উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬২তম বর্ষ

(১৩৬৬-মাঘ হইতে ১৩৬৭-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

প্রতি সংখ্যা ৫০ ন প

ভারতাত্মার বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্যের নিকট আমার বক্তব্য আমি সাহসের সহিত বলিয়াছি। হে আমার প্রিয় স্বদেশবাসিগণ, তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য আরও সাহসিকতাপূর্ণ। নবীন পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিকট প্রাচীন ভারতের বার্তা আমি সাধ্যমত প্রচার করিয়াছি, ইহা ভালভাবে হইয়াছে কি হয় নাই, ভবিষ্যৎই তাহা প্রকট করিবে; কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলশালী কণ্ঠ হইতে এখনই মৃদু অথচ স্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—দিন দিন তাহার শক্তি বর্ধিত হইতেছে—ভবিষ্যৎ ভারত বাণী প্রেরণ করিতেছে বর্তমান ভারতের নিকট!

* * *

আমরা ভারতের অধঃপতনের কথা অনেক শুনিয়া থাকি। একদিন ছিল, যখন আমিও এ সব বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার শক্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়া, দৃষ্টির বিঘ্নকারী সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, সর্বোপরি পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রগুলি যথাস্থানে যথাভাবে দর্শন করিয়া বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি—আমার ভুল হইয়াছিল।

আর্যদের পুণ্যভূমি! তোমার কোনদিন অধঃপতন হয় নাই। রাজদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে, উহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শাসনদণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে। কিন্তু ভারতে রাজা এবং রাজসভা অল্প কয়েকজনকেই বিচলিত করিয়াছে; উচ্চ হইতে নীচ অগণিত জনগণ অবারিতভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অনিবার্য গতিপথ; জাতীয় জীবনধারা বহিয়া চলিয়াছে—কখন মন্দবেগে অর্ধচেতনভাবে, কখন জাগ্রত চেতনায় প্রবলভাবে। আমি অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখি, চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়াছে অখণ্ড মিছিলের মতো, তাহার উজ্জ্বলতা কোথাও একটু কম—আবার একটু পরেই উহা দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ওই, ওই দেখা যায় আমার জননী জন্মভূমি চলিয়াছেন শান্তগম্ভীর পদসঞ্চারে তাঁহার বিধিনির্দিষ্ট গৌরবময় কর্তব্য সম্পাদনে—পশুমানবকে দেবমানবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, স্বর্গে বা মর্ত্যে এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে।

[Introduction to 'India's Message to the World' হইতে অনুবাদ]

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষের উদ্বোধন

কালস্রোতে আর একটি তরঙ্গ অতীতের বক্ষে বিলীন হইয়া গেল। এই সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধনে'র ৬২তম বর্ষ আরম্ভ। শ্রীভগবানের শুভাশিস্-শক্তিই আমাদের সম্বল। নববর্ষের যাত্রাপথে সুধী লেখক-লেখিকার, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা দিনে দিনে নূতন করিয়া লাভ করিব, ইহা নিশ্চিত জানিয়াই আমরা আগাইয়া চলি।

'উদ্বোধনে'র বাণী জাগরণের বাণী, আবার অগ্রগতির বাণী। নিদ্রিত আত্মবিস্মৃত মানুষ ভোগাচ্ছন্ন স্বপ্ন হইতে জাগরিত হওয়ার পর কি করিবে? সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত মৃতপ্রায় মানুষ অমৃতময় আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া তার পর কি করিবে?—আত্মলাভের পথে, আত্মবিকাশের পথে, সাধনার পথে আগাইয়া চলিবে!

'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি'! যে চলিতে থাকে সেই মধু আহরণ করে। আমাদেরও চলিতে হইবে—জ্ঞানের সন্ধানে, হারানো স্বরূপের সন্ধানে!

স্থিরতা জড়ের ধর্ম, স্থবিরত্ব মৃত্যুর লক্ষণ; স্পন্দন প্রাণের ধর্ম, প্রকাশ চৈতন্যের লক্ষণ, অবারিত জয়যাত্রা জীবনের লক্ষণ। বজ্রনির্ঘোষে স্বামীজী যদি কোন কথা শতাধিক বার উচ্চারণ করিয়া থাকেন তো তাহা গায়ত্রীমন্ত্রের মতো সেই মহাবাণী, 'ওঠ, জাগো, যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ ততক্ষণ থামিও না।'

স্বার্থ-সীমিত জীবনের মোহনিদ্রা হইতে আমাদের জাগিয়া উঠিতে হইবে। 'আমি ও আমার'—এই দুটি কথায় ভরা সুখতন্দ্রা ভাঙিতে হইবে! তারপর? তারপর চলিতে হইবে লক্ষ্যের অভিমুখে, লক্ষ্য সেই সুদূরের আদর্শ—যাহা দূরে, আবার নিকটে—অন্তরের অন্তরে! 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'! সেই লক্ষ্যই তো আমাদের হারানো স্বরূপ! তাহার অনুভূতি হারাইয়াই তো আমাদের যত দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু। তাহার অনুভূতি ফিরিয়া পাইলেই মানুষ দুঃখের পারে যায়, তাহার কষ্টের শেষ হয়, সে বোঝে—স্বরূপতঃ আমি 'বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকঃ'—আমি জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন—স্বরূপতঃ আমি জ্ঞানের আলোক, প্রেমের আনন্দ। এই জ্ঞানের আলোকই মানুষের সকল দুঃখ দুর্বলতা দূর করে, জ্ঞানই তাহাকে ভয় হইতে মুক্ত করে; প্রেমের আনন্দই মানুষকে ভোগ হইতে ত্যাগে, সীমা হইতে অসীমে, অল্প হইতে ভূমায় লইয়া যায়। নববর্ষের উদ্বোধনে আমরা সেই আত্ম-বিকাশের, আত্মবিস্তারের প্রার্থনা জানাইয়া ছন্দোময় কর্মময় জীবনের পথে অগ্রসর হই।

* * *

আমাদের আগাইয়া চলিতেই হইবে, কারণ আমরা যে শুনিয়াছি স্বামীজীর কথা—আমরা যে বিশ্বাস করি তাঁহার বাণীর প্রতিটি অক্ষর: 'আধ্যাত্মিকতার এক বন্যা আসিতেছে। স্পষ্ট দেখিতেছি, এই উদ্দাম, বন্ধনহীন, সর্বগ্রাসী প্লাবন সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সকলে অগ্রসর হও, সকলের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা এই প্লাবনের গতিবেগ বর্ধিত করুক এবং তোমাদের সমবেত উদ্যমে উহার পথ বাধামুক্ত হউক!'

আমাদের থামিলে চলিবে না—লক্ষ্যের অভিমুখে অবিরত আগাইয়া চলিতে হইবে। 'উদ্বোধন' যে স্বামীজীর জাগরণের বাণী—অগ্রগতির আহ্বান!

'আগামী পঞ্চাশ বৎসর—'

'আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন'—স্বামীজীর এই নির্দেশ দেশবাসী—জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক—গ্রহণ করিয়াছিল; সংখ্যায় খুব বেশি না হইলেও মধ্যবিত্ত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মর্মে মর্মে স্বামীজীর এ বাণী একদিন নাড়া দিয়াছিল।

স্বল্পমাত্রায় আচরিত হইলেও যুগোপযোগী এই ধর্ম আমাদিগকে মহা ভয় হইতে ত্রাণ করিয়াছে। স্বামীজীর মুখে এই বাণী উচ্চারিত হইবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই দেশজননী পরাধীনতার পাশমুক্ত হইয়াছেন,—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। শৃঙ্খলিতা বন্দিনী জননী আবার রাণীর আসনে—দেবীর আসনে বসিয়াছেন।

স্বামীজীর চক্ষে দেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষের মতো প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই জাতির চরমতম অবনতির দিনেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে দেশের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, এবং আসন্ন প্রভাতের মাঙ্গলিক গীতি গাহিয়া গিয়াছেন! তিনিই সেই রাত্রিশেষের ঘনীভূত অন্ধকারের বক্ষে উষাগমের স্পন্দন-স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন, তিনিই ভারতবাসীকে ডাক দিয়া শুনাইয়াছিলেন: ওঠ, জাগো, সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া,—ওঠ, জাগো, দিবসের কর্মভার গ্রহণ কর, জগৎ তোমার প্রতীক্ষারত!

সে বাণী কেহ শুনিয়াছে, কেহ শোনে নাই, তা বলিয়া যুগধর্মের রথচক্র স্থির হইয়া বসিয়া নাই! ঘর্ঘর ধ্বনিতে তাহা চলিয়াছে বিশ্ব-পরিক্রমায়। দেশে বিদেশে দেব-মানবতার জাগরণী বাণী হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইতেছে, ধীরে—কিন্তু ধ্রুব।

উদয়কালীন দিগন্ত-লগ্ন সূর্য নবীন আশা ও নব অনুরাগের বার্তা বহন করিয়া আনে, অন্ধকার-ভয় বিদূরিত করিয়া আনন্দ-কাকলিতে গগন পবন মুখরিত করে। কিন্তু আলোক-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুনীল আকাশে অরুণিমা মিলাইয়া যায়, প্রভাত-সূর্য ক্রমশঃ দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়; তাহার কিরণরাজি বিচ্ছুরিত হইয়া, প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকের সকল কিছু প্রকাশিত করে, কিন্তু সূর্যকে আর কেহ দেখে না, দেখে বিচিত্র জগৎ—বিচ্ছিন্ন সংসার, হারাইয়া যায় জগৎ-প্রকাশক আলোকের উৎস।

* * *

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মানুষ স্বামীজীকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, এখন আর তাহা দেখে কি? কাহারও কাহারও মতে স্বামীজীকে আমরা ভুলিয়াছি, কাহারও মতে সম্পূর্ণ ভুলি নাই, ক্রমশঃ ভুলিতেছি! আবার কেহ কেহ বলেন: স্বামীজীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এক সময় প্রয়োজন থাকিলেও এখন আর ঐ সব ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে লোককল্যাণ-প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন নাই! দেশে 'দরিদ্র' থাকিলে তবে তো মুক্তির সাধকেরা 'দরিদ্রনারায়ণে'র সেবা করিয়া নিজ নিজ মুক্তির পথ প্রস্তুত করিবার সুযোগ পাইবেন। আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের অভিধানে 'দরিদ্র' শব্দটিই অচল। তবে এখনও যে দেশে দরিদ্র আছে, তাহার কারণ পৃথিবী এখনও পুরাতন ভাব সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারে নাই। দান করিয়া কাল্পনিক পুণ্য অর্জন করিবার মতো লোভী ধনী এখনও আছে বলিয়াই দান গ্রহণ করিবার মতো লোভী দরিদ্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয়ই একসঙ্গে বিলুপ্ত হইবে। ইহা অতি সুন্দর মুখরোচক মনোরম আশাবাদ,—আদর্শবাদ ইহাকে বলা

চলে না, কারণ ইহা তথাকথিত 'বাস্তববাদী' দর্শনেরই অনুসিদ্ধান্ত।

অভাবগ্রস্ত আর্ত পীড়িত দরিদ্রদিগকে যাঁহারা অর্থনীতির রঙীন চশমা দিয়াই দেখেন, তাঁহাদের সহিত এখানে আমরা কোন বাদে প্রবৃত্ত হইব না। শুধু বিবেকানন্দ-সমালোচনার একটি আধুনিক ধারা দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা একান্ত আবশ্যক বোধেই এই জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ধৃত হইল।

এতদ্‌ব্যতীত আর একদল সমালোচক আছেন, যাঁহারা মনে করেন—স্বামীজীর প্রাচীনপন্থী আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাস প্রগতিশীল বর্তমানে অচল। তাঁহারা স্বামীজীর ধর্মপ্রাণতামূলক দেশপ্রেমকে ভুল করিয়া মনে করেন 'সেকেলে জাতীয়তাবাদী হিন্দুয়ানি' (out-of-date patriotic Hinduism)। এই প্রকার যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই 'আমেরিকায় স্বামীজী'-বিষয়ক বিরাট গ্রন্থের রচয়িত্রী মার্কিন মহিলা তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :

ভারতের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত আমার যতটুকু পরিচয় আছে তাহাতে মনে হয়—অনেক আধুনিক হিন্দু (ভারতবাসী) মনে করেন, স্বামীজীর মতামত সেকেলে। তাঁহাদের মতে—পরিবর্তিত অবস্থায় স্বামীজীর ভাবাদর্শ অচল। কিন্তু আমি স্বামীজী সম্বন্ধে যতটুকু জানিয়াছি—তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাই, তাঁহার উপদেশগুলি আজও সজীব। আর যদি অনুমতি পাই, তবে বলিতে পারি—স্বামীজীর শিক্ষা অবহেলা করিলে ভারতবাসিগণ নিজেরাই বিপদে পড়িবে।*

এ কথার সত্যতা আজ আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। সম্পূর্ণভাবে না হইলেও দেশবাসী কথঞ্চিৎ ভাবে স্বামীজীকে ভুলিতে বসিয়াছিল। তাই আজ চারিদিকে দেখা যায় বিভিন্ন রাজনীতিক মতবাদের নামে স্বার্থবাদ সুবিধাবাদ ও তাহার ফলস্বরূপ মুষ্টিমেয়ের দুর্নীতি ও জনসাধারণের দুর্গতি। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দেশে যে নৈতিক বল ছিল, আজ তাহা গল্পের বিষয়বস্তু।

'ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ, এই পথে তাহার জীবনধারা প্রবল বেগে চালিত কর, বাকী সব আপনা আপনি আসিবে'—স্বামীজীর এই উক্তি দীর্ঘ দিন ধরিয়া বহু ভারতীয় যুবককে ত্যাগ ও সেবার পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ত্যাগের কথা শুনিলে আজ তরুণেরা হাসে, ভোগের কথায় তাহারা উৎকর্ণ—লালায়িত। তাহারা মনে করে : ভোগেই তাহাদের জন্মগত অধিকার। সকলে ভোগ করিতেছে, আমি কেন করিব না? একদা চিন্তার ধারা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত : যেহেতু সকলে ভোগ করিতেছে, অতএব আমি করিব না। আমি মহত্তর কিছুর সন্ধানে চলিব, প্রেয় ছাড়িয়া শ্রেয়ের সাধনা করিব।

চক্রপথে মানব-মনের এ পরিবর্তন ক্রান্তদর্শী স্বামীজীর অজানা ছিল না, তিনি জানিতেন, 'an age of continence is followed by an age of corruption.'—একটি সংযমের যুগের পরে দেখা দেয় একটি অসংযমের যুগ। আজ সেই যুগ আসিয়াছে। আমরা কি ইহারই স্রোতে ভাসিয়া যাইব, অতলে তলাইয়া যাইব, না কি ঘূর্ণাবর্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিব? যদি সেই চেষ্টাই করিতে হয়, কি ভাবে করিব? কোথায় আমাদের শক্তি? কে আমাদের সহায়?

সহায় আমাদের তিনিই, যিনি জানিতেন—তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়াই মানুষ আগাইয়া

* মূল ইংরেজী উদ্ধৃতিটি এই প্রবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য।

চলে। শক্তি আমাদের তিনিই দিবেন, যিনি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তি দর্শন করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন মানব-মহিমা। স্বামীজীকে ভুলিলে চলিবে না। যাঁহার বাণী ও উদ্দীপনা একবার আমাদিগকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়াছে, তাঁহারই শিক্ষা ও দীক্ষা আমাদিগকে আবার এই মহত্তর দুর্গতি হইতেও পরিত্রাণ করিবে। স্বামীজী কি বলেন নাই, 'যাহা দিয়া যাইতেছি, তাহা কার্যে পরিণত করিতে ১৫ শত বৎসর লাগিবে'?

তাঁহার একটি মাত্র ভাবমন্ত্র সাধন করিয়া দেশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশবাসী ভুলিয়াছে তাঁহার কঠোর কঠিন সবধানবাণী : 'এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?' স্বাধীনতা সত্ত্বেও দেশের বর্তমান দুঃখ দুর্দশা দুর্নীতি দেখিয়া যাঁহারা ব্যথিত ও চিন্তিত তাঁহাদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে : এবার স্বামীজীর কোন্ মহামন্ত্র সাধনা করিলে তবে আমরা এই নবজাগ্রত দেশের উপযুক্ত অধিবাসী হইতে পারিব? নূতন দেশের জন্য আজ প্রয়োজন নূতন মানুষ। অধঃপতিত জাতির জন্য সুগভীর সমবেদনা অনুভব করিয়াই স্বামীজী আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন এক অপূর্ব প্রার্থনা-মন্ত্র : 'মা, আমায় মানুষ কর।'

কেন, আমরা কি মানুষ নই? দেশে কি সত্যই মানুষের এত অভাব স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন যে বারংবার বলিয়াছেন, 'মানুষ গড়ার ধর্মই আমার ধর্ম!'

কী সেই 'মানুষ-গড়া ধর্মে'র রহস্য-মন্ত্র? শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তিতেই ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; কথাটি এত সরল ও সহজ যে ইহার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ গভীরেই থাকিয়া যায়। স্বামীজীর জীবন দেখিয়াই, স্বামীজীর ব্যাখান হইতেই আমরা ইহার অর্থ কিছুটা ধরিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ 'মানুষে'র সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'মানুষ, না মানহুঁশ'। কথাটি কাব্য-পূর্ণ, কথাটি সূত্রাকারে উচ্চারিত। যার মান বা সম্মান বোধ আছে সেই মানুষ; আবার যে নিজের মান, পরিমাণ বা স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন সেই মানুষ। জানি না ইহার আরও কত গভীরতর অর্থ হইতে পারে, আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি সেইটুকু সাধনা করিয়া যদি জীবনে পরিণত করিতে পারি, তবেই—কি ব্যক্তি-জীবন কি সমাজ-জীবন, কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক জীবন সার্থক হইয়া যায়।

'মা, আমায় মানুষ কর'—আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য ইহাই আমাদের সাধনমন্ত্র হউক এই 'মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন' করিতে হইবে। অমানুষের মতো 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-জীবন যাপন করিয়া লাভ কি? যদি জীবন ধারণ করিতেই হয় তো মানুষের মতো জীবন যাপন করিতে হইবে। স্বামীজীই শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্মিত পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সচল বিগ্রহ, স্বামীজীই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের—নর-নারায়ণবাদের শক্তিশালী প্রবক্তা, স্বামীজীর নব-মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা কোটি কণ্ঠে প্রার্থনা করি : মা, আমাদের দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, মা আমাদের মানুষ কর।

* * *

From what I have learned of current Indian thought, it appears that a number of modern Hindus consider Swami's views outmoded and no longer applicable to the changed conditions and ideologies. But from what I have learned of Swami Vivekananda himself, it appears obvious that his counsel is still of vital relevance and that if I may be permitted to say so, the Indian people will neglect his teachings only at their peril. **—Marie Louise Burke**

[*From Preface to 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries'*]

চলার পথে

'যাত্রী'

মানুষ আসে—মানুষ যায়, কালের ঘূর্ণাবর্তে ক্ষণিকের ঢেউ তুলে আবার মিলিয়ে যায়। কোন লেখা বা রেখা তার ঐ ছোট্ট ঢেউ-এর স্মৃতি-কণাকে আর বহন করে না। এ যেন সত্যই 'জীবন'—জীবনের আর এক নাম যে জল, সেই অর্থে। জলের ঘায়ে জলের বুকে তার কোন দাগই তাই আঁকা থাকে না। কিন্তু এই নিশ্চিহ্নতার মিছিলে এমন মানুষও দেখা দেয়, যার কথা মহাকাল তার ধ্বংসাত্মক অবলুপ্তির মধ্যেও সোনার আখরে লিখে রাখে।

মানুষ আসে, মানুষ যায়—এই প্রবাহের মধ্যেও এঁরা চিরস্থির হ'য়ে থাকেন। শুধু স্মৃতি হিসাবে নয়—মানুষের সুমুখে এঁরা এক অপূর্ব আদর্শের আলোকবর্তিকা জেলে বিভ্রান্ত মানুষকে সদাই পথ দেখান। এই রকম এক আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

মানুষের মধ্যে কেউ দ্বিদল, কেউ শতদল, কিন্তু স্বামীজী হলেন সহস্রদল পদ্ম—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই প্রকার উক্তির যাথার্থ্য বিচারে আমরা যতই অগ্রসর হই, ততই আমাদের কাছে ঐ কথার তাৎপর্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। আমরা তখনই বুঝতে পারি, এই একটি মানুষ ভারতবর্ষকে কতখানি উঁচুতে তুলে ধরেছিলেন—এবং এখনো এই ভারতবর্ষকে জগতের সুমুখে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কতখানি তাঁর আদর্শানুগ হ'য়ে চলতে হবে।

শুধু আধ্যাত্মিক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, ভারতের শিক্ষা, এমন কি সমাজ-চেতনার আদর্শানুসরণেও আমাদের স্বামীজীর উক্তিগুলি আজ স্মরণ করতে হবে।

আত্মতত্ত্বের কথায় তিনি বলেছেন: আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলে যদি সত্য লাভ হয়, তাহলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হ'বে। * * * তবে ভিতরে আত্মা সর্বদা জল্ জল্ করছে—সেদিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি আমি' করছে! এইটাই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকে জগতে ব্যাবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থ-ভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্তমান। * * * লোক যে পাপ পাপ বলে, সেটা দুর্বলতার ফল—'আমি দেহ' এই অহং ভাবের রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুমি পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হ'য়ে যাবে। ঠাকুর তাই বলতেন—আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।

শিক্ষার কথায় তিনি আমাদের শুনিয়েছেন: যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। * * * Negative thought ('নেই নেই' ভাব) মানুষকে নির্জীব ক'রে দেয়।

দেখছিস না, যে সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে, 'ওটার কিছু হবে না, ওটা বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হ'য়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্লে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। * * * ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। * * * নিজেদের মধ্যেকার দেবভাবের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। * * * কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে।

সমাজ-চেতনা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য : 'তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজ শক্তি বলে তাহা প্রকাশ কর ; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। * * * এইটী বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। * * * আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া—এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া যে কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়।' * * * 'পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে তার দ্বারা কোন কার্যই হ'তে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস তা এখনি ক'রে ফেল ; পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাববার দরকার কি ? এতটুকু তো জীবন—তার ভেতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হ'তে পারে ? ফলাফল দাতা একমাত্র তিনি, যা হয় করবেন ; সে কথায় তোর কাজ কি ? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ ক'রে যা।'

জাগর মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে তিনি শুনিয়েছেন : ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

স্বামীজীর এই সব উক্তি অপরিসীম প্রেমের শক্তিতে অমর হ'য়ে আছে। তাই বলি, চল পথিক, তোমার জীবনের দীপটিকে ঐ আদর্শালোকে জালিয়ে নিয়ে চল। তোমার মনের সমগ্র সত্তাকে ঐ দিব্যদৃষ্টির সুমুখে অবারিত ক'রে দাও। তারপর সেই ধ্যানসম্পদ নিয়ে তোমার জীবনকে ক'রে তোল পূর্ণ, সার্থক। তিনি তো তোমাদের জন্যই সেই চিরসুন্দরকে আহ্বান জানিয়েছেন তোমাদেরই হৃদয়-দিগন্তে। সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে তোমার হৃদয় মন্দিরে আবাহন ক'রে নিয়ে এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই সংখ্যার ৫১ পৃষ্ঠায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণীতে 'শিক্ষাবিভাগে' জুনিয়র শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯ পড়িবেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি পত্র

[স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-সংগৃহীত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ ॥ SRI RAMAKRISHNA MISSION ORPHANAGE
P O. MAHULA, DT. MURSHIDABAD.
Dated 1st. Feby. 1913. ১৯শে মাঘ, সন ১৩১৯

প্রিয় শ্রীমান্ বিরজানন্দ,

অনেক দিন হইল 'Life' I Vol (স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনীর ১ম খণ্ড) আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, এবং যতক্ষণ পাঠ করি রোমাঞ্চিত শরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে যেন দেখিতে পাই। সেই দক্ষিণেশ্বর, সেই কাশীপুরের বাগান প্রভৃতির কথা পড়িতে পড়িতে হুবহু সেই সকল চক্ষের সাম্নে আসিয়া পড়ে। ধন্য Mother (মিসেস সেভিয়ার) ও ধন্য শ্রীশ্রীস্বামীজীর Eastern and Western Disciples (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ) ! যাঁহাদের বহুকালের আন্তরিক যত্নে আজ আমরা এমন সর্বাঙ্গসুন্দর 'Life' (জীবনী) সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিলাম। তোমাদের সকলের ঐকান্তিক যত্নের ফলে এবং শ্রীমতী mother (মাদার)-এর অসীম ভক্তি জোরেই শ্রীশ্রীস্বামীজী নিজেই তোমাদের লিখিত 'Life'-এ (জীবনী গ্রন্থে) তাঁহার spirit (ভাব) সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়াছেন!!! তোমাদের সমবেত চেষ্টা ও অচলাভক্তির ফলে যেন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সর্বদা তোমাদের এই বইখানির মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তবে একটা কথা এই যে ১ম খণ্ড পড়িয়া ২য় খণ্ডের জন্য আরও ৪ মাস বিলম্ব প্রায় অসহ্য বোধ হইবে। কবে আবার 2nd Volume (২য় খণ্ড) পাইব বলিয়া দিন গনিতে থাকিলাম।

Mother (মাদার)-কে আমার হইয়া বলিও যে 'অদ্বৈত আশ্রম' হইতে এই যে শ্রীশ্রীস্বামীজীর 'Life' (জীবনী) বাহির হইল, ইহার তুলনা নাই! কেবলমাত্র এই একটি কাজের জন্যই অদ্বৈত আশ্রমের গৌরব অক্ষুণ্ণ ও চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিল!!! ২য় Vol. (খণ্ড) বাহির হইবামাত্রই যেন আমাকে মনে থাকে। আর তাহা কি নাগাইদ বাহির হইবে, তাহাও লিখিয়া জানাইবে।

গত ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজীর শুভ জন্মতিথিপূজা হোম আরতি যথারীতি হইয়াছে, এবং ভোগ লাগাইয়া আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে খাওয়ানো হইয়াছে। আবার আগামী কল্য রবিবার 'দরিদ্রনারায়ণ' ভোজন এবং উৎসবানন্দ হইবে। বহরমপুর Ramakrishna Vivekananda Association (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি)-এর member (সদস্য—কলেজের ছাত্র)-গণের আসিবার কথা আছে। তোমাদের ওখানে উৎসব কিরূপ হইল—লিখিবে।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিয়াছেন, এবং শ্রীশ্রীমহারাজও মঠে আসিয়াছেন, বোধ হয় শুনিয়াছ।

কাশিমবাজারের Hon'ble Maharaja (মাননীয় মহারাজা)-কে 'Life' (জীবনী) একখানি পত্রপাঠ পাঠাইবে, এবং তোমাদের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিবে।

...মাদারকে আমাদের এখানকার সকলের নমস্কার ও ভালবাসা জানাইবে, এবং তোমরা সকলে জানিবে। আশ্রমের ছেলেরা এক রকম ভাল আছে। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ।...ইতি—তোমাদেরই শ্রীঅখণ্ডানন্দ।

সংসারে থেকে সাধনা*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

এই তোমাদের লখনউ-এরই মেয়ে কাশীতে গিয়েছিলেন। মেয়েটিকে প্রশ্ন করি, তুমি ঠাকুরকে তোমার ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসো? অদ্বৈত গোস্বামী বংশের মেয়ে জেনে কি জানি কেন আমার ভেতর থেকে এই প্রশ্নটি করতে ইচ্ছা হ'ল। তাই ওঁকে এ রকম জিজ্ঞাসা করলাম। তার উত্তরে উনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই'। একঘর লোক বসে আছে। বেশীর ভাগই মেয়ে। সেই আমার প্রথম প্রশ্ন। আর কাউকে কোন প্রশ্ন করিনি। যখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই'—তখন বললাম, তোমার কথা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। একটু ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো। তখন তিনি বললেন, 'মহারাজ, ছেলেমেয়ে দিয়েছেন যে ঠাকুর। যখন দিলেন তখন তাঁর ইচ্ছায় পেয়েছি, আবার তিনি যখন ডেকে নেবেন, তখন আমাদের কিছু বলবার জো নেই। ছেলেমেয়ে তিনি দিয়েছেন, আবার তিনিই ডেকে নেবেন যখন তাঁর ইচ্ছা হবে। ঠাকুর যে আমার চিরকালের আপনার—ইহকালের, পরকালের। তাঁকে ভালবাসবো না? তিনি আগে, তারপর তো এরা।'

তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের। কোথায় তিনি? আগে তিনি, তারপর তো আমি। এটা ভুলে গেছি। উপনিষদ্‌ও আমাদের এই কথা শেখাচ্ছেন। 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।'

সংসারে বেশী আসক্তি টান কিসের প্রতি? এই সব সম্পদ পুত্র বিত্ত প্রভৃতির প্রতি। এই সবেই তো আমাদের আসক্তি। কিন্তু আমাদের ভিতর যিনি রয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে অন্তরে, এসবের চেয়েও প্রিয়। কাজেই তাঁকে প্রিয়ভাবে উপাসনা করবে। এইটি ঋষিদের বাণী। আগে ভগবান, তারপর সংসার। আগে এক, তারপর শূন্য বসাতে হয়। আগে তিনি। তিনিই সব দিয়েছেন। কাজেই এই যে ছেলেমেয়ের প্রতি—সংসারের প্রতি যে আসক্তি, ভালবাসা, আকর্ষণ, টান—সব তাঁরই জন্য। তাঁকে বাদ দিলে কিছু থাকে না। এইটি ভাবো যে—সব তিনি, সব তাঁর। কতটা ভালবাসা হ'লে এটা সম্ভব হয় বল দেখি? আর সেই ভালবাসাটা আসে না কেন? এই টানটা আসে না কেন? সংসার টেনে রেখেছে; জরু, জমি, রূপেয়া—সব টেনে রেখে দিয়েছে। এইগুলিকে কোটী জন্ম ধরে ভালবাসছি। আপনার ক'রে রেখেছি। সেটা থেকে মন ওঠাতে হবে। সেইজন্যই ঠাকুরের শিক্ষা—হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, তা না হ'লে আঠা জড়িয়ে যায়, আর সেই আঠা ছাড়ানো যায় না। যদি তেল মাখানো থাকে, তাহলে হাতে আর আঠা লাগে না। তেল মাখানোর দরুন অল্প চেষ্টাতেই আঠা উঠিয়ে ফেলে দিতে পারা যায়। কাঁঠাল ভাঙা মানে কি? সংসার করা। আসক্তি হ'ল আঠা। সেই আঠাটা মনে লেগে আছে। তেলটুকু মাখানো চাই। সেই তেলটি কি? অনুরাগ, ভক্তি। সংসারের প্রতি টান, ভালবাসা—

* ১৩-১১-৫৯ তারিখে লখনউ রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ (tape-record এ গৃহীত) হইতে সংকলিত।

এ তো আছেই, ভগবান দিয়েছেন আমাদের ভেতর, না হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে? আমরা কি দেয়াল, ইট, কাঠ না পাথর? স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা নিয়েই তো এই সংসার। এইগুলি কি সংসার থেকে একেবারেই চলে যাবে? মোটেই না। সেই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হবে; ছেলে, মেয়ে, স্বামী—সবার সেবা করতে হবে। এ সব তাঁরই দান। তবে শুধু সংসারের সেবা করতে গিয়ে সব গুলিয়ে যায়। সেই আসক্তি আর ছাড়াতে পারা যায় না। সেই জন্যই ওই তেল মাখানোর উপদেশ।

প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ ও টান সংসারের প্রতি রয়েছে, তার দ্বারাই সংসারের কর্তব্য পালন করা হয়। সেই স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা যাঁর জিনিস, তাঁকেও তো দিতে হবে। যে অনুরাগ, যে প্রীতি, সংসারে দিচ্ছি—তার সবটা না হ'ক কিছুটা তো ভগবানকে দিতে পারি! প্রীতি দিয়ে সংসারের কর্তব্য পালন ক'রে যখন পূজায় বসি, তখন কোথায় থাকে সেই প্রীতি? কোথায় সে ভালবাসা, সে আকর্ষণ—টান? সংসার টেনে রেখেছে মনটা, যেতে দেয় না। কিন্তু যদি তেল মাখানো থাকে? কর্তব্য পালন করলে, মনে ভক্তি-তেল মাখানো আছে, আঠা লাগলো না। আবার সেই প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ নিয়ে বসো পূজায় জপে, বসো ধ্যানে প্রার্থনায়। সেইটি আমরা শিখিনি। Attachment and detachment—এই দুটি কথা আছে, মানে আসক্তি এবং অনাসক্তি। ও তেল মাখানো নেই, কাজেই আঠা লেগে গেছে। আর সেই প্রেম ভালবাসা নিয়ে সংসারের যেমন কর্তব্য করছি, তেমনি আর একটা বড় কর্তব্য আছে। যাঁর সংসার, যিনি এই সব দিয়েছেন, তাঁর প্রতিও তো একটা কর্তব্য থাকা চাই। ঠাকুর বলতেন, 'খোল-মাখানো জাব'। গরুকে শুকনো জাব দাও, খাবে কি? কিন্তু যদি খোল মাখিয়ে দাও, দেখবে কি রকম তৃপ্তির সঙ্গে খাবে। সংসারে যেটুকু করি, সব প্রীতি-খোল মাখানো। সকলে কি প্রীতি আস্বাদন করছে! সেই প্রেম ভালবাসা—ছেলে বল, স্বামী বল, সকলকে যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নিজেদের সংসারে দেখছ তো, সেই প্রীতিটুকু যদি পরস্পরের মধ্যে আস্বাদন না করো সংসারটা একেবারে শুকনো হ'য়ে যায়। এ তোমরা তো জানো। এই প্রীতিটুকু নিয়ে সংসারে প্রেম, ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ। তেমনি ভগবানের দিকেও আবার একটা আকর্ষণ আছে তো? সকলের ভিতর তিনি। তিনি না থাকলে কোথায় থাকবে এ সব? এটা ভুলে গেছি। শুধু শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছি। কাজেই এর বেশী আর আমরা দেখতে পাই না। এই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, আবার ওঠাতে হবে, ভগবানকে দিতে হবে। এই দেবার জন্য গীতার উপদেশ—অনাসক্ত হ'য়ে থাকো। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—পানকৌটির। পানকৌটি জলে রইল, ডানা ভিজে গেল, একবার ডানা ঝেড়ে নিলে, শুকনো হ'য়ে গেল।

আবার পাঁকাল মাছের দৃষ্টান্ত: পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকবে। দেখ পাঁকের মধ্যে রয়েছে, অথচ গায়ে পাঁক লাগে না। ওই অনাসক্তির তেল মাখানো আছে। সংসারে আমরা প্রত্যেক জিনিসই করছি প্রীতির সঙ্গে। এমনকি কুকুর-বেড়ালের প্রতিও আমাদের কত প্রীতি! কুকুরটা পর্যন্ত তোমার প্রীতি আস্বাদন করছে, তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। পশু, সেখানে আদান-প্রদানের ভাষা নেই—তাকেও তুমি কিভাবে যত্ন ক'রছ,

খাওয়ানো, দাওয়ানো সব কিছু ব্যাপারে। আর সে তোমার গোলাম হ'য়ে যাচ্ছে। বেড়ালটাও তাই।

আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন, তাঁরই জন্য তো সব। স্বামীর মধ্যে, ছেলের মধ্যে, সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন। তাঁরই জন্য তো সংসারের সব কিছু এত প্রিয়, তাঁতেই তো সব কিছুর স্থিতি। সবই হচ্ছে তাঁর। তাঁকে ভালবাসতে হবে। প্রীতিই হ'ল আসল জিনিস। প্রীতিই হ'ল পরম সাধন। সেই প্রীতিটুকু নিয়ে যেমন সংসার করতে হবে, তেমনি আবার বড় কর্তব্য যেটা, সেটাও করতে হবে। তাঁকে নিয়ে সংসার কর। জানো তো কি সঙ্গে ক'রে এনেছ? কেউ সঙ্গে যাবে? মোটেই না। যেমন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে। মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছ, আবার সেই ভাবেই যেতে হবে। কোন্ অজানা দেশ থেকে এসেছ, আবার কোন্ অজানা দেশে যেতে হবে। এই মাঝখানেরটা নিয়েই আমাদের যত কিছু গোলমাল। তা তো ঠিক নয়। তিনি সব সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন। আমরা সব তাঁতেই রয়েছি। কাজেই তাঁতে আমাদের আদি-অন্ত-মধ্য, সংসার তো আর শেষ লক্ষ্য নয়। তবে সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? সেই আগেকার কথা, যেটা থেকে আরম্ভ করেছি—আগে তিনি, তাঁকে ভালবাসতে হবে। সংসারে যারা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে—যতটুকু দরকার। আবার প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা তাঁকে দিতে হবে। সংসার তাঁকে ভুলে নয়, তাঁকে আশ্রয় ক'রে। তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে আপনার জেনে সংসার করতে হবে। কেননা ইহকালে পরকালে তিনিই রয়েছেন। সব সময় তিনিই আমার আপনার। ছেলেমেয়েদের দেখেছ তো সংসারে—কখনও দিচ্ছেন, আবার কখনও নিচ্ছেন। এর জন্য নিজেকে তৈরী থাকতে হবে। এইটি হ'ল কথা। এইটি যেন কখনও ভুলো না।

সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুর বলতেন, ছুতারনির মতো। ওইগুলো অভ্যাস করতে হয়। একদিনে ছুতারনি হওয়া যায় না। চিঁড়ে কোটে ছুতারনি। চিঁড়ে তুলছে, দেখছে চিঁড়ে কাঁড়া হ'ল কিনা। খদ্দের এসেছে, তাকে চিঁড়ে বিক্রী করছে। আবার কে কবে কত দাম বাকি রেখেছে, তার হিসাব ক'রে বলছে। ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পালন করছে! কিন্তু মনটা রেখেছে কোথায়? ঢেঁকির মুষলের দিকে। গীতায় বলছেন ভগবান্ঃ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ'—আমাকে আশ্রয় ক'রে সব কর। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'। একবারও অর্জুনকে বলছেন না যে, যুদ্ধ ক'রো না বা কাজ ক'রো না। বলছেন, যুদ্ধ কর—আমাকে স্মরণ ক'রে, আমাকে আশ্রয় ক'রে। আমাতে আসক্ত হও, আমাকে আশ্রয় কর। তাঁতে মনটা রেখে সব কাজ কর। যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই প্রীতি প্রেম—সব। আর সেইটিকে অবলম্বন ক'রে, আশ্রয় ক'রে সংসার করতে হবে। ছুতারনি যেমন মনটিকে ঢেঁকির মুষলে রেখে দিয়ে অন্য সব কাজ করে। সংসারের ভেতর থেকেও মনটিকে তাঁতে ফেলে রাখা—এইটি শিখতে হবে। তাঁকে ধরে, তাঁকে আশ্রয় ক'রে সংসার করতে হবে, তাঁকে ভুলে নয়।

ঠাকুরের আর একটি দৃষ্টান্ত। আড়ায় ডিম রয়েছে, কচ্ছপ জলে চরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মন আছে সেই ডিমের দিকে। এইটি হ'ল আসল জিনিস। এটি অভ্যাস করতে হবে। এ সব কি একদিন, কি এক ঘণ্টা বসে জপ করলে বা ধ্যান করলেই হবে? তা নয়। কর্মের ভেতর দিয়ে সব সময় এ যোগটি তাঁর সঙ্গে রাখতে

হবে। এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? তাঁকে ভালবাসতে পারলে হবে—না হ'লে অসম্ভব।

সেই গল্প জান তো? কৃষ্ণ এসেছেন বিদুরের বাড়ী। আর বিদুরের স্ত্রী কি করছেন? দরিদ্র বিদুর, বাড়ীতে কিছুই নেই। বিদুরের স্ত্রী খুঁজে পেলেন একটি শুকনো কলা। আনন্দে তিনি এত বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন যে, কি করছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। সেই কলাটা ছাড়িয়ে শুকনো খোসাটি কৃষ্ণের মুখে ধরেছেন—একেবারে হুঁশ নেই। কিন্তু খোসাটিতে এমন একটা জিনিস মাখিয়ে দিয়েছেন যে তার অমৃতের মতো আস্বাদ। কৃষ্ণ সেই প্রীতি আস্বাদন করতে লাগলেন। দেখতে পাচ্ছ, ভক্তি মানেই এই প্রীতিটুকু। ভগবান সেই প্রীতিটুকু চান। যার কাছে পান, তার একেবারে গোলাম হ'য়ে যান। ভগবান অবতীর্ণ হন মানুষ-শরীরে, এইটি শিখাবার জন্য। ঠাকুর এই প্রীতির কথা বারবার বলতেন। মীরাও এই প্রীতির কথা বলেছেন, 'প্রীত করুনা চাহি রে মনবাঁ; প্রেম লগানা চাহি।' তোমাদের এইগুলি সব জেনে নিয়ে সাধন করতে হবে। ভগবানকে আপনার ক'রে নিতে হবে। আর তা প্রত্যেকটি দৈনন্দিন কাজের ভেতর দিয়ে কিভাবে হবে, তাও শেখাচ্ছেন। যা কিছু করবে ভগবানকে স্মরণ ক'রে কর, যা কিছু করবে সব তাঁকে অর্পণ কর। আর আমরা কি করি? আমরা 'আমিত্বে'র উপাসনা করি। নিজেকে যত খালি করতে পারবে ততই দেখবে তাঁর প্রকাশ তোমার মধ্যে। যা কিছু আমরা দৈনন্দিন জীবনে করি, তা ভগবানকে স্মরণ ক'রে করতে হবে। সব সময়ে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাঁকে স্মরণ কর, আর কর্তব্য পালন কর। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' এইটিই হ'ল আসল জিনিস। আর আমাদের এইখানেই ভুল। তাঁকে স্মরণ ক'রে, আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করতে হয়। এটা অভ্যাস ছাড়া হয় না। তবে সংসারে ভোগের মধ্যে সেটা আসে না। তাই চাই সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ বড় প্রয়োজন; ঠাকুরের ভাষায় 'ঘড়ি মেলানো'। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতেন, তাঁদের মনটা বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে, আর ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে এসেছে। সাধুর কাছে গেলে সেইটে বুঝতে পারা যায়—অর্থাৎ তখন বিবেক জাগে। বিবেক ব'লে দেয় আমরা ভগবানের কাছ থেকে পিছিয়ে এসেছি। এই জন্য মন-ঘড়িটিকে মিলিয়ে নিতে হয়, regulate ক'রে নিতে হয়। সাধুসঙ্গ হুঁশ এনে দেয়। সাধুসঙ্গে ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ লাভ হয়, এমনকি ভগবান পর্যন্ত দর্শন হয়। এখনই হয় না কেন? কারণ, মন বিষয়ে বাঁধা পড়েছে। আমার নিজের জিনিস অপরের কাছে বাঁধা পড়েছে। মন তো আমার হাতে নেই। কাজেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গে সেই বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে।

আর একটা কথা যা রোজ শোনো, শোনার পর একটু চিন্তা করবে। তোমাদের শোনা হ'য়ে গেল, ব্যস্, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে এ-গল্প সে-গল্প জুড়ে দিলে। যা শুনলে তার কিছুই মনে থাকে না। শ্রবণ হয়, কিন্তু মনন নিদিধ্যাসন হয় না। কি কঠিন সংস্কার! কত জায়গায় কত কিছু শুনে আসো, সব মনে রেখে দাও। যদি ভাল সংস্কার থাকে তাহলে ধর্ম-প্রসঙ্গ যা শুনলে সব ঠিক মনে রাখতে পারবে। ভাল সংস্কার অভ্যাসের দ্বারা হয়।

তোমরা তো এত শুনছ, তবু মনটা ভরে না কেন? শুভ সংস্কার হয় না কেন? তোমাদের শ্রবণ হয়, মনন হয় না। চিন্তা করা চাই।

ঠাকুর যেমন বলতেন, 'গরু একপেট খেল, তারপর এসে জাবর কাটতে লাগল।' এইগুলি শোনার পর তোমরা দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করতে চেষ্টা করবে। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ দেখবে অশুভ সংস্কারগুলো চলে যাবে। এই সবের দ্বারা রাজসিক মন সাত্ত্বিক হবে। সাত্ত্বিক মন সাধনার সহায়। কিন্তু রাজসিক মন ঠিক উল্টো রাস্তায় নিয়ে যায়। যা শুনলে দৈনন্দিন জীবনে যদি অভ্যাস কর, এই ভাবে কর্তব্য কর্ম কর, তাহলে দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্ত্বিক হ'য়ে যাবে। ভগবানের লীলাচিন্তন, নামজপ, সাধুসঙ্গ মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে। এইগুলি দৈনন্দিন অভ্যাস করতে হবে, না হ'লে মনটা ওঠা নামা করবে। সেইজন্য ভগবান্ গীতায় বলেছেন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' ঠাকুরও বলছেন—কচ্ছপের মতো, ছুতারনির মতো খানিকটা মন তাঁতে রেখে কর্তব্য কর্ম করবে। এইটি রোজ অভ্যাস করতে হবে। মনটিকে সংসার থেকে একেবারে তুলে নিতে পারবে না, তাই গীতার শিক্ষা—আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। সব কাজে কর্মে সর্বদা খানিকটা মন তাঁর স্মরণে, তাঁর চিন্তায় রাখবে। এইটি অভ্যাস কর দেখি। ধর্ম একটা আস্বাদন করার জিনিস। ভগবান রয়েছেন, তাঁকে আস্বাদন করতে হবে তো? তাঁর সংসার তিনি সব (ভাব, সম্বন্ধ) দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে তো একটা ভাবে আস্বাদন করতে হবে। এইসব শুনলে, কিন্তু আবার হয়তো সব গুলিয়ে যাবে। কাজেই সাধুসঙ্গ চাই। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব সেখানে সদ্‌গ্রন্থ পড়বে। এ হ'ল practical ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনে যা দরকার। যা শুনলে সেটা অভ্যাস করবে। তা না হ'লে হাজার শোন, এক কান দিয়ে শুনবে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ধারণা করতে হয়।

তোমরা সকলে এসেছ। সকলেই তো ভগবানের ভক্ত। তাঁর কথা শুনতে ভালবাসো, এটা কত জন্মের শুভ সংস্কার, সুকৃতি। কেবল শোনা একটা রোগবিশেষ। কত লোক আছে, তারা শুধু শুনতেই চায়। তোমরা যেন তাদের মতন হয়ো না। যা শুনবে, সেটা ভাল ক'রে চিন্তা করবে, মনন করবে।

ভগবানের পথে এগোতে হবে তো একটু একটু ক'রে, এইটি ভুলবে না। সংসারের কর্তব্য যেমন ক'রছ, তেমনি কর। যে যে অবস্থায় আছে, তাকে সেই অবস্থা থেকেই তাঁর দিকে এগোতে হবে। গোটা সংসারটি তো আমরা মনেই পুরে রেখেছি। সংসার আর কতটুকু? সবই তো মনে। মনেই তো আসক্তি, চিন্তা—অতীতে আমার এটা হ'ল না, সেটা হ'ল না; ভবিষ্যতে আমার এটা হওয়া চাই, আর বর্তমানে এটা চাই, সেটা চাই—কেবল এই সব চিন্তা। কাজেই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে চলেছি, লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে, ভগবানে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। কিসের জন্য? আনন্দ—শান্তি পাবার জন্য। আর তাঁকে ভুলে যদি আনন্দ শান্তি খুঁজতে যাও সংসারে, তাহলে আরও জ্বালা--আরও অশান্তি। আনন্দ ও শান্তির রাস্তা হলেন তিনি। আবার তিনিই হলেন আনন্দ, তিনিই হলেন শান্তি।

স্বামী সদানন্দ

[সেবাধর্ম ও স্বামীজী-প্রসঙ্গে]

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ভাগলপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের যে প্লেগ-সেবাকার্য হইয়াছিল তাহার প্রশংসা ভাগলপুরবাসীদের মুখেই শুনিয়াছি। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও বাগ্মী স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসু, তার-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় অবিনাশ চক্রবর্তী স্বামী সদানন্দের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। এই প্লেগ-সেবাকার্য স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বাগবাজার পল্লীর এবং অন্যান্য স্থানের অসহায় গৃহস্থের রোগীদের সাহায্য ও পরিচর্যা তিনি নিজেও করিতেন এবং যুবকদেরও উক্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করিতেন।

একবার কোন একটি বালক বসন্তরোগে (Small Pox) ছটফট করিতেছে। তিনি তাহাকে তাঁহার সুপ্রশস্ত বক্ষে লইয়া শুইলেন। স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শে বালক ঘুমাইয়া পড়িলে তিনি ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে এইসব সংক্রামক রোগীর পরিচর্যা করা বিপজ্জনক। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি বললে, বিপজ্জনক? পাছে তোমার রোগ হয়, এই ভয়ে সংক্রামক রোগীর সেবা হবে না? এদের ফেলে রাখলে এই সংক্রামক রোগ বাড়ীতে পল্লীতে ছড়িয়ে যাবে, আর তুমি বুঝি তার হাত এড়াবে--এসব মনে ক'রছ, না? আমরা সন্ন্যাসী ফকীর—অত প্রাণের মায়া, শরীরের মায়া করি না। স্বামীজী এই সেবাধর্মকেই এই যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন। শরীর তো যাবেই আজ না হয় কাল, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। কিসের ভয়? ভয় করলেই যত গোল —মহামারী উপস্থিত হ'লে ভীরুদের রোগ হয় আগে। কাপুরুষ ভীরুরা কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বামীজীর মুখে প্রায় শোনা যেত, "অভীঃ অভীঃ"। একবার আমার মনে দুর্বলতার জন্যে সঙ্কোচ এসেছিল।'

কেন ও কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'উত্তর-পশ্চিমে সাধুজীবনে একজন গুরুভাইএর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ট্রেনটি খুব লেট্ হওয়ায় রাত দুপুরে পৌছেছি—ঠিক সন্ধ্যায় পৌছবার কথা ছিল। এই রাত্রে কাউকে ব্যস্ত না ক'রে আমি একটি ধর্মশালার বারান্দায় শুয়ে রইলাম, প্রত্যূষে দেখি আমার পাশে একজন কুষ্ঠরোগী। মনটায় কেমন দুর্বলতা এল। গুরুকৃপায় তখনই স্বামীজীর কথা মনে উদয় হ'ল—এ যে স্বয়ং শিব কুষ্ঠরোগীরূপে আমার সেবা নেবার জন্য আমার পাশে শুয়ে রয়েছেন। অমনি জল গরম ক'রে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে তার ঘা ধুয়ে দিলাম। গুরুভাইএর কাছে গিয়ে ভাল ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা এবং কিছুদিন তার আহারের বন্দোবস্ত ক'রে চলে এলাম।

এই সব সেবা করলে মনটা যে কত বড় হ'য়ে যায়—একবার তার ধারণা হ'লে মন আর সেবার আনন্দ ছাড়তে পারে না। Routine (নিয়ম) মতো duty (কর্তব্য) ক'রে যাচ্ছি, তা নয়; আমি যে সাক্ষাৎ শিবের পূজা করছি--এই ভাব না থাকলে শেষে শুষ্ক লাগবে, দলাদলি কর্তৃত্ব অভিমান অহঙ্কার আসবে। স্বামীজী আমার মনে এই ধারণা দৃঢ় ক'রে দিয়েছিলেন। সেবা

করলাম বেশ, তারপর তাঁর ধ্যান চিন্তা; ওদিকেই আর মন থাকবে না। অনাসক্তভাবে এই সেবা।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজীর সঙ্গে আপনার কিভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ?'

তিনি বলিলেন: উত্তর-পশ্চিমে অনেক-দিন বাস ক'রে সাধুদের একটু আধটু ভক্তি করতাম—ভিক্ষা প্রভৃতি দিয়ে সাহায্যও করতাম। তখন হাতরাস ষ্টেশনে কাজ করছি, এমন সময় স্বামীজী একদিন সেখানে নামলেন —তাঁর চেহারা দেখেই আকৃষ্ট হলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল—প্রার্থনা করলাম, 'মহারাজ, আমার বাসায় দুই একদিন দয়া ক'রে ভিক্ষা নিন।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাসায় কে কে আছে ?' বললাম, 'আমি একা—আমি অবিবাহিত। মেয়েছেলে কেউ থাকে না। সুতরাং আপনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ তোমার সাধুসেবার ইচ্ছা হ'ল কেন ?' আমি বললাম, 'উত্তর-পশ্চিমে বাস করি, সাধুদের মাঝে মাঝে আমার বাসায় দুই একদিন রেখে থাকি।'

তিনি সন্তুষ্টচিত্তে থেকে গেলেন। আহা-রাদির কথা জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'তুমি যা খাও, আমিও তাই খাব; আমি সাধু ফকীর, ভিক্ষে ক'রব—তার আবার ফরমাস ক'রব কি ? সে তো ভিক্ষে নয় ? তুমি ইচ্ছামতো যা দেবে তাই খাব—আমার কোন বাধানিষেধ নেই।'

স্বামীজী দু-তিন দিন আছেন—আমি একদিন বেলাবেলি বাড়ীতে ফিরে গেলাম স্বামীজীর সঙ্গ-লাভ করতে। তাঁকে বাসায় খুঁজে পেলাম না, দেখি মধুরকণ্ঠে কে যেন গান গাইছে। স্বামীজীর কণ্ঠ বলেই মনে হ'ল। গিয়ে দেখি—নির্জন গাছতলায় স্বামীজী গান গাইছেন এবং চক্ষু সজল—দুই একটি ধারা গাল বেয়ে পড়ছে।

এই বলিয়া স্বামী সদানন্দ সেই গানটি আবৃত্তি করিয়া শোনাইলেন। বহুদিনের কথা, গানটি ভুলিয়া গিয়াছি; মর্মার্থ এই যে—তুমি আমাকে দায়িত্বের ভার দিয়ে গিয়েছ, আমি যে একা, তুমি এসে শক্তি দাও, যাতে এই দায় পালন করতে পারি।

স্বামী সদানন্দ বলিতে লাগিলেন: নির্জনে স্বামীজীর সেই ভাব দেখে আমার প্রাণ গলে গেল—এই তো দরদী প্রেমিক সাধু। সেইদিনই তাঁর শরণাগত হয়েছিলাম। ঠিক করলাম, নোকরি নেই করেঙ্গে—জবাব দিয়ে এই মহা-পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে ফিরব। স্বামীজী আমাকে প্রথম খুব বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ আছিস—সাধু-জীবন বড় কষ্টকর। আজ গাছতলায়, কাল কারুর কুটীরে; আজ ভিক্ষে জুটল না, কাল হয় তো পেট ভরে খাওয়া জুটলো—নিরাশ্রয় অসহায় অবস্থা—এই সব কষ্ট কি সহ্য করতে পারবি ?' আমি বললাম, 'মহারাজ, আপনার সঙ্গে অনায়াসে আনন্দে—পারবো খাওয়ার সময়ে ভিক্ষে ক'রে এনে আপনার সেবা করতে পারবো।' তাঁর অনুগামী হ'য়ে চললাম।

তাঁহাদের এই পরিব্রাজক-জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন: দেখ, তোমরা পড়েছ মহাপুরুষদের হৃদয় বজ্রের মতো কঠোর আবার ফুলের চেয়েও কোমল—স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণ-কালে পদে পদে তার পরিচয় পেয়েছি। আমি নতুন, মরুভূমির উপর দিয়ে কখনও চলিনি। একদিন মরুভূমির উপর স্বামীজীর সঙ্গে যাচ্ছি—একটু বেলায় প্রখর রৌদ্রের তেজে বালুময় পথ তেতে উঠেছে, জুতা পায়ে দিয়ে চলেছি, কিন্তু জুতোও গরম—পা রাখতে পারছি না—এদিকে আগুনের মতো হাওয়া—চলতে

পারছি না—অসহ্য কষ্ট! স্বামীজী পিছন ফিরে আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'তোর ঝোলাতে জুতো রাখ্—আমার কাঁধে চড়্।' আমি হতভম্ব হ'য়ে কাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'যা বলছি শোন্।' আমার পালোয়ানী শরীর। ঝোলাশুদ্ধ আমাকে কাঁধে নিয়ে সেই প্রখর রৌদ্রে মরুভূমির রাস্তা দিয়ে স্বামীজী চলছেন, পরে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় নামিয়ে দিলেন মরুভূমির রাস্তা পার ক'রে।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামী সদানন্দ সজল চোখে বলিলেন, 'বল—কোন্ গুরু, কোন্ বাবা এমন করে? তিনি যে আমার কী ছিলেন কি ক'রে বোঝাবো?' এই ঘটনা তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন। এমনকি রোগশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি অশ্রুমোচন করিয়াছেন।

স্বামীজীর আদেশে তিনি একদল যুবক লইয়া হিমালয়ে বদরীনারায়ণ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগের কোন কোন মহাপ্রাণ যুবকও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দুই একটি গান নিজমুখে আবৃত্তি করিয়া তিনি বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। বাস্তবিকই স্বামী সদানন্দের জীবন ছিল অপূর্ব আত্মত্যাগ ও সরলতায় ভরা এবং হৃদয়টি ছিল কানায় কানায় প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি জাপান ভ্রমণে গিয়া উদ্বোধনে যে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছিলেন—তাহাতে বোঝা যায় তাঁহার ভাবধারা দ্বারা দেশের যুবকদের তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কেহ এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করেন নাই। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পদ্মভূষণ বশীশ্বর সেন তাঁহার এই পবিত্র জীবন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। শেষজীবনে বশীশ্বর ও তাঁহার ভ্রাতা টাবু তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া স্বামী সদানন্দের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা গুরুভক্তি ও সাধু-ভক্তির আদর্শস্বরূপ। কতদিন সেখানে স্বামী সদানন্দের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভগিনী নিবেদিতা বোস-পাড়ার এই বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন—প্রায় দুই বেলা স্বামী সদানন্দকে দেখিতে আসিতেন। নিবেদিতার জীবনে ইঁহার সহায়তা কিছু কম ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার প্রতি স্বামী সদানন্দের গভীর অনুরাগ এবং ভক্তি ছিল। তিনি মুখে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার রুগ্ণ মুমূর্ষু অবস্থায় শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। শুনিয়াছি সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, স্বামী সদানন্দের কী অপরিসীম ভক্তি ছিল এবং জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে কত স্নেহ করিতেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় ইহার সামান্য উল্লেখ আছে।

মহাপ্রাণ মহাপুরুষেরা নিজেদের জীবন লোককল্যাণের জন্য আহুতি দিয়া চলিয়া যান। ইঁহাদের জীবন-কথা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়—ইঁহাদের দর্শন করিলে জীবন ধন্য হয়।

জিজ্ঞাসা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

এক পুণ্যপ্রভাতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের আকাশ বাতাস ধ্বনিত ক'রে উচ্চারিত হয়েছিল জগতের সেই মহাজিজ্ঞাসা— সেই শাশ্বত প্রশ্ন ভগবান বুদ্ধের অম্বুদকণ্ঠে :

'কস্মিন্ খো নিব্বুত্তে হৃদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি ?'—কি নিভে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিভে যায় ?

যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষ এই প্রশ্নেরই উত্তর অন্বেষণ ক'রে ফিরেছে, এই জিজ্ঞাসাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে সংসারের তমসাচ্ছন্ন পথ ছেড়ে মোক্ষের অরুণোদ্ভাসিত পথে অগ্রসর হ'তে, ধন-জন-মানের মোহ কাটিয়ে জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের শুভ ব্রতে জীবনোৎসর্গ করতে, পার্থিব বাসনা-কামনা নিভিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার অনির্বাণ দীপশিখা অন্তরমধ্যে প্রজ্বলিত করতে। এইভাবেই বারংবার উত্থিত হয়েছে মানব-হৃদয়ের সেই অদম্য আকূতি :

'কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি।'

—(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫-১১-১)

'কস্মিন্ন্ ত্বং চাত্মা প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি।'

—(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩-৯-২৬)

'কস্মিন্ন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।'

— (ঐ ৩-৮-৭)

'কে আমাদের আত্মা ? ব্রহ্ম কি ?'

'কোন্ বস্তুতে তুমি ও তোমার আত্মা প্রতিষ্ঠিত ?' 'কোন্ বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোত ?'

* * *

এই ঐশ্বর আকূতিপূর্ণ পুণ্যপিপাসা দূর করবার একমাত্র উপায় হ'ল জ্ঞান, যার সম্বন্ধে ভারতদর্শনসার গীতা বলেছেন :

'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নেই।

পুণ্যভূমি ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিরা এই জ্ঞানের মহিমাই কীর্তন করেছেন নানাভাবে, নানা সুরে ও ছন্দে—চিরকাল। জ্ঞানের প্রারম্ভ যে জিজ্ঞাসা, সেই সম্বন্ধে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য কি বলেছেন—এই প্রবন্ধে তারই সামান্য কিছু বলছি।

শঙ্করের মতে মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎ সাধন হ'ল 'জ্ঞান'। এই জ্ঞানের আলোকেই শঙ্কর-দর্শন সর্বত্র সমুজ্জ্বল। এই বিষয়ে শঙ্কর কর্ম ও জ্ঞানের মূলীভূত প্রভেদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের পূর্বে সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। এই ইচ্ছা হ'ল 'জিজ্ঞাসা'। যে জ্ঞান জীবনের একমাত্র পরমশ্রেয়ঃ, যে জ্ঞানালোকই একমাত্র অনাদি অবিদ্যা-তমিস্রা দূর করতে পারে, যে জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্ম বা মোক্ষ, সেই জ্ঞানলাভের ইচ্ছাই তো সাধকজীবনের সর্বপ্রথম সোপান। সেজন্য সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রেই আছে :

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—অর্থাৎ 'অথ' বা 'এর পরে', 'অতঃ' বা 'এই কারণে' সাধকের মনে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা 'ব্রহ্মকে জানবার অভিলাষ' হয়। সেজন্য এস্থলে প্রথম প্রশ্ন উঠবে : কিসের পরে এরূপ পরম মঙ্গলসূচক 'জিজ্ঞাসা'র উদয় ?

বস্তুতঃ 'অথ' শব্দটির কয়েকটি বিভিন্ন অর্থ আছে :

অথ স্যাৎ মঙ্গলে প্রশ্নে কার্যারম্ভেষ্বনন্তরে।
অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামন্বাদেশাদিষু কচিৎ॥

—অর্থাৎ 'অথ' শব্দের অর্থ মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্যারম্ভ, আনন্তর্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা, অন্বাদেশ বা কথিতানুকথন।

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর 'অথ' শব্দের তিনটি প্রধান অর্থ—(১) অধিকার, (২) মঙ্গল এবং (৩) প্রশ্ন—উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, 'অথ' শব্দের একমাত্র অর্থ এস্থলে 'আনন্তর্য'।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সুবিখ্যাত (শঙ্কর-ভাষ্যের) 'ভামতী' টীকায় এই সম্বন্ধে যুক্তিবিচার-মাধ্যমে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ 'অথ' শব্দের অর্থ এস্থলে 'অধিকার' হ'তে পারে না। 'অধিকারে'র অর্থ হ'ল যে নূতন বিষয়ের আলোচনা হবে, তারই অবতারণা। যেমন যোগশাস্ত্র আলোচনার প্রারম্ভে বলা হয়: 'অথ যোগানুশাসনম্'—অর্থাৎ এখন যোগবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হচ্ছে। এস্থলে 'যোগ'ই হ'ল সেই সমগ্র আলোচনা বা গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' স্থলেও যদি 'অথ' শব্দের ঐ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই বলতে হয় যে, সমগ্র ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনেরই বিষয়বস্তু হ'ল শুধু 'জিজ্ঞাসা' বা জ্ঞানলাভের ইচ্ছা মাত্র,—'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' নয়। কিন্তু এ তো অতি হাস্যকর মত। কারণ সকলেই জানেন যে, ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র বিষয়বস্তু হলেন 'ব্রহ্ম'। 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভের জন্যই ব্রহ্মসূত্র-পাঠ। এরূপে এস্থলে প্রথমে ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা বা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র উদয় হয়, তারপর 'ব্রহ্ম-মীমাংসা' পাঠ করা হয়, তারপর 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ হয়। সেজন্য সমগ্র ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' বা ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছারূপ একটি চিত্তবৃত্তি বা মানসিক ভাবের মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা (Psychological Treatise) নয়, বরং 'ব্রহ্ম'রূপ একটি তত্ত্বের তাত্ত্বিক বা দর্শনমূলক আলোচনা (Metaphysical Treatise)। যদি কেবল এরূপ একটি 'ইচ্ছা'ই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হ'ত, তাহলে কাকদন্ত-পরীক্ষার জন্য যেমন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রসর হন না, তেমনি ব্রহ্মসূত্র-পাঠের জন্য কেহ প্রভূত কষ্ট স্বীকার ক'রে অগ্রসর হতেন না, সুনিশ্চিত। 'ভামতী' টীকায় (১।১।১):

'তদবিবক্ষায়াস্তু তদস্সূচনেন কাকদন্ত-পরীক্ষায়ামিব ব্রহ্ম-মীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্তেরন্।'—সেজন্য 'অথ' পদের অর্থ এস্থলে 'অধিকার' নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'অথ' পদের অর্থ এস্থলে 'মঙ্গল' নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেক পদের দুটি দিক আছে: 'শব্দের' (শ্রবণমাত্র) দিক, আন্তর (অর্থের) দিক। পদটি উচ্চারণ করলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তা হ'ল তার 'শব্দ' (sound) এবং পদের দ্বারা যে বিষয়বস্তুটি নির্দেশ করা হয়, তা হ'ল তার 'অর্থ' (meaning); কিন্তু পদের 'শব্দ' এবং 'অর্থ' এক নয়। যেমন পুত্রের মুখে 'মা' এই পদ উচ্চারিত হ'লে সেই ধ্বনি বা 'শব্দে'ই মাতার মনে অনাবিল আনন্দের উদয় হয়; কিন্তু 'মা' পদের 'অর্থ'—এই আনন্দ নয়, একটি বস্তুবিশেষ বা একজন নারী মাত্র। একই ভাবে 'অথ' পদের ধ্বনি বা শব্দই শঙ্খধ্বনির ন্যায় মঙ্গলদায়ক নিশ্চয়; কিন্তু সেজন্য 'অথ' পদের অর্থ 'মঙ্গল' নয়।

তৃতীয়তঃ 'অথ' পদের অর্থ পূর্বোল্লিখিত বিষয়ে 'প্রশ্ন' নয়। যেমন বলা হয়: 'কিময়মাত্মা নিত্যঃ অথোঽনিত্যঃ?' অর্থাৎ এই আত্মা নিত্য, অথবা অনিত্য? কিন্তু এক্ষেত্রে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' বিষয়ে এরূপ 'প্রশ্ন' বা 'বিকল্পে'র কোন প্রসঙ্গই নেই।

সেজন্য এক্ষেত্রে 'অথ' পদের প্রকৃত অর্থ হ'ল 'আনন্তর্য'। অর্থাৎ এই অর্থানুসারে 'ব্রহ্ম-

জিজ্ঞাসা'-রূপ কার্যটি একটি পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর করছে, এবং 'অথ' পদের দ্বারা সেই কারণটিই বোঝা যাচ্ছে।

কি সেই কারণ যা থেকে এরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়? পৃথিবীতে তো সহস্র সহস্র মানুষ আছে, তাদের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজনই তো কেবল ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছুক হ'য়ে ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রের শরণাপন্ন হন। কি কারণে এই ধন্য কয়েকজনের এরূপ ইচ্ছা হয়? কি কারণে সংসারের ভোগসুখেচ্ছা বর্জন ক'রে তাঁরা এইভাবে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের ইচ্ছায়, মুক্তির ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হন?

উত্তরে শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (১।১।১) সুবিখ্যাত 'সাধন-চতুষ্টয়ে'র অবতারণা করেছেন :

'তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যম্ যদনন্তরং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসোপদিশ্যত ইতি। উচ্যতে—নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ-ভোগ-বিরাগঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ।'

—অর্থাৎ যিনি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি করেছেন, যিনি ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বীতস্পৃহ হয়েছেন, যিনি শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, এবং যিনি মোক্ষলাভেচ্ছু—তাঁরই মনে এই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছার উদয় হয় অনিবার্যভাবে।

এই সাধন-চতুষ্টয় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'ভামতী'-কার যা বলেছেন তার ভাবার্থ :

'নিত্য' বস্তু হলেন 'প্রত্যগাত্মা'; 'অনিত্য' বস্তু হ'ল 'দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়'। অর্থাৎ প্রকৃত কল্পে দৃশ্যমান সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই তো 'নিত্য' বা সত্য বস্তু। অপর পক্ষে দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়প্রমুখ অন্যান্য সমস্ত পার্থিব বস্তুই 'অনিত্য' বা মিথ্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু সাধক এই ভাবে, ব্রহ্ম-মীমাংসা-পাঠের পূর্বেই—প্রারম্ভেই—আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রভেদ স্থির পূর্ণ ও নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করেন, তাহলে তিনি তো তৎ-ক্ষণাৎই আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব ও বিশ্বজগতের মিথ্যামায়াময়ত্ব উপলব্ধি ক'রে মুক্ত হ'য়ে যাবেন, আর ব্রহ্মমীমাংসা-পাঠের আবশ্যকতা কি?

অপর পক্ষে যদি বলা হয় যে, তাঁর এই উপ-লব্ধি স্থির পূর্ণ ও নিশ্চিত উপলব্ধি নয়, কিন্তু কিয়দংশে অদৃঢ় অপূর্ণ ও অনিশ্চিত উপলব্ধি, তাহলেও এই দোষ হবে যে, এরূপ অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকে দ্বিতীয় সাধন—ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখে বিরাগের উদয় হ'তে পারে না। এই উভয়সঙ্কট অতিক্রম কর-বার জন্য এস্থলে এই কথাই বলতে হয় যে, সাধক সাধারণভাবে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন, তাঁর মধ্যে যে আত্মা তা নিত্য এবং বাহিরের সকল বস্তু অনিত্য। অবশ্য এই স্তরে তাঁর এরূপ উপলব্ধি হয় না যে, সেই আত্মাই ব্রহ্ম এবং অন্যান্য সকল বস্তুই মিথ্যা—মায়ামাত্র। এরূপ পরম ও চরম উপলব্ধিই তো মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক ব'লে তার শুভোদয় হয় বহু পরে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ পরম সাধনের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও এই প্রারম্ভিক স্তরে এই যে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি, তাও পরিশেষের একমাত্র সত্য আত্মা ও মিথ্যা দেহা-দির মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধির ন্যায় পরমা উপলব্ধি না হলেও স্বীয় ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও নিশ্চিত উপলব্ধি। সেজন্য এরূপ প্রারম্ভিক উপলব্ধিও দ্বিতীয় সাধন 'ভোগবিরাগে'র সৃষ্টি করতে পারে।

সংসারের সমস্ত বস্তুকেই অনিত্য ব'লে জানলে স্বভাবতই তাদের প্রতি আর কোন আসক্তি বা আকর্ষণ থাকতে পারে না। সেজন্য

পূর্বোক্ত উপলব্ধিবিশিষ্ট সাধক ভোগেচ্ছাবিহীন, নিষ্কাম পুরুষ।

যিনি এরূপ ভোগকলুষবিহীন, তিনিই শম-দমাদি প্রকৃষ্ট গুণে সমুজ্জ্বল।

'সোঽয়মস্ত বৈরাগ্যহেতুকো মনোবিজয়ঃ শমঃ ইতি বশীকারসংজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। বিজিতঞ্চ মনস্তত্ত্ব-বিষয়-বিনিয়োগযোগ্যতাং নীয়তে। সেয়-মস্য যোগ্যতা দমঃ। যথা, দান্তোঽয়ং বৃষভযুবা হল-শকটাদি-বহন-যোগ্যঃ কৃত ইতি গম্যতে।' (ভামতী—১।১।১)

—অর্থাৎ বৈরাগ্যের দ্বারা মনের বিজয়ের নাম 'শম' অথবা 'বশীকার'। এরূপ বিজিত মনের তত্ত্বাবধারণের যোগ্যতার নাম 'দম'। যেমন বন্য বৃষভও মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বিজিত হ'লে হল-শকটাদি বহনে যোগ্য হয়, তেমনি বৈরাগ্য দ্বারা বিজিত মনও নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করবার যোগ্য হয়।

'তিতিক্ষা'—প্রাপ্ত বস্ত পরিত্যাগের ইচ্ছা; 'উপরতি'—প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি বিমুখতা; এবং 'শ্রদ্ধা'—সত্যে স্থির বিশ্বাস। 'মুমুক্ষুত্ব'—মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা।

এই ভাবে এই 'সাধন-চতুষ্টয়'ই সাধক-জীবনের প্রারম্ভ। অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, সংসার-পঙ্ক-নিমজ্জিত, পার্থিব-ভোগলিপ্ত, ত্রিতাপদগ্ধ, বদ্ধ জীব যে শুভক্ষণে এরূপ ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবন পরিত্যাগে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, সেই শুভক্ষণেই তো তার প্রথম পদক্ষেপ মোক্ষের অমল, অভয়, অরুণ পথে। এই সাধক-জীবনের চারটি প্রধান কথা:

অসার অনিত্য সংসারকে সেইরূপেই জানতে পারা; এরূপ সংসারের মায়া ত্যাগ করা; মনকে নিম্ন বিষয় থেকে উত্তোলন ক'রে উচ্চ তত্ত্বে সন্নিবিষ্ট করা; এবং সাংসারিক জীবনের উর্ধ্বে সেই অনুপম পারমার্থিক জীবনের জন্য ব্যাকুল হওয়া। শঙ্করের মতে এই চারটি প্রারম্ভিক শর্ত যাঁর ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে, তিনি স্বভাবতই সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে জানতে ও উপলব্ধি করতে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব্রহ্মবিষয়ক গ্রন্থপাঠে বা উপদেশ-শ্রবণে জীবনোৎসর্গ করেন। এইভাবে যে 'জিজ্ঞাসা' জ্ঞানের প্রারম্ভ, সেই মহাজিজ্ঞাসার কারণস্বরূপ হ'ল 'অথ' পদের দ্বারা নির্দিষ্ট এই সাধন-চতুষ্টয়।

এইভাবে শঙ্কর তাঁর স্বভাবসুলভ সহজ সরল সুমিষ্ট ভাষায় যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করেছেন, তা হ'ল এই যে—জ্ঞানলাভের কথা তো দূরে থাকুক, কেবলমাত্র 'জিজ্ঞাসা' বা জ্ঞানলাভের ইচ্ছারই যাতে উদয় হ'তে পারে, সেজন্যও বহু সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান যে মানবের জীবনে কি অমূল্য ধন, এ থেকেই তা সহজে অনুমেয়।

শিশির ও সাগর

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অসীম সাগর—অথই অপার সাধ্য নাই যে তরি;
শাশ্বত কাল অশেষ অতল রহস্যে রহে ভরি'।
উপরের চল-উর্মিমালায়,
হেরি রূপরাশি—দাঁড়ায়ে বেলায়,
নাহি জানা যায় আছে কী তলায়;
সাগরে নামিতে বাত্যাতাড়িত দীপশিখা সম ডরি।
ডুবে গেল যাহা, চিরতরে তাহা সিন্ধু লইল হরি'।

মুক্তার মতো শিশির-কণিকা নামিছে উপর থেকে;
ভীতি-অশ্রুতে ভরিয়া কাঁপিছে অপার পাথার দেখে।
রূপময় ওই স্বাতন্ত্র্য তার,
সাগরে মিশিয়া হবে একাকার,
মৃত্যু-ভয়ে সে করে চীৎকার,
ডুবিয়া গেল সে, আমিত্ব তার এতটুকু নাহি টেকে।
তবু তো সাগরে সত্তা তাহার চিরতরে গেল থেকে।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

একদা দেবর্ষি নারদ মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির আশ্রমে আগমন করিলে বাল্মীকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি সদ্‌গুণসমূহে গুণিগণের অগ্রগণ্য? কোন্ ব্যক্তি ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদার ব্যবহার-সম্পন্ন এবং সর্বপ্রাণীর কল্যাণকামী?—বীর্যশালী, বদান্য ও প্রিয়দর্শনই বা কে? কোন্ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতাগণেরও ভীতির পাত্র হইয়া থাকেন? কাহার চরিত্র মহদ্‌গুণ ও সম্পদ্-সমূহের আশ্রয়? কোন্ জন বীর্যে, শৌর্যে, তেজস্বিতায়, সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে ও বিক্রমে দেব-তুল্য? হে দেবর্ষে, আপনার নিকট এই সকল গুণবিভূষিত ব্যক্তির বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

নারদ বলিলেন, 'তুমি বহু অথচ দুর্লভ গুণের উল্লেখ করিয়াছ। মানব কেন, দেব-গণের মধ্যেও কোন একজনকে এই সকল গুণের অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র এই সকল গুণে ও অন্যান্য বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত।'

অতঃপর নারদ সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের উদার মহৎ চরিত্র বর্ণনা করিলেন। বাল্মীকি সেই অদ্ভুত রামচরিত শ্রবণে বিস্মিত হইলেন।

বাল্মীকি কর্তৃক যথাবিহিত সৎকৃত হইয়া নারদ প্রস্থান করিলে বাল্মীকি চিন্তামগ্ন হইয়া মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সশিষ্য তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। স্নান ও তর্পণান্তে অন্যমনা হইয়া তিনি তীরস্থিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রামচরিত-শ্রবণে তাঁহার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্ত সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিল। সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল বনরাজির মধ্যে নির্ভীকভাবে বিচরণশীল এক সুন্দর ক্রৌঞ্চ-দম্পতির প্রতি। বাল্মীকি মুগ্ধ হইয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁহার সম্মুখেই ক্রৌঞ্চ-দম্পতির একটি নিহত হইয়া রক্তাপ্লুত দেহে ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। ক্রৌঞ্চী করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ক্রৌঞ্চের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে আর্ত বিলাপে পরিপূরিত হইয়া উঠিল সমগ্র বনভূমি। নিসর্গ-সৌন্দর্যের পটভূমিতে অকস্মাৎ নামিয়া আসিল শোকের ছায়া। ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে বাল্মীকির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আবেগপূর্ণকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন:

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥'

—রে নিষাদ, তুমি ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে কাম-মোহিত একটিকে (অকারণে) বিনাশ করি-য়াছ। অতএব তুমি কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াই বাল্মীকি চমকিত হইলেন। বিহগের জন্য বেদনা অনুভব করিতে করিতে তিনি এ কী বলিলেন! অন্তরের বেদনা মর্ম মথিত করিয়া প্রকাশ হইল স্বরের ঝঙ্কারে, ভাব মূর্ত হইল ভাষায়, সৃষ্টি হইল প্রথম কাব্যের।

আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াও বাল্মীকি অন্যমনা রহিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা আগমন করিলেন বাল্মীকির আশ্রমে। বাল্মীকি যথো-চিত পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্বক ব্রহ্মাকে সমাদর

করিলে তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'মহর্ষে, ক্রৌঞ্চবধ উপলক্ষে তোমার কণ্ঠ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে—তাহা তুমি শোক করিতে করিতে বলিয়াছ, অতএব উহা শ্লোকরূপে বিখ্যাত হউক। আর তুমি রামের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা কর। নারদের নিকট তুমি ঐ চরিত্র অবগত হইয়াছ। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা বিষয়ক সমস্ত ঘটনাই তোমার জ্ঞানের গোচর হইবে। তুমি পুণ্যজনক মনোরম রামকথা রচনা কর।'

পুনঃপুনঃ ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বাল্মীকি স্থির করিলেন যে ঐ প্রকার শ্লোকের দ্বারাই তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা করিবেন। রামায়ণ সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীসকল, যথা—রত্নাকর দস্যুর ঋষি বাল্মীকিরূপে পরিণতি-লাভ ও রামের জন্মের ষাট হাজার বৎসর পূর্বে বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ-রচনা প্রভৃতি পুরাণের অন্তর্গত। বাল্মীকি-রামায়ণে ঐ সকল কাহিনীর অস্তিত্ব নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের তৃতীয় সর্গে আছে :

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষি।
চকার চরিতং চিত্রং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥

—অর্থাৎ রামচন্দ্র রাজপদে আরোহণ করিলে ভগবান ঋষি বাল্মীকি বিচিত্র পদবিন্যাসপূর্বক উদারার্থ মনোরম রামচরিত প্রণয়ন করিলেন। চতুর্থ সর্গের প্রথমেই আছে :

শ্রুত্বা পূর্বং কাব্যবীজং দেবর্ষেনারদাদৃষিঃ।
লোকাদন্বিষ্য ভূয়শ্চ চরিতং চরিতব্রতঃ॥
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্‌মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু কাব্যস্যান্বেষতে গতিম্‌॥

—অর্থাৎ ব্রতাদিনিয়মপরায়ণ ঋষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের মুখে অপূর্ব রামায়ণরূপ কাব্যের সার বস্তু শ্রবণ করিয়া, পুনরায় জনজগৎ হইতে রামচরিত্র অন্বেষণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্বাগ্র-কুশোপরি উপবেশন করিয়া রামায়ণ-কাব্যের গতি অর্থাৎ রচনার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি-উক্ত শ্লোক দুইটি ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকাশ করে। রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বনবাস-কাহিনী ও খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। বাল্মীকি বাস করিতেন তমসানদীর তীরে আশ্রমে। নারদের নিকট তিনি প্রথম রামচন্দ্রের বিষয় অবগত হন। কাব্য-রচনায় তাঁহার ক্ষমতাও জন্মিয়াছিল। সুতরাং লোকমুখ হইতেও নানা ভাবে তিনি রামচন্দ্রের সমুদয় কাহিনী সংগ্রহ করেন। অতঃপর নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তিনি ঐ কাহিনী শ্লোকাকারে গ্রথিত করেন।

সাধারণতঃ প্রচলিত রামায়ণ পাঠেও এই-রূপ অনুমান হয় যে, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া জনকনন্দিনী সীতা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানেই যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। বাল্মীকি সাদরে ঐ পুত্রদ্বয়কে পালন করেন ও তাহাদের নাম রাখেন লব কুশ। লব ও কুশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বাল্মীকি তাহাদিগকে বীণার সহিত সুরসংযোগে রামায়ণকথা আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দেন। বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ-কাব্য লবকুশ অতি মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতেন। বহু সভামধ্যে ঐ কাব্য আবৃত্তি করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে রামচন্দ্র বালক দুইটির বিষয় অবগত হইয়া তাহাদের আমন্ত্রণ করেন। অতঃ-পর লবকুশকে স্বীয় পুত্র বলিয়া রামের অবগতি, সীতাকে সভাস্থলে আনয়ন, পুনরায় পরীক্ষার

প্রশ্ন উত্থাপনে সীতার পাতাল-প্রবেশ ইত্যাদি ও পরবর্তী ঘটনা-সমুদয় বাল্মীকি কর্তৃক পরে লিপিবদ্ধ হয়।

কাহারও কাহারও মতে বাল্মীকি যে দুইটি বালককে রামায়ণ আবৃত্তি শিক্ষা দেন, তাহারা সীতার পুত্রদ্বয় লবকুশ নহে; পরন্তু দুইটি মুনি-বালক। এইরূপে যাঁহারা কাহিনী আবৃত্তি করিতেন, তাঁহাদের কুশীলব আখ্যা দেওয়া হইত। তাঁহাদের মতে সমুদয় উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি কর্তৃক রচিত নহে, পরবর্তীকালে সংযোজিত।

রামায়ণকে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু রামায়ণকে ইতিহাসও বলা চলে। ভারতবর্ষে সাল-তারিখ সহ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার রীতি পূর্বে ছিল না। কিন্তু কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি তদানীন্তন জাতীয় ও সমাজ-জীবনের চমৎকার পরিচয় প্রদান করে। রামায়ণ-মহাভারতে দেশের ভৌগোলিক তথ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থনীতিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি মানবজীবনের সমুদয় দিক বর্ণিত হইয়াছে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে—বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়া। আবার মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তিগুলি এই কাব্যের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে, যাহার আবেদন সর্বজনীন—সর্বকালীন।

অবশ্য বহু ঘটনা আজিকার দিনে আমাদের নিকট অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান যুক্তিবাদী যুগেও দেখা যাইতেছে, সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ মানবগণের জীবনী-রচনায় কখন কখন মিথ্যা, ভ্রম ও কল্পনা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। সুতরাং দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্যেও কিছু কল্পনা ও আতিশয্যের প্রক্ষেপ স্বাভাবিক। তবে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে কাহিনীর অন্তর্গত মূল বক্তব্যটি সহজেই ধরিতে পারা যায়।

রামায়ণ আদি কাব্য; বাল্মীকি আদি কবি। সুললিত শ্লোক, অলঙ্কারের ছটা, সুরের ঝঙ্কার, উপমার সৌন্দর্য, নিসর্গের বর্ণনা, ভাবের গাম্ভীর্য, মূল কাহিনীর অব্যাহত গতি প্রভৃতির সমাবেশে রামায়ণ-কাব্য অপূর্ব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় চিন্তাধারা রামায়ণ কর্তৃক প্রভাবিত। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনে রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। পরবর্তী কালের কবিগণ বহু পরিমাণে বাল্মীকি কবিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য হইতে প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃতে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' বাংলায় কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করিয়াই রচিত ও বিখ্যাত।

রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণের রচনাকাল খ্রীষ্ট-জন্মের তিন অথবা চার শতাব্দী পূর্বে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বৈদিক সভ্যতা বিস্তারের পরেই কাব্য-যুগের আরম্ভ। ভগবান বুদ্ধের জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৬২৪ অব্দে। বৌদ্ধ যুগের পূর্বে কাব্য-যুগ, অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের যুগ। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্‌টি পূর্ববর্তী, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। তবে মহাভারতে রামায়ণের মূল কাহিনীর উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালে তাঁহাকে ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধৌম্য মুনি রামসীতার কাহিনী বর্ণনা করেন। রামায়ণে কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনীর উল্লেখ কোথাও নাই। কয়েকটি উপাখ্যান উভয় কাব্যেই স্থান পাইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—ঐ উপাখ্যানগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। বিভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত ও প্রকাশিত রামায়ণ-গ্রন্থে বহু পাঠ-

ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে মূল কাহিনী সর্বত্রই সমান।

যাহা হউক, রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক তারিখ নির্ণয় করিতে না পারিলেও রামায়ণ-কাব্য যে বহু প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ব্রহ্মা স্বয়ং বাল্মীকিকে বরপ্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

—যতকাল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমূহ বিরাজ করিবে, ততকাল রামায়ণকথা জনগণমধ্যে প্রচারিত থাকিবে।

প্রজাপতি ব্রহ্মার বরপ্রদান সার্থক হইয়াছে। ভারতবর্ষে কত উত্থান-পতন—বিপর্যয় ঘটিল, বহিরাগত কত সভ্যতা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারত হইতে রামায়ণ-কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই।

যতকাল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমূহ বিরাজ করিবে, ভারতবাসী রামায়ণকথা হৃদয়ে বহন করিবে।

* * *

পুরাকালে কোশল নামে এক অতি সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত প্রদেশ ছিল। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা ছিল ঐ প্রদেশের রাজধানী। রাজধানী অযোধ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি পাওয়া যায়। সমগ্র নগরী ছিল পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ও চতুর্দিক ছিল অস্ত্রধারী প্রহরী কর্তৃক সুরক্ষিত। নিয়মিত জলসিঞ্চিত বিস্তীর্ণ রাজপথগুলি সর্বদাই ছিল হস্তী, অশ্ব, রথ ও অন্যান্য যান-বাহনে পূর্ণ ও জনকোলাহলে মুখরিত। বহু সপ্ততল অট্টালিকা, হর্ম্য, মনোরম উদ্যান, পানীয়শালা, বিবিধ রত্নসম্ভার-পূর্ণ বিপণি ও উৎসবমত্ত নাগরিকগণ রাজধানীর শোভা বর্ধন করিত। ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজা দশরথ ছিলেন এই রাজ্যের রাজা। সুদক্ষ রাজ্যশাসক-রূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। নিম্নোক্ত বিবরণ এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে অযোধ্যানগরীর অধিবাসিগণের অধিকাংশই ছিল সুখী। মিথ্যাবাদী, শঠ, ক্রোধী, নৃশংস—অথবা এক কথায় দুষ্টজনের সংখ্যা ছিল নগণ্য। দারিদ্র্য কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইত। সাধারণতঃ সকলেই ছিলেন বিদ্বান্, সৎ ও ন্যায়পথে জীবিকা-নির্বাহকারী; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ছিলেন স্বধর্মে রত; পুরুষ পত্নীনিষ্ঠ ও নারী পতিব্রতা—সকলেই ছিল শাস্ত্রোক্ত ব্রতপরায়ণ ও ধৈর্যসম্পন্ন।

মহারাজ দশরথের সচিব ছিলেন বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও পুরোহিত ছিলেন বামদেব। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে রাজকার্য-পরিচালনায় সাহায্য করিবার জন্য আটজন প্রধান অমাত্য ছিলেন—সুমন্ত্র তাঁহাদের অন্যতম। অমাত্যগণ বিনীত, নীতিবিদ্, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানবান্, সদা অবহিত ও সর্বদা রাজাদেশ-পালনে তৎপর। সকলেই ধৈর্যশালী, সত্যধর্মপরায়ণ, ধর্মব্যবহার ও বিচারজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমদর্শী।

রাজা দশরথের একমাত্র দুঃখ—তিনি অপুত্রক। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। অমাত্য সুমন্ত্রের পরামর্শে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে যজ্ঞে পুরোহিত-পদে বরণ করা হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক নামক ঋষির পুত্র। তিনি অরণ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অরণ্যেই তপোবনে বিচরণ করিতেন। তপোবনের বাহিরে মানবসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। ব্রহ্মচর্য-পালন ও তপস্যার ফলে তাঁহার চিত্ত অতি পবিত্র হইয়াছিল। সেই সময়ে অঙ্গদেশের

(বর্তমান বিহার) রাজা ছিলেন লোমপাদ। ঐ রাজ্যে বহুবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে শস্যক্ষয় ও প্রজাগণের দুঃখ সমুপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ বিভাণ্ডক-সুত, ধর্মাত্মা, পরমপবিত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনয়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর অমাত্যগণের পরামর্শানুযায়ী বার-বনিতাগণ কৌশলপূর্বক ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তপো-বন হইতে রাজধানীতে আনয়ন করেন। সংসারা-নভিজ্ঞ সেই পবিত্র ঋষি শিশুর ন্যায় সরল-ভাবে বনিতাগণকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতি প্রদানপূর্বক পূজা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি লতাপাতাবেষ্টিত সুসজ্জিত নৌকাকে দূর হইতে আশ্রম-ভ্রমে তাহাদের অনুরোধে উহাতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হন।

রামায়ণে মূল কাহিনীর সহিত ছোট বড় বহু উপাখ্যান আছে। পণ্ডিতগণের মতে উহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত। ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যানও তাঁহাদের মতে প্রক্ষিপ্ত। তবে এ কথা অনুমান করিতে পারা যায় যে, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং অমাত্যগণ কর্তৃক তাঁহাকে পুরোহিত-পদে বরণ করিবার পরামর্শ দেওয়া বিচিত্র নয়।

সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মিত হইল। যজ্ঞ উপলক্ষে বহু রাজা এবং ব্রাহ্মণ আমন্ত্রিত হইলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ বিরাট। কেবল নৃপতিগণ এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী। যজ্ঞের প্রারম্ভে মন্ত্রপূত অশ্বের কপালে টীকা দিয়া সৈন্যসামন্তের রক্ষণাধীনে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সংবৎসর পরে অশ্ব প্রত্যাবর্তন করিলে আরব্ধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী কিরূপ আড়ম্বরের সহিত এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার বিশদ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান তখন পর্যন্ত দেশে প্রবল ছিল।

বসন্তকালে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ণ এক বৎসর পরে পুনরায় বসন্তকাল সমুপস্থিত হইলে চতুর্দিক ভ্রমণান্তে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যাবর্তন করিল। যথাকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। হোতৃগণ বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতাগণকে আবাহন করিয়া অগ্নিতে হবি নিক্ষেপ করিলেন। যথাবিধানে স্থাপিত যূপে প্রতিদিন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বিবিধ পশু হনন করা হইতে লাগিল। যজ্ঞীয় অশ্বেরও চর্ম ছেদন করিয়া তাহার মেদ অগ্নিতে আহুতিস্বরূপ প্রদান করা নিয়ম।

যজ্ঞশেষে রাজার নিকট হইতে সুবর্ণ-রজতাদি দক্ষিণা গ্রহণান্তে প্রীতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ রাজাকে চিন্তাপূর্বক তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে বলিলেন। দশরথ কহিলেন, 'আমি উদার ও বিখ্যাত পরাক্রমশালী চারিটি পুত্র কামনা করি।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুনরায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এই যজ্ঞকালে প্রস্তুত পায়স[১] নৃপতি কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—এই তিন মহিষীকে প্রদান করেন। দশরথ-প্রদত্ত সেই উত্তম পায়স ভক্ষণ করিয়াই মহিষীগণ তেজঃ-সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন।

অবতারগণের সকলের জন্মবৃত্তান্তই অলৌ-কিক। ইঁহাদের পৃথিবীতে আগমন সাধারণ মানবের ন্যায় নহে। আশ্চর্যের বিষয়, বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ অবতারপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক হইলেও বিভিন্ন, সুতরাং বিস্ময়কর। আবার একদিক দিয়া দেখিতে গেলে অবতারগণ সকলেই মানবদেহ পরিগ্রহণার্থে মাতৃগর্ভ স্বীকার করি-য়াছেন; ইহা সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। বস্তুতঃ অলৌকিক ও লৌকিকের সংমিশ্রণে এই সকল মহামানবগণের জন্ম, চরিত্র, কার্য প্রভৃতি বিচিত্ররূপে দেখা দিয়াছে। সাধারণ বিচার-

১ মতান্তরে যজ্ঞাবশিষ্ট হবি

বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, তর্ক উহার সম্পূর্ণ মর্ম-গ্রহণে অপারগ।

স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 'অবতার-পুরুষসকলে দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধন-কালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ- ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ······প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটিরই আলোচনা চলিয়াছে—।'[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে, 'তিনি দেব-মানব—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয় তিনি তাহাই।' তিনি লিখিয়াছেন, 'ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন নাই এবং মানব-ভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থ ই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব পূর্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।'[৩]

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব, পৃঃ ২৮
৩ ঐ পৃঃ ২৯

মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতারগণ মানবের ন্যায় আচরণ করেন। আবার ঐ সকল আচ-রণের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাঁহাদের অতি-মানবীয় ভাব। বলা বাহুল্য, এই পৃথিবীতে বিচরণকালে তাঁহাদের মধ্যে দেব-মানব ভাবের সংমিশ্রণ ও উভয় ভাবের মধ্য দিয়া যে লোকোত্তর চরিত্র ও কার্য প্রকাশ পায়, তাহার মর্ম প্রকাশিত হয় অল্পসংখ্যক শুদ্ধাত্মার নিকট। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দেহত্যাগের পর ধীরে ধীরে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়:

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ।
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু॥
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ।
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্॥
কৌশল্যাঽজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণোরর্ধং মহাভাগং পুত্রমিক্ষ্বাকুনন্দনম্॥

—অনন্তর চৈত্রমাসে নবমীতিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে—পাঁচটি গ্রহ যখন তুঙ্গস্থিত, কর্কট-লগ্নেও চন্দ্রসহ বৃহস্পতি বিদ্যমান, তখন জননী কৌশল্যা সর্বলোকপূজ্য জগতের পতি দিব্য-লক্ষণযুক্ত বিষ্ণুর অর্ধাংশ ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাভাগ রামচন্দ্রকে প্রসব করিলেন।

ইহার পর যথাক্রমে কৈকেয়ীর এক পুত্র ও সুমিত্রার যমজ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করিল। চারটি শিশু তুল্য সুশ্রী। পুত্রগণের নামকরণ হইল—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

দার্শনিকের জীবনধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দর্শন ও দার্শনিকের জীবন সম্বন্ধে প্রায়শঃ অনেক ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। এসব ধারণা কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু শিক্ষিত সমাজেও উহাদের প্রসার আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে দর্শন কতিপয় বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির কল্পনা-বিলাস মাত্র, দর্শনচর্চা একটি অনাবশ্যক ও অনর্থক ক্রীড়ার সমতুল্য, অথবা কয়েকজন অকর্মা লোকের সময় কাটানোর উপায় মাত্র। দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধেও লোকের মনে দুই রকম ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। অনেকে ভাবেন যে দার্শনিক এক জগৎ-ছাড়া লোক, তিনি পরমার্থ-চিন্তায়, জ্ঞানবিচারে দিনরাত কাটান, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই এবং সংসার ও মানব-সমাজের কোন কাজে বা চিন্তায় তিনি তাঁহার সময় ও শক্তির অপব্যয় করেন না। আবার অপর দিকে অনেকে, এমনকি কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে দার্শনিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বা থাকা উচিত নয়। একজন সাধারণ সংসারী লোক যেমন বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবনের সহিত জড়িত থাকেন এবং সত্যমিথ্যা ধর্মাধর্ম বিচার না করিয়া জীবনে আর্থিক ও ঐহিক উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন, সেইরূপ দার্শনিকও সংসারের সব বিষয়ে মন দিবেন, সাংসারিক ও ঐহিক উন্নতির জন্য সব চেষ্টা করিবেন; তবে তিনি তত্ত্বজ্ঞান-লাভেরও চেষ্টা করিবেন এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা মতবাদ পোষণ করিবেন বা জ্ঞানবিচারে পারদর্শী হইবেন।

এসব ধারণাই ভ্রান্ত এবং সেগুলি নিরসন করা আবশ্যক। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে দর্শন ও দার্শনিকের জীবনধারা সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা দেখা যায় তাহার জন্য দার্শনিকরাই কতকটা দায়ী। কারণ কোন কোন দার্শনিকের মতে দর্শনশাস্ত্র শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান বিচারেই নিবদ্ধ থাকিবে এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে জীব-জগৎ সম্বন্ধে কোন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবে। তাঁহাদের মতে দর্শনে মানুষের বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবনের সমস্যাগুলির বিচারের স্থান নাই এবং মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের কোন প্রয়াস যুক্তিযুক্ত নহে। দার্শনিক সাংসারিক ও জাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইবেন এবং পরমতত্ত্ব ও পরমার্থ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিবেন। অপর পক্ষে আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন, দর্শনশাস্ত্র সর্ব বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয় মাত্র, এবং দার্শনিক সব বিষয়েরই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সব সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন। আবার দার্শনিকদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবন ও কর্মধারা সাধারণ সংসারী লোকের জীবনপ্রণালী হইতে বিশেষভাবে বা একেবারেই ভিন্ন নহে। অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে কোন কোন দার্শনিক অতি অদার্শনিক জীবন যাপন করেন।

দর্শন মানবের কল্পনাবিলাস বা ক্রীড়ার আনন্দোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। উহা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ও প্রকৃতিগত মনোবৃত্তি। মানুষ দেহেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট শরীর মাত্র নহে, তাহার বাহ্য ও জড় দেহের মধ্যে মন ও চিন্ময় আত্মা অবস্থিত। এজন্য মানুষকে দেহবিশিষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন চেতন প্রাণী বলিতে হইবে। মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (thought and reason) স্বভাব এরূপ যে, সে সব

বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। এ জ্ঞানপিপাসা মানুষের চিরসাথী, কিন্তু যেন চির অতৃপ্ত। ইহা মিটাইবার জন্য মানুষ জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা হইতে মানুষের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি হয়। মানুষ যখন তাহার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মূলে এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে জীবজগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে, তখন এক প্রকার দর্শনের উৎপত্তি হয়। তাহাকে কেহ প্রাকৃত দর্শন (Natural Philosophy), কেহ প্রত্যক্ষমূলক দর্শন (Empirical Philosophy), কেহ বৈজ্ঞানিক দর্শন (Scientific Philosophy), কেহ দৃষ্টবাদী দর্শন (Positivist Philosophy), কেহ বাস্তব দর্শন (Realistic Philosophy), আবার কেহ শুদ্ধ দর্শন (Philosophy) আখ্যা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ দর্শনই এই প্রকার দর্শনের অন্তর্গত। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাখাকে এ প্রকার দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

দর্শনের উৎপত্তির আর একটি মূল হইতেছে মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি। মানুষের যেমন দেহ ও বহিরিন্দ্রিয় আছে, তেমন তাহার মন বা অন্তঃকরণ এবং চৈতন্যময় বা চেতন আত্মাও আছে। এজন্য সব মানুষেরই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি আছে। অনুকূল অবস্থায় এ অনুভূতি পরিস্ফুট হয়, আবার প্রতিকূল পরিবেশে উহা বিনষ্ট বা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ধ্যান, ধারণা ও সাধনা দ্বারা কাহারও কাহারও মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকর্ষ লাভ করে। এরূপ প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলে বা ভিত্তিতে তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব ও জীব-জগৎ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আর এক প্রকার দার্শনিক মতবাদ রচনা করেন। এরূপ দর্শনকে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spiritualistic Philosophy বা Idealistic Philosophy) বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন এইভাবে রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে মধ্য-যুগের খ্রীষ্টীয় দর্শনকে এই জাতীয় দর্শন বলা যায়। কিন্তু অনেক স্থলেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ (Sense-experience) ও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি (Supersensuous or Spiritual experience) বিদ্যমান আছে মনে হয়, এবং এতদুভয়ের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। দৃষ্টান্তরূপে ভারতীয় সাংখ্য ও যোগ প্রভৃতি সব আস্তিক দর্শনের, এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনের নাম উল্লেখ করা যায়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের দর্শনের মধ্যে প্লেটো, আরিস্টটল, প্লোটিনাস, স্পিনোজা, হেগেল, ব্রাডলি প্রমুখ চিন্তানায়কদের দর্শনকে, এমনকি হোয়াইটহেড ও এক্সিস্‌টেনশ্যালিস্টদের (Existentialists) দর্শনকেও এই প্রকার দর্শনের দৃষ্টান্তস্থল বলিতে পারা যায়।

মানুষের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং বিচার-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হইতে দর্শনের উৎপত্তি হইলে উহাকে আমাদের কল্পনা-বিলাস এবং দর্শনচর্চাকে অনাবশ্যক ক্রীড়ামোদ মাত্র বলা চলে না। মানুষের বিচারবুদ্ধিই মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। একেবারে বিচারবুদ্ধিহীন লোককে মানুষ বলা যায় না এবং মানুষ বলাও হয় না। কাহারও মধ্যে প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিলে তাহাকে আমরা 'মানুষের মত মানুষ' বলি, আবার বিচারবুদ্ধির অল্পতাহেতু কাহাকেও 'মানুষের মত মানুষ নয়' বলি। তারপর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি মানুষের

স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ও কর্ম। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে মানুষের সহজ ও অপরিহার্য ব্যাপার, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতিও যে সেইরূপ একটি সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে একথা সত্য। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলিতে কোন দুরন্থ, দুষ্প্রাপ্য ও দুরধিগম্য বাহ্য বস্তুর অনুভূতি বুঝি না। এরূপ মনে করিলে আধ্যাত্মিক অনুভূতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং উহা অস্বীকার করা অসঙ্গত হইবে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলিতে আমি মানুষের আত্মার অনুভূতিই বুঝি। সকল মানুষেরই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে দেহেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মার অনুভূতি আছে। 'আমি নাই' বা 'আমার অস্তিত্ব নাই' একথা বড় কেহ বলেন না। যদি কখন কেহ এক সর্বগ্রাসী সন্দেহের আশ্রয় লইয়া বলেন—'আমার নিজ আত্মাকেও আমি সন্দেহ করি', তবে বলিব—'আপনি আত্মাকে স্বীকার করিয়াই সন্দেহ করিতেছেন বা সন্দেহ করিতে পারেন।' পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামতি ডেকার্টের দর্শন পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। অতএব বলিতে হয় যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যাহা আত্মানুভূতিরই নামান্তর, তাহা সব মানুষেরই অল্পবিস্তর আছে এবং চিরকালই থাকিবে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন বাহ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই স্থাপিত হউক বা আন্তর আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক হউক, তাহাকে আলেয়ার অনুসন্ধানের মতো নিরর্থক ও নিন্দনীয় বস্তু বলা সমীচীন হইবে না। পরন্তু দর্শন যে মানুষমাত্রের অপরিহার্য বৃত্তি ও নিত্য সহচর তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন ব্যতীত কোন মানুষেরই জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। ভাল হউক মন্দ হউক, জীবজগৎ ও নিজ আত্মা বা জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়াই মানুষকে জীবনে চলিতে হয়, এবং এই ধারণাই তাহার দর্শন। অবশ্য এ ধারণাকে একটি দার্শনিক মতবাদ বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিবেন অথবা সে বিষয়ে সচেতন থাকিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সচেতন ভাবে হউক বা নাই হউক, যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থন করা হউক বা নাই হউক, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি একটা না একটা দার্শনিক মত পোষণ করেন এবং তদনুসারে নিজ জীবনে চলিয়া থাকেন। যদি কেহ বলেন যে দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া কিছু নাই, দর্শনশাস্ত্র সর্বৈব মিথ্যা ও আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র, তবে তাঁহাকে বলিব—'আপনার মতও একটি দার্শনিক মত এবং উহাকে দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন, জড়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সন্দেহবাদ বা দৃষ্টবাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।'

এখন দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি এ বিষয়ে দুইটি বিপরীত ও অত্যুগ্র মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতে দার্শনিকের জীবন সাধারণ সাংসারিক মানুষের মতোই হইবে। তিনিও বিষয়ী লোকের মতো সংসারাসক্ত ও স্বার্থান্বেষী হইবেন এবং নির্বিচারে ভোগসুখ-লাভের চেষ্টা করিবেন। অপর মতে দার্শনিক বিষয়বিরাগী ও সংসার-ত্যাগী পুরুষ হইবেন। তিনি সংসারের কোন বিষয়েই মন দিবেন না, একান্তে পরমার্থ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই করিবেন না এবং অন্য লোকের, সমাজের বা সংসারের কোন হিত বা অহিত কর্মে লিপ্ত থাকিবেন না।

আমার মনে হয় এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতই চরমপন্থী বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য। অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, এ দুই মতই জগতে বা লোকসমাজে প্রচলিত আছে এবং

বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত, সমাদৃত ও জীবনে অনুসৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

সাধারণতঃ দার্শনিকের জীবনধারায় তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিফলিত ও অনুসৃত হইয়া থাকে; অতএব দার্শনিক চিন্তার ও তত্ত্বোপলব্ধির বিভিন্ন স্তর অনুসারে দার্শনিক জীবনধারারও বিভিন্ন মান ও স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ দার্শনিক চিন্তা ও জীবনধারার পার্থক্য হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলি কেবল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ (system) বলিয়াই পরিচিত নয়। অধিকাংশ দর্শনমতের মূলে এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও ভারতে বেদান্ত-সম্প্রদায়, সাংখ্য-সম্প্রদায়, যোগ-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। আবার বেদান্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যথা—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসেও আমরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও সম্প্রদায় দেখিতে পাই। যদিচ ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের মতো সেগুলি তত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত নহে। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে পাশ্চাত্যে দর্শনের সহিত জীবনের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় নহে। আরও এক কারণ হইতেছে যে, বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ ও উহাদের সমালোচনা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি লইয়াই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের মতো কয়েকজন মহর্ষি দার্শনিকের সূত্রাকারে গ্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যামূলে উহার অগ্রগতি ঘটে নাই এবং সেগুলিকে অকাট্য ও অনবদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালের একাধিক দার্শনিক জীবনে তাহা অনুসরণ করেন নাই। তথাপি আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের Platonist, Aristotelian, Kantian, Hegelian, Marxist প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তাধারা ভিন্ন এবং জীবনধারাও তদনুসারে কতকটা ভিন্ন হইবে।

পূর্বে দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধে যে দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মূলেও দুইটি বিভিন্ন দার্শনিক মত বা চিন্তাধারা আছে। সাধারণভাবে একটিকে জড়বাদ এবং অপরটিকে অধ্যাত্মবাদ (materialism and spiritualism) বলা যায়। প্রথমটির মতে জড় বা অচেতন পদার্থ বা প্রকৃতি হইতে সমুদয় জাগতিক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অচেতন মৃৎপাষাণাদি, বৃক্ষলতাদি, জীবদেহ, মানুষের সচেতন মন এবং আত্মাও জড় প্রকৃতির কার্য বা ক্রমপরিণতির ফলমাত্র। দেহাতিরিক্ত এবং দেহাসম্বদ্ধ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, চেতন দেহই আত্মা, দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়। অতএব পরলোক, পাপপুণ্য, অদৃষ্ট, কর্মফল ও ঈশ্বর প্রভৃতি সত্য বা সৎ পদার্থ নহে। যেন-তেনপ্রকারেণ সুখভোগই মানুষের একমাত্র কাম্য এবং পরম পুরুষার্থ। এরূপ দার্শনিক মতবাদ হইতে যে জীবনধারার প্রবর্তন হয় তাহাকে সুখবাদ (hedonism) বলা হয়। জড়বাদী দার্শনিকের জীবনধারা নির্বিচারে সুখান্বেষণের প্রবৃত্তি ও সুখভোগের প্রগতি। 40717

কিন্তু জড়বাদ ও তদনুবর্তী সুখবাদ বিচারসহ ও আদরণীয় বলিয়া মনে হয় না। জড়বাদ একাধিক ন্যায়াভাস-দোষদুষ্ট দার্শনিক মত এবং সুখবাদ স্ববিরুদ্ধ ও আত্মঘাতী জীবন পথ। অতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও বর্বর ব্যক্তি বা জাতির নিকট উহারা গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় হইবে। সভ্যতার আদিম যুগে, আদিম মনুষ্যজাতির জন্য

অথবা আধুনিক কালের দানব প্রকৃতির লোকের জন্য এরূপ দর্শনমত ও জীবনপথের বিধিব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এইজন্যই আমাদের দেশের চার্বাক দর্শনের কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যদের অকল্যাণ সাধন করিবার জন্যই এই মত তাহাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়—সর্ব কালেই এক রকম প্রকৃতির লোক থাকিবে, যাহাদের জন্য চার্বাক মতই বিধেয় এবং তাহাতে তাহাদের প্রথমে অকল্যাণ হইলেও চরমে কল্যাণ হইবে। মানুষের ভোগসুখের লালসা তৃপ্ত হইলেই সে ত্যাগের মহিমা বুঝিতে শিখিবে, প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়া ক্লান্ত হইলেই মানুষ নিবৃত্তির পথে চলিতে শিখিবে।

পূর্বে উল্লিখিত দার্শনিক জীবনধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতের মূলেও একটি ভিন্ন প্রকার দার্শনিক মত বা চিন্তাধারা নিহিত আছে। ইহাকে আমরা অধ্যাত্মবাদ বলিয়াছি। সাধারণভাবে অধ্যাত্মবাদ মতে আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের মূল তত্ত্ব বা পরমার্থ এবং তাহা হইতেই জীব-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ জগতের মূল কারণ ও উপাদান এক অদ্বিতীয় চেতন সত্তা, উহা জড় পদার্থ বা অচেতন প্রকৃতি নহে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন রূপ বা প্রকারভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদকে অনেকে এই দ্বিতীয় প্রকার দার্শনিক জীবনধারার ভিত্তি গণনা করেন। অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত মাধ্যমিক-দের শূন্যবাদকেও এরূপ জীবনধারার ভিত্তি বলা হয়। কারণ—অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ; আর শূন্যবাদ অনুসারে শূন্যই পরমার্থ; উহা সৎ নহে, অসৎ নহে; সদসদ্ উভয় নহে; আবার সৎও নয় অসৎও নয়—এমনও নহে। যদি তাহাই হয় তবে জগৎকে মায়াময় ও মায়া-সৃষ্ট, বা অসত্য ও মিথ্যা বা শূন্য ও অপরমার্থ বলিতে হয়। অতএব তত্ত্বদর্শী দার্শনিকের এ সংসারের কোন বস্তুতেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে, তিনি ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবেন, পরমার্থ চিন্তা ছাড়া জগৎ-সংসারের কোন বিষয়ই চিন্তা করিবেন না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বিজনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবেন। দার্শ-নিকের এরূপ জীবনধারাকে আমরা ত্যাগের, নিবৃত্তির, নৈষ্কর্ম্যের বা সন্ন্যাসের পথ (asceticism) বলিয়া থাকি।

দার্শনিকের এই প্রকার জীবনও আদর্শ বা প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না। যদি পূর্বোক্ত সুখবাদী জীবনধারায় মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার বা অবমাননা করা হয়, তবে সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনধারায় মানুষের আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত, অবসাদিত ও সঙ্কুচিত করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ উভয়কেই নেতিবাচক পথ (negative path) বলিয়াছেন। দুই নেতিবাচক দার্শনিক চিন্তা-ধারার মধ্যে এরূপ নেতিবাচক ও নিষেধাত্মক পথ দুইটির সন্ধান পাওয়া যায়। জড়বাদে মানুষের আত্মার নিষেধ এবং কেবল দেহেন্দ্রিয়ের স্বীকৃতি থাকায় জড়বাদী দার্শনিকের জীবনে শুধু দেহসুখের অন্বেষণ ও আত্মানন্দের বিসর্জন করা হয়। তিনি শ্রেয়ঃ পথ ছাড়িয়া প্রেয়ঃ পথের অনুসরণ করেন, যেন কাঞ্চন ছাড়িয়া কাঁচ পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। অপর দিকে কোন কোন বেদান্তীর মতে ব্রহ্মে জগৎ-প্রপঞ্চ ত্রিকাল-নিষিদ্ধ এবং আত্মা ত্রিকাল-সিদ্ধ থাকায়, তাঁহারা প্রবৃত্তির পথ একেবারে ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির পথে বিচরণ করেন, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মে এই জগৎ-প্রপঞ্চ ত্রিকাল-নিষিদ্ধ—একথা মূল বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের কথা বলিয়া মনে হয় না। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণনায় সগুণ ও সবিশেষবাচক বাক্যও

পাওয়া যায়, আবার নির্গুণ ও নির্বিশেষবাচক বাক্যও পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার বাক্যকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা এবং সম মর্যাদা দেওয়া উচিত। কোন কোন অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী তাহা করেন নাই। অদ্বৈতীরা নির্গুণ ও নির্বিশেষবাচক বাক্যের উপর জোর দিয়া অপর প্রকার বাক্যগুলির নিজের মতো ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ঠিক তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার মনে হয় ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষও বটেন, আবার সগুণ সবিশেষও বটেন। আর এক কথা, 'ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বম্', 'সর্ব খলু ইদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সত্য হইলে জগৎ-প্রপঞ্চকে একেবারে অসৎ, মিথ্যা বা মায়া-মরীচিকা বলা ঠিক হইবে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবাক্য যেরূপ সত্য, 'যেন জাতানি ভূতানি' ইত্যাদি বাক্যও সেরূপ সত্য। এক প্রকার বাক্য সত্য, অপর প্রকার বাক্যকে অসত্য, অথবা সব বাক্যই সগুণবাচক—কোন কোন বেদান্তীর এসব কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নাই, বোধ হয় তাঁহাদের নিজ নিজ অভিপ্রেত বা অভিলষিত দর্শনমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষ কথা, শঙ্করাচার্য প্রমুখ প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা জগৎসংসারকে পরমার্থ সৎ না বলিলেও অসৎ বা অলীক কল্পনা-মাত্র বলেন নাই এবং নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্মা জীবন যাপনও করেন নাই, পরন্তু ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য বহু কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি যে সর্বকর্ম-ত্যাগ ও জীবজগতের প্রতি অত্যুগ্র ঔদাসীন্য দার্শনিকের আদর্শ জীবনের লক্ষণ নহে। অদ্বৈত-বেদান্তী জগদ্‌বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দার্শনিকের আদর্শ জীবনধারার কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। দার্শনিক সর্বাগ্রে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন। নিত্যানিত্য সদসদ্‌বস্তু এবং ন্যায়ান্যায়-কর্ম বিচার করিয়া তিনি তাহাদের প্রতি যথোচিত আচরণ করিবেন। সত্যনিষ্ঠা দার্শনিক জীবনের পরম প্রয়োজন ও অমূল্য সম্পদ। দর্শন পরমার্থ সৎ বা সত্যের অনুক্ষণ অনুসন্ধান। যাঁহার জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে তাঁহার পক্ষে পরম সত্যের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত। দার্শনিক সংযত জীবন যাপন করিবেন। তিনি অহিংসা প্রভৃতি পঞ্চ মহাব্রত বা পঞ্চশীলের অনুশীলন করিবেন। দার্শনিক সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবেন। তিনি আত্মতুলনায় পরের সুখে সুখী হইবেন এবং পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবেন। অন্যের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বা অনিষ্ট চিন্তাও দার্শনিকের নিকট গর্হিত কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। দার্শনিক স্থিতধী, আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মতৃপ্ত হইবেন। তাঁহার বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হইবে, এবং তিনি চিত্তপ্রসাদ-লাভে সচেষ্ট হইবেন। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও দার্শনিক ঐগুলিতে নিমগ্ন বা নিমজ্জিত হইবেন না, তিনি সর্বদাই বিষয়াতিরিক্ত ও বিষয় কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট আত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক জীবনে যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ভোগসুখের জন্য লালায়িত হইবেন না, যথাযোগ্য আয়াসলব্ধ এবং জীবন-রক্ষার জন্য যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। ইন্দ্রিয়-সুখে এবং ভোগৈশ্বর্যে অনাসক্তি আদর্শ দার্শনিক জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। তিনি অনাসক্তভাবে সংসারের সকল কর্ম করিবেন এবং কর্মের ফলাফলের জন্য ব্যস্ত ব্যথিত বা উল্লসিত হইবেন না। জ্ঞানসাধনাই দার্শনিকের প্রধান কর্তব্য এবং তাহার সাধনরূপে তিনি অদম্ভিত্ব, অমানিত্ব, ক্ষান্তি, সরলতা, চিত্তশুদ্ধি, স্থৈর্য, অনহঙ্কার, সাম্যভাব, আস্তিক্য বুদ্ধি, বিবিক্তদেশানুরাগ, চিত্তবিক্ষেপকারী পরিবেশ-ত্যাগেচ্ছা, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তত্ত্ব-জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন করিবেন। সর্ব জীবের সেবা দার্শনিকের জীবনের ব্রত হইবে। তিনি সাধ্যমত দেশের ও দশের তথা বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিবেন। আদর্শ দার্শনিকের জীবন-যজ্ঞের পবিত্র মন্ত্র হইবে :

> 'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
> কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্ ॥'

পূর্ববঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

১৯১৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগ। পরম পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠের দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঢাকার শ্রীবীরেন্দ্র বসু (মহারাজের শিষ্য) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঢাকা যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রেমানন্দও 'মহারাজ'কে ঢাকা ও ময়মনসিংহে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, 'কোন তীর্থস্থান উপলক্ষ ক'রে না গেলে আমার আসন টলবে না। যদি আমাকে ৺কামাখ্যাধামে নিয়ে যেতে পার, তাহলে আমি যেতে রাজী আছি।'

আমি এবং বীরেনবাবু উভয়েই খুব আনন্দের সহিত ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। আমরা মহারাজকে ৺কামাখ্যা যাওয়ার দিন দেখিতে বলিলাম। জ্ঞান মহারাজের ঘরে বসিয়া মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ কথাবার্তা বলিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ রাজা মহারাজকে পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যাওয়ার কথা ঠিক হইবার পর আমি ময়মনসিংহের ভক্তদের লিখিয়া দিলাম পূজ্যপাদ মহারাজদের বাসস্থানের জন্য একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিতে।

মহারাজদের ৺কামাখ্যা রওনার তারিখেই কিছু মেওয়া ফল লইয়া আমি রওনা হইয়া গেলাম। ময়মনসিংহে পৌছিয়াই জানিতে পারিলাম যে, কোন ভাল বাড়ী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। আমাদের সমস্ত বাড়ীটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এবং চুনকাম করিয়া মহারাজদের বাসস্থানের জন্য ঠিক করা হইল এবং মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্যের বাড়ী হইতে কয়েকটা ভাল তাঁবু আনাইয়া আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর ধারে খাটানো হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ ৺কামাখ্যাতে তিন রাত্রি বাস করিবেন, ইহা পূর্বেই ঠিক করা ছিল; অতএব তাঁহাদের রওনা হইবার তারিখ অনুসারে তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য একজনকে ৺কামাখ্যাধামে এবং কিছু ফল মিষ্টি সহ কয়েকজন ভক্তকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ফুলছরী ঘাট ষ্টেশনে পাঠানো হইল।

শ্রীশ্রীমহারাজ সকলকে লইয়া ১৩২২ সনের ৬ই মাঘ (১৯১৬ খৃঃ ২০শে জানুআরি) শুক্রবার বেলা ১০।১০॥টার সময়ে ময়মনসিংহে পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী অম্বিকানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী হরিহরানন্দ, অবিনাশ মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ, ব্রহ্মচারী বিনোদ, পুঁটিয়ার বিভূতিবাবু, ঢাকার বীরেনবাবু। ময়মনসিংহে তাঁহাদের আগমন-বার্তা পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। স্টেশনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া আসা হইল।

আমাদের বাসাতে দুইটি প্রকোষ্ঠ-যুক্ত একটি দালান ছিল। উহার বড় প্রকোষ্ঠ শ্রীশ্রীমহারাজের থাকিবার জন্য এবং ছোট প্রকোষ্ঠটি বাবুরাম মহারাজের থাকিবার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল। নূতন লেপ তোষক পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাতেই মহারাজদের বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। এই

সময় আমার ইচ্ছা হইল—বাবুরাম মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো রাখিব, কিন্তু মহারাজের ঘরে রাখিব না। দেখিব—মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর কোন আবশ্যকতা বোধ করেন কিনা। ঘরে ঢুকিয়াই ফটো না দেখিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ফটো রাখিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমিও তখনই একখানা ফটো রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম।

মহারাজের আগমনে এক অনির্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস আমাদের মনে বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই অফুরন্ত আনন্দের জের এখন পর্যন্ত আমার হৃদয়ে খেলিতেছে। মহারাজগণ বাসায় পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন। আহার করিবার সময় প্রথম গ্রাস হাতে তুলিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ প্রায় দুই মিনিট কাল আমাকে এত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন যে আমি একেবারে অভি-ভূত হইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগি-লাম, এই অপার্থিব দয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অপার কৃপার নিদর্শন।

আহার করিয়া মহারাজগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে স্বামী শঙ্করানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজদের বিকালবেলা বেড়াবার জন্য কি গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছ?' কাজের গোলমালে গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এই কথা জানাইয়া তখনই গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইতেছে বলিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের এই কথোপকথন শুনিয়া শঙ্করানন্দজীকে বলিলেন, 'এখন গাড়ী আনবার কোন দরকার নেই। চল, আজ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি।'

মহারাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী সকলেই হাঁটিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াইতে চলিলেন। আমাদিগের বাসার পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়া, সাহেব কোয়ার্টারের প্রশস্ত এবং পরিষ্কার রাস্তা ধরিয়া আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে চলিলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ এক সময়ে ঐ স্থানে প্রায় ৮।১০ মাইল প্রশস্ত ছিল। এখন ঐখানে নদটি অতি অল্প-পরিসর, কিন্তু বিস্তৃত চড়াভূমি এখনও বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় বলিয়া ওখানে কোন বসতি নাই। ৮।১০ মাইল-ব্যাপী ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষাদি আছে। নদের ঐস্থানে আসিয়া প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'এখানে এসে আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে।'

শ্রীশ্রীমহারাজ যে কয়দিন ময়মনসিংহে ছিলেন প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে—তাল মান লয় সহ ভজন গান করিতেন। ঘরের মাঝখানে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ঘরের ভিতরে বসিয়া এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া বহু লোক এই ভজন-সঙ্গীত শুনিতেন এবং এই দুই মহাপুরুষের ধ্যানস্থ মূর্তি সন্দর্শন করিয়া সকলে ধন্য হইতেন।

অপরাহ্নে বাবুরাম মহারাজ 'মহারাজে'র কক্ষে আসিয়া কথাবার্তা বলিতেন এবং অনেক শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেন।

মহারাজগণ ময়মনসিংহে পৌছিবার পরদিন বিকেলবেলা স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। শহরের গণ্যমান্য বহু ভদ্র-লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীমহারাজকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহারাজ নিজে তো কিছুই বলিলেন না, অপর কাহাকেও কিছু বলিতে আদেশ করিলেন না। তৎপরিবর্তে তাঁহার আদেশানুসারে কেবল শ্রীরামনাম-কীর্তনই হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লাইব্রেরির মতিবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বারা তাঁহাদের লাইব্রেরির নবনির্মিত ঘরের উদ্বোধন করা হউক। এ কথা মহারাজকে নিবেদন করা মাত্রই তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং রবিবার দিন সন্ধ্যার সময় এই নূতন লাইব্রেরি-ঘর উদ্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজদের তথায় লইয়া যাওয়া হইল। লাইব্রেরির উত্তরাংশে ঠাকুরঘর করিবার জন্য একটু প্রকোষ্ঠ ছিল এবং তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো একটি বেদীর উপর সাজানো হইয়াছিল। উহা দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'আমিই ঠাকুরের আরতি ক'রব।' এই কথায় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মহারাজ স্বয়ং আরতি করিলেন, এবং পরে হলঘরে একটু বসিলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অনেক উপদেশ দিলেন।

সোমবার দিন প্রাতঃকালেই মহারাজ ঢাকা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিছানা-পত্র বাঁধিবার আদেশ দিলেন এবং বিছানাপত্র বাঁধাও হইয়া গেল। আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ; ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আজই চলে যাবার উদ্যোগ করছেন ব'লে তোমার মন খুব খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, তোমার এই টান বুধবারের বেশী থাকবে না, আর আজ মহারাজের যাওয়া হবে না।' আমাকে এই ভাবে অভয় দিয়াই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমহা-রাজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। বাবুরাম মহা-রাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ ঢাকা যাওয়া স্থগিত রাখিলেন এবং বুধবার প্রাতঃকালে যাওয়ার সময় স্থির হইল।

বিছানা খুলিবার আদেশ দিয়াই শ্রীশ্রীমহা-রাজ বলিলেন, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।' তখন বেলা ৮৷৮৷৷টা হইবে। রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, তাই অল্প একটু ঘুরিয়া আসিবার জন্য শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজকে লইয়া আমাদের বাসার পূর্বদিকের রাস্তা দিয়া ব্রহ্ম-পুত্রের তীরে গেলাম। তথায় পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথম দিনের মতো বলিয়া উঠিলেন, 'এখানে এসে আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে।' ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধন্য, যেখানে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস-পুত্রের মন বারেবারেই অনন্তে মিশিয়া যাইতেছিল।

সোমবার প্রাতঃকালে আর ভজনগান হয় নাই। বিকালবেলা মহারাজ সকলকে লইয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে নীরদ মহারাজের ভজনগান হইয়া-ছিল। বিকালবেলা পূর্বদিনের মতো ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী মাধবানন্দ তথায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ পুরোপুরি পাঁচদিন ময়মন-সিংহে ছিলেন। এই পাঁচদিনে ময়মনসিংহের শিক্ষিত লোকদের এবং ছেলেদের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বহু প্রসার লাভ করে এবং কালে এখান হইতে পাঁচজন ত্যাগী যুবক সাধু হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন।

বুধবার (১১ই মাঘ) প্রাতঃকালে ১০টার সময় মহারাজ সদলবলে ঢাকা রওনা হইলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ঢাকা গিয়াছিলাম।

ঢাকা স্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে তথাকার ভক্তেরা অত্যন্ত উৎসাহ-সহকারে মহারাজদের অভ্যর্থনা করিলেন। স্টেশনে প্রায় ৩।৪ শত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় মহারাজদের থাকিবার জন্ম কাশীমপুরের জমিদার শ্রীসারদা রায়চৌধুরীর কায়েতটুলীস্থিত বসতবাটীটি নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। মহারাজদের তথায় লইয়া যাওয়া হইল। ঢাকায় মহারাজগণ যতদিন ছিলেন, আমিও ততদিন তাঁহাদের সঙ্গে ঐ বাড়ীতেই ছিলাম।

ঢাকায় পৌঁছিবার পরদিনই প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, 'গত রাত্রে দেখলাম ঠাকুর এইখানে নৃত্য করছেন। ঠাকুরই তাঁর নিজের প্রচারকার্য নিজেই করছেন। আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।' ঢাকাতে পৌঁছিবার পরদিনই মহারাজের শরীর অসুস্থ হয়। এইজন্য প্রথম তিন চার দিন তিনি বাহিরের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন নাই। বাবুরাম মহারাজই একটি বড় হল-ঘরে সমবেত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। মহারাজের শরীর সুস্থ হওয়ার পরে তিনিও আসিয়া প্রাতঃকালীন বৈঠকে যোগ দিতেন। ঢাকার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকে এই সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন শিক্ষিত ত্যাগী যুবক সাধু হইবার জন্য বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীমহারাজের ঢাকা যাইবার ৫।৬ দিন পরে ঢাকার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিস্ সাহেব মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য আসেন। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'তুমি গিয়ে নির্মলকে (স্বামী মাধবানন্দ) বল যে, আমি তাকে বিস্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছি।' মহারাজের আদেশের কথা শুনিয়া নির্মল মহারাজ তখনই বিস্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি সহজ এবং সরল ভাষায় ঠাকুরের কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বিস্ সাহেব ইহাতে খুব আনন্দিত হইলেন। খানিকক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমহারাজও তথায় আসি-লেন। তিনি কিছু সময় ওখানে বসিয়া চলিয়া আসিলেন। বিস্ সাহেব মহারাজকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহার দর্শনেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহারাজদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় কার্জন হলে শ্রীশ্রীমহারাজের অনুমতি লইয়া প্রথমতঃ স্বামী মাধবানন্দ একটি বক্তৃতা দেন, পরে বাবুরাম মহারাজও ছাত্রদের নিকট ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে জীবন গঠন করিবার জন্য খুব উদ্দীপনা-পূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঢাকার বিখ্যাত সেতারবাদক ভগবান সেতারী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম সেতারী উভয়ে একদিন বিকালবেলা অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীমহারাজকে সেতার বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন। ইঁহাদের বাজনা শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐদিনই কুমিল্লার বিখ্যাত বংশীবাদক আফতা-বুদ্দিন মিঞা শ্রীশ্রীমহারাজকে তাঁহার বংশীবাদন শুনাইয়াছিলেন। এই বংশীবাদনও অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

ঢাকা আসিবার পর হইতে প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে ৮।৮৷৷টা হইতে বেলা ১০৷৷।১১টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে রাত্রি প্রায় ৮।৯টা পর্যন্ত সমবেত ভক্তদের সঙ্গে অনবরত কথা বলিয়া ১২।১৪ দিন পরে বাবুরাম মহারাজের শরীর খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রি

৮৷৷৯টার সময় সমবেত ভক্তদের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্যের ভঙ্গী করিলেন। তখন তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার সেই অপরূপ রূপ এখনও আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত আছে।

এই সময়েই শ্রীশ্রীমহারাজ ঢাকার বর্তমান মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন। ঢাকাতে ২০৷২৫ দিন থাকিবার পরে শ্রীশ্রীমহারাজকে কাশীমপুরের জমিদার সারদাবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। আমি এবং ঢাকার আরও কয়েকজন ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে সেখানে যাই। সকলে ঢাকা হইতে প্রাতঃকালে রেলে জয়দেব-পুর রওনা হইলাম। কাশীমপুর জয়দেবপুর হইতে ছয় মাইলের হাঁটা পথ। এই পথটুকু যাইবার জন্য সারদাবাবু জয়দেবপুর স্টেশনে ৬টা হাতী পাঠাইয়াছিলেন। একটা হাতীর উপরে শ্রীশ্রীমহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়া-ছিলেন, অপর পাঁচটা হাতীর উপরে ৪জন করিয়া বসিয়া যাওয়া হইয়াছিল। কাশীমপুর পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আহারাদির পর বিকালবেলা আবার হাতীর উপর চড়িয়া সকলে মিলিয়া ঐ গ্রামেরই সংলগ্ন এক বিরাট গভীর জঙ্গল দেখিতে গেলাম। পরদিন প্রাতঃ-কালে কাশীমপুর গ্রাম-সংলগ্ন একটা ছোট নদীতে বড় বড় চিতল মাছ ধরা দেখিবার জন্য মহারাজদের লইয়া যাওয়া হয়। হাতীতে চড়ি-য়াই সকলে তথায় গিয়াছিলাম। তথায় একবার জাল টানিতেই ৬টা বড় চিতল মাছ উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ খুব খুশী হইলেন।

এই দিনই শ্রীশ্রীমহারাজ সারদাবাবুকে মন্ত্র-দীক্ষা দিলেন। সারদাবাবুর একমাত্র পুত্র আত্মহত্যা করে। এই দুর্ঘটনায় সারদাবাবু অত্যন্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে কালযাপন করিতে-ছিলেন। আজ মহারাজের কৃপালাভ করিয়া তাঁহার দুঃখের বোঝা অনেকটা লাঘব হইল। বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সারদাবাবুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'আজ একটি বিল্বমঙ্গলের অভিনয় হ'ল।' মহারাজ এখানে সারদাবাবুর কয়েকজন আত্মীয়কেও দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই কাশীমপুরেই বাবুরাম মহারাজ আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর বলতেন, রাখাল (শ্রীশ্রীমহারাজ) ত্রিগুণাতীত।'

কাশীমপুরে হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহারাজদের সকলের ফটো তোলা হইয়াছিল। মহারাজ কাশীমপুরে তিন দিন কি চার দিন ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঢাকাতে আরও কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণ-গঞ্জের ভক্তেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যান। মহারাজগণ কণ্ট্রাক্টার নিবারণ-বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। নারায়ণগঞ্জে পৌছিবার পরদিনই শ্রীশ্রীমহারাজ নাগমহা-শয়ের বাড়ী দেওভোগ গ্রামে যান। তথায় পৌছিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত পুকুরের ধারে বসিয়া একটু বিশ্রাম করেন। সেইখানে একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নাগমহাশয়ের ভক্তির কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, 'তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরের বেড়াতে একবার উই ধরে বেড়ার কতক অংশ খেয়ে ফেলে, কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই ঐ উইগুলি মেরে বেড়াটা পরিষ্কার করতে দিলেন না।' তিনি উই-এর ভিতরেও জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিতেন, এইজন্য তাহাদের আহারে বিঘ্ন ঘটা-ইতে দেন নাই।

মহারাজ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'এ ভক্তির পরাকাষ্ঠা, highest (উচ্চতম) ভক্তির লক্ষণ।'

শ্রীশ্রীমহারাজের আগমন উপলক্ষে গ্রামের এক সংকীর্তনের দল নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহারাজগণ সকলে পুকুরপাড় হইতে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ সংকীর্তনের দলের সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং মহারাজকেও বলিলেন, 'মহারাজ, একটু নাচ।' বাবুরাম মহারাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীমহারাজ একটি গানে টান দিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া একটু নৃত্য করিবার চেষ্টা করিতেই মনে হইল—নীচে হইতে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা মহারাজের বুকের উপর উঠিয়া গেল।

আমার মনে হইল--মহারাজের শরীরটা যেন অনেক লম্বা হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার বক্ষও যেন অনেক স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ যেন পড়িয়া যাইবেন বলিয়া মনে হইতেছিল। স্বামী শঙ্করানন্দ শ্রীশ্রীমহারাজের পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহারাজকে ধরিবার উপক্রম করিতেছিলেন। আমি মহারাজের পাশে দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার উত্তোলিত দুই হাত হঠাৎ জোর করিয়া নীচের দিকে চাপিয়া ধরিলেন। সেই সঙ্গে ভাবটা যেন নীচের দিকে নামিয়া গেল। মহারাজও একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ওখানে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়াইয়া বাবুরাম মহারাজের দিকে তাকাইয়া 'বাবুরাম দা, চল' এই বলিয়াই সংকীর্তনের স্থান পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের সঙ্গে সকলেই চলিয়া আসিলাম। চকিতের মধ্যে যে মহাভাবের খেলা হইয়া গেল তাহা হয়তো অনেকেই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। এমন প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস মহারাজ মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে দমন করিয়া ফেলিলেন! নাগমহাশয়ের বাড়ী হইতে সকলে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ সাধারণতঃ বয়স্ক বা বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ কেবল যুবকদের সঙ্গেই আলাপ করিতেন।

বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, 'আমি স্বামীজীর চেলা। স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, তুই গ্রামে গিয়ে সকলকে ঠাকুরের কথা শোনাবি। যুবকদের মন সংসারে আসক্ত হয়নি, তাই তারা ঠাকুরের কথা ধারণা করতে পারে। এইজন্যই আমি যুবকদের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলি।'

মহারাজগণের নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে চট্টগ্রাম হইতে একজন ভক্ত আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে তথায় লইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। বাবুরাম মহারাজ যাইতে রাজী হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বাবুরাম মহারাজকে কিছুতেই চট্টগ্রাম যাইতে দিলেন না। নারায়ণগঞ্জে ৭।৮ দিন থাকিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ সকলকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। আমরা বহু ভক্ত তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিলে আমরা অনেকেই কাঁদিয়াছিলাম, দেখিলাম বাবুরাম মহারাজের চোখেও জল। যতদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল, আমরা দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলাম; দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজও আমাদের দিকে তাকাইয়া আছেন।

* * *

মহারাজগণ কলিকাতায় চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমিও কলিকাতা যাই। কার্য উপলক্ষে আমাকে তখন প্রতি মাসে বা প্রতি দুই মাসে একবার কলিকাতায় যাইতে হইত এবং কলিকাতা গেলেই ৫।৬ দিন আমি মঠে

থাকিতাম। সেই সময় শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট শ্রুত বিশেষ বিশেষ উক্তিগুলির কয়েকটি এখানে নিবেদন করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমি শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের সেই পুরোনো বুলি: 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' একদিন শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি তো গুরু।' একদিন বলিতেছিলেন, 'সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত মন, সমাধি—এ না হ'লে কি সাধু হয়?' আর একদিন বলিতেছিলেন, 'ঠাকুর বলতেন—তোরা ঈশ্বরের দিকে যত এগিয়ে যাবি, আমার ভালবাসা তোদের উপর ততই বেশী পড়বে। তখন কি আর এ কথার অর্থ বুঝি!' আর একদিন বলিতেছিলেন, 'মানুষ মনের সবটা বাজে খরচ ক'রে ফেলছে, যদি পাঁচ মিনিটও ভগবানের নাম ক'রত।'

আর একদিন মঠবাড়ীর দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির নীচের ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ এবং তাঁহাদের আরও দুএকজন গুরুভাই সকলে বসিয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ 'গোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তি' কথা কয়টি এরূপ ভাবের সহিত উচ্চারণ করিলেন যে উপস্থিত মহারাজগণ শ্রীশ্রীমহারাজ এ বিষয়ে আরও কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। মহারাজ কিন্তু আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিলেন 'তুমি বড় কৃপণ।' মহারাজও অমনি 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ' এই কথা জোরে উচ্চারণ করিয়া সকলকে হাসাইয়া দিলেন, কিন্তু 'গোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তি' সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না।

শ্রীশ্রীমহারাজের মঠে অবস্থানকালে নিয়ম ছিল নূতন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ শেষ রাত্রি ৪টার সময় মহারাজের ঘরে তাঁহার নিকট বসিয়া ধ্যান করিবে। একদিন আমার ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ধ্যানের শেষে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'সর্বদা মনে মনে ভগবানের নাম করা কি প্রকার সাধন?' উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'শ্রেষ্ঠ সাধন।'

একদিন বলরামবাবুর বৈঠকখানার হলঘরে বিকালবেলা শ্রীশ্রীমহারাজ পায়চারি করিতেছেন, আমি তথায় গিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে বসিয়া মহারাজকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীশ্রীমহারাজ কেবল 'জিতেন' এই শব্দটি এমন মধুরভাবে উচ্চারণ করিয়া আমাকে ডাকিলেন যে, আমার হৃদয়ের মর্মস্থান পর্যন্ত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। এমন প্রেমপূর্ণ মধুর আহ্বান, এমন আপনার-করিয়া-লওয়া ডাক জীবনে আর কখনও শুনি নাই। শ্রীশ্রীমহারাজের হৃদয় যে কি অসীম প্রেমপূর্ণ ছিল তাহা ঐ একটি আহ্বানেই বুঝিতে পারিলাম। মহারাজ আমাকে ঐ প্রকার একবার ডাকিয়াই আবার নিজের ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ একটি ডাক আমার প্রাণে আজ পর্যন্ত বাজিতেছে। ঐ একটি ডাকেই চিরপ্রেম-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে!

জাগি

'অনিরুদ্ধ'

জাগি অচেতন রজনীর কুহেলিকা উৎসারি
দীপ্ত অরুণ আলো সাথে ;
জাগি 'ওঠ্ ওঠ্ চল্ চল্' কম্বু কাকলি শুনি
উৎসাহ-উদ্বেল প্রাতে।
জাগি কুণ্ঠা ও দ্বিধা লাজ অবসাদ পরিহরি
বুকে ল'য়ে অদম্য আশা
জাগি পরাজয় লঙ্ঘিয়া দুর্জয় বিশ্বাসে
মোহ ভয়-সংশয়-নাশা।
জাগি পৃথিবীর ধাবমান পরিবর্তন স্রোতে
ধ্রুব পদে সংযুত আঁখি
জাগি মিথ্যার গুণ্ঠন নির্মম বিদারিয়া
স্বার্থ-কলুষ দূরে রাখি।

জাগি উদ্ধত অহমিকা অভিমান চূর্ণিয়া
প্রপন্ন ঈশ্বর-চরণে
জাগি নির্মল ভক্তির প্রশান্ত মহিমায়
দুর্দম বাসনার মরণে।
জাগি এ বিশ্বভুবনের অনাহত সঙ্গীতে
দিকে দিকে বহে সুরধারা
জাগি অনুপম তৃপ্তির উচ্ছল প্রাঙ্গনে
আপনাতে আপনা-হারা।
জাগি জন্মমরণহীন ক্ষোভহীন শোকহীন
স্বরূপের ভাস্বর জ্ঞানে
জাগি অখিল এ চরাচর আত্মবিলাস মানি
অদ্বয় সত্যের ভানে।

বেলুড়

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সত্যসন্ধ সন্ন্যাসীর সুভাষিত বাণী,
ভাস্করের হাতে-গড়া মঠে মূর্তিমান্
জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিবাদ একসাথে আনি'
দানিল সেবার ধর্ম—প্রেমে মহীয়ান্।
মঠ নয়, মানবের মিলন-মন্দির,
জ্ঞানেতে নির্মল নিত্য, বিভূতির ছটা,
বিবেকানন্দের নামে সবে নতশির,
ধ্যানে নাই আড়ম্বর, অর্চনায় ঘটা।
বেলুড় পবিত্র নাম, জ্ঞানের মন্দির,
সত্যের দ্যুতিতে নিত্য চির-প্রভাময়,
কল্যাণের মন্ত্রগান ওঠে অতি ধীর,
ব্রহ্মচর্য-ব্রতচারী জাগে জ্যোতির্ময়।
প্রণাম বেলুড় মঠ, শিখাইলে প্রেম,
স্বামীজীর নামে নতি রাখিয়া এলেম।

বিবেকানন্দ

শ্রীশান্তশীল দাশ

হে সন্ন্যাসী দীপ্তচক্ষু, 'এ সংসার মিথ্যা মায়াময়',
ব'লে তুমি সাথে লয়ে বৈরাগীর উত্তরীয়খানি,
অসংখ্য মানুষ-ভরা, ত্যাগ করি' এই লোকালয়,
যাওনিতো দূরে সরে, হে বিরাট, অসীম-সন্ধানী।
তোমার অসীমে তুমি পেয়েছিলে সীমার মাঝারে,
প্রতিটি 'নরে'র মাঝে দেখেছিলে তুমি 'নারায়ণ' ;
অকুণ্ঠ অর্ঘ্যের ডালা তুলে দিলে সেই দেবতারে,
এ বিশ্ব নিখিল হ'ল সুবিশাল তব পূজাঙ্গন।
যেখানে মানুষ কাঁদে, লাঞ্ছিত, পীড়িত অসহায়—
তোমার দেবতা কাঁদে সেখানে সে-মানুষের মাঝে,
কী গভীর প্রেমে তুমি তুলে নিলে সেই দেবতায় ;
তোমার আরতি-মন্ত্র কী গভীর সুরে সেথা বাজে!
'নারায়ণ' হ'ল 'নর' তোমার জীবন-সাধনায়,
সেই 'নারায়ণে' চিত্ত বারংবার প্রণতি জানায়।

আমেরিকায় বেদান্তের বার্তাবহ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার *

আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ বাঙ্কার (Ellsworth Bunker) ১৯৫৭ খৃঃ ১৪ই মার্চ নঈদিল্লীতে আমেরিকান ছাত্রদের একটি সভায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে কৃষ্টিগত সম্বন্ধ দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান—সংক্ষেপে তার উল্লেখ ক'রে বলেন :

'This cultural interest (between India and the United States) has been a two-way affair. The impact of Swami Vivekananda at the World Parliament of Religions in 1893 is well-known. The great Tagore left a lasting impression on Americans after his visit to the United States. Many other leaders' achievements and utterances have had great influence in my country.'

—অর্থাৎ এই কৃষ্টিগত আগ্রহ দুদিক থেকেই দেখা দিয়েছে। ১৮৯৩ খৃঃ বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সংঘাত সর্বজন-বিদিত। যুক্তরাষ্ট্র-ভ্রমণের পর মহান্ (রবীন্দ্রনাথ) ঠাকুরও আমেরিকাবাসীদের মনে স্থায়ী প্রভাব রেখে আসেন। অন্যান্য বহু (ভারতীয়) নেতার কীর্তিকলাপের ও বাণীর প্রভাব আমার দেশে যথেষ্ট।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে এবং পরে ভারতের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমেরিকায় গিয়েছেন, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে স্বামীজীই যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রথম এবং যথার্থ কৃষ্টিগত প্রতিনিধি। ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসভা নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা, তার থেকেও বড় ঘটনা—সেই সভায় বিবেকানন্দের উপস্থিতি। এই উপলক্ষে স্বামীজী (তখন তিনি মাত্র ৩০ বৎসরের যুবক সন্ন্যাসী) অপূর্ব সুযোগ পেলেন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার এবং পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত হবার। আবার স্বামীজীর (cyclonic Hindu বা তুফানী হিন্দু, lightning orator বা বৈদ্যুতিক বক্তা প্রভৃতি নামে তখন তিনি বিভূষিত) অসংখ্য বক্তৃতায় এবং আলোচনায় আমেরিকাবাসীরা সর্বপ্রথম শুনল যে পাশ্চাত্যকে দেবার জন্য ভারতের আছে এক মহৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ। গভীর বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলবার যোগ্যতা অন্য যে কোন দেশের চেয়ে ভারতের বেশী। স্বামীজী অনুভব করেন, ভারত যদি পাশ্চাত্যকে শেখায় ধর্ম ও দর্শন, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশগুলিকে বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখাতে পারে।

বিবেকানন্দ যে ভাবে আমেরিকা গেলেন তা খুবই চমকপ্রদ। মোটেই তা সহজে নিষ্পন্ন হয়নি। কিছুকাল আগে থেকেই এ দেশে অনেকে জেনেছিল, চিকাগোয় একটি ধর্মমহাসভা হচ্ছে। স্বামীজী না পেয়েছিলেন কোন আমন্ত্রণ, না ছিল তাঁর টাকা—এতদূর যেতে হবে, আবার সে দেশে গিয়ে থাকার খরচও তো চাই।

অবশেষে ১৮৯৩ খৃঃ প্রথমে তিনি পেলেন অন্তরের এক আহ্বান অথবা দৈব আদেশ (যা অভিরুচি বলতে পারা যায়)—অনিমন্ত্রিত বিবেকানন্দ সাহস ক'রে পা বাড়ালেন অজানার পথে। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষিণ ভারতের শিষ্যেরা এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুরা যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সাহায্যও করেন।

৩১শে মে স্বামীজী জাহাজে বোম্বাই ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ভঙ্কুবরে (কানাডা) পদার্পণ করলেন—২৫শে জুলাই। চিকাগো পৌঁছে তিনি জানলেন, ধর্মমহাসভা আরম্ভ হ'তে কয়েক সপ্তাহ দেরি আছে; তাই তিনি বোষ্টন চলে

* Associate Editor, Amrita Bazar Patrika.

গেলেন। ম্যাসাচুসেট্‌স্ অঞ্চলে চার পাঁচ সপ্তাহে ১১টি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কয়েকজন প্রভাবশালী আমেরিকানের সংস্পর্শে এসেছেন, সর্বোপরি আমেরিকার সমাজ-জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা তাঁর হয়েছে। তাঁর বক্তৃতাগুলি এত শিক্ষাপূর্ণ এবং মনোমুগ্ধকর হ'ত যে তিনি সর্বত্র বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। যেখানে তিনি যেতেন, সেখানেই সংবাদ-পত্র সাগ্রহে তাঁর সংবাদ প্রকাশ ক'রত।

এখনও আসল সমস্যার সমাধান হয়নি,—যেজন্যে তিনি অর্ধেক পৃথিবী (১০,০০০ মাইল) অতিক্রম ক'রে এসেছেন, সেই ধর্মমহাসভার আমন্ত্রণ-লিপি এখনও তিনি পাননি। সাহায্য এল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডক্টর জন হেনরি রাইট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক; তাঁরই সহযোগিতায় অবশেষে স্বামীজী ধর্ম-মহাসভায় প্রতিনিধির একটি আসন-লাভে সমর্থ হলেন।

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর কলা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মসভার অধিবেশন শুরু হয়। গত মে মাসে আমি যখন মিশিগান এভিন্যু-এর ওপর এই বিরাট ভবনে (বর্তমানে এটি একটি ম্যুজিয়াম ও চিত্র-প্রদর্শনী) প্রবেশ করি, তখন আমার মন যেন মুহূর্তের মধ্যে ৬৬ বৎসর পিছিয়ে চলে গিয়েছিল, এবং এই ঐতিহাসিক ভবনে ১৭ দিনব্যাপী ধর্মমহাসভার অধিবেশনে স্বামীজী যে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন, তা অনুভব করছিলাম।

যখন তিনি 'আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' ব'লে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন, তখন সেই সভায় উপস্থিত ৫,০০০ নরনারীর মনে এক নাটকীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। স্বামীজীর ঐ মহান্ ভাষণে যে বিশ্বজনীনতার সুর ছিল তারই আবেদনে সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে উঠে কয়েক মিনিট ধরে আনন্দধ্বনি করেছিল। জনসভায় কোন বক্তার মুখে তারা এমন ভ্রাতৃত্বের ভাবপূর্ণ ভালবাসা-ভরা আহ্বান কখনও শোনেনি। ধর্মসভায় স্বামীজীর এই প্রথম বক্তৃতা এবং পরবর্তী ভাষণগুলিও তারা পরম আগ্রহে ও ভক্তিভরে শুনেছিল; এবং এই বক্তৃতার মাধ্যমেই স্বামীজীর নাম আমেরিকায় এবং তার বাইরেও রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে গেল।

মোটামুটি ভাবে স্বামীজী দু'বার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন; প্রথমবার—১৮৯৩ খৃঃ জুলাই-এর শেষ থেকে ১৮৯৫ খৃঃ আগষ্ট পর্যন্ত, আবার ১৮৯৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৯৬ এপ্রিল পর্যন্ত—২৯ মাস। দ্বিতীয় বারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন প্রায় ১০।১১ মাস ১৮৯৯।১৯০০খৃঃ। তাহলে দেখা যাচ্ছে—স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থান-কাল সর্বসমেত সাড়ে তিন বছরের বেশী নয়। ১৯০০, ২০শে জুলাই তিনি আমেরিকা ছেড়ে ইওরোপে ঘুরে হঠাৎ বেলুড় মঠে ফিরে আসেন ১৯০০ খৃঃ ডিসেম্বরে। প্রায় দেড় বছর পরে ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

'নতুন আবিষ্কার'

স্বামীজীর আমেরিকা থাকাকালীন সাধারণ বিবরণ তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত জীবনীতে পাওয়া যায়; কিন্তু চমকপ্রদ খুঁটিনাটি অনেক কিছু—অজানাই থেকে যেত, যদি না 'জনৈক আমেরিকান ভক্ত' ১৯৫০ খৃঃ বিরাট গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। মার্কিন সংবাদ-পত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি খুঁজে খুঁজে তিনি তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল। স্বামীজীর বক্তৃতার ও আলোচনার চমকপ্রদ বিবরণী, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

ও বিরাট জ্ঞান সম্বন্ধে আমেরিকানদের মতামত —সব মুদ্রিত আকারে পাওয়া গেল। সেগুলি যেন মাটি খুঁড়ে বার করা হ'ল। এগুলির ফটো তুলে নেওয়া হ'ল, প্রতিলিপি ক'রে নেওয়া হ'ল।

রামকৃষ্ণ-সংঘের ইংরেজী মাসিক পত্রিকা Prabuddha Bharata-এর ১৯৫৫ খৃঃ কয়েকটি সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries by an American Devotee' নামে। সাগ্রহে এগুলি পড়তে পড়তে ভাবতাম, কে এই 'আমেরিকান ভক্ত'—যিনি নিরলসভাবে এক শহর থেকে আর এক শহরে গেছেন, গ্রন্থাগারে পুরানো সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা থেকে এত সব নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। গত বছর প্রবন্ধ-গুলি 'অদ্বৈত আশ্রম' থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ৬৫০ পৃষ্ঠার বইখানির মধ্যে স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের প্রথমবারের মাত্র ২১ মাসের কথা (আগষ্ট ১৮৯৩ থেকে এপ্রিল ১৮৯৫ পর্যন্ত) আছে। আশ্চর্য হবো না, যদি দেখি অদূর ভবিষ্যতে একাধিক খণ্ডে স্বামীজীর আমেরিকা-বাসের সকল তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে। নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি—এক একটি যেন সোনার দানা। স্বামীজীর কথা শুনে মার্কিনদের মনে কি প্রকার প্রতিক্রিয়া হ'ত, মানুষ হিসেবেই বা তারা তাঁকে কি ভাবে দেখত, আবার চিন্তাশীল বক্তা ও ধর্মনেতারূপেই বা তাঁকে তারা কি চোখে দেখত, এ সব বিষয়ে নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলি সত্যি নতুন আলোক সম্পাত করে।

একথা সর্বজনবিদিত যে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অন্ততঃ প্রথমাবস্থা স্বামীজীর খুব সুখে কাটেনি। আবার ধর্মমহাসভায় অদ্ভুত সাফল্য অর্জনের পর যখন নির্ভীক বক্তা এবং ধর্মনেতারূপে তিনি বিখ্যাত হ'য়ে গেছেন, তখন তাঁর অনেক শত্রুও দেখা দিয়েছে—বিশেষতঃ খৃষ্টান পাদ্রীদের মধ্য থেকে, তাদের ধারণা এই কালবৈশাখীসদৃশ হিন্দু সন্ন্যাসী বুঝি বা তাদের খৃষ্টধর্মের সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করবে। দুঃখের বিষয়—শত্রুতা ও বিরূপতা অনেক সময় সংবাদপত্রে ও বক্তৃতা-মঞ্চে প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হ'ত, এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বামীজীকে এতে যোগ দিতে হ'ত। তবে একটা কথা—স্বদেশবাসীদের মধ্যেও যেমন কেউ কেউ স্বামীজীর শত্রুতা করেছেন, আমেরিকানদের মধ্যে আবার তেমনি স্বামীজী অনেক অকপট প্রভাবশালী এবং সাহায্যকারী বন্ধু লাভ করেছেন। শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেছে। বন্ধুরা জানত, তিনি কি জিনিসে তৈরী। যে উদ্দেশ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, তা যাতে সফল হয় তার জন্য তারা সর্বতো-ভাবে তাঁকে সাহায্য করেছে। 'আমেরিকান ভক্ত'টি তাঁর 'নতুন আবিষ্কারে' কিছুই গোপন করেননি। স্বামীজীর জীবনের সব দিক তিনি অনাবৃতভাবে দেখিয়েছেন উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা ক'রে। বইখানি যদিও জীবনী নয়, তবু স্বামীজীর জীবনের একখানি অমূল্য আকর গ্রন্থ।

গত বছর (১৯৫৯) মে মাসে আমি যখন স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটিতে, তখন আমার বন্ধু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সমিতির একজন সদস্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনিই 'নতুন আবিষ্কারে'র 'জনৈক আমেরিকান ভক্ত'। —অবাক্ হ'য়ে দেখলাম 'জনৈক ভক্ত' জনৈকা মহিলা—দুর্বল, ছোটখাট ধরনের, বয়স প্রায় ৫০ কি ৬০। এঁরই নাম মারী লুই বার্ক! আশ্চর্য হ'য়ে ভাবতে লাগলাম—ক'বছর ধরে একটানা ভাবে এঁকে কি দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে! মহিলা এত শান্ত এবং নম্র যে তাঁকে তাঁর বই-এর কথা বলাতে তিনি বললেন, 'ও কিছু না'। এ রকম একটি বই লিখে যিনি আমাদের ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া পরম সৌভাগ্য।

বেদান্তের বার্তা

স্বামীজী মনে করতেন, ভারত আমেরিকাকে শ্রেষ্ঠ জিনিস যা দিতে পারে তা হচ্ছে 'বেদান্ত'; তারই মধ্যে আছে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও বিশ্বজনীনতার বাণী এবং এরই মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিগত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে দুই মহাজাতির মধ্যে।

বেদান্তের শিক্ষা: মানুষ দিব্যভাবাপন্ন। এই বিশ্বের পেছনে যদি কোন একটি বাস্তব সত্তা থাকে—তা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, এবং তিনি সর্বব্যাপী। সেই ব্রহ্ম যদি সর্বব্যাপী হন, তবে নিশ্চয় তিনি আছেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, তিনি আছেন যে কোন সৃষ্ট জীব ও পদার্থের ভেতরে। তিনিই যদি সব কিছুর মধ্যে আছেন, তবে বেদান্তের শিক্ষা শুধু ভ্রাতৃত্ব নয়—সকলের তাদাত্ম্য ঐক্য (identity)।

বেদান্ত আরও শিক্ষা দেয়, ইহজগতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য—তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সদা-বিদ্যমান ব্রহ্মভাবকে বিকশিত করা। বেদান্তের মতে সত্য বিশ্বজনীন। বেদান্ত সব ধর্মকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে, কারণ সব ধর্মের মূলেই যে দিব্য প্রেরণা আছে—তা বেদান্তই ধরতে পেরেছে। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনোভাবের উপযুক্ত। প্রত্যেক ধর্মই আবার প্রতিটি মানুষের মতো খানিকটা অজ্ঞানতায় জড়িত। তবে বেদান্ত তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বেদান্ত জোর দেয় অন্তর্নিহিত সত্যের ওপর। বেদান্ত ধর্মান্তরিতকরণ সমর্থন করে না; তবে হিন্দুকে সাহায্য করে ভাল হিন্দু হ'তে, খৃষ্টানকে ভাল খৃষ্টান হ'তে, মুসলমানকে ভাল মুসলমান হ'তে। তিন বছরের অধিককাল ধরে শত শত বক্তৃতায় স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মূল বিষয়বস্তু ছিল বেদান্ত।

বেদান্তের এই বার্তার বিশ্বজনীনতা বহু আমেরিকানের হৃদয় স্পর্শ করে। যারা তাঁর খুব কাছে আসত এবং আত্মোপলব্ধির জন্য সাহায্য চাইত, তাদের জন্য তিনি পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করতেন। কয়েকজন সংসার ত্যাগ ক'রে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এ সব কঠিন ও বিরাট কাজে স্বামীজীর লৌহদৃঢ় শরীরও ভেঙে পড়ল। তিনি দেশে ফেরার প্রয়োজন অনুভব করলেন, তবে তার আগে কতকগুলি বেদান্ত-কেন্দ্রকে স্থায়ী রূপ দেবার কথা ভাবলেন।

১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন ক'রে এলেন। বিদেশে এইটিই প্রথম কেন্দ্র। ১৯০০ খৃঃ প্রথমে দ্বিতীয় বার যখন তিনি আমেরিকা আসেন, তখন লস্ এঞ্জেলস্-এ (দক্ষিণ কালিফর্নিয়ার) এবং স্যান্-ফ্রান্সিস্কোয় (উত্তর কালিফর্নিয়ার) বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সব কেন্দ্রে যে পরিবেশের মধ্যে সময় কাটিয়েছি, তার স্মৃতি এখনও আমার মনকে ঊর্ধ্বলোকে টেনে নেয়।

১৯০০ খৃঃ মাঝামাঝি যখন স্বামীজী শেষবারের মতো আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সাক্ষাৎ শিষ্য সেখানকার কাজের ভার নিয়েছেন। আজ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ১১টি বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। কয়েকটি কেন্দ্রে রবিবারের সমাবেশে যোগ দেবার সুযোগ পেয়ে বুঝেছি, আমেরিকার নরনারী—বিশেষ ক'রে তাঁদের মধ্যে যাঁরা মনীষাসম্পন্ন, বেদান্ত-আন্দোলনে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ। এ আন্দোলন কখনও গণ-আন্দোলন হ'তে পারে না। তাই বলা যায়—যুক্তরাষ্ট্রে এ আন্দোলন আনুভূমিকভাবে (horizontally) নয়, ঊর্ধ্বাধ ভাবে (vertically) ছড়িয়ে পড়ছে; অর্থাৎ আমেরিকার জনগণকে না হলেও

সেখানকার চিন্তাশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষকে প্রভাবিত করছে।

আমি বিশেষভাবে বিস্মিত হয়েছি—কয়েকটি বেদান্ত-কেন্দ্রের মার্কিন অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ভক্তি আগ্রহ এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা দেখে। এই শ্রদ্ধার অংশমাত্র যদি আমাদের থাকত! আমেরিকা যাবার আগে আমার ধারণা ছিল—দীর্ঘকাল আমেরিকা-বাসের ফলে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হ'য়ে গেছেন এবং যখন তাঁদের সাহেবী পোষাক-পরা দেখলাম, তখন ভাবলাম আমার ধারণাই ঠিক; কিন্তু তারপর যখন তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলাম এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কইলাম তখন বুঝলাম, অনেকের মতোই আমার ধারণা কতদূর ভুল।

স্বামীজী আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত—এই ৬৬ বৎসরের বেদান্ত-আন্দোলনের একটি প্রামাণ্য সুসম্বদ্ধ বিরাট ইতিহাস লেখার সময় হয়েছে। তাতেই পাওয়া যাবে বেদান্তের বার্তা কিভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ সমাদৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, আমেরিকায় ১১টি বেদান্ত-কেন্দ্র আর্থিক দিক দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের ওপর নির্ভরশীল নয়; আমেরিকার নরনারীগণ—যাঁরা যে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই এর ব্যয়ভার বহন করেন।

কৃষ্টিগত সহযোগিতা

গত শতাব্দীর শেষ দশকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতার যে ভিত্তি স্বামীজী স্থাপন ক'রে গেছেন, আজ তা নানাদিকে নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করছে। কতকগুলি ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য ঠেকে, এবং আমি বিশ্বাস করি অনেকেরই কাছে ঐরূপ মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন:

> দূর দূর দেশেও এখানকার অনেক ভক্ত আছে, তাদের গায়ের রঙ অন্য রকম, তাদের ভাষা আলাদা।*

এই কথাগুলি কি বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথের কাছে ইঙ্গিত নয় যে তাঁকে যেতে হবে বিদেশে—সেই সব ভক্ত খুঁজে বার করতে?

কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য অনুধাবনীয়:

বিবেকানন্দ যে সব বিদেশে গিয়ে থেকেছেন তার মধ্যে আমেরিকাই প্রথম, বিদেশীদের মধ্যে আমেরিকানরাই সর্বপ্রথম স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। 'রামকৃষ্ণ প্রচারে'র প্রথম বিদেশী কেন্দ্র ৬০ বৎসর আগে নিউইয়র্কেই স্থাপিত হয়েছে, স্বামীজীর একজন আমেরিকান শিষ্যার (মিসেস ওলি বুল) অর্থানুকূল্যেই বেলুড়ের প্রথম মঠ ও মন্দির স্থাপিত হয়। আবার বোষ্টনের দুজন ভক্ত মহিলা বেলুড়ের বিরাট মন্দিরের ব্যয়ভারের অধিকাংশ বহন করেন। স্যানফ্রান্সিস্কোর নূতন হিন্দু মন্দিরও (গত অক্টোবরে যার উদ্বোধন হয়েছে) আমেরিকার টাকাতেই নির্মিত। সর্বশেষ একজন আমেরিকান মহিলাই স্বামীজীর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন।

পূর্বেই বলেছি বিবেকানন্দ ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রথম কৃষ্টি-প্রতিনিধি। তাঁর পর বহু বিখ্যাত ভারতবাসী আমেরিকা গিয়েছেন, এবং বহু খ্যাতনামা আমেরিকান ভারতে এসেছেন। যদিও গান্ধীজী কখনও আমেরিকা যাননি, তথাপি আমেরিকা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে এবং 'ভারতের লিংকন' ব'লে মনে করে।

* এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছেন: তিনি (ঠাকুর) বলতেন,..............তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০)

এ-সব সত্ত্বেও যদি যুক্তরাষ্ট্রে ভারত সম্বন্ধে এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রভূত অজ্ঞতার আবরণ থাকে, তাহলে উভয় দেশের মানুষের কর্তব্য—পরস্পরের কৃষ্টি ও চিন্তাধারা বোঝবার আরও ব্যাপক চেষ্টা করা। এরূপ করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এমন অনেক কিছু আছে যা উভয় দেশেই এক প্রকার। আমেরিকা পাশ্চাত্যে বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ, আর ভারত শুধু প্রাচ্যে কেন—পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমেরিকায় বিভিন্ন জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের সমাবেশ, ভারতের মহাজাতিও গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র সম্প্রদায়ের ও ভাবের সমন্বয়ে। সমাজে, ব্যক্তি-জীবনে ও চিন্তাধারায় আমেরিকা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ; ভারতও তাই। আর আমেরিকানরা ভারতবাসীর মতো প্রাণখোলা এবং আদর্শবাদী, হৃদয়হীন আচারনিষ্ঠার ওপর উভয়ের কারুরই শ্রদ্ধা নেই।

এই যদি উভয় দেশের মানুষের মানসিক গঠন হয়, তবে এই দুই দেশের মানুষের মধ্যে অধিকতর কৃষ্টিগত সহযোগিতার ফলে শুধু যে এই দুই দেশেরই মঙ্গল হবে তা নয়, প্রকারান্তরে এ প্রচেষ্টা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের কারণ হবে।

স্মরণিকা

শ্রীদেবাশিস্ বাগচী

দীর্ঘ বছরের ব্যবধান
তোমার আমার মাঝে।
দেশের হিতের কাজে
জীবনের ব্রতশেষে করিলে প্রয়াণ
অমৃত আনন্দ-দেশে।
অবশেষে
কেটে গেছে অনেক বছর,
আমরা এসেছি পৃথিবীতে,
তোমারে দেখিনি তবু, হে সন্ন্যাসিবর
আজিকার দিনে চাই তোমারেই পেতে।
৪ঠা জুলাই,
উনিশ শ' দুই—
ইন্দ্রপতনে স্তব্ধ সবার অন্তর,
অশ্রুভারে অবনত অতীব কাতর।
তোমার বিচ্ছেদে সব শূন্য দেখেছিল
ভারতের ভবিষ্যৎ ক্ষণেকের তরে,
'আনন্দ'বিহীন বিশ্ব অসম্ভব ছিল—
'বিবেকে'র প্রেরণায় জাগিছে মানুষ আজ
প্রতি ঘরে ঘরে।
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' ;
কে তুমি মহান্ প্রাণ শুনাইলে সে বাণী শাশ্বত,
জাগালে বিশ্বের লোকে—
প্রেমের বর্তিকালোকে ?

জীবন্মৃত মানুষেরে মুক্ত করিবারে
কে বলিলে 'ওঠ, জাগ, জানো আপনারে' ?
সকল জীবের মাঝে আত্মা বিরাজিত,
মানুষের সব কাজ আত্মশক্তি-কৃত !
নরেন্দ্র নরেন্দ্রনাথ সত্যতত্ত্বজ্ঞানী—
খুঁজিয়া দিলেন পথ মুক্তির সন্ধানী।

বিশ্বসভা মাঝে আজ ভারতের স্থান
সু-উচ্চে স্থাপিত হ'ল, বেড়ে গেল মান,
গুরুর আসন আজও জগতের কাছে,
স্বামীজীর হাতে গড়া—ভারতের আছে।
সবই আছে ; নাই শুধু সে অদৃশ্য হাত—
অমানিশা দূর ক'রে নূতন প্রভাত
এনেছিল এই দেশে ;
ভারত জাগিল অবশেষে।

কিন্তু, হারায়ে গিয়েছে তার পরম প্রেমিক—
কোমল বীরের প্রাণ তেজস্বী নির্ভীক।
স্বামীজী গেলেন চলি কোথা কোন্ লোকে,
ভারতেরে মগ্ন করি' ভাষাহারা শোকে ?
ঐশী আখরে ওই লেখা তাঁর নাম,
প্রতিটি হৃদয় তাঁর জ্যোতির্ময় ধাম !

কে ঘোচাবে জাতির ক্লীবতা ?

শ্রীমতী দিব্যপ্রভা ভরালী

আজো তব জন্মভূমি অজ্ঞানতা-পঙ্কে মগ্নপ্রায়
তোমারে ভুলিছে দেশবাসী ;
আজি এ দুর্যোগ দিনে ভারতের প্রাণের বেদনা
ঘুচাও আবার তুমি আসি।

ভুলিছে শাশ্বত সুর ভারতের হৃদয়-তন্ত্রীর
লক্ষ্যহারা মূক জনগণ,
অন্ধ-নীত অন্ধ সব—অন্ধকারে কে দেখাবে পথ,
কে বা দুঃখ করিবে মোচন ?

ধর্মের পরম সত্য—আদর্শ মহান্—প্রচারিবে
পুনঃ আজি এ ভারত-ধামে,
সুষুপ্ত মানব-প্রাণ জাগাইবে অমৃত আলোকে
সত্য-শিব-সুন্দরের নামে !

দূর করি দুর্বলতা অক্ষমতা ভীরুতা দীনতা
কে শোনাবে শক্তির বারতা ?
বেদান্তের বজ্রবাণী 'অভীঃ অভীঃ' উদ্‌ঘোষি আবার
কে ঘোচাবে জাতির ক্লীবতা ?

তোমার বিহনে আজি সারথিবিহীন যেন রথ,
নেতৃহীন তব দেশবাসী।
কাঁদে আজো জন্মভূমি, শোকশীর্ণা দেশ-মাতৃকার
মুছাও চোখের জল আসি !

আত্মভোলা স্বদেশবাসীরে তব জাগাও আবার
শক্তিমন্ত্র করগো প্রচার
জনসমাজের মাঝে, টুটায়ে সকল গ্লানি ভয়
নব তেজ করগো সঞ্চার

সমালোচনা

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ; প্রকাশিকা : প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আরিয়াদহ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১০৪ ; মূল্য দেড় টাকা।

স্বামী নির্বেদানন্দ-রচিত 'The Holy Mother (Sarada Devi)' শ্রীশ্রীমায়ের শত-বর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'The Great Women of India' নামক ইংরেজী গ্রন্থের শেষ অধ্যায়, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহা পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাংলা অনুবাদ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাঙালী পাঠকসমাজ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-গুলি বিভিন্ন দিক হইতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সহ নিপুণভাবে আলোচিত দেখিতে পাইবেন।

অনুবাদ সর্বত্র সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে, একথা বলিতে পারি না।

মা সারদামণি—শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক : লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪২ ; মূল্য ৮৭ নয়া পয়সা।

নব-সাক্ষরদের জন্য সহজ সরল ভাষায় লেখা শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন-কথা। বইটিতে ১৭ খানি ছবি আছে। শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর সময় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে যে মডেল প্রদর্শিত হইয়াছিল, এগুলি তাহারই আলোকচিত্র। নব-সাক্ষর বয়স্কদের পাঠের সুবিধার জন্য বইটি বড় টাইপে ছাপা হইয়াছে। সাধু ও চলিত ভাষা মাঝে মাঝে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, ইহা ভবিষ্যতে সংশোধনীয়।

*   *   *

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা :—অনুবাদক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র; দীপায়ন প্রকাশন ভবন প্রকাশিত ; পৃষ্ঠা ৯৩ ; মূল্য—দুই টাকা।

ভাব-কল্পনার আকাশে মানস-বলাকাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া নিছক 'স্বপ্নের হাতে আত্ম-সমর্পণের আকুতি' কোনদিনই কোন সত্যকার কবির উপজীব্য হইতে পারে না। মরমবীণার মূর্চ্ছনাকে শব্দ ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করিয়া পাঠকের মানসপটে ক্ষণিক আন্দোলন তুলিয়া পাঠককে কিঞ্চিৎ রসবোধের ইঙ্গিত দেওয়া—হয়ত কোন কোন কবির কাব্যসন্ধানের নিরিখ হইতে পারে; কিন্তু তাহাও বোধ হয়, কাব্য-বিচারের চরম মূল্যায়ন নয়। কিন্তু যে কবি নিজের আন্তর জগতের সূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনার তরঙ্গকে শব্দঝঙ্কারে হিল্লোলিত করিয়া 'বিশ্বের ব্যথা বহন' করেন সেই কবিই কবি। তাঁহারা তাঁহাদের চেতনার নিগূঢ় সৌন্দর্যকে সর্বমানবের ধ্যান-সম্পদে রূপায়িত করিয়া মানবমনে আনন্দলোকের বার্তা পৌছাইয়া দিতে পারেন ;—আমাদের আলোচ্য ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্‌ এইরূপ এক সার্থক কবি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত অংশ জুড়িয়াই (১৮২৯-৯২) ইনি আমেরিকায় জীবিত ছিলেন। তাঁহার লেখা Leaves of Grass, Drum Taps, Specimen Days and Collect এবং Democratic Vistas তাঁহার জীবিত কালে অনেক পাঠকের নিকট অবোধ্য শব্দ-সম্পদের সমষ্টিমাত্র মনে হইলেও তৎকালেই দার্শনিক Emerson-এর প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। আধুনিক কাব্যরসিকরা তাঁহার কাব্যে রসসম্পদের অনেক মহামূল্য বস্তু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই হুইট্‌ম্যান্‌ যে একজন সর্বমানবের চিরন্তনের কবি—এই প্রতিশ্রুতি আজ সর্বজনবিদিত।

এই মহান কবির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বকীয়তায় বাংলা অনুবাদ করিয়া নিঃসংশয়ে বাংলা কাব্যভাণ্ডারে এক স্মরণযোগ্য সংযোজন করিয়াছেন। অনুবাদকের কবি-মনের সুরস্পন্দনে হুইটম্যানের কাব্যসুষমার মূল সুরটিও চমৎকার ধরা পড়িয়াছে। ফলে এই অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া আমরা হুইট-ম্যানের কবিমানসের যথার্থ রূপটিকে আমাদের নিকট অবারিত দেখিতে পাই। উদাহরণ-স্বরূপ দুই-চারিটি উদ্ধৃতির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেছি :

"এই যে ভাবনা এ শুধু আমার একার নয়,
নয় আমার নিজস্ব
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ যা ভেবেছে
এ হ'ল তাই।" (পৃঃ১)

"আজ যা কাদার ডেলা, তাই হবে
প্রেমিক আর প্রদীপ আমি জানি।" (পৃঃ২)

"অনন্ত পর্যটনের আমি পথিক—
বর্ষাতি, আর মজবুত জুতো আর কাঁধে একটি লাঠি
—এই আমার নিশানা।" (পৃঃ ৬)

"যা হওয়া উচিত ছিল
সমস্ত অতীত ঠিক তাই—এই আমার ঘোষণা।"
(পৃঃ ২২)

"শক্তি আর সাহস চিরজয়ী,
যা জীবনকে জয়ী করে তাই করে মরণকে।"
(পৃঃ ২৯)

"পাল তোলো,
সমুদ্র যেখানে গভীর
চলো সেই অতলতায়
বেহিসাবী বেপরোয়া হে হৃদয়,
তোমার সঙ্গে আমিও মাতি
আবিষ্কারের নেশায়।" (পৃঃ ৬৪)

"এসো মধুর মৃত্যু
এসো সান্ত্বনা
আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও
* * *
অকম্পিত পদে তুমি এসো
যখন সময় হবে আমার।" (পৃঃ ৯৩)

এই সুন্দর অনুবাদগুলিকে আস্বাদন করিয়া আমাদের বাঙালী কাব্যপিয়াসীদের হুইট্ম্যান্-তৃষ্ণা বর্ধিত হইলে তাঁহারা নিশ্চয় মূলের সন্ধানে ছুটিবেন। পুস্তকটিতে দুই চারিটি মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়িল। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে তাহার সংস্কার সাধিত হইবে। পুস্তকটির কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর; বোর্ডবাঁধাই প্রচ্ছদপটে হুইটম্যানের একটি ভাবমূলক রেখাচিত্র পুস্তকটির গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। **—মহানন্দ**

নবনীত (হিন্দী ডাইজেষ্ট)—শ্রীরতনলাল জোশী কর্তৃক নবনীত প্রকাশন লিমিটেড, ৩৪২ তারদেব, বোম্বাই-৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲।

হিন্দী প্রকাশনের ক্ষেত্র অভাবনীয় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইহা হিন্দী-প্রেমিক ব্যক্তি-গণের নিকট কেবলমাত্র আনন্দদায়ক নয়, সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য-প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেও ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।

আলোচ্য 'নবনীত' ইংরেজী Reador's Digest-এর অনুকরণে পরিকল্পিত। মুখ্যতঃ সমসাময়িক হিন্দী লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজী, বাংলা, তামিল, উর্দু, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা হইতেও প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। অবশ্য অহিন্দী প্রত্যেক রচনাই হিন্দীতে অনূদিত। রবীন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী রাজ-গোপালাচারী, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, মুল্করাজ আনন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কে. এম. পানিক্কর, খাজা আহমদ আব্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যেকের লেখায় ইহা সমৃদ্ধ। অনুবাদগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। অসংখ্য রেখাচিত্রশোভিত সুমুদ্রিত 'নবনীতে'র দীপাবলী বিশেষাঙ্ককে অভিনন্দিত করি।

—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বার্ষিক সভা

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৫০তম বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী পঠিত হয়।

১৯৫৮ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

আলোচ্য বৎসরে পূর্ব পাকিস্তান ব্যতীত মিশনের প্রায় সকল কেন্দ্রেই উন্নতি লক্ষিত হয়।

নূতন ভবন বা বিভাগ উদ্বোধন

কনখল সেবাশ্রমে এক্স-রে ও ফিজিওথেরাপি বিভাগ খোলা হইয়াছে (জানুআরি), আসানসোল আশ্রমে এবং নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে বহুমুখী বিদ্যালয়-ভবনের উদ্বোধন (জানু), রহড়া আশ্রমে নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (জানু), জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (জুন), শিলং আশ্রমে বিদ্যার্থি ভবন (ফেব্রু), কামারপুকুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়-ভবন (এপ্রিল), চণ্ডীগড় আশ্রম নূতন নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত (মে), রাঁচি আশ্রমে নূতন গ্রন্থাগার-ভবন (জুন), বেলঘরিয়ায় ইঞ্জিনিয়রিং স্কুলের প্রধান ভবন (জুন), সারদাপীঠ বেলুড়—ইঞ্জিনিয়রিং স্কুলে বৃহৎ ছাত্রাবাস (জুলাই), শিক্ষকশিক্ষণ কলেজ (জুলাই), গ্রন্থাগার (অক্টোবর), এলাহাবাদ আশ্রমে নূতন গ্রন্থাগার-ভবন (অক্টোবর), নরেন্দ্রপুরে কলেজের ছেলেদের জন্য দ্বিতল ছাত্রাবাস (ডিসেম্বর), মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয় এসেম্ব্লি হল (ডিসেম্বর), ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একটি নূতন বিদ্যালয়-ভবন (অক্টোবর)।

নূতন কেন্দ্র

ডিসেম্বরে দক্ষিণ ভারতের একটি উন্নতিশীল কেন্দ্র—'শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনম্' মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সদস্যসংখ্যা

১৯৫৮ খৃঃ মিশন ৭ জন সন্ন্যাসী সদস্য হারাইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম : স্বামী নির্বেদানন্দ। বর্ষশেষে মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬২৬—তন্মধ্যে সাধু ৩০৬, ভক্ত ৩২০।

কেন্দ্রসংখ্যা

বেলুড়ের মূলকেন্দ্র ধরিয়া ডিসেম্বর মাসে মিশনের মোট কেন্দ্রসংখ্যা ছিল ৭৩; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২ ; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া; বাকী ৫৯টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য হিসাবে : পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে ৯, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২ ; দিল্লী, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া।*

কার্যবিভাগ

মিশনের কাজকর্ম মোটামুটি পাঁচটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ : (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ : ১৯৫৮ খৃঃ ভারতে কোন রিলিফের প্রয়োজন হয় নাই। সিংহলে ব্যাটিক্যালোয়া জেলায় দুইমাস বন্যার্তদের ও কলম্বো শহরে ১০দিন দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য করা হয়। এজন্য মোট ব্যয় হয় ১২,০০০ টাকা।

(২) চিকিৎসা : ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্মনির্বিশেষে রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—কাশী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুনের সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা-হাসপাতাল এবং কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে।

* [মঠ-কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।]

১৯৫৮ খৃঃ মিশনের তত্ত্বাবধানে ৯টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে ২২,৫৫০ জন রোগী ছিল, এবং ৫১টি বহির্বিভাগীয় হাসপাতালে ২৩,৬৬,৯৪৪ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়।

(৩) **শিক্ষা** : মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ ও	১,৭৮০	
„ (আবাসিক)	বেলুড়		
বি. টি কলেজ,	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	১৪১	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ	কোয়েম্বাতুর ও সরিষা (ছাত্রী)	১২৬	
জুনিয়র „ „	রহড়া ও সারগাছি	১০০	
শারীর শিক্ষা „	কোয়েম্বাতুর	৮৫	
গ্রামীণ „ „	„	১০৩	
সমাজশিক্ষ-শিক্ষণ কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	১৫২	
কৃষিশিক্ষণ কেন্দ্র	„	১৬	
ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল	„ বেলুড় ও বেলঘরিয়া	১,১৪৫	
জুনিয়র শিল্পবিদ্যালয়		৪৯২	১২৭
ছাত্রনিবাস (অনাথাশ্রমসহ)	৫৬	৩,৪৬০	৪৪৪
চতুষ্পাঠী	২	৩১	
সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র	৫	২০৯	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১০	২,৭২৬	৮১৭
মাধ্যমিক „	২৭	৯,৫৩৮	৪,৩৫৯
সিনিয়র বেসিক „	৭	৫৮৪	৫৪২
জুনিয়র „ „	১৫	১,৮৭২	৫৭২
নিম্নশ্রেণীর „ „	৯৭	১৫,০৮১	৮,৪৬০

ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ৩৪,৬৭২ ছাত্র ও ১৫,২৮১ ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, মাদ্রাজ, বেলুড়, রহড়া, সরিষা, মেদিনীপুর, আসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্পারাইতুরাই এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাসগুলি মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কার্যের নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে এবং রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা ছিল।

(৪) **সাহায্য** : বেলুড় মঠ হইতে প্রদত্ত

সাহায্য :	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	৯৩	২০১	৪
সাময়িক :	২৭২	৭৫	

এজন্য মোট ব্যয়িত হয় প্রায় ২২,১৬৩ টাকা। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য প্রদত্ত হয় তাহার পরিমাণ ৩,২১০ টাকা।

(৫) **কৃষ্টি ও ধর্ম** : পূর্বের মতো মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনাসভা, ক্লাস, প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

*　　*　　*

বার্ষিক সভার অন্যান্য কার্য শেষ হইলে সভাপতি মহারাজ বলেন :

ঠাকুর এসেছিলেন বিশেষভাবে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্যে। কি দেখে দেশের লোক শিখবে? কে দেশকে গড়বে? আজ আমাদের 'মা' চাই। মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, চাকরী করছে; কিন্তু দেশের শিক্ষা কোন্ দিকে যাচ্ছে? হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে, মস্তিষ্কের চর্চা যথেষ্ট হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে মেয়েরা নিজেদের তৈরী করুক, দেশের ছেলেমেয়েদের তৈরী করুক। মেয়েরাই পারবে হাইড্রোজেন বোমার শক্তি প্রতিরোধ করতে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ৬ই পৌষ, (২২. ১২. ৫৯) মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১০৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে দিবসব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। উষাকালে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী : কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাটী (১নং উদ্বোধন লেন) ভক্তদের নিকট শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী নামে পরিচিত সেই বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভজন, আরাত্রিক প্রভৃতির মাধ্যমে মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়।

শত শত ভক্ত জগজ্জননীর শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। প্রায় ৯০০ নরনারী বসিয়া এবং ৫০০ জন হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির সময় এবং পরেও বহু ভক্তের সমাগম হয়।

ফরিদপুর : গত ২২শে ডিসেম্বর আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারতি ভজন, দ্বিপ্রহরে বিশেষ পূজা হোম ও চণ্ডীপাঠ, বৈকালে মহিলাসভা, সন্ধ্যায় ভজন ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীবৃন্দ ভজন ও স্তোত্র পাঠ করে। আনুমানিক ২০০০ মহিলা প্রসাদ ধারণ করেন।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী : যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তগণকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্য-স্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন প্রাতে ভজন-সঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম ও কালী-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১২ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্বামী বোধাত্মানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার পর ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সুন্দরানন্দ, ডক্টর কালিদাস নাগ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (হিন্দীতে) এবং সভাপতি স্বামী তেজসানন্দ। রাত্রে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 'কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে লীলা-কীর্তন করেন।

২রা জানুআরি সন্ধ্যায় আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া স্বামী ওঁকারানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যা করেন, যথাস্থানে কথামৃতে উল্লিখিত সঙ্গীতগুলি গীত হয়। রাত্রে কালীকীর্তন হইয়াছিল। ৩রা জানুআরি পূর্বাহ্নে স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক গীতা ব্যাখ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যলীলা (সাধনা) অবলম্বনে পাঁচালি-সম্বলিত লীলা-কীর্তন হয়। অপরাহ্নে ও রাত্রে হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই (নীলাচল-লীলা) কীর্তনাভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগমে দিবসত্রয় কল্পতরু-লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটী আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

কাঁকুড়গাছি : যোগোদ্যানেও পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন এবং প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধন : শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১৯শে পৌষ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের সুবৃহৎ প্রতিকৃতিখানি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে পার্শ্ববর্তী নবনির্মিত ভবনকক্ষে সজ্জিত করা হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনী ও রচনা হইতে পাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও ভজনের পর প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

মেদিনীপুর : রামকৃষ্ণ মিশনের দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ২রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে যুগোপযোগী আদর্শ সুষ্ঠুভাবে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ, মহিলা কলেজ, মেদিনীপুর কলেজে ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে চারিটি ভাষণ দেন। স্বামীজীর আদর্শে পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের শ্রেষ্ঠ বাহনরূপে শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে তিনি আহ্বান জানান এবং এই প্রাচীন দেশের শক্তির উৎস যে ধর্ম, তাহাকে বরণ করিয়া আদর্শ নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিবার পথের সন্ধান দেন। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে 'আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও মানবধর্মে'র তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজার বিরাট আড়ম্বরে এবং তীব্র কোলাহলে শান্তসমাহিত মনে অন্তরতমের সাধনা যেন বিঘ্নিত হয়, ধর্ম যেন আচারসর্বস্ব হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ অনুধ্যান দ্বারা এ যুগে সত্যধর্মের সন্ধান করিতে হইবে।

সেবাকার্য

মনসাদ্বীপ : বাংলা দেশের অন্যান্য বহু স্থানের মতো সাগরদ্বীপও এবার অতিবৃষ্টির জন্য অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়াছে। এখানে বন্যা না হইলেও চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এবং জানুআরির প্রথম সপ্তাহে বেলুড় হইতে প্রেরিত ৫০০ বস্ত্রাদি (ধুতি শাড়ী ও কম্বল) স্থানীয় মিশন কেন্দ্র কর্তৃক তিনটি ইউনিয়নে (ধবলাট, বেগুয়াখালি, মনসাদ্বীপ ২য়) প্রায় ৫০০ পরিবারের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহা ছাড়া UNICEF প্রেরিত ১২৫ প্যাকেট গুঁড়া দুধ চারটি ইউনিয়নে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে।

সমাজশিক্ষা দিবস

সরিষা : গত ১লা ডিসেম্বর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্যসূচীর মাধ্যমে সরিষায় সমাজশিক্ষা দিবস উদ্‌যাপিত হয় : পতাকা তোলা, গ্রাম পরিষ্কার করা, সাক্ষর বয়স্কদের সই যোগাড় করা, জনশিক্ষা-প্রদর্শনী, মহিলাদের জন্য মিলনী সভা। উৎসবের পূর্বদিন সমবেত-কণ্ঠে গান গাহিয়া গ্রামে গ্রামে যাওয়া হয়, এবং শেষ দিন (২রা) অপরাহ্ণেও জনশিক্ষা-প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

নরেন্দ্রপুর :—গত ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানের সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রে সমাজশিক্ষা দিবস পরিপালিত হয়। মূল কেন্দ্রের পরিচালনায় বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মিগণ সমবেত হইয়া গান, আবৃত্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি দেখান। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় সমাজশিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন কয়েকজন সমাজকর্মী।

জাপানী কনসালের মিঃ কে সুচিরো জাপানের সমাজব্যবস্থার কথা বলেন। পরিশেষে

একাঙ্ক নাটিকা 'বারোয়ারী পূজা' সকলের মনোরঞ্জন করে। ১৯শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাজশিক্ষা কর্মসূচীতে 'গ্রামবাসীদের সহযোগিতার সমস্যা' বিষয়ক আলোচনা হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্কো: প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব ভাষণগৃহে বেদান্ত ও ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়; স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

সেপ্টেম্বর: কর্ম, পুনর্জন্ম ও অনন্ত জীবন; ঈশ্বর আছেন, তার প্রমাণ; আন্তর যোগ; আমরা বাঁচি না, মরিও না। অদ্বৈতবাদ দর্শন ও ধর্ম।

অক্টোবর: কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং; (নূতন মন্দির উদ্বোধন); ভারাক্রান্ত যারা, সকলে এস; যে সাধুদের দেখেছি; ঈশ্বরকে খুঁজিও না, প্রত্যক্ষ কর; শব্দ প্রতীক ও যোগাভ্যাস।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

দক্ষিণেশ্বর: গত ৬ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীসারদামঠে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্তপাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং বালিকাগণ কর্তৃক গীত মাতৃসঙ্গীত একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা ৮টা হইতে ভক্ত-সমাগম আরম্ভ হয়। মঠপ্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত মাতৃসঙ্গীত দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করে, ইহার পর প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সুন্দর ও সরল ভাবে আলোচনা করেন। প্রায় ২০০০ ভক্ত মহিলা এবং শিশুকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনের পর রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কালী-কীর্তন হইয়াছিল।

মাকড়দহ (হাওড়া): গত ২৭শে ডিসেম্বর স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব নগর-কীর্তন, পূজা, প্রসাদবিতরণ, ভজন, কথামৃত-পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী সংশুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন স্বামী জীবানন্দ। প্রায় ২০০০ ভক্তের সমাগম হয়।

আঁটপুর (হুগলী): ১৮৮৬ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর (পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক বাসভূমি) ঘোষবাটীর প্রাঙ্গণে প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে 'নরেন্দ্রনাথ' আটজন গুরুভ্রাতাসহ ঈশ্বরার্থে সংসারত্যাগের সংকল্প করেন। সেইখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপিত আছে। প্রতিবৎসরের মতো এবৎসরও ২৪শে ডিসেম্বর ঐ পুণ্য-ঘটনার স্মৃতিতে ভক্তগণ সমবেত হন। বৈকালে জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ এই দিনের তাৎপর্য বিষয়ে বলেন। সন্ধ্যায় আগ্রহশীল ভক্তদের উপস্থিতিতে ধুনির সম্মুখে ঐ ঘটনার বিষয় পাঠ করা হয়।

২২শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) নিকটেই পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে পূজা পাঠ আলোচনার মাধ্যমে জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কটক : কটকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৫৫তম কল্পতরু উৎসব বাঙ্গালীসাহি পল্লীস্থ রাম-কৃষ্ণ কুটীরে গত ১লা জানুআরি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বদিনে অভিষেক-কীর্তন হয়; উৎসবের দিন পূজা, পাঠ, কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা ও অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। প্রায় ৩০০ লোকের এক সভায় স্বামী মহানন্দ ভাষণ দেন। পরের দিনও স্থানীয় আই, জি, পি-র বাস-স্থানে বিশিষ্ট জনসমাবেশে আগ্রহশীল শ্রোতাদের প্রশ্নাদির যথাযথ উত্তর দান করিয়া বক্তা আনন্দ দান করেন।

বারাসত : শিবানন্দ-ধামে গত ১০ই পৌষ এবং ১৫ই পৌষ হইতে ১৮ই পৌষ পর্যন্ত মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শুভ ১০৪তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, শিবমহিম্নঃস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, ভজন, শিবানন্দ-বাণী আলোচনা, ভাগবতপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কথকতা, ছাত্রদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, পাঁচালি-সম্বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় শিবানন্দ-জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সভাপতি), স্বামী পুণ্যানন্দ এবং মহকুমা-শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল। প্রায় ১২,০০০ নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে স্থানীয় একটি দল 'জয়দেব' যাত্রাভিনয় করে।

আমেদাবাদ : গত ১০ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অখণ্ডানন্দ হলে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে ভারতের উপ-অর্থসচিব শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের অধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসবে শ্রীমতী জয়াবেন ওঝা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের মুখ্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপ-দেশাবলী সকলকে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'সনাতন ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা' বিষয় অবলম্বনে হিন্দীতে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলেন: জঙ্গলে তপস্যা না করিয়া সংসারে সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাপন করিলে ভগবানের নিকট পৌছানো যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। মনে প্রাণে সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যের জীবনকে সুখী করিবার জন্য সতত প্রযত্ন করা উচিত। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ইহাই সহজ সরল পথ বলিয়া তাঁহারা নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আলোক ও বর্ণ: ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর সি. ভি. রামন্ আন্নামালাই নগরে ভারতীয় বিজ্ঞান আকাডেমীর বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহার সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। চক্ষু কেন ও কিভাবে বিভিন্ন রঙ দেখে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি যে নূতন তথ্য পাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই :

চক্ষুগোলকের পশ্চাতে রেটিনাতেই বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গ ধরিবার জন্য অন্ততঃ চার প্রকার উপাদান রহিয়াছে—(১) লুটিন—অপর নাম জ্যাণ্টোফিল (২) হেমোগ্লোবিন, (৩) অক্সি-হেমো-গ্লোবিন, (৪) মিথাইমো-গ্লোবিন।

প্রথমটি ও তাহার কার্য পূর্ব হইতেই জানা ছিল। অন্য তিনটি রক্তের মধ্যেই আছে, এবং রেটিনায় প্রচুর রক্ত চলাচল হয়। রক্তের এই বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোকরশ্মি আত্মসাৎ (absorb) করিয়া বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করিয়া নার্ভ-সহায়ে মস্তিষ্কে লইয়া যায়। সেখানেই

বিভিন্ন বর্ণের অনুভব হয়। বিকীরণের 'কোয়াণ্টাম থিওরি' প্রয়োগ করিয়া ডক্টর রামন্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কৃষ্টি-সংবাদ

সংস্কৃত নাটকঃ গত ২৮শে ডিসেম্বর বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্যগণ কর্তৃক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সদ্যোরচিত সংস্কৃত নাটক 'মুক্তি-সারদম্' ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর প্রযোজনায় অভিনীত হইয়াছে। সর্বপ্রথম রজনীতেই 'মুক্তি-সারদম্' নাটকের অভিনয় বাঙ্গালোরে জনসাধারণকে বিশেষ মুগ্ধ করে। নাটকের রূপসজ্জায় সহায়তা করেন মাদ্রাজের প্রখ্যাত রূপসজ্জাকার হরিপদ চন্দ্র।

২৭শে ডিসেম্বর অখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালোরে 'শক্তি-সারদম্' এবং ৩০শে ডিসেম্বর পন্দিচেরীতে 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' নামক নাটক অভিনীত হয়। উভয় নাট্যাভিনয়ই সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

মহাভারত প্রদর্শনীঃ মাটির পুতুলে 'রামায়ণ-প্রদর্শনী'র পর অনেকেই 'মহাভারত-প্রদর্শনী'র জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জাতীয় কৃষ্টি-সংঘের (National Cultural Association) উদ্যোগে শ্রীযুগল শ্রীমলের প্রচেষ্টায় এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর সহযোগে ইহা একটি সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রীরাজশেখর বসু-রচিত 'মহাভারতের সারানুবাদ' অবলম্বনে প্রথমে ১৩৭টি ঘটনা-চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরে ৩৫০০টি সুসজ্জিত মাটির পুতুলের সাহায্যে এই পুরাণ-কাহিনী জীবন্ত করা হইয়াছে। গৃহাদি পরিকল্পনায় বৌদ্ধ যুগের ছাপ সুস্পষ্ট। মাসের পর মাস ধরিয়া ৪০ জন মৃৎশিল্পী এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; মৃতপ্রায় শিল্পটিও যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের নিকট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। আবালবৃদ্ধবনিতা এই মহাভারত-প্রদর্শনী দেখিয়া ইতিহাস ও পুরাণের সহিত জীবনের শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন। কয়েকটি স্থানে ঘটনার বিকৃতি চোখে পড়িল; উদ্যোক্তাদের মতে ঐরূপ ঘটনাও কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব-সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত :

তেজপুর (আসাম), খেপুত (মেদিনীপুর), পিপড়াডি কোলিয়ারি (হাজারিবাগ)।

ভ্রমসংশোধন

গত পৌষ সংখ্যায় ৬৬৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি'র লেখকের নাম 'ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন লাহিড়ী' পড়িবেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম শুভ জন্মতিথি আগামী ৭ই মাঘ, ২১শে জানুআরি, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

৺পণ্ডিত আশুতোষ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

দীননাথঃ সদানন্দো ভ্রাজমানো স্বতেজসা।
কলিদোষ-সমাক্রান্ত-সমুদ্ধরণ-বাঞ্ছয়া ॥১

মহাশক্তিং সমাশ্রিত্য ত্বমাগতো নিজেচ্ছয়া।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং রামকৃষ্ণস্বরূপিণে ॥২

যো রামঃ স হি কৃষ্ণস্তু ত্বয্যভেদঃ প্রদৃশ্যতে।
লোকশিক্ষা-প্রদানার্থমাগতস্ত্বং মহীতলে ॥৩

করুণার্ণব ভো দেব! গৃহাণ প্রণতাঞ্জলিম্।
নাস্ত্যস্মাকং ধনং কিঞ্চিৎ তুভ্যং যদ্দীয়তে পুনঃ ॥৪

বিষ্ণবে রামকৃষ্ণায় রামকৃষ্ণায় বিষ্ণবে।
নমস্তুভ্যমভেদাত্মন্ পুনঃ পুনর্নমো নমঃ ॥৫

অহো তবায়ং মহিমা মহাত্মন্, সমগ্রলোকে সদয়া হি দৃষ্টিঃ।
রূপং তবেদং করুণার্দ্রচিত্তং রজস্তমোনাশকরং জনানাম্ ॥৬

ইচ্ছাস্মাকং তবচরণয়োঃ সন্নিপাতো মহাত্মন্,
সংসারাব্ধেস্তরণকরণং রামকৃষ্ণাখ্য দেব।
কিন্ত্বেতেষামতিগুরুতরং মানসং শক্রপক্ষং
শীঘ্রং নো ভো শময় শময় প্রার্থনা নেষ্টমন্যৎ ॥৭

হে যোগিংস্ত্বং পরমপুরুষো দৃশ্যসে সুপ্রসন্নো
নিস্পন্দং তে নয়নযুগলং পশ্যতামাশু ভক্তিম্।
সংমূঢ়ানাং জনয়তি মুহুঃ কিং পুনঃ সাত্ত্বিকানাং
স ত্বং মুক্তো নয়নপথগো রামকৃষ্ণোঽস্মীষাম্ ॥৮

হে রামকৃষ্ণ! যুক্তাত্মন্! বামাঙ্গং প্রকৃতিস্তব।
সাপি যোগবিশুদ্ধাত্মা সারদানামধারিণী ॥৯

যুবয়োর্দৃষ্টিমাত্রেণ ভক্তিরব্যভিচারিণী
জায়তে প্রার্থনাস্মাকং সাধ্বী স্যান্মানসী গতিঃ ॥১০

মাতঃ! পূজ্যা জগতি সকলৈর্ভর্তৃপাদে বসন্তী
নিত্যধ্যানা পতিগতমনাঃ শান্তশুদ্ধস্বভাবা।
ধন্যাস্মিংস্ত্বং করণনিয়মাজ্ জ্ঞায়সে দেবতৈব
আদ্যা মাতা জনহিতকরী রামকৃষ্ণেণ সার্ধম্॥১১
রচিতমাশুতোষেণ শ্রীমতা ভক্তিসাধকম্।
সংখ্যৈকাদশমাত্রেণ শ্লোকস্তোত্রমিদং স্মৃতম্॥১২

বঙ্গানুবাদ

(হে রামকৃষ্ণ!) তুমি দীননাথ, সদানন্দময়, কলিযুগের বহুদোষ সমাক্রান্ত মানবগণের উদ্ধারেচ্ছায় স্বকীয় তেজে বিরাজমান।১

তুমি মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় আসিয়াছ, হে গুরুদেব! রামকৃষ্ণ-রূপধারী তোমাকে প্রণাম করি।২

যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ—এই রাম ও কৃষ্ণের অভেদ তোমাতেই দেখা যায়, তুমি লোকশিক্ষার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।৩

হে দয়ার সাগর দেব! এই প্রণতগণের অঞ্জলি গ্রহণ কর; আমাদের অন্য কোন ধন নাই যাহা তোমাকে দিতে পারি।৪

তুমি বিষ্ণুস্বরূপ রামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণু, অতএব হে অভিন্নস্বরূপ! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি।৫

হে মহাত্মন্! আশ্চর্য তোমার মহিমা, সমগ্র জগতের প্রতি তুমি করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ। তোমার দয়ার্দ্র চিত্ত সকল লোকের রজোগুণ ও তমোগুণ নাশ করিতেছে।৬

হে মহাত্মন্! হে রামকৃষ্ণ! ইচ্ছা হয় তোমার চরণযুগলে পতিত হই; তোমার চরণে পতিত হওয়াই আমাদের সংসারসাগর পার হইবার হেতু। কিন্তু আমাদের চিত্তে কামক্রোধাদি গুরুতর শত্রুপক্ষ বাস করে, ইহাদিগকে শীঘ্র ধ্বংস কর, অন্য কিছু চাই না—এইমাত্র প্রার্থনা।৭

হে যোগারূঢ়! তোমাকে পরমপুরুষ ও আনন্দময় রূপে দেখি, আমরা মোহাচ্ছন্ন হইলেও তোমার নিশ্চল নেত্রদ্বয় দর্শনে আমাদের ভক্তিভাব জন্মাইতেছে! সাত্ত্বিকগণের আর কথা কি? মায়ামুক্ত তুমি, আমাদের নয়নগোচর হইতেছ।৮

হে যোগিন্ রামকৃষ্ণ! বামাঙ্গে তোমার প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিদেবীও সারদা-নামধারিণী হইয়া যোগ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তা হইয়াছেন।৯

তোমাদের উভয়ের দৃষ্টিমাত্রে ঐকান্তিকী ভক্তি হইতেছে। প্রার্থনা—আমাদের চিত্তের গতি সাধু হোক।১০

হে জননি! তুমি স্বামীর চরণসমীপে বাস করিয়া জগতে সকলের পূজনীয়া হইতেছ, তুমি সর্বদা ধ্যানযুক্তা, পতিগতপ্রাণা এবং নির্মল শান্তিযুক্তস্বভাবা, তুমি ইন্দ্রিয়সংযমহেতু এ জগতে ধন্যা হইয়া দেব রামকৃষ্ণের সহিত জনহিতকারিণী আদ্যাশক্তি দেবতারূপে পরিচিত হইতেছ।১১

শ্রীমান্ আশুতোষ কর্তৃক বিরচিত এই ভক্তি-উৎপাদক একাদশসংখ্যক শ্লোকাত্মক স্তোত্র সমাপ্ত হইল।১২

কথাপ্রসঙ্গে

বিশ্বধর্ম, না বিশ্বজনীন ধর্ম ?

আজকাল মানুষের মনে নূতন করিয়া ধর্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসা জাগিতেছে। ধর্মবিষয়ক সভা সমিতির সংখ্যা বাড়িতেছে; সাময়িক সম্মেলনে, সাপ্তাহিক বৈঠকে বা দৈনিক প্রবচনে—কোথাও শ্রোতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। যতই আমরা এ যুগকে জড়বাদী ভোগবাদী বলিয়া গালি দিই না কেন, এ যুগের মানুষ প্রচলিত ধর্মগুলিকে যেরূপ বিচার করিয়া দেখিতে চাহিতেছে, ধর্মের প্রকৃত রহস্য ও তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মন লইয়া জানিতে চাহিতেছে, এত ব্যাপকভাবে এরূপ কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাজনৈতিক নেতারাও আজকাল স্বীকার করিতেছেন, ধর্মের ভিত্তিতেই স্থায়ী কল্যাণকর সমাজগঠন সম্ভব। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।

মানুষের মতামতের 'পেণ্ডুলাম' যে আজ ধর্মের দিকে ঝুঁকিতেছে তাহার প্রধান কারণ—তাহার মনের অশান্তি, জীবনের অনিশ্চয়তা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে, আজ বিশ্বগতভাবে তাহাই ঘটিতেছে। যতদিন শরীরে শক্তি-সামর্থ্য থাকে ততদিন মানুষ পুরুষকারের উপর বিশ্বাসী থাকিয়া দৈব কোন শক্তিকে মানিতে চায় না, কিন্তু জীবন যতই অগ্রসর হয়, অনেক আপ্রাণ চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, শক্তি-সামর্থ্য পরাক্রমের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করিয়া যখন অস্তাচলের দিকে চলিতে থাকে, তখন মানুষ স্বীকার করে—পুরুষকার ভিন্ন আরও একটি শক্তি আছে, যাহার উপর তাহার কোনই হাত নাই, বরং সেই শক্তিই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। গত দুই মহাযুদ্ধের পর আণবিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ মানুষকে আজ এইরূপই এক দুর্বল অসহায় অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। একই সঙ্গে দেখা দিয়াছে শিল্পযুগের অবশ্যম্ভাবী বিভীষিকা—শ্রেণীসংগ্রাম।

গ্রামীণ শান্ত সভ্যতা গিয়াছে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস টলিয়াছে। মানুষ আজ বিপন্ন, বিভ্রান্ত। ইওরোপের রেনেসাঁ-যুগ শিল্প ও বিজ্ঞানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়া যুক্তির রাজপথে তাহাকে ধর্ম-বিশ্বাস হইতে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছিল, আজ তাহা এক আত্মঘাতী সভ্যতায় (যদি ইহাকে সভ্যতাই বলিতে হয়) পর্যবসিত!

আজ যেন মানুষের নিঃশ্বাস রুদ্ধ; যাহারা পরিত্রাতায় বিশ্বাসী, তাহারা একজন পরিত্রাতার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে। যাহারা অবতারে বিশ্বাসী তাহারা মনে করিতেছে, এইবার বোধ হয় পরবর্তী অবতারের আবির্ভাবকাল সমাগত! যদি এখন না হয়—তবে আর কবে সেই মঙ্গলময় শক্তি আবির্ভূত হইয়া মানবের দুঃখ কষ্ট দূর করিবেন?

* * *

ধর্ম-জগতের আলোড়ন তিনটি স্তরে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম দেখা দেন সংস্কারকগণ, তাঁহারা পুরাতন ঐতিহ্যকেই বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী করিয়া চান এক বিরাট পরিবর্তন, চান এক নূতন নিয়ম; কিন্তু প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে সমাজে দেখা দেন আর একদল মানুষ, যাঁহারা পুরাতনকে ভালবাসেন; ম্রিয়মাণ পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করাই তাঁহাদের জীবন-ব্রত, তাঁহারা বহিরাগত নূতন সব কিছু বর্জন করিয়া পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই ভাসিতে বা ডুবিতে চান।

প্রকৃত বিবর্তন আসে তৃতীয় আর এক প্রকার বিপ্লবী মানবের মাধ্যমে, তাঁহারাই যুগের

চাকা ঘুরাইয়া দেন। অনুভূতির শক্ত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া অতীত-বর্তমান নূতন-পুরাতন সব কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান! তাঁহাদেরই জীবনালোকে যুগযুগান্তরের অন্ধতমিস্রা কাটিয়া যায়, তাঁহাদেরই চিন্তাধারায় ও ভাবের প্লাবনে জনমানসে যে পলি পড়ে, তাহারই উপর পরবর্তী যুগের সমৃদ্ধ ফসল ফলিয়া উঠে!

এইরূপ একটি যুগান্তকারী ঘটনা—ঘটিবে নয়, ঘটিয়া গিয়াছে! ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হইতেছে, কালের যবনিকা যতই উঠিতেছে—ততই দেখা যাইতেছে ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চে বর্তমান মানব-মনের প্রশ্নের উত্তরগুলি যেন সাজানো রহিয়াছে! এ যুগের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান কে যেন পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছে! আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বলিতেছি। তিনিই তাঁহার জীবনে সকল ধর্মের সত্যতা অনুভব করিয়া উদারতম ধর্মবোধের এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

নব যুগের প্রবর্তন করিতে হইলেই যে একটি নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিতে হইবে, তাহা নয়; বর্তমানে তাহার কোন প্রয়োজনই নাই। বরং বহু বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে বিভ্রান্ত মানব আজ জানিতে চায়—ধর্ম বলিতে ঠিক কি বুঝায়? এতগুলি ধর্ম কেন? সব ধর্মই কি সত্য? বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম কোন্‌টি?

তাত্ত্বিক আলোচনায় (theoretical disscussion) নয়—অনুভূতির স্পর্শেই মানুষ সংশয়শূন্য হয়, তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলিয়া যায়, তাহার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি কাটিয়া যায়, তাহার জীবনে দেখা দেয় স্থায়ী পরিবর্তন। প্রচারকদের বিবিধ যন্ত্রে অবশ্যই ঘোষিত হইতেছে: আমার শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই প্রকৃত ধর্ম, আমার ধর্মই ঈশ্বরাভিপ্রেত, আমার ধর্মই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ। আমার ধর্মই এ যুগের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ধর্ম, আমার ধর্মই বিশ্বধর্ম! এই ধর্মেই বিশ্বশান্তি!

অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মিলিল—কিন্তু একটির তো মিলিল না, সেই একটির অভাবই মেঘের মতো সারা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া সব কিছু কালো করিয়া দেয়। 'এতগুলি ধর্মমত কেন?'—এ প্রশ্নের উত্তর কই?

ধর্মমাত্রই যদি ঈশ্বরানুপ্রেরিত হয় এবং ঈশ্বর যদি এক হন, তবে ধর্মে ধর্মে এত বিভিন্নতা কেন, বিরোধ কেন?

দেখা যাইতেছে আজিকার যুক্তিবাদী মানব পুরাণ-কল্পিত বা কোন ব্যক্তি-নামাঙ্কিত ধর্মে নির্ভর করিতে পারিতেছে না, গালভরা-নামের 'বিশ্বধর্মে'ও (World religion) সে সন্তুষ্ট নয়। সে চায় বিরোধের সমন্বয়, সে চায় এক বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal religion)।

তথাকথিত বিশ্বধর্ম বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বজনীন ধর্ম বিশ্বপ্লাবী। বিশ্বধর্ম যতই বিরাট হউক, উহা বিরোধের বীজ বপন করে; বিশ্বজনীন ধর্ম বিরোধের অবসান—প্রকৃত শান্তির আশ্রয়! বিশ্বধর্ম বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, দাম্ভিক সম্রাটের মতো উহা অন্যান্য ধর্মকে দুর্বল ও হীন মনে করিয়া, এমন কি অধর্ম মনে করিয়া তাহাদের নির্মূল করিতে চায়। 'বিশ্বধর্ম' যুযুৎসু জিগীষু, প্রচারশীল প্রতিযোগিতাপরায়ণ, কখনও বা জিঘাংসাপরায়ণ। বিশ্বজনীন ধর্ম হিমালয়ের মতো স্বমহিমায় বিরাজমান, সকল ধর্ম শত শত তুষারশৃঙ্গের মতো তাহারই মহিমা প্রকাশিত করে, প্রতিফলিত করে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম প্রচারের উপর নির্ভর করে না, ইহা চিরদিন ছিল, আছে ও থাকিবে; তবে ইহা বোধের অপেক্ষা রাখে। এই বিশ্বজনীন ধর্ম বুঝিতে পারিলেই ধর্মবিরোধ তিরোহিত হয়; ইহাই চিরন্তন মানব ধর্ম—সর্বধর্মের উৎস-মুখ, ইহাই সনাতন ধর্ম—সর্বধর্মের মিলনভূমি।

* * *

বর্তমান গণতান্ত্রিক মানব-মন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন বিশ্বধর্মগুলিতে সন্তুষ্ট নয়। উহাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নাই, ঐগুলি কোন কেন্দ্রীভূত শাসনযন্ত্রের বা শিলীভূত (fossilised) নিয়মতন্ত্রের নির্দেশে চালিত (regimented religion)। অপরপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিটি মানবের নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনা অনুযায়ী আন্তর বিকাশের ধর্ম।

বিশ্বজনীন ধর্ম শুধু সংগঠিত (organised) এবং দিব্যভাবে প্রকাশিত (revealed religions) কয়েকটি ধর্মকে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নয়; এ যুগের বিশ্বজনীন ধর্মের প্রধান প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন, আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যে দিন দেখিব প্রত্যেকটি মানুষের ধর্ম পৃথক পৃথক! ইহারই নাম ধর্ম-স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতাই বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন। ধর্ম-ব্যাপারে ভারতে এই স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই এখানে মানুষ আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উঠিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। ধর্ম এখানে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে পঙ্গু করে নাই, এবং ধর্মচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র এখানে কখনও আধ্যাত্মিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

এই বিশ্বজনীন ধর্ম বুঝিতে হইলে সর্ব প্রথম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে। ঈশ্বর যখন সকল ধর্মের স্রষ্টা, তখন বুঝিতে হইবে—দেশকালের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন ধর্মপথ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার কোনটিই ভুল নহে, তবে সকলগুলিরই মূল্য আপেক্ষিক। যখন যেখানে যেভাবে প্রয়োজন, তখন সেখানে সেভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন সকলের পক্ষেই মঙ্গলময়, তখন সকল ধর্মেই তিনি তাঁহার শক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রিয় একটি ধর্ম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না; প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধি সম্ভব এবং উহা সাধন- ও নিষ্ঠা-সাপেক্ষ।

আজিকার এই সঙ্কটের দিনে এই প্রকার উদার ভাব একান্ত প্রয়োজন, কারণ একমাত্র এই প্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাবই মানুষকে মানুষের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করিতে পারে, বিশ্বজনীন ধর্মভাবই বিশ্বমানবের ঐক্য স্থাপন করিতে পারে, আজ মানুষ সমষ্টি-মৃত্যুর সম্মুখীন। সর্বমানবের ঐক্যবোধ ব্যতীত অন্য কিছুই আজ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

একটি মানুষকে অন্য মানুষ হইতে পৃথক করিয়াছে—প্রথম তাহার শরীরবোধ এবং শরীর-কেন্দ্রিক ছোট বড় স্বার্থ! তারপর ভাষা, জাতি, ধর্ম—সব একে একে আসিয়া প্রাচীর তুলিয়া একদল মানুষকে আর একদল হইতে হইতে পৃথক করিয়াছে। কিন্তু চীনের প্রাচীরের যুগ কাটিয়া গিয়াছে; হিমালয়ের প্রাচীরও আজ ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেক্ষেত্রে এ সকল কৃত্রিম ও অকৃত্রিম প্রাচীর অস্বীকার করিয়া আজ আমাদের দাঁড়াইতে হইবে বিশ্বের প্রাঙ্গণে শুধু মানবত্বের পরিচয় লইয়া। মানুষ শুধু দেহটুকুই নয়, দেহ-মন-আত্মা-সমন্বিত পরিপূর্ণ মানুষ। নিজের প্রকৃত পরিচয় যখন আমরা পাইব, তখন কি আর আমরা পশুর মতো দন্ত প্রকাশ করিয়াই পরস্পরকে অভিবাদন করিব? না নিম্ন স্তরের কামনা-সর্বস্ব মানুষের মতো পরস্পরকে ঈর্ষাদ্বেষ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিব? আত্মার উদারভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষই প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের অধিকারী হইয়া সর্বপ্রকার ভয়শূন্য শান্তিপূর্ণ সমাজ রচনা করিতে পারে—যেখানে সকল মানুষের শুধু দেহগত অভাবই দূরীভূত হইবে না, মনের অভাবেরও পূরণ হইবে, নৈতিক বিকাশ ও আত্মার স্ফুরণ প্রতিটি মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করিবে। বিশ্বজনীন ধর্মবোধ তাহারই প্রস্তুতি।

চলার পথে

'যাত্রী'

এ পৃথিবীতে মানুষের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিষ মানুষ নিজেই। তাই সে তার সমগ্র জীবন ধরেই আশ্চর্য বস্তুর প্রাণসত্তাকে ধরবার সাধনায় থাকে ব্যাপ্ত। কত তুলনা, কত দর্শন, কত অনুভব, কত স্বপ্ন, কত আদর্শ—আজীবন তাকে এই মহা আবিষ্কারের ধ্যানে তন্ময় রাখে। তাই সে ছোটে, কথা কয়, কথা শোনে, মিতালি পাতায়; অন্যের কাছে নিজের মূল্যায়ন করতে চায়; সাধন করে, সংসার পাতায়—এমনি কত কি! এক কথায় মানুষ তার এই জীবনটাকে দিয়েই তার জীব-শরীরের আনন্দ-কেন্দ্রের অন্বেষণ চালায়। তার কাছে জীবনটার তাই অনেক দাম; তবুও জীবন একদিন তাকে ফাঁকি দিয়েই সরে পড়ে!

পদ্মপাতায় জলের ফোঁটার মতোই এ জীবনের স্থিতি; ছুঁচের মাথায় সরষের অবস্থিতির মতোই তা আবার অস্থির। অথচ এই চির-যাযাবর জীবনটাকে সুস্থির ক'রে দাঁড় করাবার জন্যই মানুষের শতেক চেষ্টা ও সহস্র আকুতি সমস্ত জীবন ধরেই—ব্যর্থতার অট্টহাস্যে উতরোল হ'য়ে ফেটে পড়ছে। যা খোঁজার জন্য সে একদিন জীবন আরম্ভ করেছিল, সে খোঁজা শেষ না করেই সে চলে যায় জীবনান্তরে।

তা ব'লে জীবনটা কি শুধু ফাঁকি দিয়েই তৈরী?—এইটেই কি ভাবতে হবে? মনের সাগরের এই ব্যর্থ ঢেউ গোনা কি কোনদিনও শেষ হবে না? তা কে বলেছে? জীবনে সত্যকার রূপ বুঝতে হ'লে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে গেলে যেটি থাকে, সেটি বুঝতে হবে। সেইটি উপলব্ধি করতে পারলেই—সৃষ্টি পূর্বের সেই 'সৎ'কে—অর্থাৎ যা জন্মায়নি, যা মরে না, যা আছে—এবং যা আছে বলেই সকলে আছি—তাকে বুঝতে পারবো। এবং এই বুঝতে পারাটাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা— পরাবিদ্যা। 'সৎ'কে জানাই পরাবিদ্যা। সেই সৎ-ই চিৎ, সত্যই চৈতন্যময়, জ্ঞানময়।

কথাটায় হেঁয়ালি এসে গেল। কিন্তু ভাষার সাহায্যে যাকে বোঝানো যায় না, যা অনুভবে অনুভব করতে হয়, যা কথা-হারনোর নীরবতায় নিশ্চল থাকে, যা বিচারের ব্যাখ্যায় বিচিত্র হয় মাত্র—তাকে অন্য কি ভাবে আর বোঝাতে পারবো? তবু বলি: সেই 'সৎ' জিনিষটি আছে, এইটেই সত্য—আর সব কিছু অসত্য। তা ব'লে তা এখানে আছে বা ওখানে আছে, তাও নয়; সে দূরে আছে বা কাছে আছে, তাও নয়। জীবনের এপারে বা ওপারে সে রয়েছে, তাও বলতে পারি না, তবে তা যে সকল ভয়-শূন্যতার মাঝে অশৃঙ্খলিত অবস্থায় মুক্ত হ'য়ে অবস্থান করছে—এইটেই আমাদের পুরোগামিগণ—যাঁরা সেই 'সৎ'কে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন—বলে গেছেন।

ঐ 'সৎ' বা অনন্ত সত্তাকে বুঝতে হ'লে আমাদের বাহ্য জাগ্রৎ জীবন-বোধকে যে মেরে ফেলে তাকেই আবার স্বপনের সুরে কাছে ডাকতে হবে, তা নয়। তবে আমাদের চোখের দৃষ্টিকোণটাকে দিতে হবে বদলে। উদাহরণ দিয়ে বলি: জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে জলের চাঁদকে ধরবার জন্য নীচে তাকালে কোনদিনই চাঁদে পৌছব না, তাই উর্ধ্বে তাকিয়ে চাঁদের যথার্থ অবস্থানকে করতে হবে আবিষ্কার। সেই ঠিক ঠিক দেখার দৃষ্টি পরিবর্তন করলেই আমাদের চোখ যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। অন্যথায় ঐ ছায়া-চাঁদের পেছনে ছুটে বেড়ালে তো চিরকালই তা অধরা থেকে যাবে।

কিন্তু এই সত্যকারের ধরাটাও কি সম্ভব? এই সীমার মাঝে অসীমকে ধরা? উত্তরে বলব : হাঁ, সম্ভব, আর এইটুকু বোঝাবার জন্যইতো অবতারদের জীবন ও বাণী আমাদের সুমুখে তুলে ধরা রয়েছে। আমরা আমাদের জৈব-সমস্যার নানান জটিলতার পাঁচিল তুলে তাঁদের সেই উপলব্ধ বস্তুর আস্বাদনের সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি। কেউ বা ঐ পাঁচিলের ওপর থেকে একটু আধটু উঁকি মেরে দেখছি; কিন্তু ঐ পাঁচিল ভেঙে ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে, লক্ষের দু'একজন মাত্র, নিজেকে মুক্তির অবারিত প্রান্তরে টেনে এনে, সেই সত্যের অপূর্ব দর্শন-সাগরে নিজের জীব-জীবনের দৃষ্টি-গঙ্গার সাগর-সঙ্গম রচনা করেন। ফলে তাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে দৃষ্ট সৃষ্টির সেই আদিম ধ্বংসাত্মক পরিবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক সংবেদনার সাহায্যে সেই 'সৎ'-এর সানন্দ অনুভব করেন।

এই 'সৎ'-এর প্রতি দৃষ্টি ফেরাবার জন্য আমাদের জগৎ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বাহিরের কোন কিছুর ওপর নির্ভর করতে হবে, তা নয়। আমাদের অন্তর থেকেই সেই শক্তি আসবে। শুধু আসবে নয়—তাই-ই আসে। উদাহরণস্বরূপ বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনবেদ অনুসরণ করেই তা আমরা বুঝে নিতে পারি।

এই আন্তর শক্তিকে জাগাতে হ'লে নিজের মনকে নিজেরই বিবেক দিয়ে জয় করতে হবে। মনের নিম্নাভিমুখী সকল প্রবৃত্তিকে করতে হবে উর্ধ্বাভিমুখী এবং এর জন্য সবচেয়ে যা বেশী সাহায্য করবে তা হচ্ছে একটি জীবন্ত আদর্শানুসরণ। এই আদর্শানুসরণের জন্য চাই সেই আদর্শের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি। তাহলে, সেই দৃষ্টির সুমুখেই ফুটে উঠবে সেই দিব্য-দৃষ্টি, যার সাহায্যে আমরা ঈশ্বর-লীলার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি। তখনই জানা হ'য়ে যাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এই বিশ্বজগৎকে—আর শেষ পর্যন্ত নিজেকেও, যা জানা হ'য়ে গেলে আর অন্য কিছু জানা বাকী থাকে না।

ঐ সর্বপ্রাপ্তির ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের মধ্যেই ভাস্বর হ'য়ে রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। এর জন্য, এ পথের প্রধান বাধা 'ভয়'কে সর্বাগ্রেই দূর করতে হবে। ভয় দূর করা তখনই সম্ভব, যখন 'আমরা দুর্বল'—এই মহা পাপবোধ আমাদের মন থেকে চিরতরে হবে উন্মূলিত। তখনই আমরা স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারবো আমাদের মধ্যকার ঐশ্বরিক সত্তার সার্বভৌম স্বাধীনতার খোলা আকাশে। অথচ আশ্চর্য, এই 'স্বাধীনতা'কেই আমরা আমাদের প্রবৃত্তির শিকলে বেঁধে রেখে নিজেদের অগ্রগতি নিজেরাই শুদ্ধ ক'রে রেখেছি—নোঙর ফেলে দাঁড় টানার মতো। এই বন্দী জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের নিজেদের শক্তিই একমাত্র কার্যকরী। যেমন করেই হোক এই বন্দী জীবনের অবসান ঘটালেই আমরা বুঝতে পারবো—আমরা চিরস্বাধীন—স্বপ্নের কেমন এক অলীক কল্পনার মোহে নিজেকে এতদিন বন্দী ও শক্তিহীন ব'লে মনে করেছিলাম মাত্র। মনের সেই অবাধ স্বাধীনতার দিবালোকে সকল কিছুই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সকল কিছুই তার যথার্থ স্বরূপ নিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়ায়। ফলে, সেখানে কোন মরীচিকা থাকে না, থাকে না কোন কুহেলিকা, কোন স্বপ্ন বা মোহ; বরং দ্রষ্টার আন্তর সৌন্দর্যের আলোকে তখন সে নিজেই যে কেবল নিজের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাই নয়, অন্য সকলেও তার প্রতি ঐ আত্মিক আলোর প্রেম সৌন্দর্যে, আকৃষ্ট হয়। এমন কি ঐ অনির্বাণ আগুনে পতঙ্গের মতো সকলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়,—ঝাঁপিয়ে পড়েও; তবে তাতে তাদের পাখা পোড়ে না, প্রাণ যায় না, বরং এক মৃত্যুহীন জীবনের উর্ধ্বলোকে বিচরণ করার শক্তি হয়।

পথিক, এখনো নীরব কেন? অপরূপ রূপ-রাগে তোমার সুমুখেই তো সেই সত্যের রবি রয়েছে জেগে—শুধু সুমুখে নয়, তোমার ভেতরেও! আকাশ-বাতাস, আর তোমার ঐ শ্যামল বনানীর দিকে তাকিয়ে দেখ! দেখ, সেই রাঙা সত্যের অরুণ-রাগেই তো তাদের

প্রাণের সাধনদীপ্তি বাড়িয়ে গেছে। দেখ, একবার দেখ; তাহলেই বুঝতে পারবে, কেমন ক'রে সেই পরশমণির স্পর্শ লেগে তোমার মরচে-পড়া মন-লোহা চেতনার স্বর্ণ-খণ্ডে রূপায়িত হবে। তখনই বুঝবে সেই কৃষ্ণের মহাকর্ষণ। তাই বলি, ওগো পথিক, মাঝ-পথেই থেমে গিয়ে তোমার জীবনকে সঙ্কুচিত কোরোনা। মনে রেখো, সনাতন ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তুমি—নিখিলের অন্তর্লীন আনন্দ-ঝঙ্কার জেগে রয়েছে তোমারই কণ্ঠে। তুমি সে-সব ভুলে নিজেকে আর কত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে বলো? ওঠ, জাগ, মহাসাধনা খুলে দিক তোমার নিয়তির দ্বার—প্রবেশ করো সেই আলোর রাজত্বে—অমৃতময় হয়ে যাক্ তোমার জীবন। চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

তোমার আসার বারতা এল গো!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী কাব্যশ্রী

বসন্ত-বায় দোলা দিয়ে যায়,
শিহরণ জাগে মনে,
তোমার আসার বারতা এল গো,
কুসুমিত বনে বনে!
গায় আগমনী পিক কুহু-বোলে,
ব্যথিত হৃদয় ব্যথা আজ ভোলে,
দীর্ঘ দিনের বিরহ ঘুচিছে
সেই সুর আলাপনে!
তোমার আসার বারতা এল গো,
শিহরণ জাগে মনে!
কচি কিশলয়ে কি যেন আভাস
সহসা উঠিছে ফুটে,
সবুজ বনের ছায়া-বীথি ছেয়ে
বকুল পড়িছে লুটে!
অশোকের রাঙা ঠোঁটে ঝরে হাসি,
রঙের নেশায় পলাশ উদাসী,
কৃষ্ণচূড়ার রূপের বাহার
নব রূপে ভ'রি উঠে!
বিশ্ব-হৃদয় রূপময় হ'য়ে
স্বরূপ তোমার ফুটে!
নদী আজ গায় কুল্ কুল্ স্বরে,
দিকে দিকে বাঁশী বাজে!
তোমার চরণ-ছন্দ যেন গো,
শুনি আমি তারি মাঝে!

সীমাহীন নভে তোমার নয়ন,
করুণার দিঠি করে বিকিরণ,
তোমার মুখের স্বর্গীয় শোভা
দিগ্ দিগন্তে রাজে।
তোমার আসার বারতা ল'য়ে গো
দিকে দিকে বাঁশী বাজে!

পরশন তব অঙ্গে লাগিছে
ভোরের অরুণ-করে,
চাঁদের অমিয়-জ্যোছনা ধারায়
স্মিত হাসি তব ঝরে!
জড়ের মাঝারে জেগে উঠে প্রাণ,
দিকে দিকে বহে পুলক-উজান,
শীর্ণা ধরার বুক ভ'রি আজ
অনুরাগ সঞ্চরে!
তোমার আসার বারতা এল গো,
অন্তরে অন্তরে!

এল মধু তিথি মধুর লগ্নে
মধু-ঝরা মধুমাসে,
আকাশে বহিছে মধুর প্রবাহ
বাতাসের শ্বাসে শ্বাসে!
বিশ্ব-দৃশ্য আজি মধু-মাখা,
মধু দিয়ে যেন চরাচর ঢাকা,
জাগিয়া উঠেছ তুমি চির-রাকা
মধুভরা চিদাকাশে!
তোমার আসার বারতা এল গো,
ভুবনের চারিপাশে

শ্রীরামকৃষ্ণ-'দর্শন'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মহাদেববাবু বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষার দার্শনিক সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বহু বৎসর হইতে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশাদি পড়িতেছেন, আলোচনা করিতেছেন, ভাল লাগে, আনন্দ পান, ধর্মজীবনে একটি বিশ্বাস, সাহস, উৎসাহ বোধ করেন। ইহার বেশী কখনও তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সেদিন বন্ধু শিবদাসবাবু—দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মনে একটি খটকা লাগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ উপর-উপর পড়িলে কিছুই বোঝা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দার্শনিক মতবাদ জানা প্রয়োজন, তবেই তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

শিবদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো মহাদেববাবু, শ্রীরামকৃষ্ণ কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন?

—তা তো বলতেই হবে, অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-পন্থী সন্ন্যাসী তোতাপুরীর কাছে তিনি যখন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

শিবদাসবাবু বলিলেন, সে হ'তে পারে—এক সময়ে তিনি ঐ সাধনা করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি তো বরাবর কালীমন্দিরে যেতেন, প্রণাম করতেন, পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, কালীমূর্তিকে চামর করতেন। আবার কীর্তন শুনে তাঁর ভাব হ'ত, সমাধি হ'ত। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে এ সকল আচরণের সামঞ্জস্য কোথায়?

মহাদেববাবু বলিলেন, কেন স্বয়ং শঙ্করাচার্যও তো দেবদর্শন দেবপূজা করেছেন, দেবদেবীর স্তবস্তুতি লিখে গেছেন। অথচ তাঁকে তো অদ্বৈতবাদের একরকম প্রতিষ্ঠাতাই বলা চলে। অদ্বৈতবাদ মানলেও বোধ করি দেবদেবীর ভক্তি আটকায় না।

শিবদাসবাবু—শঙ্করাচার্য দেবদেবীর স্তব-স্তুতি লিখেছেন সত্য কথা, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর যে রকম (তাঁর পরমহংসত্ব লাভ করবার পরেও) একটা জমাটী ভক্তিভাব দেখা যায়, তাঁর ভিতর সে রকমটি ছিল কি? এ যেন শিষ্যসামন্তদের জন্যে বা মন্দাধিকারী গৃহস্থদের জন্যে দায়ে পড়ে ভক্তিবাদ খ্যাপন। শঙ্করের সমগ্র গ্রন্থাবলী পড়ে দেখুন—তাঁর মূল সুরটিই হ'ল, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আর জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নেই। বার বার তিনি পারমার্থিক সত্যের কথা বলছেন। সেই সত্যের তুলনায় এই জীব-জগৎ তো বটেই, দেবদেবীও মিথ্যা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা কালীকে কখনো মিথ্যা বলতে পারতেন কি?

মহাদেববাবু—কেন? অদ্বৈত সাধনার আগে তিনি তো কল্পনায় জ্ঞানরূপ অসি দিয়ে মা কালীর মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, আর যেই ঐরূপ করা অমনি তাঁর মন হু হু ক'রে নামরূপের রাজ্য ছেড়ে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়েছিল।

শিবদাসবাবু—সে হ'ল সাধন-অবস্থার কথা। কিন্তু আমি বলছি পরবর্তী কালের পরমহংস-দেবের কথা। যখন তিনি সাধনা শেষ ক'রে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, লোকশিক্ষক হয়েছেন, যখন তাঁর ফিলসফি দানা বেঁধেছে, তখনকার কথা। সেই অবস্থায় তিনি কি মা কালীকে, রাধা-কৃষ্ণকে উড়িয়ে দিতে পারতেন?—মায়িক বলতে

পারতেন? নিত্য মন্দিরে যাওয়া চাই, প্রসাদ খাওয়া চাই, ভগবানের কত রকম নাম করা চাই। অদ্বৈতবাদী কি এ সব করবে? শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল? রামকৃষ্ণদেব যখন হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করতেন, তখন তিনি তো ঠাট্টা ক'রে বলতেন, 'রোটি ঠোকতে কেঁও?'

মহাদেববাবু—তা, তোতাপুরীর মতো গোঁড়া অদ্বৈতবাদী দেবদেবীকে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, আমার ধারণা।

শিবদাসবাবু—হাঁ আপনার ধারণা হ'তে পারে। কিন্তু এটা হ'ল layman's (অনভিজ্ঞ ব্যক্তির) ধারণা। এর দাম বেশী নয়। আপনার ধারণা প্রমাণসহ নয়। শঙ্করের দেবভক্তি তাঁর ফিলসফিতে পাত্তা পায় না। ওটা শঙ্করের লেখায় ও চরিত্রে একটা ফালতু জিনিস, এমনকি অবান্তর জিনিসও বলা চলে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কালীভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি এ রকম ফালতু জিনিস নয়। কালীভক্তির background (পটভূমিকা) ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবাই যায় না। শঙ্করাচার্য যত স্তবস্তোত্র লিখেছেন তার সবগুলিকে বাদ দিলেও শঙ্করের জীবন ও বাণী অটুট থাকে।

মহাদেববাবু একটু দমিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হ'লে শিবদাসবাবু, আপনি কি বলতে চান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবাদী ছিলেন না?

শিবদাসবাবু—হাঁ ঠিক। আমি বলবো তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না।

মহাদেববাবু—তবে কি বলতে চান তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন?

শিবদাসবাবু—না, তাও বলতে চাইনে।

—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী?

—না।

—দ্বৈতাদ্বৈত?—অচিন্ত্যভেদাভেদ?

—না।

মহাদেববাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে আপনি কি বলতে চান?

শিবদাসবাবু বিজ্ঞজনোচিত উদার হাসি হাসিয়া মহাদেববাবুর দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, বসুন, স্থির হ'য়ে বসুন। আমার গবেষণা, পর্যালোচনা, নিভৃত অনুধ্যানের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যা বুঝেছি তা আপনাকে আজ বলবো। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তাঁর উপদেশের মর্ম বুঝতে পারবেন না।

শিবদাসবাবু বলিয়া চলিলেন। প্রতীচ্যের প্রাচীন গ্রীস হইতে বর্তমান ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু ইজ্‌ম্‌-এর কথা তুলিলেন, প্রাচ্যে মহেঞ্জোদারো, প্রাচীন পারস্য, মিশরের দেবদেবী ধর্মতত্ত্ব হইতে শুরু করিয়া কর্তাভজা, বাউল, সাঁই পর্যন্ত কিছু বাদ দিলেন না। মহাদেববাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার অস্বস্তি-ভাব দেখিয়া শিবদাসবাবু বলিলেন, আর একটু ধৈর্য ধরুন মহাদেববাবু। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা খাড়া ক'রে নিই—তারপরে শ্রীরামকৃষ্ণের সিন্‌থেসিস্‌-এ আসবো। কিন্তু মহাদেববাবুর পক্ষে সেদিন আর অপেক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন, ঘুম পাইতেছিল, মনটাও ভীষণ খিঁচড়াইয়া গিয়াছিল।

পুনরায় কয়েকদিন পরে উভয়ের দেখা। শিবদাসবাবু বলিলেন, আসুন সেদিনকার আলোচনাটা আবার শুরু করা যাক। মহাদেববাবু বলিলেন, আমার মাথায় ঢোকে না আপনার ফিলসফি। শিবদাসবাবু বলিলেন, উপায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের ফিলসফি না বুঝলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পড়া বৃথা, তাঁর উপদেশ পালন সুকঠিন।

মহাদেববাবু আর কি করিবেন? সুবোধ বালকের মতো বসিয়া রহিলেন। শিবদাসবাবু বলিয়া চলিলেন। মহাদেববাবু যখন রাত এগারোটায় ছুটি পাইলেন, তখন তাঁহার মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।

তাহার পর আরও তিন দিন এই অত্যাচার চলিল। কিন্তু কোনও সুফল হইল না। মহাদেববাবু শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-খ্যাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের কূলকিনারা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। নানা সংশয় উঠিয়া মনকে তোলপাড় করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজবোধ্য উপদেশগুলিও যেন দুর্নির্ণেয় রহস্যের কালো পোষাক পরিয়া ভূতের মতো তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল।

মহাদেববাবু সত্যই বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন।

*   *   *

কয়েকদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মহাদেববাবু ঠিক করিলেন অন্ততঃ দুই মাস আর শিবদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। যদি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন আবিষ্কার করিতেই হয়, তাহা নিজের চেষ্টাতেই করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে কথিত শিবদাস-বাণী শুনিয়া আর সময় নষ্ট করিবেন না।

মহাদেববাবুর মনে হইল শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনই তাঁহার উপদেশের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান। তাঁহার শিক্ষা যদি কোনও স্থলে বুঝিতে না পারা যায়, শব্দজাল সৃষ্টি করিয়া উহা বুঝিতে যাওয়া নিরর্থক। উচিত, ঐ উপদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহার জীবন-চর্যার অবলোকন। ঐ জীবনচর্যাই তাঁহার উপদেশকে স্পষ্ট করিয়া দিবে।

তিনি কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন? হাঁ। কেননা দিনের মধ্যে বহুবার তাঁহার মন নির্বিকল্প সমাধিতে নামরূপের অতীত অদ্বয় সত্যে ডুবিয়া যাইত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই অনুভূতি তাঁহার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। 'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥' গীতার এই শ্লোকে বর্ণিত সমদৃষ্টি স্বতই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। অদ্বৈতবাদ আর কাহাকে বলে?

তবে তিনি কালীঘরে যাইতেন কেন? 'মা মা' করিতেন কেন? সংকীর্তনে মাতিতেন কেন? অদ্বৈতবাদের সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য কোথায়? দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ একই ব্যক্তিতে কি করিয়া সম্ভবপর?

মহাদেববাবুর মনে হইল, এই দার্শনিক সংশয়ের উত্তরও কোন নূতনতর দার্শনিক শব্দবিন্যাস হইতে মিলিবে না, মিলিবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইতেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ যেমন তাঁহার আচরণ দ্বারা সমর্থিত, তাঁহার দ্বৈত উপাসনাও সেইরূপ তাঁহার বহুতর ব্যবহারে প্রমাণিত। কোন্ দার্শনিক তত্ত্বে দাঁড়াইয়া তিনি অদ্বৈত ও দ্বৈত—দুইকেই এইভাবে সমান মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা নাই বা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম। তত্ত্বের বর্ণনা বড় কথা নয়, বড় কথা তত্ত্বের অনুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন (তাঁহার অনুভূতি ও আচরণ দ্বারা) যে, অদ্বৈতবাদের নির্বিশেষ আত্মানুভূতি এবং সমাধি হইতে নামিয়া আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে সর্ববস্তুতে এক সমরস ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াও ভক্ত ও ভক্তির আনন্দ ও সার্থকতাকে স্থান দেওয়া যায়—শুধু এক মতে নয়, অজস্র মতে অজস্রভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতানুভূতি সত্য, ভক্তিভাবও সত্য। তাঁহার অদ্বৈত দ্বৈতকে হীন করে নাই, তাঁহার দ্বৈত অদ্বৈতকে লঘু করে নাই।

ইহা কোন্ দর্শন?—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ দর্শন; তাঁহার জীবন একটি ছাঁচ। তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, অপরের পক্ষেও

তাহা সম্ভব হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ছাঁচে আমরাও আমাদের জীবন গঠন করিয়া যাইতে পারি—যে জীবনে অদ্বৈত ও দ্বৈতের সমন্বয় সম্ভবপর। নানা মত লইয়া বিরোধ যে নিরর্থক, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-দর্শনের মূলকথা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা তাঁহার ভাস্বর জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই জীবনকেই অনুধ্যান করিতে হইবে, তবেই তাঁহার শিক্ষা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। না, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নূতন কোনও 'ইজ্‌ম্'-এর প্রয়োজন নাই। ঐ ইজ্‌ম্-কে খাড়া করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিতে হইবে, দ্বৈতবাদকে মুণ্ডন করিতে হইবে, আরও কত কিছুকে গালাগালি দিতে হইবে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের বিরোধী। তিনি কিছু ভাঙিতে আসেন নাই, কাহাকেও তিরস্কার করিতে আসেন নাই। সকলকে পুরা সম্মান, শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া গিয়াছেন। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীকে তোমাদের দার্শনিক অভিধানের বাছা বাছা শব্দের সংশ্লেষ-বিশ্লেষ দ্বারা একটি নূতন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে যাইও না দার্শনিক! বড় অন্যায় করিবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর। বলিও না—'ইজ্‌ম্' না হইলে, দর্শনের সুস্পষ্ট উপন্যাস না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাহীন, বিদগ্ধ সুধীসমাজে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁহাকে বরং অপাঙ্‌ক্তেয়ই থাকিতে দাও।

মহাপুরুষদের উপদেশ তাঁহাদের জীবিত-কালে যাহারা শুনে, শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়--তাঁহাদের শক্তি ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাহারা ঐ উপদেশগুলিকে মহাপুরুষদের জীবনের সহিত এক করিয়া দেখে বলিয়া তাহা-দের নিকট উপদেশগুলিতে বিশেষ কোন কুয়াসা থাকে না। উহা বুঝিতে কোন লিখিত ভাষ্যটীকার প্রয়োজন হয় না। যদি কোন সংশয় আসে তৎক্ষণাৎ তাহারা মহাপুরুষদের জীবনের আচরণসমূহের প্রতি দৃক্‌পাত করে। কোন না কোন আচরণ হইতে আলোক পাওয়া যায়, উপদেশের যে অংশ বুঝিতে পারা যাইতেছিল না, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বার বার অর্জুনকে কি বলিতেছেন?—অর্জুন, দেখ, আমার দিকে তাকাইয়া দেখ—আমি কি ভাবে কাজ করি, কি জ্ঞান হৃদয়ে ধরিয়া চলি ফিরি, কি ভালবাসা বুকে লইয়া জীবনধারণ করি, চিত্তের কি স্থিরতা, সমতা রাখিয়া এই দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে বাস করি। যদি তোমাকে কর্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগের কথা বলিয়া থাকি তো মনে করিও না বানাইয়া বানাইয়া, শব্দজাল বুনিয়া তোমাকে বলিয়াছি। ঐ যোগগুলির প্রমাণ আমি, ঐ যোগগুলির ব্যাখ্যা আমি, ভাষ্যও আমি।

বুদ্ধও শিষ্যগণকে উপদেশ করিবার সময় বার বার তৃতীয় পুরুষে নিজের কথা বলিয়াছেন—'তথাগত এইরূপ করিয়াছিলেন', 'তথাগত ইহা দেখিয়াছিলেন'—ইত্যাদি। নিজের কথা নিজে বলা মহাপুরুষদের নিকট রুচিকর নয়, কিন্তু উপায়ান্তরই বা কি? না বলিলে, বিদ্যা-দিগ্‌গজ আমরা আমাদের বুদ্ধি তাঁহাদের উপদেশের সহিত মিশাইয়া একটি প্রকাণ্ড গালভরা মতবাদ খাড়া করিয়া বসিব, ঐ মত-বাদের চাপে তাঁহারা দমবন্ধ হইয়া মারা যাইবেন।

যীশুখ্রীষ্টকেও লজ্জার মাথা খাইয়া জেলে-মালা শিষ্যবর্গকে নিজের কথা পাড়িতে হইয়া-ছিল বার বার। জেলেমালাদের অনেক সময় সংশয় হইত—ইনি এত 'আমি আমি' করেন কেন? হায় রে, কি করিয়া তখন বুঝিবে

কেন করেন। পরে বুঝিয়াছিল। খ্রীষ্টের তিরোভাবের পর দিগন্ত-প্রসারিত অন্ধকারের মধ্যে, অজস্র বিপদ ও বিভীষিকার মধ্যে, নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে কোন্ শক্তি তাহা-দিগকে সংহত রাখিয়াছিল, আশ্বস্ত রাখিয়াছিল, বিশ্বাসে কর্তব্যে অবিচলিত রাখিয়াছিল? খ্রীষ্টজীবন-প্রমাণিত খ্রীষ্টবাণী। জীবন তাহারা দেখিয়াছিল বলিয়া বাণীকে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল। খ্রীষ্ট তাহাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কথায় যদি অবিশ্বাস আসে তো তাহারা যেন তাঁহাকে মনে করে। তিনি নিজে তাঁহার উপদেশের ভাষ্য।

কিন্তু এই অদ্ভুত পৃথিবী বেশীদিন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্টকে আমল দেয় না। আখেরে বিদ্যা-দিগ্‌গজরাই এই পৃথিবীকে চালায়, শাসায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ-বাণী 'গীতা'র কত ভাষ্য, কত টীকা, কত অনুটীকা কালে কালে জমিয়াছে—জমিতেছে। শাস্তার সরল প্রাণস্পর্শী উপদেশ-গুলিকে মূলধন করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কী বিপুল বহুপ্রসারিত শব্দ-বাণিজ্যই গড়িয়া উঠিয়াছিল! ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, তুমিই কি রক্ষা পাইয়াছিলে? গ্যালিলি উপসাগরের তটে তটে জেলেমালা চাষাভুষাদের মধ্যে, স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধদের মধ্যে যাহা বলিয়া গেলে—পরে দেশদেশান্তরে গবেষক পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহার ব্যাখ্যান-অনুব্যাখ্যানের তাপে তোমার অন্তরাত্মা কি হাঁপাইয়া উঠে নাই?

শঙ্করাচার্য ও শ্রীচৈতন্যও নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহাদের শিক্ষা ও জীবনপ্রেরণা 'দার্শনিক'দের কবলে পড়িয়া জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে, যাহা ছিল একটি সতেজ স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক শক্তি, তাহা মেধাবী পণ্ডিতগণের বাক্যবিলাস ও তর্কামোদে পরিণত হইয়াছিল। বিদ্যাদিগ্‌গজরা জিতিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর ও চৈতন্যের ভাবকে হার মানিতে হইয়াছে।

মহাদেববাবুর মনে হইল শ্রীরামকৃষ্ণও অব্যাহতি পাইবেন না। 'শিবদাসবাবু'দিগকে নিরস্ত করা যাইবে না। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 'দর্শন' খাড়া না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। তাঁহারা যে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদগ্ধ সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় করিতে নাছোড়বান্দা। দার্শনিক আলোক-সম্পাত ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ তো একান্তই গ্রাম্য পাঁচালি!

তা, শিবদাসবাবুরা তাঁহাদিগের 'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী' লইয়া থাকুন। মহাদেববাবু ঠিক করিয়াছেন, তিনি উহা হইতে দূরে থাকিবেন। তাঁহাদিগের দার্শনিক ব্যাখ্যান ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষা তিনি বুঝিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যতক্ষণ সামনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সহচরগণের জীবন ও আচরণসমূহকে যতক্ষণ প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যাইতেছে।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—তথা তন্ত্র, পুরাণ এবং আরও নানামতের সিদ্ধান্ত কি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণে সমন্বিত হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যার জন্য নূতন কোন গবেষণার প্রয়োজন নাই। সনাতন বৈদিক ধর্মের শিক্ষার মধ্যেই উহার দিগ্‌দর্শন আছে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' ইত্যাদি বাক্যই এক ও বহুর যোগসূত্র নির্ণয় করে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'বেদমূর্তি'। বেদ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য এক অদ্বয় ব্রহ্মসত্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি স্তরের উপযোগিতা আছে, প্রামাণ্য আছে। যিনি শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি জানেন উপরে উঠিবার জন্য প্রত্যেকটি ধাপের প্রয়োজন। তিনি কোনও ধাপের নিন্দা করেন না, কাহাকেও গালাগালি দেন না।

কথার মালা সাজাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন গড়িতে পারা যাইবে না, গড়া উচিতও নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন। মহাদেববাবু ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মুশকিল কাটিয়া গিয়াছে।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

[পটভূমিকা]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত প্রসারে কেশবচন্দ্রের বিশিষ্ট জীবন-ভাবনা ও বিচিত্র কর্মোদ্যমের কথা বাঙালী আজ প্রায় ভুলতে বসেছে। ভোলবার প্রধান কারণ জীবনের প্রতি আচার্য কেশবের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আজকের বাঙালীর জীবনদৃষ্টির একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেশবচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতিভাবনা ছিল জীবনসাধনারই অঙ্গ-বিশেষ। আত্মানুশীলন ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যে জীবনকে একটা স্থির প্রতিষ্ঠাভূমির ওপর স্থাপন করতে পারলে সংস্কৃতিশতদল বিকশিত হ'য়ে উঠবে বিচিত্র বর্ণালি দিয়ে—এই ছিল কেশবচন্দ্রের সাধনা। সেজন্য সে আত্মভ্রষ্টতার যুগে কেশবচন্দ্র বাঙালীকে আহ্বান করেছিলেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে। এ অগ্নিমন্ত্র আত্মার জাগরণের মন্ত্র। আত্মা জাগরিত হ'লে জীবনের উত্তাপ বাড়ে, আর এ উত্তপ্ত জীবনবোধের তাড়নায় জাগ্রত জাতি অনুসন্ধান করে নিত্য নতুন অভ্যুদয়ের পথ। কেশবচন্দ্রের এ অগ্নিমন্ত্রের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। এ অগ্নিমন্ত্র অগ্নিগর্ভ সহস্র শিখা বিস্তার ক'রে স্পর্শ করেছিল সে যুগের জাগরণোন্মুখ অসংখ্য মনকে; এবং সে বহুমনের কালিমা দগ্ধ ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল দেশব্যাপী এক নবীন জীবন। সে জীবন ব্যাপকতায় বিশাল, উপলব্ধিতে গভীর, কর্মৈষণায় অক্লান্ত, আর নবসৃষ্টি-প্রয়াসে অধীর।

সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের জন্যে প্রথমে চাই মনের পরিশীলন, আর মনের পরিশীলনের জন্যে প্রথমে প্রয়োজন আত্মসমীক্ষা ও আত্মানুশীলন। যেখানে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মন ও আত্মার অনুশীলন নেই, সেখানে জাতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুম রচনা ছাড়া আর কী? প্রতিভার বরপুত্র কেশবচন্দ্র এ গভীর জীবনসত্য অনুভব করেছিলেন এখন থেকে আরও প্রায় একশো বছর আগে। স্বীয় অন্তরে অনুভূত গভীর প্রত্যয় জাগ্রত করেছিল তাঁর জীবনকে, আলোকিত করেছিল সমসাময়িক অসংখ্য মনকে, আর সক্রিয় করেছিল সে যুগের বাঙালীকে জীবন ও কর্মের বিচিত্র পথে বিচরণ করতে। সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

কেশবচন্দ্র যে বছর জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮ খৃঃ) তার পাঁচ বছর আগে ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে (১৮৩৩ খৃঃ)। এ মহান্ চিন্তানেতা ও কর্মবীরের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে নব্য বাঙলার সংস্কৃতি-জগতে যেন একটা উজ্জ্বল দীপ নিভে গেল। মাত্র পনের বছরকাল (১৮১৫—১৮৩০) রামমোহন বাঙলা দেশের নব্যসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাঙালী জীবনের প্রায় সর্বতোমুখী সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর মৌলিক ভাবনা ও অক্লান্ত কর্মৈষণার সাহায্যে সমকালীন বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে যে উত্তপ্ত বেগ সঞ্চার করেছিলেন তা ছিল ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে যথেষ্ট। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর প্রাগ্রসর জাতিসমূহের সমপর্যায়ে উন্নীত

করবার উদগ্র কামনায় তিনি যে কর্মসূচীর নির্দেশ দেন তার ভেতর আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্যে সুদূর ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি যে আন্দোলন সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাও বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনকে আকৃষ্ট করেছিল একটা নতুন সম্ভাবনার দিকে। সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কারে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব অনুভূত হ'তে থাকল তাঁর মৃত্যুর পরেও। ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষণীয়। তাঁর একান্তভাবে যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন প্রগতিশীল হিন্দুদের মনে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিলেও তাদের বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন বা বিধর্মী ক'রে তোলেনি। এর কারণ, তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টায় বিপ্লবের বীজ যতই থাকুক না কেন, তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে ছিল ভারতের সনাতন জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রেরণা। রামমোহনের সমকালেই বাঙলা দেশে আর একটি প্রবল শক্তি দেখা দিল, যার প্রভাবে বাঙালীর মনোজীবন প্রবলভাবে আন্দোলিত হ'য়ে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়ল। কোন কোন বাঙালী সংস্কৃতিসমালোচক এ যুগকে অভিহিত করেছেন 'ঝড়তুফানের যুগ' ব'লে। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এ বিপ্লববিক্ষুব্ধ যুগের স্রষ্টা হিন্দুকলেজের যুক্তিবাদী মনীষী শিক্ষক ডিরোজিও। কলেজ-গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে ডিরোজিও-প্রবর্তিত শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত সমস্ত চিন্তাধারাকে একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে দেখা। এই নব্যতন্ত্রের শিক্ষার ফলে হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষার্থীর দল হ'য়ে উঠলেন প্রবল সংশয়বাদী। স্বদেশীয় সনাতন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখতে লাগলেন তাঁরা সীমাহীন ঘৃণার চোখে; আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যেই তাঁরা দেখতে পেলেন জীবনের সমস্ত অভীপ্সিত আদর্শ। ভূদেব, রাজনারায়ণ, রামতনু লাহিড়ীর মতো স্বল্পসংখ্যক স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিই ছিলেন স্বদেশের সনাতন আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ। পূর্বোক্ত তরুণ ছাত্রদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বাঙালীর সংস্কৃতি-জগতে একটা তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। বিজাতীয় পোষাক, বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ, অপরিমিত মদ্যপান প্রভৃতি হ'ল তাঁদের বহির্জীবনের প্রধান আকর্ষণ, আর স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা ক'রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোচনাই হ'ল তাঁদের নব্যতন্ত্রী সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য। এমনকি ভারসাম্যহীন শিক্ষার প্রবল উন্মাদনায় এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক ধর্ম মনে ক'রে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধা করলেন না। স্বদেশীয় ভাবাপন্ন সে যুগের কোন কোন চিন্তানেতা দেখতে পেলেন সমকালীন বাঙালী সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবপ্রেরণায় একটা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

এ যুগসঙ্কটের দিনে রামমোহনের মানসশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এ বিজাতীয় ভাবান্দোলনের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত চরিত্রে বিশুদ্ধিসাধন, নব্যতন্ত্রী ইংরেজী শিক্ষিতদের বহির্মুখী মনকে স্বদেশীয় ঐতিহ্যাভিমুখী ক'রে তোলাই হ'ল এ সময় দেবেন্দ্রনাথের একান্ত সাধনার বিষয়। এ উদ্দেশ্যে রামমোহনের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে তিনি নতুন শক্তির সঞ্চার করলেন রামমোহনের সহকর্মী রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তায়, আর সমকালীন অপরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ

প্রজ্ঞার আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্ সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের সহযোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা ক'রে।*

দেবেন্দ্রনাথ যে শুধু সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তা নয়, একটা সুগভীর ভাগবত চেতনা ছিল তাঁর মহান্ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব-উপলব্ধ সত্যধর্মের প্রেরণায় তিনি যে শুধু স্বীয় কুলধর্মকে বিসর্জন দিলেন তা নয়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে বেদান্ত-প্রতিপাদিত সেই সত্যধর্মকে প্রচার করবার ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি সে যুগসঙ্কটের কালে। কিন্তু রামমোহন-পরিকল্পিত এ নবধর্ম-প্রচারে দেবেন্দ্রনাথ একটা প্রবল বাধা পেলেন সহকর্মী অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে। ভগবানের মঙ্গল-বিধানের প্রতি গভীর 'মিষ্টিক' চেতনার ফলে একটা সংশয়শূন্য বিশ্বাসই ছিল দেবেন্দ্রনাথের সকল ধর্মসাধনার মূল প্রেরণা, আর অবিচল বিশ্বাসে জগৎস্রষ্টার নিকট প্রার্থনা মানুষের আত্মিক সমুন্নতির প্রধান উপায়—এই ছিল ভগবৎ-নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির প্রধান কথা। প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন অক্ষয়কুমার কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এ 'মিষ্টিক' বিশ্বাস ও ভক্তিতত্ত্বকে তাঁর যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। পাশ্চাত্য যুক্তি-নির্ভর চেতনার আলোকে একটি সত্যসন্ধ দৃষ্টি-ভঙ্গী যে দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, বাঙালী সংস্কৃতি যে একটা অভিনব অভ্যুদয়ের পথ খুঁজছে, দেবেন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারলেও সে সংশয়বাদের যুগে অন্তর দিয়ে তা অনুমোদন করতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথের অখণ্ড ধর্মবিশ্বাসের ওপর অক্ষয়কুমারের যুক্তি-দণ্ডের আঘাতের প্রবল প্রতিক্রিয়া হ'ল এই: নির্জনে স্রষ্টার মৌন মহিমা উপলব্ধি ক'রে নিজের বিক্ষুব্ধ অন্তরে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি হিমালয়ের ক্রোড়ে।

দেবেন্দ্রনাথের ভাবান্দোলিত জীবনের এ হ'ল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এ বছরটি নানা কারণে বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতি-হাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ বছরেই ভারতের সিপাহীরা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে—এই অভিযোগে; এ বছরেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা দেশ ও বাঙলা দেশের বাইরের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হ'ল; আর একটি আপাতক্ষুদ্র ঘটনা ঘ'টল বাঙলা দেশেই কলকাতার বুকে। এই স্মরণীয় বৎসরেই কলকাতার একটি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের একজন সত্যসন্ধ ভগবৎ-প্রেমিক যুবক আপন কুলধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। বাঙালীর আত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব হ'ল কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে যুগের বাঙালীর ধর্মসংস্কারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তেজস্বী কেশবচন্দ্রের যোগকে বলা চলে মণিকাঞ্চন-সংযোগ। এখন থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা গৌরবপূর্ণ উজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হয়েছে এ উভয় ধর্মনেতার অতলান্ত ভগবদ্ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস ও লোকহিতব্রতের মহান্ আদর্শে।

আধুনিক বাঙালীর সংস্কৃতি-ইতিহাসে এই হ'ল কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা।

* ভাদ্র, ১৩৬৬ সনে উদ্বোধনে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ডিরোজিও-প্রসঙ্গে

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ডিরোজিওকে 'নবযুগের প্রবর্তক'[১] বলেছেন। বিশেষণটি সার্থক। হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও[২] হিন্দু কলেজে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল অবধি পড়িয়েছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। সব পরিবর্তনের সূচনায় যেমন বাড়াবাড়ি থাকে, তেমনি ডিরোজিওর শিষ্যদেরও বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই ছাত্রেরা যখন উত্তরজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন, তখন উন্মাদনার পর্ব কেটে গিয়ে সুস্থ ও মহত্তর জীবনাদর্শে তাঁরা সার্থক হ'য়ে উঠেছেন। সুতরাং ফলের দিক থেকে বিচার করলে ডিরোজিও যে চিন্তার বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, তার অসাধারণ উৎকর্ষের কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ডিরোজিও ছিলেন জাত-শিক্ষক। 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি'—এমন ধরনের শিক্ষাব্রতীদের মধ্যেও ডিরোজিওর মতো আদর্শ শিক্ষক দুর্লভ। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্য দিয়ে ডিরোজিও বাঙালীর মানস ক্ষেত্রে যে সব চিন্তাবীজ বপন ক'রে যান, সেগুলির মোটামুটি বিভাগ এই—(১) স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, (২) স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ, (৩) অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, (৪) পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ ও দেশীয় সংস্কৃতি—বিশেষভাবে হিন্দুধর্মের সামাজিক ত্রুটির প্রতি অবজ্ঞা, (৫) জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ। এই কয়টির মধ্যে চতুর্থ বিষয়টির জন্যই তদানীন্তন হিন্দুসমাজের সঙ্গে ডিরোজিওর বিরোধ ঘটে। অনেকটা এই কারণেই ডিরোজিও আজ অবধি এক শ্রেণীর হিন্দুর কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে আছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে ডিরোজিওর শিষ্যেরা ধর্মের মৌলিক আদর্শগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁদের বিদ্রোহ ছিল দেশাচারের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ডিরোজিও কোন সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত ব'লে মনে করতেন না, তাই ধর্ম সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবু প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার-বিচারকে তাঁর শিষ্যেরা যতটা আক্রমণ করতেন, খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা করতেন না। সেদিক থেকে রামমোহনের চিন্তাধারা আরও স্বচ্ছ, উদার এবং সমদর্শী। পরবর্তী কালে ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ খৃষ্টান হননি। কৃষ্ণমোহন যে সামাজিক উৎপীড়নের জন্য খৃষ্টান হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন—একথা সুবিদিত। খৃষ্টান হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ অটুট ছিল। অপরপক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে, যিনি রাজ-ভ্রুকুটি উপেক্ষা ক'রে কাথিয়াওয়ার রাজ্যে সুশাসনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

১,৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ৮৩, ৯৯-১০০। (নিউ এজ সংস্করণ)

২ জন্ম-১৮০৯—মৃত্যু-১৮৩১ 'জাতিতে পোর্তুগীজ বংশোদ্ভব ফিরিঙ্গী' (ঐ পৃঃ ৮৩)

এই সন্ন্যাসী তাঁর অনুরাগীদের কাছে 'গুরু ডিরোজিওর নাম' বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন এবং 'তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন।'[৩]

ছাত্রজীবনে ডিরোজিও ছিলেন ডেভিড ড্রামণ্ড সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্র। কলকাতায় সে সময় ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চালিত আরও স্কুল ছিল। কিন্তু অন্যান্য স্কুলের চেয়ে ড্রামণ্ডের স্কুলের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, আইরিশ ড্রামণ্ড ছিলেন ডেভিড হিউমের চিন্তাধারার পক্ষপাতী। তখনকার ভারতবাসী ইংরেজেরা অনেকেই ড্রামণ্ডের স্বাধীন চিন্তা বিশেষ পছন্দ ক'রত না। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের উত্তরাধিকার ডিরোজিও এই গুরুর কাছেই লাভ করেন। ছাত্রজীবনে ডিরোজিওর ক্লাসিক সাহিত্য এবং গণিতের প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমাণ্টিক বন্ধনমুক্তির প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, ডিরোজিও-মানস তার দ্বারাই লালিত। ইংরেজী সাহিত্যের সদ্য-প্রকাশিত বইগুলির সবচেয়ে আগ্রহশীল ক্রেতাদের মধ্যে ভারতবর্ষে ডিরোজিও ছিলেন অগ্রগণ্য।[৪]

ড্রামণ্ডের স্কুলে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও ভারতীয় ছাত্রেরা একত্র পড়াশুনো ক'রত। এর ফলে ডিরোজিও এদেশের মানুষের সঙ্গে শৈশব থেকেই একাত্ম হ'য়ে মিশতে পেরেছিলেন। ফিরিঙ্গি হয়েও ভারতবর্ষকে আপন মাতৃভূমিরূপে অন্তরে অনুভব করা—এই কারণেই তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছিল। স্কুলের পাঠ মোটামুটি শেষ ক'রে তিনি কিছুকাল তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে ভাগলপুরে ছিলেন। ভাগলপুরের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর সহজাত কবিস্বভাব সহজেই প্রেরণার উপাদান খুঁজে পেত। কিশোর ডিরোজিওর অনেক কবিতাই তখনকার 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়েছে। তিন চার বছরের মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন, এবং ইণ্ডিয়া গেজেটের সহকারী সম্পাদকপদে নির্বাচিত হলেন —সেই সঙ্গে প্রতিভার গুণে হিন্দু কলেজের সহকারী শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত হলেন। কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি কলকাতার বিদগ্ধ-সমাজে তখন ছড়িয়ে পড়েছে, এখন শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ক্রমবর্ধমান হ'ল। পরবর্তী কালে Bradley-Birt (ব্র্যাডলি বার্ট) এই তরুণ কবির কাব্যগুচ্ছ একত্রে প্রকাশ করেন। ডিরোজিও সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা ক'রে তিনি ডিরোজিওর কাব্যসাধনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন:

> His poems show a remarkable command of language and beauty of expression; and if inspite of their unbounded enthusiasm, their wealth of imagery, and their passionate resentment of wrong, they lack something in originality and undoubtedly owe much to Byron and Moore, his contemporaries, it must be remembered that death at the age of twenty-three cut short the undoubted promise his youthful work evinces......There can be no doubt from his poems that his was one of those natures not made for happiness. He lived life too intensely, his sympathies were too widespread, his sensitive mind too much alive to the eternal of things, for him ever to lead the ordinary life of his fellow men. (Poems of H.V. Derozio—a forgotten poet.)

—'ডিরোজিওর কবিতায় তাঁর ভাষার উপর দখল এবং প্রকাশের সৌন্দর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাঁর কবিতায় অপার উৎসাহ ও উদ্দীপনা, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদসত্ত্বেও মৌলিকতার অভাব রয়েছে এবং তিনি নিঃসন্দেহে সমকালীন বায়রণ ও মুরের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে মাত্র তেইশ বছর বয়সে অকালমৃত্যু তাঁর রচনাবলীর সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে। ...তাঁর কবিতা পড়ে একথা বেশ বুঝা যায় যে, সহজ সুখের জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। জীবনকে তিনি বড় বেশী নিবিড়ভাবে অনুভব করতেন,

৪ Life of H.V. Derozio—Thomas Edward.

তাঁর সহানুভূতি ছিল অতিবিস্তৃত, তাঁর স্পর্শ-সচেতন মন সব বস্তুকেই দেখতে পেত অনন্তের পটভূমিকায়। তাই তাঁর পক্ষে সমকালীন অন্যান্য লোকদের মতো সাধারণ জীবন যাপন করা অসম্ভব ছিল।'

উদ্ধৃত মন্তব্যটি সংক্ষেপে ডিরোজিও-মানসের সার্থক উপলব্ধি। এই মন্তব্যটির সমর্থনে ডিরোজিওর দু'চারটি কাব্য-কণিকা উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

Good night! well then, good night to thee,
In peace thine eyelids close;
May dreams of future happiness
Illume thy soft repose!
I've that within that knows no rest,
Sleep comes to me in vain;
My dreams are dark—I never more
Shall pass 'good night' again.
(Good Night)

একটি চতুর্দশপদীতে ডিরোজিও মৃত্যুকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ ব'লে সম্বোধন করেছেন:

Death—my best friend, if thou dost ope the door,
The gloomy entrance to a sunshine world,
It boots not when my being's scene is furled,
So thou canst aught like vanished bliss restore.

সেকালে তাঁর 'ফকির অব জাঙ্গিরা' কাহিনী-কাব্যটি সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিল। এ কাব্যের সূচনায় কবি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন:

My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion in chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave of thee,
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! One kind wish for thee!

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা-সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ-বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিপুল রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন-অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে অভাগা জননি!
(অনুবাদ: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)[৫]

দেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে ডিরোজিওর Harp of India কবিতাটিও স্মরণীয়। তাঁর কাব্য-সংগ্রহের অনেক কবিতাই গ্রীসকে লক্ষ্য করে। গ্রীক সভ্যতার মহিমা ও গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধ—এ দুইই ডিরোজিওর আবেগ ও চিন্তা-ধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কবিতায় যে বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় মেলে তারই পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর স্বদেশানুরাগ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই স্বদেশানুরাগ তিনি তাঁর ছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত করেন। Young Bengal বা 'নব্য বঙ্গ' নামে পরিচিত তাঁর ছাত্র-বৃন্দ ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে এই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের জন্যই আজ অবধি আমাদের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

৫ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল।

লোক-শিক্ষায় কথকতা

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লোক-শিক্ষা বলতে আপামর সাধারণের শিক্ষা-দীক্ষাই বোঝায়। সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে আমাদের শিক্ষালাভ হয়—দেখে, শুনে এবং পড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষ নিজে দেখে আর কতটুকুই বা শিখতে পারে? অতীতে কত ঘটনাই ঘটে গেছে। পৃথিবীর নানা স্থানে নিত্যই কত ঘটনা ঘটছে। সেগুলো দেখে শেখার তো কোন উপায়ই নেই।

পড়ে অনেক বিষয়ই শেখা বা জানা যায়, কিন্তু সকলের পক্ষে এই উপায়েও তো শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। পড়ে শিখতে হ'লে অক্ষরজ্ঞান আবশ্যক। একে তো আমাদের দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। যারা কোনক্রমে নিজেদের নাম লিখতে পারে, তাদেরও সাক্ষরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা পড়ে কিছু শিখতে বা জানতে পারে না। সুতরাং যারা পড়ে শিখতে পারে, তাদের সংখ্যা এদেশে শতকরা আর কয়জন? খুব বেশী হ'লে শতকরা আট দশ জন মাত্র, এর অধিক নয়।

শুনে শেখার সুযোগ বা অবকাশ মোটামুটি সকলেই অল্পবিস্তর পেয়ে থাকে। সাক্ষর-নিরক্ষর-নির্বিশেষে এই উপায়ে অনেক কিছুই শিখতে বা জানতে পারে। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে শুনে অনায়াসেই কত বিষয় আমাদের শেখা হ'য়ে যায়। সর্বসাধারণের পক্ষে শুনেই বেশী বিষয় শেখা সম্ভব। সুতরাং এই উপায়েই লোক-শিক্ষা ব্যাপকভাবে সাধিত হয়, সন্দেহ নেই। এই জন্যই লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার আবেদন যেমন অপ্রতিহত, তার অবদানও তেমনি অপরিসীম।

এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন: "বাংলার গ্রামীণ জীবনে কথকতার প্রভাব কত, তাহা অল্প কথায় বুঝান কঠিন।...পূর্বে কথকতা লোক-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সাক্ষর-নিরক্ষর-নির্বিশেষে কথকতার সাহায্যে অনেক পুরাণ-কাহিনীই জানিয়া লইতেন। শুনিয়া কীরূপ শেখা ও জানা যায়, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই। বৃদ্ধারা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিতেন। বৈশাখ মাস—পুণ্য মাস। এ-সময়ে এই মহাকাব্যগুলি বেশী পড়া হইত। একজন বৃদ্ধাকে বাল্যকালে (তখন আমার এগার-বার বৎসর বয়স) রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইতাম। এই দুইখানি গ্রন্থের কোথায় কী কাহিনী বা উপাখ্যান আছে, তা বৃদ্ধার মুখস্থ। আমাকে 'অমুক অধ্যায়' বা 'অমুক উপখ্যান' পড়িবার নির্দেশ দিতেন। আমি তাহা পড়িয়া শুনাইতাম।...এখন ভাবিয়া অবাক হই, ঐ 'নিরক্ষর' বৃদ্ধা শুনিয়া শুনিয়া সমগ্র রামায়ণ মহাভারত কীরূপ জানিয়া লইয়াছিলেন।...একবার একমাস ধরিয়া কথকতা শুনিয়াছিলাম, তাহার রেশ যেন এখনও কানে লাগিয়া আছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতাম। তখন আমরা চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।"

প্রাচীন বাংলার লোক-শিক্ষার ইতিহাসে কথকতার ভূমিকা, সত্যই অতি বিরাট ও অতুলনীয়। একথা দেশের মনীষিগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের

'লোক-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধ আজ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

কথকতা কেবল মধুর স্বর-সংযোগে শাস্ত্র-পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যান নয়। এর পরিবেশনার ভঙ্গিমা বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরাণ-শাস্ত্রাদির এক একটি আখ্যায়িকা নিয়ে কথকঠাকুর অতি বিচিত্র ভঙ্গিমায় কথকতা করতেন। একই আসরে তাঁর কণ্ঠে কখন মধুর পাঠ, কখন শ্লোক আবৃত্তি, কখন সরস গল্প, কখন চমৎকার উপমা, কখন সুললিত সঙ্গীত এবং কখন তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা শোনা যেত।

কথকঠাকুরের অপূর্ব নাটকীয়তাও ছিল সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন ও চিত্তাকর্ষণের প্রধানতম সহায়। একই আসরে তিনি প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বিভিন্ন রস পরিবেশনকালে তাঁর কণ্ঠস্বর, মুখমণ্ডল, অঙ্গভঙ্গিমা প্রভৃতি অতি অদ্ভুতরূপে পরিবর্তিত হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকেও সেই সমস্ত রসে এবং ভাবে বিগলিত ও অভিভূত ক'রে ফেলতেন।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে কথকঠাকুরের ভাবাপ্লুত পরিবেশন ভঙ্গিমার একটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়: "কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। করুণ কণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল।...তাহার পর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে তাহার আজন্ম-জড়িত মায়াবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। বনের শিশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়'। কেহ আসিল না, কেহ সে ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন তিনি সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন। প্রতি কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন, 'আয়, আয়, আয়।' কেহ আসিল না।"

কথকতা জন-সাহিত্যের অন্তর্গত। যে সমাজ বা মণ্ডলী কথকতা শুনত, তারই মনের কথা-ভাব, অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, হৃদয়ের সুখ-দুঃখ ও অনুরাগ-বিরাগের একটা অতি নিবিড় সংবেদন তাতে অভিব্যক্ত দেখা যায়। কথকতার পুঁথি সেকেলে বাংলায় লেখ্য ভাষায় গদ্যে এক একটি পালা বিভাগ ক'রে রচিত হ'ত। ঐ পুঁথির ভাষা ছিল সংস্কৃতপ্রধান, গুরুগম্ভীর বিশেষণবহুল ও অলঙ্কারযুক্ত। তাতে কথাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে শাস্ত্রের শ্লোকমালার উদ্ধৃতি, পুরাণ-প্রবচন, সুললিত সঙ্গীত, মনোহর উপাখ্যান, সরস উপমা প্রভৃতিও সংকলিত থাকত। বিশিষ্ট কথকগণের সাধনায় কথকতা একটি আদর্শ কলা-বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

বিশেষণবহুল দীর্ঘ বাক্যবিন্যাসদ্বারা কথকঠাকুর কি ভাবে প্রসঙ্গের ভূমিকা বা প্রস্তাবনা করতেন প্রাচীন পুঁথি থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দিই :

"নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদসম্ভূতা পূত-সলিলা শ্রীশ্রীভাগীরথীতটে শান্তরসাস্পদ শুচিস্নিগ্ধ পরমপবিত্র আশ্রমসন্নিধানে প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরম তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহারাজাধিরাজ শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশ্রীভাগবতী কথামৃত শ্রবণমানসে পরমতত্ত্বজ্ঞ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব পরমহংস মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাপ্রভুপাদকে করযোড়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"

সদলঙ্কারসংযুক্ত শ্রুতিমধুর বাক্যে কথকঠাকুর পরিবেশ বর্ণনা করতেন, প্রাচীন পুঁথিগুলিতে তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোথাও মেঘ-মন্দ্র দিবসের বর্ণনা, কোথাও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রাত্রির বর্ণনা, কোথাও বা আনন্দ উৎসব-মুখরিত

রাজবাটীর বর্ণনা, কোথাও শান্তরসাস্পদ তপোবনের বর্ণনা।

ঐ পালা-পুঁথিগুলির রচনা সরস ও সুন্দর হলেই যথেষ্ট হ'ত না। অনুষ্ঠানের সাফল্য বা উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভর ক'রত কথকঠাকুরদের বাক্‌নৈপুণ্য, পরিবেশন-কুশলতা, স্বরমাধুর্য ও বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমার উপর। ঐ পুঁথি তাঁদের প্রসঙ্গের মুখ্য বা প্রধান অবলম্বন হিসেবে থাকত। প্রসঙ্গত তাঁরা পুঁথির বাইরেরও বহু কথা-কাহিনী ও তথ্য-তত্ত্ব পরিবেশন করতেন। এমনকি সময়ে সময়ে তাঁরা বহু অবান্তর বিষয়েরও অবতারণা করতেন—সর্বদাই তাঁদের লক্ষ্য থাকত বিষয়বস্তুকে সরস ও সহজবোধ্য করার দিকে। তাঁদের স্বাভাবিক বাচন-ভঙ্গিমা ও বর্ণন-দক্ষতায় অতি নীরস শুষ্ক বিষয়ও সরল শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হ'ত।

সেকালে আমাদের কথক-পণ্ডিতগণের মতো ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রচারকগণও অনেকে এদেশে নিজেদের ধর্ম-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাধনা-আদর্শ প্রভৃতি ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে কথকতাকে অন্যতম বাহনরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানদের শাসনকালে ইসলাম ধর্মের মহিমা ও প্রভাব দেশময় বিস্তারকল্পে 'নবী-কাহিনী' কথকতা প্রচলিত হয়। তাঁরা তখন মহান্ পীরপয়গম্বরের পুণ্যচরিত-মাহাত্ম্য আপামর সাধারণের মধ্যে কথকতার পদ্ধতিতে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

মৌলভী-মোল্লা কথকগণ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাই তাঁরা পারশী, আরবী ও উর্দু মিশ্রিত ভাঙা ভাঙা বাংলায় কবিতা রচনা ক'রে বিচিত্র সুরলালিত্যে 'নবী-কাহিনী' কথকতা করতেন। ঐরূপ কবিতায় রচিত নবী-কাহিনী বা ইসলামী কথকতার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করি:

আমীর বলন্ত: আমি আরবনন্দন।
হামজা আমার নাম বিদিত ভুবন॥
আমীরের নাম শুনি লন্দুরে বোলয়।
আমাকে বান্ধিতে তুমি যাইলে মহাশয়॥
আমীরেও বলিলেনত: আমি সেই জান।
তা শুনি লন্দুরে গদা লয় তোর মান॥
আমীরে ছিকর ধরি কহিলেক আগে।
লন্দুরে গুরুক হানিলেক মহা বেগে॥

খৃষ্টান পাদ্রীগণ কথকতায় এদেশের জনসাধারণের গভীর অভিনিবেশ ও প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করেন। তাঁরা নিজেদের ধর্ম-সাধনা তথা মহাত্মা যীশুখৃষ্টের শিক্ষাদর্শ ও মতবাদ জনমণ্ডলীকে বক্তৃতাদ্বারা বোঝাতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, ঐরূপ শুষ্ক বক্তৃতায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তাঁরা তখন কেউ কেউ মনোযোগ সহকারে কথকতা শুনে তার ভাব-ভঙ্গিমাগুলি সযত্নে আয়ত্ত করেন। পরে তারই মাধ্যমে তাঁরা যীশুর 'সুসমাচার' প্রচারে ব্রতী হন। এই উপায়ে তাঁদের প্রচারকার্য সহজতর হ'য়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় (বাংলা সংস্করণ) প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে (২৬শে ফাল্গুন, ১২৭৭ সাল) প্রকাশিত একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী এখানে উদ্ধার করি:

"কিছু দিন হইল জনকয়েক খৃষ্টিয়ান মফঃস্বলে তাম্বু ফেলিয়া তথায় ধর্মপ্রচার করিতে অবস্থিতি করেন। আমরা তাঁহাদের মুখে শুনি যে, কথকতা খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পাঠে অবগত হইলাম যে, লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড লঙ্, অন্যান্য জনকয়েক সাহেব সঙ্গে করিয়া উত্তরপাড়ায় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে কথোপকথন শুনিতে যান

এবং তৎশ্রবণে মোহিত হইয়া নিজ ধর্মপ্রচারের একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।"

কথকের পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্র-পুরাণাদিতে গভীর জ্ঞানই কথকতার উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। দেখা যায়, সুপণ্ডিতগণ অনেকেই শাস্ত্রাদির নিগূঢ় মর্ম সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। অথচ, সাধারণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ তা সকলের বোধগম্য অতি মনোজ্ঞ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। পাণ্ডিত্য এবং ব্যাখ্যান-নৈপুণ্য পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত হলেও উভয়ের স্রোতোধারা সব সময় একই খাতে প্রবাহিত হয় না। সুতরাং সুপণ্ডিত মাত্রই যে উত্তম ব্যাখ্যাতা হবেন তার কোন অর্থ নেই।

ব্যাখ্যান-কুশলতার সমস্ত কৃতিত্বটা কথক ঠাকুরের গভীর পাণ্ডিত্যেরই ফল নয়। কোন কোন ভাগ্যবান্ কথক কথকতা-কালে পাণ্ডিত্যের অতীত এক ভাবরাজ্য থেকে অন্তরে প্রেরণা লাভ করেন। তার ফলে, ঐ সময়ে তাঁদের হৃদয়ে পরম পবিত্র এক স্বর্গীয় ভাব প্রকাশিত হয়। তখন স্বয়ং বাগ্‌দেবী যেন তাঁদের কণ্ঠে আবির্ভূতা হ'য়ে তাঁদের কথার রাশ ঠেলে দেন এবং তাঁরা তন্ময় চিত্তে কথকতা করেন।

ঐরূপ প্রেরণাপ্রসূত কথকতাই সার্থক। তার প্রভাব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অপরিসীম আবেদন ও সুগভীর ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। ফলে, সমাগত শ্রোতৃবর্গেরও মন ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাব-লোকে আরোহণ করে। তখন তাদের মন হ'তে সকল অবসাদ বিদূরিত হয়। তারাও তন্ময় হ'য়ে পরম আগ্রহভরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাসনে বসে ঐরূপ কথকতার রস-মাধুর্য আস্বাদন করে। সময়বোধ এবং গৃহ-কর্মাদি বিষয়ের চিন্তা ঐ কালে তাঁদের মন হ'তে তিরোহিত হয়। কীভাবে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হ'য়ে যায়, সে সম্বন্ধে তাদের একেবারে হুঁশ থাকে না। কথকতা-শেষে তারা প্রচুর আনন্দ ও পরিতৃপ্তি নিয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। ঐরূপ ভাবময় কথকতার সুমধুর রেশ ও বিমল আনন্দ বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও উপদেশ

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ভারতের সভ্যতা, ভারতের ভাব, পরকে আপন ক'রে নেয়, নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় না ক'রে নিজের যা কিছু ভালো, যা কিছু জনগণের অন্ধকার চিত্তে আলোকপাত করতে পারে, পথভ্রষ্টকে পথ দেখাতে পারে—তা বিলিয়ে দেয়, দেশ ও দশকে উন্নততর স্থানে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ এই হিন্দুর ধর্ম, তার আদর্শও এই। এই জাতি আবহমান কাল সাধনার ফলে অনেক কিছু পেয়েছে, তার সবটুকুই সে জগতের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে সার্থকতা লাভ করছে।

ভারতের বুকে অনেক আলোড়ন হ'য়ে গেছে, অনেক রাজ্য গড়ে উঠেছে, অনেক ভেঙেও গেছে, ভারত কোনদিন তার আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হয়নি। বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনই ভারতের সভ্যতার কেন্দ্রশক্তি। যুগে যুগে এই সভ্যতাকে বহু নূতন জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, তার ফলে সে তার মনন-সম্পদ বিতরণ ক'রে সকলকে সমৃদ্ধ করেছে, মহত্তর করেছে।

এই জীবন-দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য বহুর মধ্যে একত্ব-দর্শনের সাধনা। যুগে যুগে

এদেশে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা বহুরূপে বহুভাবে সাধনা ক'রে সেই একই ভাবের বিচিত্র বিকাশ দেখেছেন, বিভিন্ন মত নিয়ে, বিভিন্ন পথ দিয়ে তাঁরা একই অনুভবে পৌঁছেছেন।

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত প্রেমই ভারতের সাধনা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এই সত্যকেই পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। ভারতীয় দর্শনে—সাধনার প্রয়োজনে প্রেম মৈত্রী ও সাম্যের কথা আছে; শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে এই তিনটি ভাবকে আমরা রূপায়িত দেখতে পেয়েছি।

তাঁর অসংখ্য উপদেশ আমরা পেয়েছি; জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষকে তিনি সচেতন করতে চেয়েছেন, জানিয়েছেন মানুষের জীবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা।

মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখুক, কপটতা বা ছলনা ত্যাগ ক'রে, মন মুখ এক ক'রে সরল হোক, তবেই ভগবানকে পাবে, ঠাকুর এ কথা জোর করেই বলেছেন। অনেক জন্মের তপস্যার ফলে মানুষ সরল হয়, আর সেই সরলতাই বড় কাছে এনে দেয় ভগবানকে। অনন্ত ভগবান ভক্তের একাগ্র সাধনায় সান্ত-রূপে ধরা দেন—এ সত্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে লাভ করেছেন, তাই দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন: যে যে ভাবেই সাধনা কর, পৌঁছাবে সেই একই স্থানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: ভিন্ন ভিন্ন রূপে আরাধনা করলেও ভক্ত দেখতে পান একই ঈশ্বরকে—তাঁর আরাধ্যকে, সর্বত্রই যিনি বিদ্য-মান। ভগবান কল্পতরু, তাঁকে যে যেভাবে ডাকবে সেইভাবেই তিনি তাকে দেখা দেবেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে জানা, ঈশ্বরের বিষয় শোনা,—আর বিজ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁর দর্শন পাই, তাঁর সঙ্গে কথা বলি, তাঁকে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে পাই।

ঠাকুর ভাবকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন, এতে যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই,—চাই শুধু বিশ্বাস। সংসারে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সংসারী মন যখন বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, সেই সময় ঠাকুরের বাণী চিত্তে শক্তি সঞ্চার করে।

সংসারের কাজ ক'রে যাও, কিন্তু ভগবানের দিকে মন রাখো—এই ছিল তাঁর উপদেশ। হাজার কাজের মধ্যে তাঁর নাম কর, মনে রেখো তুমি দাসীমাত্র। পরের সংসারে কাজ ক'রছ, যেদিন জবাব হ'য়ে যাবে সেদিন ফিরে যেতে হবে আপনার ঘরে, আপনার জনের মাঝে। সে আপন জনকে বিস্মৃত হয়ো না।

ঠাকুর বার বার বলেছেন: পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকতে, কাদামাটি যেন গায়ে না লাগে। নিষ্কামভাবে কর্ম কর, কর্মফল তাঁর উপর ফেলে দাও। কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকলেই কর্ম দুঃখের কারণ হয়, এইটি সর্বদা মনে রাখতে হবে।

ঠাকুরের মঙ্গলবাণী সাধককে পথ দেখায়, সংসারীকে সৎ প্রেরণা যোগায়, তাকে জীবন-যুদ্ধে জয়ী করে।

কুমারিলভট্টের জ্ঞানবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

কুমারিলের মতে আত্মার [মনের] ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞানোৎপত্তির ফলে 'বিষয়' প্রকট হয়, কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে থাকে (১) জ্ঞাতা (২) জ্ঞেয় (৩) জ্ঞানের কারণ ও (৪) জ্ঞানের ফল অর্থাৎ জ্ঞেয়ের জ্ঞাততা।

জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু জ্ঞানের ফল হইতে (জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাকট্য বা জ্ঞাততা হইতে) জ্ঞানের অনুমান হয়। জ্ঞান-ক্রিয়ায় জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধের উদ্‌ভব হয়। সেই সম্বন্ধ-সৃষ্টিতে জ্ঞাতার ক্রিয়া থাকে। এই সম্বন্ধ আছে বলিয়া জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্তার (জ্ঞাতার) ক্রিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়, এবং এই সম্বন্ধ হইতে জ্ঞানের অনুমান হয়। সংবিদ্ (consciousness) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ-সাধক তৃতীয় বস্তু। যাঁহারা বলেন—জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ উদ্‌ভূত হয়, তাহা মানস প্রত্যক্ষে অনুভূত হয়। 'আমি ঐ ঘট জানি'—ইহা আমরা বলিতে পারিতাম না, যদি জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞাত বিষয়ের সম্বন্ধ এবং জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আমরা জানিতে না পারিতাম। এখন বিবেচ্য—জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ হয়, এবং জ্ঞানের বিষয় সংবিদ্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সংবিদ্ ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় কিসের দ্বারা? একই জ্ঞানে বিষয়-জ্ঞান ও এই সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে পারে না। কেননা এই জ্ঞানোৎপত্তির সময় এই সম্বন্ধের উদ্‌ভবই হয় নাই। জ্ঞানই এই সম্বন্ধ। তাহার উৎপত্তির পরে তাহার সহিত সংবিদের সম্বন্ধ হয়। যখন কোন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন তাহার বিষয় প্রকাশিত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সেই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহা প্রথমে বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া পরে বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ইহা বলা যায় না। জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যে স্বপ্রকাশ, তাহাও বলা চলে না। তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এই জন্য কুমারিল-শিষ্যগণ আত্মা এবং বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা মানস-প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেন। তাই মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

জ্ঞানে জ্ঞেয়ের এক বিশেষ রূপ (অতিশয়) জ্ঞান কর্তৃক সৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ত্রিতয়প্রতিভাসবাদিগণও (যাঁহারা জ্ঞানে—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন) এই অতিশয়ের উৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক-দর্শনের অনুগামিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জ্ঞানে বিষয়ের রূপান্তর হয় না। জ্ঞানসাম্য বিষয়ের গুণ নহে। ইহা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মধ্যে অনন্যসাধারণ সম্বন্ধ। কুমারিল জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন, তাঁহার অনুবর্তিগণ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে, তাহা জ্ঞানের বিষয় এবং সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্য অন্য

এক জ্ঞানের প্রয়োজন। তাহাতে অনবস্থার উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মতে জ্ঞান অনুমানগম্য।

কুমারিল 'প্রমা'র (যথার্থ জ্ঞানের) স্বতঃ-প্রামাণ্য স্বীকার করেন। জ্ঞানের উৎপত্তি ইন্দ্রিয় অথবা অনুমান হইতে হইতে পারে, কিন্তু ইহা আপনিই বিষয় প্রকাশিত করে, এবং তাহার স্বতঃপ্রামাণ্যের বোধ উৎপাদন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বিরোধী কিছু আবিষ্কৃত না হয় (যেমন ইন্দ্রিয়ের দোষ অপটুতা প্রভৃতি), ততক্ষণ জ্ঞানের সত্যতায় কোন সন্দেহ আমাদের থাকে না।

কুমারিলের মতে শুক্তিতে রজত-জ্ঞান জ্ঞান-রূপে প্রামাণিক, জ্ঞাতার মনে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। পাণ্ডুরোগে যে কোন বস্তু পীতরূপে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ চক্ষুতে পীত-রস ; চক্ষু পীতবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বাহিরের বস্তু পীতরূপেই দৃষ্ট হয়। তখন যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে আবির্ভূত হয়, তাহা বস্তুতঃ পীতবর্ণ। সন্দিগ্ধ জ্ঞানে যখন দূরে দৃষ্ট দীর্ঘাকার পদার্থ, কোন মানুষ অথবা অন্য কোন দীর্ঘাকার বস্তু—এই সন্দেহ হয়, তখন শুধু দীর্ঘ আকারই জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তখন মনে দীর্ঘাকারবিশিষ্ট দুই বস্তুর স্মরণ হয়।

অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা অজ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের কারণ। জ্ঞানের অপ্রামাণ্য ত্রিবিধ : (১) মিথ্যা জ্ঞান, (২) অজ্ঞান এবং (৩) সংশয়। সন্দিগ্ধ এবং মিথ্যা জ্ঞান ভাববাচক বস্তু ; ও তাহার উৎপত্তি হয় দোষযুক্ত কারণ হইতে, অজ্ঞানে জ্ঞানোৎপত্তির কারণের অভাব।

এই সকল আলোচনায় 'প্রামাণ্য' শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রত্যেক জ্ঞানই (সত্য হউক, মিথ্যা হউক) জ্ঞানরূপে প্রামাণিক, কেননা যে রূপেই তাহা প্রকাশিত হউক, সেই রূপেই তাহার অস্তিত্ব আছে। ভ্রান্তিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান—এই অর্থে প্রামাণিক। কার্যকালে যে জ্ঞান কার্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাই প্রামাণিক (pragmatic) এবং যাহা উত্তীর্ণ হয় না, তাহা অপ্রামাণিক।

ভ্রান্তি ও মিথ্যা জ্ঞান

সকল জ্ঞানেরই যদি স্বতঃপ্রামাণ্য থাকে, তাহা হইলে ভ্রান্তি কি ?

জৈন মতে—যে জ্ঞান আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অব্যবহিত ও অপরিহার্য উপায় তাহাই প্রামাণিক। যতক্ষণ কোন জ্ঞানের বিরোধী কিছু দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা সত্য। যে জ্ঞানে বস্তুদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা হইতে ভিন্ন সম্বন্ধে বস্তুর প্রকাশ হয়, তাহা মিথ্যা। যখন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, তখন যে স্থানে সর্পের অস্তিত্ব নাই, সেই স্থানের সম্পর্কে সর্প দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই জ্ঞান মিথ্যা। যাহা তথ্য, তাহা তথ্য হইতে ভিন্নরূপে দেখাই মিথ্যা জ্ঞান। এই মতকে সংখ্যাতি বলে।

উপরোক্ত মত ব্যতীত ভ্রান্তি সম্বন্ধে তিনটি মত আছে : (১) আত্মখ্যাতি, (২) বিপরীত-খ্যাতি অথবা অন্যথাখ্যাতি এবং (৩) অখ্যাতিবাদ।

বিপরীত বা অন্যথাখ্যাতি—ন্যায় বৈশেষিক ও যোগদর্শনে স্বীকৃত ; আত্মখ্যাতি বৌদ্ধ-দিগের মত এবং অখ্যাতি মীমাংসা ও সাংখ্য-দিগের মত।

বৌদ্ধগণ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান-প্রবাহ ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। এই বিজ্ঞান-প্রবাহ তাহার স্বীয় নিয়ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়মানু-সারে কখনও সত্য জ্ঞান, কখনও মিথ্যা জ্ঞানের উদ্ভব হয়—তাহাতে বিজ্ঞান-বাহ্য কোন বস্তুর ক্রিয়া নাই। বিজ্ঞান-বাহ্য কিছু থাকিলেও, একটি বিষয় হইতে কখনও সত্য জ্ঞান, কখনও

মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তির কোন হেতু নাই। জ্ঞান-প্রবাহের মধ্যেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উদ্ভব এবং তাহাদের সংযোগ হয়। সত্য ও মিথ্যা উভয় জ্ঞানেই ইহা ঘটে।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে বাহ্যকারণরহিত জ্ঞান হইতে যদি জ্ঞাতা ও ভ্রান্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে 'ইহা রজত' এই প্রত্যক্ষ হইত না। 'আমি রজত' ইহাই প্রত্যক্ষ হইত। 'বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই এবং আভ্যন্তরীণ জ্ঞান বাহ্যবস্তু-উদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়'—এ মতেরও কোন ভিত্তি নাই।

অন্যথাখ্যাতিবাদে শুক্তির বিশেষ ধর্ম ও রজতের ধর্মের ভেদ দৃষ্ট হয় না। আবার সেই সময়ে শুক্তির ঔজ্জ্বল্য ও অন্যান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ হইতে রজতের স্মৃতি আপনা হইতেই আবির্ভূত হয় এবং দৃষ্ট বস্তু রজত বলিয়া গৃহীত হয়। শুক্তি তখন শুক্তিরূপে জ্ঞাত হয় না, রজতের সহিত তাহার যে যে ধর্মের পার্থক্য তাহার জ্ঞান হয় না, কেবল রজতের সহিত তাহার সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয় বলিয়া রজতরূপে তাহার জ্ঞান হয়। রজতের স্মৃতি যে মনের মধ্যে আছে, এই তথ্যের তখন বোধ হয় না। কেবল রজত ও শুক্তির মধ্যে পার্থক্য-বোধের অভাব হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হইতে পারে না। কেননা যে জ্ঞান হয় তাহা ভাবাত্মক (positive), অভাবাত্মক (negative) নহে।

মীমাংসা-দর্শনের প্রভাকর-মতকে বলে অখ্যাতিবাদ। এই মতে প্রত্যেক জ্ঞানই সত্য, রজ্জুতে যখন সর্পজ্ঞান হয়, তখন দ্বিবিধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ হয়—প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও স্মৃতি-জ্ঞান, প্রত্যক্ষ রজ্জুর জ্ঞান ও স্মৃতি-সর্পের জ্ঞান। উভয় জ্ঞানই সত্য—কেবল তখন এইটুকু মনে হয় না যে, যে সর্পের জ্ঞান হইতেছে তাহা অতীতকালে দৃষ্ট। প্রত্যক্ষ রজ্জু ও স্মৃত সর্পের মধ্যে ভেদও লক্ষিত হয় না। ফলে সর্প দেখিয়া যাহা করিতাম, রজ্জু দেখিয়াও তাহাই করি; আমাদের আচরণ একরূপ হয়। এই আচরণই ভ্রান্তিদুষ্ট। স্মৃতি-প্রমোষ (স্মৃতি-বিচ্যুতি) অথবা তাহার ফলে বিবেকাগ্রহ এখানে জ্ঞানের ত্রুটি। ইহা অভাবাত্মক, ইহাকে ভ্রান্তি বলা যায় না। ভ্রান্তি একটি ভাববাচক মানসিক অবস্থা।

কুমারিল-পন্থিগণ প্রভাকরের মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষ ও স্মৃত বিষয়ের ভেদজ্ঞানের অভাব হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হয় না। ভ্রান্তিতে যাহা দৃষ্ট হয়, অনেক সময় তাহা ভাবাত্মক। রজ্জু দেখিয়া যে সর্পের ভ্রান্তি হয়, সেই সর্পের জ্ঞান অভাবাত্মক নহে; তাহা জীবন্ত সর্পের ভাবাত্মক জ্ঞান। যখন রজ্জু দেখিয়া বলি 'ইহা সর্প' তখন বাক্যের কর্তা বা উদ্দেশ্য 'ইহা' এবং বিধেয় 'সর্প'—উভয়ই সত্য; রজ্জু ও সর্প উভয়েরই জগতে অস্তিত্ব আছে। রজ্জু ও সর্পকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে বাক্যে সম্বন্ধ করাই ভ্রান্তি—এই প্রকার ভ্রান্ত 'সংসর্গ'ই (বাক্যের মধ্যে সংযোগ) ভ্রান্তি। সম্বন্ধ বিষয়গুলি সত্য, তাহাদের মধ্যে ভ্রান্তি নাই। এই প্রকার ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত আচরণ সত্য জ্ঞান হইতে উদ্ভূত আচরণ হইতে ভিন্ন। এই মতের সহিত ন্যায়দর্শনের অন্যথাখ্যাতি- বা বিপরীতখ্যাতি-বাদের ভেদ নাই, অখ্যাতিবাদ স্বীকার না করিলেও কুমারিল জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন।

পূর্বমীমাংসার তত্ত্ববিজ্ঞান

মীমাংসা-দর্শন বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী। এই মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহাদের সত্য অস্তিত্ব আছে। তাহাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক নহে। বৌদ্ধ শূন্যবাদ

মীমাংসা-দর্শনে প্রত্যাখ্যাত, বেদান্তের মায়াবাদও অস্বীকৃত। বহুবস্তুসমন্বিত বাহ্যজগৎ সত্য,—তাহার অস্তিত্ব মায়িক নহে, প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতীত মীমাংসা-দর্শনে আত্মা, দেবতা, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকৃত, এবং বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্তব্যতা উপদিষ্ট। জীবাত্মার সংখ্যা বহু, তাহারা নিত্য। জগতের উপাদান সকলও নিত্য, জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা কর্মের নিয়ম কর্তৃক শাসিত।

জগতে আছে ত্রিবিধ বস্তু—(১) ভোগায়তন জীবদেহ, (২) দেহ-সংশ্লিষ্ট ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ, এবং (৩) ভোগ্য বিষয়। দেহের দ্বারা জীবগণ কৃতকর্মের ফলভোগ করে, ইন্দ্রিয়গণ-সাহায্যে এই ভোগ সাধিত হয়। ভোগ্য বিষয় সুখ ও দুঃখ উভয়েরই জনক।

মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, মীমাংসকদিগের কেহ কেহ পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু পরমাণু-উপাদান দ্বারা জগৎসৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন না। কর্মের শক্তি দ্বারাই পরমাণু নিয়ন্ত্রিত। জীবদিগের কর্মানুযায়ী ভোগের জন্য যেরূপ জগতের প্রয়োজন, কর্মের শক্তিতেই সেরূপ জগৎ সৃষ্ট হয়।

মীমাংসা-দর্শন প্রত্যক্ষবাদী নহে। অপ্রত্যক্ষ বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা বৈদিক জ্ঞানকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের বিশেষ পার্থক্য নাই। জাতি, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভাকর ও কুমারিলের মত প্রায় এক প্রকার, কোন কোন বিষয়ে কুমারিল ন্যায়দর্শন অপেক্ষা সাংখ্য কর্তৃক অধিকতর প্রভাবিত। হিন্দু দর্শনসকলের মধ্যে সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনই কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (physics) একটা চিত্র তাত্ত্বিক দর্শনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে অল্প পরিবর্তিত আকারে ইহা গৃহীত হইয়াছে। কুমারিল ও প্রভাকর বৈশেষিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শনে অনুশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানের সহিত ন্যায়-বৈশেষিকের মত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে ন্যায়-দর্শনের সহিত মীমাংসা-দর্শনের মিল নাই। মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা করা। ঈশ্বর হইতে বেদের প্রামাণ্য উদ্ভূত নহে, এবং অন্য প্রমাণ দ্বারাও বেদের প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মীমাংসা প্রথমেই সকল জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে 'কিরূপে ধর্ম অর্জন করা যায়?' তাহা ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না; কেননা ধর্ম এমন কোন বিদ্যমান বস্তু (existing something) নহে, যাহার জ্ঞান অন্য প্রমাণ দ্বারাও লাভ করা যায়। পরন্তু কেবল বেদের আদেশ পালন দ্বারাই ধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম ও অধর্ম জ্ঞানের জন্য বেদের শব্দ-প্রমাণই আমাদের একমাত্র উপায়; অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হইয়াছিল—কারণ তাহা ভিন্ন অনেক বৈদিক বাক্যের অর্থ বোধ করা দুঃসাধ্য। অন্য সকল দর্শনে সৃষ্টি- ও প্রলয়-বাদ অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিপ্রলয় স্বীকার করিলে বেদের নিত্যত্ব থাকে না, এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বই এইজন্য মীমাংসা-দর্শনে অস্বীকৃত।

আত্মা

যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ও তাহার ফলভোগের জন্য দেহব্যতিরিক্ত আত্মার প্রয়োজন। আত্মা

না থাকিলে যজ্ঞই বা কে করিবে, স্বর্গেই বা যাইবে কে? সুতরাং মীমাংসা-দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হইতে আত্মা ভিন্ন। আত্মা নিত্য, বিভু এবং বহু। প্রত্যেক দেহে একটি করিয়া আত্মা। শবরস্বামী জ্ঞাতার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা স্বসংবেদ্য (আপনা কর্তৃক জ্ঞেয়) কিন্তু অন্য কর্তৃক অদ্রষ্টব্য ও অদর্শয়িতব্য। শবর-মতে আত্মা ও সংবিদ্ (consciousness) অভিন্ন। তিনি বলিয়াছেন, 'জ্ঞানাতিরিক্তঃ স্থায়ী জ্ঞাতা বর্ততে'—জ্ঞানের অতিরিক্ত স্থায়ী জ্ঞাতা আছেন। সেই জ্ঞাতা আপনাকে জানেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

নিদ্রাকালে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকে। বুদ্ধি যদি আত্মার নিত্য সহচর হইত, তাহা হইলেও তাহারা যে অভিন্ন, তাহা বলা যাইত না। ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, দেখা যায়। ইন্দ্রিয়ে অনুভূত বিষয়-সকলের একত্ব-বিধান আত্মা কর্তৃক সাধিত হয়। সকল জ্ঞানেই আমরা জ্ঞাতাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করি। দেহের উপাদানসকল অচেতন; তাহাদের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেহ তাহার অতিরিক্ত আত্মার উদ্দেশ্যসাধক, এবং আত্মা কর্তৃক চালিত। স্মৃতি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আত্মার পরিণাম হয়, কিন্তু সকল পরিণামের মধ্যে আত্মা বর্তমান থাকে। জ্ঞান আত্মার গুণ। আত্মা দ্রব্য। আত্মার পরিণাম হয়, এবং কর্মের ফল-ভোগের সময় সেই ফল-কারক কর্মের স্মৃতি আমাদের থাকে না। ইহা দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব খণ্ডিত হয় না। কর্মের ফলভোগের জন্য স্থায়ী কর্মকর্তার প্রয়োজন। তাহা স্বীকার না করিলে কর্মবাদের কোন অর্থই হয় না। বৌদ্ধগণ কর্মফলের এবং পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হয় না। যে বিজ্ঞানপ্রবাহের কথা বৌদ্ধগণ বলেন, তাহা দ্বারা আত্মা, সংবিদ্, কামনা, স্মৃতি, সুখ ও দুঃখের ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের বিভিন্ন অংশে যে পরিণাম ঘটে, আত্মা তাহা অবগত হন। সুতরাং আত্মা অণুপরিমাণ নহেন। আত্মা বিভু এবং একটির পরে অন্য একটি দেহ ধারণে সক্ষম। আত্মার শক্তি দ্বারাই দেহ চালিত হয়। আত্মা বহু। তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হইত না। শরীরের ক্রিয়া দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অন্য আত্মার অস্তিত্বও অন্য দেহের ক্রিয়া হইতে অনুমিত হয়। এক সূর্য হইতেই জলে বহু প্রতিবিম্ব-সূর্যের উদ্ভব হয়—এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মা যে এক ও অদ্বিতীয় তাহা প্রমাণিত হয় না; কেননা জলে বিভিন্ন প্রতিবিম্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ তাহাদের আধার ভিন্ন ভিন্ন জলাশয় হইতে উদ্ভূত হয়। এই উপমা আত্মার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে বিভিন্ন দেহে আত্মা-প্রতিবিম্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ দেহ হইতে উদ্ভূত হয়, বলিতে হয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ অচেতন দেহের গুণ হইতে পারে না। সুখ-দুঃখ আত্মার গুণ, সুতরাং আত্মাকে এক ও অদ্বিতীয় বলা যায় না।

বিশ্বকৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই যুগে বিশ্বকৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে মানবসমাজকে চালিত করিতেছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হইবার পরে আসে একটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের একটি লক্ষ্য ছিল—মানুষের দৈহিক শ্রম লাঘব করিয়া কিসে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো যায়। কলকব্জা আবিষ্কৃত হইল। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল; কিন্তু কলকব্জা যখন বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া ব্যাপকভাবে তৈরী হইতে লাগিল, তখন যাঁহারা ঐসব ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারা লোভপরতন্ত্র ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ মানুষের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়া মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সমাজে ক্ষমতা অর্জন করিয়া অপরের উপর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দাসত্বের ভার চাপাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বিরাট বিরাট শিল্পকেন্দ্রে সহস্র সহস্র নরনারী আত্মবিক্রয় করিয়া উদরপূর্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা অপহৃত হইল। মানুষগুলি পেটের দায়ে কলকব্জার অঙ্গহিসাবে কলের মতো জীবন যাপন করিতে লাগিল। কলকব্জা যেমন অনুভূতিশূন্য কার্য করিতে থাকে, মানুষগুলি মানবসুলভ অনুভূতি হারাইয়া নিষ্ঠুর কলের সেবা করিতে লাগিল। কলকব্জার নেতারা মানবসুলভ সমবেদনা হারাইয়া মানুষের প্রতি কলের মতো ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে মানবের ব্যক্তিত্ব (Human personality) খর্ব হইতে লাগিল। নির্মম ব্যবহারে নেতাদের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র হইয়া গেল এবং সাধারণ নরনারীর ব্যক্তিত্ব দাসত্বের শৃঙ্খলে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। মানবীয় আত্মাগুলি (Standardised) ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিচরণ করিতে লাগিল। জগতের বড় সমস্যা তখনই, যখন ব্যাপকভাবে মানবাত্মা হীন ও দুর্বল হইয়া মানবের সমষ্টিভূত কল্যাণকে ধ্বংস করিতে থাকে। মানবসমাজের দুর্দিন সেইদিন, যেদিন মানুষ ব্যাপকভাবে নিজেদের সত্তা হারাইয়া আত্মহা-ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে।

ঐ যুগে একদিকে ভোগবাদ বিজ্ঞানের জড়বাদকে আলিঙ্গন করিয়া মানবীয় কৃষ্টিকে সমূলে উৎপাটন করিতে লাগিল। যে যুক্তিবাদের খাতে বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ঐ যুগে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আদর্শহীন ও প্রাণহীন। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষা ও দীক্ষা সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। আত্মার অস্তিত্ব বা তাহার অমরত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায় তখনকার যুগে উচ্চশিক্ষিত নরনারী ধর্মবিজ্ঞান বা দার্শনিক সত্যগুলিকে কয়েকজন বিকৃতমস্তিষ্ক তথাকথিত মহাপুরুষ বা মতলবী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কল্পনাপ্রসূত মনে করিতে লাগিলেন। যে সত্য প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ, প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিস ও প্লেটো, প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার প্লটিনাস ও পরফিরী, প্রাচীন চীনের লাউজে প্রভৃতি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন —উহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সন্দেহস্থল ও

কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যের এই তরঙ্গ প্রাচ্যের সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করিল এবং প্রাচ্যের কৃষ্টিভূমি ভারতবর্ষ বিশেষভাবে সর্বপ্রকারে আক্রান্ত হইল। পাশ্চাত্য রাজশক্তি ভারতের অতীত গৌরবকে খর্ব করিয়া ধর্ম, দর্শন ও নীতির উপর প্রবল আঘাত করিতে লাগিল। বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে ভারতীয় জীবন ও কৃষ্টি পূর্বেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এখন নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার চাপে তাহা নূতন করিয়া পরপদানত হইয়া পড়িল।

সেই যুগে কলিকাতা মহানগরী ভারতবর্ষের অভিনব শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। সর্বপ্রকারে আত্মবিস্মৃত করাইয়া যে শিক্ষা ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে পঙ্গু করিবে, সেই শিক্ষা সুচিন্তিত প্রণালীতে যে বৎসর প্রবর্তন করা হইল—সেই বৎসরই প্রাচীন জগতের তথা ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

ইঁহার আবির্ভাবের পূর্বে কতিপয় মহাত্মা ও সম্প্রদায় ভারতের কৃষ্টি এবং প্রাচ্যের মৌলিকতা বজায় রাখিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রবর্তিত সম্প্রদায়গুলি এই প্রাচীন যুগের ভগ্নস্তূপের উপর কতকগুলি অস্থায়ী ও আংশিক সংস্কার করিলেন। প্রাচ্যের সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টি ও পূর্বতন যুগাচার্যগণের অলৌকিক প্রতিভাকে দাঁড় করাইয়া ঐ যুগের সর্বগ্রাসী বন্যারূপী প্রতীচ্য সভ্যতাকে ব্যাহত করিতে পারিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময় কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করিয়া যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য কঠোর সাধনা করিতেছিলেন—সেই সময় শিক্ষিতাভিমানী ভারতবাসী বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, দেবদেবী, ভারতীয় দর্শন, পূজাপদ্ধতি, উপাসনাপ্রণালী, যোগশিক্ষা, পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক রীতি-নীতি এবং অবতারসমূহের জীবনকাহিনী ও বাণী প্রভৃতি সর্ববিষয়ে আস্থাহীন হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও জড়বাদের তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যুগে কোন কেতাবী শিক্ষার ধার ধারেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প বা সভ্যতার কোন কিছু তাঁহার জীবনে কোন ছায়াপাতই করে নাই। তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তা করিয়া নিজের জীবনকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গঠিত করিতেছিলেন। সত্যকে জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করিবার জন্য তিনি এক তীব্র সত্যনিষ্ঠা লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অলৌকিক জীবনে কি বাক্যে, কি চিন্তায়, কি কর্মে, কি ধর্মে ও কি ব্যবহারে কখনও অসত্যের সম্পর্ক রাখেন নাই। কি জাগ্রতে, কি স্বপ্নে, কি নিদ্রায় তিনি অপূর্ব সংযম সাধনা করিয়া নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল সাধনার মূলে ছিল—ঐকান্তিকতা, বিচারশীলতা ও ব্যাকুলতা। বর্তমান যুগে মানুষ কত সহজ উপায়ে নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে পারে এবং সত্য মূর্ত হইয়া কি ভাবে সত্যান্বেষীকে সহায়তা করেন—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সাধক-জীবনের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই। সত্যের পথে বর্তমান যুগে কি কি বস্তু বিশেষ পরিপন্থী—তাহা তিনি সাধনপথে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগের পূর্বে ভারতে যে মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল, তিনি তাঁহার সাধক-জীবনের প্রারম্ভে তাহা সাধনা করিয়া কৃতকার্য হন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যেমন প্রথমে মাতৃনামে ক্রন্দন

করিতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই সাধকভাবে ব্রতী হইয়া পরম সত্যকে 'মা' বলিয়া কাতর আহ্বান করেন। বৈদিক যুগের ঋষিদৃষ্ট সত্য-গুলি তিনি সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রামায়ণবর্ণিত সীতাকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীরামসহায় হনুমানের ভাবে সাধনা করিয়া তিনি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নয়ন-গোচর করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণীর ভাবে সাধনা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ভারতবাসীকে তিনি দেখাইলেন যে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কবিকল্পিত বা ভক্তভাবিত ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহারা সত্যই এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধ্যানসহায়ে তিনি যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্যকে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত পথের ঐক্য-দর্শন করিয়া 'যত মত তত পথ'-রূপ যুগবাণী প্রচার করিলেন। জৈন সম্প্রদায় ও নানক এবং তুলসীদাস প্রমুখ মহাপুরুষদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। সর্বধর্মের এবং সর্বমতের সমন্বয়ভূমিতে আরোহণ করিয়া তিনি নিজের বাণী জগতের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বেদমত ও পুরাণমতের ঐক্য তাঁহার মধ্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছিল। পুরাণ ও তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি উভয়ের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সাধনা করিয়া নিজের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশঙ্করের মিলনভূমি তিনি দেখাইয়াছিলেন। যোগ ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ তাঁহার ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের পরিপূর্ণ সাধনা করিয়া অপূর্ব ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁহার জীবনে সদা জাগরূক থাকিত। ঋষি-প্রদর্শিত হিন্দু দেবদেবীকে তিনি শুধু শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নহে, অপিচ তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া আলাপ করিতেন। তিনি সকল অবতারগণের সহিত যেমন একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন, তেমন সকল দেবগণের মধ্যেও নিজের স্বরূপ দেখিতেন ও দেখাইতেন। বেদান্তের দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি মত-বাদগুলি তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার বাণীর মধ্যে এই সকল মতের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

তিনি ব্যাবহারিক জীবনে—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পাপী, কি সাধু সকলের মধ্যে এক আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি সন্তান-ভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। দারপরিগ্রহ করিয়া সহধর্মিণীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, জগজ্জননীর আসনে বসাইয়া ইষ্টদেবীরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া-ছিলেন। তিনি সহধর্মিণীর সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃত্যুর বা পর-কালের ব্যবধান ছিল না। তিনি এই সম্পর্কে এক অনন্ত সত্তার মধ্যে ইহজীবন ও পরজীব-নের সমন্বয় করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাণী সর্বদেশ, সর্বধর্ম ও সকল শাস্ত্রকে এবং সকল অবতারপুরুষকে গ্রহণ করিয়া এক অপূর্ব সার্বভৌমিকতা সৃষ্টি করিয়াছে।

তাঁহার উপদেশ ও জীবন—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে সকল ব্যক্তিকে সমভাবে স্পর্শ করিতে পারে। তাই তিনি বর্তমান জগতে এত মৌলিক, এত অভিনব ও এত জীবন্ত প্রতীয়-মান হইতেছেন।

ভারতীয় জীবনকে ও ভারতীয় সমাজকে উন্নত করিতে তাঁহার বাণী বর্তমান যুগে

অদ্বিতীয় অনুমিত হইতেছে। তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে ভারতের জাতীয়তা স্পন্দিত হইয়াছে এবং জাতীয় আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ভারতের আত্মাকে পূর্ণভাবে নিজ জীবনের ও বাণীর মধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত শিবজ্ঞানে জীব-সেবা প্রত্যেক ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের ও দেশের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। কারণ, ইহা মানুষের প্রতি মানুষের একটি মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত করিতেছে। এই দিব্য দৃষ্টিভঙ্গীতে কার্য করিলেই জগতের মধ্যে যে অশান্তি ও হানাহানি চলিতেছে—তাহার উপশম হইতে পারে। কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—সব নীতির মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিতে অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম চালিত না হইলে জগতের কল্যাণ ও শান্তি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই তাঁহার বাণীর প্রকৃষ্ট রূপায়ণ। তাঁহার জীবনই জগতের ও ভারতের ইতিহাসে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান।

পদধ্বনি কানে আসে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অনন্তকালের স্রোতে সংখ্যাতীত বুদ্‌বুদের সম
উঠিতেছে নিত্য চিন্তা শত শত ভাবের আবেগে,
সংগ্রাম-সংঘাতে জয়ী যে বুদ্‌বুদ, তাহা সর্বোত্তম,
আর সবি মিশে যায় মহাতরঙ্গের স্পর্শ লেগে।
সে বুদ্‌বুদ গঙ্গাতীরে ভবতারিণীর ঘাটে তুমি
হংসের আসনে বসি রেখে গেছ প্রভু! সর্ব ধর্ম
করি সমন্বয়,—আজ সে যে করিতেছে বিশ্বভূমি
আলোড়িত! আসুরিক যন্ত্র-সভ্যতার ঘৃণ্য কর্ম
হতেছে বিলীন এবে উল্লোলিত চৈতন্য-সিন্ধুতে,
নিঃশ্রেয়স লভিবার দিন এলো বুদ্‌বুদ-বিন্দুতে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল হ'তে যেই জ্যোতি এনেছিলে সাথে,
তারি শিখা হ'তে হেরি জ্বলিতেছে শত দীপশিখা;
অকম্পিত রহে তারা দুর্দিনের হিমশিলা-পাতে
ঝঞ্ঝার আঘাতে। মহাভারতের গূঢ় আধ্যাত্মিকা
স্পর্শে তব হয়েছে উদ্ধার যাহা, তার তত্ত্ববাণী
জেগে ওঠে দিকে দিকে কৃপাসিক্ত বীজমন্ত্রে তব।
জড়-অধ্যুষিত ধরা বুকে লয়ে পাদপদ্মখানি
মৌন প্রতীক্ষায় শবরীর সম। ধরি' রূপ নব
তুমি যে আসিবে ফিরে নরদেহে হেথায় আবার,
পদধ্বনি কানে আসে পূর্ণ করো তব অঙ্গীকার।

শুদ্ধা ভক্তি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত

ধর্ম অর্থে সাধারণতঃ বোঝায় একটি মিশ্রভাব। সে ভাবের সাথে জড়িয়ে আছে অজানার ভয়, বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে বিস্ময় এবং নিজের অসহায়তার উপলব্ধি। দুর্বল মানুষ চায় এক বিরাট শক্তির ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে। তার বিশ্বাস যে এই বিশ্বশক্তি সহানুভূতি-সম্পন্ন—চোখের জলে সে সাড়া দেয়, বিপদের মুহূর্তে সে পাশে এসে দাঁড়ায় ও অন্ধকারে চলার পথে সে আলো দেখায়। এই সহানুভূতিতে বিশ্বাসের ফলে আসে কৃতজ্ঞতা, যার পরিচয় আমরা পাই আদিম মানুষের দেবতার স্তবগানে।

সাংখ্যদর্শনের মতে দুঃখবোধই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার মূল কারণ—'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা'। কিন্তু এ প্রশ্ন শুধু দুঃখজনিত নয়। সত্য কিংবা তত্ত্ব জানবার ইচ্ছাও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অজ্ঞতার বেদনা তার কাছে অসহনীয়।

বিভিন্ন ভাবের এই ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে একজন প্রেমময়কে ভালবাসতে। তার এ অন্তরের আকুতি চিরন্তন। উপনিষদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারও আগে বৈদিক ঋষি করেছেন ভগবান বরুণের স্তব রচনা! সে গান প্রেমের সুরে বাঁধা। ভালবাসার মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুষমাবোধ আছে তারই স্ফুরণ বৈদিক ছন্দে 'উষা'র বন্দনায়।

পুরাণের ভক্তি আর্য ঋষির প্রাণধর্মের ক্রম-প্রকাশ। বেদবিভাগের ও মহাভারত লেখার পরও মহর্ষি ব্যাসের অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ হয়নি। তাই সেই শূন্য গগনে বেজে উঠল দেবর্ষি নারদের প্রেমের বীণায় হরিগুণগান। শ্রীমদ্ভাগবত হ'ল রচিত। সে ভাগবতের ভগবানকে স্তব করলেন বালক ধ্রুব :

> ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বম্
> সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
> তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলম্
> বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তোবন্ধো॥

—প্রভু, একদিন তোমারই দেওয়া জ্ঞানে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে পিতামহ ব্রহ্মা দেখেছিলেন এই বিশ্বকে ছায়াছবির মতন—যেমন ক'রে মানুষ দেখে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে সদ্য ঘুমভাঙা-চোখে। ওগো আর্তের বন্ধু, সেই তোমার মুক্তিপ্রদ পা-দুখানি এই সফলতার মুহূর্তে ধ্রুব ভুলে যাবে—এত অকৃতজ্ঞ সে নয়। বিষ্ণুপুরাণে গাইলেন প্রহ্লাদ :

> নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
> তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তে সদা ত্বয়ি॥

—ওগো অচ্যুত, যত বার যত নীচ জন্মই আমার হ'ক না কেন, তোমার পায়ে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে।

সেই অচলা ভক্তির আকর্ষণে অচল তত্ত্ব চঞ্চল হ'য়ে উঠল, আর জ্ঞানময় দেখা দিলেন প্রেমময় হ'য়ে। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই :

> ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার,
> কৃষ্ণ যার অন্ত না পায়, জীব কোন ছার ;
> ভক্তপ্রেমের যত দশা যে গতি প্রকার,
> যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ;
> কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে
> ভক্তভাবে অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥

* * *

ভগবান কৃষ্ণের ভক্তভাবে সে রস আস্বাদনের

প্রতিজ্ঞা এবার পূর্ণ হ'ল 'কথামৃতে'। শ্রীরামকৃষ্ণ ফুল হাতে ক'রে প্রার্থনা করলেন, 'মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

যে বস্তু স্বভাবতঃ শুদ্ধ, তার সাথে কোন ভাব-মিশ্রণ—আচার্য শঙ্করের ভাষায় কোন 'সংযোগ' কিংবা 'সমবায়'—অসম্ভব। মানুষের ভালবাসা অবিমিশ্র অনুভূতি নয়; তার চিন্তাও শুদ্ধ নয়। তাই মানবীয় চিন্তা কিংবা ভাবের মাধ্যমে এই শুদ্ধা ভক্তিকে প্রকাশ করা যায় না। 'কথামৃতে'র ভাষায় ব্রহ্মজ্ঞান যেমন কেবল 'বোধে বোধ হয়', শুদ্ধা ভক্তিও তেমনি কেবল অনুভবেই অনুভূত হয়। এ ভালবাসায় প্রেমিক, প্রেমাস্পদ ও প্রেম একই অখণ্ড ভাবে পরিণত হয়। তাইতো দ্বৈত ও অদ্বৈতের সঙ্গমতীর্থে দাঁড়িয়ে সমাধির আলোতে অস্ফুটস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'তুমিই আমি, আমিই তুমি। তুমি খাও, তুমি-আমি খাও। বেশ-কিন্তু করছো। এ কি ন্যাবা লেগেছে! চারিদিকেই তোমাকে দেখছি'।

শুদ্ধা ভক্তি সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বশূন্য। এ ভক্তির মধ্যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের কোন প্রশ্ন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাঁর প্রার্থনার অর্থ করছেন, 'জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান নিতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন, যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে তার মন্দ বোধও আছে'। শুদ্ধা ভক্তির মধ্যে দ্বিতীয় কোন বোধের স্থান নাই; তাই সে জ্ঞান-অজ্ঞানের, পাপ-পুণ্যের পার।

এই ভাগবত প্রীতির কোন হেতু নাই। এ প্রেম অহৈতুকী। ভালবাসার কোন কারণ থাকলে তার নিজস্ব নৈতিক গৌরব থাকে না; সে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। কোন কারণের বিনিময়ে সত্যকারের ভালবাসার ক্রয়-বিক্রয় হয় না। প্রেম—রূপপিপাসা, গুণানুরাগ কিংবা ঐশ্বর্যপ্রীতি নয়। শুদ্ধ ভক্ত 'ঐশ্বর্যময়' ভগবানকে ভালবাসতে পারে না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, গোপীরা যমুনায় ডুব দিয়ে বৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে দেখেছিলেন, কিন্তু সে রূপ তাঁদের ভাল লাগল না—'শুদ্ধ ভক্ত ঐশ্বর্য দেখতে চায় না'। ঐশ্বর্যানুরাগ মনের দারিদ্র্যের পরিচায়ক, আর সত্যকারের ভক্তি অন্তরের সম্পদ্। ঠাকুর বলতেন, 'হাজরা বোধ হয় পূর্ব জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই ভগবানের অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়'। ভাগবত অনুরাগ যত নিষ্কাম হবে সাধকের অনুভূতির মধ্যে ঐশ্বর্যের ভাগ তত কম পড়বে। কথামৃতে পাই: 'সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা ঈশ্বরী মূর্তি। তারপর দ্বিভুজা—তখন অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তারপর কচি গোপাল-মূর্তি দর্শন, তখন কোন ঐশ্বর্যই নাই। এরও পরে আছে কেবল জ্যোতি-দর্শন...যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়বে'।

শুদ্ধা ভক্তিকে 'কথামৃতে' বলা হয়েছে, 'নিষ্কাম অমলা ভক্তি'। পার্থিব সুখের প্রশ্ন তো দূরের কথা, এ অনুরাগের মধ্যে কোনরূপ গ্রহণের মনোবৃত্তিই নাই। প্রেমের স্বরূপ আত্মদান, প্রতিদান গ্রহণ নয়। ভালবাসা দিতেই জানে, নিতে জানে না। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা, 'তোমাকে দেখতে আসি, কারণ তোমাকে ভালবাসি—এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি......আনন্দ একটু হয়, তা কি ক'রব?' এ ভালবাসা নিজের আনন্দে নিজেই ভরপুর। এ আনন্দ প্রেমেরই স্বরূপ। অপত্যস্নেহের

রসেই যেমন মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা, নিছক ভাগবত প্রীতির মাধুর্যই তেমনি এই নিষ্কাম ভক্তির রূপ। শুদ্ধ ভক্ত প্রেমাস্পদকে ভালবাসে, বিনিময়ে ভালবাসা চায় না। এ 'সাধারণী' প্রীতি নয়, যা (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়)—'নিজের সুখ চায়, তোমার সুখ হ'ক আর না হ'ক'। 'সমঞ্জসা' প্রীতি চায় 'আমারও সুখ হ'ক, তোমারও সুখ হ'ক'—শুদ্ধা ভক্তি, এ প্রার্থনাও করে না। এ সেই সমর্থা প্রেম, যা 'কৃষ্ণ-সুখে সুখী'। ভগবানের নিজস্ব আনন্দের মধ্যে শুদ্ধ ভক্ত হয় আত্মহারা। সেই অখণ্ড শান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পৃথক্ ভাবে আনন্দবোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাইতো মহাপ্রভু বলেছেন:

মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য॥

* * *

প্রশ্নটি অন্য দিক থেকেও আলোচনা করা যেতে পারে। যে বস্তু মৌলিক কিংবা প্রাথমিক, দর্শনের বিচারে তার কোন কারণ থাকতে পারে না। মুক্তিপিপাসা থেকে এই ভক্তি জন্মায় না, যদিও এই ভক্তির ফলে মুক্তি হ'তে পারে। 'কথামৃতে' শুনি, 'ভক্তবৎসল মনে করলেই মুক্তি দিতে পারেন'।

একথা সত্য যে ভাগবত প্রীতি অদ্বৈততত্ত্ব-লাভের একটি প্রধান উপায়, কিন্তু 'কথামৃতের' শুদ্ধা ভক্তি নিজেই একটি উদ্দেশ্য, নিছক উপায় নয়। অন্ততঃ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দরদী সাধক তাকে তত্ত্বজ্ঞানের সহায়-রূপে গ্রহণ করে না। প্রশ্ন হ'ল, 'আচ্ছা ভক্ত, তারও তো এককালে নির্বাণ চাই?' উত্তর এল—নির্বাণ যে চাইই এমন কিছু নয়। এই রকম আছে যে 'নিত্যকৃষ্ণ, তাঁর নিত্যভক্ত। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম'···· 'মূষলং কুলনাশনং—মূষল যত ঘসেছিল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একটু সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞানবিচার কর, ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে আবার ঘুরে ফিরে—'হরি, হরি, হরিবোল'। এইটে জেনে রেখো, আলেখ-লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়'।

শুদ্ধা ভক্তি অহৈতুকী বলেই ব্রহ্মজ্ঞানের পরও তার প্রকাশ হ'তে পারে। যার কারণ নেই, তার রহস্যও ভেদ করা যায় না। এ ভালবাসা একই সাথে নিজেই উদ্দেশ্য, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় (যদিও সে উপায় সম্বন্ধে ভক্ত সম্পূর্ণ সচেতন নয়) এবং ব্রহ্মলাভের ফল। 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্ন: 'নারদ, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার কি শাস্ত্রে নাই? ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরও তিনি একটু আমি রেখে দেন, তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়······ শুকদেবের জড়সমাধির পরও আবার রূপ-দর্শন হ'ল····· হৃদয়মধ্যে চিন্ময় রূপ দর্শন করতে লাগলেন'। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকেও এই সত্য ফুটে উঠেছে:

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

'নিত্য-রাধাকৃষ্ণ আর লীলা-রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ। শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখনও লীলায়। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।' নিত্য ও লীলার মধ্যে এক অখণ্ড রসাস্বাদই শুদ্ধা ভক্তি। শুদ্ধা ভক্তি কোন মাধুর্যকে অস্বীকার করে না; গ্রহণ করাই তার নীতি, বর্জন করা নয়। কিন্তু এ গ্রহণ করার কোন ভেদবুদ্ধি নাই—বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্বের অনুভূতি নাই। নিত্য ও লীলার রসের মধ্যে কোন ভিন্নবোধ নাই। সূর্যের

আলোর বোধ তার জ্যোতির অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র হয় না। নিত্য ও লীলার সমরস আস্বাদনই শুদ্ধা ভক্তির মর্মকথা।

এই ভক্তি স্বভাবতঃ স্থির ও শান্ত, কিন্তু অনুরাগের একটি ফেনিল রূপের পরিচয়ও 'কথামৃতে' আছে। সে আবেগ-ভরা প্রীতিকে 'রাগভক্তি' কিংবা 'প্রেমাভক্তি' বলা হয়। এই রাগানুগা প্রীতির সাথে শুদ্ধা ভক্তির পার্থক্য সব সময় সুস্পষ্ট নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কোন স্থানে তাকে 'অহৈতুকী' বা 'শুদ্ধা ভক্তির' অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। তবু তিনি ফুল হাতে ক'রে মহামায়ার কাছে যে শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন তা নিছক রাগানুগা ভক্তি নয়। এ কথা সত্য যে 'রাগভক্তি' শুদ্ধা ভক্তির মতোই স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, সে 'স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের মতো, তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না'। শুদ্ধা ভক্তির মতোই সে ঐশ্বর্যবোধহীন; মুক্তি-পিপাসাও তার নাই। তবু কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির মতো সে সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত নয়; এবং অত নির্ব্যক্তিকও নয়। 'শুদ্ধা ভক্তি' প্রধানতঃ একটি উদ্দেশ্য; 'রাগ ভক্তি' কথামৃতের অধিকাংশ স্থলেই একটি উপায়। যথা:

'ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হ'লে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি ·····এই ভক্তি এলে সাকার নিরাকার দুইই সাক্ষাৎকার হয়'। এই রাগভক্তির প্রধান উপাদান ইষ্টের ভিতর রসের সন্ধান। এ রস যেন 'ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা; স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা'। মাতৃত্বের রসই সন্তানকে আকৃষ্ট করে, আবার বাৎসল্য-রসেই হয় মাতৃত্বের স্ফুরণ। ভাগবত রস সাধকের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি করে এবং রসময়কে সে নিবিড়ভাবে পেতে চায়। এই একান্ত ক'রে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে রাগভক্তি। উপনিষদ্ যাকে বলেছে 'রসো বৈ সঃ', তাঁর আকর্ষণই প্রেমাভক্তির মূল কারণ। হরিভক্তি-বিলাসে আছে:

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

—ইষ্টের ভিতর যে নিজস্ব রস আছে, সেই রসের আবিষ্টতার রঙে রাঙানো ভক্তিকে রাগভক্তি বলে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন 'ঈশ্বরের এই মাধুর্যরসে ডুবে যা।'

রাগভক্তি একমুখী 'আমি কেবল রামচিন্তা করি—বার তিথি নক্ষত্র জানি না।' এই দিব্য একাগ্রতা সাধকের মনে আনে বাহ্য বিষয়ে উদাসীনতা—পরিপূর্ণ নির্বিকারতা। তাইতো কথামৃতের ভগবান হলধারীকে পূর্ণিমার দিন জিজ্ঞাসা করলেন. 'দাদা, আজ কি অমাবস্যা?' এই রসতন্ময়তার ফলেই একদিন মহাপ্রভু ভাগীরথীকে যমুনা ভেবে স্তব করেছিলেন: 'চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী, দ্রব-ব্রহ্ম-গাত্রী'। —চিদানন্দের আলোয় গড়া নন্দনন্দনের প্রেমপাত্রী যমুনা, তুমি যে ব্রহ্মের বিগলিত করুণা।

প্রেমাভক্তি নিয়মনিষ্ঠা নয়, কিংবা অনুষ্ঠান-প্রিয়তাও নয়। পুণ্যলাভের কিংবা ধর্মসঞ্চয়ের কোন প্রবৃত্তি তার নাই।—'এই অবস্থায় অমুক দিন সংক্রান্তি—ভাল ক'রে নাম ক'রব, এ সব আর মনে থাকে না।'

'এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয়কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না দয়া থাকে······দয়া অর্থ সর্বজীবে ভালবাসা।' প্রেমা ভক্তি নির্মম নয়, সে একনিষ্ঠ বলেই তার 'মায়া' নাই, সংসারাসক্তি নাই। পার্থিব প্রীতির সাথে দিব্যানুরাগের সামঞ্জস্য করা যায় না।

কথামৃতের ভগবানের ভাষায়—'প্রথমে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যেরূপ নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ভগবানে থাকে তবে ভক্তি হয়। শুদ্ধা ভক্তি হওয়া বড় কঠিন।' প্রেম স্বভাবতই একনিষ্ঠ। যে কারণে সতীর দুইজন প্রেমিক হয় না, ঠিক সেই কারণেই ভক্ত একই সাথে ভগবান ও সংসারকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসা ভাগ হ'য়ে গেলে তার নৈতিক গৌরবও থাকে না। প্রেম ত্যাগমন্ত্রপূত। সন্তানের স্নেহে মা আত্ম-সুখে দেন জলাঞ্জলি; আর ভগবানের অনুরাগে ভক্ত সংসার-সুখে হন বীতস্পৃহ। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে পড়েঃ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার সর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারবে, সে আমার শিষ্য হ'তে পারবে না।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে।'

শুধাইনি তব পরিচয়

শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী

ভগবান, যুগে যুগে এ-ধূলায় তুমি নেমে এসে
দুঃখী তাপী পতিতেরে দাও তব অমৃতের স্বাদ,
দুর্বলেরে রক্ষা করো, ক্ষমা করো সর্ব অপরাধ,
মর্মজ্বালা মুছে দাও অশান্তের, তুমি ভালোবেসে
সংসার-গরলভার দূর করো—করুণায় হেসে
ওগো নীলকণ্ঠ, এই মরণের মাঝেতে অবাধ
বহাও অমৃত-বীজ, তমোঘন সর্ব অবসাদ;
রাত্রির তিমির সম কোথা যায় উষার উন্মেষে।
ভগবান রামকৃষ্ণ, এসেছিলে এ মর্ত্য-ধূলায়
আমাদের কান্না শুনে,—অহেতুক ওগো কৃপাময়!
আমরা খেলায় মেতে শুধাইনি তব পরিচয়;
আজ দেখি দিকে দিকে মানুষের মায়ার কুলায়
তোমার করুণা ভরা; বুঝি বা এখনো আছে ক্ষণ
এসেছি আকুল হ'য়ে বুকে বয়ে এ-কাঙাল মন।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমারে পাওয়ার পথ কত যে দুর্গম,
কর ক্ষুরধার—তাহা জানি প্রিয়তম।
তবু নাই সে উৎসাহ, সেই উদ্দীপনা—
যাহারে আশ্রয় করি সমস্ত ভাবনা
তোমার চরণপদ্মে কেন্দ্রীভূত হয়।
জড়তায় পঙ্গু চিত্ত ঘুমাইয়া রয়
পঙ্কিল তন্দ্রার মাঝে। আর কতদিন
মৃত্তিকা আঁকড়ি রবো চলচ্ছক্তিহীন
বৃক্ষসম? দাও প্রভু, দাও সেই পাখা—
যাহে ভর করি যাবো ইন্দ্রধনু আঁকা
বর্ণাঢ্য স্বপ্নালু ওই দূর দিগলয়ে,
তোমার আনন্দময় জ্যোতির নিলয়ে।
জড়তা ভাসায়ে দাও উৎসাহ-প্লাবনে;
আমার শক্তির উৎস তোমারই চরণে।

ভাগবতের বৈশিষ্ট্য

শ্রীযুগলকিশোর দে

অখিল-রসামৃত-মূর্তি সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের স্বরূপ-নির্ণয়ের ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধস্থাপনের জন্য যত শাস্ত্রাদির কথা আমরা জানি তন্মধ্যে শ্রীভাগবতকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আমরা এখানে তাহারই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করিব।

(১) বক্তা ও শ্রোতা লক্ষণে :
গীতার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই এক বিশেষ কর্তব্য-পরায়ণ অবস্থায় আসীন। উভয়েরই হস্তে কর্তব্য-ধর্মের যন্ত্রাদি; সারথিরূপে বক্তার হস্তে অশ্বের বল্গা, আর শ্রোতা—যিনি রথী—তাঁর হস্তে ধনুর্বাণ। আলোচনার সুর সর্বাত্ম-সমর্পণে উঠিয়াছে; আদেশ হইতেছে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। গীতা শ্রোতাকে যেখানে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, শ্রীভাগবতে দেখি ঠিক সেই অবস্থাতেই শ্রোতা উপবিষ্ট। গঙ্গার উন্মুক্ত পবিত্র তীরে সমবেত ঋষিগণ, নিজ প্রজাগণ প্রভৃতির মধ্যেই সমস্ত কামনা-বাসনা-মান-অভিমানশূন্য হইয়া রাজাধিরাজ উপবিষ্ট। অপর দিকে বক্তা সর্বত্যাগী পরমহংসমুকুটমণি। গীতা যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, ভাগবত সেখান হইতে আরম্ভ হইল। কি অপূর্ব দৃশ্য !

কেবল তাহাই নহে, গীতায় বক্তা ভগবান স্বয়ং, ভাগবতের বক্তা ভগবৎপ্রিয় সর্বত্যাগী ভক্ত। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন, আমি বলিলে জগৎ হয়তো বিশ্বাস করিবে না—তাই হে পার্থ, তুমি বল, তুমি ভক্ত, তোমার কথা জগৎ বিশ্বাস করবে—বল 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। এখানে শ্রীভগবান নিজ বাক্য হইতেও ভক্তমুখনিঃসৃত বাক্যকে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন, আর সমস্ত ভাগবতখানা দেখি সেই ভক্তমুখের বাক্য-সুধায় সুধায়িত।

(২) ভাগবত-সভার অধিবেশনে :
নিখিল বিশ্বের মধ্যে একমাত্র শ্রীভাগবত ব্যতীত অপর কোন ধর্মগ্রন্থের এত অধিক অধিবেশনের কথা শুনা যায় না, ভারতের বেদ উপনিষদ্ ও অন্যান্য পুরাণাদিরও নয়। একাধারে ভক্ত ও ভগবানকে আদিপ্রবর্তকরূপে স্বীকার করিয়াই পুরাণ-চক্রবর্তী শ্রীভাগবত জগতের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল। শ্রীভাগবতে : (১।৩।৪৩)

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥

দ্বিবিধ ধারায় (শ্রীভগবান ও ভক্ত) এই ভাগবতের ১৪টি অধিবেশন হইয়াছে—শ্রীভগবান হইতে ৬টি, ভক্ত-পরম্পরায় ৮টি।
শ্রীভগবান হইতে :

শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা (১ম অধিবেশন), ব্রহ্মা হইতে দেবর্ষি নারদ (২য় অধিঃ), দেবর্ষি নারদ হইতে শ্রীব্যাসদেব (৩য় অধিঃ), শ্রীব্যাসদেব হইতে শ্রীশুকদেব (৪র্থ অধিঃ), শুকদেব হইতে পরীক্ষিত মহারাজ ও সভাস্থিত শ্রীসূত গোস্বামী (৫ম অধিঃ), সূত গোস্বামী হইতে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ ও জগদ্বাসিগণ (৬ষ্ঠ অধিঃ)।
ভক্ত হইতে :

শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে সনৎকুমার (১ম অধিঃ). সনৎকুমার হইতে সাংখ্যায়ন (২য় অধিঃ), সাংখ্যায়ন হইতে দেবগুরু বৃহস্পতি (৩য় অধিঃ), বৃহস্পতি হইতে উদ্ধব (৪র্থ অধিঃ), উদ্ধব হইতে পরাশর (৫ম অধিঃ), পরাশর হইতে

পুলস্ত্য (৬ষ্ঠ অধিঃ), পুলস্ত্য হইতে মৈত্রেয় (৭ম অধিঃ), মৈত্রেয় হইতে বিদুর (৮ম অধিঃ)।

(৩) ঔদার্যে :

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥

ভাঃ ১১।২।১২

এই শ্লোকে বাধাবন্ধনহীন এক সর্বজনীন উদারতা। ভাগবতের প্রথমেও এই বাণীরই সার্থকতা-জনিত এক পরম আশার বাণী রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে···সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ' ॥

(৪) স্বরূপের যথার্থতা নির্ধারণে : অনেকে গীতাবক্তা ও ভাগবতের কৃষ্ণকে একই বলিয়া মানিতে চাহেন না। কিন্তু ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা আমরা কুন্তীস্তব, ভীষ্মস্তব ও শিশুপালের উক্তি হইতে বুঝিতে পারি।

এই সকল স্থানে দেখি কুন্তীদেবী যাঁহাকে রথের সারথ্যরূপ নীচ কার্যের কথা বলিলেন, তাঁহাকেই নন্দনন্দন এবং তমালনীল কলেবর বলিলেন ; এগুলি যাঁহাকে নির্দেশ করে, তিনিই যে গীতাবক্তা! গীতার মঙ্গলাচরণে যাঁহাকে গোপালনন্দন বলা হইয়াছে, শিশুপাল তাঁহাকেই গোপাল কুলপাংশুল বলিয়াছেন। তিনিই তো সেই গীতার গোপালনন্দন ও দেবকীনন্দন, গীতাতেই আমরা একথার সত্যতা জানিতে পারি। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন যখন তাঁহার মানুষী মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ভগবান তাঁহার সেই মানুষরূপই প্রকাশ করিয়াছিলেন—'স্বকং রূপং দর্শয়ামাস,' এই স্বকীয় রূপ বলিতে মানুষরূপই এবং তাহার স্বীকৃতি অর্জুনের বাক্যেই পাওয়া যায়—যখন অর্জুন বলিলেন, 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং' ইত্যাদি তখন সহজেই বলিতে পারা যায় যে, এই মানুষ রূপটি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণমূর্তি।

(৫) লীলাকথা বর্ণনে : শাস্ত্রে সর্বত্র ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানেরই জয়। শ্রীভাগবত এই তিনেরই জয়গাথার অমিয় মধুর গীতি-মাল্য। লীলাকথার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, উপলক্ষণে শ্রীনাম রূপ গুণ ও পরিকরকেও বুঝিতে হইবে। কেননা, 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে'র অমিয় মধুর ভাষায় বলি,

'কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণ-লীলাবৃন্দ
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥'

ইহার প্রতিটিরই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই দেখা যায়, সনকাদি গুণাকৃষ্ট হইয়া, শুকাদি লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ভজন করেন।

শঙ্করাচার্য বলিলেন, 'মুক্তা অপি লীলাবিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি'। শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের ন্যায় শ্রীভাগবতেরও এই রূপ আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়াই সনাতন গোস্বামী শ্রীভাগবতকে 'কৃষ্ণ পরিবর্তিত' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই ভাগবতী লীলাকথার আকর্ষণ অতল গভীর। মাথুরবিরহিণী ব্রজরমণীগণ 'ভ্রমরগীতি'তে এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু হে উদ্ধব! তাঁহার কথা ছাড়িয়া তো থাকা যায় না।'

স্বয়ং লীলাকথা-কীর্তনকারীকে 'কে তুমি আচম্বিতে আসি আমারে পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত' (চৈঃ চঃ মধ্য), বলিয়া শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; অথচ সেই ব্যক্তিকে তিনি স্পর্শ করিবেন না, ইহাই ছিল তাঁহার সংকল্প। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, যে আবেশে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছুটিয়াছিলেন, ঠিক সেই আবেশেই—বরং ততোধিক আবেশে তিনি কৃষ্ণ-কথাকীর্তনকারী (প্রতাপরুদ্র)কে ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবত এই লীলা-কথারই কাহিনী ; শ্রীভাগবত তাই প্রেমভক্তির

মন্দাকিনী, অশ্রুজলের নির্ঝরিণী; তাই শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন:

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্তিদ্বয় পাত্র॥ (চৈঃচঃ আদি)

তাই দেখা যায়, গোস্বামিপাদগণ—যেমন শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহকে 'হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম' বলিয়াছেন, তেমনি আবার দেখা যায় শ্রীভাগবতকেও 'মন্মহাধন', 'মদেকবন্ধো', 'সদ্‌গুরো' প্রভৃতি বলিয়াছেন। শ্রীশ্যামসুন্দরকে 'ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম' বলিয়াছেন, আবার শ্রীগ্রন্থকে 'ত্রয়ী' রূপে দর্শন করিয়াছেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান এই 'ত্রয়ী'-সংজ্ঞক ভাব লইয়াই শ্রীমৎ সনাতন শ্রীভাগবতকে 'শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত, ...কৃষ্ণ তুভ্যং নমো নমঃ' বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও আমরা শ্রীভাগবতকে শ্রীভগবানের মূর্তবিগ্রহরূপে বর্ণিত দেখি—

'পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ......
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং
ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥'

(৬) **শ্রীনামমাহাত্ম্যে:**

নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রীভগবানের লীলার মতো ভগবন্নামের আলোচনা আর অন্য কোন গ্রন্থে এতাদৃশ দেখা যায় না।

এইজন্যই আমরা দেখি, ভাগবতের প্রথমে ও শেষে যেমন শ্রীভগবানের প্রণাম ও বন্দনা—ঠিক সেই প্রকার শ্রীভগবন্নামেরও প্রণাম ও বন্দনা। আবার যেমন 'সত্যং পরং ধীমহি' বলিয়া ভগবানকে বন্দনা—ঠিক নামকে সেই প্রকার 'সত্যং পরং ধীমহি' বলিয়া বন্দনা, এই প্রকার প্রণাম ও বন্দনা এবং শ্রীভগবন্নামের এরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা অন্যত্র আছে বলিয়া জানি না।

এই সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা একান্ত দরকার যে শ্রীভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহার সকল কিছুরই এক অপূর্ব ও অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে ভাগবতে, এমনকি তাঁহার 'দাম'-বন্ধনের রজ্জুটিকে পর্যন্ত অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত বলা হইয়াছে। তাই দেখা যায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, অশন, বসন, প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহাদিগকেও বন্দনা ও প্রণাম করা হইয়াছে—এমনকি তাহাদের করুণা ভিক্ষাও করা হইয়াছে। শ্রীসনাতন সেইজন্য স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকৃপাকে বন্দন করিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ তব কারুণ্যমহিম্নে মে নমো নমঃ।'

যে গ্রন্থের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য, উহাকে 'বেদার্থ-পরিবৃংহিত', 'গায়ত্রীভাষ্য', 'ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাষ্যম্', 'ভারতার্থবিনিময়' প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

নদীয়ার নিমাই

শ্রীশম্ভুদাস মিত্র

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
—বিদগ্ধমাধব

যে সনাতন পুরুষের কথা বলিতেছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার-জ্ঞানে পূজা করেন—অংশাবতার নয়, যুগাবতার নয়, মন্বন্তরাবতার নয়, পরন্তু লীলাময় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান।

ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় অবশ্য তাঁর পূর্ণা-বতারত্ব স্বীকার করেন না। তথাপি ইহা সর্ব-জনস্বীকৃত যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বঙ্গমাতার তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। পূর্বাকাশে উদিত হলেও চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাকিরণ ভারতের সর্বত্র বিচ্ছুরিত হয়েছিল।

নদীয়ার নিমাই ছিলেন একজন পরম পণ্ডিত। ১৬ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শেষ ক'রে তিনি নবদ্বীপে একটি টোলে অধ্যাপনা করতেন। আর তাঁর বয়স যখন ২১।২২ বৎসর, তখন তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে অব-লীলাক্রমে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। সেদিন নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ—যে সমাজে তাঁর পিতা এবং পিতামহের সমবয়সী প্রবীণ পণ্ডিতগণও ছিলেন—সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে নিমাই নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এত সম্মান অন্য কোন ভাগ্যবান্ অদ্যাবধি পান নাই।

তথাপি তাঁর জীবনী-রচয়িতাগণ বারংবার বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম যৌবনে 'বিদ্যা-বিলাস' করেছিলেন—অর্থাৎ যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং বিদ্যাচর্চা তিনি করেছিলেন, তৎসমুদয় তাঁর একটি বিলাস বা ক্রীড়া মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি চিরদিনই পরম ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রেম এবং ভক্তিমার্গে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রে তিনি এ জগতে প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করেন। অধিকন্তু তাঁর ভক্ত-গণ বিশ্বাস করেন যে শ্রুতিতে, গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিযোগ বর্ণিত হয়েছে, তা কালে কালে নষ্ট বা লুপ্ত হ'য়ে যায়। প্রথমে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের প্রভাবে এবং তৎপরে নাস্তিক বৌদ্ধমতের প্রচারে এবং পরিশেষে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তমত-প্রচারের ফলে হরিভক্তি লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেই হরিভক্তি জগতে প্রচার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে স্তুতি করেছিলেন এই শ্লোকে:

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

—কালের প্রভাবে নিজভক্তিযোগ লোপ পেলে শ্রীচৈতন্য তা প্রচার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পাদপদ্মে ভৃঙ্গের ন্যায় চঞ্চল আমার চিত্ত গাঢ়রূপে লীন হ'ক।

তিনি নিজে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সাত শত বৎসর পূর্বে আচার্য শঙ্কর আসমুদ্রহিমাচল উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।' সেদিন ভারতের অগণিত নরনারী স্তব্ধবিস্ময়ে দেখেছিল এক বিরাট প্রতিভা, শুনেছিল তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেদান্তধর্ম। শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রবর্তিত ধর্মের যেমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর ধর্ম প্রচারেরও তেমনি ছিল মৌলিকত্ব। তিনি তাঁর প্রেমের ধর্ম প্রচার করেছিলেন জগতের কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল সকলকে ভালবেসে। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

'এই মত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥'

আর সেই ধর্মপ্রচারের ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। ভারতের আকাশ, বাতাস মুখরিত হয়েছিল হরিনামে, কৃষ্ণনামে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে।

তাঁর একটি বিরাট কীর্তি লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার। তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বৃন্দাবন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি যখন শুনলেন যে যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে, তাঁর প্রিয় গোপিনীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন, সেই লীলাভূমি হিংস্র জন্তুদের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়েছে, তখন তাঁর চোখ

ফেটে করুণা ঝরে পড়েছিল,—আমাদের প্রতি করুণা, জগতের পাপী তাপীদের জন্ম করুণা। সেই করুণায় বিগলিত হ'য়ে তিনি তাঁর দুই প্রিয় ভক্ত ও অনুরক্ত পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে পাঠিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার-কার্যে। তাঁরা বৃন্দাবনে গিয়ে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আলোচনা ক'রে এবং নিজেদের উপলব্ধি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি লীলাস্থল নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার করেছিলেন। কেবলমাত্র এই কারণেই প্রত্যেক ভারতবাসী শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর ঐ দুইটি ভক্তের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে সংস্কৃত এবং বাংলা সাহিত্যে জোয়ার এসেছিল। যদিও আমরা 'শিক্ষাষ্টকম্' ছাড়া তাঁর নিজের কোন রচনা পাই না, তথাপি তাঁরই প্রেরণায় তাঁরই শিষ্য এবং সেবক, ভক্ত এবং অনুরক্তগণ এই দুইটি ভাষা এবং সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধি দান করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যে সম্পদ্ আমরা পেয়েছি, বিষয়বস্তু হিসাবে, তা চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ আমরা পেয়েছি শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকখানি অপূর্ব টীকা। টীকা যে কত সুন্দর, কত মধুর হ'তে পারে তা এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ না করলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই সমস্ত টীকা রচনা করেছেন শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এবং আরও অনেকে। দ্বিতীয়তঃ আমরা পেয়েছি বৈষ্ণব দর্শন ও স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি অপূর্ব গ্রন্থ, যা অদ্যাপি পণ্ডিত এবং ভক্তগণকে প্রচুর আনন্দ দান করে। শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' এবং 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'—শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'লঘুভাগবতামৃত'—শ্রীজীব গোস্বামীর 'সর্বসম্বাদিনী', 'ষট্‌সন্দর্ভ' এবং আরও বহু গ্রন্থ এই পর্যায়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু কাব্য, নাটক এবং গীতি রচিত হয়েছে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রীরূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' এবং 'ললিতমাধব', শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'গোবিন্দ-লীলামৃত' এবং বাংলা ভাষায় রচিত বহু গোস্বামিগণের প্রণীত কাব্যসম্ভার যা বৈষ্ণব সাহিত্য নামে খ্যাত, আজও আমাদের প্রচুর আনন্দ দান করে। সর্বশেষে আমরা পেয়েছি শ্রীচৈতন্যদেবের কয়েকখানি মধুর জীবনচরিত। শ্রীবৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', শ্রীদামোদর স্বরূপের 'কড়চা', শ্রীকবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্রীমুরারি গুপ্তের 'চৈতন্য-চরিত', শ্রীলোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' এবং আরও বহু অমূল্য গ্রন্থ বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাঙালী আত্মভোলা জাতি। তাই এই পরমপুরুষকে আমরা ভুলে রয়েছি। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রবর্তিত মধুর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজ মনে করেন এ ছোটলোক নেড়ানেড়ীদের ধর্ম, শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের উপযুক্ত নয়। কিন্তু যেদিন আমরা আমাদের উচ্চ বর্ণ এবং উচ্চ শিক্ষার দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে এদিকে মনোনিবেশ ক'রব, সেই দিন আমরা বুঝতে পারব—আমাদের এই দেশে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং কি মধুর তাঁর প্রবর্তিত প্রেম ধর্ম। বৈষ্ণব আচার্যগণ বলেন, শ্রীহরির কৃপা ব্যতিরেকে তাঁর মহিমা বোঝা সম্ভব নহে। সে কৃপা কবে আমাদের উপর বর্ষিত হবে?

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[দ্বিতীয় প্রবন্ধ]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে সর্বত্র অবতার বলিয়া পূজিত। জার্মান পণ্ডিত Winternitz-এর মতে বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেন, তখনও শ্রীরামচন্দ্র অবতাররূপে পরিগণিত হন নাই। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়, কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, অবতারগণের পৃথিবীতে অবস্থানকালে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাদের অবতারত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। প্রকৃতপক্ষে দেহ-পরিত্যাগের পর তাঁহাদের দিব্য অলৌকিক চরিত্র ও কার্য ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইয়া প্রমাণ করে যে, তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন। শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধেও ইহা সত্য হওয়া স্বাভাবিক। কেবল অবতার কেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সর্বত্রই সাধক এবং সাধিকাগণ সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যায়। জীবিতকালে তাঁহারা সাধক-সাধিকারূপে খ্যাতি লাভ করা দূরে থাকুক, কেহ কেহ নির্যাতন পর্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু দেহত্যাগের বহু বর্ষ পরে তাঁহারা জনসাধারণের নিকট উচ্চ আসন লাভ করিয়া পূজিত হইয়াছেন। রাক্ষসদিগের অধিপতি রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রণী করিয়া দেবগণের বিষ্ণুর সমীপে গমন ও অত্যাচারপীড়িত দেবগণ ও পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুর ধরাতলে অবতীর্ণ হইবার আশ্বাস-প্রদান প্রভৃতি পরবর্তী রচনা বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়।

গীতামুখে শ্রীভগবান স্বয়ং অবতারগণের আবির্ভাবের প্রধানতঃ তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের ফলে যাঁহাদের চিত্তে বৈরাগ্য ও ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়, অবতারগণের আগমনে পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা ইহসংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। দুষ্টের বিনাশ রাম ও কৃষ্ণাবতারে অস্ত্রসংহারের দ্বারা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ ও চৈতন্যাবতারে করুণা ও প্রেমই ছিল অস্ত্রস্বরূপ। ইহা ব্যতীত স্বীয় অনুপম চরিত্র ও কার্যের দ্বারাই যুগোপযোগী যে ধর্ম তাঁহারা স্থাপন করিয়া যান, বহুকাল ধরিয়া মানবজাতি তাহা অবলম্বনে জীবনের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার চেষ্টা করে। সকল অবতারের জীবনেই এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষ প্রকট।

বাল্মীকি-রামায়ণে আদিকাণ্ডে রামের জন্ম, তাড়কা মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসবধ ও সীতার সহিত বিবাহ—এই তিনটি প্রধান ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামের বাল্যলীলা সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নাই। রামায়ণ-রচনাকালে শ্রীরামচন্দ্র যে অবতার বলিয়া গৃহীত হন নাই, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ। ভক্তপ্রবর তুলসীদাস বহু পরে তাঁহার 'রামচরিত-মানসে' রামের অলৌকিক বাল্যলীলা নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার প্রেম- ও ভক্তিপূর্ণ ভক্ত-হৃদয়ের অনুভূতি।

রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাজপ্রাসাদে রাজৈশ্বর্যে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। যদিও চারি ভ্রাতার মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অতিশয় দৃঢ় ছিল, তথাপি যে কারণে হউক—লক্ষ্মণ রামের প্রতি ও শত্রুঘ্ন ভরতের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। চারি ভ্রাতাই অপরূপ রূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট, অমিত বিক্রমশালী,

বিনীত ও মহদ্‌গুণসমূহে বিভূষিত। সকলেই বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র দশরথের প্রাণতুল্য ও প্রজাগণের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। পুত্রগণের বিবাহের কাল সমাগত দেখিয়া দশরথ যখন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, তখন সহসা একদিন মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র নৃপতির সাক্ষাৎ মানসে অযোধ্যায় আগমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, কান্যকুব্জের রাজা গাধির তনয়। বাহুবলে বহুবার ক্ষত্রিয়বৃন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তিনি মহর্ষিগণের অন্যতম বলিয়া পূজিত হন। বিশ্বমিত্র-উপাখ্যান প্রমাণ করে যে, ঐ সময় পর্যন্ত জাতি-বিভাগ বংশগত হইয়া উঠে নাই। ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও কেহ ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যাত্মপরায়ণ হইলেই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতেন।

বিশ্বামিত্র তখন সিদ্ধাশ্রম তপোবনে যজ্ঞ-সিদ্ধিকর এক ব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। ঐ ব্রতানুষ্ঠানকালে কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাশ করার নিয়ম ছিল না। ব্রত অসমাপ্ত থাকিতেই রাক্ষসগণ যজ্ঞবেদীর উপর রুধির বর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা অত্যাচার আরম্ভ করিল। নিয়মবদ্ধ বিশ্বামিত্র ক্রোধ প্রয়োগ করিতে না পারায় কোন প্রকার প্রতীকারে সমর্থ হইলেন না। অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দশরথ সমীপে উপস্থিত হইলেন।

এখান হইতেই রাক্ষসদিগের সহিত রামের সংগ্রাম আরম্ভ। রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে নর ও রাক্ষস অথবা রাম ও রাবণের যুদ্ধের ইতিহাস। কেহ কেহ ইহাকে আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে রামচন্দ্র কর্তৃক দাক্ষিণাত্যে অনার্য জাতিসকল বিজিত হয় ও আর্যধর্ম স্থাপিত হয়। এই রাক্ষসদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায়, ইহারা অতিশয় অত্যাচারী, হিংস্র ও ক্রূর ছিল। সমুদয় আলঙ্কারিক বর্ণনা, যাহা আতিশয্য দোষে দুষ্ট তাহা ছাড়িয়া দিলেও প্রমাণ হয় যে, ঐ সময় ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-দেশ পর্যন্ত বহু আর্যেতর জাতি বাস করিত। লঙ্কার রাজৈশ্বর্য, রাজ্যপরিচালনা নীতি, রাক্ষস-দিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম প্রভৃতি উহাদিগকে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া নির্দেশ করে না। বস্তুতঃ আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মবাদের উপর এবং আর্যেতর সভ্যতা ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব-ভোগসম্পদ যাহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য বা লক্ষ্য, তাহারাই নীতিজ্ঞান-বিরহিত, পরস্বাপহারী, লোভী ও অত্যাচারী হয়। চরিত্র ও কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন উচ্চ মহৎ আদর্শ না থাকায় 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' নীতিই তাহাদের পরিচালনা করে। অসু- অর্থাৎ প্রাণ-ধর্মী বলিয়া ইহারা অসুর। মনে হয় যক্ষ, রক্ষ, অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি ইহাদের শ্রেণীবিভাগ মাত্র। বর্তমান যুগেও এই অসুরের সংখ্যা কম নহে। সভ্যতার আদি যুগ হইতে এই অসুরদল কর্তৃক মানব-জাতি নিরন্তর পীড়িত, অত্যাচারিত। কদাচিৎ ইহাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মভীরু বিভীষণ ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের আবির্ভাব হয়। রাক্ষস-গণ নরমাংসভোজী ছিল কিনা বলা কঠিন। অমরকোষে 'রাক্ষস' শব্দে নিশাচর নির্দেশ করা হইয়াছে। নিশাকালে ইহারা যত্র তত্র বিচরণ করিত। ঋষিগণের তপোবনে অকস্মাৎ দলবদ্ধ-

ভাবে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া নানাভাবে অত্যাচার করিত। ঐ সময়ে সমুদয় রাক্ষস-দিগের অধিপতি ছিল লঙ্কার রাজা রাবণ।

বিশ্বামিত্র রাক্ষসগণের অত্যাচার নিবারণার্থে রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। মনে হয়, কিশোর হইলেও তখনই রামচন্দ্রের ধনু-র্বিদ্যায় পারদর্শিতার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। দশরথ বিশ্বামিত্রকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ-পূরণে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। স্নেহের পুত্র নয়নানন্দ রামকে তিনি কিরূপে তপোবনে প্রেরণ করিবেন? কাতরভাবে তিনি বিশ্বামিত্রকে অনুনয় করিলেন,

'রামেণাহং বিহীনশ্চ মুহূর্তমপি নোৎসহে।
জীবিতং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমর্হসি॥
উদারগুণসম্পন্নং মনোহ্বদয়নন্দনম্।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং ন মে ত্বং নেতুমর্হসি॥
প্রণিপত্যাভিযাচে ত্বাং কৃপণঃ পুত্রলালসঃ।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং ন মে রামং ভগবন্ নেতুমর্হসি॥'

রামবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও জীবন-ধারণে সমর্থ নহি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না।......

...বিশেষতঃ রাম এখনও ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করে নাই, বালক বলিলেই চলে, রাক্ষসনিধন তাহার দ্বারা কিরূপে সম্ভব? বিশ্বামিত্রের আদেশে দশরথ নিজেই তপোবনে গমনপূর্বক রাক্ষস বধ করিয়া তাঁহার যজ্ঞ নিষ্কণ্টক করিবেন। দশরথের কাতর প্রার্থনা ও যুক্তির উত্তরে বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন রামচন্দ্রকে। দশরথ প্রমাদ গনিলেন। রামচন্দ্রকে তপোবনে প্রেরণ অসম্ভব, আবার বিশ্বামিত্রকেও ক্রুদ্ধ করিতে পারেন না। অবশেষে বশিষ্ঠ পরামর্শ দিলেন, রাম বালক হইলেও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। ইহা ব্যতীত বিশ্বামিত্র পূর্বে রাজধর্ম পালন করিয়াছেন, সুতরাং নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার তিনি অবগত আছেন। রামচন্দ্রকে ঐ সকল বিদ্যা শিখাইয়া দিলে কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। বিশ্বামিত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

অতঃপর রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ মুহূর্তমাত্র রামকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং তিনিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রামের অনুগমন করিলেন। রাজধানী পিছনে পড়িয়া রহিল। রাম ও লক্ষ্মণ বনপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহারা প্রথমে সিদ্ধাশ্রমে গমনপূর্বক রাক্ষস সংহার করিয়া পরে রাজধানী মিথিলায় উপনীত হন। অযোধ্যা হইতে মিথিলা পর্যন্ত সমুদয় পথের বর্ণনা যেমন সুন্দর, তেমনি চমৎকার ভৌগোলিক বিবরণ।

রাম ও লক্ষ্মণ রাজকুমার। আবাল্য রাজ-প্রাসাদে রাজৈশ্বর্যে প্রতিপালিত। অথচ কত অনায়াসে বনপথশ্রম স্বীকার করিলেন! নির্ভীক, সুকুমার কিশোরদ্বয় উৎসাহের সহিত রাত্রিকালে নদীতীরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, আহার ছিল বনের সুমিষ্ট ফল-মূল। বিশ্রামকালে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের পরিচর্যায় রত হইতেন। রামের বালকোচিত কৌতূহলের সীমা নাই। রাজধানীর বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতিশয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং পথ অতিক্রমকালে যাহা কিছু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত, তৎসম্বন্ধেই বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করিতেন। বিশ্বামিত্র অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, দেশের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসীম। রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রত্যেকটি জনপদ ও নদীর বিবরণ দিয়াছেন। পথিমধ্যে তিনি রামচন্দ্রকে নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যা

দান করেন। প্রথম রাত্রি সরযূর দক্ষিণতটে ও দ্বিতীয় রাত্রি গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অতিবাহিত হয়। প্রভাতে নৌকায় নদী পার হইয়া ক্রমে তাঁহারা এক বিশাল অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, পূর্বে ঐ স্থানে এক বিখ্যাত জনপদ ছিল, বর্তমানে উহা মহাবলশালিনী তাড়কা নামে রাক্ষসীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত। ঐ রাক্ষসীকে নিধন করা রামের কর্তব্য।

তাড়কা পূর্বে ছিল যক্ষী, কিন্তু ঋষি অগস্ত্যের তথায় বাসকালে তাড়কা তাঁহাকে পরাভূত করিতে উদ্যত হইলে অগস্ত্য তাঁহাকে নরমাংস-ভোজী রাক্ষসীতে পরিণত করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বহু উপাখ্যান পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় রূপকে আবৃত। অন্তর্নিহিত তথ্য সব সময় উদ্‌ঘাটন করা কঠিন। কথিত আছে, দক্ষিণ ভারতে অগস্ত্য ঋষি সর্বপ্রথম আর্য সভ্যতা প্রচার করেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, ঐ অঞ্চলে প্রচারকালে অগস্ত্য তাড়কার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্র আরও বলিলেন, নারীবধ-ভয়ে রামচন্দ্র যেন করুণা প্রকাশ না করেন। গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাগণের হিতসাধনই রাজপুত্রগণের সদা কর্তব্য। প্রজারক্ষণ তাঁহাদের সনাতন ধর্ম।

তাড়কাকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র সেই জনপদ অত্যাচারমুক্ত করেন। পরদিন সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হইলে তাঁহারা মুনিঋষিগণ কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। রাক্ষস-ভয়ে সকলেই ভীত। যথাকালে যজ্ঞানল প্রজ্বালিত হইলে মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয় অন্যান্য অনুচরগণসহ যজ্ঞ-বিনাশাভিপ্রায়ে বেদীর অভি-মুখে ধাবিত হইলে রাম তাঁহাদের সংহার করি-লেন। আশ্রম নিরাপদ ও কল্যাণযুক্ত হইল।

ঐ সময়ে মিথিলাপতি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্র ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা জনকরাজার সভায় অবস্থিত যে বৃহৎ ধনু এ পর্যন্ত কোন নৃপতি উত্তোলন পর্যন্ত করিতে পারেন নাই —রামচন্দ্র তাহা দর্শন করেন। 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া রাম লক্ষ্মণ-সহ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্বক উত্তরদিক অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই যাত্রাকালে বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জ নগরী, সগরবংশ ও নানা উপাখ্যানের সহিত গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ ও তাঁহার সাগর-সঙ্গম বর্ণনা করেন। উপাখ্যানের অন্তরালে গঙ্গানদীর উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর পর্যন্ত একটি ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়।

শোণনদের তীরে কান্যকুব্জ নগরীর কথা বর্ণনা করিতে করিতে যখন অর্ধরাত্রি হইয়া গেল, বিশ্বামিত্র বলিলেন,

'নিস্পন্দাস্তরবঃ সর্বে সংলীনা মৃগপক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥
সূক্ষ্মেণাঞ্জনচূর্ণেন নভঃ কৃৎস্নমিবাঞ্জিতম্।
গ্রহনক্ষত্রতারাভিঃ কাঞ্চনীভিরিবাবৃতম্ ॥'

—রঘুনন্দন, দেখ, বৃক্ষসমূহ নিস্পন্দ, মৃগপক্ষিগণ নিদ্রিত এবং দিকসমূহ রজনীর অন্ধকারে আবৃত। সমস্ত নভঃপ্রদেশ যেন সূক্ষ্ম অঞ্জনচূর্ণের দ্বারা অনুলিপ্ত ও যেন কাঞ্চননির্মিত সমুজ্জ্বল গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজির দ্বারা আচ্ছাদিত।

সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে নদীতীরস্থিত নীরব বনভূমি ও তারকারাজিবেষ্টিত আকাশ কি মনোহর শোভাই না ধারণ করিয়াছিল!

প্রভাতে সম্মুখে বিস্তীর্ণ শোণনদ দেখিয়া রাম-চন্দ্র চিন্তিত হইলে বিশ্বামিত্র আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

'গাধ এষ মহাবাহো তরিতব্যো যথাসুখম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ॥'

—হে মহাবাহো, এই নদ অগভীর। আমরা অনায়াসে যে কোন স্থান দিয়া পার হইতে পারি।

তবে আমি এই পথই স্থির করিয়াছি, যে পথে মহর্ষিগণ গমন করেন।

অবশেষে রাজধানী মিথিলানগরী দেখা গেল। নগরীর সমীপস্থ নির্জন বনে রমণীয় ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত মুনিগণ-পরিত্যক্ত ঐ আশ্রমটি কাহার?

'শ্রীমানবিরলচ্ছায়ো মুনিসংঘবিবর্জিতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যাসীদয়মাশ্রমঃ॥'

রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র অহল্যার উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। অহল্যাকে ব্যভিচারিণী জানিয়া গৌতম অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,

'ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি ত্বং নিবৎস্যসি॥
বায়ুভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্নিবৎস্যসি॥'

—অর্থাৎ তুমি বহু বর্ষ ধরিয়া সন্তাপ অনুভবকরত বায়ুভক্ষণ করিয়া সতত ভস্মশায়িনী ও সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে বাস করিবে।

অহল্যার শাপ সম্বন্ধে পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত পলঘাট হইতে মুদ্রিত রামায়ণে আছে, 'বায়ুভক্ষা শিলা ভূত্বা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী' ইত্যাদি অর্থাৎ অহল্যা পাষাণরূপী হইয়াছিলেন। অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়াছিলেন—ইহাই অবশ্য সমধিক প্রচলিত।

অহল্যার প্রতি গৌতমের অভিশাপপ্রদান প্রসঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের গৌড়ীয় সংস্করণের সঙ্কলন করিয়া শ্রীঅমরেশ ঠাকুর ভূমিকায় যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য, 'এই আখ্যানে ইহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অহল্যা গৌতমবেশধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং গৌতমও এই জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বর্জন করেন নাই। তিনি অভিশাপচ্ছলে পত্নীকে প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং এই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার মন পাপ-পরিশূন্য হইলে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।' অহল্যার উপাখ্যান তদানীন্তন সমাজের উদার দৃষ্টিভঙ্গীরই সাক্ষ্য বহন করে।

গৌতম বলিয়াছিলেন,

'যদা ত্বিদং বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি তং দৃষ্ট্বা ধূতপাপা ভবিষ্যসি॥'

দশরথাত্মজ রাম যখন এই ঘোর বনে আসিবেন—তখন তাঁহার দর্শনে তুমি পাপমুক্ত হইবে।

অতঃপর অহল্যাকে শাপমুক্ত করিয়া রামচন্দ্র অন্যান্য সকলের সহিত মিথিলায় উপনীত হইলেন। এখানে তিনি বিশ্বামিত্রের আদেশে জনক রাজার বৃহৎ ধনু ভঙ্গ করেন। রামের বীরত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া জনক পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বীর্যশুল্কা দুহিতা (অর্থাৎ যিনি বীর্যরূপ মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিব) সীতাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণের উদ্যোগ করিলেন। দশরথের নিকট দূত প্রেরিত হইল। দশরথ অপর পুত্রদ্বয় ও লোকজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলে যথাসময়ে আড়ম্বরের সহিত রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত জনকের অপর কন্যা উর্মিলার এবং ভরত শত্রুঘ্নের সহিত জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির পরিণয়-কার্য সমাধা হইল।

পুত্র ও বধূগণকে লইয়া রাজধানী প্রত্যাবর্তন-কালে দশরথ আর একটি বিপদের সম্মুখীন হইলেন। পরশুরাম একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। পূর্বে একাধিকবার নিষ্ঠুরভাবে ক্ষত্রিয়গণকে নিধন করিয়াছেন। রাম জনক রাজার সভাস্থিত বৃহৎ ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন—এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বালক রামের বীরত্ব পরশুরামকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং তিনি পথি-মধ্যে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আস্ফালন পূর্বক তাঁহাকে তাঁহার প্রদত্ত ধনুকে শর সংযোজনা করিতে বলিলেন। দশরথ প্রভৃতি সকলেই পরশুরামের ক্রোধ সন্দর্শনে ভীত ও কম্পিত হইলেন। রামচন্দ্র কিন্তু সহাস্যে অবলীলাক্রমে ভৃগু-প্রদত্ত ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে শর সংযোজনাপূর্বক তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন।

যথাকালে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পুরবাসিগণ আনন্দে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সমালোচনা

ঋগ্বেদঃ (প্রথম অষ্টক)—ডক্টর মতিলাল দাশ কর্তৃক ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের বাংলা ভাষায় পদ্যছন্দে অনুবাদ। প্রকাশক : ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ, Block K, Plot 467, কলিকাতা-৩৩ পৃঃ ২৩৩, মূল্য ৫৲।

গ্রন্থকার উক্তগ্রন্থে প্রত্যেক অধ্যায়ের অনুবাদের পর 'অধ্যায় পরিচয়ে' গদ্যে প্রত্যেক অধ্যায়ে কোন্ কোন্ মন্ত্রে কোন্ কোন্ দেবতার স্তুতি বা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—তাহা এবং ঋষি, ছন্দ, সংখ্যা ইত্যাদি পদার্থগুলির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। বেদের ভাষ্যকার সায়ন, ব্যাখ্যাকার স্কন্দস্বামী, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মোক্ষমূলর, গিফিথ্স্ প্রভৃতি বেদের অনুবাদকগণের অংশবিশেষে মতভেদেরও আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির অনুবাদ প্রায়ই মূলানুযায়ী হইয়াছে। পদ্যছন্দে অনুবাদ করায় বাঙালী পাঠকের পক্ষে শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইয়াছে।

সমস্ত বেদই যে সেই অমৃতস্বরূপ ভূমাকে বুঝাইয়া মানুষের বুদ্ধিকে পরিপূর্ণতায় উদ্বুদ্ধ করে, তাহা তিনি (গ্রন্থকার) 'বেদরহস্য' নামক উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন। যথা : 'বেদ অমৃত-বিদ্যা—অমৃতের পুত্রগণের জন্য তার প্রকাশ……ভূমার পরিপূর্ণতার বোধে উন্মীলন।' ইত্যাদি (১ পৃঃ ১১ পং)। আবার বলিয়াছেন : বিশ্বের সমস্ত শক্তিই সেই চৈতন্যের দিকে লইয়া যায় অর্থাৎ বেদোক্ত যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতিও পরম্পরাক্রমে সেই চৈতন্যের সন্ধান দিবার জন্য ব্যাপৃত।

কোন কোন স্থলে অনুবাদক কর্তৃক কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন : 'বেদ এই জীবনবাদ প্রচার করে।… বৈরাগ্যের দীনতায় নয়, সমারোহে এবং উৎসবের আনন্দে।'

বেদ অমৃতবিদ্যা, অথচ বেদে বৈরাগ্যের কথা নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব? বৈরাগ্য ব্যতীত কি অমৃতত্ব লাভ হয়? বৈরাগ্য দীনতা নয়, ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিবার মহাশক্তি। আবার এক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে : 'বেদ মানুষকে বলেছে এই পৃথিবীকে ভালবাসতে। অজানা স্বর্গলোকের সুখের কামনায় জীবনকে উপবাসী ও ক্লান্ত করাকে যাঁরা ধর্ম মনে করেন, তাঁরা, শুনুন বেদের……উদাত্তবাণী।' (৩ পৃঃ ১৫ পং) ইহার বিরোধী কথা আবার দেখা যাইতেছে। যথা : 'যজ্ঞফল বহুধা প্রসারিত—অষ্টদিক্ পরিব্যাপ্ত ক'রে দ্যুলোককে যজ্ঞ ছেয়ে রেখেছে' (৮ পৃঃ ১৬ পং)। ইত্যাদি। এই সকল স্থলে গ্রন্থকার যদি উক্ত আপাত-বিরোধগুলির পরিষ্কার সমাধান করিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইত। অধিকারী-ভেদে, বেদ কোথাও ইহলোকের উপর জোর দিয়াছেন, আবার কোথাও বা পরলোকের উপর এবং শ্রেষ্ঠ অধিকারীর প্রতি সর্বত্যাগপূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই ভাবেই বিরোধের সমাধান হইতে পারে। —মেধাচৈতন্য

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নাটক (দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য)—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী প্রণীত। ১০২।৩, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৮৬; মূল্য প্রতি খণ্ড দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে :

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা লীলা আদিলীলা নাম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাজীবনের আদিখণ্ড অবলম্বনে এই নাটক বিরচিত। ভাষা প্রাঞ্জল ও অভিনয়োপযোগী, তবে কোন কোন স্থানে সংলাপ দীর্ঘ কবিতায় প্রদত্ত হওয়ায় অভিনয় ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয়। ৮ অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে ৫:টি সুললিত গান আছে। ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা ইহার অভিনয় দর্শনে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের প্রামাণিক ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হইবেন এবং ভক্তি ও তৃপ্তির আস্বাদ লাভ করিবেন।

গল্পে গীতা—শ্রীক্ষেত্রমোহন ভাদুড়ী প্রণীত। ৯, পশুপতি বোস লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য ১'৩৭ নয়া পয়সা।

ছাত্রছাত্রীগণের জন্য লেখা গল্পে গীতা। বর্তমানে বিভিন্নমুখী ভাবধারার প্রাবল্যে তরুণগণ বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় এইরূপ পুস্তকের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সমগ্র গীতাগ্রন্থের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিমূলক উচ্চ তত্ত্বগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত না হইলেও গীতার মূল বিষয়বস্তু সহজ সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আদর্শ জীবন গঠনের উপাদান ইহাতে বহুল পরিমাণে সন্নিবেশিত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে জীবনের জয়যাত্রা, আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ, জীবের দেহ ও আত্মা, গীতায় কর্মপদ্ধতি, কর্ম অকর্ম বিকর্ম, গীতায় যজ্ঞ, বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতি আলোচিত। শুদ্ধিপত্রের বহির্ভূত বহু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে এইগুলি অবশ্য সংশোধনীয়।

কল্যাণ (হিন্দী): ৩৪তম বর্ষের ১ম সংখ্যা সংক্ষিপ্ত দেবীভাগবতাঙ্ক। সম্পাদক—হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও চিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০৪; মূল্য টাকা ৭'৫০।

হিন্দী ভাষায় সনাতন ধর্মপ্রচারে 'কল্যাণ-' পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। কল্যাণের পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই বিশেষাঙ্কের নাম 'সংক্ষিপ্ত দেবীভাগবতাঙ্ক।' ইহা প্রসিদ্ধ পুরাণ দেবীভাগবতের বারটি স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। পরমতত্ত্ব নিরূপণের সঙ্গে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, সদাচার প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মের অভিন্নস্বরূপা মহাশক্তি ভগবতীর বিবিধ কাহিনী, বিচিত্র লীলা, ভক্তরক্ষাকার্য, উপাসনা-পদ্ধতি, মন্ত্র, গায়ত্রী, দেবীভাগবত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দেবীর বিভিন্ন লীলা বর্ণন করিয়া এক রঙের (১৮) ও বহু রঙের (২২) এবং রেখাচিত্র (১৭৬) এই গ্রন্থের অলংকার। পূর্ব পূর্ব বর্ষের ন্যায় এই বিশেষাঙ্কটিও সুন্দর ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়-সম্ভারে পরিপূর্ণ। গ্রন্থাগারসমূহের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। —**জীবানন্দ**

গীতা-জয়ন্তী: শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত; প্রকাশক: রথীন্দ্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা ৩১, পৃষ্ঠা ২০৮, মূল্য দুই টাকা।

জনক-জননীর পুত্রশোক ভুলিবার উপায়রূপে বার্ষিক গীতা-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতা প্রচার এবং এই স্মারকগ্রন্থ সংকলন। দেবচরিত্র পুত্রকে স্মরণীয় করিবার এক সার্থক ও অভিনব পন্থা শোকার্ত পিতামাতা অবলম্বন করিয়াছেন। গীতার স্বর্গত ও জীবিত বহু বিখ্যাত ব্যাখ্যাতার লেখা হইতে নির্বাচন করিয়া এবং বার্ষিক গীতাজয়ন্তীর বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা সংকলিত করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি সম্পাদিত। মোট ৩৫টি প্রবন্ধে গীতা সম্বন্ধীয় বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা পাঠকবর্গ জ্ঞান ভক্তি ও শান্তি লাভ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ৭ই মাঘ (২১শে জানুআরি) বৃহস্পতিবার শুভ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম আবির্ভাব-উৎসব সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর যোড়শোপচারে পূজা, কালীকীর্তন, হোম ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৬৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পার্শ্বস্থ গঙ্গাতীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী তেজসানন্দ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার স্বামীজীর জীবনী আলোচনাকালে বলেন যে, স্বামীজীর ধর্মমত জাতিগতভাবে বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বের সকলের কল্যাণের জন্যই তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতের বিশেষতঃ বাংলার ধর্মেতিহাস আলোচনা করিয়া ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্বামীজীর আবির্ভাব আমাদের সমাজ-জীবনে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে।

পরিশেষে স্বামী তেজসানন্দ স্বামীজীর বাণীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার আহ্বান জানান।

পুরী : গত ২১শে জানুআরি হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে বিবেকানন্দজন্মোৎসব মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, নরনারায়ণ-সেবা, রামনাম, বক্তৃতা ও ছাত্রদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুচারুরূপে প্রচুর আনন্দসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআত্মবল্লভ মহান্তির সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় শ্রীসর্বেশ্বর দাস, শ্রীললিতমোহন বর্মন, শ্রীত্রিলোচন মিশ্র বক্তৃতা করেন। স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা, স্বদেশপ্রেম, সেবাধর্ম, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শ্রীকিশোরীমোহন ত্রিবেদী সংস্কৃত ভাষায় সভাপতি ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ দেন। ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিবৃন্দ স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দ দান করে।

তমলুক : বিগত ২১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মতিথি-উৎসব তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজাপাঠ, প্রসাদবিতরণ, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও সন্ধ্যা-আরতির পর আলোচনা-সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

পরে ২৪শে ও ২৫শে জানুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দ আশ্রমে ও তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে স্বামীজীর কথা আলোচনা করেন। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজদাস চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ জানা স্বামীজীর সম্বন্ধে বলেন। সঙ্গীতবিশারদ শিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর সুমধুর ভজন সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৩০শে জানুআরি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, চণ্ডীপাঠ ও 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তক হইতে পাঠ হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ পূজ্যপাদ মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীসত্যপ্রিয় মহান্তির পৌরোহিত্যে ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন সুসাহিত্যিক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ, অধ্যাপক শ্রীবীরকিশোর ত্রিপাঠী এবং স্বামী অসঙ্গানন্দ। বিভিন্ন বক্তার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ, রামকৃষ্ণ মিশনের আর্তসেবা, স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিকতা, বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহরে প্রায় ১৫০০ ভক্ত, বিদ্যার্থী ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্ম-সঙ্গীতের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত কর্মধারা:

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়: বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে ১৭৫টি ছাত্র ছিল। নিম্নশ্রেণীগুলিতে হিন্দী বাধ্যতামূলক, উচ্চ শ্রেণীগুলিতে ঐচ্ছিক।

বেসিক ট্রেনিং স্কুল: ৭৬ জন শিক্ষালাভ করে। ৩৭ জন ট্রেনিং পরীক্ষা দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়। সিনিয়র বেসিক স্কুল: ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫১৮ (ছাত্রী ১৯৫)। বি. টি. কলেজ: ৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪০ জন উত্তীর্ণ হয়। সমাজসেবা: S. E. O. T. C.তে ৭৫ জন শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টা: এই বিভাগটি খোলা হয় ১৯৫৫ খৃঃ। সভাসমিতি, পাঠচক্র, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশন, কারখানা, শ্রুতিচাক্ষুষী শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা করা হয়। ৭০টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৭৫০ জন শিক্ষক এই কার্যে সহযোগিতা করেন।

গবেষণা: কোয়েম্বাতুর জেলার ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ধারণ জন্য এই বিভাগ ৪৫টি স্কুলে কার্য করিতেছে।

শারীর শিক্ষা কলেজ: আলোচ্য বর্ষের ৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

গ্রামীণ শিক্ষা: ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল, কৃষি-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতেছে।

গ্রাম্য চিকিৎসা: এক্স্-রে সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। ৩০,৯০০ রোগী (নূতন ১৩,৭৭৪) চিকিৎসিত হয়। অস্ত্র-চিকিৎসা: ১৬৬

কনখল: সেবাশ্রম সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হরিদ্বারের নিকট অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৭০৪ রোগী ভরতি হয়। বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯৫,৩৩৯ (নূতন ২৭,৮২৩); অস্ত্র-চিকিৎসা ৩৪২টি; লেবরেটরিতে ২,৯৩৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৪,৪৪১; পাঠাগারে ২৩ খানি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। গড়ে দৈনিক ২৫০জনকে গুঁড়া দুধ এবং শীতকালে কিছু সোয়েটার ও গরম জামা গরীব ছেলেদের দেওয়া হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

উদ্বোধন (কলিকাতা) : গত ১লা ফেব্রুআরি শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীর সংলগ্ন নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ।

এতদুপলক্ষে ঐ দিন বিশেষ পূজা পাঠ হোম ভজনাদি হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রী'মনাম কীর্তন হইয়াছিল। পরদিন বেলুড় মঠ ও বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সাধুগণ আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে প্রসাদ ধারণ করেন।

বক্তৃতা-সফর

ওড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে : গত নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ওড়িষ্যা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজীতে ও বাংলায় বক্তৃতা দেন। নিম্নে স্থান ও বক্তৃতার বিষয় লিপিবদ্ধ হইল :

স্থান	প্রতিষ্ঠান	বিষয়
কটক	প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান	কল্যাণরাষ্ট্রের শাসক
"	রেডিও ক্লাব	উপনিষদের মাধুর্য
"	অল ইণ্ডিয়া রেডিও	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গল্প
"	সাউথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন	ভাগবতের ভক্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণ
মেদিনীপুর	বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ	ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশে (বাংলা)
"	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম —বিদ্যালয়	উপনিষদ্ ও শ্রীরামকৃষ্ণ (বাংলা)
"	মহিলা মহাবিদ্যালয়	শিক্ষা
"	মেদিনীপুর কলেজ	যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর বাণী
"	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম —ছাত্রাবাস	আশ্রমিক ছাত্রদের উদ্দেশে (বাংলা)
বেলুড় মঠ	বিদ্যামন্দির	যুবকদের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান
"	"	ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা
"	সমাজ-শিক্ষণ ও শিক্ষক-শিক্ষণ-কলেজ	শিক্ষকদের উদ্দেশে
কলিকাতা	রোটারি ক্লাব	বিবেকানন্দে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন
কলিকাতা	বলরাম মন্দির	উপনিষদের মাধুর্য (বাংলা)

আসামে : গত সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসামের শিলং, গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ডিগবয়, তিনসুকিয়া, মারগারিটা, মাঝুম, লিডু, ডুমডুমা, নাহারকাটিয়া, করিমগঞ্জ, শ্রীগৌরী, কালিগঞ্জ, ভাঙ্গা, গিরীশগঞ্জ, নিলামবাজার, কায়স্থগ্রাম, বারুইগ্রাম, ফাকুয়াগ্রাম, নেতাজীনগর, সমৃদ্ধিপুর, কাঠিগড়া, হাইলাকান্দি, রামকৃষ্ণনগর, রাঙ্গাউটি, নালাবাজার প্রভৃতি স্থানে আলোকচিত্র সহযোগে—'ভারতে শক্তিপূজা,' 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান', 'ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী,' 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' ও 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ,' সম্বন্ধে মোট ৩৭টি বক্তৃতা দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

গত এক মাস যাবৎ স্বামী ঈশানানন্দ (বরদা মহারাজ) কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে বহু স্থানে ছোট বড় ভক্ত-সমাবেশে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিয়াছেন; কোন কোন সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা শুনিবার আগ্রহ সমাজে ক্রমবর্ধমান।

যে সকল স্থানে আলোচনা হইয়াছে নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লিখিত হইল : বলরাম মন্দির, বজবজ, সিঁথি (রামকৃষ্ণ আশ্রম) মাকড়দহ, খুরুট (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম), বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, চেতলা, আলিপুর।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

মহাজাতি সদন (কলিকাতা) ঃ

গত ১২ই জানুআরি মহাজাতি সদন ট্রাষ্টি বোর্ডের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকালে সদনের দ্বিতলে স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র ও গ্রন্থাবলীর প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন হয় এবং সায়াহ্নে একটি সভা হয়। মাত্র একদিন-স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

সায়াহ্নে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া সারগর্ভ ভাষণে বলেন: শিক্ষাই জাতির প্রাণস্বরূপ, শিক্ষার সঞ্জীবনীতে দেশ ও জাতি প্রস্ফুটিত হয়। স্বামীজীর মতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ণত্ব, অমৃতত্ব, দেবভাব ও ব্রহ্মলাভ। স্বামীজী বলিয়াছেন, ব্রহ্মস্বরূপ জীবে প্রথম হইতেই ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব নিহিত থাকে। এই ব্রহ্মত্বকে বিকশিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ; অব্যক্তকে ব্যক্ত করাই শিক্ষা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞানের বীজ নিহিত আছে, শিক্ষা উহাকে প্রকাশ করে মাত্র। অর্থাৎ বাহিরের শিক্ষা অন্তরের শিক্ষাকে প্রকাশ করার উপায় মাত্র।

বর্তমান সাম্যবাদের যুগে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই স্বামীজীর সর্বজনীন নীতি কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বিশ্বের সকল মানুষকে একই মহা মানব-জাতির অংশরূপে বিবেচনা করিলে পৃথিবীতে শান্তি আসিবে।

এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী শ্রীনিমাইচাঁদ বড়াল ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রবৃন্দ ধ্রুপদ ও স্বামীজীর গীত ও রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সকালে মহাজাতি সদনে প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, ৯৭ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এই দিনটি অতি গর্বের দিন। আজিকার দিনে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু আজিকার দিনে মানুষ যদি প্রকৃত উন্নতি করিতে চাহে তবে ভারতের অধ্যাত্মবাদের সাহায্যে মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

মহাজাতি সদনের সম্পাদক শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। স্বামীজী-ব্যবহৃত যষ্টি, কমণ্ডলু ও তানপুরা প্রদর্শনীতে রাখা হয়।

শ্রীরামপুর ঃ গত ২৪শে জানুআরি স্থানীয় টাউন হলে শ্রীরামপুর সংস্কৃতি-পরিষদের উদ্যোগে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে মাল্যভূষিত স্বামীজীর একটি প্রতিকৃতিতে শ্রীরামপুর, মাহেশ, শেওড়াফুলি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন। ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা হয় এবং রচনা ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার পারিতোষিক দেওয়া হয়।

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য (সভাপতি) স্বামীজীর জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য

আহ্বান জানান। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-ভজন সমবেতকণ্ঠে সুন্দরভাবে গীত হইয়াছিল।

সালকিয়া (হাওড়া) **:** গত ৩০শে জানুআরি সালকিয়া তরুণদল কর্তৃক স্বামীজীর জন্মোৎসব বিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজীর একটি বৃহৎ মূর্তি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ বর্তমান যুগে স্বামীজীর বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও রূপায়ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর জীবনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

বেলগাছিয়া (কলিকাতা) **:** গত ২৬শে জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ - সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক, প্রসাদ-বিতরণ ও কালীকীর্তন হয়। অপরাহ্নে স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক কথামৃত পাঠের পর ধর্মসভায় স্বামী ঈশানানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সভাপতি) এবং স্বামী সাধনানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

শিকড়া-কুলীনগ্রাম : শ্রীরামকৃষ্ণ-মানস-পুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ৯৮তম শুভ জন্মোৎসব তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রাম-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৩০শে ও ৩১শে জানুআরি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, ব্রহ্মানন্দ-জীবনী ও উপদেশ পাঠ, কথকতা, তীর্থপরিক্রমা, রামনাম, গোষ্ঠলীলা-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা হয়। প্রথম দিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ সঙ্গীত-সহযোগে কথকতা করেন এবং দ্বিতীয় দিন ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ' অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে পল্লীগ্রামটি আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

কার্যবিবরণী

কলিকাতা : স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বেদান্তমঠের (১৯এ, বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিভিন্ন কর্ম-ধারা লিপিবদ্ধ হইল।

শিক্ষা : কলিকাতায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, এখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়; নৈতিক, শারীরিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; ছাত্রসংখ্যা ২৫০। ফ্রি লাইব্রেরিতে মূল্যবান ৬০০০ গ্রন্থ আছে; পাঠাগারে দৈনিক উপস্থিতি ২৫।৩০জন।

প্রকাশন : স্বামী অভেদানন্দের মূল ইংরেজী পুস্তকগুলি এবং কয়েকটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি নূতন বইও ছাপা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র বাংলা 'বিশ্ববাণী' প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।

ধর্ম ও সংস্কৃতি : উপনিষদ্, ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে বক্তৃতা, ক্লাস ও আলোচনা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়।

পূজা ও উৎসব : আশ্রমে নিয়মিত পূজা, ভোগ, আরতি ও ভজন-কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট শংকরাচার্যের জন্মদিন যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিমায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখাকেন্দ্র: মূলকেন্দ্র ছাড়া ছাতরা (শ্রীরামপুর), দার্জিলিং ও মজঃফরপুরে একটি করিয়া স্বায়ত্তশাসনশীল শাখাকেন্দ্র আছে। মজঃফরপুরে একটি হাসপাতাল, দার্জিলিংএ একটি বি. টি কলেজ ও একটি এল. টি কলেজ পরিচালিত হইতেছে।

কৃষ্টি-সংবাদ

দার্শনিক বৈঠক: আন্তর্জাতিক দর্শন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-কেন্দ্র প্যারিসে। এ বৎসর মহীশূরে ঐ সংস্থার একটি আলোচনা-বৈঠক বসে, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আলোচিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি এই সম্মেলনে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে।

ইউনেস্কো (UNESCO), এবং কয়েকটি দেশের সরকার এই সম্মেলনকে আর্থিক সাহায্য করেন। ইউনেস্কোর অঙ্গীভূত এই আলোচনা বৈঠকে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমস্যাটি তিনটি ধারায় আলোচিত হয়: (১) বিজ্ঞান ও দর্শন, (২) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজ, (৩) জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য ও ঐতিহ্য।

বিশ্বধর্ম-সম্মেলন: গত ২রা হইতে ৯ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত কলিকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে শান্তি-স্থাপন ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ-প্রতিষ্ঠা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ইহার উদ্যোক্তা মুনি শ্রীসুশীল কুমারজী মহারাজ। বিশ্ব অহিংসা সংঘের সভা, মহিলা সম্মেলন ও নিরামিষভোজীদের আলোচনা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি অধিবেশনের অঙ্গ ছিল। শেষ দুইদিনের সভায় সাধারণের যোগদানের ব্যবস্থা থাকে।

পরলোকে রাজেন্দ্রলাল দে

গত ১৮ই পৌষ (ইং ৩রা জানুআরি '৬০) রাত্রি একটায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য রাজেন্দ্রলাল দে তাঁহার পুরুলিয়াস্থ বাসভবন 'সারদেশ্বরী কুটিরে' ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি অ্যানিমিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রম সংশোধন

মাঘ মাসের উদ্বোধনের ৩৩ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তির পর পড়িবেন, 'আমি তাঁহাকে ময়মনসিংহ যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম'।

এ মাসের পত্রিকায় ৭৩ পৃঃ ৩য় পঙ্‌ক্তি পড়িবেন: হেনরী ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৫ই ফাল্গুন (২৮.২.৬০) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠ, উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (৬.৩.৬০) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—'

তস্মৈ স হোবাচ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥

তত্রাপরা—ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

(অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৪-৫)

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালয়িতা ব্রহ্মা অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরা ঋষি তাহা লাভ করেন।

গৃহস্থশ্রেষ্ঠ শৌনকের মনে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিলে তিনি যথাবিধি অঙ্গিরা সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্, কোন্ বস্তু ঠিক মত জানিলে এই সমস্তই জানা হয়?'

অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন: 'দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে'—পরমার্থদর্শী বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। ঐ দুটি বিদ্যা—পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ।

তন্মধ্যে চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ [ইহলোকে ও পরলোকে সুখসাধক যাবতীয় জ্ঞান] সকলই অপরা বিদ্যা; এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষরকে (ব্রহ্মকে, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে) অনুভব করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা।

উপনিষদ্ বা বেদান্ত—বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বেদকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাই পরা বিদ্যার প্রকাশক। —'এক জ্ঞানই জ্ঞান, নানা জ্ঞান অজ্ঞান।'

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মশিক্ষার স্থান ও কাল

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা কতটা এবং কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে—এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য গত আগস্ট মাসে বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি গঠিত হয়, তাহার সদস্যগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন: সমগ্র সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষাজগতে বর্তমানে যে দোষত্রুটি দেখা দিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ জনসাধারণের উপর ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এ অবস্থা প্রতীকারের সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায়—অতি শৈশব হইতে দেশবাসীর মনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাদান' কমিটি (Committee on Religious and Moral Instruction) গঠনের প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণ করিতেছে—সারা দেশে নৈতিক মান দিন দিন নামিতেছে এবং ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে। কমিটি দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার পর তাঁহাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হইতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, এ বিষয়ে যদি কোন বাধা বিপত্তি থাকে তো তাহা সবল হস্তে দূর করা কর্তব্য। তাঁহারা মনে করেন না যে এই সিদ্ধান্ত সংবিধান-বিরোধী।

শ্রীপ্রকাশের নেতৃত্বে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণের সমাবেশে গঠিত এই কমিটির সিদ্ধান্তের মূল্য যথেষ্টই আছে। বিভিন্ন দিক দিয়া ইহার আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন, ইহা তো কোন নূতন প্রস্তাব নয়। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন (University Commission) অনুরূপ প্রস্তাবই করিয়াছিলেন; তাহা কেন কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই?

কাহারও মতে ছাত্রসমাজের এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা, এ যুগেরই ধর্ম। ইহা ভারতের কোন বিশেষ সমস্যা নয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ও শিল্পনির্ভর জীবনের এ একটা অভিব্যক্তি। উচ্ছৃঙ্খলতা বা দুর্নীতি শুধু ছাত্রসমাজেই সীমাবদ্ধ নহে, সমাজে ও রাষ্ট্র-জীবনের সর্বস্তরে ইহা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। শুধু ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দিলেই কি এই ব্যাপক সামাজিক ব্যাধি দূরীভূত হইবে?

যুব-সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তির কিছুটা দূরীভূত করিতে অনেক কল্যাণ-রাষ্ট্রে শিক্ষানীতির সহিত অর্থনীতিকে এমনভাবে যুক্ত করা হইয়াছে যে, শিক্ষালাভের পর প্রত্যেক যুবকের কোন না কোন কর্মসংস্থান হইয়া যাইবেই, এ বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত। মানুষ স্বভাবতই চায়—একটি সুখের সংসার, আর্থিক সচ্ছলতা, নিরাপদ আশ্রয়, নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ! যে আর্থনীতিক কাঠামোতে এইগুলি সম্ভব, সেখানে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায় তিরোহিত।

এ-জাতীয় অশান্তি দূর করিবার জন্য শুধু মাত্র ধর্মনৈতিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। প্রথম প্রথম কিছুটা কাজ করিলেও দেখা যাইবে, বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাড়িয়া ছাত্রেরা যখন বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করিতেছে, তখন চারিদিকে যেরূপ দেখিবে, বাধ্য হইয়া সেও সেরূপ ছাঁচে গঠিত হইয়া যাইবে। শিক্ষক, অভিভাবক

ও নেতাদের জীবনে রূপায়িত দেখিলে তবেই উপদেশ ও আদর্শ ছাত্রদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিবে। নতুবা ধর্ম ও নীতি পুস্তকের বেড়া-দেওয়া বাগানেরই শোভা বর্ধন করিবে; বেড়ার বাহিরে ঝোপঝাড় কাঁটার জঙ্গল দেশকে ভরিয়া ফেলিবে। জীবনে রূপায়িত না দেখিলে আদর্শ ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে একটি মাত্র জীবনে রূপায়িত আদর্শ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

ছাত্রদের নিকট নীতি ও ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, কারণ উহারা সার্থক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু সে শিক্ষা দিবে কে? শিক্ষকগণ যদি পরীক্ষণীয় বিষয়রূপে ইতিহাস ভূগোলের মতো কতকগুলি নীতি ও উপদেশ মুখস্থ করাইয়া যান, তাহাতে কতটুকু কাজ হইবে? হয়তো বহু ছাত্রই নোট বই পড়িয়া ঐ বিষয়ে পাস করিবে! গল্পের আকারে পরিবেশিত হইলে কল্পনাপ্রবণ শিশু-মনে নীতিকথা কিছুটা কাজ করে বটে, কিন্তু বাইবেলের সেই বীজবপকের গল্পটিও (Parable of the Sower) যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। পাথুরে শক্ত মাটিতে পড়িয়া বীজ ঠিকরাইয়া যায়, কাঁটার ঝোপেতে বীজ ব্যর্থ হয়, পাখী আসিয়া কত বীজ খাইয়া ফেলে। শুধু মাত্র নরম পাট-করা জমিতেই বীজ সফল হয়। সকল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এমন হৃদয়-মন প্রস্তুত করা, যেখানে মহত্ত্বের বীজ উপ্ত হইয়া সার্থক সফল মহৎ জীবনে পরিণত হইতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু একটি শিক্ষকের নয়; বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক যদি একপ্রাণ হইয়া ছাত্রদের জীবনগঠনে উদ্যোগী হন, তবেই তাঁহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে। বিভিন্ন শিক্ষকের মুখে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা পাইলে ছাত্রেরা বিভ্রান্তই হইয়া থাকে। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি সীমাবদ্ধ বিষয়; এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয় সম্বন্ধে বড় একটা কিছু বলেন না। কিন্তু ধর্ম বা নীতি এমনই একটি ব্যাপক বিষয়—যে সকলেই এ বিষয়ে বক্তা, সকলেই শিক্ষক। ছাত্রেরা কাহার কথা শুনিবে, কাহাকে মানিবে, অনেক সময় কিছুই ঠিক করিতে পারে না। তবে দেখা যায়—যেখানে তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা, সেখানেই তাহাদের আকর্ষণ। যে শিক্ষকের চরিত্রে ও ব্যবহারে তাহারা মুগ্ধ, যে শিক্ষক প্রাণপাত করিয়া তাহাদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য উদ্যোগী, ছাত্রগণ অজ্ঞাতসারে সেই শিক্ষককেই অন্ততঃ সাময়িকভাবে আদর্শ করিয়া ফেলে, তাঁহার মতো হাতের লেখা করে, চলে ফেরে, কথা বলে,—অনেক সময় তাঁহার কথারই প্রতিধ্বনি করে। এমনও দেখা যায় ছাত্র শিক্ষকের ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারই একটি প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে শিক্ষকছাত্র-সম্পর্ক গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে। ইহাই ছিল ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ—গুরুকুলপ্রথার মর্মকথা। আধুনিক ধরনের ঘণ্টা-কণ্টকিত ক্লাসে এই ভাব রূপায়িত করা সম্ভব নয়। একটি শিশুর জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য যেমন একটি গোটা মাতা প্রয়োজন, একটি বালকের জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য তেমনি পুরোপুরি একটি শিক্ষক প্রয়োজন। উপনিষদের শান্তিপাঠে তাই ধ্বনিত হইয়াছে, 'সহ নৌ অবতু, সহ নৌ ভুনক্তু'। দ্বিবচনের তাৎপর্য—গুরু-শিষ্যের এই জীবন-বিনিময়ে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।

ছাত্রদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষকের সুন্দর সুগঠিত জীবন, অভিভাবকের—বিশেষতঃ মাতাপিতার শান্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ, সর্বশেষে যে সকল খ্যাতনামা নেতা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির

জন্য চিন্তা করেন, বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহাদের জীবনও ছাত্রদের জীবনকে প্রভূত-ভাবে প্রভাবিত করে। যদি কোন নেতার 'ভাবের ঘরে চুরি' ধরা পড়িয়া যায়, বহু জীবন আদর্শ হারাইয়া ফেলে; এবং সেই নেতার প্রচারিত আদর্শ, চিন্তাধারা সমাজে আর বিশেষ কিছু করিতে পারে না। এজন্য নেতাদের ক্ষণিক লোকপ্রিয়তার প্রতি, আপাতমধুর মতবাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া জাতির শাশ্বত আদর্শের প্রতিই নিষ্ঠা প্রয়োজন। পুরাতন পরীক্ষিত যে সকল ভাব ও নীতি জাতীয় জীবনকে দীর্ঘদিন ধরিয়া চালিত করিয়াছে, সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁহাদিগকে আদর্শ নেতারূপে পরিণত করিয়া দেশবাসীকে, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে; এবং ছাত্রদের মধ্য হইতেই পরবর্তী যুগের নেতাও দেখা দিবে, যাহারা জাতীয় জীবন-ধারা সার্থক অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে।

এতদূর পর্যন্ত গেল আদর্শের কথা। বাস্তব-ক্ষেত্রের কথায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি গত ৬ই ফেব্রুআরি নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষতের ২৭তম অধিবেশনে বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া বলিয়াছেন:

'ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমার মনে হয়, তাহা-দিগকে যথার্থ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যাপারে অভিভাবকের অক্ষমতা এবং তাহাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে শিক্ষকদের অপারগতাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বর্তমান বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার মূল কারণ।...... তাছাড়া রাজনীতিক নেতা-রাও তাঁহাদের রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানাভাবে ছাত্রছাত্রীদিগকে উত্তেজিত করিয়া থাকেন। তবে একথাও সত্য যে, চিরাচরিত আচারবিচার ও মূল্যবোধ দ্রুত ভাঙিয়া পড়ি-তেছে, অথচ নূতন কোন নিষ্ঠা ও অনুরক্তির ভাব সৃষ্ট হইতেছে না। এই রূপান্তরের সময়ে যে সামঞ্জস্য ও স্থায়িত্ব বিধানের প্রয়োজন আছে, তাহা মিটিতেছে না বলি-য়াই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বর্তমানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।'

প্রতীকারের সন্ধানে গিয়া ডক্টর শ্রীমালি বলিতেছেন, 'যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ শিক্ষাদান-কার্যে আত্মোৎসর্গ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ-সাধনে আন্তরিকতার সহিত সচেষ্ট থাকেন, সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ঘটে না।' আধুনিক সামাজিক আর্থনীতিক পরিবেশে সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক স্নাতকোত্তর (graduate) ছাত্রকে কিছুদিন জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন, তাহা কতদূর কার্যকর হইবে তাহা বলা শক্ত। সেবা হৃদয়ের বৃত্তি। জোর করিয়া কাহাকেও দিয়া যে কাজ করানো যায়, তাহাকে সেবা বলা চলে না। সেবার প্রবৃত্তি জাগে সেবার আদর্শ দেখিয়া; একটি প্রদীপের শিখা হইতে যেমন জ্বলিয়া উঠে আর একটি প্রদীপের শিখা।

ভাষণের শেষাংশে শিক্ষামন্ত্রী ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাদান সম্পর্কে শ্রীপ্রকাশ কমিটির প্রস্তাব সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন: 'ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া হইবে না। কারণ ঐ সুপারিশে সততা, নিয়ম, শৃঙ্খলাবোধ ও তিতিক্ষা প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। ঐ সকল গুণের দ্বারা জীবন উন্নত ও পরিমার্জিত হয়; উহা ব্যতীত কোন সমাজ টিকিয়া থাকিতে পারে না।

'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচারের বিরোধী—এই ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত ভুল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্ম ও নীতির বিরোধী নয়; প্রকৃতপক্ষে নৈতিক আদর্শের ভিত্তি না থাকিলে ধর্মনিরপেক্ষ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিতে পারে না।'

কোন কোন নেতা মনে করেন, ভারতে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রধান বাধা—দেশে বিভিন্ন ধর্মের অবস্থান, এবং সেইজন্য তাঁহাদের মনে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, কোন্ ধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইবে? যাঁহারা এ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা সম্প্রদায়কেই ধর্ম বলিয়া ভুল করেন। ধর্মের একটি শাশ্বত রূপ আছে, সম্প্রদায় তাহারই দেশকাল-অনুযায়ী রূপ। ভারতে বহু সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরিয়া একত্র শান্তিতে বাস করিয়াছে; মাঝে মাঝে রাজনীতিক কারণে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিকেই রাজনীতিকগণ ধর্মবিরোধ বলিয়া মনে করেন। সেইজন্যই সরকারী প্রচেষ্টায় ধর্ম শিক্ষা দিতে তাঁহারা এত ভয় পান। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিষয়ক নিশ্চেষ্টতার ইহাই প্রধান কারণ।

ইহার প্রতীকার: (১) বিদ্যালয়ে শিক্ষাসূচীতে ধর্মের সাধারণ ভাব বা মূলনীতিগুলির উপর জোর দেওয়া, (২) নিজ নিজ ধর্মের বিশেষ ভাব ও পদ্ধতিগুলি বিদ্যালয়ের বাহিরে, গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে বা নির্দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা, (৩) সর্বশেষে—একটু পরিণত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন প্রতিবেশীর ধর্ম বুঝিতে ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবে, এইভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' কথাটি সার্থক হইবে। (৪) প্রথমাবস্থায় সমবেত সঙ্গীত খুবই প্রয়োজন, পরিণত বয়সেই নীরব প্রার্থনা সম্ভব। (৫) ঐতিহাসিক মহাপুরুষ এবং ধর্মপ্রবর্তকদিগের জীবন ও বাণী আলোচনার মাধ্যমে তাঁহাদের প্রচারিত ভাবগুলি ছাত্রদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহাদের মন উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবে। ইহার অধিক কিছু করিবার ক্ষমতা বিদ্যালয়ের বা শিক্ষকের নাই; তাহা আধ্যাত্মিকতার এলাকা, এবং সেখানে অভিজ্ঞ গুরুর সহায়তা প্রয়োজন।

'ধর্ম' শব্দটির অর্থ বড়ই ব্যাপক; নিম্নস্তরে ইহা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির সমপর্যায়ে, আবার উচ্চস্তরে ধর্ম বলিতে আধ্যাত্মিকতাই বুঝায়—যাহার অর্থ ইহ জীবনেই জড়াতিরিক্ত চৈতন্যসত্তার অনুভূতি—এক আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসপরায়ণ, আত্মনির্ভরশীল ভাব।

'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে ছাত্রদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম শুধু পারত্রিক কোন ব্যাপার নয়, ধর্ম দ্বারা ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণই সাধিত হয়। ধর্ম শুধু মোক্ষেরই সাধক নয়, অর্থকামেরও সহায়ক—অর্থাৎ ধর্ম প্রথমে অভ্যুদয় আনয়ন করে, পরে আনে নিঃশ্রেয়সের সাধনা।

ধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে, সত্যনিষ্ঠ ও সংযত করে, সদুপায়ে অর্জিত অর্থ সৎকর্মে ব্যয় করিতে বলে, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে সাহায্য করে; ধর্মানুশীলনের ফল মনুষ্যত্ব লাভ। ধর্মহীন মানুষ বিবেক-বুদ্ধিহীন,—পশুরই সমান।

ধর্ম জীবনের শেষ অধ্যায় নয়, প্রথম অধ্যায়—চতুর্বর্গের প্রথম বর্গ। সারা জীবন অধর্ম করিয়া শেষ জীবনে ধর্ম হয় না। তাই তো প্রাচীন নীতি ছিল, 'যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাৎ'। শৈশব হইতে ধর্মভাব শিক্ষা করিলে তবেই মানুষ যৌবনে ধর্মশীল হইতে পারে, তবেই সমাজে উত্তরোত্তর শান্ত সংযত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এবং দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া শান্তি ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

মানুষের 'জানার' আর শেষ নেই! তাই তো মানুষ কয়েক লক্ষ বছর হ'ল এ পৃথিবীতে এসেও এখনও পর্যন্ত তার নিজের দেহ ও মনটাকে জেনেই শেষ করতে পারলো না। যখনই সে মনে করেছে, এই বুঝি দেহের ও মনের চরম কথা, সে তার বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে জেনে ফেলেছে, তখনই আবার পরবর্তী আর একদল এসে সেই 'জানার' মধ্যে দেখিয়েছে—ভুল, ত্রুটি, প্রমাদ, হেত্বাভাস—এমনি কত কি! তাই মনে হয়, জানার প্রস্তুতি-পর্বই আজও মানুষের শেষ হ'য়ে যায়নি, পরিণতির তো কথাই নেই। এইভাবেই তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার গগনস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার একটি চমৎকার 'প্যাটার্ন' সে তার চলার পথে এঁকে রেখে যাচ্ছে মাত্র!

কিছুদিন আগে পর্যন্ত, মানুষ এই পৃথিবীর 'জানা-জায়গা'গুলো নিয়েই তার চিন্তার স্থায়ী 'পিরামিড্' রচনায় ব্যাপৃত ছিল। আর মাঝে-মধ্যে ঐ দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশের দিকে বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে, তারার ঝিকিমিকি দেখে, কিংবা জ্যোৎস্নালোকে অবগাহিত ভেসে-যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে, বিচিত্র ভাব ও ভাষার ডালি গেছে সাজিয়ে। অথবা বড় জোর, তার কল্পনার রহস্যগুণ্ঠিত পক্ষীরাজ ঘোড়াটায় চেপে কিছু মন-গড়া সংবাদ বয়ে নিয়ে এসে, তাকেই রঙে ও রসে ভিজিয়ে আমাদের মনের খোরাক জুগিয়েছে। জুল ভার্নে বা অস্কার্-ওয়াইল্ড্ প্রভৃতির লেখা পড়লে তো এইরূপ বাণীবাহকদের কথাই মনে জাগে। যদিও আজকের দিনে সত্যকার মূল্যবিচারে তাঁদের কর্মকীর্তির দাম—বোধ হয় কানাকড়িও নয়।

সম্প্রতি 'স্পুটনিক' কথাটা মানুষের বিজ্ঞান-মনকে আরও দূরাকাঙ্ক্ষিত ক'রে বিপদে ফেলেছে। এতদিন মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীটাকে জেনেই তৃপ্তির তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চুপ ক'রে ছিল। এখন তার জানার পরিধি বেড়েছে, সেই সঙ্গে তার মনের দামাল ছেলেটার অস্থিরতাও। এতদিন তার শিশু-মন কেবলমাত্র 'পৃথিবীকে জানা'র দোলনায় দোল খাচ্ছিল—তার বাইরে সে আর পা বাড়ায়নি। সে এখন এই দোলনার বাইরের অবকাশের ও অবস্থানের মধ্যে পেয়েছে ছাড়া। ফলে, চার দেওয়ালে ঘেরা কুতূহলের অর্গল তার গিয়েছে খুলে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রহে সে নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে না পারছে, ততক্ষণ সে ছট্‌ফট্ করবেই। কিন্তু এখানেই কি তার 'জানার' ভৌগোলিক পরিধিটা শেষ হ'য়ে যাবে? তা কে বলছে? এর পরেও মানুষ চাইবে সূর্যে কলোনী গড়তে, কিংবা চাইবে যাযাবর হ'য়ে ঘুরতে, সূর্যের চেয়েও বিরাট ও উজ্জ্বল তারকায়—একটির পর একটিতে। আজ তার আকাঙ্ক্ষা-পুষ্পের অনেক আশার পাপড়ির মুখ খুলে গেছে। বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলে আজ তাই সে সুনীল আকাশে হ'তে চায় উধাও—অসীম।

এমনি ক'রে বাইরে ছুটে গিয়ে, মানুষ কি শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমান্তে এসে পৌঁছাবে? তার ওপারে যাবার তখন আর কিছু থাকবে না? এই সীমাহীন বিশ্বের সীমা কি সে সত্যই খুঁজে পাবে? মানুষ কি সেদিন জানতে পারবে এই বিশ্বের উৎপত্তির চরম কথা? পারবে কি প্রকৃতির পরিণতির ইতিহাস জানতে—তার ভবিষ্য-পুরাণের অন্ততঃ সূচীপত্রটিকেও?

মানুষের এই বৃহত্তরকে ধরার অভিযানই তার চাঞ্চল্যের শেষ কথা নয়। তার এই বৃহত্তরের উপাদান-কণিকাগুলোর রহস্যটুকু এখনও তার অজানা। বর্তমান জড়বিজ্ঞান তাকে জানিয়ে দিয়েছে 'ইলেকট্রন' ও 'প্রোটনে'র অস্থিরতার সংবাদ, তাদের বিচ্ছুরণ-শক্তির তথ্য, তাদের মহা-মিলনের শক্তিব্যঞ্জক আকর্ষণটিকেও। তাই আজ মানুষ 'এ্যাটম্'-বোমা, 'হাইড্রোজেন'-বোমার নির্মাতা। আর এটা আছে বলেই মানুষ আজ স্পুটনিক চড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার চিন্তা করতে ভরসা পাচ্ছে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম কণিকাসমূহের সঠিক চালচলন এখনও মানুষ জানে না। সে জানে না—কেন তাদের এই অস্থিরতা? কি প্রয়োজনে তাদের ঐ মহাচাঞ্চল্য? —কে জোগায় তাদের মধ্যে এই প্রাণ-স্ফুরণ। কোন অদৃশ্য হস্ত কি তাহলে এর পেছনে কাজ করছে? আছে কি এ সবের পেছনে কোন অযুক্ত উল্লেখ? তাহলে কি সেই অদৃশ্যকে মানুষ তার বিজ্ঞান দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে? মানুষের জড়-বিদ্যার জালে কি ধরা পড়বে সেই অতীন্দ্রিয়? সৃষ্টির এই রহস্যময় অনতিক্রম্য সমুদ্র—মানুষ কি শেষে তার কাগজের নৌকা চড়েই পার হ'য়ে যেতে পারবে? মোট কথা, মানুষকে কেন্দ্র ক'রে জড়বস্তুর সূক্ষ্মত্বেই যাই, আর বিশালত্বেই যাই—মানুষ আজও তার সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারেনি—ভবিষ্যতেই যে পারবে তার সম্ভাবনাই বা কোথায়?

চারিদিকের জড়বস্তুর সাম্রাজ্য ছেড়ে, মানুষের নিজের মনের রহস্য সন্ধানের কথায় এলেও যে, সে রহস্যের সমাধান হ'য়ে যায়, তাও নয়! মানুষ মনের ভেতরকার চেতন, অচেতন প্রভৃতি স্তরের কথা আবিষ্কার করেছে—কত যুক্তি ও বিচার, তথ্য ও তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছে বটে, কিন্তু তবুও একটি ঢিল ছুঁড়লে একদল পাখীর প্রত্যেকটি একই দিকে যায় না কেন, তার রহস্য ভেদ করতে সে পারে না। মানুষের নিজের অন্তর-রহস্য আজও তার অজানা। অথচ এই তন্দ্রালু তন্ময়তায় ঘেরা মনকে নিয়েই মানুষ তার বাইরের অজানা রহস্যকে পরিমাপ করতে ছোটে!

আবার কত প্রাণী রয়েছে; তারা তাদের জীবন নিয়েই বেশ আছে, এর বাইরে তাদের চিন্তা নেই। কিন্তু, কে জোগাল মানুষের মধ্যে এই 'মন'টিকে, যার জন্য মানুষ কেবল ইতর প্রাণীর মতন কেবল বেঁচে থেকেই সন্তুষ্ট নয়। চিন্তার জগতে তাই সে তার অনুসন্ধিৎসার শিশু-চোখ মেলে সে নিজের কাছেই নিজে রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। চিন্তার স্থান মাথাকে বা অনুভূতির স্থান হৃদয়কে ভিন্ন (dissect) করেও একে ধরা যায় না; সব ধরার বাইরে দাঁড়িয়েই রহস্য আজও লুকোচুরি খেলছে।

মানুষের কাছে আর এক আশ্চর্য বস্তু—মৃত্যু। সে এলেই এই চির-অভিসারী প্রাণ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তখন মানুষ তার ভাবনার আকাশে আর বিপুল ইচ্ছার ডানা মেলতে পারে না; বরং তার এই প্রিয় দেহটাকে ছেড়েই তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হয়। মৃত্যুর এই মাধ্যাকর্ষণ-রহস্য—ভবিষ্যতের কোন নিউটন আবিষ্কার করবে ব'লে আজও তা ফল হ'য়ে জ্ঞানবৃক্ষে ঝুলছে!

এর পরেও এক প্রশ্ন জাগে। এই যে দৃশ্য জগৎ, এই যে মানুষের অনুভূতি, এই যে তার মনের সাহায্যে রহস্য আবিষ্কারের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, এই যে তার চেতনানুভূতি—যা তার সত্যকারের ভাব-বিগ্রহ—এসব কি মানুষকে ঐ সব রহস্য ভেদ করতেই সাহায্য করছে, না কানামাছি খেলার মতো কারো হাতের ভুল ছোঁয়া পেয়ে যথার্থকে ধরার ব্যাপারটিকে ক'রে তুলছে আরও জটিল।

তাছাড়া মানুষ তার বাইরের বোবা অনুভূতির উপর নির্ভর করেই তার চেতনকে চালাচ্ছে, কিন্তু ঐ অনুভূতির উপর নির্ভরশীল আমাদের এই চেতন মন অন্ধের মতোই তাঁকে আঁকড়ে, ঐ অন্ধের (অনুভূতির সাহায্যে বাহ্য বস্তুর সংবেদন-সংগ্রহ রূপ) সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে—কোথায়? —তা ঐ দুই অন্ধের একজনও জানে না—জানা সম্ভবও নয়; কারণ একে অন্যের খণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করেই সব কিছু বুঝে নিতে প্রয়াস পাচ্ছে যে!

তাহলে পথিক! আমাদের এই অন্ধের পাল্লায় পড়ে কিছু না বুঝেই কি এই পৃথিবীতে পুঞ্জীকৃত ঔদাসীন্যে ডুবে থাকতে হবে? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই?—উপায় আছে। সেটা বিচারের পথে নয়, বিশ্বাসের পথে। চল, সেই বিশ্বাসের খেয়া-তরী ধরে এই রহস্যময়তার ওপারে গিয়ে আপন আত্মার মুখোমুখি দাঁড়াই। ডাকো খেয়া-পারের সেই কাণ্ডারীকেও। বুঝে নয়, না বুঝেই ডাকো। ছোট ছেলে কি মাকে বুঝে নিয়ে ডাকে? সেই শিশুর আর্তি সম্বল ক'রে চল—মায়ের নির্ভরতার ক্রোড়ে উঠবে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

চৈত্র-বৈরাগী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

তোমার গোপন মনের মাঝে
কে বুঝি গো দেয় দোলা!
বাহির হ'লে উদাস মনে
বৈরাগী গো পথ-ভোলা!

আজকে তুমি ঘর ছেড়েছ
কাহার লাগি কোন্‌খানে?
কোন্ সুদূরের লক্ষ্য তোমায়
টানছে অলখ্ দিক্ পানে?

ভূষণ তোমার লুটায় ধূলায়,
মিলায় তনুর হেম ঘটা,
শ্যামল-বরণ উত্তরীয়ে
ভস্ম-রূপের পায় ছটা!

ভালে তোমার জ্বলছে আগুন,
আস্যে হাসির নাই ভাতি,
বাঁধন হারা ক্ষেপা বাতাস
তোমার পথের আজ সাথী!

তোমার পথে ফুল ফুটে না,
মধুপ যত যায় ফিরে,
বন-বীথির নাইকো ছায়া
স্নিগ্ধ নদীর তীর ঘিরে!

তোমার পথে বেণু-বীণার
সুর যে কোথায় রয় মিশি,
গীতিহারা বিহগ কাঁদে,
নীরব থাকে দশদিশি!

তোমার হাতের একতারাতে
উদাস প্রাণের গান জাগে,
কোকিল-কুহু পায় না আমল,
সুর ভাঁজিছ কোন্ রাগে?

অচিন্ পথের বাউল ওগো,
ব্যাকুল হ'লে কার তরে?
কার পানে আজ চল্‌ছ ছুটে
শূন্য বিরল প্রান্তরে?

কোন্ সে ঘরের আকর্ষণে
ঘর ছেড়ে যাও কোন্ দেশে?
এই ভুবনের রূপের আলো
তোমার চোখে যায় ভেসে!

তোমার পথে আঁধার নামে,
দীপ্ত দিনের নাই আলো,
ঊর্ধ্ব আকাশ বিরূপ হ'ল,
সূর্য-হারা সব কালো!

সুদূর পথের ওগো পথিক,
ওগো বাউল, দিক্-ভোলা!
তোমার গোপন মনের মাঝে
কে এসে আজ দেয় দোলা!

প্রীতিঃ পরমসাধনম্ *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

৩০।৪০ বছরের আগেকার কথা—কন্যাকুমারী যাবার রাস্তায় কেরলে একটি ভক্তের বাড়ীতে ৪।৫ দিন ছিলুম। আগে ভগবান তারপরে সংসার—এই ভাব নিয়ে তিনি সংসার করতেন। আগে সংসার, তারপর ভগবান নয়। ভক্তটি ভগবানকে নিয়েই সংসারের কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর সাথে আলাপ হ'ল। তাঁর কথার আসল ভাবটি এই :

স্ত্রী পুত্র পরিবার—এরা সব হ'ল তাঁর, আমার কেউ নয়। আমি এইভাবে তাদের সেবা করি—সংসারের কর্তব্য পালন করি। এই ভাবে ভাবস্থ হ'য়ে তিনি অনেক কিছু বললেন। আমি চুপ ক'রে সব শুনলুম। তিনি ছিলেন সেখানকার জেলা-জজ। তারপর তিনি আদালতে চলে গেলেন। বিকেল বেলা ফিরে এলেন। এসে আবার আমার কাছে ওই সব কথা ব'লে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঠাকুরঘরে। একটি আলাদা মন্দির, সেখানে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেইখানেই একান্তভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ করতেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে বলছেন—দেখুন মহারাজ, বোধ হয় ভাবছেন, সবই যদি ভগবানের হ'ল, তাহলে আমার কি রইল? আমার একটা আপনার জিনিস চাই তো! ওই দেখুন বসে আছেন। উনিই আমার আপনার। আর এই যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—সব ওঁর। এইভাবে আমি সংসারে চলেছি।

কত বড় কথা একবার ভেবে দেখ—এই ভাবটি। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একটা ভাবকে নিয়ে চলতে হয়—সকলেই তো আমরা চলি সংসারে। 'আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার কন্যা' এই সব ভাব নিয়েই তো সংসারের প্রতি আমাদের কত অনুরাগ, প্রীতি, ভালবাসা। এই ভাবটি না থাকলে তো হয় না। কাজেই এখানে ভগবানকে তিনি আপনার করেছেন; আর স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—সব তাঁর। কি সুন্দর কথা, 'আমার তো একটা আপনার চাই। আমাকে তো একটা ধরে দাঁড়াতে হবে! আমার একজন অবলম্বন, আশ্রয় চাই তো।' এইভাবে তাঁর চোখ দিয়ে দর দর ক'রে জল পড়ছে, আর তিনি বার বার ঠাকুরকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'এই আমার আপনার।' এই আপনার-ভাবটি এলেই জানবে, যেটুকু তাঁর পূজা-জপ-প্রার্থনা, সংসারের কর্তব্যপালন সেইটুকুই একটা প্রেম-প্রীতির সহিত আমরা করতে সক্ষম হবো। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যদি সব কাজ করো, সংসারী হলেও ধীরে ধীরে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে। ভগবানের দিকে এই প্রীতি-ভালবাসাটুকু নেই বলেই যত গোল। কেবল এক দিকে আছে; আর এক দিকে নেই ব'লে আমরা পারি না।

এই সব যা কিছু স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব হ'ল তাঁর, —আপনার একজন কে হলেন? এই একটা খুব বড় জিনিস আমি তাঁর কাছে শুনেছিলুম। তাই মাঝে মাঝে অনেককে বলি, আগে তিনি তারপর সংসার। কাজেই একটা অবলম্বন, একটা আশ্রয় নিয়ে এইভাবে সংসারে থাকতে হবে।

* ১৪-১১-৫৯, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লখনৌ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ—(শব্দযন্ত্রে গৃহীত) হইতে সঙ্কলিত। শ্রুত-লেখক শ্রীহরিপদ কর।

একটু প্রীতি নিয়ে ভজন করো,—একটু প্রীতি ভগবানের প্রতি দাও। ঠাকুর বলতেন, ভগবান ভক্ত নইলে থাকতে পারেন না। একটা অপূর্ব সম্বন্ধ! তোমরা সকলেই তো ভক্ত। এই সম্বন্ধ নিয়েই বার বার ভগবান মনুষ্য-শরীর ধারণ ক'রে আসেন—সে দিন পর্যন্ত এসেছিলেন, এই প্রেম-প্রীতিটুকু আস্বাদন করার জন্য। আহা! তিনি কাঙাল—তিনি এই প্রেম-প্রীতির কাঙাল। দেখ না ঠাকুরের এই কথাটি : সাধারণতঃ ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ। আবার কখন কখন ভগবান ছুঁচ, ভক্ত হয় চুম্বক। ভক্ত ভগবানকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণই প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা। ভগবান—বাক্যমনের অতীত হলেও, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা হলেও আর একটি তাঁর ভাব আছে। সেটি আমরা পাই তাঁর অবতারে। সেটি কি?—ভগবানের এই মাধুর্য ভাব। সেখানে ঐশ্বর্যের লেশ নেই। সেই ভাবটি কি? তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে একটা আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। সংসারে যেমন একটা ভাব ছাড়া আমরা চলতে পারি না, তেমনি ভগবানের সঙ্গেও একটা ভাব চাই, একটা সম্বন্ধ, একটা প্রীতির বন্ধন।

গীতায় ভগবান বলছেন :

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

—সেই সব ভক্তেরা, যারা প্রীতিপূর্বক একটু ভজনা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই। সংসারের যেমন সব কাজ প্রীতিমাখানো—ছেলেকে খাওয়ানো, স্বামীর সেবা, রাঁধা বাড়া—যা কিছু কতব্য কর না কেন, সব একেবারে প্রীতিমাখানো। কিন্তু ভগবানের জন্য যেটি করি, সেখানে তো সেই প্রীতি মাখাতে পারি না। তাই তো তৃপ্তি হয় না! সংসারের প্রতিটি জিনিস প্রীতিমাখানো। ছেলে মেয়ে আর সবাই সেই প্রীতিটুকুই তো আস্বাদন করে। তাই এখানে ভগবান বলছেন, 'যে আমাকে একটু প্রীতিপূর্বক ভজনা করে—'; ওই 'প্রীতি' কথাটি একেবারে স্পষ্ট লেখা আছে। অনুরাগের সহিত, প্রেমের সহিত ভজন চাই। তোমরা জান তো বিষয়ের প্রতি যে ভালবাসা তার কত টান। ওই প্রীতিটুকু আছে বলেই তো সংসার চলছে।

ভগবান বলছেন, 'প্রীতিপূর্বক ভজন কর।—করলে কি হয়?—না, যে করে তাকে আমি বুদ্ধি-যোগ দিই। শুভ বুদ্ধি দিই—বিবেক-বুদ্ধি! যে বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে সে আমাকে লাভ করে, আমাকে প্রাপ্ত হয়।' এই দেখ তোমার কাছে তিনি চাইছেন একটু প্রীতিমাখানো ভজন, তার পরিবর্তে দিচ্ছেন কি?—বুদ্ধিযোগ। এ বুদ্ধি যে-সে বুদ্ধি নয়। এ বুদ্ধি কি করে? তাঁকে লাভ করিয়ে দেয়। তাঁর সঙ্গে যোগ বা মিলন করিয়ে দেয়। বুদ্ধি হ'ল বিচার। তিনি নিজে স্বয়ং দেন এই বুদ্ধি! ভালবাসা হ'লে ভগবানের সঙ্গে একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হয়।

আমরা একটু পূজা করেই বলি 'এই নাও ফুল, এই নাও জল,' তার পরিবর্তে এটা চাই ওটা চাই, অভাব মিটছে না। বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না। বন্ধনের উপর বন্ধন। একে তো বন্ধন রয়েছে, ভগবানের পূজা ক'রে আবার বন্ধন! কিন্তু এখানে তিনি নিজে থেকে যা দিচ্ছেন, সেটি তা নয়। তাঁকে লাভ করার উপায় ব'লে দিচ্ছেন। দেখেছ কত তফাৎ!

আমাদের ভজন কি রকম? এই পূজা করলাম, এবার দাও।—এটা দাও, সেটা দাও। পেলে, আবার চাই। এ চাওয়ার শেষ নেই, এ পিপাসার শেষ নেই। আর তার সঙ্গে কি আসে? —জ্বালা-যন্ত্রণা। চিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়েছেন এ কথা।

মাছটাকে ফেলে দিয়ে গাছের ডালে চিল বসলো—নিশ্চিন্ত। এই বাসনাই মাছ। আর কাকগুলো কি হ'ল? ওই জ্বালা যন্ত্রণা চিন্তা। তবুও আমরা ছাড়ছি না বাসনা! কি সুন্দর দৃষ্টান্ত!

গীতা হ'ল ব্রহ্মবিদ্যা। কি ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, কি ক'রে ভগবদ্দর্শন হয়, তার উপায় বলছেন ভগবান স্বয়ং: যারা আমার প্রীতি-পূর্বক ভজনা করে—তাদের কি করি? 'দদামি বুদ্ধিযোগং'—তাদের বুদ্ধিযোগ দিই, যে বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে ভক্ত আমাকে লাভ করে। তাঁকে লাভ করা ছাড়া আর শান্তি নেই।

আগে তিনি তারপর সংসার। তিনি তো রয়েছেন আমাদের মধ্যে, আর আমরা তাঁকে এই মন্দির-মধ্যে রেখে, দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে ঘুরছি আনন্দ ও শান্তির জন্য। এই অবস্থা, এই দুর্দশা আমাদের কে করেছেন? —তিনিই। বলদটাকে কে ঘানিতে জুড়েছে? —কলু। কে চোখে ঠুলি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে? —কলু! 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। উপায় নেই, যখন কলুর বলদের মতো আমাদের অবস্থা! এই ঘোরাচ্ছেন, তারপরে বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ'। তিনিই ঘোরাচ্ছেন, অন্তর্যামী রূপে হৃদয়ে থেকে তিনিই ঘোরাচ্ছেন। তাঁর শরণাগত হ'য়ে বলতে হয়, 'এই চোখের ঠুলি খুলে দাও। এই বন্ধন মোচন কর, ঘানি থেকে অব্যাহতি দাও।'

'ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
হেরি গো তোর অভয় পদ॥'

এই বন্ধনটা খুলতে হবে। এই বন্ধন মুক্ত হবার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হ'তে হয়। আর আমরা করি কি? —আরো গাঁট দিচ্ছি। 'ভগবান, ছেলে দাও, মেয়ে দাও, জমি দাও, জরু দাও। টাকা দাও, গাড়ী দাও, বাড়ী দাও। মোকদ্দমা জিতিয়ে দাও'—এই সব ব'লে চাইছি। অন্ত নেই বাসনার। যদি বুঝতুম যে লক্ষ টাকা পেলে সব হ'য়ে গেল—তা তো নয়। সারা রাজ্য পেলেও, এই সমস্ত পৃথিবীটা পেলেও নয়। শান্তির এ রাস্তা নয়। আমরা ঠিক উল্টো রাস্তায় চলেছি—শান্তি পাচ্ছি না। ভোগ-বাসনার জন্যই জ্বালা-যন্ত্রণা—ওই সেই চিলটির অবস্থা। সে একটু ভোগ করবে বলেই তো ছোঁ মেরে মাছটাকে নিয়ে উপরে উঠছিল। ভোগ করতে পারলে? দু'চার-শো কাক তাকে তাড়া করেছে। ভোগবাসনা ধরে আছে বলেই তো মানুষের এত জ্বালা-যন্ত্রণা। ঠাকুরের এই সব উপদেশ গীতার মতো; এগুলি ভাবতে হয়, ধ্যান করতে হয়, চিন্তা করতে হয়।

কোথায় প্রীতি—ভগবান সব জানেন। তাই গীতায় বলছেন, 'আমায় প্রীতিপূর্বক ভজনা কর, আমি তো তোমায় বুদ্ধিযোগ দেবার জন্য তৈরী।' এ হ'ল ভক্তের জন্য। যারা অন্যভাবে উপাসনা করে, এ ব্যাপার তাদের জন্য নয়।

ভক্ত-ভগবান্ সম্বন্ধ একটি আলাদা। ভগবান বলছেন, ভক্ত যে আমার প্রাণ! ভক্তকে আমি কত ভালবাসি। তিনি তোমার কাছে চাইছেন কি? এতটুকু ভালবাসা—একটু প্রীতি। তোমরা সংসারেই সবটুকু দিয়ে রেখেছ। একটু তাঁকে দাও দেখি। একটু সেই প্রীতির সঙ্গে ভজনা কর, একটু প্রীতির সঙ্গে প্রার্থনা কর। একটু প্রীতিমাখানো ফুল তাঁকে অর্পণ কর। তাতেও আমরা নারাজ। তাই তো বলছেন, প্রীতিটুকু চাই।

ভগবান কি দেখেন? সংসারে মনুষ্যদৃষ্টি আছে, আর ভগবানের ভগবদ্দৃষ্টি আছে। মানুষের দৃষ্টি কি, তা তো সবাই জানো।

আর ভগবদ্দৃষ্টি কি? একজনের যদি ৯৯টি গুণ থাকে আর একটা দোষ থাকে, সংসার কি দেখে? ৯৯টি গুণ ভুলে ওই একটা দোষ নিয়ে তাকে একেবারে যা খুশি তাই বলবে। এই হ'ল মনুষ্যদৃষ্টি। আর ভগবদ্দৃষ্টি কি জানো? যদি ৯৯টি দোষ থাকে, আর যদি একটি গুণ থাকে, তিনি সেই একটি গুণ দেখেন। একটি গুণকে—বিন্দুকে সিন্ধু দেখেন। এই হ'ল দুটির তফাৎ। তিনি যদি এরকম না করেন, আমরা কি উদ্ধার হ'তে পারি? আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি কি? কাজেই ভগবান আসেন যুগে যুগে; এসে বলেন, আমাকে একটু প্রীতিপূর্বক ভজনা কর। একটু ভালবাসা, প্রীতি দাও। শুধু এই বললেন না; আবার বলছেন, আমার ভজন-পূজা, জপ-ধ্যান যা কিছু কর, এগুলি সব প্রীতিপূর্বক কর। তাহলেই আমি তোমাকে কি দেবো?—আপনা থেকে দেবো, তোমাকে চাইতে হবে না। একটু প্রীতিমাখানো ভজন কর, আমি তোমাকে শুভ বুদ্ধি দেব—যে বুদ্ধির আশ্রয় ক'রে আমাকে লাভ করতে পারবে।

তারপর আবার দেখ তিনি বলছেন—দেখ একবার কতটা উৎসাহ দিচ্ছেন ভগবান—'কতটা এগিয়ে যাই জানো অর্জুন? শুধু বুদ্ধিযোগ দিয়েই ক্ষান্ত হই না। এই সব ভক্তদের—যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, তাদের উপর করুণাপরবশ হ'য়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করি, যে আমি অন্তর্যামী হ'য়ে সকলের হৃদয়ে রয়েছি, অজ্ঞান-তম যাকে আবৃত ক'রে রেখেছে, ঢেকে রেখেছে সেই আমি ভক্তের কাছে আত্মপ্রকাশ করি, অন্ধকার মায়া মোহ আমার প্রকাশে দূর হ'য়ে যায়—নাশয়ামি আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।' এতটুকু প্রীতিমাখানো ভজনের ভেতর দিয়ে তিনি কোথায় কি ভাবে কৃপা করছেন ভক্তকে। একেবারে আমাদের মায়ামোহ কাটিয়ে হৃদয়ে মধ্যে স্বপ্রকাশ। তাই ঠাকুর বলতেন, ভগবানের দিকে এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন।

দেখেছ গীতায় এই দুটি শ্লোকের সঙ্গে ঠাকুরের বাণীর কত মিল! এইটি হ'ল তাঁর দৃষ্টিকোণ। ভুলে যেওনা মনুষ্যদৃষ্টি, ভুলে যেও না ভগবদ্দৃষ্টি,—ঠিক উলটো। এই হ'ল ব্যাপার। এই প্রীতিপূর্ণ ভজন,—এইটি সংসারে থেকে করতে হবে! আগে ভগবান, তারপর তো সংসার?

তারপর আবার দেখ পূজা করতে শেখাচ্ছেন: প্রীতিপূর্বক 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—এই যে পত্রপুষ্প ফলজল, যাতে এক পয়সাও খরচ নেই। গাছের ফল, গাছের পাতা তুলসী-বেলপাতা আর জল নাও। এই সবই তো ভগবানের, তোমার কোন্‌টা? এই যে আমরা ফল-জল দিয়ে পূজা করি, সবই তো তাঁরই জিনিস। এগুলি কি তোমার জিনিস? তাঁরই জিনিস নিয়ে তাঁরই পূজা করছি। তারপর বলছেন, এইগুলি আমার জিনিস হলেও যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি, এইগুলি ভক্তি মাখিয়ে—এই প্রেম মাখিয়ে যে আমাকে অর্পণ করে তারটাই আমি গ্রহণ করি। সেই ভক্তিটুকুই আমি আস্বাদন করি। পাতাটা তো আর খান না তিনি। ভক্ত যখন প্রীতি মাখিয়ে, এই একটু প্রেম মাখিয়ে আমাকে ভজন করে, আমি তখন যেন ভরে যাই। ভোজন ক'রে যেমন তৃপ্তি লাভ হয়, ভক্তের ভজনে সেই তৃপ্তি আমি লাভ করি—ভক্তের কাছে ওই প্রীতিমাখানো বেলপাতাটি কি তুলসীপাতাটি গ্রহণ করি। এখন দেখ, এই প্রীতিটকু হ'ল আসল জিনিস,—আর এইটি

এলেই বুঝতে পারবে, ভগবানের কাছে যাবার রাস্তা সহজ হ'য়ে গেল।

দুরকম ভক্তি আছে—বৈধী ভক্তি আর রাগানুগা ভক্তি। প্রথমে বৈধী ভক্তি—এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এই ভাবে পূজা করতে হবে—এই সব নিয়মে। এইটে দরকার প্রথমে। সেই জন্য দীক্ষার পর গুরু যা ব'লে দেন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তা করতে হয়। বৈধী ভক্তির পর কি আসে?—রাগভক্তি, প্রেমভক্তি। রাগভক্তিটা হ'ল প্রীতিমাখানো। বৈধী ভক্তিটা এল গেল, কিছু দিন করলে তারপর ছেড়ে দিলে। কিন্তু সংসারের কোন কাজ অসমাপ্ত রাখবার উপায় আছে কি? যে কাজটা আরম্ভ করলে সেটা তো শেষ করো প্রীতি মাখিয়ে। আর জপ-ধ্যান-পূজা—সেখানেই যত কিছু গোলমাল। এখানেও ঠিক থাকা চাই। সংসারের কোন কাজে যদি গোলমাল ক'রে ফেল রক্ষা আছে? স্বামী এসে ধমক দেবে, ছেলে এসে বলবে, আজ কি রেঁধেছ মা? সংসারে জব্দ ক'রে রেখেছে এই প্রীতির শাসন। আর এখানে শাসন করার কেউ নেই। এখানে গুরু মন্ত্র দিয়ে চলে গেলেন। এখানে বাইরে থেকে তো কোন শাসন আসছে না। কাজেই যা খুশি তাই। সংসারে যথেচ্ছাচার করার জো নেই। অফিসেও তাই। মাইনে বাড়বে না—উন্নতি হবে না, সব ভয়ে ভয়ে করছে। কাজেই এই বৈধী ভক্তিতে প্রথমে একটা নিষ্ঠা, একটা শ্রদ্ধা, একটু ভয় আছে,—পরে রাগভক্তি হবে। সে ভক্তি কি সহজে আসে? প্রথমে যাঁর কাছে দীক্ষা নিলে, তাঁর প্রতি চাই শ্রদ্ধা—তাঁর কথা তিনি যা বলেছেন, তার উপর চাই বিশ্বাস। সেই শ্রদ্ধাটিকে নিয়ে তারপর কাজে লাগতে হবে। যা তিনি বলেছেন সেই আদেশ পালন করতে হবে। সংসারে দেখ, কোন ফাঁকি দেবার জো নেই। এইটির বেলায় যত ফাঁকি। শ্রদ্ধা নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর আদেশ পালন—এইটি হ'ল বৈধী ভক্তি।

কিসের জন্য? একটা উদ্দেশ্য আছে তো—সবেরই তো একটা উদ্দেশ্য আছে। তুমি রাঁধতে জানো, ভাল রাঁধতে হবে। গাইতে জানলে ভাল গাইতে হবে। উন্নতি নইলে আমরা থাকতে পারি কি? এক জায়গায় এক অবস্থায় আমরা কি রাখতে পারি নিজেকে? ছেলে ক্লাসে প্রমোশন পাচ্ছে। তারপর একটা পাস ক'রল, দুটো পাস ক'রল। সবাই তো উন্নতি করতে চায়। এখানে উন্নতি হয় না কেন? ওই বিবেকটুকু নেই; তাই ভগবান বলছেন, 'দদামি বুদ্ধিযোগং'। আমার ভজন কর দেখি প্রীতিপূর্বক, বুদ্ধিযোগ বিবেক আমিই সব দেব। কাজেই এই বৈধী ভক্তি প্রথমে করতে হয়, তারপর রাগভক্তি আসে। রাগভক্তি আনবার জন্য কতগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। গুরু যা দিয়েছেন, তা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করবে। ছেলেদের যা পড়তে বলেছে—পাঠশালে স্কুলে বা কলেজে—ছেলেরা সেইগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে না পড়লে কখনও বিদ্যা অর্জন করতে পারে? সেইখানে তারা যদি গোলমাল করে, তাহলে পাস করতে পারবে? বিবেকটি হ'ল হাল। নৌকার হালটি হ'ল আসল জিনিস। হাল ধরে থাকে যে মাঝি, সেই তো আসলে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। হাল যদি ভেঙে গেল, তাহলে আর কি হবে? এই বিবেক হাল। এই বিবেক কিসের জন্য? এই যে আমরা পূজা জপ করছি, গুরুর আদেশে—কিসের জন্য? প্রেমভক্তি, রাগভক্তি আনবার জন্য। কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! পাখা করছি, বাতাস পাবার জন্য। যেই বাতাস উঠল পাখাটি ফেলে দিলুম। এই বৈধী ভক্তির ভেতর দিয়ে রাগভক্তি এলে আর বৈধী ভক্তির দরকার নেই, প্রমোশন উন্নতি হ'ল আর কি!

বৈধীভক্তির ও রাগভক্তির কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঠাকুর। বলেছেন মাঠে ধান ভরে

আছে, ধান কাটা হয়নি। তখন কি ক'রে যেতে হয় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে?—আল ঘুরে যেতে হয়। কত ঘুরতে হয়! ঘুরে ঘুরে তবে একটা গ্রামে পৌছতে হয়। আর যখন ধান কাটা হ'য়ে গেল, তখন আর আল ঘুরতে হবে না—সোজা একেবারে যেতে পারবে। তেমনি রাগভক্তি একেবারে সোজা ভগবানের কাছে পৌছায়। তাহলে এই প্রেমপ্রীতিটুকুই হ'ল আসল।

ভগবান চান ভক্তের কাছে এই প্রীতিটুকু। গীতায় তাই বললেন, ওই প্রীতিটুকু দিয়ে ভজন কর, বাকি সব আমি ক'রে দেব। সামান্যটুকুও আমরা করতে নারাজ।

ভজন করতে-করতেই সব আসবে। সব তিনি দেন। ক্ষুদ্রকে তিনি কত বড় ক'রে দেখেন। সেইজন্য তিনি কত কৃপা ক'রে একশো পা এগিয়ে আসেন—সত্যি। এইটি একটি বড় কথা। মনে থাকে যেন সংসার করতে গিয়ে তাঁকে ভুলবে না, কখনও তাঁকে ভুলবে না। তাঁকে একটু প্রীতিপূর্বক ভজন কর। মীরার দেখ, 'প্রীত করনা চাহি রে মনওয়া প্রেম লগানা চাই'। তা না হ'লে গিরিধারীলালকে লাভ করতে পারতেন কি তিনি?

একটি চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে—আখের ক্ষেতে জল নিয়ে যাবে ব'লে—তাহলে ভাল ফসল হবে। সেই আখ বিক্রি ক'রে সংসার প্রতিপালন করবে। কাজেই সে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে—ডোঙা ক'রে জল সেঁচে আখের ক্ষেত ভরতি করছে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই—ভাবছে কিছুক্ষণ পরেই যখন এই জল সেঁচা শেষ হবে, দেখব আখের ক্ষেত জলে ভরে রয়েছে। কিন্তু কাজ শেষ ক'রে চেয়ে দেখে এক ফোঁটা জলও আখের ক্ষেতে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কি সর্বনাশ, এত পরিশ্রম করেও কিছু হ'ল না! কোথায় গেল এত জল? খুঁজতে খুঁজতে আসছে—কোথায় গেল এত জল! দেখলে কতকগুলো ঘোগ—ইঁদুরের গর্ত, তার ভেতর দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে, এতটুকুও আখের ক্ষেতে নেই। তেমনি এই কামনা-বাসনা আমাদের কিছু হ'তে দিচ্ছে না।

আসক্তি-নোঙর ফেলা আছে, এইজন্য আমাদের নৌকা এগোতে পারছে না। কাজেই এইগুলো সব ভাল ক'রে মনে বিচার করবে, তারপর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে ভজনের সঙ্গে—আমাকে প্রেম দাও, প্রীতি দাও।

ঠাকুর প্রার্থনা করতেন 'শুদ্ধা, অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি দে মা' ব'লে। দেখেছ! ঠাকুরের প্রার্থনা ছিল মার কাছে, 'আমি দেহ-সুখ চাই না মা।' থুথু ফেলে থুথু খেতে নেই। তারপর প্রার্থনা করতেন, 'আমাকে শুদ্ধা, নিষ্কাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি দাও।' শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি গোপীদের ছিল—কৃষ্ণকে তাঁরা বেঁধেছিলেন। অহেতুকী ভক্তি প্রহ্লাদের ছিল, কৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন। ঠাকুর ওই সব চাইছেন বলছেন, 'মা, তোকে চাই।' তাঁকে পেতে গেলে কি করতে হবে?—প্রীতিপূর্বক ভজন।

তুমি এতটুকু ভজন কর, তিনি সেইটে এতটা দেখবেন! একেবারে একশো পা এগিয়ে আসবেন। এগুলি সব মনে রাখবে—ঠাকুরের উক্তি। দৈনন্দিন জীবনে একটা মনের খাদ্য চাইতো! এখন ক'রছ সব তো পেটের জন্য দেহ-সুখের জন্য। মনও একটা খাদ্য চায় তো, মনকে দিতে হবে কিছু। এইগুলিই খাওয়াচ্ছ মনকে।

রোজ একটু ক'রে ভজন করতে হবে। ঘটি রোজ মাজতে হবে—পেতলের ঘটি। তবেই এখানে আসা সার্থক হবে। ভজন চাই—ভজন চাই, তারপর কৃপা। অহেতুক কৃপাসিন্ধু চান শুধু একটু প্রীতিপূর্বক ভজন।

হাক্স্‌লির দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আলডুস্‌ হাক্স্‌লির (Aldous Huxley) Ends and Means বইখানিতে চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় আছে। হাক্স্‌লির মতে বৈজ্ঞা-নিকের ভুল হচ্ছে একদেশ-দর্শিতায়। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতা থেকে কেবল সেইগুলিকে বেছে নেওয়া—যেগুলি আমরা ওজন করতে, মাপতে অথবা গুনতে পারি এবং এই বাছাই-করা কতকগুলি সত্যকে সমগ্র সত্য ব'লে চালু করতে যাওয়া নিশ্চয়ই ভুল। এই ভুলের পথে গিয়ে বিজ্ঞান কিছু লাভ করেনি—এমন কথা বলা ঠিক নয়। লাভ সে যথেষ্ট করেছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মতোই বিজ্ঞান তার বিজয়-রথকে চালিয়ে দিয়েছে দিকে দিকে। জড়-প্রকৃতির দুর্গ-প্রাকার লুটিয়ে পড়েছে ধূলিতলে সেই দুর্বার অভিযানের সম্মুখে। জড়প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে বিজ্ঞানলক্ষ্মী মর্ত্যের ধূলায় স্বর্গের দরজা খুলে দেবে, মানুষের আর কিছুই চাইবার থাকবে না—এই গোঁড়ামি বৈজ্ঞানিককে যুগিয়েছে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। কিন্তু যাকে আমরা জড়প্রকৃতি বলছি (টয়েন্‌বীর ভাষায় Non-Human Nature), যাকে জয় ক'রে মানুষ এতকাল ধরে ভাবছিল, স্বর্গ তার কর-তলে-- সে তো প্রকৃতির আধখানামাত্র। শুধু আধখানা নয়, 'the less formidable half' (অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ আধখানা) বলাই ঠিক। প্রকৃতির বাকী আধখানা রয়েছে মানু-ষের নিজেরই মধ্যে, যাকে এখনও সে জয় করতে পারেনি। আজও আমাদের স্বভাবের কোন্‌ গভীরে বিচরণ করছে সেই আদিম উলঙ্গ বর্বর, যার প্রকাশ যুদ্ধবিগ্রহের হানাহানির মধ্যে। আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং বুদ্ধি এই বর্বরটাকে বাগে আনতে গিয়ে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে। কখন যে স্বভাবের কালো অরণ্য থেকে বেরিয়ে আসে বুনো ষাঁড়টা, শিঙের আগায় আমাদের বুদ্ধি এবং সঙ্কল্পকে কোথায় ফেলে দেয় ছুঁড়ে! আগ্নেয়গিরির এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের সামনে আমাদের মনের অবচেতন দিকটা চকিতে ধরা পড়ে যায় এবং মগ্নচৈতন্যের এই চেহারা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্‌ হ'য়ে যাই। প্রকৃতির এই ভয়াবহ আধ-খানাকে লক্ষ্য করেই টয়েন্‌বী মন্তব্য করেছেন: The other half of Nature, with which man still has to cope, is Nature as he finds her within himself.

ইচ্ছাশক্তির এবং বুদ্ধির জয়জয়কার সর্বত্র —এই অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে গেলে তবেই না আমরা ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন অনুভব করি! তবেই না আমরা 'কথামৃতে'র সেই বাছুরের মতো বলতে আরম্ভ করি, নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু! আমি নই, আমি নই, তুমি তুমি! টয়েন্‌বী ঠিকই বলেছেন, Self-centredness is an intellectual error, because no living creature is in truth the centre of the universe.—(স্বার্থ-কেন্দ্রিকতা একটা বুদ্ধির ভুল, কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাণী বিশ্বের কেন্দ্র হ'তে পারে না)।

আমাদের বুদ্ধির অহঙ্কার আর একটা জায়-গায় এসে আজ বিষম আঘাত খেতে আরম্ভ করেছে! আরব্যোপন্যাসের সেই জেলে জালার মুখটা খুলে দিতেই বেরিয়ে পড়লো একটা দৈত্য, আর তার আকার ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হ'তে লাগলো। বৈজ্ঞানিক সেই জেলের মতোই একান্তভাবে বিজ্ঞানের সেবা করতে গিয়ে আজ মুক্তি দিয়েছে পরমাণু-বোমার

দানবীয় শক্তিকে, যে-শক্তি পৃথিবীকে যে কোন মুহূর্তে রসাতলে পাঠাতে পারে।

আসন্ন প্রলয়ের সামনে মানুষের নাড়া-খাওয়া মন আজ ভাবতে আরম্ভ করেছে, বিজ্ঞানের এবং টেক্‌নলজির রাস্তায় 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছানো আদৌ সম্ভব কি না!

বৈজ্ঞানিকের এবং টেক্‌নিশিয়ানের প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির ঔদ্ধত্যে মানুষের আড়াইশো বছরের শ্রদ্ধা যখন ভাঙতে আরম্ভ করছে, তখন ধর্ম আবার তার হারানো সিংহাসন অধিকার করতে পারে। যা ওজন করা, মাপা অথবা গোনা যায়, তারই মধ্যে কি সত্যের রাজ্য সীমাবদ্ধ? প্রেম, সৌন্দর্য, ধ্যানের আনন্দ—এরা কি মিথ্যে? এদের কি কোন মূল্য নেই? সার্থকতা নেই? আলডুস্ হাক্স্‌লি বলছেন: Reality as actually experienced contains intuitions of value and significance, contains love, beauty, mystical ecstasy, intimations of godhead. মানুষের উপলব্ধিতে যে-সত্য ধরা দেয়, তার মধ্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সহজ অনুভূতি—ভালোবাসার অনুভূতি, সৌন্দর্যের অনুভূতি, ঈশ্বরের আনন্দের অনুভূতি, অধ্যাত্ম-চেতনার আভাস। বিজ্ঞানের হাতে এমন কোন যন্ত্রপাতি আগেও ছিল না এবং এখনও নেই, যা দিয়ে সত্যের এই সব গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণ করা যায়। তাই বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-চেতনার দিকটাকে উপেক্ষা করেছে, জগতের যে-সকল দিককে পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং উচ্চতর গণিতের নানাশাখার সাহায্যে জানা যায়, তাদেরই উপর সমস্ত জোর দিয়ে এসেছে।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা বলেন—ঈশ্বরের আনন্দ নেহাত কল্পনা-প্রসূত, ওর কোন বাস্তব সত্তা নেই, ও নিছক মায়া। কিন্তু যারা সংসার নিয়ে ডুবে আছে, ঈশ্বরের আনন্দের আস্বাদন যারা পায়নি কখনও, তাদের কাছে ঐ আনন্দ তো মন-গড়া ব'লে মনে হবেই। পাতকুয়ার ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখেনি—পাতকুয়াটিই জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে একটা পৃথিবী আছে। জন্ম থেকে যে বধির, তাকে কেমন ক'রে বোঝানো যাবে সঙ্গীতের অনির্বচনীয় মাধুর্য? একজন ভারতীয় ইওরোপীয় সঙ্গীতের সুর প্রথম শুনলে মনে করবে ভেড়ার গোয়ালে কে আগুন দিয়েছে। কিন্তু অনেকদিন ধরে শুনতে শুনতে তার একদিন মনে হবে, ইওরোপীয় সঙ্গীত উপেক্ষার বস্তু নয়। হাক্স্‌লি বলছেন: জীবনের আনন্দময় অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে যেগুলি নিতান্ত সহজবোধ্য কেবল সেগুলিরই দ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত। The rest cannot be had except by those who have undergone a suitable training. জীবনের বাকী আনন্দগুলির অনুভূতি সাধনা-সাপেক্ষ। রবিঠাকুরের গীতি-কবিতাগুলিকে প্রথমটায় মনে হবে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি, কিন্তু পড়তে পড়তে একদিন মনে হবে—সাহিত্যে ওদের সত্যি সত্যি কোন তুলনা নেই। হাক্স্‌লি বলছেন, Knowledge is always a function of being. আমরা যে-রকমটি, তারই উপর নির্ভর করে আমাদের জানা। আর আমরা কোন্ স্তরের মানুষ, তা নির্ভর করে আমাদের আদর্শকে জীবনে সত্য ক'রে তুলবার জন্যে আমরা কতখানি চেষ্টা করেছি তার উপর, আমাদের আদর্শের ধরনের উপরেও অনেকখানি।

হাক্স্‌লি বলছেন, সাধনার রাস্তায় যাঁরা ঈশ্বরের আনন্দের আস্বাদন পেয়েছেন, তাঁদের অনুভূতির অভিজ্ঞতা পেতে হ'লে নিজে সাধক হওয়া চাই। সাধন ক'রব না, তবুও আশা ক'রব ঈশ্বরের আনন্দের অনির্বচনীয় অনুভূতির—এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কি হ'তে পারে?

বৈদিক ঋষির জীবন-দর্শন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বৈদিক ঋষি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। রৌদ্রস্নাত পৃথিবীর বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছবি তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিত। তাঁহারা ভালবাসিতেন বনকুন্তলা শ্যামা ধরণী-জননীকে—ভালবাসিতেন পৃথিবীর লীলাচঞ্চল জীবন। তাঁহাদের প্রার্থনা সত্য, শিব ও সুন্দরের উদ্দেশ্যে।

ঋগ্বেদে শ্যাবাশ্ব আত্রেয় প্রার্থনা করিতেছেন:

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব॥
অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে।
বিশ্বা বামানি ধীমহি॥
আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে।
সত্যসবং সবিতারম্॥ ৫।৮২।৫-৭

—হে জগৎ-প্রসবিতঃ! হে দিব্যদ্যুতি সবিতঃ! তুমি পরম জ্যোতির্ময় দেবতা—যত কিছু দুঃখ, যত কিছু পাপ, অন্যায়, কলঙ্ক তুমি দূর কর। যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণময়, যাহা শুভ ও শঙ্কর, তাহাই প্রেরণ কর।

পাপহীন অদিতি সবিতার কল্যাণে দোষহীন সেই দেবতার অনুপম শক্তিতে আমরা যেন পাই—যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শোভন ও উজ্জ্বল।

এস আমরা সেই পরমদেবতার নিগূঢ় সত্যকে বরণ করি, আমাদের হৃদয়ের উৎসারিত স্তোত্রে সেই বিশ্বদেব সৎপতি সত্যপালককে গ্রহণ করি।

তিনি শিবতম। কল্যাণ ও ভদ্র তাঁহারই প্রসন্ন প্রসাদ। শিব যেখানে, কমনীয়তা সেখানে, সৌন্দর্য সুষমা কান্তি সেখানে; কিন্তু শিব ও সুন্দর তো একক নন, অনন্য নন; তাঁহাদের আসন সত্যের সুদৃঢ় বেদীর উপর। সত্যের ভিত্তিতেই শিব ও সুন্দরের উদ্দীপন।

বৈদিক ঋষির দেবতা তাই শূন্য নয়, মায়া বা ছায়া নয়, তিনি সচ্চিদানন্দ। সেই আনন্দসাগরে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষিদের জগৎ মধুময়। বৃহস্পতি-তনয় ভরদ্বাজ তাই প্রার্থনা করিয়াছেন:

মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং
মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা
মহিশ্রবো বাজমস্মে সুবীর্যম্॥৬।৭০।৫

—দ্যৌ ও পৃথিবী মধুধারা বর্ষণ করুন, মধুক্ষরণ করুন। আমরা যেন দ্যাবাপৃথিবী হইতে মধু দোহন করি, কারণ তাহারা মধুব্রত। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে যজ্ঞ ও সম্পৎ দিন, দিন আমাদিগকে বিপুল কীর্তি, সুবীর্য এবং প্রচুর ধন।

যিনি প্রাণারাম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই জীবনকে দেখিতেন বলিয়া তাঁহাদের জন্য বায়ু মধুর হইয়া বহে, নদী মধুর স্রোতে স্রোতস্বিনী হয়। তাঁহাদের জন্য বনস্পতি মধুময়, ওষধি মধু ভরিয়া রাখে, রাত্রি ও দিন মধুরতায় সিক্ত হয়, সূর্য মধুর আলোক দেয়, দশদিক মধুতে ভরিয়া যায়।

ভগবানকে লইয়া ঋষিরা তর্ক করেন নাই। তাঁহাকে তাঁহারা দিব্যানুভূতিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহারা নানা নামে ডাকিয়াছেন—নানা মূর্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনিই এক।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥১০৷৮২৷৩

—যে পিতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদের বিধাতা, যিনি সমস্ত ধামকে জানেন—বিশ্বভুবন যাঁহার ক্রীড়াস্থল, যিনি এক হইয়াও বিবিধ দেবতার নামে পরিচিত, অন্য সকলে সপ্রশ্ন হইয়া তাঁহাকেই অনুসন্ধান করে।

এক অদ্বিতীয়ের বিচিত্র বিলাস বিশ্বজগৎ—নানা শক্তির প্রকাশ সেই একেরই শক্তি; অথর্ববেদ ও যজুর্বেদে এই পরমকে দূরে না রাখিয়া অনুরাগের আবেগে বলা হইয়াছে:

স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধু।

প্রিয়তম সেই সখাকে প্রেমের ছন্দে দর্শন করিতে পারাই চরম পুরুষার্থ। তিনি তো পরম ত্রাতা, তিনি মঘবা—তাঁহার স্নেহের অমৃতধারা আমাদের জন্য সতত বহমান, তাই—

অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবক শোচিষম্।
হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে ॥৮৷৪৩৷৪১

—পুলকিত হৃদয়ে উল্লসিত অন্তরে সেই আনন্দময় দেবতার উপাসনা করিব, তিনি যে সর্বজনপ্রিয়, তিনি জ্যোতির্ময়, পবিত্র ও শুচি।

খৃষ্টীয় পাপবোধ বৈদিক ঋষিকে পীড়িত করে না। তিনি জানেন মানুষ চিরদীপ্ত, পবিত্র, অমৃতের সন্তান। সেই অমৃতত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ অন্তরের উদ্বেল আনন্দে। সেই আনন্দের মাধ্যমেই অন্তর-দেবতাকে উপাসনা করিতে হইবে। সান্ত অনন্তকে ধরিবে, অপূর্ণ পূর্ণতাকে আলিঙ্গন করিবে, খণ্ড অখণ্ডকে আকর্ষণ করিবে। ইহা সম্ভব, কারণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্বরূপতঃ এক।

তিনি তাঁহার অশেষ মাধুর্য লইয়া দূরে নহেন, তিনি নামিয়া আসিতেছেন, ভক্তকে প্রতি মুহূর্তে আহ্বান করিতেছেন—এই লীলাই তাঁহার করুণার মহৎ পরিচয়। তাই

গাব ইব গ্রামং যুযুধিরিবাশ্বান্
বা শ্রেব বৎসং সুমনা দোহনা।
পতিরিব জায়ামভি নো ন্যেতু
ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥১০৷১৪৯৷৪

—গরু যেমন গ্রামে ফেরে, যোদ্ধা যেমন প্রিয় অশ্বের নিকট ধাবমান হয়, বৎসের নিকট যেমন গাভী চঞ্চল হইয়া ধায়, পতি যেমন জায়ার নিকট যায়, তেমনই সেই প্রিয়তম যিনি দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন—যিনি ধাতা, যিনি সবিতা, সমস্ত সুখের যিনি জনক, তিনি আমাদিগের নিকট আসুন।

ভাগবত জ্ঞানের এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত বৈদিক ঋষি কর্মবাদী ছিলেন, পৃথিবীর জীবনকে ধন্য ও পুণ্য করিবার জন্য তিনি অতন্দ্র কর্মের উপাসক। আলস্যের জড়িমা তাঁহার কাম্য নহে, তাঁহার চাই সদাজাগ্রত অধ্যবসায়। নব নব কর্মে নবীন অভ্যুদয়ের দিকে চলাই তাঁহার লক্ষ্য। স্বাস্থ্যে সবল, বীর্যে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, জীবনের পরিপূর্ণতা বৈদিক ঋষির অভিপ্রেত। শতায়ু হইবার উদগ্র বাসনা তাঁহার—অকালমৃত্যু তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। তাই ঋষি শত শরৎ অজর হইয়া বাঁচিতে চাহেন। সেই কর্মোজ্জ্বল জীবনে তাঁহার প্রার্থনা:

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্। ঋগ্বেদ ২৷২১৷৬

—হে পরমেশ! যাহা শ্রেষ্ঠ ধন, যাহা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পৎ, তাহাই আমাদিগকে দাও, দাও সুনিপুণ চিত্ত, দাও সৌভাগ্য। আমাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ধন দিনে দিনে নবতর

পুষ্টি লাভ করুক, আমাদের তনু নিরাময় হউক, আমাদের বাক্য সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হউক, আমাদের প্রতিটি দিন যেন আনন্দে ও উৎসবে সুদিন হইয়া উঠে।

আমাদের প্রত্যহকে সৌভাগ্যপ্রদীপ্ত সুদিন করিতে হইলে চাই অতন্দ্র অধ্যবসায়—চাই অনলস কর্ম। দেবতারা প্রমাদকে ঘৃণা করেন—তাঁহারা ব্রতীকে, কর্মীকে স্নেহ করেন :

ত্রাতারো দেবা অধিবোচতা নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ
সুবীরা সো বিদথমা বদেম ॥ ৮।৪৮।১৪

—হে পরিত্রাতা দেবগণ, আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। নিদ্রা যেন আমাদিগকে মোহিত না করে, অলস জল্পনায় যেন আমরা কালক্ষেপ না করি। আমরা যেন বাক্‌পটু হইয়া সভায় বিদগ্ধ বক্তা হই—আমরা যেন দেবপ্রিয় হই—যেন সুবীর হই। স্বপ্নালু হইলে চলিবে না—অতন্দ্র কর্মী হইতে হইবে। কর্ম করিয়া যে শ্রান্ত, তপস্যায় যে আসক্ত, ব্রতে যে নিষ্ঠ—দেবতারা তাহাকেই আপ্যায়িত করেন। ধৃতব্রত ব্যক্তিই সমাজে শ্রেষ্ঠ। তাহাকে বলিতে হইবে, 'চরৈবেতি চরৈবেতি' সূর্য-চন্দ্রের মতো অবিরাম গতিতে কেবল চলিতে হইবে—চলার মাঝেই মানুষ মধুলাভ করে। সূর্যের যেমন বিশ্রাম নাই—মানুষকে তেমনই অবিশ্রাম কাজ করিতে হইবে। যে যতদিন বাঁচিবে, ততদিন কর্ম করিয়াই তাহাকে বাঁচিতে হইবে—ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

জীবনবাদী ঋষির কর্ম কিন্তু আত্মস্বার্থের জন্য নহে, তাহাকে যজ্ঞ-জীবন যাপন করিতে হইবে। যজ্ঞ দেবোদ্দেশে ত্যাগ; বিষ্ণুর প্রীতিকাম হইয়া জীবন চালাইতে হইবে—সকলকে খাওয়াইয়া তাহাকে যজ্ঞাবশেষ খাইতে হইবে, আপনাকে লইয়া বিব্রত হওয়া তাহার চলিবে না।

ধন আহরণ করিতে হইবে, কিন্তু সত্যের পথে সে আহরণ—নমস্কার এবং তপস্যায় তাহার আয়োজন। প্রতিদিন আত্মানুশীলনের দ্বারা মানুষ দক্ষ হইবে; ঋতপালনে তাহার আসিবে নবতর শক্তি, জাগ্রত হইবে তাহার অন্তর্লীন প্রতিভা। কিন্তু মানুষের এই ধন, এই অন্ন লোকসেবায়। সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত অন্নই মানুষের অমৃত—যে লোক নিজের বিলাস-ব্যসনে ধন ব্যয় করে, সে তস্কর।

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদো ॥ ১০।১১।৬

—যে জ্ঞানহীন সে বৃথাই অন্ন সঞ্চয় করে, তাহার শ্রম ব্যর্থ, কারণ যে অন্ন লোকে কলঙ্কিত, তাহা তাহার মৃত্যু আনয়ন করিবে। যে একক খায়, সেই স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল পাপই ভক্ষণ করে; বন্ধুকে যে দেয় না, দেবতাকে যে দেয় না—সেই স্বার্থান্ধ লোভী পাপেই ডোবে।

দিব্য জীবনের উদ্গাতা বৈদিক ঋষি ছয়টি জিনিসকে তাঁহার দেব-জীবনের ভিত্তি বলিতেন; অথর্ব বেদে পাই :

সত্যং বৃহৎ ঋতমুগ্রং দীক্ষাতপে।
ব্রহ্ম যজ্ঞ পৃথিবীং ধারয়ন্তি ॥ ১২।১।১

—পৃথিবীকে ধারণ করে ছয়টি বস্তু : সত্য, বৃহৎ ও উগ্র ঋত, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ।

সত্যই ধর্মের প্রথম ও প্রধান সোপান। সবিতা সত্যধর্মা। সত্য বাক্ এবং সত্য কর্ম অভ্যুদয়ের পথ। সত্যেরই জয়, অনৃতের ক্ষয়। অঘমর্ষণ ঋষি বলিয়াছেন :

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
—ঋত এবং সত্য তপস্যার তীব্রতায় জন্ম-

লাভ করে। তপস্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে চাই দীক্ষা। দীক্ষিত হইয়া পরমার্থের জন্য চাই মানুষের অতন্দ্র সেবা। তাহার দুইটি সহায়—উপাসনা এবং যজ্ঞ।

এই যে দিব্য জীবনের স্বপ্ন—ইহা অসম্ভব নয়। ঋষির বোধিতে নিগূঢ় অনুভূতিতে তাহা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে এই অধ্যাত্ম-বিদ্যা ঋষি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা একান্ত মিথ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা সর্বসাধারণের জন্য তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই অমৃত-তত্ত্ব সকলকে দিবার জন্য তিনি অনুশাসন দিয়াছেন, বিশ্ব-মানবকে আর্য করিবার কথা বলিয়াছেন।

সেই ঋষিবাক্য পূর্ণ করিবার চেষ্টা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কল্যাণী বেদবিদ্যা তাপতপ্ত জগতের মানুষকে দিবার যুগ আজ আসিয়াছে। বিশ্বমানবকে দ্বিজ করিবার, সত্যে ও ঋতে দীক্ষা দিবার সুবর্ণ সুযোগ আজ উপস্থিত। আমরা যেন অকারণে সেই সুযোগ হেলায় না হারাই।

বৃহৎ পৃথিবীর বৃহত্ত্বের মাঝে আজ সমগ্র মানবজাতির নবীন উজ্জীবন হউক। বিবর্ধন এবং প্রগতির পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়া উঠুক। আবার সংবলন ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা উদাত্ত স্বরে গাহি :

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২-৪

—তোমরা সকলে একত্র হও, এক সুরে কথা কও, তোমাদের মন ঐকতানে বাজুক। তোমাদের মন্ত্র এক হউক, তোমাদের সমিতি এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমাদের চিন্তা এক হউক। আমি তোমাদিগকে একই অভিপ্রায়ে নিযুক্ত হইতে বলি, একই উপচারে তোমরা পূজা করিবে। তোমাদের আকূতি এক হউক, তোমাদের সুসঙ্গতি হউক, মনে প্রাণে ঐক্য হউক, তোমাদের সকলের চিন্তা ও ভাবনা এক হউক, তাহা হইলে তোমরা একমত হইতে পারিবে।

বিশ্বজনীনতা বৈদিক ঋষির অতিমানবত্বের পরিচয়। যেদিন ব্যবধান ছিল দুস্তর, মরু-কান্তার এবং অভ্রংলিহ পর্বতমালা, সীমাহীন বারিধি যেদিন মানুষে মানুষে ভেদ ও অপরি-চয়ের অর্গল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেই অতীতেই বৈদিক ঋষি বিশ্বপ্রেমের কথা ভাবিতেন। তিনি বিশ্ব-নরের দেবতাকে বৈশ্বানর নাম দিয়া উপা-সনা করিতেন। ইন্দ্র সাধারণের দেবতা। সেই ঋষি-দৃষ্ট বিশ্বমৈত্রী আজ সত্য হউক। আজ যেন আমরা বলিতে পারি :

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে॥ যজুর্বেদ ৩৬।১৮

—বিশ্বজগতের সকল প্রাণী যেন মিত্রের মতো আমাকে অবলোকন করে, আমিও যেন সকলকে মিত্রের চক্ষুতে দেখি। আমরা যেন মৈত্রীর মাধ্যমে পরস্পরকে দেখিতে শিখি। বৈদিক ঋষির জীবন-দর্শনের শেষ কথা এই বিশ্বাত্মবোধ—বিশ্বানুভূতি।

সংস্কৃতের মহাকাব্য

ডক্টর শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত আলংকারিকেরা কাব্যকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি দৃশ্য আর একটি শ্রব্য। যে কাব্য অভিনয়োপযোগী তাই দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ নাটকই দৃশ্যকাব্য, এর আর একটি নাম রূপক। রূপকালংকারে একটি বস্তুর ওপরে আর একটিকে এমনভাবে আরোপিত করা হয়, যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে নিজের রূপে রূপায়িত ক'রে তোলে। এ অলংকার আরোপ-প্রাণ, আর আরোপ আছে বলেই এর নাম হয়েছে রূপক। নাটককেও আরোপ-প্রাণ ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে; কারণ যতক্ষণ অভিনয় চলতে থাকে, ততক্ষণ দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পাত্র-পাত্রী বলেই মনে করেন। এইজন্যই নাটকের আর একটি নাম হচ্ছে রূপক। যে কাব্য কেবল শ্রোতব্য,—যাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা চলে না, তার নাম শ্রব্য কাব্য। এ কাব্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হ'য়ে থাকে—পদ্যময়, গদ্যময় ও মিশ্রকাব্য। মিশ্রকাব্যই আলংকারিক-গোষ্ঠীতে চম্পূ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। পদ্যময় কাব্যের প্রভেদ দুটি--মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সর্বপ্রথম দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শে' মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ কাব্য সর্গাকারে নিবদ্ধ হয় ব'লে এর আর একটি নাম হচ্ছে সর্গবন্ধ। সর্গবন্ধ মহাকাব্যের কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হওয়া চাই,—এর ইতিবৃত্ত-নির্মাণে কবি-কল্পনার কোন অবকাশ নেই। যদি নিতান্তই কবি-কল্পিত ইতিবৃত্ত পরিবেশিত হয়, তাহলে তা যেন কোন মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়। মহাকাব্যের নায়ক চতুর ও উদাত্ত দেবতা কিংবা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হওয়া চাই। সহজ কথায় মহাকাব্য অভিজাত-জীবনের আলেখ্যরূপে গড়ে উঠবে, এতে প্রতিবিম্বিত হবে সমাজের উন্নত স্তরের জীবন। মহাকাব্যের আরম্ভে থাকবে পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে রচিত আশীর্বাণী, কিংবা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপক শ্লোক। কখনও কখনও সরাসরি নায়কের বর্ণনার দ্বারা বা কাহিনীর সূচনার দ্বারাও মহাকাব্য আরম্ভ হ'তে পারে। এর সর্গগুলি আকারে খুব বিস্তৃতও হবে না, আবার সংহতও হবে না। সাধারণতঃ এক ছন্দে সর্গের শ্লোকগুলি রচিত হবে; কেবল শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোকে ভিন্ন ছন্দের ব্যবহার থাকবে। আগামী সর্গের কাহিনীর সূচনা সর্গের শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোকে থাকবে। এই লক্ষণগুলিই সব নয়। মহাকাব্যের কলেবর-স্ফীতির জন্য যে যে বিষয়ের বর্ণনা এতে স্থান লাভ করবে, তারও একটি নির্দিষ্ট তালিকা আলংকারিকেরা দিয়ে দিয়েছেন। এতে স্থান লাভ করেছে নগর, সমুদ্র, পর্বত, ঋতু, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, চন্দ্রাস্ত, জলকেলি, উদ্যান, মদ্যপান, সম্ভোগ, বিবাহ, বিচ্ছেদ, কুমারোৎপত্তি, মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধযাত্রা, নায়কের উন্নতিলাভ এবং আরও অনেক কিছু। এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা মহাকাব্যে প্রবেশ লাভ ক'রে কাব্যকে মহৎ ক'রে তুলবে। নগর প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা ব্যাহত হ'য়ে মূল কাহিনীর

সূত্র যাতে ছিন্ন না হ'য়ে যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

আলংকারিকেরা তাই বলেছেন, নাটক-প্রসিদ্ধ পঞ্চ সন্ধি মহাকাব্যে স্থান লাভ ক'রে কাহিনীকে সুসংহত ক'রে তুলবে। নাটকীয় কাহিনীর পাঁচটি অবান্তর ভাগের কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দ্বিবিধ আলংকারিকই স্বীকার করেছেন। এই ভাগগুলি হচ্ছে—প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ, গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার। পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা এদের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে: Exposition, Growth of Action, Climax, Resolution ও Catastrophe; সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে এরাই হচ্ছে যথাক্রমে মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্শসন্ধি ও নির্বহণসন্ধি। মহাকাব্যের কাহিনী বীজবপন থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফলপ্রাপ্তিতে পৌঁছাবে,—এইটাই বোধ করি আলংকারিকেরা 'পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্' বিশেষণের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। এ-রকম মহাকাব্যের ছন্দ যদি শ্রুতিসুখকর হয়, আর শব্দালংকার ও অর্থালংকারের বিন্যাস যদি তাকে রমণীয় ক'রে তোলে, সহজ কথায়—তার আঙ্গিক যদি চিত্তাকর্ষক হয়, তাহলে তা জাতীয় স্মৃতির অমরাবতীতে চিরদিনের জন্য স্থানলাভ করবে।

আচার্য দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালের আলংকারিক রুদ্রট তাকেই সামগ্রিক ভাবে অপরিবর্তিত রূপে মেনে নিয়েছেন। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ এ সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রসের মধ্যে একটী প্রধানভাবে পরিবেশিত হবে; কোথাও দুর্জনের নিন্দা, কোথাও বা সুজনের গুণকীর্তন থাকবে, সর্গসংখ্যা হবে আটের বেশী, আর নাম হবে কবি, ইতিবৃত্ত, নায়ক বা কাহিনীতে অংশগ্রহণকারী কোন চরিত্রের নামানুসারে। যে আলংকারিক সর্বপ্রথম মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন, তাঁর প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি কালিদাসোত্তর যুগের। অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মহাকাব্যগুলিকে সামনে রেখে, তাদের সঙ্গে মিলিয়েই তিনি মহাকাব্যের ধর্ম আবিষ্কার করেছেন।

কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ-রচিত মহাকাব্য দুটি—বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ। মূল সংস্কৃতে লেখা 'বুদ্ধচরিতে'র মাত্র তেরটি সর্গ এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে; অবশ্য অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, এতে বাইশটি সর্গ ছিল। 'বুদ্ধচরিতে' বুদ্ধের মানসিক পরিবর্তন, সিদ্ধিলাভ, মারের সঙ্গে যুদ্ধ ও পরিশেষে জয়লাভ, এই সমস্ত বর্ণিত হয়েছে। জরাতুর ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, স্বপ্নাবিষ্টা নিরাবরণা নারী ও মৃতদেহ দর্শন ক'রে সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারের বর্ণনার দ্বারা অশ্বঘোষ সংসারের অসারতা ও অনিত্যতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন,—বলতে চেয়েছেন যে বন্ধন কাটিয়ে উঠতে না পারলে, চিত্তচাঞ্চল্যকে জয় না করলে পুরুষার্থ লাভ হয় না। অশ্বঘোষের এ কথা চিরকালের সত্য, আর এই জন্যেই তাঁর কাব্য মহাকাব্য। 'সৌন্দরানন্দ' সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। এ কাব্যে কবি বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের বলপূর্বক দীক্ষা গ্রহণের বর্ণনা করেছেন। নন্দ দীক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু ভোগের প্রতি আসক্তিকে ত্যাগ করতে পারেননি। তীব্র ভোগাসক্তির অনলে তিনি দগ্ধ হয়েছেন; এতে ইন্ধন জুগিয়েছে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সুন্দরার বিলাপ। তাই স্বর্গে গিয়েও নন্দের শান্তিলাভ হয়নি,—অপ্সরাদের সান্নিধ্য খুঁজতে হয়েছে। এ কাব্যে বোধ হয়, অশ্বঘোষ আসক্তি-

ত্যাগের ওপর জোর দিয়েছেন; বলেছেন—শুধু বস্তুত্যাগ করলেই হল না, ভোগের ইচ্ছাকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হবে। পূর্বের মতোই এ-আদর্শও শাশ্বত ও ব্যাপক। 'সৌন্দরানন্দে'র সর্গসংখ্যা হচ্ছে আঠারটি। মহাকাব্যের লক্ষণ অনুযায়ী এতে নগর, ঋতু প্রভৃতির শব্দচিত্র স্থান পেয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের কবিপ্রতিভাও আমাদিগকে দুটি মহাকাব্য উপহার দিয়েছে। একটি 'কুমারসম্ভব', আর একটি 'রঘুবংশ'। 'কুমারসম্ভবে'র সর্গসংখ্যা আটের বেশী ও পরিবেশিত প্রধান রস শৃঙ্গার। এর আরম্ভ হয়েছে কাহিনীর অন্যতম চরিত্র হিমালয়ের বর্ণনার দ্বারা এবং পর্বত, ঋতু, বিবাহ, সম্ভোগ, কুমারোৎপত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনাও এতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু 'কুমারসম্ভবে'র মহত্ত্ব এর ওপরে নির্ভর করে না। এ কাব্য মহৎ, কারণ মদনভস্মের কথা ব'লে এ কাব্য নারীর ললিত দেহসৌন্দর্যের চরম ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করেছে; বলেছে যে, প্রিয়জনের চিত্ত জয় করার প্রকৃত পথ হচ্ছে তপস্যা ও ত্যাগ—বলেছে যে, ত্যাগ ও প্রেমকে আশ্রয় ক'রে যে মিলন সংঘটিত হয়, তার থেকেই কার্ত্তিকেয়ের মতো কুমারোৎপত্তি আশা করা যেতে পারে। ফাল্গুনের পত্রপুষ্প-পর্যাপ্তির মধ্যে যখন বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্বতী মহাদেবের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন, তখনই যদি মহাদেব তাঁকে গ্রহণ করতেন, তাহলে সে মিলনের ফলস্বরূপ কার্ত্তিকেয়কে পাওয়া সম্ভব হ'ত না। 'কুমারসম্ভবে'র সত্য শাশ্বত সত্য, নারীর ললিত লাবণ্যের ব্যর্থতা চিরকালের। তাই এ কাব্য মহাকাব্য।

'রঘুবংশে' মহাকবি রঘুবংশীয় রাজন্যবর্গের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ কাব্যের আরম্ভ হয়েছে পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা দিয়ে ও ঋতু, যুদ্ধযাত্রা, সন্তানজন্ম প্রভৃতির বর্ণনা এর কলেবরকে স্ফীত করেছে। এর প্রধান রস বীররস। যদিও মহাকাব্যের লক্ষণের সঙ্গে এর সঙ্গতি স্পষ্ট, তা হলেও কেবল এই কারণেই রঘুবংশ মহাকাব্য হয়েছে, এ কথা বললে কাব্যের প্রতি অবিচার করা হবে। 'রঘুবংশে' ভারতীয় আদর্শের জয়-ঘোষণা ক'রে কবি তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনারই পরিচয় দিয়াছেন। রঘুবংশের রাজারা শৈশবে বিদ্যা অভ্যাস করতেন, যৌবনে বিষয় উপভোগ করতেন, বার্ধক্যে মুনির বৃত্তি অবলম্বন ক'রে পরিশেষে যোগের দ্বারা দেহত্যাগ করতেন। এঁরা দান করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন, যশ লাভের জন্য রাজ্যজয় করতেন ও সন্তান লাভের জন্য বিবাহ করতেন। প্রজাবর্গের শিক্ষাদান, ভরণ-পোষণ সব কিছুর ভার এঁরা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে এঁরাই ছিলেন প্রজাদের পিতৃস্থানীয়। কালিদাস আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যতদিন আদর্শের প্রতি রঘুবংশীয় রাজাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন তাঁরা সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে পেরেছেন—ইহকালে ও পরকালে অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন। রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সব কিছু নিঃশেষে দান ক'রে মধ্যজ অকিঞ্চনত্বের পরিচয় দিয়েছেন; তাতে তাঁর লাভই হয়েছে, কারণ যশোবৃদ্ধি ঘটেছে। রাম প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সীতাকে নির্বাসিত করেছেন—বিবেকের বৃশ্চিকদংশন মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন; তাঁরও তাতে লাভ হয়েছে, কারণ আদর্শ রাজা ব'লে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছেন। 'রঘুবংশে'র মহাকবি সকলের শেষে অগ্নিবর্ণ নামে এক রাজার বর্ণনা করেছেন। অগ্নিবর্ণ আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন না, প্রজাবর্গের কল্যাণ ও সুখের দিকে আদৌ দৃষ্টি দিতেন না। তিনি ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগপরায়ণ।

কালিদাস বলেছেন, মধুরভাষিণী নারী ও বীণা—এ দুটির সঙ্গসুখের মোহ রাজা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এরাই ছিল তাঁর নিত্য-সহচরী। তাই আদর্শ-চ্যুত নৃপতি অগ্নিবর্ণকে ঘৃণ্য মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তিনি স্থান পাননি। আদর্শনিষ্ঠের উন্নতি ও আদর্শচ্যুতের ধ্বংস চিরকালই হ'য়ে থাকে। 'রঘুবংশে'র মধ্যে এই চিরকালের সত্য স্থান পেয়েছে বলেই এ কাব্য মহৎ, এর আবেদন এত বেশী।

যদিও দণ্ডী ও তাঁর উত্তরসূরিরা 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'কে সামনে রেখেই তাঁদের মহাকাব্য-লক্ষণ রচনা করেছেন, তা হলেও ঐ দুইটি কাব্যের প্রকৃত মহত্ত্বের কারণ অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁদের লক্ষণ মহাকাব্যের বহিরঙ্গের বর্ণনা করেছে, তা তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। দণ্ডী বা বিশ্বনাথ উভয়েই মহাকাব্যের মহত্ত্ব কিসের ওপর নির্ভর করে, সে সম্বন্ধে নীরব থেকে গেছেন। বুদ্ধচরিত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কবির বৃহৎ পরিকল্পনা ও পরিবেশিত আদর্শের মহত্ত্বের জন্যেই কাব্য মহাকাব্য হয়। বস্তুসত্তার প্রাধান্য মহাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিই সব নয়। আচার্য দণ্ডী প্রমুখ সংস্কৃত আলংকারিকেরা একেই বড় ক'রে দেখেছেন, প্রাণকে উপেক্ষা ক'রে। এর ফলও হয়েছে মারাত্মক। কালিদাসের পরবর্তী যুগের যে সমস্ত কবিযশঃপ্রার্থীরা আলংকারিকদের লক্ষণ বর্ণে বর্ণে অনুসরণ ক'রে মহাকাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের সৃষ্টিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। তাই কালিদাসোত্তর যুগের মহাকাব্য অনেক নিম্নস্তরের। যেমন রঘুবংশ-কুমারসম্ভবকে রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না, তেমনি কিরাতার্জুনীয়-শিশুপালবধকেও প্রথম দুটির সমশ্রেণীর ব'লে গণনা করা চলে না।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ে'র কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব থেকে সংগৃহীত। বার বছরের জন্য পাণ্ডবেরা বনে এসেছেন। দ্রৌপদীর শ্লেষপূর্ণ উক্তি ও ভীমের ক্রোধ যুধিষ্ঠিরকে টলাতে পারেনি,—কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে উৎসাহিত করতে পারেনি। এই সময় ঋষি বেদব্যাস এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর নির্দেশমত পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন থেকে কাম্যকবনে গেছেন। সেখানে এসে অর্জুন মহাদেবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ইন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে এসে অর্জুনকে তপস্যা করতে নিষেধ করেছেন। শেষে তাঁর দৃঢ়তা দেখে আশীর্বাদ ক'রে ফিরে গেছেন। পরিশেষে ব্যাধের বেশ ধারণ ক'রে মহাদেব এসে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্জুনের সঙ্গে বরাহ-হননকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর কৃত্রিম কলহ হয়েছে। এর পর প্রসন্ন মহাদেব আত্মপ্রকাশ ক'রে শৈব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করেছেন। এই ছোট কাহিনীটি যে কি ক'রে ১৮টি সর্গের বর্ণনীয় বিষয় হ'তে পারে, তা ভেবে সত্যি বিস্মিত হ'তে হয়। অবশ্য, আলংকারিকেরা এ বিষয়ে ভারবিকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের উপদেশমত ঋতু, পর্বত, কামক্রীড়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা ক'রে কবি তাঁর কাহিনীর কলেবর-স্ফীতি ঘটিয়েছেন। ভারবির বর্ণনা-শক্তি প্রশংসার দাবি রাখে; তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি উক্তিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিক দিয়ে তাঁর কবি-প্রতিভার প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু যখন শব্দালংকারের বিন্যাসের দ্বারা তিনি নিজের চাতুর্যের পরিচয় দিতে গেছেন, তখন অলংকার

কাব্যলক্ষ্মীর শোভাকর না হ'য়ে পীড়াকরই হ'য়ে উঠেছে।

সব থেকে বেশী নিজের চাতুর্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেছেন কবি ভট্টি। এঁর রচনা ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত সমগ্র রামায়ণের কাহিনী। ভট্টি কাব্য রচনা করতে যাননি,—গিয়েছেন ব্যাকরণের মূল সূত্র ও অলংকারের উদাহরণ দিতে। তাই তাঁর কাব্যের আর একটি নাম উদাহরণ-কাব্য। ব্যাকরণ ও অলংকার কবি-কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করলেও ভট্টি মাঝে মাঝে তাঁর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় ভালভাবেই দিয়েছেন। তবে সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে এ কথা বলতেই হয় যে, এটি সুধীসমাজের সুখপাঠ্য, সাধারণের প্রবেশ এখানে নিষেধ। একথা কবির নিজের। নিজের কাব্যের আবেদন সীমিত, এ কথা ব'লে কবি হয়তো যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন আবেদন বিসর্জন দিয়ে কাব্য মহত্ত্ব হারিয়েছে।

কবি মাঘ সম্পূর্ণরূপে ভারবির অনুগামী। তাঁর 'শিশুপালবধে'র বিষয়বস্তু ও মহাভারত থেকে সংগৃহীত। এ কাহিনীটিও আকারে ক্ষুদ্র। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্ম কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেবার কথা তুলেছেন। এতে চেদিরাজ শিশুপাল ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজসভা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। তিনি ভীষ্মকে অপমান করেছেন এবং কৃষ্ণের চরিত্রের ওপর দোষারোপ করেছেন। শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করার পর এটি কৃষ্ণের কাছে অসহ্য হয়েছে। ফলে তাঁর চক্রাঘাতে চেদিরাজের মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখানেই কাহিনীর শেষ। অনেক অবান্তর বিষয়ের বর্ণনা সন্নিবেশিত ক'রে একেই স্ফীত করা হয়েছে। মাঘ নীতিশাস্ত্র, অলংকার-শাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে ভারবির মতো দুরূহ শব্দালংকার প্রয়োগ ক'রে নিজের নৈপুণ্যও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সব করতে গিয়ে রস-সমাহিতচিত্ত থাকতে পারেননি; দৃষ্টি বিখণ্ডিত হয়েছে। ফলে কাব্যেরও ত্রুটি ঘটেছে।

নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান নিয়ে শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিত' রচনা করেছেন। কাব্যের পদ-লালিত্য প্রশংসা অর্জন করেছে, এখানেও শাস্ত্রীয় জটিল বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত করায় কাব্য সর্বজনীন আবেদন হারিয়েছে। ভট্টির মতোই শ্রীহর্ষও বলেছেন যে, দুর্জনের প্রবেশ নিষেধ করার জন্য ইচ্ছে করেই তিনি গ্রন্থ-গ্রন্থি বিন্যস্ত করেছেন। যে কবির দৃষ্টি গ্রন্থ-গ্রন্থি-বিন্যাসে নিবদ্ধ, সে কবির পক্ষে শাশ্বত মহৎ আদর্শ পরিবেশন ক'রে রচনাকে মহত্ত্ব দান করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে বৈয়াকরণেরা 'আদি পণ্ডিত' ব'লে সম্মানিত হতেন। বৈয়াকরণ-গোষ্ঠীতে প্রাদুর্ভূত আলংকারিকদের সম্মানও কম ছিল না। এঁদের নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হ'ত। মহাকাব্যের লক্ষণে কেবল বহিরঙ্গের আলোচনা ক'রে কবিযশঃপ্রার্থীদের তাঁরা বিভ্রান্ত করেছেন। তাঁদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যে কাব্য রচিত হয়েছে, তা আর যাই হোক, মহাকাব্য হয়নি। বুদ্ধচরিত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব—এ সবই আলংকারিকদের লক্ষণ-নির্দেশের আগের রচনা, তাই এগুলি সার্থক মহাকাব্য।

ডিরোজিও-প্রসঙ্গে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওর বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপনে। এ দিকে তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও সুনিপুণ অধ্যাপনা দুইই সহায়ক হয়েছিল। শুধু ক্লাসে পড়িয়েই তিনি তৃপ্ত হতেন না, ক্লাসের বাইরে—এমন কি নিজের বাড়ীতে ছাত্রদের নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা ক'রে তাদের চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতেন। সাধারণতঃ কোন একটি প্রসঙ্গ তুলে তিনি ছাত্রদের সেই বিষয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বলতেন, এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে ঐ প্রসঙ্গের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মনীষীদের যুক্তিরাশি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করতেন। এমনি ক'রে স্বাধীন চিন্তাশক্তির চালনার ফলে ছাত্রদের মৌলিক মানসিকতা গড়ে উঠত। উত্তরকালে তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য ধর্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ী এই পন্থা অনুসরণ করেই শিক্ষক-জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্র এবং ছাত্রকল্প ব্যক্তিদের মধ্যে উনিশ শতকে বাঙালী-মানসের নব জাগরণের ইতিহাসে এই কয়জন বিশেষভাবে স্মরণীয়: রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

ছাত্রদের সঙ্গে নিরলস জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনেই একটি আলোচনা-সভার প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবেই 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' সভাটির উদ্ভব হয় (১৮২৮ খৃঃ)। এই আলোচনা-সভায় যোগ দিতে আসতেন ডেভিড হেয়ার, স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, ডক্টর মিল প্রভৃতি সেকালের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা। এই সভার আলোচনার উন্নত মান দেখে তাঁরা অবাক্ হ'য়ে যেতেন। আলোচনার বিষয় থাকত: স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বনাম অদৃষ্টবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি, পুতুল পূজা[১] ও পুরোহিত-তন্ত্রের অসারতা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি। তদানীন্তন হিন্দুসমাজে সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, বিধবাদের দুর্দশা, জাতিভেদ, প্রাচীন দেশাচারের বাড়াবাড়ি—এ-সব কিছুর বিরুদ্ধেই ডিরোজিওর ছাত্রদের শাণিত যুক্তি ও স্বাধীন মতামত এই সভায় প্রকাশিত হ'ত।[২] ক্রমে ছাত্রদের ঘরে ঘরে এবং ব্যাপকভাবে কলকাতার প্রাচীনতম হিন্দুসমাজে মতামতের সংঘর্ষ দেখা দিল। এ সংঘর্ষের সামাজিক দিকটিই সেকালে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল, একালে সে ইতিহাসের মানসিক প্রভাবই আমাদের লক্ষণীয়।

সমকালীন সমাজে ইংরেজ বণিকবৃত্তির দূষিত প্রভাবে ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমাজে যে সমস্ত ব্যভিচার ও মিথ্যাচার বহুল-প্রচলিত ছিল, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে সেগুলির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। পর-

১ প্রতিমাপূজা ও পুতুলপূজার পার্থক্য তাঁরা ধরতে পারেননি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে সে যুগের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই প্রতিমাপূজার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি।

২ দ্রষ্টব্য—Life of Derozio : Edward Thomas.

বর্তীকালে রাধানাথ শিকদার গুরুর স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে বলেছেন :

ডিরোজিও ছিলেন দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক। বিদ্যাবত্তার অভিমান করলেও তিনি সত্যি সুবিদ্বান্ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাদের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁর শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে এত গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে, আজও সে আকাঙ্ক্ষা আমার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে চলেছে। তাঁরই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। তাঁর কাছ থেকে আমি এমন কতগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করেছি, যেগুলি চিরকাল আমার কর্মধারাকে প্রভাবিত করবে।... একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা—যে দুটি গুণ এখনকার শিক্ষিতসমাজে বিশেষভাবে দেখা যায়—যা ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ—এ সব কিছুর মূলে ছিলেন ডিরোজিও।[৩]

প্যারীচাঁদ মিত্র ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছেন :

তিনি ছাত্রদের স্বাধীনচিন্তার পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ক'রে দিতেন। যাতে তারা কোন রকমেই বেকন-কথিত কোন মায়াবিগ্রহ (idols) দ্বারাই প্রভাবিত না হয়, সত্যের জন্য জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ করে এবং সর্বপ্রকার পাপ বর্জন ক'রে চলে—সেই সম্বন্ধে তাদের মনে বিশেষভাবে ছাপ দিয়ে দিতেন। প্রায়ই তিনি প্রাচীন ইতিহাস থেকে ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, মানবকল্যাণ এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ পড়ে শোনাতেন। যে ভাবে তিনি এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলতেন তার ফলে ছাত্রদের মনে সেগুলি গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রত। কোন ছাত্র হয়তো ন্যায়বিচারের মহিমায় মুগ্ধ হ'ত, কেউ বা সত্যনিষ্ঠার পরম গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হ'ত, কেউ দেশপ্রেমে, কেউ বা মানবকল্যাণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত।[৪]

ছাত্রসমাজে ডিরোজিওর প্রভাব সম্বন্ধে সেই সময়কার হিন্দু কলেজের কেরানী শ্রীহরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যও মূল্যবান :

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ডিরোজিও-স্থাপিত আলোচনা-সভায় যোগদানের সুযোগ ছিল। এই আলোচনা-সভায় পড়া হ'ত কবিতা, সাহিত্য, আর দর্শনের বই। প্রায় রোজই বিদ্যালয় আরম্ভ হবার আগে বা ছুটির পরে আলোচনা-সভা বসতো। কর্তৃপক্ষের অগোচরে অথবা বিনা অনুমতিতেই এই অধিবেশনগুলি হ'ত। কিন্তু ছাত্রদের সাহিত্যে ও দর্শনে কৃতবিদ্য ক'রে তোলার কাজে ডিরোজিওর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। এ উৎসাহের মূলে যে ভালবাসা ও মানব-প্রীতির প্রেরণা ছিল, তেমন প্রেরণা আজ অবধি কোন শিক্ষকের মধ্যে দেখা যায়নি। বাস্তবিক পক্ষে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে তাঁর ছাত্রেরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ ছাড়া চলত না। অপরপক্ষে ডিরোজিও তাদের সাহিত্যরুচি জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং তাদের নৈতিক ধারণা ও অনুভূতিকে সমসাময়িক অজ্ঞতার অনেক উর্ধ্বে তুলেছিলেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির এমনই জোর ছিল যে, তাঁর ছাত্রেরা শুধুমাত্র সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার জন্যই বাইরের জগতে সম্মান পেতেন না, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্মান পেতেন খাঁটি সত্যবাদী মানুষ ব'লে। সত্যি সত্যি, 'কলেজের ছাত্র' কথাটি তখন 'সত্যবাদী' কথাটির সমার্থ-বাচক ছিল ; এবং তখনকার লোকেরা একথা বিশ্বাস করতেন যে 'কলেজের ছাত্র' কখনও মিথ্যাবাদী হ'তে পারেন না।[৫]

ডিরোজিওর জীবনে ও কাব্যে যে অন্বেষণ-বৃত্তি দেখতে পাই, তার মূলে ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই। এই অন্বেষণেরই সাহিত্যফল রোমান্টিক মনোধর্ম। ডিরোজিওর কবিতা তাই মূলতঃ রোমান্টিক। অপরপক্ষে যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ফরাসী বিপ্লবে ইন্ধন যুগিয়েছিল, সেই যুক্তিবাদের প্রভাব দেখা দিল ডিরোজিওর শিক্ষক-জীবনে। নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ডিরোজিও তাঁর বিখ্যাত পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন :

আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার নিয়ে তাদের মন থেকে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করতে সচেষ্ট ছিলাম। এক

৩ আর্যদর্শন, ১২৯১—উদ্ধৃতি অবলম্বনে।

৪ Life of David Hare.—প্যারীচাঁদ মিত্র
(অনুবাদ—বর্তমান লেখক কৃত)

৫ Life of Derozio—Edward Thomas.
(অনুবাদ—বর্তমান লেখক কৃত)

একটি বিষয় নিয়ে তার সপক্ষে বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তা বুঝিয়ে দিতাম। এ ব্যাপারে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ; তিনি বলতেন,—যদি কেউ কোন বিষয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করে, তাহলে শেষ অবধি তার সন্দেহ থেকেই যায়, সন্দেহ দূর করার উপায় থাকে না। মনে একটি সন্দেহের পর আর একটি সন্দেহ জাগবে। ফলে সব বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মাবে। কাজে কাজেই আমি কলেজের ছাত্রদের যেমন হিউমের ক্লিয়'ন্থেস (Cleanthes) ও ফিলোর (Philo) বিখ্যাত কথোপকথনের সারাংশ পড়িয়ে আস্তিক্যের (Theism) বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম মতবাদগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি, তেমনি হিউমের বিরুদ্ধপন্থী ডক্টর রীড ও ডুগালড্ ষ্টুয়ার্টের* আস্তিক্যের সপক্ষে সূক্ষ্মতর জবাবগুলির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছি—সে সব যুক্তি আজ পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছে।......আমি যে পন্থা অনুসরণ করেছি, তাতে যদি ছেলেদের ধর্মবিশ্বাস টলে থাকে, তার দোষ আমার নয়। তাদের মনে কোন বিশ্বাস জন্মানো আমার সাধ্য নয়। যদি কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য আমাকে দায়ী করা হয়, তবে অন্যদের আস্তিকতার জন্য আমার কৃতিত্বও স্বীকার্য। বিশ্বাস করুন, আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতামতের পরিবর্তন সম্বন্ধে এত সচেতন যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও আমি কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এমনভাবে মিশিয়ে রয়েছে যে, কোন রকম গোঁড়ামির সাহসই আমার নেই। কাজেই আমি কখনই বলতে পারি না—'এটা ঠিক, অথবা ওটা ঠিক নয়।' বিজ্ঞানের নানান্ গবেষণা এবং মনীষীদের নানান্ চিন্তার ফলে একথা বুঝা গেছে যে বিনয়ই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, আর এই জ্ঞানই আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ৬

ডিরোজিওর এই বিনম্র চিত্তের জ্ঞানান্বেষী সংশয় অনুধাবনযোগ্য। কারণ চিরাচরিত পন্থাকেই একমাত্র সত্য ব'লে স্বীকার না করার দুঃসাহস ডিরোজিওর শিষ্যেরা এই চিন্তাধারা থেকেই গ্রহণ করেন।

১৮৩০ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুআরি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মিলিত উৎসাহে Parthenon নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য—'হিন্দুর ঘরে জন্মালেও যারা শিক্ষা-দীক্ষায় ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন, তারা নিজেদের মনোভাবের আদানপ্রদানের জন্য এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ প্রয়োজন মনে করে, যেখানে তারা নিজেদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারবে।'৭ প্রথম সংখ্যায় ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের স্বপক্ষে প্রবন্ধাদি ছিল। সেই সঙ্গে ছিল হিন্দুসমাজের প্রচলিত কুসংস্কারগুলির নিন্দা এবং স্বল্পব্যয়ে বিচার-ব্যবস্থার জন্য আবেদন।৮ এই সব অত্যুগ্র মতামতের দরুণ কলেজ-পরিদর্শক ডঃ এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব দু'সংখ্যা প্রকাশের পরেই পত্রিকাটি বন্ধ ক'রে দেন।

১৮৩১ খৃঃ এই ছাত্রদল 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই (১৮৩১-১৮৪৪) পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল Government and Jurispudence (শাসন-ব্যবস্থা ও আইনবিধি) সম্বন্ধে জনসাধারণের বোধগম্য আলোচনা প্রকাশ করা। এ দুটি সংবাদপত্রের পিছনেই ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল।৯

সত্যিকার শিক্ষক যাঁরা, তাঁরা চিরদিন ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ কামনা ক'রে থাকেন। এই কবি-অধ্যাপকের মনে ছাত্রপ্রীতি কতখানি প্রেরণার আগুন জেলে দিয়েছিল, তার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন একটি চতুর্দশপদী কবিতায়:

* Dr. Reid, Dugald Steward.

৬ Life of Derozio—Edward Thomas. (অনুবাদ—বর্তমান লেখক কৃত)

৭ ৮,৯ : দ্রষ্টব্য History of Political Thought. —Dr. Biman Behari Mazumdar.

(To the students of the Hindu College)
Expanding like petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
that stretch
(Like young birds in soft summer hour)
Their wings to try their strength.
O how the winds
Of circumstance, and freshening April
showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence,
And how you worship Truth's Omnipotence!
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Wearing the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain. [১০]

ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ক'রে তাদের চিৎ-পদ্মের বিকাশ ঘটিয়েই ডিরোজিও ক্ষান্ত ছিলেন না। ব্যাবহারিক জীবনে যাতে তারা সৎ, সত্যবাদী ও ঋজুচরিত্র হ'য়ে ওঠে সে দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই সঙ্গে সাহেবী রীতির অনুকরণে মদ খাওয়ার ফ্যাশান-প্রবর্তনেও ডিরোজিওর প্রভাব ছিল। মদ খাওয়া বা নিষিদ্ধ মাংসাদি খাওয়াকে ডিরোজিও-শিষ্যেরা কুসংস্কার-বিরোধী কাজ ব'লে মনে করতেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন:

তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্রাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।[১১]

এই মদ খাওয়ার অভ্যাস সেকালের শিক্ষিত সমাজে কি বিপর্যয় এনেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় এবং দীনবন্ধুর নাটক 'সধবার একাদশী'তে। রাজনারায়ণ নিজেও এই নেশার আকর্ষণে মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছিলেন; রোগযন্ত্রণায় তাঁর শুভবুদ্ধি ফিরে আসে। অবশ্য রাজনারায়ণ ডিরোজিওর গুণের দিকটাই বড় ক'রে দেখেছেন:

ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা সর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্বক বাঙ্গালীদিগের সংসর্গে এমন বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি যে সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।[১২]

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পক্ষে যেটা একান্ত করণীয় ছিল, অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ অবধি করা হয়নি, ডিরোজিও একাকী উনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে সেই কাজটি করতে পেরেছিলেন।

ডিরোজিওর সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী পরবর্তী-কালে দেশের আর্থিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষাগত আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করেছেন। বাংলা সাহিত্যও তাঁদের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়েছে। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যুগ্মচেষ্টায় যে 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশিত হয়, তাতে চলতি ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ডিরোজিও-শিষ্যের উপযুক্ত অগ্রগামিতারই চিহ্ন। মধুসূদন অবশ্য ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র নন। কিন্তু ডিরোজিও যে শৃঙ্খল-মোচনের বাণী প্রচার ক'রে যান, তার ফলেই মধুসূদনের মানসলোকে প্রাচীন সাহিত্যের নবমূল্যায়ন সম্ভব হয়। এক হিসাবে ডিরোজিওর যুক্তিবাদী বলিষ্ঠতার ফলেই রাবণ-চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহজ সুস্থ প্রকাশ সম্ভব হয়। ক্লাসিক সাহিত্যের প্রেরণাপুষ্ট মধুসূদন যে

১০ দ্রষ্টব্য: Poems of Henry Louis Vivian Derozio—Bradley-Birt.

১১ দ্রষ্টব্য: সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু।

১২ দ্রষ্টব্য: সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু।

রোমান্টিক রস-পিপাসাকেই জাগিয়ে তুলেছেন—তার কারণ ডিরোজিও-প্রভাবিত নব্যবঙ্গের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা। ডিরোজিওর ব্রত ছিল, মানুষকে তার চিন্তা ও কর্মের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। ডিরোজিওর ভাবশিষ্যদের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তা উনিশ শতকের প্রথম দিকে এক নূতন ভাবাদর্শের সন্ধান পেল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অনেক পরিমাণে এই ভাবাদর্শেরই সৃষ্টি।[১৩]

কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে যে ভাব-বিদ্রোহ দেখা দিল, তা কলকাতার হিন্দুসমাজের, বিশেষ ক'রে হিন্দু কলেজের হিন্দু কর্তৃপক্ষকে চঞ্চল ক'রে তুলল। পাশ্চাত্যশিক্ষার নবমদিরা-পানে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রেরা কি ধরনের বাড়াবাড়ি ক'রত, তার কৌতুককর বিবরণ আছে 'সেকাল ও একাল' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বই দুটিতে।

ডিরোজিওর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়—(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং ছাত্রদের মনে সেই অবিশ্বাস জাগানো, (২) পিতামাতাকে অবহেলা করতে শেখানো, (৩) ভাইবোনের বিবাহ অনুমোদন করা। ডিরোজিওর প্রদত্ত প্রথম অভিযোগটির উত্তর সংক্ষিপ্তাকারে আগেই দিয়েছি।* দ্বিতীয় অপবাদ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'এমন শিক্ষা আমি কখনো দিই না। আমি নিজে পিতামাতার অতি বাধ্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আলাদা বাড়ীতে থাকা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চান। আমি তাতে রাজী হইনি।' তৃতীয় অপবাদটি 'সম্পূর্ণ আজগুবি।'

অনেক বৎসর পরে আজকের দিনে এই অভিযোগগুলি লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতিকে ভুল বুঝেই প্রথম দুটি অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু তৃতীয় অভিযোগটি সম্বন্ধে জনৈক গুজব-ব্যবসায়ীর দায়িত্ব ছিল। তাঁর নাম বৃন্দাবন ঘোষাল—'যার কর্ম কেবল বাবুদের কাছে গল্প ক'রে বেড়ানো।'[১৪] বৃন্দাবনঘোষাল-জাতীয় জীবেরা এখনও এইভাবে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায় এবং তথাকথিত 'বড়মানুষেরা' সে সব গুজবকেই ধ্রুব সত্য জ্ঞান করেন, হিন্দু কলেজের জ্ঞানী গুণী কর্তৃপক্ষও অনেক পরিমাণেই করেছিলেন। ডিরোজিওকে তাঁরা এই ব'লে পদচ্যুত করলেন যে 'দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকলে হিন্দু কলেজের অনিষ্ট হবে।' এ আশঙ্কা পুরোপুরি মিথ্যা ছিল না। আতঙ্কগ্রস্ত অভিভাবকেরা সত্যসত্যই পুত্রদের সরিয়ে নিতে আরম্ভ করেছিলেন। কলেজ-পরিদর্শক ডঃ উইলসন ডিরোজিওকে এই পদচ্যুতির সংবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন এবং পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তাঁর কোন বক্তব্য থাকলে জানাতে বললেন। ডিরোজিওকে পূর্বাহ্নে ডেকে তাঁর বক্তব্য নিবেদনের সুযোগও দেওয়া হ'ল না। মর্মাহত ডিরোজিও সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র পাঠালেন। সে পদত্যাগপত্র তাঁর স্বাধীনচিত্ত পৌরুষের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

কলেজ-জীবনই ডিরোজিওর আসল জীবন। ১৮৩১ খৃঃ এপ্রিলে কলেজ ছাড়বার পর কয়েক মাস তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের উন্নতির জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর ছাত্রদের জ্ঞানচর্চায় সহায়তা করার ব্রত। ১৮৩১ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর কলেরায় তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। যে ছাত্রদল তাঁকে ঘিরে

* ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৬ নং উদ্ধৃতি।

১৩ শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর কাছে এই চিন্তাধারার জন্য আমি ঋণী।

১৪ দ্রষ্টব্য : Life of Derozio : Edward Thomas.

দলবদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল, তাদের সকলের সম্মিলিত সেবা তাঁর মৃত্যুমুহূর্তকে গুরুশিষ্যের চিরন্তন প্রীতিসম্বন্ধে করুণ-রঙীন ক'রে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সমগ্র উনিশ শতক ধরে ডিরোজিওর চিন্তাদর্শ নানা সমালোচনার নির্মম আক্রমণ সহ্য করেও নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীর মননশীলতাকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। কারণ, সে চিন্তাধারার মূল কথা ছিল মানুষের নিজের প্রতি বিশ্বাস; সেই সঙ্গে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে স্থির অনড় সিদ্ধান্তের বদলে সত্যের নব নব রূপ আবিষ্কার ক'রে দেশ ও কালের পরিবর্তনকে নতুন পৃথিবীর সঙ্গে সমন্বিত ক'রে দেওয়া।

সেকালে ডিরোজিওর এই শিষ্যগোষ্ঠী পরিচিত হয়েছিলেন নব্যবঙ্গ বা Young Bengal নামে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁরা সমসাময়িক দেশবাসীর চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন। তাঁদের সমস্ত শিক্ষা ও সাধনা নিয়োজিত হয়েছিল স্বদেশের উন্নতিকল্পে; কারণ, ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের অন্তরে 'Mother India' বা জননী ভারতবর্ষের অনুধ্যান জাগরিত করেছিলেন। ভারতবর্ষ যুগে যুগে এমনি ক'রে নব নব চিন্তার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং পরিশেষে সেই চিন্তাধারাকে নিজস্ব ক'রে নিয়ে আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ডিরোজিওর চিন্তাধারায় ভারত-সংস্কৃতির সনাতন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী শিষ্যবৃন্দ সত্যের অন্বেষণে শেষ অবধি এই উত্তরাধিকারও লাভ করেছিলেন। তাই রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ধিত ব্রাহ্মসমাজের ঔপনিষদিক চিন্তাধারাকে ডিরোজিও-শিষ্যদের অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন। রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব—এ তিনজন তো ব্রাহ্ম-ধর্মেই দীক্ষিত হন। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের খৃষ্টানী কোন সামাজিক বা আর্থিক পুরস্কার-প্রণোদিত নয়। বিশেষভাবে মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এবং ডিরোজিওর প্রভাবেই তিনি সৎপথে পরি-চালিত হন। ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ততায় এঁরা নিজস্ব অভিরুচি-অনুযায়ী খৃষ্টান হয়েছিলেন। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের উৎপীড়নও অনেকটা দায়ী। একথাও স্মরণীয়, ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে মহেশচন্দ্র ও কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।[১৫] পরবর্তী জীবনে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুর 'ষড়্‌দর্শন-সংবাদ' লিখেছিলেন।

বর্তমানে যখন শাসন-ব্যবস্থার সর্বস্তরেই চুরি ঘুস এবং দায়িত্বহীনতার নিদর্শন দেখতে পাই, তখন একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে ডিরোজিও-ছাত্রেরা সেকালের সমাজ-জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে সততার আদর্শ স্থাপন করেন। সত্য কথা যদি কলির তপস্যা হয়, তবে ডিরোজিও-শিষ্যেরা আজীবন সে তপস্যা ক'রে গিয়েছেন। সেই সত্যেরই প্রেরণায় দেখা দিয়েছিল রামতনু লাহিড়ীর মতো ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তি-তন্ময় ব্যক্তিত্ব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাম-গোপাল ঘোষের মতো নির্ভীক স্পষ্ট বক্তার রাজ-নৈতিক প্রজ্ঞা। স্বয়ং ডিরোজিও সতীদাহ নিবারণের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা নীলবিদ্রোহ, বিধবাবিবাহ, তথাকথিত কালা আইন প্রভৃতি আন্দোলনে জনসাধারণের

১৫ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' : শিবনাথ শাস্ত্রী (নিউ এজ সংস্করণ) পৃঃ ১০৭।

মুখপাত্ররূপে স্বদেশের প্রতি তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন ক'রে গেছেন।[১৬]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও নবযুগের বিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে যে মননভূমি গড়ে উঠল—তার সঙ্গে ডিরোজিও-গোষ্ঠীর চিন্তাধারার সম্পর্ক কতখানি?—এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় সত্যানুসন্ধানের যে আদর্শ ডিরোজিও-গোষ্ঠীর অন্তরে ছিল, সেই আদর্শই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'য়ে ক্রমে বাঙালী মনীষাকে স্বদেশ ও বিশ্বের সংযোগসাধনে ব্যাপৃত করেছে। তাই ডিরোজিও-গোষ্ঠীর বিদ্রোহেই নব্যবঙ্গের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ইঙ্গিত নিহিত ছিল। অবশ্য কেবলমাত্র এই একটি গোষ্ঠীর দ্বারাই বাঙালীর মনোজগতের বিপ্লব সাধিত হয়নি এবং এই গোষ্ঠীর চিন্তাধারায় অসঙ্গতিও প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু রামমোহন প্রমুখ মহারথীরা যখন সমগ্র দেশের বিশালতর পটভূমিতে সঞ্চরণশীল, তখন তরুণতরদের জীবনে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফলগুলি জাতীয় চিত্তে সঞ্চারিত করার প্রধান কৃতিত্ব ডিরোজিওর। তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যেরাই তখন বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ। কালের জোয়ারে তাঁদের প্রাথমিক মত্ততার কাহিনীগুলি অনায়াসে ভেসে চলে গেছে, কিন্তু মুক্তমানসের যে পলিমাটি তাঁরা নতুন যুগের শিক্ষিতমানসে ছড়িয়ে গেলেন, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তারই অপর্যাপ্ত ফসল।

কিন্তু এই সাধনার মূল্য তাঁদের দিতে হয়েছে লোকনিন্দা, সামাজিক অত্যাচার, ধনী ও পরাক্রান্তদের বিরুদ্ধতা—সব কিছু সহ্য ক'রে। তার বদলে তাঁরা সমাজকে দিয়েছেন যুক্তিবাদের প্রতি নিষ্ঠা, সত্য ও সততার প্রতি অনুরাগ, অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্জয় সাহস। এ সব কিছুর মূলে যে তরুণ শিক্ষকের প্রেরণা ছিল, পার্ক ষ্ট্রীটের কবরখানায় তাঁর শেষ শয্যা রয়েছে। বহুদিন অনাদৃত থাকার পর অবশেষে তাঁর গুণমুগ্ধ কোন স্বদেশবাসী সেই শয্যার উপর একখানি প্রস্তরলিপি স্থাপন করেন। বোধ করি, নিজের এই নিরলঙ্কার শেষ শয্যাটির কথা ভেবেই একদা ডিরোজিও লিখেছিলেন :

There, all in silence, let him sleep his sleep,
No wandering mortal thither once shall wend,
There, nothing o'er him
but the heavens shall weep,
There, never pilgrim at his shrine shall bend,
But holy stars alone their nightly vigils keep.[১৭]

১৬ "১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতেরও দণ্ডবিধির অধীন করাই আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির 'কালা আইন' (Black Acts) নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। তখন দেশের এমনি অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন"—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (পৃঃ ১১৯)।

১৭ Poems of H. L. V. Derozio—Bradley-Birt.

শঙ্করের নির্গুণব্রহ্মবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শঙ্কর দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারও ভাষ্য লিখিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যে তাঁহার দার্শনিক মত বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক মত কেবলাদ্বৈতবাদ বা 'নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ' নামে আখ্যাত। 'নির্বিশেষ' শব্দের অর্থ বিশেষহীন। শঙ্কর যে ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে জগতের বিশিষ্ট বস্তুসকলের স্থান নাই, বিশিষ্ট চৈতন্যবিশিষ্ট (individual) জীবের স্থানও তাহাতে নাই। শঙ্করের ব্রহ্ম অনন্ত, তিনি সার্বিক (universal), কখনও তিনি সান্ত হন না, বিশেষত্ব প্রাপ্ত হন না। তিনিই একমাত্র সত্য; তিনি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর প্রকৃত (পারমার্থিক) অস্তিত্ব নাই। 'নানা'র অস্তিত্ব নাই, কেবল 'এক'ই আছে। নানাত্বের যে বোধ হয়, তাহা অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত, তাহা মায়া (illusion), যাদুকরের যাদুর মতো তাহা ভ্রান্তিমাত্র। ইহাই নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ, বিশেষহীন, দ্বৈতহীন, এক ও অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। শঙ্করের মতে ইহাই উপনিষৎসম্মত ব্রহ্মবাদ। উপনিষদে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ইহাই তাঁহার মত।

ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্য এ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। বৌধায়ন-রচিত এক ভাষ্য ছিল। তাহা অতি প্রাচীন। কথিত আছে, রামানুজের ভাষ্য বৌধায়নের ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মসূত্রের যতগুলি ভাষ্য আছে—শঙ্কর-ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্যেই নির্বিশেষাদ্বৈতের সমর্থন নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং নিম্বার্ক ব্রহ্মের সবিশেষ রূপই স্বীকার করেন। মধ্বাচার্য তো পুরাপুরি দ্বৈতবাদী; ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন প্রকার অভিন্নতা তিনি স্বীকার করেন না।

শঙ্কর অসাধারণ মনীষার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসর পরমায়ুর মধ্যে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইয়া আধুনিক বিদেশী পণ্ডিতেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো, আরিস্টট্‌ল, স্পিনোজা, ক্যাণ্ট ও হেগেল ভিন্ন অন্য কাহারও মতের সহিত তাঁহার মতের তুলনা হয় না। তিনি যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা ভারতীয় দার্শনিকগণের জ্ঞানের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে। তাঁহার স্বকীয় দর্শনের আলোকেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ স্থাপিত হয় নাই, ইহাও অনেকের মত। এই মতের প্রমাণেরও অভাব নাই।

নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনে শঙ্করের প্রধান অবলম্বন 'অবিদ্যা'। অবিদ্যা ও মায়া শব্দদ্বয় শঙ্কর অধিকাংশ স্থলে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দুই এক স্থলে অর্থের ভিন্নতাও দেখা যায়। অবিদ্যা ও মায়া শব্দদ্বয় উপনিষদে

ও বেদসংহিতাতেও পাওয়া যায়—কিন্তু শঙ্কর একটু নূতন অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার করিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে মায়াকে 'প্রকৃতি,' এবং 'মহেশ্বর' (ব্রহ্ম)-কে মায়ী (মায়াধীশ) বলা হইয়াছে। সেখানে মায়া অর্থে ঈশ্বরের শক্তি। উক্ত উপনিষদের প্রথমেই আছে :

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। ১।৩

—তাঁহারা (ঋষিগণ) ধ্যানযোগে স্বগুণদ্বারা আচ্ছাদিত ঈশ্বরের আত্ম-শক্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে 'স্বগুণ' শব্দের অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপ ঈশ্বরের গুণ, অথবা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বিষয়সমূহ। এই ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) অথবা জাগতিক বস্তুসকলের অন্তরালে যে দেবাত্মশক্তি ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই 'মায়া'। শঙ্কর কিন্তু মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন বস্তুর ব্যাবহারিক (phenomenal) অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নাই। কেননা তাঁহার মতে পরমার্থতঃ ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মে এই জগৎ অধ্যস্ত—অর্থাৎ জগতের অন্তরালে যে অক্ষর নিষ্কল পরিবর্তনহীন ব্রহ্ম নিত্য বর্তমান, তাঁহারই উপরিভাগে এই চঞ্চল নিত্য পরিবর্তনশীল বিনশ্বর জগৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু তাহার কোন অবাধিত অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যাকে শঙ্কর 'অধ্যাস'ও বলিয়াছেন। 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' (পূর্বদৃষ্ট বস্তুর অন্য স্থানে যে অবভাস স্মৃতি হইতে হয়) বলিয়া অধ্যাসের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি পরে বলিয়াছেন, 'এই লক্ষণযুক্ত অধ্যাসকে পণ্ডিতেরা অবিদ্যাও বলেন।' আরও বলিয়াছেন, 'যেখানে অধ্যাস হয়, সেখানে যাহাতে অধ্যাস হয়, তাহার (অধিষ্ঠানের) সহিত অধ্যস্ত বিষয়ের ভেদ-অনুপলব্ধিবশতঃ ভ্রমই অধ্যাস। কাহারও কাহারও মতে অধিষ্ঠানভূত বস্তুর বিপরীত ধর্ম-কল্পনাই অধ্যাস। বস্তুতঃ এক বস্তুর অন্য ধর্মযুক্ত বস্তুরূপে অবভাসই অধ্যাস। জগৎরূপে ব্রহ্মের অবভাস সেই জন্য অধ্যাস।

কিন্তু কেন এবং কাহার এই মিথ্যা জ্ঞান হয়? যিনি চিৎ ও আনন্দস্বরূপ নিশ্চল ও নির্বিকল্প, দেশ ও কালের অতীত, এবং যিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেই ব্রহ্ম কেন ও কাহার নিকট দেশ ও কালে অবস্থিত চঞ্চল অচেতন জগৎরূপে প্রতীয়মান হন? যিনি অখণ্ড ও নিষ্কল, কেন তিনি নানা ভাগে বিভক্ত নামরূপে খণ্ডিতরূপে দৃষ্ট হন? ইহার একটি উত্তর হইতে পারে এই যে, আমাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ এমনভাবে গঠিত যে তাহারা এক অনন্ত অখণ্ড বস্তুকে ধরিতে পারে না, তাই অসীম অখণ্ড জগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে নামরূপে খণ্ডিত আকারে আমাদের গোচর হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যাহা যাহা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে দেশ ও কালের ছাঁচে ঢালিয়া, তাহাদের দেশ ও কালের ছাঁচযুক্ত রূপই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি সেই-রূপেই তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ন্যায়ের (logic) নিয়মানুসারে তাহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করে। বুদ্ধির এই নৈয়ায়িক কাঠামো (logical frame), এবং ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ দর্শনের অপটুতাই আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের মূলে বর্তমান। চক্ষুর দোষবশতঃ যেমন রজ্জু সর্পরূপে এবং এক চন্দ্র দ্বিচন্দ্ররূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির স্বাভাবিক অপটুতাবশতঃ এক অখণ্ড বস্তুকে আমরা খণ্ডিত আকারে দেখিতে পাই। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ বলিয়াছেন যে, প্রাণের অভিব্যক্তি-ক্রমে বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়াছিল—জড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত,

সত্যের আবিষ্কার বুদ্ধির (Intellect) প্রয়োজনের বাহিরে। তাই বুদ্ধি এক অবিশ্রাম-গতিমান বস্তুকে গতিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্বীয় কার্য সম্পাদন করে।

আমরা জগতের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি, তাহা যে তাহার সত্য রূপ নহে—আধুনিক বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। জড়ের উপাদানরূপে বিজ্ঞান যে প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারা স্পন্দনে প্রকাশিত শক্তির বিভিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু জড় বস্তু মানুষের গোচর হয় স্থূল নিরেট ও দেশে বিস্তৃত রূপে। যে বস্তুকে আমরা রন্ধ্রহীন নিরেট রূপে দেখি তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্থানই শূন্য। সৌরজগতের অতি অল্প মাত্র স্থান সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহগণ এবং গ্রহদিগের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান উপগ্রহগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, অবশিষ্ট স্থান শূন্য। তেমনি প্রত্যেক জড় বস্তু যে যে পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, তাহাদের মধ্যস্থ অতি অল্পমাত্র স্থান প্রোটন ও ইলেকট্রন কর্তৃক অধ্যুষিত, অবশিষ্ট সমস্ত স্থান শূন্য। আর প্রোটন বা ইলেকট্রনও স্থূল জড়কণা নহে, তাহারা শক্তির স্পন্দন মাত্র; সুতরাং জড়জগতের যে রূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, তাহা তাহার সত্য রূপ নহে, তাহা মিথ্যা। শক্তিই সত্য, শক্তিই প্রকৃতি, তাহাই ব্রহ্মের মায়া। সুতরাং জগৎ অর্থাৎ জগতের অনুভূত রূপ মিথ্যা। শঙ্করের সহিত এখানে বিজ্ঞানের বিরোধ নাই।

শঙ্কর জড়জগৎকে ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়াছেন, তাহাকে আকাশকুসুমের মতো কল্পনা বলেন নাই। ব্রহ্মে যে নাম-রূপ অধ্যস্ত হয়, তাহাই জড়জগৎ, তাহা মিথ্যা। তাহাও আবার একান্ত মিথ্যা নহে। তাহার যে ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে, তাহা শঙ্কর বলিয়াছেন। নামরূপ-সংবলিত জড়জগৎ 'সৎ' নহে, ত্রিকালে সত্য নহে, তাহা নশ্বর—তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ইহাই শঙ্করের মত। কিন্তু এখানে নাম-রূপের অন্তরালে ব্রহ্ম বর্তমান। নাম-রূপ ব্রহ্মের ছদ্মবেশ।

কিন্তু জীব? শঙ্করের মতে অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার)-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব। উপাধির নাশ হইলে ব্রহ্মই থাকেন স্ব-স্বরূপে। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জীবের নাই। 'জীবো ব্রহ্মৈব, নাপরঃ।'

কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে 'উপাধি' আসে কোথা হইতে? শঙ্কর বলেন উপাধি 'অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতঃ'—অর্থাৎ অবিদ্যা কর্তৃক উৎপন্ন। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় সকলই অবিদ্যা-জাত—তাহাদের অবাধিত সত্তা বা পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তাহারা বিনশ্বর—চিরকাল থাকে না। বিদ্যার উদ্ভবের সঙ্গে তাহারা বিনষ্ট হয়। সুতরাং মন-বুদ্ধি-অহংকার-সমন্বিত জীবের অস্তিত্ব থাকে ততদিন, যতদিন অবিদ্যার নাশ না হয়। জীবের অবিদ্যার নাশ হইলে বহির্জগতে প্রতীয়মান জড়জগতের সহিত অন্তর্জগতে প্রতীয়মান খণ্ড জ্ঞানেরও নাশ হয়, তখন বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। প্রত্যেক জীবও তাহার জীবত্ব-জ্ঞান ব্রহ্ম-সমুদ্রে অবিদ্যা-বুদ্বুদরূপে উত্থিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিনশ্বর হইলেও এই অবিদ্যা-বুদ্বুদেরও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে।

সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি—অর্থাৎ ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাস অর্থাৎ জগতের মিথ্যা-প্রতীতি হয় জীবের; জীবও অনাদি, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্তকাল ধরিয়া অন্তঃকরণ-রূপ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত

উপাধি সহযোগে জীবরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। এই অবিদ্যার আশ্রয় কি? পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যার অবস্থান অসম্ভব, যেমন সূর্যে অন্ধকার অসম্ভব। অবিদ্যা ব্যতীত জীবের উদ্ভবও অসম্ভব। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়, ৩য় পাদের ৩০নং সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন :

'যাবদেব চায়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ তাবদেব অস্য জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বং চ। পরমার্থতস্তু ন জীবো নাম বুদ্ধ্যুপাধিপরিকল্পিত-স্বরূপ-ব্যতিরেকেণ অস্তি। ন হি নিত্যমুক্ত-স্বরূপাৎ সর্বজ্ঞাৎ ঈশ্বরাৎ অন্যঃ চেতনধাতুঃ দ্বিতীয়ঃ বেদান্তার্থ-নিরূপণায়াম্ উপলভ্যতে।'

—অর্থাৎ যে পর্যন্ত বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্যন্ত জীবের জীবত্ব ও সংসারিত্ব। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত জীবত্ব ব্যতীত জীব নামক কিছুর অস্তিত্ব নাই। নিত্যমুক্ত-স্বরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় আর কোনও চেতন বস্তু বেদান্তের অর্থনিরূপণে পাওয়া যায় না। যে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা জীবত্ব কল্পিত, অবিদ্যা কর্তৃক তাহা প্রত্যুপস্থাপিত হইবার পূর্বে জীবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না। অবিদ্যা যদি সত্য হয়, এবং জীব ও ব্রহ্মের কেহই যদি তাহার আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব শঙ্কর স্বীকার করেন না।

ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য কোন চেতন ধাতু যদি না থাকে (যাহা শঙ্কর বলিয়াছেন), তাহা হইলে জীবের যে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান হইলেও ঈশ্বরেরই জ্ঞান। কেন না জ্ঞান চেতন পদার্থেরই ধর্ম। কিন্তু শঙ্কর বলিয়াছেন (২।১।১৪) :

অবিদ্যাত্মক-উপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষম্ এব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চ। ন পরমার্থতঃ বিদ্যয়া অপাস্ত-সর্বোপাধি-স্বরূপে আত্মনি ঈশিতৃ-ঈশিতব্য সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহারঃ উপপদ্যতে।

—অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব অবিদ্যাত্মক উপাধিসাপেক্ষ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিদ্যা কর্তৃক অপসারিত-সর্বোপাধি আত্মায় নিয়ন্তা, নিয়ম্য, সর্বজ্ঞত্বাদি ভাব কিছুই নাই। অপগত-সর্বোপাধি আত্মাই ব্রহ্ম। শঙ্কর বলেন, আত্মায় সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি নাই। সুতরাং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরও জীবেরই মতো অবিদ্যা-কল্পিত। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সকলই যদি অবিদ্যা-কল্পিত হয়, তাহা হইলে সে অবিদ্যাকে ব্রহ্মেরই অবিদ্যা বলিতে হয়। নতুবা তাহাকে দ্বিতীয় স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

কামারপুকুর

[সঙ্গীত : বেহাগ—ত্রিতাল]

স্বামী অলোকানন্দ

কামারপুকুর—বল আর কত দূর?
ব্যাকুল পরাণ মোর দরশন আশে,
চরণ চলে না আর দূরপথ-ক্লেশে,
শ্রবণে বাজিছে মোর এই শুধু সুর,
'রঘুবীর গদাধর হাল্‌দারপুকুর'॥

নাহি মোর অনুরাগ সাধন-ভজনে,
বিবেক-বৈরাগ্য নাই বঞ্চিত পরাণে,
নিজগুণে কৃপা করি দেহ দরশন,
জনম সফল কর এই আকিঞ্চন,
হৃদয়ে ধ্বনিছে মোর এই শুধু সুর,
'রঘুবীর গদাধর কামারপুকুর'॥

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[তৃতীয় প্রবন্ধ—বনগমন]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনগমন বর্ণিত হইয়াছে। সে কাহিনী করুণ ও চিত্ত-স্পর্শী। ঘটনা কিঞ্চিৎ আকস্মিক, কিন্তু কাব্যের গতি এত সহজ ও সাবলীল যে, কোথাও অসঙ্গতি দেখা যায় না। দশরথ ও কৌশল্যার বিলাপ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে পুনরাবৃত্তি দোষ দৃষ্ট হয়। মনে হয়, পরে ঐগুলি সংযোজনা করিয়া কাব্যের আকার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সমৃদ্ধ নগরী অযোধ্যার সৌন্দর্য-সম্ভার ও রামের বনগমন সংবাদে উহার ম্লান বিষাদশ্রী উভয় চিত্রই সুন্দর। রাজপরিবারের সব চরিত্রগুলিই এই অধ্যায়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের বনগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অসহায় বৃদ্ধ দশরথের কাতরতা, কৌশল্যার করুণ বিলাপ, রামের প্রতি অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের ক্রোধ, কৈকেয়ীর নির্মম আচরণ, প্রজাবর্গের আকুল শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার যে আদর্শগুলি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের নরনারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া অনুপ্রেরণা দিয়াছে, রামচন্দ্রের সেই অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা ও পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার দৃঢ়তা ও পাতিব্রত্য অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন চৈত্র মাসে। কয়েক বৎসর সুখে অতিবাহিত হইলে বৎসর ঘুরিয়া পুনরায় পুষ্পিত-কানন-সমন্বিত শুভ চৈত্র মাস আসিল। বৃদ্ধ দশরথ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। অভিষেকের দিন বড় তাড়াতাড়ি স্থির হইয়াছিল। যে রাত্রে নানারূপ অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া দশরথ বিচলিত হন,তাহার পরদিনই তিনি রামের অভিষেক সম্বন্ধে অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করেন। জ্যোতিষিবর্গ যখন বলিলেন, পরদিবস পুষ্যা নক্ষত্রে সময় শুভ, তখন কাল বিলম্ব না করিয়া ঐদিনই অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভরত তখন শত্রুঘ্ন-সহ মাতুলালয়ে ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁহার আচরণে রামের প্রতি প্রতিকূলভাব দেখা না যাইলেও ভরত হইতে রামের বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা দশরথের মনে জাগিয়াছিল। কারণ, শ্রীরামচন্দ্রকে অভিষেকের সংবাদ-প্রদানকালে তিনি বলিয়াছিলেন, ভরতের বিদেশে অবস্থান-কালেই রামের অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রামের অভিষেক-বার্তা ঘোষিত হইবামাত্র সমগ্র রাজধানী বিচিত্র উৎসব-সজ্জা ধারণ করিল। আনন্দোৎসব-মত্ত নাগরিকগণ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত হর্ষ বিষাদে পরিণত হইবে।

যেদিন রামের রাজ্যাভিষেক-বার্তা ঘোষিত হইল, সেদিন যেন দৈববশে পরিচালিত হইয়াই কৈকেয়ীর অন্যতম পরিচারিকা মন্থরা রাজ-প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিল। তারপর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগরীর উৎসব-সজ্জা দর্শনে বিস্মিত হইয়া একজন ধাত্রীকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, পরদিবস রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সমগ্র পুরবাসী আনন্দে মগ্ন। তখন ঈর্ষাপরায়ণা

মন্থরা ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুত অবতরণপূর্বক একেবারে কৈকেয়ীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল,

'উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং তে ঘোরমাগতম্।
সমুপপ্লুতমাত্মানং দুর্ভগে নাববুধ্যসে ॥'

—মূঢ়ে, উঠ, এখনও কেন শয়ন করিয়া আছ? তোমার ভীষণ বিপদ সমুপস্থিত। হে দুর্ভগে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি দুর্দশাগ্রস্ত।

রামের বনবাস ও রামসীতার সমগ্র দুঃখের কারণ মন্থরা ও কৈকেয়ী। কৈকেয়ী-চরিত্র নিন্দিত। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—দশরথের এই তিন মহিষীর চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা সংক্ষেপে ভরতের উক্তিতে পাওয়া যায়। রামের বনগমন ও দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য অমাত্যগণ-প্রেরিত দূতকে অযোধ্যার সকলের কুশল-প্রশ্ন করিতে গিয়া ভরত বলিয়াছিলেন,

'কচ্চিদম্বা কুশলিনী কৌশল্যা ধর্মচারিণী।
মাতা রামস্য ধর্মজ্ঞা ভর্তৃব্রতপরায়ণা ॥
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা লক্ষ্মণং যা ব্যজায়ত।
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাত্মানমরোগা চাপি মধ্যমা ॥
আত্মকার্যপরা চণ্ডা ক্রোধনা নিত্যগর্বিতা।
কৈকেয়ী চাপি মে মাতা কচ্চিৎ কুশলিনী দৃঢ়ম্ ॥'

—ভর্তৃব্রত-পরায়ণা, ধর্মচারিণী, ধর্মজ্ঞা, রামজননী কৌশল্যা কুশলে আছেন তো? যিনি মহাত্মা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্মজ্ঞ, মধ্যমা মাতা সুমিত্রাও নীরোগ অবস্থায় আছেন তো? আর স্বকার্যসাধনপরায়ণা, উগ্রস্বভাবা, ক্রোধশীলা, নিত্যগর্বিতা আমার মাতা কৈকেয়ী স্থির কুশলসম্পন্না কি?

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধর্মজ্ঞা কথাটি কৈকেয়ীর সম্বন্ধে একেবারেই প্রযুক্ত হয় নাই। কৈকেয়ী সুন্দরী, উগ্রস্বভাবা, ক্রোধপরায়ণা, দশরথের প্রণয়ভাগিনী বলিয়া সৌভাগ্যমদে গর্বিতা, কিন্তু রামের প্রতি অতীব স্নেহসম্পন্না।

মন্থরা কৈকেয়ীকে রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ প্রদানান্তে দশরথের প্রতি অশেষ কটূক্তি করিয়া রামের প্রতি তাঁহার চিত্ত বিমুখ করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুত্তরে কিন্তু কৈকেয়ী একখানি সুন্দর আভরণ নিজ গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া মন্থরাকে উপহার দিয়া বলিলেন,

'মন্থরে, যৎ ত্বয়া মেঽদ্য প্রিয়মাখ্যাতমীপ্সিতম্।
তদিদং প্রীতিদানং তে প্রীত্যা ভূয়ো দদামি তে ॥
রামে বা ভরতে বাপি বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
তস্মাৎ প্রিয়ং মে যদ্রামং রাজা রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥'

—মন্থরে, তুমি আজ আমার নিকট যে অভীষ্ট প্রিয়বার্তা নিবেদন করিলে, তাহার জন্য তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ পুনরায় আমি তোমাকে এই প্রীতিদান প্রদান করিতেছি। রাম ও ভরতের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। রাজা রামকে অভিষিক্ত করিবেন, এ সংবাদ আমার নিকট প্রিয়।'

কৈকেয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রাম হইতে কাহারও অকল্যাণ হইতে পারে না। রামের প্রতি তাঁহার স্নেহপূর্ণ চিত্তকে বিমুখ করা মন্থরার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। অবশেষে মন্থরা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে দুইটি মোক্ষম বাণ নিক্ষেপ করিল। রামচন্দ্র একবার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে অযোধ্যার রাজবংশ রামের পুত্রপৌত্রাদির অনুগামী হইবে। ভরতের বংশ কখনই রাজত্ব করিতে পারিবে না! দ্বিতীয়তঃ সৌভাগ্যমদে মত্ত কৈকেয়ী ইতিপূর্বে কৌশল্যাকে যে অবমাননা করিয়াছেন, রাজমাতা হইয়া কৌশল্যা কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন না?

মন্থরার এ অস্ত্র অব্যর্থ। বংশানুক্রমে প্রিয় পুত্রের রাজ্যচ্যুতি ও সপত্নীর সৌভাগ্যোদয়ের চিন্তা কৈকেয়ীর সমগ্র চিত্ত অধিকারপূর্বক বহুবিধ কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টি করিয়া রামের

প্রতি স্নেহশূন্য করিল। তখন মনে হইল মন্থরার সকল পরামর্শ ই হিতকর ও যুক্তিসঙ্গত। কৈকেয়ীর চিত্ত ঐরূপে প্রভাবিত করিয়া মন্থরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নির্দেশ করিল। পূর্বে একবার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীর পরিচর্যায় আরোগ্যলাভপূর্বক প্রীত হইয়া তাঁহাকে দুইটি বর প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন। মন্থরা যুক্তি দিল, ঐ বরদ্বয় প্রার্থনা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়—এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে রামের চতুর্দশ বৎসর নির্বাসন।

অতঃপর দশরথের কাতর অনুনয়, ভৎর্সনা আবেদন সমস্তই ব্যর্থ হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৈকেয়ী বলিলেন,

'যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি বনং রামং বিসর্জয়।
ভরতঞ্চাপি মে পুত্রং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়॥'

—যদি আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হন, তবে রামকে বনে প্রেরণ করিয়া আমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

রাজ্যাভিষেকের সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে পুরোহিতবর্গের নির্দেশানুসারে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নানারূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পিতার আহ্বানে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কৈকেয়ীর মুখ হইতে তিনি নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। কিন্তু রামের নিকট কি ঐ সংবাদ সত্যই নিদারুণ ছিল? কৈকেয়ীর নির্দেশ শুনিবামাত্র তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

'এবমস্তু নিবৎস্যামি বনে চীরজটাধরঃ।
চতুর্দশৈব বর্ষাণি প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ পিতুঃ॥'

—তাহাই হউক, বল্কল ও জটাধারী হইয়া আমি পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসরই বনে বাস করিব।

তৎক্ষণাৎ তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বনগমনে সংকল্প করিলেন। একবারও কোন প্রশ্ন তুলিলেন না, বৃদ্ধ পিতাকে দোষারোপ করিলেন না, কৈকেয়ীকে অপ্রিয়বাক্য বলিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রের এই অপূর্ব ত্যাগ সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। পার্থিব শ্রেষ্ঠ সুখসম্পদ্ রাজৈশ্বর্য, নবপরিণীতা পত্নী সমস্তই মুহূর্তমধ্যে পরিত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা যে তাঁহার অনুগমন করিবেন, তাহা তিনি চিন্তাও করেন নাই; এবং পরে সর্বতোভাবে তাঁহাদের নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন কোন আধুনিক যুক্তিবাদীর চক্ষে হয়তো এই ত্যাগ মহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিবেন—স্ত্রীবশীভূত বৃদ্ধ পিতার কথায় রাজ্যপালনের ও স্বীয় জননী ও পত্নীর প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করা কি সঙ্গত হইয়াছিল? ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? যুক্তির অভাব সে যুগেও দেখা যায় নাই। কৌশল্যা ও লক্ষ্মণ দশরথের উদ্দেশ্যে ক্রোধ প্রকাশ এবং কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া রামচন্দ্রের রাজ্য পরিত্যাগ ও বনগমনের বিপক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। আর পার্থিব সম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া বনবাসের মহৎ দুঃখ প্রসন্নচিত্তে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ পর্যন্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে রামচন্দ্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! ভক্তহৃদয় তাই শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছেন,

'প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকত-
স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে
সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা॥'

—রঘুনন্দনের মুখকমলের যে শ্রী রাজ্যাভিষেকেও প্রফুল্লভাব ধারণ করে নাই, এবং বনবাসের দুঃখেও

যাহা ম্লান হয় নাই, সেই মুখশ্রী আমাকে সর্বদা মঙ্গল প্রদান করুক।

শ্রীরামচন্দ্রের মহৎ, বিশাল হৃদয় সকলের প্রতি প্রেম ও ক্ষমায় পূর্ণ। দশরথ ও কৌশল্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজান্তঃপুরের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি কৈকেয়ীকে অভিসম্পাত না করিয়াছেন। এমনকি, যে প্রিয় পুত্রের রাজ্যলাভের কামনায় কৈকেয়ী হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন, সেই ভরতও জননীকে ক্ষমা করেন নাই। অযোধ্যার প্রজাবর্গ সকলেই কৈকেয়ীর প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া কখনও তাঁহার উদ্দেশ্যে বিরূপ বাক্য নির্গত হয় নাই। রাম তাঁহার আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দায়ী করিয়াছিলেন দৈবকে; লক্ষ্মণের ক্রোধপূর্ণ উক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন,

'কৈকেয়ী তু প্রকৃত্যৈব সদা মাং প্রতি বৎসলা।
সত্যং মৎপরিপীড়ার্থং বলাদ্দৈবেন মোহিতা ॥'

—আমার প্রতি স্বভাবতই সর্বদা স্নেহসম্পন্না কৈকেয়ীকে নিশ্চয়ই দৈব আমার দুঃখ বিধানের নিমিত্ত বলপূর্বক মোহিত করিয়াছে।

মহাপুরুষগণের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য। মানবের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, তাঁহাদিগের চিত্তে ক্রোধ সঞ্চার করে না। বরং তাহাদের প্রতি অনুকম্পায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা কি তাঁহাদের আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পরিচয় নয়?

রামের বনগমনের সংবাদ শ্রবণে অন্তঃপুরে সকলের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, মহাকবি তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সর্বদা রামের অনুগত। রামের প্রতি বনবাসের নির্দেশ তাঁহার এত অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, নানারূপ যুক্তি দিয়া পরিশেষে বলপূর্বক বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া রামকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, বনগমনে রাম দৃঢ়সংকল্প, তখন প্রকৃত কর্তব্য নির্ধারণে তাঁহার বিলম্ব হইল না। রামের সহিত তিনিও বনে বাস করিবেন। রাম-পরিত্যক্ত রাজপুরীতে বাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আনুগত্য আদর্শস্থানীয়।

রাম যখন তাঁহার বনগমন-বার্তা কৌশল্যাকে নিবেদন করিতে গেলেন, শুক্লবস্ত্রপরিহিতা, প্রযত্নবতী, উপবাসাদিপূর্বক সংযতচিত্তা, ব্রত-ধারিণী কৌশল্যা তখন পুত্রের কল্যাণ-কামনায় দেবতাগণের পূজায় নিরতা ছিলেন। কৌশল্যার মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতীয় নারীর সাক্ষাৎ পাই—যে নারী পতিব্রতা, পুত্রবৎসলা, সর্বদা ব্রত উপবাস ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রত, দেব-পরায়ণা, কল্যাণময়ী। রামের বনগমন সংবাদে শোকে কাতর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,

'ন প্রাপ্তপূর্বং কল্যাণং ময়া পতিপরিগ্রহাৎ।
আশংসিতং মে সুচিরং ত্বত্তোঽপি প্রাপ্নুয়ামিতি ॥
তদদ্য বিফলীভূতং মম রাম বিচিন্তিতম্।
দুঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী ॥'

—পূর্বে আমি পতির নিকট সুখলাভ করি নাই। চিরকাল প্রত্যাশা করিয়াছি, তোমা হইতেই সুখলাভ করিব। রাম, অদ্য আমার সুখের সকল চিন্তা বিফল হইল। বৎস, বিধাতা আমাকে অপরিসীম দুঃখভাগিনী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

কৌশল্যাকে কোন প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া রাম সীতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন।

সীতা চরিত্র বাস্তবিকই অতুলনীয়। সীতা ও সাবিত্রীর পাতিব্রত্যই সমধিক কীর্তিত; কিন্তু তেজ, সাহস, দৃঢ়তা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতাও কি তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়? সীতা রামের যোগ্য পত্নী। রামের বনবাস-গমনের সংকল্প জানিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি রামের অনুগমনে

প্রস্তুত হইলেন। একবারও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন না যে, রামের বনগমন সঙ্গত নহে। তাঁহার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আপাতদৃষ্টিতে যাহারা দায়ী, তাহাদের উপর একবারও দোষারোপ করিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাতিব্রত্য-আদর্শের অভাব নাই। সীতা কেবল পতিব্রতাই নহেন, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও অপরিসীম ক্ষমার তুলনা নাই। তিনি রাজকন্যা, রাজবধূ—আবাল্য রাজপ্রাসাদে সুখৈশ্বর্যে প্রতিপালিতা। কত অনায়াসে তিনি বনবাসের ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত হইলেন! বনবাস সম্বন্ধে যে তাঁহার কোনরূপ ধারণা ছিল না, তাহা বলা যায় না। কারণ রাম বনবাসের দুঃখসমূহ বর্ণনা করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

'কন্যয়ৈব ময়া সর্বে বনদোষাঃ শ্রুতাঃ পুরা।
ভিক্ষুক্যাঃ সাধুবৃত্তায়াঃ কথয়ন্ত্যা পিতুর্গৃহে ॥'

—পূর্বে পিতৃগৃহে কন্যাবস্থায় অবস্থানকালে আমি সাধুচরিত্রা কোন তাপসীর নিকট কথাপ্রসঙ্গে বনবাসের সমস্ত দোষ (দুঃখ) শ্রবণ করিয়াছিলাম।

সীতার ঐকান্তিক প্রার্থনা সত্ত্বেও রামচন্দ্র যখন তাঁহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না, তখন সীতা ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন,

'অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদয়ুপশ্যতি।
তেজস্বী রাম একৈকঃ সূর্যবদ্দ্যুতিমানিতি ॥
কিংবা পশ্যন্ বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
ত্যক্তুমিচ্ছসি মাং যেন প্রিয়াং নান্যপরায়ণাম্ ॥

—একমাত্র রামচন্দ্রই তেজস্বী ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, অজ্ঞানতাবশতই লোকে এইরূপ মিথ্যা বিবেচনা করিয়া থাকে। আপনি কি দেখিয়া বিষণ্ণ হইতেছেন, আপনার ভয়েরই বা কি কারণ,—যাহার জন্য অনন্যপরায়ণা আমাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছেন?

কৈকেয়ী যখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে পরিধানের নিমিত্ত চীর (কুশ-নির্মিত বস্ত্র) প্রদান করেন, তখনও সীতা কৈকেয়ীর প্রতি কোনরূপ বিরূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া চীরদ্বয় গ্রহণ করেন। কেবল চীর পরিধানে অনভিজ্ঞা তিনি একখণ্ড চীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অপর খণ্ড কিরূপে পরিধান করিতে হয় তাহা ভাবিয়াই উদ্বিগ্ন হইলেন।

বনগমনে উদ্যতা সীতাকে কৌশল্যা যখন নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন সীতা বিনীতভাবে বলিয়াছেন,

'পৃথগ্ জনসমামার্যে ন মাং ত্বং কর্তুমর্হসি।
ধর্মাদ্ বিচলিতুং নালমহং সূর্যাদিব প্রভা ॥'

—আর্যে, আপনি আমাকে সাধারণ রমণী বলিয়া মনে করিবেন না। সূর্য হইতে সূর্যের প্রভা যেমন পৃথক থাকিতে পারে না, তেমনি আমিও ধর্ম হইতে বিচলিত হইতে পারি না। সত্যই সীতা সাধারণ নারী নহেন। সীতার কথা বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

আর সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতার চরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে। ......ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্রেরই আশ্রিত। মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমনকি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।

অবশেষে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার যাত্রার সময় আসিল। মন্ত্রিগণ, পুরোহিতবর্গ ও পৌরজন

নিশা-অবসানে অভিষেকের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাজদর্শনপ্রার্থী হইয়া জানিতে পারিলেন, মুহূর্তে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যার সেই মহাশোকের কাহিনী আজ পর্যন্ত কত পণ্ডিত, কত কবি কতভাবেই না লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! সমগ্র অযোধ্যাবাসী 'হা রাম' বলিয়া আকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে রামচন্দ্রের রথের অনুগমন করিলেন। ভারতবর্ষে আর একবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গমন করেন, সেদিন এমনি করিয়াই গোপীগণ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার রথের অনুধাবন করিয়া অবশেষে রথের অদর্শনে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

পুরনারী-সমাবৃত দশরথ ও কৌশল্যা যখন রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া প্রজাবৃন্দের সহিত বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন সে দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্র দ্রুত রথ পরিচালনার আদেশ দিলেন। এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি সে দৃশ্য কল্পনা করিয়া 'পুরস্কারে'র কবির কণ্ঠে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন:

(কবি) কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে,
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনের পথে—

ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদবিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়-রথে।

রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে-সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে—

অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।'

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পবিত্র জাহ্নবীতীরে মায়ের মন্দির,
মানব-কল্যাণ-গীতি সেথা উচ্ছ্বসিত,
স্বরগের স্বস্তি-বাণী ধ্বনিছে গম্ভীর
রামকৃষ্ণ-কথামৃতে মন সম্মোহিত।

মাতৃ-আরাধনা-মন্ত্রে নিয়ত মুখর
ধ্যানরত সদানন্দ পরম-পুরুষ
ভাবেতে বিহ্বল সদা, জ্ঞানেতে প্রখর,
বাণীর বিভূতি নিত্য নাশিছে কলুষ।

পঞ্চবটী-পুণ্যছায়ে প্রজ্ঞার প্রকাশ,
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানে সিদ্ধ জীবন সাধন,
রামকৃষ্ণ-সারদার ব্রত অনায়াস—
সংসার-জীবন মাঝে সন্ন্যাস যাপন।

অনাসক্ত প্রেমধারা জীবাত্মায় জীবন
জীবের মাঝারে শিব নিত্য-নিরঞ্জন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

স্বাধীন ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্যাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটি প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতা-লাভের আজ এক যুগ অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে কোন একটী স্থির ও সুষ্ঠু পন্থা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। যে শিক্ষা জাতির প্রাণস্বরূপা, যে শিক্ষার সঞ্জীবনী শক্তিতে বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীন, প্রপীড়িত ভারত নবজীবন লাভে ধন্য হবে, সেই শিক্ষাকেই এই ভাবে অবহেলা করা নিশ্চয়ই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। আজ স্মরণ হচ্ছে ভারতাত্মার মূর্ত প্রতি-চ্ছবি স্বামী বিবেকানন্দের সেই সখেদ উক্তি:

ইয়োরোপের নানা স্থানে ভ্রমণকালে আমি দেখতাম, কি আরামেই না সেখানকার দরিদ্র জনেরাও জীবন যাপন করছে, কি সুন্দর শিক্ষাই না তারা লাভ করছে; আর যখন আমাদের দেশের দরিদ্র জনদের কথা ভাবতাম, তখন আমি অশ্রুবর্ষণ করতাম। এই প্রভেদের কারণ কি? 'শিক্ষা'—এই উত্তরই আমি পেলাম।

এই উত্তরকেই স্বামীজী তাঁর সুধন্য জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে শিক্ষার স্বরূপ, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচেষ্টা করেছেন।

এস্থলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে: 'শিক্ষা' বলতে আমরা কি বুঝি? শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা কি? তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ সরল মধুরভাবে স্বামীজী শিক্ষার কয়েকটী সংজ্ঞা বা বিবরণ দিয়ে বলেছেন:

শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা সকলের অন্ত-র্নিহিত ব্রহ্ম জাগ্রত হন।

আমাদের সেরূপ ভাবধারাকেই আত্মস্থ ক'রে নিতে হবে, যাতে জীবন গঠিত হয়, মানুষ গঠিত হয়, চরিত্র গঠিত হয়।

আমরা সেই শিক্ষাই চাই, যা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বর্ধিত হয়, বুদ্ধি বিস্তৃত হয়, এবং নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়।

সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষ-গঠন। সকল শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল মানুষকে বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করা।

মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই হ'ল শিক্ষা।

এইভাবে স্বামীজীর মতে শিক্ষার সাতটী প্রধান লক্ষণ:

অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের জাগরণ, অন্তরস্থ পূর্ণতার প্রকাশ, জীবনের গঠন, মানুষের গঠন, চরিত্রের গঠন, বুদ্ধি-অনুভূতি-ইচ্ছা-শক্তির বর্ধন, আত্ম-বিশ্বাস।

প্রথমতঃ বেদান্তবাদী স্বামীজীর মতে প্রত্যেক মানুষই ব্রহ্মস্বরূপ, নিত্যবুদ্ধশুদ্ধমুক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। কিন্তু এই ব্রহ্মভাব, ঈশ্বরত্ব, পূর্ণত্ব ভূমারূপ ও আনন্দরসঘনত্ব জীবে শাশ্বত-কাল ধরে নিহিত হ'য়ে থাকলেও প্রকাশিত হয় না। সেইজন্যই জীব নিজেকে 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র', পাপী তাপী শোকক্লিষ্ট প্রভৃতি ভেবে আকুল হয়। কিন্তু এ সবই তার নিজের অজ্ঞানের ফল মাত্র। যেমন মেঘাবৃত সূর্যকে আমরা দেখতে পাই না সত্য, কিন্তু সেজন্য সূর্যের অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্যও বিলুপ্ত হয় না; তেমনি অজ্ঞানাবরণের জন্য আমাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে না পারলেও তিনি চিরকালই

আছেন। অর্থাৎ আমরা শাশ্বতকালই ব্রহ্ম, সেই সত্যটা আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ আমরা চিরব্রহ্ম ব'লে চিরপূর্ণ। ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্ব সমার্থক, সেজন্য এই পূর্ণতাও আমাদের মধ্যে শাশ্বতকাল নিহিত হ'য়ে আছে। শিক্ষার দ্বারা তার প্রকাশমাত্রই হয়।

স্বামীজী এই যে বলেছেন, ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্ব আমাদের আগন্তুক গুণ নয়, আমাদের মধ্যে নূতন সৃষ্টি নয়, আমাদের নূতন লাভ নয়, কিন্তু আমাদের চিরন্তন, অবিনাশী সত্তা বা স্বরূপই মাত্র, তা ভারতীয় দর্শনের একটি অভিনব, নিগূঢ়, মূলীভূত তত্ত্ব। এই মতানুসারে 'সত্য' ও 'নিত্য' সমার্থক; যা সত্য তার জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। সেজন্য সত্যের 'সৃষ্টি' হয় না, সত্য 'লব্ধ' হয় না, নিত্যস্থিত, নিত্যলব্ধ সত্যের 'প্রকাশ'ই হয় মাত্র।

এস্থলে অদ্বৈত বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ 'কণ্ঠ-চামীকর ন্যায়', 'রাজপুত্র-ব্যাধ-ন্যায়', 'দশমস্ত্বমসি ন্যায়' প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সুন্দর উদাহরণগুলির অর্থ হ'ল এই: এক ব্যক্তির কণ্ঠে প্রথম থেকেই চামীকর বা স্বর্ণ-হারটী আছে; সে কিন্তু তা না জেনে সেই হারটীকে অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে; সেই সময়ে অন্য এক ব্যক্তি যদি সেই হারটিকে নির্দেশ ক'রে বলে, 'হার তোমার কণ্ঠেই তো আছে, তাহলে সে হারকে নূতন ক'রে লাভ করে না, যে হার তার পূর্বেই ছিল, তার প্রকাশ মাত্রই তার কাছে হয়। একই ভাবে—যে রাজপুত্র শৈশবেই ব্যাধ কর্তৃক অপহৃত হ'য়ে প্রথমে নিজেকেই ব্যাধই মনে করে, এবং পরে অন্যদের নিকট থেকে সে যে রাজপুত্র তা জানতে পারে, সেও নূতন ক'রে রাজপুত্র হয় না, তার পূর্ণ রাজ-পুত্রত্বের প্রকাশ মাত্রই তার কাছে হয়। একই ভাবে—দশজনের দলের দলপতি সংখ্যাগণনা-কালে ভ্রমক্রমে নিজেকে বাদ দিয়ে গণনা ক'রে নয়-জন আছে ভেবে যখন ব্যাকুল হয়, তখন যদি অন্য কেহ তাকে বলে, 'তুমিই তো দশম জন' তাহলে সে নূতন ক'রে দশম হয় না; তার পূর্ব দশমত্বের প্রকাশই কেবল তাঁর কাছে হয়। এরূপে—আমরা যখন উপলব্ধি করি যে, আমরা ব্রহ্ম ও পূর্ণ, তখন আমরা নূতন ক'রে ব্রহ্ম ও পূর্ণ হই না; আমাদের সত্তাগত, শাশ্বত ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্বের প্রকাশই কেবল আমাদের কাছে হয়। সে জন্য সাধনার অর্থ এই নয় যে, আমরা একটী নূতন স্বরূপ ও গুণ লাভের জন্য প্রচেষ্টা করছি; সিদ্ধির অর্থ এই নয় যে, আমরা একটী নূতন অবস্থায়, অব্রহ্মত্ব থেকে ব্রহ্মত্বে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় উপনীত হচ্ছে। নিত্য বিরাজমান আত্মার স্বরূপের আবরণ উন্মোচন প্রচেষ্টাই সাধনা, অনাবৃত আত্মার, স্বরূপের প্রকাশ বা উপলব্ধিই সিদ্ধি।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কথা খাটে। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি যে, আমরা জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ণ-স্বরূপ আমরা অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপও—একই সঙ্গে। সেজন্য নতুন ক'রে জ্ঞান লাভ হয় না; অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হ'লে আমাদের নিকট সেই নিত্য জ্ঞানের প্রকাশই হয় মাত্র।

স্বামীজী শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা-কালে এই কথাটাই বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন:

জ্ঞান মানবের মধ্যেই নিহিত হ'য়ে রয়েছে, বাইরে থেকে কোন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান অন্তরেই রয়েছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে জানার অর্থ 'আবিষ্কার করা' বা 'আবরণ উন্মোচন করা।' আত্মা অনন্ত জ্ঞানের আকর এবং শিক্ষার অর্থ হচ্ছে আত্মার আবরণ অপসারণ ক'রে তাকে আবিষ্কার করা। আমরা বলে থাকি যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু এটা কি তাঁর জন্য বাইরে এক কোণে অপেক্ষা ক'রে বসে ছিল? এটা ছিল তাঁর নিজেরই মনে; সময় সমুপস্থিত হ'লে তিনি তা আবিষ্কার করলেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানই মনের থেকেই আসে; বিশ্বের অনন্ত গ্রন্থাগার তো পৃথিবীর ঘটনাবলী তোমার নিজের মনের গ্রন্থটাকেই পাঠ করবার জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে! একটা আপেল ফলের পতন নিউটনকেও নিজে মনোগ্রন্থকে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর পূর্বের চিন্তা ধারাকে পুনর্গঠিত ক'রে, তাদের মধ্যে একটা নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করেন—একেই আমরা বলি 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'! এটা আপেল ফলেও ছিল না, পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন কিছুতেও ছিল না। সেজন্য পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল জ্ঞানই মানব-মনের মধ্যেই রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান আবিষ্কৃত হয় না, আবৃত হয়েই থেকে যায়, এবং যখন এই আবরণ ধীরে ধীরে অপসৃত হয়, তখন আমরা বলি যে আমরা শিক্ষা লাভ করছি, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এই প্রণালীতেই। যাঁর ক্ষেত্রে এই আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন অধিকতর জ্ঞানবান; যাঁর ক্ষেত্রে তা ঘন হ'য়ে পড়ে রয়েছে, তিনিই হলেন অজ্ঞ; যাঁর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হ'য়ে গেছে, তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ। চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত হ'য়ে থাকে, তেমনি মনেও জ্ঞান নিহিত হ'য়ে আছে; ঘর্ষণের দ্বারা যেমন সেই অগ্নি প্রকাশিত হয়, শিক্ষার দ্বারাও তেমনি সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হয়। সেজন্য সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি থাকে এই মনেই। যাকে আমরা প্রাকৃতিক শক্তি বলি, প্রকৃতির গুপ্ত ঐশ্বর্য বলি, তা সবই আছে এই অন্তরেই। সকল জ্ঞানই আসে মানবাত্মা থেকে! মানব প্রকাশিত করে, নিজের মধ্যে আবিষ্কৃত ক'রে সেই জ্ঞানকেই যা অনন্তকাল ধরে বিরাজমান।

এই ভাবে স্বামীজী মানবের নিত্য অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির কথা বলেছেন বারংবার স্থির বিশ্বাসভরে। এর থেকেই আসছে শিক্ষার তৃতীয় লক্ষণ—জীবন গঠন। যে জীবনকে আমরা সাধারণতঃ জীবন বলে থাকি তা তো প্রকৃত জীবন নয়—মরণ; কারণ তাতে আমরা ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে মরছি আমাদের নিজেদের অজ্ঞান বাষ্পের দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে, আমাদের বাসনা কামনার দ্বারা দগ্ধ হ'য়ে, আমাদের আচার-কদাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হ'য়ে। এই 'মরণ' থেকে পরিত্রাণ লাভ করবার একমাত্র উপায় সকল ক্ষয়-ক্ষতির উর্ধ্বে যে এক অক্ষয় পূর্ণ জীবন, তারই গঠন। বস্তুতঃ আমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মত্ব ও পূর্ণত্বের প্রকাশ হলেই এই জীবনেরও প্রকাশ হয়।

এরূপ একটি পূর্ণ জীবনই 'মানুষ', এই হ'ল শিক্ষার চতুর্থ লক্ষণ—মানুষ-গঠন। মানুষ জীব নয়, মানুষ জন্মমরণশীল শোকতাপতপ্ত, ক্লেশক্লেদ-ক্লিষ্ট প্রাণী নয়; মানুষ অনন্ত অসীম অমৃত জীবনের অধিকারী, ব্রহ্মত্বের অধিকারী—পূর্ণত্বের অধিকারী। এরূপ বোধই তো মনুষ্যত্ব এবং এরূপ মনুষ্যত্ব জীবত্বের নিবারণ ও ব্রহ্মত্বের স্ফুরণ। মানুষ নিত্যবদ্ধ জীব নয়, নিত্যমুক্ত ব্রহ্মও নয়, কিন্তু বদ্ধমুক্ত মানুষ—জীবত্বের অন্ধকার আবরণ মায়া ভেদ ক'রে আলোক-দ্রষ্টা। এই আলোক-দর্শনই হ'ল শিক্ষা, সাধনা, সংস্কৃতি।

চরিত্রের গঠন সর্বজনীন ও সর্বপূর্ণ জীবনের প্রতি দিকটার তুল্য পূর্ণ প্রকাশ, সেজন্য শিক্ষার অর্থ কেবল বুদ্ধিবৃত্তির, কেবল চিন্তাশক্তির, কেবল জ্ঞানের প্রকাশ নয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে ধীর, শান্ত, পূর্ণ অনুভূতিরও সুন্দরতম প্রকাশ; সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ পুণ্য নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিরও প্রকাশ; শিক্ষা যদি প্রকাশই হয়, তাহলে তা হবে পরিপূর্ণ। সূর্য প্রকাশিত হ'লে সবই তো আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে

উঠে। একই ভাবে যে শিক্ষার আলোকে সমগ্র সত্তাই আলোকিত হ'য়ে উঠবে—সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। বস্তুতঃ, জ্ঞান, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি, সেই একই স্বরূপের বিভিন্ন দিক সেজন্য একে অপরের পরিপূরক; জ্ঞানের কোমল দিক অনুভূতি, অনুভূতির কার্যিক দিক প্রবৃত্তি। এরূপে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানের দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া হলেও অনুভূতি ও প্রবৃত্তি ব্যতীত জ্ঞানের পূর্ণতা কোথায়?

উপরে যে ছয়টি শিক্ষার লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা সবই সমার্থক, একই বস্তুর বিভিন্ন দিক্ মাত্র, যেহেতু বস্তুতত্ত্ব বা সত্য সেই একই; বস্তুতত্ত্ব বা সত্য বহু ও বিভিন্ন হ'তে পারে না। অন্যথায় সেই সব বহু ও বিভিন্ন বস্তুতত্ত্ব বা সত্য স্বভাবতই পরস্পরবিরোধী হবে। সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তো একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান বস্তুর অধীনেই অন্য সবগুলিকে আনতে হবে; একই ভাবে শিক্ষাতত্ত্ব সেই একই এবং শিক্ষার ছয়টি লক্ষণ সেই একটি তত্ত্বেরই বিভিন্ন লক্ষণ, সেই একটি বস্তুরই বিভিন্ন গুণ, সেই একটি সত্যেরই বিভিন্ন রূপ। পুনরায়, সর্বক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে এই লক্ষণ বা গুণ বা রূপের নবসৃষ্টি হচ্ছে না, হচ্ছে কেবল প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই মাত্র, যা পূর্ব থেকেই অন্তর্নিহিত, যা শাশ্বত—অথচ যা অজ্ঞাত, তারই বহিঃপ্রকাশ—তারই উপলব্ধি মাত্র। ঐ ক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এই প্রকাশ হবে কার দ্বারা, কি উপায়ে?

এরই উত্তরে স্বামীজী শিক্ষার সপ্তম লক্ষণের উল্লেখ করেছেন—আত্মবিশ্বাস ও তারই কার্যিক দিক বা আত্মপ্রচেষ্টা। বস্তুতঃ যা আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত হ'য়ে রয়েছে, আবৃত হ'য়ে রয়েছে, অনভিব্যক্ত হ'য়ে রয়েছে, তাকে জাগ্রত অনাবৃত অভিব্যক্ত করতে তো বাহিরের কোন যন্ত্র, কোন শক্তি বা কোন কর্তা পারে না; পারে কেবল অন্তরের যন্ত্র, অন্তরের শক্তি, অন্তরের কর্তা, এক কথায়—পারি কেবল আমরা নিজেরাই, অন্য কেহই নয়। অতি জোরের সঙ্গে স্বামীজী বলছেন:

প্রকৃতপক্ষে, কেহই কোনদিন অন্যের দ্বারা শিক্ষালাভ করেনি। আমাদের প্রত্যেককেই নিজেকে নিজেই শিক্ষা দিতে হয়। বাহিরের শিক্ষক কেবল সেই পরিবেশের সৃষ্টিই করেন, যাতে অন্তরের শিক্ষক বস্তু-অবধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ হন। তারপর আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ ও চিন্তাশক্তির দ্বারা সব কিছুই আমাদের নিকট সহজতর হ'য়ে আসবে। বহু যোজনব্যাপী বিশাল বটবৃক্ষ একটি অতি ক্ষুদ্র বীজে নিহিত থাকে। সেই পুঞ্জীভূত শক্তি সেইখানেই তো আবদ্ধ হয়েছিল। একই ভাবে মহতী বুদ্ধি একটি ক্ষুদ্র জীবকোষে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। এই তত্ত্বটিকে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধদোষ-দুষ্ট বলে মনে হলেও এটি পূর্ণসত্য। আমরা প্রত্যেকেই সেই একটি ক্ষুদ্র জীবকোষ থেকেই আবির্ভূত হয়েছি, এবং আমাদের সমস্ত শক্তিই সেইখানেই প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। একথা বলা যায় না যে, সেই সব শক্তি খাদ্যাদি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, কারণ বহু খাদ্যাদি একত্র করলেও এর থেকে কোন শক্তির উদ্ভব হ'তে পারে না। এরূপে মানবাত্মার মধ্যেই অনন্ত শক্তি বিরাজ করছে, তা আমরা জানি বা না জানি। সেই শক্তি প্রকাশিত হয় তখনই, যখন আমরা তা উপলব্ধি করি।

এইভাবে যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি আমাদের নিজেদের আত্মার মধ্যেই নিহিত হ'য়ে রয়েছে শাশ্বতকাল, তাদেরই আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত করতে হবে—এরই নাম 'শিক্ষা'। তাহলে কি বাহিরের শিক্ষক ও

শিক্ষালয়ের প্রয়োজন নেই? অতি সহজ, সুন্দর একটি উপমা দিয়ে স্বামীজী বলেছেন—

'তুমি যেমন একটি বৃক্ষকে বর্ধিত করতে পার না, তেমনি একটি শিশুকেও শিক্ষিত করতে পার না। বৃক্ষটি নিজেই নিজের স্বরূপানুসারে বর্ধিত হয়। শিশুটিও নিজে নিজেই শিক্ষিত হয়। কিন্তু তুমি কেবল তাকে তার চলার পথে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করতে পার। তুমি তার বাধা অপসারণ করতে পার, এবং তার জ্ঞানের প্রকাশ তখন আপনিই হবে। যেমন মাটীটা একটু নরম ক'রে দাও, যাতে সে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে; তার চারিপাশে বেড়া দিয়ে দাও যাতে সে নষ্ট হ'য়ে না যায়; তার কাছে আলো, বাতাস, জল এনে দাও, যাতে ক্ষুদ্র বীজ অচিরেই বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হ'তে পারে; এইখানেই তোমার কাজ শেষ।'

এই হ'ল সংক্ষেপে স্বামীজীর অপূর্ব শিক্ষা-তত্ত্ব। আজ আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। স্বামীজীর শিক্ষা-তত্ত্বের দুটি মূল ভিত্তি হ'ল: (১) শিক্ষার অর্থ বাহিরের নূতন সত্তা, গুণ ও শক্তির প্রাপ্তি নয়, অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তা, গুণ ও শক্তির বিকাশ মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের 'হেরিডিটি'-তত্ত্ব এরই প্রতিধ্বনি। এই মতানুসারে—শিশু একটি মূলীভূত স্বরূপ, কয়েকটি মূলীভূত গুণ ও শক্তি নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে; উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে তারা ক্রমশঃ বিকশিত হ'য়ে উঠে তার জীবন গঠন করে। অবশ্য 'হেরিডিটি ও এন্‌ভাইরন্‌মেণ্ট' অর্থাৎ জন্মগত গুণ ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর শক্তিমান, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বাদ-বিসংবাদের শেষ এখনও হয়নি; তা সত্বেও জন্মগত গুণ প্রভৃতির বিশেষ গুরুত্ব আজ সর্বজন-স্বীকৃত। (২) শিক্ষার অর্থ স্ব-শিক্ষা, নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান। এটিও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের একটি সর্বসমাদৃত মতবাদ। সেইজন্যই বাইরে থেকে শিশুর মাথায় বিদ্যার ভার না চাপিয়ে, কঠিন শাসনের দ্বারা তাকে জ্ঞানাহরণে বাধ্য না ক'রে আজ তাকে স্বাধীনভাবে, খেলাধূলার মধ্যে, আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশের সাহায্যে শিক্ষা লাভের নানারূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু এইভাবে পরিপূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত হলেও স্বামীজীর শিক্ষা-তত্ত্ব, তথা অন্যান্য সকল তত্ত্বেরই মূল ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান বা 'সায়েন্স' নয়, বিশেষ জ্ঞান বা 'দর্শন'। বিজ্ঞান ও দর্শনে মূলীভূত প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সীমা, দর্শনের লক্ষ্য ভূমা। বিজ্ঞান দিতে পারে কেবল সীমাবদ্ধ সুখ; দর্শন এনে দেয় ভূমার মহান্ আনন্দ। সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমোদ বৃদ্ধি হলেও আনন্দ বৃদ্ধি হচ্ছে না; পার্থিব শক্তি বৃদ্ধি হলেও প্রকৃত শান্তি বৃদ্ধি হচ্ছে না; আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি হলেও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হচ্ছে না; সংযোগ বৃদ্ধি হলেও সমন্বয় বৃদ্ধি হচ্ছে না। তাহলে সেই প্রগতি তো প্রতিহত গতিই মাত্র, প্রকৃষ্ট গতি কোনক্রমেই নয়। এরূপ প্রতিহত গতি কি ক'রে নিয়ে যাবে আমাদের গন্তব্য পথে, আমাদের চরম লক্ষ্যে, আমাদের পরম শ্রেয়ে? সেজন্যই সত্যদ্রষ্টা ঋষি, শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামীজী এই বেদান্ত-দর্শনকেই করেছিলেন জীবনের মূল ভিত্তি; অন্যদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই করতে। সেজন্যই তিনি বারংবার বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছিলেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ নয়, চাকুরী লাভ নয়, অর্থ লাভ নয়—অন্তরস্থ ব্রহ্মোপলব্ধি। এই ব্রহ্মোপলব্ধিতে লাভ কি হবে? প্রকৃতপক্ষে লাভালাভের কোনোরূপ প্রশ্নই এস্থলে নেই। কারণ, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পরিপূর্ণ বৃক্ষের

ফলপুষ্পের বিকাশ যখন হয়, তখন তা অনিবার্য ভাবেই, অবশ্যম্ভাবী ভাবেই, স্বভাবগত ভাবেই সংঘটিত হয়; এবং যা হবেই হবে, যা হতেই হবে, যা না হ'য়ে উপায় নেই, তা সাধারণ লাভ-ক্ষতির পরিমাপের বহু উর্ধ্বে। একই ভাবে জীবের মানবে, মানবের ব্রহ্মে যে প্রকাশ—তাও লাভালাভের ব্যাপার নয়, কেবলমাত্র সংঘটনের ব্যাপার; এমন কি তাও নয়, কেবলমাত্র ঘটন-বিহীন, কালাতীত শাশ্বত অস্তিত্ব ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়।

তা সত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে এস্থলে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপিত করাই যায়, তাহলে কি এস্থলেও অল্প লাভ হবে? না। তবে কি সেই মহালাভ? ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে কি মহালাভ আমাদের হবে? ধন নয়, মান নয়, পদ নয়। তবে তা কি? স্বামীজীর অমৃত-মধুর ভাষাতেই বলি:

'পৃথিবীর দিক্ থেকে ব্রহ্মোপলব্ধির এই মহান লাভ এই যে, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরও যদি এই উপলব্ধি হয়, তাহলেও সমগ্র জগৎ পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে; এবং বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করবে। তখন আমাদের মধ্যে অপরকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে যাবার যে পশুপ্রবৃত্তি আছে, তা পৃথিবী থেকে তিরোহিত হ'য়ে যাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল দ্বন্দ্ব, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল দ্বেষ; সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল ঈর্ষ্যা, সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশেষে তিরোহিত হ'য়ে যাবে সকল পাপ। তখন দেবতারাই এই পৃথিবীতে বাস করবে, তখনই এই পৃথিবী হবে স্বর্গরাজ্য। যেখানে দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের লীলা হয়, যেখানে দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের কাজকর্ম চলে, যেখানে দেবতাদের সঙ্গে দেবতাদের প্রীতির বন্ধন থাকে, সেখানে পাপের অস্তিত্ব কোথায়? এই তো হ'ল ব্রহ্মোপলব্ধির মহান লাভ, মহৎ প্রয়োজন। সমাজে যা কিছু তোমরা দেখছ, তা সবই তখন পরিবর্তিত পরিমার্জিত হ'য়ে যাবে। তোমরা তখন কোন ব্যক্তিকেই পাপী বলে মনে করবে না। তোমরা তখন কোন ব্যক্তিকেই তার ভুলভ্রান্তির জন্য বিদ্রূপ করবে না। তোমরা তখন কোন ব্যক্তিকেই তার দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করবে না। কারণ তোমরা তখন প্রত্যেকের মধ্যেই সেই একই ঈশ্বর দর্শন করবে। তোমরা তখন কাকেও ঈর্ষ্যা করবে না, কাকেও শাস্তি প্রদানে উৎসুক হবে না! এ সবই তখন তিরোহিত হ'য়ে যাবে, বিরাজ করবে কেবল প্রেম; এই প্রেমের মহাদর্শ তখন এরূপ শক্তি-শালী হবে যে, মনুষ্যজাতির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আর কোন শাসন, কোন বন্ধনেরই প্রয়োজন হবে না।'

কি অপূর্ব স্বামীজীর এই স্বপ্ন; কেবল তা নয়, কি অপরিসীম তাঁর আশা; কেবল তা নয়, কি অনমনীয় তাঁর বিশ্বাস!—

পৃথিবীর কোটী কোটী জনগণের মধ্যে একটী মাত্র অংশও যদি কয়েক মুহূর্ত মাত্র বসে বলেন, 'তোমরা সকলেই দেবতা! হে মানুষ! হে পশু! হে সকল প্রাণী! তোমরা সকলেই সেই একই পরম দেবতার প্রকাশ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে।

তখন আকাশে বাতাসে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হবে 'তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি!' তখন সমগ্র পৃথিবীতে, কোটী কোটী সূর্যচন্দ্রে, প্রত্যেক বস্তুতে সেই একই সম্মিলিত ধ্বনি উত্থিত হবে, 'তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি!'

প্রান্তে

'অনিরুদ্ধ'

প্রান্তে আসিনু আজ
এতদিন পথে ছিল যত ভয়
চিত্তে হানিত যত সংশয়
সাশ্রু নয়নে সহিয়া এসেছি
যত অপমান লাজ—
সকলি ফুরালো আজ!
প্রান্ত-মহিমা প্রান্তেই বুঝা যায়
দূর হ'তে দেখা বৃথা কল্পনা হায়।

প্রান্ত হইতে চাহি—
দূর পশ্চাতে দীনতার রূপ
সঞ্চিত মোহ কালিমার স্তূপ
দেখি বিস্ময়ে কোথাও আজিকে
কালো কিছু আর নাহি
সমুখে পিছনে চাহি!
প্রান্তের আলো দিগ্‌দিক্ পানে ধায়
পুঞ্জিত তম দীপ্ত করিতে চায়।

প্রান্তে দাঁড়ায়ে রই।
নাহি আর কোন চলার ভাবনা
মিটেছে যতেক কর্ম-তাড়না
অতীতের সেই দুর্বার আশা
উন্মত্ততা কই?
শান্ত দাঁড়ায়ে রই!
মহাসমুদ্রে মিশে তটিনীর ধারা
গতির ধর্ম শুদ্ধ স্বরূপে হারা।

প্রান্তে এসেছি ফিরে।
ভেবেছিনু যারা গেছে চির দূর
বিরহ রাখিতে হৃদয় আতুর
কালের গর্ভ হ'তে তারা উঠি
দাঁড়ালো আমায় ঘিরে
হারানো এসেছে ফিরে
সব বিচ্ছেদ প্রান্তেই হয় এক
শূন্যতা পায় পূর্ণের অভিষেক।

গাহি প্রান্তের গান
অখিল সীমার বাঁধন টুটিয়া
নিজ উল্লাসে চলে যা ছুটিয়া
স্বর্গ মর্ত্য ভাস্বর প্রেমে
যেই সুরে একতান—
মাতায় বিশ্বপ্রাণ।
প্রান্তের গীত হরিল সকল ব্যথা
নামিল জীবনে পরম সার্থকতা।

সমালোচনা

সৎপ্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, আসাম। পৃষ্ঠা—১৫২, মূল্য—টাকা ২·৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ-কথিত 'সৎপ্রসঙ্গ—প্রথম খণ্ডে'র পর অনেকেই সাগ্রহে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথম খণ্ডের প্রসঙ্গগুলি অধিকাংশই আসাম অঞ্চলে প্রদত্ত। এই খণ্ডের প্রসঙ্গগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত এবং যথাসময়ে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার পূর্বে পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া এবং সাধক-জীবনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রসঙ্গগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধন-পত্রিকায় প্রকাশিত পূজ্যপাদ মহারাজের লেখা 'শ্রীশ্রীমা' প্রবন্ধটি গ্রন্থারম্ভে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকটির সৌন্দর্যের সহিত মাধুর্য শতগুণে বাড়িয়াছে। কুড়িটি প্রসঙ্গ সময়ানুক্রমে (১৯৫৪-১৯৫৯) সাজানো আছে। সাধক পাঠকগণ পুস্তকখানি হইতে নিজ নিজ সাধন-জীবনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিবেন। গীতা ও 'কথামৃতে'র কথাগুলি জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিবে। মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ সর্বদা সহজপ্রাপ্য নহে, সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গের স্মৃতি বহন করে। 'সৎপ্রসঙ্গ' সাধুসঙ্গের অভাব মিটাইতে পারে। 'সৎপ্রসঙ্গ' সাধকগণের নিত্যসঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সাধনপথে সহায় হউক।

* * *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ গদ্য সংস্করণ (প্রথম খণ্ড—আদিলীলা)। অনুবাদক—শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য ; প্রকাশক—ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রচারিণী সমিতি, ১৩এ ডোভার রোড, কলিকাতা-১৯ ; পৃষ্ঠা—২৯১+৪০ ; মূল্য—৫·০।

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বাঙালীর হৃদয়-দেবতা। 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' নদীয়ার চাঁদ নিমাইরূপে যিনি কায়া ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতীরূপে সমগ্র ভারতের তথা বিশ্ববাসীর প্রণম্য আচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইয়া সকলের প্রাণে শান্তি দিয়াছিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু-পাপী, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল।'

বাঙালীর জাতীয় জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিমেয়। বাঙলার ভাগ্যাকাশ একদিন এই চৈতন্যচন্দ্রের উচ্ছলিত বিমল কিরণে সমুদ্ভাসিত ছিল। জাতির মর্মে মর্মে—তাহার সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধর্মে, একদা চৈতন্যের স্পন্দন দেখিয়া সমগ্র ভারত স্তম্ভিত হইয়াছিল। অতি স্বাভাবিক নিয়মেই সারা ভারতে সেদিন এই চৈতন্য-প্রবাহের স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। বর্তমান-সমস্যাপীড়িত আত্মিক অবনতির দিনে, এমন একটি অমিয়জীবনের রসাস্বাদনের জন্য তৃষ্ণাজাগরণ বড়ই শুভ লক্ষণ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থ যথার্থই এক-

খানি অনবদ্য সঞ্জীবনী-কাব্য। কবিশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ্ কবিরাজ গোস্বামী ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই এই সুবিশাল অমৃত-সিন্ধু মন্থনে সমর্থ হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজ উক্তি স্মরণীয়:

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ-রূপ-সনাতন॥'

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্যের অন্যতম এই 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বকালের শান্তিকামী মানবের নিকট চির আদরণীয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সুসংগ্রথিত এই দিব্যসাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নহে। বাংলা ভাষায় পয়ার-ত্রিপদী-ছন্দে লিখিত হইলেও উহার বিন্যাস-পারিপাট্য ও স্থানে স্থানে সুমার্জিত সংস্কৃত-বহুল ভাষার ভাব-গাম্ভীর্য জনসাধারণের নিকট কিঞ্চিৎ অসুবিধাকর সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা, বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র, বিষ্ণুপুরাণ, উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, কৃষ্ণকর্ণামৃত, হরিভক্তিবিলাস, বাল্মীকি-রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্ত, পদ্মপুরাণ, ললিতমাধব, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রপুরাণাদি হইতে অধিক পরিমাণে উদ্ধৃতি-প্রমাণাদির উল্লেখ থাকায় সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ বাস্তবিকই দুরধিগম্য।

সুতরাং এমন একখানি অমূল্য গ্রন্থের সহজ-সরল বাংলা গদ্যানুবাদের অভাব আমরা মনে-প্রাণে বোধ করিতেছিলাম। বড়ই আনন্দের কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিলং শাখার সম্পাদক শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় সাধকের নিষ্ঠা লইয়া এই শ্রমসাধ্য কার্যে হাত দিয়াছেন।

আলোচ্য পুস্তকখানি 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলা অংশের গদ্য সংস্করণ। আমরা আশায় থাকিলাম, সুযোগ্য লেখক অনুরূপভাবে মধ্য ও অন্ত্যলীলাভাগেরও গদ্য সংস্করণ শীঘ্রই দেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিবেন। সপ্তদশটি সুবিন্যস্ত পরিচ্ছেদ লইয়া এই আদি-লীলা। প্রকাশিত বর্তমান অংশের ভাষা অতি সুন্দর, সজীব ও সহজ হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহা মূল গ্রন্থের রসাস্বাদনে খুবই সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

'চরিতামৃত' গ্রন্থের মূল আদিলীলা অংশটিও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে বর্তমান পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাই-য়াছে এবং ইহা দ্বারা পাঠকের মূল গ্রন্থপাঠের আগ্রহও পরিতৃপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদ-পরিকল্পনায় সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মুদ্রণ-ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রচ্ছদের ভিতর ভাগে প্রথমে ও শেষদিকে, পুস্তকের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে এবং ইতস্ততঃ এত অধিক-সংখ্যক প্রশংসাপত্র ও অভিমত সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, উহাতে পুস্তকের আঙ্গিক সৌষ্ঠব কিছু লাঘব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। একই ব্যক্তির অভিমতকে বা একই প্রশংসা-লিপিকে পুস্তকের একাধিক স্থানে প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ, তাহার পরিচয় করাইবার জন্য এরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় সুপা-রিশের কি আবশ্যক, তাহা বুঝিলাম না।

যাহা হউক, শ্রীভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন, সন্দেহ নাই। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থের এই গদ্য সংস্করণ বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। —অজ্জানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুআরি) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৫তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর কর্মসূচী সহায়ে উদ্যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, দশাবতারের পূজা, ভোগারতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ণে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ বলেন, ঈশ্বরকে লাভ করাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং সকল ধর্মই সত্য, সাধন দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শন হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। মানব-কল্যাণের যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিলে জীবন আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

সকাল হইতে অগণিত নরনারী মঠে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১১,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয়। শেষ রাত্রে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ ২৩জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ১৭জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ৬ই মার্চ মহোৎসব-দিনে বেলুড়মঠ প্রাতঃকাল হইতেই এক অপরূপ মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন এবং সন্ধ্যায় বাজী পোড়ানো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে এক পশলা বৃষ্টি ও সারাদিন দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও সন্ধ্যার দিকে দর্শনার্থী সমাগম বৃদ্ধি পায়। প্রায় দুই লক্ষাধিক ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৩২ হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা): গত ২৮শে ফেব্রুআরি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৫তম জন্মতিথি উৎসব বহু ভক্তসমাবেশে মঙ্গলারতি পূজাহোম ভক্তসেবার মাধ্যমে মহা আনন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে সভায় শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিত মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠের পর কয়েক পৃষ্ঠা 'কথামৃত' পাঠ করেন। ডক্টর দত্ত মজুমদার (Administrator, New Capital) বলেন, ভক্তির ভিত্তিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে. সি. রায় (Secretary, Tribal and Rural Welfare Dept.) শ্রীরামকৃষ্ণকে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ রূপে বর্ণনা করেন।

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

ফরিদপুরঃ বিগত ২১শে জানুআরি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৮তম জন্মতিথি এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে মঙ্গল আরতি, ভজন, মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম এবং সন্ধ্যায় আরতি,

ভজন, কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, তৎপর স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে ছাত্রগণ প্রবন্ধ পাঠ করে।

২৯শে জানুআরি শুক্রবার অপরাহ্ণে জিলা জজ সাহেবের সভাপতিত্বে জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংক্ষেপে একটি ভাষণ দিলে পর সভাপতি তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর জীবনের বহুমুখী প্রতিভার মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

বিদ্যালয়-ভবন উদ্বোধন

সারগাছি: গত ২৩শে জানুআরি স্থানীয় আশ্রমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। পবিত্র ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয়-পরিদর্শক মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যালয়টির সাফল্য কামনা করেন। বিদ্যালয়-সংলগ্ন নবনির্মিত ছাত্রাবাসে ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর নির্দিষ্ট-সংখ্যক ছাত্র ভরতি করা হইবে।

পুরস্কার-বিতরণোৎসব

বেলুড় বিদ্যামন্দির: গত ২০শে ফেব্রুআরি শনিবার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সভামুখ্যের আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় লোকসভার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের বিশিষ্ট সদস্য খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। সভাগৃহে অভিভাবক, অধ্যাপক, গণ্যমান্য অতিথি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক সাধুব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ১৯৫৯-৬০ খৃঃ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি বলেন যে, এই বিদ্যায়তনের অধ্যয়নানুকূল শান্ত পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষকগণের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতিই এই অপূর্ব সাফল্যের প্রধান কারণ।

তদনন্তর বিদ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র তাহাদের সুনিপুণ আবৃত্তি ও সুললিত সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সভাপতি মহোদয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে 'শিক্ষা-দীক্ষা' কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া বলেন যে, বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণের কেবল পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ করিলেই চলিবে না। জীবন-তপস্যায় অকৃত্রিম সাধক হইতে গেলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অত্যুদার মহামন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত হইতে হইবে। মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের নিকট তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক নিবেদন জানাইয়া তিনি আরও বলেন—তাঁহারা যেন সুকুমারমতি মাণবকগণকে সত্যকার মানবপদবাচ্য করিয়া তোলেন। স্নেহভাজন ছাত্রগণ যাহাতে অহংকার-রহিত অন্তরে কর্মমার্গে বিচরণ করিতে পারে; সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে গীতার সাত্ত্বিক কর্তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন; কারণ স্থূল-'আমি'র চেতনাকে পরিহার করিতে না পারিলে জীবনের উন্মুক্ত উদার প্রান্তরে মানুষ কখনও আপনার সত্যরূপে বিকশিত হইতে পারে না। তাই তিনি নিঃশব্দ অনাড়ম্বর এবং আত্মপ্রচারণা হইতে বিমুক্ত কর্মসাধনাকেই মানুষের মহত্তম কৃত্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

পুরস্কার-বিতরণের পর ছাত্রদের সমবেত কণ্ঠে সমাপ্তি সঙ্গীত গীত হইলে বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটারী স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

স্বামী বিজয়ানন্দঃ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যস্থ বেদান্ত কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী বিজয়ানন্দ জানুআরি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালা শহরে একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে স্প্যানিস ভাষায় ছয়টি বক্তৃতা দেন। সরকারী বেতারে ভাষণগুলি প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বক্তৃতায় বেদান্তের উদার ভাব ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী স্থানীয় বহু ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরও সমাদর লাভ করে এবং তাঁহারা বক্তাকে অভিনন্দিত করেন। স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগত ধর্মালোচনার জন্যও প্রত্যহ অনেক নরনারী উপস্থিত হইতেন।

গত বৎসরের (১৯৫৯) মধ্যভাগে স্বামী বিজয়ানন্দ দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল রাজ্যে আড়াই মাস অবস্থান করিয়া রিও-দে-জেনেরিও এবং সাঁওপাওলো এই প্রধান শহরদ্বয়ে মোট ১৩টি বক্তৃতা এবং অনেকগুলি ছোট ছোট আলোচনা-সভা পরিচালনা করেন। ব্রেজিলে ধীরে ধীরে বেদান্তানুরাগী একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। ব্রেজিলের স্থানীয় পর্তুগীজ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের কয়েকখানি গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে।

বুয়েনেস আইরেস বেদান্ত কেন্দ্রটি শহর হইতে ২০ মাইল দূরে শান্ত পল্লীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। প্রতি রবিবারে এখানে শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে ভক্তেরা সমবেত হন এবং ধর্মালোচনা, পাঠ ও প্রশ্নোত্তর নির্বাহিত হয়। স্বামী বিজয়ানন্দ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন শহরে গিয়া দুইটি বক্তৃতা দিয়া থাকেন। এই বক্তৃতাগুলিতে গড়ে প্রায় ১০০ জন শ্রোতা হয়। সাক্ষাৎকার ও পত্রের মাধ্যমে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অন্যান্য দেশের বহু বেদান্তানুরাগী নরনারী স্বামী বিজয়ানন্দের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে ১২ খানি গ্রন্থ স্প্যানিস ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রেজিল ব্যতীত দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সব দেশেই কথ্য ও লেখ্য ভাষা স্প্যানিস।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

ডক্টর শ্যামাচরণ দেঃ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনমান্য ডক্টর শ্যামাচরণ দে মহাশয় গত ২৭শে ফেব্রুআরি ভোর ৫।টায় পূর্ণ ৯১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শেষ দুই মাস যাবৎ তিনি শয্যাগত ছিলেন। 'দে বাবা' নামে তিনি শিক্ষক ছাত্র ও বন্ধুমহলে এবং সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। ঋষিপ্রতিম চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রগণ সহ ৬০০০ নরনারী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণস্থিত তাঁহার বাসভবন হইতে হরিশ্চন্দ্র ঘাট পর্যন্ত শবানুগমন করেন।

ডক্টর অ্যানি বেসান্তের জনহিতকর কার্যে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি ১৯১৩ খৃঃ সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থা হইতেই ইহার

সর্ববিধ উন্নতির মূলে 'দে বাবা'র অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার স্মৃতি চির উজ্জ্বল থাকিবে। কলেরা ও বসন্ত রোগাক্রান্ত ছাত্রদের তিনি যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহাও আদর্শস্থানীয়।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার, সহাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ (Principal), সহ-উপাচার্য (Pro-Vice-Chancellor) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং সর্বত্র যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, ছাত্রগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। দীর্ঘকাল গণিতের অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়া তিনি কোন দিন বেতন গ্রহণ করেন নাই। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করেন। বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ও শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। উভয় আশ্রমেরই তিনি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন: আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ১২ই মার্চ প্রত্যূষে ৮২ বৎসর বয়সে বিশ্বভারতী সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় বর্ধমানে এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মরদেহ আনীত হয়, এবং আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রী, অনুরাগী আশ্রমবাসী ও জনসাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বারাণসীধামে জন্মলাভের পর ক্ষিতিমোহনের জীবনের প্রথমাংশ সেখানেই কাটে বহু পণ্ডিত ও সাধুর সংস্পর্শে। এই ভাবে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ও ভাষায় শিক্ষিত হইয়া উঠেন এবং সন্ত-মতের সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রেরণাতেই পশ্চিম ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা' (ইংরেজীতেও অনূদিত) গ্রন্থ রচনা করেন।

২৮ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি দেশের ও বঙ্গভাষার সেবা করেন। ১৯৫৩ খৃঃ তিনি বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তিনি বিদ্যা-ভবনের (গবেষণা বিভাগের) অধ্যক্ষ ছিলেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে বিশ্বভারতী তাঁহাকে দেশিকোত্তম (D. Litt.) উপাধিতে ভূষিত করে।

'মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার ধারা' ভিন্ন 'বাউল ধর্মের মর্মকথা', 'কবীর', 'দাদু' প্রভৃতি তাঁহার চিরস্মরণীয় গ্রন্থ। তাঁহার তিরোভাবে সাহিত্য ও সাধনার জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণীয় নয়। পরলোকগত এই মহান্ আত্মার শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তকর্মী কৈলাসচন্দ্র সেন: পুরী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের পরম হিতৈষী নিরলস কর্মী ও বিশিষ্ট ভক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৪শে জানুআরি ৭৮ বৎসর বয়সে রাত্রি ২॥টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

কটক জেলার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে কৈলাসচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পুরী কালেক্টরী দপ্তরে যোগদান করেন। কর্মকুশলতায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) রূপে ১৯৪১ খৃঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৪০ খৃঃ পুরী রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বিধবা আশ্রম ও গ্রন্থাগারের সম্পাদকরূপে কার্য-ভার গ্রহণ করিয়া ১৯৪৬ খৃঃ হইতে তিনি শুধু গ্রন্থাগারের গুরু দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

সাহিত্যানুরাগী, অধ্যয়নশীল কৈলাসচন্দ্র ওড়িয়া ভাষায় পদ্যছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী 'লীলামৃত' নামে একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ওড়িয়া ভাষায় তাঁহার 'গীতামৃত' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের ধারা-বাহিক দিনপঞ্জী) এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা', 'ভারত পুণ্যভূমি', 'বেদান্তের বার্তা' প্রভৃতি ভাষণের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এইরূপ একজন কৃতী পুরুষের তিরো-ধানে ঐ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা

বারাসত : গত ২রা মার্চ প্রাতে ৮॥ টায় বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহা-রাজ শিবানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১০৫ বৎসর পূর্বে বারাসত শহরের শেঠপুকুর অঞ্চলের যেস্থানে স্বামী শিবানন্দ ভূমিষ্ঠ হন, সেই স্থানেই স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইবে। এই শুভ অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং কলিকাতা ও বারাসতের বহু ভক্ত নরনারী যোগদান করেন।

যথারীতি অনুষ্ঠানসহ ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনকার্য সমাপ্ত হইবার পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ মর্মস্পর্শী ভাষায় সমবেত সাধু ও ভক্তগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, '১৯০৭ খৃঃ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি, কি কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করছিলেন! বাঘ-ছালের উপর শুতেন, সারারাত ধ্যান-ভজন তপস্যায় তন্ময় থাকতেন। অদ্বৈত আশ্রমে তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভোগ নিবেদন হ'ত—স্বামীজীর উদ্দেশে ভোগ নিবেদন এই প্রথম দেখি। মহাপুরুষ মহারাজের কঠোর তপস্যাপূত গম্ভীর ব্যক্তিত্বের কাছে দাঁড়াতে ভয় হ'ত, কিন্তু তিনি যখন ডেকে কথাবার্তা বলতেন, তখন দেখতাম প্রেমে ভরপুর মহাপুরুষ। শেষজীবনে (১৯৩২) দেখেছি কঠোর ভাব চলে গেছে—ঠাকুর-মা-ময় হ'য়ে গেছেন। ঠাকুর ও মা তাঁর মধ্যে যেন বসে কাজ করছেন। বলতেন—ঠাকুরের দরজায় পড়ে আছি তাঁর কুকুর হ'য়ে, দাস হ'য়ে। এই পূর্ণ আত্মসমর্পণ-যোগই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।' স্বামী গম্ভীরানন্দও মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের কথা বলেন।

কৃষ্টিসংবাদ

আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা : সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ-বিধায়ক ভারতীয় সংসদের (Indian Council for Cultural Relation) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়া বিশ্ববিখ্যাত লেখক অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী নয়া দিল্লীতে 'বিশ্ব-ঐক্য' বিষয়বস্তু লইয়া নিম্ন-লিখিত তিনটি বক্তৃতা দিয়াছেন :

(১) Need for World Unity.
(২) Movement towards World Unity.
(৩) India's contribution to World Unity.

তাঁহার বক্তৃতাগুলির সার মর্ম : ধ্বংসোন্মুখ আণবিক যুগে মানবসমাজের আত্মরক্ষার জন্যই আজ বিশ্ব-ঐক্য প্রয়োজন। বর্তমানে মানুষ যতটা বিপন্ন, এতটা বিপন্ন সে কখনও হয় নাই। বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-বলে মানুষ বন্যজন্তু বা রোগজীবাণুকে জয় করিয়াছে; কিন্তু আজ মানুষের পরম শত্রু যুদ্ধোন্মাদ মানুষ নিজে। যুদ্ধ বাতিল করিতে হইলে সারা পৃথিবীতে একটি কল্যাণশাসন প্রয়োজন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ অশোকের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পারিলে তবেই বিশ্ব-ঐক্য সম্ভব। এ বিষয়ে ভার-তের এক মহান্ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব রহিয়াছে।

কোথায় আলো ?

কিং জ্যোতিস্তব ভানুমানহনি মে রাত্রৌ প্রদীপাদিকং
স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধৌ কিং জ্যোতিরাখ্যাহি মে।
চক্ষুস্তস্য নিমীলনাদিসময়ে কিং ধীর্ধিয়ো দর্শনে
কিং তত্রাহমতো ভবান্ পরমকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো! ॥

[শ্রীশঙ্করাচার্য-বিরচিতা একশ্লোকী]

গুরু-শিষ্য-সংবাদ মাধ্যমে (গুরুর প্রশ্ন ও শিষ্যের উত্তরচ্ছলে) আচার্য শংকর একটি মাত্র শ্লোকে চরম জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন :

গুরু—বৎস, দিনে তুমি কাহার সাহায্যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ কর ?
রাত্রিতেই বা কে সর্বপ্রকাশক ?

শিষ্য—দিবসে সূর্য, এবং রাত্রিতে চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি।

গুরু—বেশ, এবার বলো—সূর্য, দীপ প্রভৃতি কাহার সাহায্যে দেখ ?

শিষ্য—চক্ষুর সাহায্যে।

গুরু—যখন চক্ষু মুদ্রিত কর, যখন বহিরিন্দ্রিয় উপরত,
তখন কিসের সাহায্যে অনুভূতি হয় ?

শিষ্য—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির সাহায্যে।

গুরু—বুদ্ধির সাক্ষী কে ? বুদ্ধি যে আছে এবং কাজ করিতেছে—একথা কে বুঝাইয়া দেয় ?

শিষ্য—বুদ্ধি আত্মজ্যোতিতেই প্রকাশিত, উদ্‌ভাসিত। বুদ্ধিকে অনুভব করিতে আত্মাই সমর্থ!
গুরুদেব, আপনি সেই পরমজ্যোতি আত্মস্বরূপ, শুদ্ধ আমিও সেই পরমজ্যোতিস্বরূপ!

কথাপ্রসঙ্গে

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে

এ বৎসর Indian Council for Cultural Relation (সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিধায়ক ভারতীয় সংসদ)-এর উদ্যোগে দিল্লীতে আজাদ-স্মৃতি-বক্তৃতা দিতে অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবীকে আমন্ত্রণ করা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, বিশ্বপরিস্থিতির এ সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁহার ভারতে আগমন এবং তাঁহার ভাষণটিও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ;—রাজনীতির দিক দিয়া না হইলেও কৃষ্টি ও ইতিহাস বুঝিবার দিক দিয়া।

যে দেশ মাত্র কিছুদিন পূর্বে বৃটেনের পরাধীন ছিল, সেই ভারতের পক্ষে একজন বৃটিশ ঐতিহাসিককে এভাবে আহ্বান করা খুবই মহত্ত্বের পরিচয়, একথা স্বয়ং টয়েনবী স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—ইহা সম্ভব হওয়ার আর একটি কারণ, উভয় দেশ বোঝাপড়া করিয়া সময়ের উপযোগী রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তাহাতেই পূর্বের বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত।

ভারত টয়েনবীর মুখে কি শুনিতে চাহিয়াছিল?—বিশ্ব-ইতিহাসে ভারতের স্থান কোথায়, বিশেষতঃ সমসাময়িক ইতিহাসে। টয়েনবীও তাঁহার তিনটি বক্তৃতায় সুবিস্তৃতভাবে না হইলেও সুবিন্যস্তভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন, বিশ্বপরিস্থিতির পটভূমিকায় বর্তমান ভারতের কর্তব্য নির্ণয়ও তিনি করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের তৃতীয় নয়ন দিয়া তিনি ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন:

(১) আণবিক যুগে যুদ্ধ অসম্ভব; যুদ্ধ হইলে উহা সমগ্র মানবজাতিকে ধ্বংস করিবে।

(২) যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে প্রয়োজন—জাতীয়তাবোধ নয়, বিশ্ব-ঐক্য—অশোকের ভাবে অনুপ্রাণিত আন্তর্জাতিক মৈত্রী।

(৩) শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহা মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(৪) ভারত আজ আক্রান্ত না হইলেও বিপন্ন, তবু এই বিপন্ন ভারতই স্বীয় আচরণ দ্বারা জগতে শান্তির আদর্শ স্থাপন করিতে পারিবে।

(৫) ভারতেই বিশ্বের সকল সমস্যা পুঞ্জীভূত আছে; এবং সমাধানও এখানে পূর্ব পূর্ব যুগে হইয়াছে, আবার হইবে।

*   *   *

টয়েনবীর ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিবার পূর্বে দেখা যাক—তাঁহার এরূপ বলিবার কিরূপ কি অধিকার আছে। টয়েনবী ইতিহাসের শুধু অধ্যাপকই নন, আজীবন ইতিহাসের ছাত্র। গত ৩৮ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১০টি খণ্ডে যে বিরাট গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন 'A Study of History' (ইতিহাস অধ্যয়ন)। এ ইতিহাস কোন দেশের নয়, কোন বিশেষ জাতির নয়, এ ইতিহাস মানুষের ইতিহাস—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, তাহার উত্থান-পতনের ইতিহাস—মহাকাব্যের মতো মনোরম, মহাকাব্যেরই মতো ইহা বেদনায় ভরা। সভ্যতার স্তরে স্তরে ৬,০০০ বৎসরের ইতিহাস তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিত হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই বড়, কিন্তু মনীষী হিসাবে আরও বড়। কত সন্দেহ তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, কত পুরাতন বিশ্বাস অস্বীকার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, কত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, কত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও বলেন নাই—এই শেষ কথা। অনাসক্ত তন্ময়তা তাঁহার রচনার সৌন্দর্য ও মাধুর্য। তাই আজ টয়েনবীকে বাদ দিয়া ইতিহাস অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ।

টয়েনবী বাহির হইয়াছেন—সত্যের সন্ধানে, তত্ত্বের সন্ধানে; পূর্ববর্তী যুগের ঐতিহাসিকদের মতো কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্যের সন্ধানে নয়। তিনি মনে করেন না—কুম্ভকার মৃত্তিকার ক্রীতদাস, তিনি মনে করেন—কুম্ভকার মৃত্তিকাকে রূপ দিবে। তাঁহার অগ্রগতি অতি ধীরে, কিন্তু ধ্রুব। তাঁহার ইতিহাস-রচনা মানব-কেন্দ্রিক। তাঁহার মতে ইজিপ্ট শুধু নীলনদেরই দান নয়, ইজিপ্ট মানুষেরও দান। মানুষের পরিশ্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছিল নীলনদের সভ্যতা, শুধু নীলনদের কেন, সকল সভ্যতাই—কি নদী উপত্যকায়, কি পার্বত্য অধিত্যকায়, কি দ্বীপমালায়!

মানুষের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বস্তুনির্ভর জড়বিজ্ঞানেরও কত নিয়ম পরিবর্তিত হইতেছে, তখন ব্যক্তি-নির্ভর মানবসমাজের নিয়ম পরিবর্তিত হইবে না কেন? এই পরিবর্তন ও বিবর্তনই তো মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। এক এক যুগে এক এক ভাব প্রবল হইয়াছে, কিছুদিন উহা মানব-মনে রাজত্ব করিয়াছে, মানবসমাজ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; কিছুদিন পরে আর এক প্রকার মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এক সময় মনে করা হইত ক্রীতদাস-প্রথা সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ; আজ মানুষ প্রশ্ন করে—ঐ প্রথা সত্যই কখনও সভ্যসমাজে ছিল কি না, থাকিলেও কি ভাবে ছিল!

বর্তমান পৃথিবীতে দুইটি ভাব রাজত্ব করিতেছে:

(১) শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি,

(২) রাজনীতিক গণতন্ত্র।

আমরা এই দুই ভাবের প্রভাবে বাস করিতেছি।

'শিল্প ইতিহাসকে রূপ দিতেছে'—ইহা এ যুগের ভ্রান্ত ধারণা। শিল্পের কাজ মানুষের সঙ্গে জড় পদার্থের কি সম্বন্ধ তাই স্থির করা। ইতিহাসের কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি—একটা শাশ্বত সত্য নয়।

ভাবের দিক হইতে স্বায়ত্ত শাসন, জাতীয়তা, গণতন্ত্র প্রভৃতি আদিম মানবের গোষ্ঠীভাবের পুরাতন আধারে নূতন সুরা,—'a sour ferment of the new wine of democracy in an old bottle of tribalism.'

তাই টয়েনবী বলেন: ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে—রাষ্ট্র ও রাজনীতির নয়, সমাজ ও কৃষ্টির; শুধু তথ্য সংগ্রহ করিয়া নয় একটি ব্যাপক নিয়ম অনুসন্ধান করিয়া। ইতিহাস স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করিবে না, জীবনের পথ আলোকিত করিবে।

কোন দেশের ইতিহাস একটি যুগে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধ্যয়ন করা যায় না,—পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ এবং আগে-পাছে যুগসমূহ আপনা হইতেই আসিয়া যায়। অতএব দেশ ও কালের আয়ত ক্ষেত্রে (extended in time and space) ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে তবেই 'মানুষে'র রূপান্তর চোখে পড়িবে। কি ভাবে আদিম অমানব বা অর্ধমানব মানবে, এবং সামাজিক মানব অতিমানব বা মহামানবে রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার কাহিনীই তো ইতিহাস। সমাজের পটভূমিকায় এই রূপান্তর ঘটিতেছে, তাই মানুষের ইতিহাস মানে সমাজের ইতিহাস, কৃষ্টির ইতিহাস। সমাজ ও কৃষ্টি গড়িতেছে ভাঙিতেছে, ঘাত-প্রতিঘাতে রূপান্তরিত হইতেছে, বহিরাগত শক্তির আঘাতে তাহার গতিও পরিবর্তিত হইতেছে!

সভ্যতা কিভাবে কোথায় কখন আরম্ভ হইল, কেন মানুষ ৩,০০,০০০ বৎসর আদিম অবস্থায় ছিল, কেন গত ৬,০০০ বৎসরেই সভ্যতা এত বিচিত্র রূপে রূপায়িত হইয়াছে—টয়েনবী এ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে মানব-মনের জড়তাই তাহার

উন্নতির পথ আটকাইয়া ছিল। কিন্তু কি সেই অজ্ঞাত শক্তি যাহার প্রেরণায় মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে? সে শক্তি ঈশ্বরের না শয়তানের? —দেবতার না অসুরের? সে কি কোন বিশেষ রক্তের (race) শক্তি, না পরিবেশের (environment) প্রভাব? হয়তো বিভিন্ন শক্তির টানাপোড়েনেই মানবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাহারও মতে যখন ও যেখানে জীবন সচ্ছল থাকে, তখন ও সেখানে সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া উঠে। টয়েনবী একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'Ease is inimical to civilisation.' আরাম কখনও সভ্যতার প্রেরণা দেয় না, আরাম সভ্যতার শত্রু। শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়িয়া উঠে প্রজ্ঞার আলোকে। সকল সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয় না, অনেক সভ্যতা মধ্য পথেই থামিয়া যায়। কত সভ্যতা ভাঙিয়া যায়, লুপ্ত হয়। পরিবেশ জয় করিয়াই সভ্যতা গড়িয়া উঠে, এই জয়ের মধ্যেই আছে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব। সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় উন্নত-তর যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা অনুন্নত মানুষদের সহিত ক্রীতদাসের মতো আচরণ। ইহাই বিজেতা ও বিজিত—উভয়ের পতন সূচনা করে।

টয়েনবীর সিদ্ধান্ত: উন্নতির জন্য প্রয়োজন—অন্তর্নিহিত শক্তির মুক্তি, এবং বাহির হইতে ভিতরের দিকে অভিযান—আত্মবিকাশের সাধনা। 'It is human individuals......that make human history'—ব্যক্তি-মানবই মানুষের ইতিহাস রচনা করে। এই ব্যক্তিমানব মহামানব। সভ্যতা তাই সৃজনশীল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কীর্তি।

এই সৃজনশীল ব্যক্তি প্রথমে সমাজ হইতে দূরে চলিয়া যান, শক্তি সঞ্চয় করিয়া নিজে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসেন, এবং সমাজকে রূপান্তরিত করেন। ইতিহাসে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি বহুবার হইয়াছে এবং হইবে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ ও গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনে এই সত্য প্রমাণিত।

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা একদিন এক শ্রেণীর মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছে, আবার আর এক শ্রেণীর মানুষকে স্তম্ভিত করিয়াছে, তাঁহারা অপেক্ষায় ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যার; সে ব্যাখ্যা আজও হয়তো আসে নাই। তবে টয়েনবী ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেই আমরা বুঝিতে শুরু করিয়াছি—ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা বা যে কেন মতানুযায়ী ব্যাখ্যা আংশিক সত্য, অন্ধের হাতী-দর্শনের ন্যায়। যে কোন মতবাদ অপেক্ষা মানুষ বড়, মানুষই প্রয়োজনের খাতিরে মতবাদের বেড়া বাঁধে। প্রয়োজন ফুরাইলে মানুষই জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া দেয়, যদি না ইতিমধ্যে সে বেড়া নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে।

* * *

ঐতিহাসিকের এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিরন্তন 'মানুষ'কে বুঝিতে হইবে, তবেই আমরা পারিব তাহার বর্তমান সমস্যাগুলির স্বরূপ বুঝিতে ও তাহার সমাধান করিতে। মানুষ যুগে যুগে বিপন্ন হইয়াছে, এবং যুগে যুগে সে নিজেকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। মহাবন্যা (deluge) তুষার-বিস্তার (glacial extension) প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই; বন্যজন্তু এবং রোগ-মহামারীর সহিত সংগ্রামেও মানুষ জয়ী হইয়াছে, কিন্তু আজ মানুষের সর্বনাশা বিপদ উপস্থিত মানুষ হইতেই! অতীতে বহু বার দেখা গিয়াছে —অনুরূপ বিপদ হইতে মানুষ নিজেকে রক্ষা করিবার শক্তি ও বুদ্ধি লাভ করিয়াছে শেষ মুহূর্তে, এবারও তাহাই হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই যুগের নূতন বিপদ আণবিক শক্তিজাত অস্ত্র-শস্ত্র! এই দ্বিমুখী সংহার-শক্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ভুলিতে

হইবে, মানব-জাতিকে এক ও অখণ্ডভাবে দেখিয়া সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। স্থানীয় সীমাবদ্ধ দেশপ্রেমের পরিবর্তে আজ বিশ্বমৈত্রীর কথা ভাবিতে হইবে, তবেই এক বিশ্ব-শাসন-সংস্থার মাধ্যমে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। উহাকে পারস্পরিক ধ্বংসে ব্যয়িত না করিয়া সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করিতে হইবে।

কিন্তু কিভাবে? ইহা কি জোর করিয়া, এবং আর এক ঊর্ধ্বতন শক্তিশালী সামরিক একনায়কত্বের মাধ্যমে, না যথার্থ কল্যাণবোধের প্রেরণায়? এই কল্যাণবোধ জাগ্রত করিতে হইলে প্রয়োজন রাজর্ষি অশোকের মনোভাব, যিনি যুদ্ধের ব্যর্থতা বুঝিয়া স্বীয় বিপুল রাজশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন মানুষের মন হইতে অনিষ্টসাধনবৃত্তি দূরীভূত করিয়া বিশ্বব্যাপী এক মৈত্রীভাব প্রচার করিতে; সে প্রচারে ছিল না কাহারও প্রতি ঈর্ষা বা অভিযোগ, সে প্রচারে ছিল শুধু করুণার বার্তা, আর ছিল তাহারই সহায়ে উন্নততর মানুষ হইবার আবেদন। একদিন যে মৈত্রী-করুণার বাণী এশিয়াতে প্রচারিত হইয়াছিল, আজ তাহাই ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে আচরিত হইবার দিন আসিয়াছে।

আমরা যদি আজ যুদ্ধকে শেষ না করি, যুদ্ধই আমাদিগকে শেষ করিবে। এই সেদিন যেমন মানুষ ক্রীতদাস-প্রথা দূরীভূত করিয়াছে, এখনও বর্ণ-বিদ্বেষ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই প্রকার উদ্যম ও আদর্শবাদ লইয়া আজ যুদ্ধ দূরীভূত করিতে হইবে। যুদ্ধ ব্যতীত যে সীমান্ত-সমস্যার সমাধান সম্ভব—সে আদর্শ অভিজ্ঞ ভারতবর্ষই দেখাইবে, টয়েনবী এইরূপ আশা পোষণ করেন। ভারত যদি এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতে না পারে, তবে পৃথিবীর দুর্দিন এবং সভ্যতা পিছাইয়া যাইবে। এই আণবিক যুগের পৃথিবীতে ভারতের উপর এক গুরু দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, অন্য কোন দেশ বা জাতি এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম।

একদা ছিল প্রতিবেশীর গরু বাগানে প্রবেশ করিলে হত্যাকাণ্ড বাধিয়া যাইত, গ্রামের লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিত। একদিন ছিল উহা বীরত্ব, আজ উহা অপরাধ। আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের ব্যবহার আজ অনুরূপ দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন—কেন্দ্রীয় শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক কোন বিশ্ব-শাসন-ব্যবস্থা, যাহার দরবারে উভয় পক্ষের অভিযোগ শ্রুত হইবে এবং যাহার বিচার উভয়েই মানিতে বাধ্য থাকিবে। এইরূপ প্রচেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু আদর্শ হইতে তাহা এখনও অনেক দূরে। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপরই আগামী যুগের শান্তি নির্ভর করিতেছে। লীগ অব নেশনস্ ব্যর্থ হইয়াছে, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ (U.N.O.) টলমল করিতেছে;—ইহাকেই কি বিশ্ব-শাসন-ব্যবস্থায় (World Government) রূপান্তরিত করা সম্ভব? না বিশালতর ভিত্তির উপর—উদারতর নীতির উপর সেই কল্যাণ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে?

জীবনের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ভারতবর্ষ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বদ্রষ্টা ভারতীয় মনীষা, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘাত-প্রতিঘাত হইতে সগৌরবে উত্তীর্ণ ভারতীয় জনতা স্বীয় অভিজ্ঞতা দিয়া সাধনা দিয়া আজ পৃথিবীর এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

শুধু ভূগোলের দিক দিয়াই ভারত পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, ভাব-জগতেও ভারত আজ দুই বিরোধী বিবদমান ভাবের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান; তাহারই হস্তে ভবিষ্যতের শক্তির তুলাদণ্ড (balance of power) দোদুল্যমান।

চলার পথে

'যাত্রী'

সামনেই ঈষ্টার। ক্রুশে মৃত্যুর পর তিন দিন কবরে থেকে, নবজীবনের দীপ্তি নিয়ে যীশু সেই মৃত্যুময় অন্ধকার কবর থেকে এই সময়েই উঠে এসেছিলেন, পৃথিবীতে আত্মার অমরত্ব ঘোষণা করতে। যীশু-জীবনের সেই ঘটনাকে ঘিরেই আজ মনে নানান কথার 'ফুট' উঠছে।

প্রতিটি খৃষ্ট-ধর্ম মন্দিরেই ঐ তিন দিন ধ'রে নানান আনুষ্ঠানিক উৎসবের বান ডাকে। এবং শেষের দিন রাত্রিশেষে, বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর চার্চ-বেদীর বামদিকে রক্ষিত প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ মোমবাতিটি জালিয়ে দেওয়া হয়। এই মোমবাতিটি পুনরুত্থিত খৃষ্টের আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতার প্রতীক। মোমবাতিটি প্রজ্বলিত হওয়ার পরেই চার্চের পুরোহিতগণের সমবেত কণ্ঠে যে গীত অনুরণিত হ'য়ে ওঠে তা একদিক থেকে যেমন করুণ, অন্যদিক থেকে তা আবার ভাবব্যঞ্জক ও প্রাণস্পর্শী। গানটির মর্মার্থঃ 'জাগো, ওগো স্বর্গের দূতবৃন্দ! ওঠ, আনন্দ কর। তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত ঐ আধ্যাত্মিক রহস্যময়তাকে আহ্বান জানাও। দেখ, ঐ মহাবিজয়ী রাজা (যীশুখৃষ্ট) এসেছেন। ভেরীনিনাদে তাঁর মুক্তির বার্তা দিকে দিকে প্রচার কর। হে পৃথিবী, তোমার কি সৌভাগ্য! তুমি এখন এক উজ্জ্বল স্বর্গীয় দ্যুতিতে অবগাহন করতে পারছ। এখন তো তোমার আনন্দে অধীর হ'য়ে ওঠার কথা। হে পৃথিবী, দেখ দেখ, ঐ আলোর রাজা তোমাকে কেমন এক ভাস্বর আলোকে স্নান করিয়ে দিয়েছেন। ওগো পৃথিবী, তুমি বিশ্বাস করো—আজ থেকে মানব-মনের সকল অন্ধকারই হবে দূরীভূত।' * * * এর পরেও সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক কার্যাদির পর সকলে যখন চার্চের বাইরে আসেন, তখন দেখতে পান, বসন্তের হাস্যময় সূর্য পৃথিবীর সকল অশুচি মুছিয়ে তাকে জ্যোতির বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারের পর হঠাৎ এই আলোর পরশে প্রত্যেকের মনটিই এক অন্তর্মুখী ভাবব্যঞ্জনায় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

মৃত্যুর পরেও যীশুর এই পুনরুত্থান—অনেক বাস্তববাদীই 'আজগুবি' ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু তা চাওয়ার আগে, এ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। অন্ধের মৃগয়া গমনের মতো এক নিছক অলীকত্ব দিয়ে এ তৈরী হয়নি। এর মধ্যে সত্যই লুকিয়ে রয়েছে—জীবনের একটি নিখুঁত ছবি, যা জীবনের সত্যকার রহস্যকে প্রকাশ ক'রে তোলে।

গাছে বীজ হ'ল, পাকল, এক সময়ে তা আবার পৃথিবীর বুকে ঝরেও পড়ল। এবং সেখানে মাটির কবরে প্রবেশ ক'রে মৃত্যুর আবেশ মেখে তা ঘুমিয়ে রইল কিছুদিন। কিন্তু সে কি সত্যই ঘুম? তার মাঝে কি সত্যই সমাপ্তি ধ্বনিত হ'ল? তা তো নয়। সেই বীজের আবার ঘুম ভাঙে। সে আবার উত্থিত হয়। ফুলে ফলে পত্রে সে তার সবুজের ডালি সাজিয়ে দিয়ে, আমাদের চোখের সুমুখেই তার জীবনতরঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিকশিত হয়—সে আবার বাঁচে। চিরকালের এই রূপকটিকেই মানুষ আবহমান কাল ধ'রে নানান প্রতীক দিয়ে সাজিয়েছে—ধর্মের রাজত্বেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

নদীর জীবনেতিহাসও তাই। সে তার পর্বত-কেন্দ্রে জন্ম নিয়ে তার সকল জলভার সাগরের বুকে মিশিয়ে দিতে ছুটে এল। সে তার চলার পথের চারিদিকে, উষর মাটিতে সবুজের প্রাণ স্পন্দন দিল জাগিয়ে। তার পরে বহু-ব্যাকুলতায় একদিন সাগরে এসে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দিল। এইখানেই কি তার পরিসমাপ্তি? এইখানেই কি ঘটল মৃত্যু? তা তো নয়। নদীর এই বিলিয়ে-দেওয়া জলভারই একদিন আবার সূক্ষ্মদেহে বাষ্পাকারে হ'ল পুনরুত্থিত এবং তা মেঘের ভেলায় ভেসে এসে নদীর সকল অবদানকেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল নদীর উৎস-মুখের সেই পর্বত-পিতাকেই।

প্রজাপতিও তার স্বাধীনতার রঙীন ডানা মেলার পূর্বে, কীটাবস্থায় অনেক দিন ধ'রে জড়ত্বের মৃত্যুময় নিস্পন্দতায় ডুবে থাকে। তার সেই মৃত্যু-ঘুমই একদিন জীবনের প্রাণোচ্ছলতায় উপছে পড়ে। আরও কত প্রাণী তাদের শীত-ঘুমের মাঝে মৃত্যুর নির্জীবতা টেনে আনে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাদের ঘুম ভাঙে—কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাদের ঐ কিছুদিনের নিষ্ক্রিয়তাই প্রাণ-প্রাচুর্যের শক্তি জোগায়। নিস্পন্দ ডিম্ব-কবর থেকেই একদিন জীব তার প্রাণময়তাকে আবিষ্কার করে। এই ভাবে সর্বত্রই শ্রম-বিশ্রামের, জীবন-মরণের তরঙ্গায়িত উত্থানপতনের নয়নাভিরাম লীলা।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বাসেও এই ভাবটি স্থান পেয়েছে। সেখানেও শক্তির দুটো রূপ—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। একই শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আপাত মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে তখন তাকে আমরা বলি নিহিত শক্তি (potential energy)। সেইটেই আবার একসময়ে স্পন্দনোন্মাদনায় নেচে ওঠে। তখন আর থাকে না কোন মৃত্যুর ইঙ্গিত, মরণের ছায়া। তখন সে জীবন্ত! কর্মমুখর। দামাল ছেলের ছিটকে পড়া শক্তিতে ভরপুর—সে তখন সক্রিয় শক্তি (kinetic energy)। শক্তির এই আপাত মৃত্যুরূপ এইভাবেই প্রাণের আহ্বানে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

আলোহীন অন্ধকূপেই আমরা চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুতের প্রখর আলোক সৃষ্টি করি। নিষ্প্রাণ কাঠের সঙ্গে কাঠ ঘষেই একদিন প্রাগৈতিহাসিক মানব অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তুলেছিল জাগিয়ে। শুধু তাই নয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আলো-আঁধারের চিরন্তন লীলার পথেই—জীবনমৃত্যুর চিহ্নিত পথেই সৃষ্টি-চক্র চলেছে আগিয়ে। শীতের ঝরাপাতার পরে ঐ পত্রহীন মৃত্যুঘেরা শুষ্ক ডালেই আবার বসন্তের ছোঁয়া লাগে। পাতা গজায়। ফুল ধরে। ফল পাকে। পাখী আসে, গান গায়।—এক কথায় জীবন-সৌন্দর্যের ঝলক লাগে।

এই ভাবেই মৃত্যুর পরেও নবজীবন নিয়ে বেঁচে উঠতে দেখি যীশুকে। তাঁরও আগে ওসিরিস্‌কে (Osiris), র-কে (Ra), তাম্মুজকে (Tammuz), এ্যাডনিসকে (Adonis), তারপর এদেশেও দেখি নচিকেতা ফিরে আসছে যমলোক থেকে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ী। কাব্যে ও সাহিত্যে দেখি ফিনিকস্ (Phœnix) পাখি মৃত্যু-ভস্ম থেকে দুঃসাহসিক অন্বেষা নিয়ে জেগে ওঠে। জীবন-মৃত্যুর এই অনন্ত চক্রে আমরা অমরত্বকেই স্বীকার করি। আধ্যাত্মিকতার রাজ্যেও জীবনের জয়গান সর্বাগ্রে। সেখানে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী, সেখানে মৃত্যু নেই—থেমে যাওয়া নেই। আছে কেবল, চলা আর চলা—'চরৈবেতি।'

চল পথিক। আমরাও মৃত্যুর নিস্পন্দতাকে অস্বীকার ক'রে আমাদের মধ্যকার সেই অনন্ত জীবনকে করি জাগ্রত। আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যকে খুঁজে বার করি চল। জড়ত্বের কবর ভেঙে আমরাও চৈতন্যের আলোকে জেগে উঠি চল। চল—সেই জাগরণের অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরাকালের ঋষিদের মতো বলি—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে আমি দেখেছি। অন্ধকারের পরপারে সেই জ্যোতির্ময় মহান আত্মাকে আমি জেনেছি। চল পথিক! মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই অমরত্বকে পাবার আগ্রহে এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

গাহি বুদ্ধের জয়

ব্রহ্মচারী সারদাচৈতন্য

মানুষের লাগি মানুষের ঘরে
এসেছিলে মহাপ্রাণ!
রাজসুখ তুমি তুচ্ছ করিলে
লভিতে চরম জ্ঞান।

জরা মৃত্যু ও ব্যাধির কবলে
দিন দিন মরে যারা,
শুনালে তাদের নির্বাণ কিসে,
মুক্তি লভিল তারা।

দুঃখ-সুখের কারায় যাদের
জীবন কাটিয়া যায়,
তোমার অভয়-মন্ত্রে তাহারা
নির্বাণ পানে ধায়।

দেশে ও বিদেশে ধ্বনিল তোমার
মৈত্রীপ্রীতির বাণী।
পূজিল তোমারে প্রজাসাধারণ
পূজিল রাজা ও রাণী।

অমৃতত্বের সন্ধান দিলে
মর্ত্য মানবগণে,
দেবতার চেয়ে উচ্চ আসন
পেয়েছ তাদের মনে।

লক্ষ লক্ষ ভক্ত আজিকে
গাহিছে তোমার জয়।
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহি বুদ্ধের জয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনিবার্য কারণে 'শঙ্করের নিগুর্ণব্রহ্মবাদ' প্রবন্ধের শেষাংশ বর্তমানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। উঃ সঃ।

নববর্ষে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আপ্তপুরুষেরা ডাকে বন্ধু ! মহাপুরুষের মনে,
শ্রেয়কে আশ্রয় করি' সূর্যোদয় হের চিত্তাকাশে।
দূর কোন্ দিগন্তের পার হ'তে দৈবী সুর আসে,
তাহারি ঝঙ্কার ওঠে দিকে দিকে নব জাগরণে।
আবির্ভাব লগ্ন কার ? শুভ বার্তা ল'য়ে শঙ্খ বাজে,
মহত্তম জীবনের সম্ভাবনা-বীজ হের কাছে।

মৃত্যুর তোরণদ্বারে অমৃতের এসেছে আহ্বান,
বর্ষের প্রথম দিনে আনন্দের সমারোহে নব।
প্রাণময় রহস্যের আবরণ খুলে শক্তি লব,
সংসার-তরঙ্গ দোলে, এসো বন্ধু ! করি তীর্থস্নান।
অন্তরের দুর্বলতা হোক নির্বাসিত—মন মুখ
করো এক, ভাগবত সাধনায় পেতে দাও বুক।

আগামী দিনের নীড়ে যে বিহগ বসিবে একদা,
তাহারি কূজনধ্বনি কোথা যেন শুনিয়া সহসা
স্বতন্ত্র হয়েছে মন ! যন্ত্রযুগে পরম ভরসা
অগ্নিযজ্ঞে প্রেমাহুতি, 'কথামৃত' হৃদে রাখি সদা।
জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব—ভস্মাবৃত রণবহ্নি রহে,
তারি মাঝে রামকৃষ্ণ-করুণার ফল্গুস্রোত বহে।

ঔদ্ধত্যের পথে পথে দীন ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু
মাধুকরী করিছে প্রেমের, জীর্ণ কটিবাস পরি' ;
ঐশ্বর্যেরে করিয়া কাঙাল নিখিলের অধীশ্বরী
লীলাসহচরী গুণ্ঠিতা ব্রাহ্মণীরূপে ! কবি তবু
চেয়ে আছ বিশ্ব পানে নববর্ষে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ?
আনন্দে বন্দনা গাও আজিকার নূতন সৃষ্টিতে।

করুণাঘন অমিতাভ

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

আড়াই হাজার বছরেরও সামান্য কিছু বেশি হ'ল—এই ভারতেরই একটি কোণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ। সেদিন ছিল বৈশাখমাসের পূর্ণিমা। লুম্বিনী বনে পাদচারণা করছিলেন পূর্ণ-গর্ভা মায়াদেবী; সেইখানেই সেই পুণ্যবতী জননীর কোলে নেমে এলেন ভগবান তথাগত। অনন্তকালের বুকে অসীম পুণ্যের এক চিরন্তন স্বাক্ষর।

সেই আবির্ভাবের মধ্যে একটু অলৌকিকতা ছিল। গর্ভধারণ করার পূর্বে শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখেছিলেন মহারাণী। শুভ্রোজ্জ্বল সত্যের বাহক ও প্রচারক হ'য়ে এই জগতে তিনি আসবেন ব'লে হয়তো এই স্বপ্নের প্রয়োজনও ছিল। দীপ্তোজ্জ্বল সূর্যের মহা আবির্ভাবের পূর্বক্ষণে উষার রক্তিম আভাস ফুটে ওঠার প্রয়োজন আছে। সেই মহিমময় উদার অভ্যুদয়কে প্রত্যক্ষ করার পূর্বে মনের দিক দিয়েও কিছুটা প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হয়; তা না হ'লে পূর্ণজ্যোতির বহু-ব্যাপ্ত বিচ্ছুরণকে সম্যক্‌ভাবে বোঝা যায় না। মহারাণী হয়তো সেই অচিন্তনীয় স্বপ্নের কথা ভেবে স্নিগ্ধনয়নে একবার চেয়েছিলেন পুত্রের মুখের পানে,—কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য! একবার পরম তৃপ্তিতে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সেই যে চোখ বুজেছিলেন, আর তাকাতে পারেননি। জগতের বুকে সিদ্ধার্থকে এনে দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন তিনি। সমগ্র জগৎ চেয়ে রইল তাঁর সেই লোকোত্তর পুত্রের মুখপানে।

সমগ্র জগৎ আজও চেয়ে আছে সেই পুণ্যজ্যোতি মুখের পানে। সেই অনন্ত অভয় হাসিভরা মুখ কেমন ক'রে বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছিল বাণাহত হংসটির দিকে চেয়ে,—হলকর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন সহস্র কীটপতঙ্গের দুর্দশা দেখে কেমন ক'রে পদ্মআঁখিদুটি অশ্রুতে ভ'রে উঠেছিল, নিখিল ধরণী একধ্যানে আজও তা তাকিয়ে দেখছে। আরও বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে দেখছে—দেবদুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারী এক রাজবংশীয় তরুণ কেমন ক'রে ফেলে যাচ্ছেন অপরিমিত ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও নবজাত পুত্রকে, কেমন ক'রে মুণ্ডিতমস্তক সেই নবীন সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে ফিরছেন। জগতের মনগুলিকে ত্যাগের বাণী দিয়ে ফিরাতে চাইছেন যেন! জগৎ আজও দেখছে, কেমন ক'রে তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দিচ্ছেন। দেবতার উপাসনায় নয়, নৈতিক অনুশাসনে শাসিত করছেন জগতের মনগুলিকে। প্রেম-ভালবাসার মধ্যে যে মহাকল্যাণের পথ, সেই পথে এগিয়ে যেতে বলছেন সকলকে। সত্যের দ্বারা জয় করতে বলছেন মিথ্যাকে, চিত্তকে আত্মতুষ্টির দোষ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সার্বিক মঙ্গলব্রতে আত্মনিয়োগ করতে সকলকে ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্যেই বিশ্বকবি তাঁকে বলে-ছেন 'করুণাঘন'!

যে শিশুরূপের স্নিগ্ধ জ্যোতিকে একবার মাত্র দেখে মহারাণী চোখ বুজেছিলেন, সেই শিশুরই পরিণত রূপের স্থির প্রসন্নতাকে শত শত ভাস্কর নিজ হৃদয়ের ধ্যান দিয়ে বুদ্ধমূর্তিতে রূপ দিয়ে গিয়েছেন। সমগ্র জগৎ আজ তা দেখছে—দেখছে করুণাময় রূপের অভয় জ্যোতিঃপ্রবাহকে।

পতিতা আম্রপালিরও কাছে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'আমি এসেছি'। এই আগমনের যে অভয়বাণী, তা জগতের কানে না এসে কি যায়?

ভগবান বুদ্ধের মধ্যে একদিকে হৃদয়ের স্বীকৃতি, আর একদিকে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। সূক্ষ্মতম দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে প্রজ্ঞা-নয়নের উন্মেষ তাঁর। ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নির্বাণের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি। নিখিল নরনারীর মনে শান্তি বর্ষণের কল্যাণ-ব্রত তাঁর জীবনে। আত্মাকে সমুন্নতির পর্যায়ে উন্নীত করার জীবনচর্যার সঙ্গে ত্যাগের গৈরিক বাসকে বেঁধে রেখেছেন তিনি। ক্ষুদ্র সুখ ত্যাগ ক'রে যদি বৃহৎ সুখের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে যাঁরা প্রাজ্ঞ, তাঁরা সেই বৃহৎ সুখের পানে ধাবিত হন। তিনিও সেই বৃহত্তর সুখের পানেই ধাবিত হয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর উপলব্ধি, এইখানেই তাঁর বুদ্ধত্ব।

মানবের ধর্মজীবনকে ঘিরে রেখেছে সুন্দরের ধ্যানচিন্তা ও তার সান্নিধ্যের নিবিড়তা। কারণ যা সত্য, তাই তো সুন্দর! বুদ্ধদেবের ধর্মে 'ঈশ্বর'নামের উচ্চারণ নেই, কিন্তু ঈশ্বর যদি সত্য-শিব-সুন্দর হন, আনন্দস্বরূপ এবং অমৃতের ধ্যানসত্তা হন, তবে তাঁর বাণীতে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। যদিও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব থেকেই বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের জন্ম, তা হলেও তাঁর ধর্মের প্রধান যে ভাব 'জীবে দয়া'—তা তো বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যব্রতী ও সুন্দরের পূজারী বুদ্ধদেবের কথায় এই পুণ্য-বাণীই বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।' উপনিষদে সূক্ষ্মতর ব্রহ্ম ও আত্মার আলোচনা আছে—তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম লিপ্ত হয়েছিল কতকগুলি শুষ্ক আচার ও আচরণে। বাহ্য বৈদিক ধর্মাচরণ সত্ত্বেও সে যুগে বেশ কিছু নৈতিক অবনতিও ঘটেছিল। বুদ্ধদেব তাই যে জীবন-বেদ প্রচার করলেন, তাতে নৈতিক অনুশাসনই সবচেয়ে বড় হ'য়ে দেখা দিল। সমস্ত মানবের মধ্যে মৈত্রীর বাণী প্রচার ক'রে 'মৈত্রেয়'-রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমা তাই তাঁর আত্মিক বাণীতে উজ্জ্বলতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তাই বুদ্ধদেবের চরণোপান্তে যখন প্রণত হন ভক্ত, তখন মনে হয় তাঁরা সত্যকে, সুন্দরকে এবং সত্যের নীতিগত অনুশাসনকেই আন্তরিক প্রণতি নিবেদন করছেন।

একবার ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা মিলিন্দ মহাস্থবির নাগসেনকে তপশ্চর্যার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। নাগসেন তার উত্তরে বলেছিলেন, তপশ্চর্যায় বর্তমান দুঃখের পরি-সমাপ্তি ঘটে, আর ভাবীকালে কোন দুঃখের উদ্ভব হয় না। এই জাগতিক দুঃখের অনুদ্ভবের বাণীই ভগবান বুদ্ধের পরমতম দান। তিন শত বছর পরে এক রাজসন্ন্যাসী ভারতের বুকে স্তম্ভে স্তম্ভে অঙ্কিত ক'রে দিয়েছিলেন এই পুণ্যবাণী; আর সমগ্র জগতের লোক সেই পুণ্যবাণী হৃদয়ে ধারণ ক'রে অনন্তকালের বুকে প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধমূর্তি—আর বলে, হে অনন্ত পুণ্য! সঙ্গীত বেজে ওঠে আকাশে:

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

বুদ্ধ-বাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

দণ্ডকে ভয় সকলেই করে,
প্রাণ প্রিয় সবাকার,
নিজের বেদনা স্মরি কাহারেও
আঘাত দিও না আর।

বৈরিতা দিয়ে বৈরিতার কি
হয় কভু নিরসন ?
অবৈরিতায় শান্ত বৈরী,
—ধর্ম এ সনাতন।

শত্রু তোমারে যদি দেয় ব্যথা
কখনো চিত্ত মাঝে,
ক্রোধ-বশীভূত হও কেন তাহে ?
—দুঃখ কেন বা বাজে ?

তোমার শীলেরে সমূলে বিনাশে—
পোষিছ কেন সে ক্রোধ ?
হৃদয়ে তোমার কেন বা জাগাও
এই মূর্খতা-বোধ ?

অন্যে যখন করিবে কর্ম—
গর্হিত নিন্দিত,
তুমি হও যদি তখন ক্রুদ্ধ
কিংবা ব্যথিত-চিত,

তবে কেন কর সে হেন কর্ম ?
—নিজেরে দুঃখ দাও ?
ক্রোধোন্মত্ত দুঃখে নিজেরে
পীড়িতে কেন বা চাও ?

ক্রোধান্ধ তব শত্রুরা যদি
কুপথ বাছিয়া লয়,
তুমি কেন কর সে পথে গমন ?
কেন ক্রোধ উপজয় ?

* * *

জননী যেমন নিজ পুত্রের
জীবন করিতে ত্রাণ,
প্রয়োজন হ'লে দেন বিনিময়ে
আপনার প্রিয় প্রাণ,—

সকল প্রাণীর সহিত তেমনি
মৈত্রীর ভাব লহ,
হও অবাধিত বৈর-বিহীন,
হিংসা-শূন্য রহ।

স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-বিরহিত হও
নিখিল জীবের প্রতি,
চলিতে ফিরিতে শুইতে বসিতে
হও কল্যাণ-ব্রতী।

ঊর্দ্ধ ও অধ—চারিদিক ভরি
ব্রহ্ম-বিহার করো,
সারা বিশ্বের কল্যাণ-লাগি',
মহান জীবন ধরো।

সাহিত্যের ধর্ম

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

শীতের সকালে এক ঝলক সোনার রোদ আঁচল বিছিয়ে দিল বারান্দায়। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, প্রকৃতির মুখে কৌতুকের হাসি। যে মাধবী লতাটি আমার দরজার গা বেয়ে লতিয়ে গেছে সে যেন তার ভীরু মাথা দুলিয়ে বললে, 'এসেছে, সে এসেছে'।

যাকে পাবার জন্যে আমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলাম, সতৃষ্ণ নয়নে আকাশ-সীমায় তাকিয়ে যার উদ্দেশ্যে বার বার আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়েছিলাম এবং আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অশ্বত্থ-শাখার ঘুঘুপাখীটিও যাকে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, অবশেষে তার আবির্ভাব-বেদনায় পূব-আকাশটা লাল হ'য়ে উঠল। সে এল। ভুবন-মন ভুলিয়ে মনোহরণ বেশে সে এল।

তাকে পেয়ে আমার চোখের দুটি তারা হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। আমার মন-ময়ূরী যেন পাখা ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ নাচতে শুরু ক'রে দিল। আনন্দ—আনন্দে আমার হৃদয় মাতাল হ'য়ে গেল। আমি সেই আনন্দকে ধ'রে রাখলাম কালি-কলমের আলপনায়। আমার হৃদয়ে যা ছিল অনন্ত, আমি তাকে সান্তের বেড়ায় আটকে দিলাম। আলপনায় আটক সেই আনন্দকে যে কোন সহৃদয় জনই যে কোন সময় সমানভাবেই উপভোগ করতে পারেন।

কিংবা এও হ'তে পারে, আমার চোখে যা ছিল একদিন আকাশের ফেরারী মেঘ, আমি হয়তো তাকে মনের আনন্দে ঘড়ায় ভরে ঘরে তুলে রেখেছি। এখন কোন তৃষ্ণার্ত পথিক যদি সেই জল পান ক'রে তৃপ্ত হ'তে চান, তা হ'লে তিনিও সমান ভাবেই আমার আনন্দের অংশীদার হবেন। আমার ভালো লাগার সঙ্গে তখনই তাঁর 'সহিতত্ব' জন্মাবে।

এমনি করেই দু'টি মনের সেতু সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। এই সেতুর নামই সাহিত্য। সাহিত্য হ'ল সহৃদয় হৃদয়-সংবাদ। এ সংবাদ এক মনের সঙ্গে আর এক মনের 'সহিতত্ব' জন্মায়। একের ভাবনা আর একটি সমব্যথী মনে তরঙ্গ তোলে। আবার কেউ কেউ সাহিত্যের অন্য ব্যাখ্যাও করেন। তাঁরা বলেন: সহ হিতেন= সহিত,+ষ্য প্রত্যয় ক'রে সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।—অর্থাৎ যা হিত সাধন করে তা-ই সাহিত্য। এ কার হিত? সমাজের হিত। 'সাহিত্যে'র এ ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে সাহিত্যের পেছনে একটি উদ্দেশ্য আরোপ করতে হয়। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যই নয়, শুধু আনন্দ পরিবেশনের জন্যই নয়; এ ছাড়া সাহিত্যের আরও একটি কাজ আছে। সেটি হ'ল সমাজের হিতসাধন।

আমার মনে হয় এই দুই মতের মিলনেই সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। সাহিত্যিক সমাজসংস্কারক নন; মুখ্যতঃ তিনি শিল্পী। তাঁর উদ্দেশ্য সৃষ্টি। তবে এই সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি জীবনের কথা বলেন, সমাজের কথা বলেন। কথার সঙ্গে কথা মিশিয়ে তিনি অশ্রু-হাসির অনেক মালা রচনা করেন। সেটা হ'ল সাহিত্যিকের কাছে সমাজের উপরি পাওনা। তিনি সমাজের হিতের কথা বলেন, কিন্তু সে

কথাকে তিনি সুন্দর ক'রে বলেন। এই সুন্দর ক'রে বলাটাই সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য।

তবে সাহিত্যকে কখনও শুধু মাত্র স্বপ্ন-বিলাসী মনের অবকাশের ফসলরূপে গণ্য করা যায় না। সাহিত্য জাগ্রত মনের অতন্দ্র স্বাক্ষরে চিহ্নিত। জীবনকে সার্থক ভাবে, সহৃদয় চিত্তে অনুধাবনই সাহিত্যিকের কাজ। এই জীবন-বোধই সাহিত্যের আসল কথা। সাহিত্যিকের তৃতীয় নয়ন যে ভাবে জীবনকে দেখে, সাধারণ মানুষ জীবনের সেই গভীর প্রদেশের সন্ধান রাখে না। আর রাখলেও তা প্রকাশ করবার যোগ্য ভাষার বাহন খুঁজে পায় না। সাহিত্যি-কের হাতে রয়েছে সেই ভাষার জাদু, যা মানব-জীবনের সেই গোপন কথাকে বাঙ্ময় ক'রে তোলে। সাহিত্যিকের এই দৃষ্টি আসে সহানু-ভূতি থেকে। জীবনের জন্য, মানুষের জন্য, সমাজের জন্য এই সহানুভূতির টানে সাহিত্যিক কখনও বা দুঃখে, কখনও বা আনন্দে জীবনের কথাচিত্র রচনা করেন। জীবনের প্রতিটি দেখা জিনিষ, প্রতিটি চেনা ঘটনা সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকষে যাচাই ক'রে, অনুভূতির রঙে রঙীন ক'রে, অভিজ্ঞতার রসে জারিত ক'রে সাহিত্যে রূপায়িত করেন। এই জীবন অন্বেষণ ও সহানুভূতিই সাহিত্যের মূল কথা।

সাহিত্যের জন্মলগ্ন আজও নির্ধারিত হয়নি। আর তা হওয়া সম্ভবও নয়। লিখিত সাহিত্যের আদি আছে। কিন্তু অলিখিত সাহিত্য যে অনাদি। সে সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে রচিত। আমাদের স্মৃতি-শ্রুতি তারই পরিচয় বহন করছে। ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সাহিত্য হ'ল ঋগ্বেদ। ভারতাত্মার আনন্দ-ঘন কল্যাণবাণীর প্রথম বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটেছে ঋগ্বেদে। তারপর উপনিষদ্। তারও অনেক পরে মহাকাব্যের যুগ। মানুষের জীবন-সমস্যা নানা ভাবে রূপায়িত হ'য়েছে আমাদের দুই মহাকাব্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথটিও প্রায় এমনি।

এবারে প্রশ্ন হ'ল সাহিত্যের ধর্ম কি? সাহিত্যের ধর্ম হ'ল জীবনকে প্রকাশ করা। এ জীবন কোন খণ্ড জীবন নয়, এ জীবন বিশ্ব-জীবন। এই বিশ্বজীবনকে জানার আগে চাই নিজেকে জানা। 'আত্মানং বিদ্ধি' বা নিজেকে জানো—এ বাণী পুরানো কালের। বর্তমানে এর সঙ্গে আরও একটি শ্লোগান যোগ হয়েছে, —পরিবেশ ও প্রতিবেশীকে জানো। এই ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বমানবের যোগ যে সাহিত্যে যত গভীর, সে সাহিত্য তত সার্থক। জীবনের অখণ্ড রূপই সাহিত্যের বিষয়বস্তু।

প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির জন্যই চাই গভীর অধ্যবসায়, নীরব প্রস্তুতি। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিন্দুমাত্র খ্যাতির প্রত্যাশা না রেখে মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য এই নেপথ্য প্রস্তুতির সময়েই সাহিত্যিক জীবনকে দেখেন, জীবনকে ভালবাসেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তখন সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সাহিত্য তাই জীবনকে আলিঙ্গন করে, তাকে গ্রহণ ক'রে তাতে নিজের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলে। জীবন সম্পর্কে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীই সাহিত্যকে সমসাময়িকতার উর্ধ্বে, তুচ্ছতার উর্ধ্বে চিরকালের বিষয়বস্তু ক'রে তোলে। সাহিত্যে নেতি-বাদ অচল। প্রত্যয়ই সাহিত্যকে জীবনের সহযোগীরূপে বাঁচিয়ে রাখে। কেবল অস্বীকার, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা দ্বারা জীবনকে জানা যায় না, বুঝা যায় না। হুইটম্যানের লেখা ক'টি লাইন মনে পড়ে:

I am not the poet of goodness only,
I do not decline to be the poet of
Wickedness also.

—আমি শুধু সদ্‌ভাবের কবি নই, অসদ্‌ভাবেরও কবি হ'তে আমি নারাজ নই। শুভ এবং অশুভ, সুন্দর ও অসুন্দর উভয়ের মধ্য থেকে এক মহত্তর কল্যাণকে বের ক'রে আনাই শিল্পীর কাজ, এটাই সাহিত্যের দায়িত্ব। সাহিত্যে শুধু মাত্র শুদ্ধাচার কিংবা নীতিবাগীশদের প্রভুত্ব চলতে দিলে তাকে শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রাণ রসহীনতায় পর্যবসিত করা হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার, সাহিত্য 'পর্নোগ্রাফি' বা 'ফটোগ্রাফি' নয়। Art lies in concealment—কোন শিল্পীরই এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি, বেদনারও। জীবনের সপ্তবর্ণ রামধনুর রং লেগেছে সাহিত্যে। তাকে একদেশদর্শী হ'লে চলবে না। সমগ্র জীবন, জীবনের অন্তর্বেদনা, তার আকাশ-চারী মন—সব কিছুই আজ সাহিত্যের অঙ্গীভূত। সাহিত্য জীবনের পরিপূরক,—জীবনের দর্পণ। এ দর্পণে সুন্দরের প্রতিফলন যেমন সত্য, অসুন্দরের প্রতিভাসও তেমনি বাস্তব। সেই অসুন্দরের মধ্যে সুন্দর, অকল্যাণের মধ্যে কল্যাণ কামনাই সাহিত্যের ধর্ম।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যে শ্রেণীবাদের কথা বলছেন। তাদের মতে সাহিত্যের কারবার হ'ল ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। তাঁদের কাছে সাহিত্য হ'ল সমাজ-বিপ্লবের হাতিয়ার। তাঁরা বলেন, যে যুগে যে শ্রেণী প্রতাপশালী হ'য়ে উঠেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, সে যুগে সে শ্রেণীই সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে। সে যুগে তারাই হয়েছে সাহিত্যের কুশীলব। এ যুগে ইতিহাসের গতি যখন মোড় নিয়েছে ও ইতিহাসের পালে যখন নতুন যুগের হাওয়া লেগেছে, এ যুগে সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমিরও পরিবর্তন ঘটবে। বুর্জোয়া সাহিত্যের পরিবর্তে এ যুগে রচিত হবে গণসাহিত্য। সে সাহিত্যে সর্বহারা কিষান-মজুরেরই প্রাধান্য থাকবে। প্রাধান্য থাকবে বললেই সবখানি বলা হ'ল না, বলতে হবে এ যুগের সাহিত্যিক কিষান-মজুরের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য রচনা করবেন।

সবিনয়ে নিবেদন ক'রব, সাহিত্যে এইরূপ শ্রেণীবাদ আমরা স্বীকার করি না। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'ল বিশ্বমানবের সম্পদ, সেখানে কোন বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি সার্বিক ও সর্বজনীন দৃষ্টি না থাকলে সত্যিকারের সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত কোন্ যুগের সৃষ্টি? কিংবা কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'? এ দেশের কিষান-মজুররা কি এ সব গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পায় না?

তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে যত সহজে পৃথক্ করা সম্ভব, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা তত সহজ ব্যাপার নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য ব'লে কোন কথা নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্র হ'ল তীর্থক্ষেত্রের মতো। সেখানে সবার অবাধ প্রবেশাধিকার।

বস্তুতঃ মানুষে মানুষে স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, মানুষে মানুষে মিলও বড় একটা কম নেই। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক জায়গায় মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা আশ্চর্য মিল আছে। এই মানবিক আবেদনকে অবলম্বন ক'রে যে সাহিত্য রচিত হবে তা কি চাষী-মজুর, কি শিল্পপতি, কি বুর্জোয়া-গোষ্ঠী—সবার কাছেই সমান সমাদর পাবে। কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে গণ-সাহিত্য বা 'সর্বহারা' সংস্কৃতি ব'লে কোন কথা নেই, এর

সকল কিছুর উপরই সকল মহেুবের অবাধ অধিকার। ট্রট্‌স্কীর কথায় :

There is no workers' culture and that there will never be any, and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away for ever with class-culture and to make way to human culture; we frequently seem to forget it. (*Literature and Revolution*).

—'শ্রমিকের কৃষ্টি' ব'লে কোন কৃষ্টি নেই এবং তা কখন হবেও না; তার জন্য দুঃখ করার কোন কারণ নেই। শ্রমিক ক্ষমতা লাভ করে শ্রেণীগত কৃষ্টি চিরতরে দূর ক'রে দেবার জন্য। মানব-কৃষ্টির অভিমুখেই তার যাত্রা,—এ কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

সাহিত্যের হ'ল অখণ্ড স্বরূপ। একে বরং বলা যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। দ্বৈতকে স্বীকার করেও সে অদ্বৈত, সান্তকে মেনে নিয়েও সে অনন্ত। এই সার্বিক অখণ্ড দৃষ্টিই সত্যিকার সাহিত্যের দৃষ্টি। আর এটাই হ'ল সাহিত্যের ধর্ম।

শিল্পীর সন্তান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তুমি এ বিশ্ব সৃজন করেছ
অতি অপরূপ সাজে।
সৃজন-কামনা জাগায়ে তুলেছে
তাহা যে আমার মাঝে।
পিতার বিদ্যা পুত্র কিছু তো পায়।
পিতৃধর্ম কিছু কিছু শুনি
পুত্রেও বর্তায়।

তুচ্ছ হউক ক্ষুদ্র হউক তবু
আমিও সৃষ্টি করিয়াছি কিছু প্রভু।
লোকের সমাজে দেখাতে লজ্জা হয়।
তোমারে দেখাতে লজ্জা তো নাই
তুমি পিতা স্নেহময়।

তোমারি চরণে করিলাম নিবেদন,
জানি তুমি হেলা করিবে না এ যে
তোমারি অনুকরণ।
পুত্র না হ'লে বলিতাম এরে চুরি
তারিফ করিবে করেছি কেমন
চুরিতেও বাহাদুরি।
পিতার বিত্তে পুত্রের অধিকার
কে করে বিশ্বে এ কথা অস্বীকার?

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[দশম অধ্যায়]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[গত পৌষসংখ্যায় শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত 'ভাবার্থদীপিকা'র নবম অধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে কি অবস্থায় শ্রীভগবান ভক্তকে নিজ বিভূতি বা ঐশ্বর্য দেখান। দশম অধ্যায়ে নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-স্থান বর্ণনা করিতেছেন। অনুবাদের অন্তর্গত সংখ্যাগুলি 'জ্ঞানেশ্বরী'র শ্লোকাঙ্ক। উঃ সঃ।]

হে গুরুরাজ, আপনি নির্মল জ্ঞানদানে চতুর, বিদ্যারূপ-কমল-প্রকাশক, 'পরা'বাণী তত্ত্বরূপ প্রমদার সহিত বিলাসকারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সংসাররূপ-তমোনাশকারী সূর্য, অপরিমেয় পরমবীর্যবান্, অত্যন্ত পরিণত তুরীয়াবস্থার (সমাধিস্থিতির) পোষণ করাই আপনার লীলা, আপনাকে নমস্কার। হে অখিলজগৎপালন, কল্যাণরূপ মণির খনি, সজ্জনবনের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ, হে আরাধ্যদেবতা, আপনাকে নমস্কার।

আপনি চতুর চকোরের আনন্দদানকারী চন্দ্র, আত্মানুভবকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞান-সাগর, মদন-গর্বহারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সদ্ভক্তের ভজনীয়, ভবরূপ হস্তীর গণ্ডস্থল-বিদারণকারী, বিশ্বোৎপত্তির আদিস্থান, হে গুরুরাজ, আপনাকে নমস্কার করি।

আপনার কৃপারূপ গণেশের প্রসাদে বালকেও সারস্বত বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

যে গুরুদেবের উদার বাক্য অভয়বাণীরূপ রাজাদেশ প্রদান করিলে নবরসের প্রকাশরূপ পুরস্কার পাওয়া যায়, আপনার প্রেমরূপ সরস্বতী দেবী অঙ্গীকার করিলে মূকও গ্রন্থ-রচনায় বৃহস্পতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

অধিক কি বলিব? আপনার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে কিংবা আপনার পদ্মহস্ত যাহার মস্তক স্পর্শ করে, সে জীব হইলেও শিবের সমান যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

এমনি যাঁহার মহিমার ঐশ্বর্য, বাক্য দ্বারা কিরূপে তাঁহার স্তুতি করিব? সূর্যের অঙ্গ কি গন্ধদ্রব্য দ্বারা মার্জন করা যায়? ১০

কল্পতরুকে কেমন করিয়া ফুলে সজ্জিত করা যায়? ক্ষীরসাগরকে কিরূপে আতিথ্য গ্রহণ করানো যায়? কর্পূরকে কি করিয়া সুবাসিত করিতে ইচ্ছা করিবে? চন্দনের উপর কিসের প্রলেপ দিবে? অমৃতকে কিরূপে রন্ধন করিবে? গগনের উপর কি কোন মণ্ডপ উঠানো যায়?

তেমনি শ্রীগুরুর মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিবার সাধন কি আছে? ইহা জানিয়াই আমি নিঃশব্দে নমস্কার করিতেছি। যদি বুদ্ধিবলে শ্রীগুরুর সামর্থ্য বর্ণনা করিতে যাই, তবে তাহা মুক্তার উপর প্রলেপ (পুট) দিবার ন্যায় হইবে।

এখন এ কথা থাকুক, সাড়ে-পনের-আনা কসের (উত্তম) স্বর্ণকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে হয় না—তাই কিছু না বলিয়া গুরুর চরণে মস্তক রাখাই ভাল।

হে স্বামিন্, আপনি মমতার সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই আমি কৃষ্ণার্জুনসংবাদরূপী প্রয়াগসঙ্গমে অক্ষয়বটস্বরূপ হইয়াছি।

উপমন্যু কৈলাসপতি শঙ্করের কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার সম্মুখে ক্ষীরসাগরের বাটি (ভাণ্ডার) রাখিয়া দিয়াছিলেন, অথবা বৈকুণ্ঠপতি (শ্রীবিষ্ণু) কৌতুকে (প্রেমসহকারে) রুষ্ট ধ্রুবকে ধ্রুবপদ-রূপ মিষ্টান্ন দিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তেমনি যে ভগবদ্‌গীতা ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল, সেই ভগবদ্‌গীতা আমি 'ওবী' ছন্দে গাহিতেছি, আপনি এমনই কৃপা করিয়াছেন। যে বাণীরূপ বনে ঘুরিয়া একটি অক্ষরেরও সফলতার বার্তা শুনা যায় না, আপনি সেই বাণীকে বিবেকের উপর কল্পলতা করিয়াছেন। ২০

যাহা শুধু দেহবুদ্ধি ছিল, তাহাকে আপনি আনন্দ-ভাণ্ডারের কুঠরী করিয়া দিয়াছেন, মনকে গীতার্থ-সাগরের জলশয্যায় শয়ন করাইয়াছেন।

এখন আপনার কৃপাপ্রসাদে আমি ভগবদ্‌গীতার পূর্বকাণ্ড কৌতুকে 'ওবী'ছন্দে বর্ণনা করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যমতের (জ্ঞানযোগের) সহিত ভেদ দেখাইয়া (কর্ম)-যোগের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল কর্মের প্রতিষ্ঠা, চতুর্থ অধ্যায়ে উহাকেই জ্ঞানের সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, পঞ্চম অধ্যায়ে যোগতত্ত্বের মহত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ যোগতত্ত্বই আসনবিধি হইতে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যভাব পর্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকট করা হইয়াছে। তেমনি যোগস্থিতি ও যোগভ্রষ্টের গতি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতির 'উপক্রম' (আরম্ভ) ও 'পরিহার' (নিরসন), এবং পুরুষোত্তমকে যে চারিপ্রকার ভক্ত ভজনা করে—তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

তদনন্তর অষ্টম অধ্যায়ে সাতটি প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেহান্ত সময়ে কিরূপ বুদ্ধি হয়, এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করা হইয়াছে। যাহা কিছু অভিপ্রায় (তত্ত্বজ্ঞান) অপার বেদে প্রকট হইয়াছে, তাহা মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

মহাভারতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যে অভিপ্রায় গীতার সাত শত শ্লোকে আছে, তাহা এক নবম অধ্যায়েই প্রকট করা হইয়াছে। ৩০

অতএব নবম অধ্যায়ের 'অভিপ্রায়' স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে (আমার) ভয় হয়; বৃথাই শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা! অহো, গুড় ও শর্করার ঢেলা একই রস হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিচার করিয়া দেখিলে মিষ্টত্বেও কোন ভেদ নাই।

কেহ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া উহা প্রতিপাদন করে, কেহ স্বস্থানেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, কেহ বা জানিয়া সেই জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

গীতার অধ্যায়গুলি এইরূপ। পরন্তু নবম অধ্যায় অনির্বচনীয় (অবর্ণনীয়)—তাহাও হে প্রভু, আপনার সামর্থ্যেই আমি বর্ণনা করিয়াছি।

অহো, কাহারও (বশিষ্ঠের) গৈরিক উত্তরীয় (সূর্যের ন্যায়) প্রকাশশীল, কেহ (বিশ্বামিত্র) সৃষ্টির উপরেও সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, কেহ (শ্রীরামচন্দ্র) সমুদ্রে পাষাণ বাঁধিয়া সৈন্য পার করিয়াছেন। কেহ (মারুতি) আকাশে উঠিয়া সূর্য ধরিতে উদ্যত, কেহ (অগস্ত্য ঋষি) গণ্ডূষে সমুদ্রশোষণে সক্ষম,—আর আপনি আমার দ্বারা গীতার এই ব্যাখ্যা করাইয়াছেন, হে প্রভু অবধান করুন।

পরন্তু এসব কথা এখন থাকুক ; রাম-রাবণের যুদ্ধ কিরূপ ? না, রাম ও রাবণ যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন—(অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের তুলনা নাই)।

তেমনি নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ যেমন আছে, তেমনি (তাহার তুলনা নাই); আমি বলিতেছি না—যে গীতার্থ অবগত আছে, সেই তত্ত্বজ্ঞই ইহা নির্ণয় করিতে পারে।

এইভাবে আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে গীতার প্রথম নয়টি অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছি ; এখন গ্রন্থের উত্তর খণ্ড আরম্ভ হইতেছে, শ্রবণ করুন। এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মুখ্য ও গৌণ বিভূতির কথা বলিতেছেন, সেই সুন্দর সরস কথা আমি বর্ণনা করিব। ৪০

এই দেশী (মারাঠী) ভাষার উৎকর্ষে 'শান্ত'রস 'শৃঙ্গার'রসকেও হার মানাইবে, এবং 'ওবী' ছন্দ সাহিত্যের অলঙ্কার হইবে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত এই মারাঠী (ভাষ্য) পাঠ করিলে যখন সঠিক অর্থের মর্ম গ্রহণ করা যাইবে, তখন কোন্‌টি মূল গ্রন্থ তাহা বুঝা যাইবে না।

অঙ্গের সৌন্দর্য অলঙ্কারের ভূষণ হইয়া গেলে যেমন কে কাহাকে সুশোভিত করিতেছে, তাহা বলা যায় না, তেমনি সংস্কৃত ও দেশী ভাষা একই ভাবের সুখাসনে কেমন শোভা পাইবে—তাহা উত্তমরূপে শ্রবণ করুন। ভাব রূপ গ্রহণ করিলেই রসবৃত্তির (রসালতার) বর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং চাতুর্য বলে, 'আমার প্রতিষ্ঠা হইল'।

তেমনি দেশী ভাষার লাবণ্য লুণ্ঠন করিয়া রসের তারুণ্য ফুটাইয়া তোলা হইবে এবং গহন গীতা-তত্ত্ব বলা হইবে। তখন চরাচরপরমগুরু চতুরচিত্তে আনন্দবর্ধনকারী যাদবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে লাগিলেন, তাহাই শ্রবণ করুন।

নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন : শ্রীহরি বলিলেন—হে অর্জুন, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। শ্রীভগবান উবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

আমি ইতিপূর্বে যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছি, উহা দ্বারা তোমার অবধানের পরীক্ষা করিলাম। উহাতে কোন ন্যূনতা নাই—বরঞ্চ উহা পূর্ণই।

ঘটে অল্প জল ঢালিয়া যদি দেখা যায় উহা চুয়াইয়া পড়ে না, তবেই ঘট জলপূর্ণ করিতে হয়, তেমনি (তোমার শুনিবার আগ্রহ) দেখিয়া আরও শুনাইব—এরূপ ইচ্ছা হইতেছে। ৫০

নবাগত লোককে সর্বস্ব দিয়া যদি দেখা যায় সে বিশ্বাসযোগ্য, তবেই তাহাকে ভাণ্ডারী করা যায়, —তেমনি হে কিরীটী, তুমি এখন আমার নিজধাম (বিশ্বাসযোগ্য) হইয়াছ।

এই ভাবে অর্জুনকে দেখিয়া সর্বেশ্বর অত্যন্ত প্রেমসহকারে কহিলেন—মেঘ যেমন পর্বতকে দেখিয়া জলপূর্ণ হইয়া আসে, তেমনি কৃপালুগণের রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহাবাহো, শুন, আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই অভিপ্রায় পুনরায় বলিতেছি।

প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া যদি দেখা যায় যে ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সেজন্য যেমন কৃষিকর্মে বিমুখ হওয়া উচিত নহে ; বারংবার পুট দিলে সোনার ঔজ্জ্বল্য বাড়িতে থাকে, সুতরাং তাহার খাদ নষ্ট করা উচিত নয় কি ? তেমনি হে পার্থ, তোমার কোন উপকার করিবার জন্য নহে, আমার নিজের স্বার্থেই আমি পুনরায় বলিতেছি।

বালকের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইলে, সে ঐ শৃঙ্গারের কি বুঝে? সেই সুখের আনন্দ তাহার মাতাই উপভোগ করে; তেমনি তোমাকে যাহা বলা হয়, তাহা যখন তুমি বুঝিতে পার, তখনই আমার প্রেম দ্বিগুণ বর্ধিত হয়।

এখন হে অর্জুন! এই আলঙ্কারিক পরিভাষা থাকুক। তোমার প্রতি আমার প্রেম গভীর, সেইজন্যই তোমাকে বলিতে আমার তৃপ্তির অন্ত নাই। এই কারণেই তোমাকে এই সব কথা বলিতেছি, এখন মন দিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। ৬০

হে সুমর্মা (মর্মজ্ঞ), আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর। অক্ষরের রূপ ধরিয়া যেন স্বয়ং পরব্রহ্মই তোমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥ ২

পরন্তু হে কিরীটী, তুমি আমাকে সত্যই জান না, আমি যেখানে প্রকট হই, বিশ্ব সেখানে স্বপ্নসদৃশ, সেখানে (আমার স্বরূপ নিরূপণে) বেদও মূক হইয়াছে, মন ও প্রাণবায়ু পঙ্গু হইয়াছে, রাত্রি বিনাই রবি অস্ত গিয়াছে।

উদরের মধ্যে গর্ভের সন্তান যেমন আপন মাতার বয়স জানে না, তেমনি সমস্ত দেবতাগণ আমার স্বরূপ জানিতে পারে না। জলচরগণ যেমন সমুদ্রকে মাপিতে পারে না, মশক যেমন আকাশকে উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তেমনি মহর্ষিগণের জ্ঞানও আমার স্বরূপ জানিতে পায় না।

আমি কে, কত বড় এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি?—এসব নিরূপণ করিতে কত কল্প চলিয়া গেল! হে পাণ্ডব, ঋষিগণ, দেবগণ ও অন্য সমস্ত ভূতজাত—আমি সকলের আদিকারণ, এইজন্য আমাকে জানা কঠিন।

পর্বত হইতে নামিয়া জল যদি পুনরায় পর্বতে উঠিতে পারে, বৃক্ষের শীর্ষ যদি মূলে আসিয়া লাগে, তবেই আমা হইতে উৎপন্ন জগৎ আমাকে জানিতে পারে; যদি সূক্ষ্ম অঙ্কুরের মধ্যে সম্পূর্ণ বটবৃক্ষটি আবদ্ধ করা যায়, যদি তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্রকে ভরা যায় কিংবা যদি পরমাণুর মধ্যে এই ভূগোলক (পৃথিবী) স্থান পায়, তবেই আমা হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণের, ঋষি ও দেবগণের আমাকে জানিবার অবকাশ (অবসর) হয়। ৭০

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

এই অবস্থায় (আমাকে জানা কঠিন হইলেও) যদি কদাচিৎ কেহ বাহেন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির মার্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের প্রতি বিমুখ হয়, ইন্দ্রিয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে, এবং দেহভাব বিস্মৃত হইয়া মহাভূতের মস্তকের উপর চড়িয়া বসে; সেখানে স্থির হইয়া থাকিয়া বিবেকবলে ও নির্মল আত্মপ্রকাশে স্বচক্ষেই আমার অজত্ব দেখিতে পায়।

প্রস্তরের মধ্যে যেমন পরশ-পাথর, রসের মধ্যে যেমন অমৃত, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে সে আমার অংশ—জানিবে। সে চলন্ত জ্ঞানের বীজ, তাহার অবয়ব সুখের অঙ্কুর, পরন্তু তাহার মনুষ্যাকার তাহার লৌকিক পরিচয় মাত্র।

অকস্মাৎ বন্যার জলে যদি একটি হীরকখণ্ড পড়িয়া যায়, তবে তাহা কি জলে গলিয়া যায়? তেমনি মনুষ্যলোকের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত মনুষ্যের মতো ব্যবহার করিলেও প্রকৃতির দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না।

ভয়ে পাপ তাহাকে ছাড়িয়া যায়; জলন্ত চন্দনবৃক্ষ হইতে সর্প যেমন পলায়ন করে, তেমনি যে আমাকে জানিতে পারে, সর্ব সঙ্কল্প তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫

আমাকে কি করিয়া জানা যায়?—এই কল্পনা (প্রশ্ন) যদি তোমার চিত্তে জাগিয়া থাকে, তবে আমার ভাবের (স্বরূপ ধর্ম) কথা শুন: যাহা (আমার ভাব) ভিন্ন ভিন্ন ভূতে তাহা প্রকৃতির সমান হইয়া ত্রিভুবনে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। ৮০

উহাদের মধ্যে প্রথম জানিবে বুদ্ধি, তৎপরে নিঃসীম জ্ঞান, অসংমোহ (মোহের অভাব) সহনশীলতা, ক্ষমা, সত্য, শম ও দম (মনোনিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), সংসারের সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু—ইহাদেরও আমার ভাবের মধ্যে ধরিবে।

ভয় ও নির্ভয়তা, অহিংসা ও সমতা, তুষ্টি ও তপ এবং হে পাণ্ডুসুত, দান আর যশ ও অপকীর্তি—এই যে সব ভাব দেখা যায়, তাহা সব আমা হইতেই প্রাণীদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

প্রাণিগণ যেমন বিভিন্ন, ইহারাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জানিবে—কতকগুলি আমার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি অজ্ঞানপ্রসূত, যেমন সূর্য হইতেই প্রকাশ ও অন্ধকার—সূর্য উদিত হইলেই প্রকাশ দেখা যায়, আর অস্ত গেলেই অন্ধকার।

আমাকে জানা বা না জানা, ইহা জীবগণের কর্মের ফল অনুসারেই হয়, এই জন্য তাহাদের মধ্যে ভাবের প্রকাশ বিষম (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়)।

হে পাণ্ডুকুমার, এইভাবে সমস্ত জীব ও সৃষ্টি আমারই ভাবের সহিত জড়িত হইয়া আছে, জানিবে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

আর যাঁহাদের অধীনে এই সৃষ্টির বৃদ্ধি ও এই লোকব্যবহার চলিতেছে, সেই অপর একাদশ ভাবের কথা বলিতেছি শুন: সমস্ত মহর্ষিগণের মধ্যে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ কশ্যপাদি প্রসিদ্ধ সপ্ত ঋষি। আর চতুর্দশ মনুর মধ্যে স্বয়ম্ভু প্রমুখ চারিটি মনু মুখ্য ও গরিষ্ঠ—প্রথম ও প্রধান।

হে ধনুর্ধর, এই যে একাদশটি ভাব—ইহারা সৃষ্টির ব্যাপারের জন্য আমার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যখন লোকের ব্যবস্থা (লোকসৃষ্টি বা লোকস্থিতি) হয় নাই, যখন মহাভূতের সমষ্টি নিষ্ক্রিয় ও স্তব্ধ হইয়াছিল, তখনই ইহারা (একাদশ ভাব) উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারাই লোক রচনা করিয়াছে, এবং সেখানে নিজ জনকে (লোকপাল নিযুক্ত করিয়া) অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। অতএব এই একাদশ ভাব রাজা এবং জগৎ ইহাদেরই প্রজা,—এইভাবে সারা বিশ্ব আমারই

বিস্তার জানিবে। দেখ, আরম্ভে (প্রথমে) একটি বীজই থাকে, তাহাই বাড়িয়া বৃক্ষের গুঁড়ি হয়, গুঁড়ি হইতে অঙ্কুরের উদ্গম হইয়া বৃক্ষের ডাল হয়; ডাল হইতে শাখা প্রশাখা, পল্লব ও পত্রের উদ্গম হয়। পল্লব হইতে ফুল ও ফল হয়—এইভাবে সম্পূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ সমস্ত কেবল বীজই।

তেমনি আদিতে এক আমিই ছিলাম, তাহার পর আমার মন বহু হইতে ইচ্ছা করিল, আমার মন হইতে সপ্ত ঋষি ও চার মনুর জন্ম হইল। ইহারাই বিবিধ লোক সৃজন করিলেন, লোকে ভিন্ন ভিন্ন লোকপাল হইল, এবং লোকপাল হইতেই প্রজাসকল উৎপন্ন হইল। ১০০

এই ভাবে—বাস্তবিক আমিই এই বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া আছি, এই ভাব সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই আমাকে বুঝিতে পারে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়॥৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৮

এইজন্য হে সুভদ্রাপতি, এই ভাব আমারই বিভূতি—এই ব্যাপ্তি সারা জগৎ ভরিয়া আছে। অতএব আমা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্তই 'আমি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইভাবে যাহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে জ্ঞানের জাগৃতি হইয়াছে, সুতরাং সে উত্তমাধম ভেদের স্বপ্ন দেখে না।

আমি, আমার বিভূতি ও তাহাতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি—এ সমস্তকেই সে যোগানুভব দ্বারা ঈশ্বরভাব বলিয়া মানে, সুতরাং শঙ্কাহীন যোগের প্রভাবে মনোবল দ্বারা সে আমার সহিত সমরস হইয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই—তুমি নিশ্চিতভাবে ইহা জানিও।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥৯

যেমন সূর্যই সূর্যের আরতি করে, কিংবা চন্দ্র চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অথবা সমান দুই প্রবাহ একত্রে মিলিয়া যায়, তেমনি উহারা (ঐ ভক্তগণ) সমরসের প্রয়াগতীর্থ হইয়া যায়। ঐ তীর্থজলের উপর সাত্ত্বিক ভাবের বন্যা বহিয়া যায় এবং তাহার সংবাদ(অধ্যাত্মচর্চা)রূপ চৌরাস্তায় স্থাপিত গণেশের মূর্তি হইয়া যায় (গণেশের ন্যায় উপদেষ্টা হয়)। তখন তাহারা মহাসুখে (ব্রহ্মানন্দে) ভরিয়া আত্মজ্ঞানে (দেহের) বাহিরে চলিয়া আসে, এবং আমাকে প্রাপ্তির সন্তোষে তৃপ্ত হইয়া উদ্গার তুলিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে একান্তে যে একাক্ষরী মন্ত্র বলা হয়, তাহাই তাহারা ত্রিজগতে মেঘের ন্যায় গর্জন করিয়া কহিতে থাকে।১১০

কমলকলিকা প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে মকরন্দকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত সবারই আনন্দের জন্য তাহা বিলাইয়া দেয়, তেমনি ইহারা বিশ্বে আমারই কথা বর্ণনা করে, কথার আনন্দে কথাই ভুলিয়া যায় (স্তব্ধ হইয়া থাকে) এবং সেই বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের শরীর মন লীন হইয়া যায়। এইভাবে—প্রেমের আতিশয্যে যাহাদের দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না, তাহারা নিজের মধ্যে আমাকে পাওয়ার সুখ অনুভব করিয়াছে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০

হে অর্জুন, তাহাদের আমি যাহা কিছু দান করিতে যাই, তাহার সর্বোত্তম অংশ নিজ স্থানেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। হে বীর অর্জুন, তাহারা যে পথে বাহির হয় তাহার তুলনায় স্বর্গ ও মোক্ষ কুটিল পথ বলিয়া মনে হয়।

এইজন্য তাহারা আমার প্রতি যে প্রেম ধরে, আমাকেই তাহার প্রতিদান দিতে হয়; পরন্তু আমি যাহা দিতে যাই, তাহা তাহাদেরই অধীন। এখন এমন হয় যে তাহাদের প্রেম যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কালের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়ে, ইহার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হয়।

হে কিরীটী, প্রেমাস্পদ ক্রীড়ারত বালককে আপন স্নেহের দৃষ্টিতে আচ্ছাদন করিয়া মাতা যেমন তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে, বালক যে যে খেলার সামগ্রী চায়, মাতা তাহা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করিয়া দেয়, তেমনি আমাকে উপাসনার অধিকারকে পোষণ করিতে হয়। যে মার্গের পোষণে আমার ভক্ত আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হয়, বিশেষ প্রেম সহকারে আমাকে তাহার পালন করিতে হয়।১২০

ভক্ত আমাকে বিশ্বাস করে এবং ভালবাসে, আমিও তাহার অনন্যগতিই ইচ্ছা করি, কারণ প্রেমিকের সঙ্কট আমারই সঙ্কট। দেখ, স্বর্গ ও মোক্ষ রচনা করিয়া ঐ দুটি মার্গই আমি ভক্তের অধীন করিয়া রাখিয়াছি, অবশেষে লক্ষ্মীর সহিত নিজেকেও তাহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়াছি।

পরন্তু সহজ সুন্দর নির্মল (নিত্য নবীন) যে আত্মসুখ, তাহা প্রেমিক ভক্তের জন্য যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। হে কিরীটী, এই সুখের শেষ সীমা শান্তি, আমি আমার প্রেমিক ভক্তগণকে প্রেম সহকারে আমার কাছে টানিয়া লই—একথা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

আমার আত্মার প্রতি 'ভাব' (প্রেম ও ভক্তি) যে জীবনের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে, এক আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই যে মিথ্যা মনে করে। হে বীর, তাহার নির্মল তত্ত্বজ্ঞান কর্পূরের মশালের ন্যায় হয়, এবং আমি মশালচি হইয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলি। অজ্ঞান-রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার নাশ করিয়া দূরে সরাইয়া তাহার জন্য এমন জ্ঞানোদয় করাইয়া দিই। প্রেমী ভক্তের প্রিয়তম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ভাবে বলিলেন, তখন অর্জুন কহিলেন: আমার মনোবৃত্তি শান্ত হইল। হে প্রভু, শ্রবণ করুন, আপনি সংসারের আবর্জনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিলেন, আমি জননীজঠর (পুনর্জন্ম) হইতে মুক্ত হইলাম। নিজের জন্মদোষ আজ আমার নিজের চক্ষেই দেখিলাম, এখন হে প্রভু, আমার জীবন সার্থক হইল মনে হইতেছে। ।১৩০

হে দেব, আপনার মুখনিঃসৃত কৃপামৃতবাণী শ্রবণ করিয়া আজ সুবিদ্যার জন্ম হইল, আমার ভাগ্যদশার উদয় হইল। এই বচনরূপ সূর্যের প্রকাশে অন্তর্বাহ্য অন্ধকার দূর হইল, এই জন্য আপনার যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি। অর্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২

হে জগন্নাথ, আপনিই পরব্রহ্ম, যাহা এই মহাভূতের বিশ্রান্তিস্থান তাহাই আপনার গঠিত পরম নিজধাম। আপনি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ—এই) তিন দেবতার পরম দেবতা। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব যে পুরুষ আপনি তাহাই,—মায়াবিকারের অতীত দিব্য স্বরূপ।

হে স্বামিন্, আপনি অনাদিসিদ্ধ, আপনি জন্মকর্মের বশীভূত নহেন। আমি আপনাকে এখন জানিতে পারিয়াছি। আপনিই কালযন্ত্রের সূত্রধার (চালক), আপনি জীবকলার (জীবাত্মার) অধিপতি, আপনি ব্রহ্মকটাহধাত্রী (ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়)—ইহা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

অন্য এক উপায়ে এই মহান অনুভবের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়; পূর্বকালে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণও এইভাবে আপনার বর্ণনা করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমি তাঁহাদের বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতেছি। দেবর্ষি নারদ সর্বদা আমাদের কাছে আসিয়া এইরূপ বাক্যদ্বারা আপনার স্তুতিগান করিতেন, পরন্তু তাহার অর্থ না বুঝিয়া আমরা শুধু সঙ্গীতই শ্রবণ করিতাম। হে প্রভু, অন্ধের গ্রামে যদি রবি স্বতই প্রকট হয়, তবে তাহারা সূর্যের তাপই অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ দেখিতে পায় না। ১৪০

তেমনি দেবর্ষি যখন অধ্যাত্মগান করিতেন, তখন তাহার রাগের খেলাই আমরা শুনিতাম, অন্য কিছু আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিত না। অসিত ও দেবল ঋষির মুখেও আমি আপনার এবম্বিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, পরন্তু তখন আমার বুদ্ধি বিষয়-বিষে মলিন ছিল। আর অপরের কথা কি বলিব? ব্যাসদেব স্বয়ং আসিয়া সর্বদা সর্বত্র আপনার স্বরূপ বর্ণনা করিতেন।

হে দেব, যেমন কেহ অন্ধকারে চিন্তামণি পাইয়া 'ইহা চিন্তামণি নয়' এই বুদ্ধিতে তাহাকে উপেক্ষা করে, পরে সামান্য সূর্যোদয় হইলে তাহা চিনিতে পারিয়া বলে, 'ইহাই চিন্তামণি'—তেমনি ব্যাসাদি মহর্ষিগণের বাক্য আমার পক্ষে (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) রত্নের খনিসদৃশ; পরন্তু হে দেব, আপনার অভাবে আমি তাহা বৃথাই উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

পরশমণি

শ্রীমতী বিভা সরকার

পরশমণির পরশ পেয়েছি
ওগো অন্তর্যামী!
নয়নে আমার একি অপরূপ—
তুমি আসিয়াছ নামি!
মিলন জেনেছি তাই এ বিরহ,
অরূপে হৃদয় খোঁজে অহরহ।

কে বলে তোমার কোন রূপ নাই?
অরূপ রূপের শেষ!
স্রোতে ভাসা ফুল পায় যদি কূল,
প্লাবিয়া উঠিবে প্রাণের দুকূল।
শেষের সে ক্ষণে অশরীরী মায়া
ধরিবে কি নব বেশ?

'লাগ্ ভেলকি লাগ্'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বাজিকর ও তাহার প্রদর্শিত ভেলকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রিয় উপমা ছিল— ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টির উপমা। একটি খালি ঝুড়িকে ঢাকিয়া দিয়া ঢাকনির উপর কাঠি ঠেকাইয়া যাদুকর বলিতেছে, লাগ্ ভেলকি লাগ্। তাহার পর যেই সে ঢাকনি তুলিয়াছে, অমনি ঝুড়ির ভিতর হইতে এক ঝাঁক পাখী বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। দর্শকগণ চোখকে অবিশ্বাস করিতে পারে না, অথবা কেমন করিয়া শূন্য ঝুড়ি হইতে পাখী বাহির হইল তাহারও হদিশ খুঁজিয়া পায় না। ইহারই নাম ভেলকি। নাই অথচ আছে, দেখা যাইতেছে— কিন্তু কেমন করিয়া যে দেখিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় লাগিয়া আছে। যাহারা ভেলকি দেখে তাহাদের অভিজ্ঞতা এই প্রকার। কিন্তু ভেলকি যে দেখায়—বাজিকর— তাহার জ্ঞানে কোনও অস্পষ্টতা নাই। সে জানে, যে পাখী সে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সত্য নয়, সে-ই সত্য। তাহার কাঠি ঘুরানো এবং 'লাগ্ ভেলকি লাগ্' বলাটা সত্য—কিন্তু ভেলকি যাহা প্রকাশ পায়, তাহা একেবারেই ভুয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—'কি জান, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। জীব-জগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলে-পিলে, এ সব বাজিকরের ভেলকি। এই আছে, এই নাই।' (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩।১৭।২)

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারেন না। তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়িতে স্ত্রীপুত্র-কন্যাজামাতা-পৌত্রপৌত্রী-দৌহিত্রদৌহিত্রী-পরিশোভিত মোটা-আয়-পরিপুষ্ট সুখসামঞ্জস্যপূর্ণ সংসারে কখনও শূন্য ঝুড়ি হইতে পাখী উড়িয়া আকাশে মিলাইয়া যায় নাই। বিচিত্র বর্ণের পাখী তিনি অহরহঃ দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা ভেলকি নয়, সত্য পাখী। অবিনাশ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'আছে' কখনও 'নাই' হয় নাই। তিনি কি করিয়া বিশ্বাস করিবেন 'আর সব অনিত্য'?

কিন্তু মালতীর কথা আলাদা—অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেশী ৺বিনয় মিত্রের বিধবা পত্নী মালতী। বিনয় মিত্র ছিলেন খ্যাতিমান্ অধ্যাপক। কতই আর বয়স হইয়াছিল? মাত্র ত্রিশ। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষুদ্র সংসারটি—বেশী টাকা-কড়ি না থাকিলেও নিবিড় শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল! বিনয় মিত্র কলেজের পথে একদিন লরী চাপা পড়িলেন। মাত্র ৪ ঘণ্টা বাঁচিয়া ছিলেন। মালতী হাস-পাতালে গিয়াছিল, কিন্তু বিনয় মিত্র তখন সংজ্ঞাহীন। স্বামী একটিবার চোখ চাহিয়াও স্ত্রীর নিকট শেষ বিদায় লইতে পারিলেন না। এই পৃথিবীর সকল আলোই মালতীর নিকট নিভিয়া গিয়াছে। মালতী হাসিবে, না কাঁদিবে? অন্ততঃ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শন মালতী বিশ্বাস করিতে পারে না। একদিন মালতী ভগবানকে বিশ্বাস করিত। ভগবানের দয়াতেই তো এমন শিবতুল্য পতি সে পাইয়াছিল, পাঁচটি বৎসর যেন একটা একটানা আনন্দের জোয়ারে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সেই করুণাময় ভগবানের মনে এমন নিষ্ঠুরতা কি করিয়া লুকাইয়া ছিল? এত বড় প্রচণ্ড আঘাত ভগবান কি করিয়া তাহার উপর হানিলেন? না—ভগবান

নাই। এমন বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত ভগবান থাকিতে পারেন না। অথবা ভগবান ঠিক আছেন, কিন্তু তাঁহার কাজের রীতিই এইরূপ—আলোক-আঁধার-মিশানো, হাসি-কান্না দিয়া গাঁথা, অস্তি-নাস্তির দুর্বোধ্য ইন্দ্রজাল? না—মালতী কিছুই বুঝিতে পারে না। ছেলেবেলায় দেখা ভোলা বাজিকরের যাদুখেলার কথা মনে পড়ে। অনেক দর্শক-দর্শিকার মধ্যে উপবিষ্টা পিসিমাকে ডাকিয়া ভোলা বলিয়াছিল, মা ঠাকরুন, এই দেখুন আমার হাতে একগাছি সুতো। মন্তোরের বলে একে সোনার হার ক'রে দিচ্ছি। ভোলা সুতাগাছটি হাতের মুঠায় লইয়া মন্ত্র পড়িয়াছিল—লাগ্ ভেলকি লাগ্। তারপর মুঠা খুলিয়া বাস্তবিকই সরু একগাছি সোনার হার বাহির করিল। পিসি-মা নিজের হাতে উহা ধরিয়াছিলেন। বলিলেন, ঠিকই হার। কিন্তু রাঙা মাসিমা যখন উহা ধরিতে গেলেন তখন উধাও! পিসিমা হতভম্ব। মালতী ভাবিতেছে—তাহার স্বামী কি বাস্তবিকই রক্তমাংসের শরীর লইয়া পাঁচ বৎসর তাহার জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, না তিনি পিসিমার হাতে ভোলা বাজিকরের সৃষ্ট মিথ্যা সোনার হার?

* * *

বিপিন বসুর একটি চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় কুড়িখানি বাড়ির মালিক বিপিন বসু। একমাত্র পুত্র মলয়ের বিবাহের সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন। কত আশা, কত আনন্দ, কত তৃপ্তি লইয়া বসু-দম্পতি দিন গণিতে-ছিলেন। কিন্তু ঠিক বিবাহের একুশ দিন আগে হঠাৎ মলয় টাইফয়েডে পড়িল। দুর্ভাবনা ও আতঙ্কের মধ্যে মাতাপিতার দিন কাটিতে লাগিল। চিকিৎসা ও সেবাযত্নের ত্রুটি নাই, কিন্তু অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলিল। অবশেষে কী নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যেই না বিধাতা ভবিতব্য ঘটাইলেন। মলয় মরিল ঠিক সেই দিনে এবং সেই সময়ে, যে তারিখে ও লগ্নে তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল! সে পিতার একটি চোখ যেন সঙ্গে লইয়া গিয়াছে—যে চোখ দিয়া বিপিন বসু এই পৃথিবীর শোভা-সম্পদ, জীবনের মাধুর্য নিরীক্ষণ করিতেন। বিপিন বসুর একটি চোখ আছে। সেই চোখ তাঁহার কোন্ কাজে লাগিবে? সে চোখ দিয়া অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। গুরুদেব সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, বিপিন, ভগবান মঙ্গলময়। বিপিন বসু ধর্মভীরু, গুরুদেবের কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু মঙ্গলের সংজ্ঞা কি, তাহা বিপিন বসু বুঝিতে পারেন না। মঙ্গল কি স্বাভাবিক পথে মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া আসিতে পারে না?

* * *

রাজবল্লভ স্ট্রীটের ঐ মোড়ের বাড়ীটির এক-তালা হইতে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া নিত্য গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যান—তাঁহার কাহিনী শুনিবে? মেয়েটির নাম টিয়া—তাঁহার একমাত্র কন্যার একমাত্র দুহিতার একমাত্র সন্তান। আত্মীয় বলিতে ভদ্রলোকের এই বালিকাটিই এখন সম্বল। স্ত্রী ৺কাশীলাভ করিয়াছেন অনেক বৎসর। ভদ্রলোক কন্যার মুখ চাহিয়া ছিলেন।

কন্যা তো গেল, জামাতাও। দৌহিত্রী রহিল। তাহাকে মানুষ করিলেন, বিবাহ দিলেন। সেও একদিন মৃত্যুশয্যায় 'দাদু টিয়া রইল, দেখো'—এই কাতর মিনতি জানাইয়া চোখ বুজিল। টিয়া মায়ের দাদুকে 'দিয়া' বলিয়া ডাকে, বৃদ্ধ ডাকেন—টিয়া। টিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বড় আদরভরে সাড়া দেয়, দিয়া। দিয়ার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়—অবিশ্রান্ত কান্না। কিন্তু এক ফোঁটা জলও চোখে আসে না। অশ্রুর সকল উৎস চিরদিনের মতো তাঁহার শুকাইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে মনে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান তোমার সংসারে এ কি নিয়ম?

ভগবান মুচকি মুচকি হাসেন। সোজা উত্তর দিতে পারেন না।

এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এতই সোজা যে শুনিলে লোকে ভগবানকে লাঠি লইয়া তাড়া করিবে। বলিবে, বেকুফ, ইয়ারকির আর জায়গা পাওনি? ভগবান তাই শাস্ত্র-বাচস্পতিদের উপর ভার দেন ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর তৈরী করিতে। তাঁহারা শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া বিধাতার বিশ্ব-বিধানের কত গালভরা চুলচেরা নিয়ম আবিষ্কার করিয়া যান। ভগবান আবার হাসেন। শাস্ত্রবাচস্পতিরা তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন বটে!

নন্দীর মতো নাছোড়বান্দা ব্যক্তি কিন্তু পণ্ডিতদের পথ না মাড়াইয়া সিধা ভগবানকেই চাপিয়া ধরে, বলিতেই হইবে। শিবঠাকুর বলেন, সোজা উত্তর আর কি বৎস! সঙ্কেত দ্বারা তোমাকে বুঝাইব। ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো বুঝিয়া নিও। হঠাৎ একটি ভারী শব্দ হইল। নন্দী চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু ইহা কিসের শব্দ?

শিব। রাবণ জন্মগ্রহণ ক'রল, তাই শব্দ।

একটু পরে অনুরূপ আর একটি তীব্র আওয়াজ। বিস্মিত নন্দী জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর এবার কিসের শব্দ?

শিব। (হাসিয়া) এবার রাবণ বধ হ'ল। সিদ্ধি বাটিতে বাটিতে নন্দীর ঘটে বুদ্ধি কিছু জমিয়াছিল বইকি! সে ঠিক বুঝিয়া লইল যে ত্রিলোক-সন্ত্রাসকারী মহাবল রাবণের জন্ম-কর্ম, তথা স্বয়ং নারায়ণের মর্ত্যে অবতরণ, অযোধ্যা-লীলা, বনবাস, রাবণবধ—মানুষের বিচারে এত যে বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা তাহা শিবঠাকুরের দৃষ্টিতে কয়েকটি মুহূর্তের একান্ত তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। আর শিবের দৃষ্টিই তো সত্য দৃষ্টি। সত্যদৃষ্টিতে জগৎসংসারের বিপুলতা, ঘটনারাশির বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা—'লাগ্ ভেলকি লাগ্' ছাড়া আর কিছু নয়। কেন হইল, কি করিয়া হইল, কখন হইল, কোথা হইতে হইল—এ সকল প্রশ্ন সত্যদৃষ্টিতে নিরর্থক।

বাল্মীকি মুনি সবে মুনিত্ব লাভ করিয়াছেন, হৃদয়-বৃত্তিগুলি খুবই কোমল, ব্যাধ-শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত দেখিয়া এবং শোকনিমগ্ন স্ত্রী-বকটির করুণ কান্না শুনিয়া তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? সহানুভূতি উথলাইয়া উঠিয়াছে। ক্ষোভে নিষ্ঠুর ব্যাধকে অভিশাপ দিয়া বসিলেন,—'মা নিষাদ' ইত্যাদি। এই নিদারুণ শাপ শুনিয়া ব্যাধ কি করিয়াছিল, তাহা রামায়ণে লিপিবদ্ধ নাই। ভয় পাইয়াছিল নিশ্চিত, কিন্তু ইহাও ঠিক যে সে হো হো করিয়া হাসিয়াও উঠিয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিল, মুনিঠাকুর, একটি ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে যদি এত বিচলিত হন তো সারাজীবন করিবেন কি? এই পৃথিবীর প্রতি হাটে, প্রতি ঘাটে, অলিতে গলিতে, ঘরে বাইরে প্রত্যহ প্রতি-নিয়ত যে দুঃখদ্বন্দ্ব দ্বেষহিংসা অন্যায়-অবিচারের অবিচ্ছিন্ন স্রোত চলিয়াছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনিবহের শোক-দুঃখ-সন্তাপের যে মর্মন্তুদ বিলাপ প্রতিক্ষণ আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহা রোধ করিবেন কোন্ কৌশলে? কাহাকে অভিশাপ দিবেন? কত অভিশাপ দিবেন?—এ রোধ করা যায় কি?

না, যায় না। বাল্মীকি এই নগ্ন সত্য পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন রামায়ণ লিখিতে বসিয়া। ভারতবর্ষের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা কাব্যে লিপিবদ্ধ করিবেন, এই কল্পনা ঋষিকে খুবই উৎসাহিত করিয়াছিল। বড় আশা বড় আনন্দ লইয়া, কালি কলম লইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু লেখা শুরু করিয়া দেখিতে পাইলেন কাজটি আদৌ সুখকর নয়।

আশা এবং নৈরাশ্য, পুণ্য এবং পাপ, আলো এবং আঁধার, হর্ষ এবং বিষাদের এত বিচিত্র ভিড়কে সুষ্ঠুভাবে সাজাইবেন কি করিয়া? রামচরিত তো নয়—দুঃখের বন্যা। বৈকুণ্ঠবিলাসী নারায়ণের কথা বর্ণনা করা ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ, অনেক তৃপ্তিকর, কেননা সেখানে মায়ার দ্বন্দ্ব নাই। নারায়ণ অবিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপে বর্তমান। যত পার তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্যের বর্ণনা করিয়া ভরপুর হইয়া যাও। কিন্তু সেই নারায়ণ যখন পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মানবীয় জীবনরীতি অনুসরণ করেন, তখন ব্যাপারটা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই পার্থিব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সাধারণ মানুষের চেয়ে বোধ করি এক শত গুণ বেশী তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। তাই চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাল্মীকিকে রামায়ণের সাতকাণ্ড শেষ করিতে হইয়াছিল।—শেষ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন নাই কি, ভগবান, তোমার জন্ম-কর্ম লিপিবদ্ধ তো করিলাম, কিন্তু মর্ম তো নিজে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না? যাহা কিছু করিলে সবটা কি সত্য না ভেলকি? ভগবান! তুমি কি বাজিকর?

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী মহাগ্রন্থ রামায়ণে সংগ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ সহস্র সহস্র মানুষেরও তো জীবন আছে, জীবনের ঘটনাবলী আছে। সেই জীবন-কাহিনীও ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলে এক একখানি ক্ষুদ্র রামায়ণ হয় না কি? আলোক-আঁধার, উল্লাস-বেদনা, জয়-পরাজয়, গৌরব-অপমান—এইরূপ প্রত্যেক রামায়ণের উপজীব্য নয় কি? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে আমরা যে বিস্ময় অনুভব করি, উহার ঘটনাবলীর কারণ পরম্পরা আবিষ্কার করিতে গিয়া যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, ঐ বিস্ময় ও ব্যর্থতা যে শুধু রামায়ণের ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, প্রত্যেক মানুষের জীবন-প্রবাহে উহা প্রযোজ্য। অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় হয় তো ব্যতিক্রম। তিনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বলিয়া বাজি ও বাজিকরের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে লাভ করিতে হয় নাই। কিন্তু এই সংসারে অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্তই বিরল। মালতী-বিপিনবসু রাজবল্লভ স্ট্রীটের বৃদ্ধ ভদ্রলোকরাই এই সংসারে ছড়াইয়া আছে। তাঁহাদের জীবনের তথ্য সংগ্রহ কর। দেখিবে রামায়ণের মতো পদে পদে দুর্বোধ্যতা, অসংলগ্নতা। ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া ঘটিল—তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই, ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না।

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যতিক্রম নন; ঈশানকোণে মেঘ কখন যে দেখা দিবে কে বলিতে পারে? কাহার চাঁদের হাট কোন মুহূর্তে ভাঙিতে আরম্ভ করিবে—কে জানে? অতএব বেশী নাচাকোঁদা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; শোকে মুহ্যমান হইয়া শুইয়া পড়াও মনুষ্যত্ব নয়। অনাসক্ত সত্যসন্ধ দৃষ্টি লইয়া জীবনের সম্মুখীন হও। জীবনে সুখ আছে, দুঃখও আছে; জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে; আশা আছে, নৈরাশ্যও আছে। আলোক আঁধার—দুটারই জন্য প্রস্তুত থাকিও, জয় পরাজয়—দুইটিকেই সমভাবে অভিনন্দিত করিও। এই ভাবেই আমরা সংসারকে জয় করিতে পারি, জয় করিয়া সংসারাতীত অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্যকে লাভ করিতে পারি। সেই সত্যের নাম ভগবান—পরমাত্মা। তাঁহাতে কোনও দ্বন্দ্ব নাই, আলোছায়া নাই। তিনিই বাজিকর, তাঁহাতে কোনও অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নাই। যত অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা বাজিতেই—তাঁহার সৃষ্টিতেই।

মুণ্ডক উপনিষদ বলিতেছেন, 'পরীক্ষ্য লোকান্—'। সংসারকে যাচাইয়া দেখিতে হইবে,

তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই বিশ্লেষণের দ্বারাই সংসারের মায়িক স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি, শুধু মালতীর স্বামীবিয়োগে নয়, বিপিন বসুর হৃদয়বিদারক শোকে নয়, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ে নয়, সংসারের প্রত্যেকটি ধাপে কুয়াসা ঢাকিয়া রহিয়াছে; বিপদ কুণ্ডলী পাকাইয়া আক্রমণের সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে, মর্মন্তুদ হাহাকার বুক ভাঙিয়া উপরে প্রকাশ পাইবার জন্য অন্তরদেশে প্রতীক্ষমাণ। তখনই আমাদের হৃদয় বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ হয়, আমরা সংসারে আসক্তি ত্যাগ করিতে শিখি, বুঝিতে পারি এই দুর্বোধ্য জীবন-প্রহেলিকার সমাধান শুধু ভগবদ্জ্ঞানে, ভগবদ্‌ভক্তিতে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—কি দেখছিলাম জান? ভগবতী মূর্তি—পেটের ভিতর ছেলে, তাকে বের ক'রে আবার গিলে ফেলছে। ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হ'য়ে! আমায় দেখাচ্ছে যে সব শূন্য। যেন বলছে, লাগ্! লাগ্! লাগ্ ভেলকি লাগ্! (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৪।২৭।২)

প্রকাশ এবং আবরণ, সৃষ্টি এবং সংহার—এই বিরুদ্ধ ক্রিয়া পাশাপাশি তীব্রবেগে প্রতিনিয়ত চলিয়াছে—ইহারই নাম সংসার, ইহারই নাম মায়া। সাধারণ দৃষ্টিতে মায়াকে আমরা বুঝিতে পারি না। সংসারের স্বরূপ আমরা ধরিতে পারি না। মায়া আমাদের শরীর মন বুদ্ধিতে জাঁকিয়া বসিয়া থাকে। আমরা জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলি—হাসি, নাচি, উৎসাহে লাফাই, ছুটাছুটি করি, আবার ঘা খাইয়া বসিয়া পড়ি, কাঁদিয়া বুক ভাসাই। মায়াকে বুঝিবার অজস্র সুযোগ আমাদের চোখের সম্মুখে আসে, কিন্তু কোন সুযোগই আমরা কাজে লাগাইতে পারি না।

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে কচিৎ কখনও আমাদের ঘুম ভাঙে। তখন আমাদের জিজ্ঞাসার মনোবৃত্তি উপস্থিত হয়। আমরা সংসারের চিরপ্রচলিত ঘটনাপুঞ্জকে নূতন চোখে দেখিতে আরম্ভ করি। জিজ্ঞাসা করি, কী তাজ্জব ব্যাপার—ইহা কি সত্য না স্বপ্ন?

স্বপ্নে যেমন অজস্র বিরুদ্ধতা একসঙ্গে হাজির হয়, জাগ্রৎকালের সংসারেও প্রতি স্তরে আমরা সেইরূপ বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই। একদিন যেখানে সুসমঞ্জস নির্ভুল হিসাব দেখিতাম, সেখানে হাস্যকর গরমিল চোখে পড়ে। সমস্ত সংসার তখন মনে হয় ভেলকি, বাজিকরের সৃষ্টি। এই অভিজ্ঞতা আধ্যাত্মিক পরম সত্যলাভের একটি অপরিহার্য ধাপ। জগতের মায়িকতা বুঝিতে পারিলে মায়াতীত শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং তাঁহার কৃপায় একদিন সে ইচ্ছা সফল হয়। ভগবানকে লাভ করিয়া আমাদের মানব-জীবন ধন্য হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা*

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

'জগদুদ্ধারহেতুস্ত্বম্ অবতীর্ণা যুগে যুগে।'

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান যখন যুগ-প্রয়োজনে ধর্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন, সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তিও তখন ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়া লীলার পূর্ণতা সাধন করেন।

এ যুগে ভারতের নবশক্তিপীঠ এই জয়রাম-বাটীই তাঁহার আবির্ভাব-স্থান। এই গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি জগতের বহু নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যদিও তাঁহার স্থুল শরীর অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি সূক্ষ্মবিগ্রহে অলক্ষ্যভাবে থাকিয়া এখনও তিনি বহু নরনারীর সর্বকল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়া তাহাদের ধন্য করিতেছেন।

অশেষ করুণায় একবার শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিয়াছিলেন, শরৎকে লিখে আমার এই জন্ম-স্থানে বাড়ী কর, ছেলেরা এলে কোথায় থাকবে, তোমরা কোথায় থাকবে? রাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, থাম্ রাধু, বাড়ী-ঘর-দোর হ'লে আমরা এখানে থাকবো।

তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান স্বামী সারদানন্দজী তাই মন্দির নির্মাণ করাইয়া ভক্ত-সন্তানদের পূজা অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। অনেক নরনারী ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন ও শান্তি এবং আনন্দলাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল সেই কৃপাময়ী এই সন্তানের মাধ্যমেই তাঁহার সেবা করাইয়া লইতেছেন এবং তাঁহার আশ্রিত ভক্ত সন্তানগণেরও সেবা করিবার সুযোগ দিতেছেন। তাঁহার ভক্ত সন্তানগণ অনেকে আমাকে অনুরোধ করেন 'মার সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন'। সেই মহাশক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া বালকত্বের পরিচয়। কোন ছোট সন্তানকে যদি বলা যায়, 'হ্যাঁরে, তোর মা কেমন?' সে কি বলিবে! সে তখন—'মা এই করেন, তাই করেন, মার এই এই শক্তি আছে' প্রভৃতি বলিবে। সে কোন সংবাদই রাখে না—সে জানে, তাহার মা স্নেহময়ী জননী, সর্ব রকমে তাহাকে রক্ষা করেন এবং তাহার একমাত্র আপনার ও আশ্রয়স্থল। মুখের ভাষায় শুধু ব্যক্ত হয়, আমার মা খুব ভাল।

শ্রীমার সম্বন্ধে আমার যাহা স্মরণে আছে, তাহারই যৎসামান্য বলিতেছি:

প্রথম দর্শন—৺প্রসন্নমামার বাড়ীর মধ্যে তাঁহার সেই পুরাতন ঘরের (যে ঘরে তিনি বাস করিতেন) বারান্দায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আসিয়া মাকে প্রথম দর্শন ও প্রণাম করিলাম। পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। প্রণাম করিতেই মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও চিবুকে হাত দিয়া স্নেহ-চুম্বন করিলেন। আমি তাঁহার করুণার অমৃতময় ধারা উপলব্ধি করিলাম। বলিলেন, 'বাবা, কখন এলে—সন্ধ্যা হ'য়ে যাচ্ছে, আজ থাকছ তো?' আমি এত করুণা ও ভালবাসায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইতে লাগিল যেন আপনার হই-তেও আপনার মা। বলিলাম—'না মা, থাকবো না—আমি কোয়ালপাড়ায় যাব।' আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া মায়ের প্রদত্ত কিছু প্রসাদ লইয়া কোয়ালপাড়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন

* শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে জয়রামবাটীতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণ হইতে সংকলিত।

করিলাম। তখন হইতেই কেমন একটা করুণার আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম, কখন আবার মার কাছে যাইব! সুযোগ পাইলেই মার কাছে আসিয়া অন্তরের ব্যথা নিবেদন করিয়া শান্তি ও আনন্দ পাইতাম। তিনিও প্রেরণা দিয়া অপার করুণায় কৃতার্থ করিতেন। দেখিয়াছি—তাঁহার নিকট কোন সন্তান ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি তাহার মনের সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিতেন—স্বচ্ছ কাচের আলমারির মধ্যস্থ সব কিছু যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি তাঁহার নিকট কেহ উপস্থিত হইলেই তাহার অন্তরের বিষয় মা সমস্তই জানিতে পারিতেন। যদি কেহ ভাব গোপন করিয়া কিছু বলিবার জন্য চেষ্টা করিত, ঈষৎ হাস্যবদনে মা সব উত্তর দিতেন, সব বুঝিতেন, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিতেন না।

তখন তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁহার সন্তানদিগকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিতেন; তখনকার দিনে প্রবল ব্রাহ্মণসমাজ এইরূপ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দীক্ষাদান এবং সকলের সহিত সন্তানের মতো আচরণ করায় তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও সময়ে সময়ে তাঁহার বিশ্বমাতৃত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মা যুগপ্রয়োজনে আসিয়াছেন। একদিন দেখা গেল—এইখানেই নূতন বাড়ীতে মা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত, প্রায় শয্যাশায়ীই আছেন—শরীর অত্যন্ত দুর্বল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিলেন—মায়ের শরীর এখন অত্যন্ত খারাপ, দীক্ষা প্রভৃতি এখন বন্ধ করিয়া দাও, কেহই যেন তাঁর কাছে যেয়ে বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।

তাঁহারই আদেশে মায়ের দরজার পাশে আমি বসিয়া থাকিতাম, কাহাকেও ভিতরে যাইতে দিতাম না, এই সময়ে বরিশালের এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। অনাহারে থাকিয়া মায়ের কাছে দীক্ষা লইবে আবেদন জানাইল। 'এখন দীক্ষা হইবে না' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে আরও উত্তেজিত হইতে লাগিল। কারণ, তাহার মাতৃদর্শনে ব্যাঘাত হইতেছে। সেও বরিশালের লোক, আর আমিও নাছোড়বান্দা। বাগবিতণ্ডা চরম অবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল। ঘর হইতে জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা সেই দুর্বল অবস্থায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আসতে দিচ্ছ না?' আমি বলিলাম—শরৎ মহারাজ বারণ করেছেন, আপনার শরীর অসুস্থ, তাই কাকেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'শরৎ কি বলবে? আমাদের এই জন্যই তো আসা।' তাঁহারা যে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই এক কথাতেই তাহার আভাস পাওয়া গেল।

কোন ভক্ত-সন্তান মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মা, কেউ আপনাকে কালী বলে, কেউ বলে দুর্গা, কেউ বা জগদ্ধাত্রী, আমরা তো বিশ্বাস করতে পারি না; শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে তার পূর্ণ বিশ্বাস এনেছিলেন, সেইরূপ আপনি যদি বলেন তবেই বিশ্বাস হয়।'

তদুত্তরে মা বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, যে যা বলে তাই।' ভাষাটি এত সহজ ও সরল, কিন্তু—এই কথাতেও তাঁহার প্রতি :বিশ্বাস আনা সুদূর পরাহত। যে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে, তাহারই জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার কথা বলিতে গেলে শেষ হয় না। একদিন আমি মাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম—'মা, মনের

যে রকম অবস্থা তাহাতে ডুবে যাব ব'লে বোধ হয়।' মা শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—'সে কি গো—বল কি গো—ঠাকুরের সন্তান, আমার ছেলে—ডুববে কি, কখনই না।' তাঁর সেই অমোঘ আশীর্বাদই আমার জীবনের সম্বল।

শুভজন্মতিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে তাঁর স্থূল শরীরে যে শেষ তিথিপূজা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিও অতি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার গৃহে তক্তপোষের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিলেন, কোণে রাধুর সেই শিশু ছেলেটি—দেখিয়া মনে হইল আদ্যাশক্তির কোলে যেন শ্রীগোপাল বসিয়া রহিয়াছেন। আমাকে ফুল দেবার জন্য বলিলেন, আমি একটি বড় মালা তাঁহার সেবিকার হাতে দিয়া মায়ের গলায় পরাইয়া দিতে বলিলাম। দীর্ঘ মালাটি জানু পর্যন্ত ঝুলিতে লাগিল। আমি ফুল লইয়া শ্রীমায়ের পাদপদ্ম পূজা করিলাম এবং মার কাছে প্রার্থনা করিলাম—মা, এই শুভদিনে আপনার অনেক সন্তানের আজ দর্শন ও পূজা করিবার ইচ্ছা থাকলেও সকলের আসা সম্ভব নয়—আমি তাই সকলের হ'য়ে আপনার পাদপদ্ম পূজা করলাম।

মা বলিলেন, আমার ছেলেরা যে যেখানে আছে—ঠাকুর তাদের কল্যাণ করুন—মঙ্গল করুন। আজ ঐ সূক্ষ্মবিগ্রহরূপিণী পাদপদ্মে প্রার্থনা করি—যাহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বা যাহারা আসিতে পারেন নাই—তিনি সকলেরই মঙ্গল করুন, কল্যাণ করুন এবং দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া শান্তি ও আনন্দে রাখুন।

কে তুমি?

শ্রীঅধীর সরকার

কে তুমি? কোথায় থাকো? কখনো কি দেখেছি তোমারে?
তুমি কি আকাশে থাকো--মহামৌনস্তম্ভিত সুনীলে?
পর্বতের শুভ্রতায় দিগন্তের শ্যামল মিছিলে?
নিয়ত তরঙ্গভঙ্গে আন্দোলিত ক্ষুব্ধ পারাবারে?
কী জানি, কি মনে হয়, তবুওতো বহুদিন জানি
একজন 'তুমি' আছ—যেমন মেঘেতে থাকে জল,
শাখার সবুজ স্বপ্নে—সেইমতো তোমারেও মানি—
রূপে গন্ধে স্বাদুতায় পরিপূর্ণ কত শত ফল।
আবার আশ্চর্য দেখি, কেমনে গোপনে ধীরে ধীরে
মানুষে মানুষে জাগে মধুময় ভালবাসাবাসি;
মায়ের হৃদয় ঘিরে যে মহিমা বারংবার ফিরে
সে কি তুমি আছ বলে? দেখি স্বচ্ছ শিশুদের হাসি!
কি যেন, কে যেন আছে; ভাবি, তবু পাইনাক' সীমা—
অথচ আশ্চর্য দেখি জলে স্থলে তোমারই মহিমা।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

[ফাল্গুন-সংখ্যার পর]

॥ দুই ॥

কোন প্রগতিশীল দেশের উন্নত সংস্কৃতি অবিমিশ্র উপাদানে গঠিত হয়নি। কর্মের সঙ্গে ধর্ম, দেহের সঙ্গে আত্মা, ঐহিকতার সঙ্গে ভগবন্মুখিতা, বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবনার সমন্বয়েই জীবন্ত সংস্কৃতি একটা সর্বাশ্রয়ী রূপ লাভ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রগতিশীল দেশগুলিতে সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ দেখে আমরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হই। ভাবি, বস্তুনির্ভরতাই বুঝি সে সমস্ত দেশের প্রাণবান্ সংস্কৃতির মর্মমূলে। যে বিরাট আত্মিক শক্তি এ সমস্ত দেশের সাধারণ অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় থেকে সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছে, সে সম্পর্কে অনেক সময় আমরা অবহিত হই না। বীর্যের সঙ্গে বিপুল ত্যাগ, অনির্বাণ কর্মৈষণার সঙ্গে নীরব আত্মিক সাধনাই হ'ল পাশ্চাত্য প্রগতিশীল জাতিসমূহের সর্বাঙ্গীণ জীবন-বিকাশের প্রধান প্রেরণা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ধারণে এ সত্য আজ তর্কাতীত।

শুধু প্রগতিশীল আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কেন, যে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকারের জন্যে আজ আমরা গর্বিত, সে সংস্কৃতির উপাদানও বিমিশ্র। সে উদার সংস্কৃতির একদিকে যেমন বীর্যের সাধনা, ঐহিক ভোগ সম্ভোগের জন্যে তীব্র উত্তেজনা, তেমনি আর একদিকে রয়েছে ইহজীবনোত্তর চিরন্তন জীবনের আদর্শ লাভের জন্য অনন্ত আকূতি। এ মিশ্র জীবনবোধের পরিচয় অনুস্যূত হ'য়ে আছে ভারতীয় পুরাণে, বেদ-বেদান্তে, চার্বাক দর্শনে, ক্লাসিকেল সাহিত্যে, বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে আর শঙ্করভাষ্যে। এক যুগে যখন জাতির জীবনে ভোগের মাত্রা বেড়েছে, পরবর্তী যুগে তার বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া, আবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভিত্তিতে মানব-জীবনের আদর্শ-অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা যখন শুষ্ক জ্ঞান-সাধনার রূপ নিয়েছে, পরবর্তী যুগে সে শুষ্কতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে হৃদয়ভিত্তিক প্রেমসাধনায়। একযুগে শুধু বিশ্বাস ভারতীয় হিন্দুকে অনুপ্রাণিত করেছে অগণিত দেবদেবীর পূজায় আর যজ্ঞে বলির নামে নির্মম জীবহত্যায়, আর একযুগে সেই বিশ্বাসের উপর জয়লাভ করেছে যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী উদার জীবনদর্শন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রেম, ভোগলোলুপতা ও বৈরাগ্য—এ সমস্ত বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘর্ষে জেগে উঠেছিল বিচিত্রধর্মী প্রাচীন প্রাণবন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সে যুগের সংস্কৃতিপ্রসার ও রূপান্তরের মূলে রয়েছে সমকালীন ভারতীয় জীবনে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ফলে যুগে যুগে মানুষের মুক্ত মনে উদিত হয়েছিল স্বতন্ত্র মতবাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও লাভ করেছে নিত্য নতুন রূপ। মধ্যযুগে ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাল, আর পরমত-অসহিষ্ণু বিদেশী শাসকের চাপে পড়ে তাদের মনের স্বাধীনতাও

হ'ল অন্তর্হিত। এ মানসিক পরাধীনতার অনিবার্য প্রভাব দেখা দিল সমাজ-জীবনে। সমাজ হ'য়ে উঠল রক্ষণশীল, ব্যক্তিমন হ'য়ে উঠল সঙ্কীর্ণ। ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজ-মন গড়ে উঠল তদনুরূপ সংস্কারের আশ্রয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি হ'ল ব্যাহত।

বহুকালের তিমিরাচ্ছন্ন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগন্তরেখা আবার নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল ভারতে ইংরেজ অধিকারের ফলে। এবারেও বিজয়ী রাজা বিদেশী, কিন্তু মধ্যযুগের রাজার মতো পরমত-অসহিষ্ণু নয়। সাত-সাগরের পার হ'তে এ বিদেশী শাসকের জাতি বন্ধনভীরু ভারতীয় জীবনের সামনে তুলে ধ'রল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উচ্চ আদর্শ, আর যুক্তিবাদের তীব্র আলোক। সে আলোকে প্রথম আলোকিত হ'ল 'ভারতপথিক' রামমোহনের মন। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিবিচারে বিশ্লেষণাত্মক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন এ মহান্ চিন্তানেতা, আর বহু যুগের মুমূর্ষু স্বদেশীয় চিত্তে এক প্রবল ভাবান্দোলন সৃষ্টি করলেন তাঁর নব-উপলব্ধ জীবনবোধের সাহায্যে। স্বাগত জানালেন তিনি বিদেশীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সচল ও সবল রূপকে।

কিন্তু রামমোহনের সংস্কৃতি-সাধনা প্রধানতঃ বুদ্ধির সাধনা। পরিশীলিত মনের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে। সংস্কৃতি-সাধনার ক্ষেত্রে একই পথের পথিক ছিলেন সমকালীন প্রতিভাবান্ শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর আদর্শানুরাগী শিষ্যসম্প্রদায়। শুধু বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে সত্যোপলব্ধি চেষ্টার মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা বা উন্মাদনা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে উন্মাদনায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় যে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সে মুক্ত মননের আন্দোলন সমস্ত জাতির চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি সেদিন। শুধু সেদিন নয়, কোনদিনও পারেনি। বাঙালীর হৃদয় যুগে যুগে জেগেছে হৃদয়ের স্পর্শে, আনন্দের আবেদনে। ষোড়শ শতাব্দীতে—সে তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক ভাবনার যুগে শ্রীচৈতন্যের হৃদয়োত্থিত প্রেমভক্তির আন্দোলন শুধু বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকেনি—সে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল ভারতবর্ষের বহু স্থানে, এবং সৃষ্টি করেছিল হৃদয়ভিত্তিক একটি অভিনব ধর্ম। সে সঙ্কীর্ণ মানসিকতার যুগেও চৈতন্যপ্রবর্তিত এ অভিনব মানব-ধর্ম যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল সংস্কৃতি-সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল, সে ধর্মের প্রভাব আজও পৃথিবীর চিন্তাশীল ও শান্তিবাদী সম্প্রদায়ের উপর সমভাবে বিদ্যমান।

সে হৃদয়ের পথেই আহ্বান করলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জাতিকে একটা নতুন জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে। প্রেম, ভক্তি ও মানব-মাহাত্ম্যের উপর গভীরতর প্রত্যয়ই হ'ল সে হৃদয়ের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সে হৃদয় কি জ্ঞানবর্জিত? মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই বলেছেন: 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই' তাঁর নতুন ধর্মবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তিভূমি। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কেশবচন্দ্রের জীবনের পথও সেই একই হৃদয়চর্চার পথ। স্রষ্টার প্রতি অসংশয় ভক্তি ও বিশ্বাস, মানুষের শুভ-বুদ্ধির উপর সহজ প্রত্যয়, আর তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থিত সানুরাগ প্রেমের পথে তিনি জাতিকে আহ্বান করেছিলেন একটা নবতর জীবনধর্মের অনুশীলনের জন্য। কেশবচন্দ্রের আপাতবিক্ষুব্ধ অন্তঃস্তব্ধ জীবনের ইতিহাস এ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনেরই ইতিহাস। অতঃপর কেশবচন্দ্রের জীবন, কর্ম ও বাণীর মধ্য দিয়ে তাঁর বিশিষ্ট

জীবনোপলব্ধি ও সংস্কৃতি-সাধনা কী সবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ তিন ॥

পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনীষী কারলাইল একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন: 'The history of the world is the biography of the great men.' উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবর্ধনের আলোচনা প্রসঙ্গেও এ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। এ শতাব্দীতে যখনই কোন সংস্কৃতিসংকট উপস্থিত হয়েছে, তখনই দেখি সে যুগে এমন সব মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের মুক্ত জ্ঞান ও প্রেমের আলোকে জাতি দেখতে পেয়েছে সে সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার সংকেত। গত শতকের ভাববিক্ষুব্ধ বাঙালীর ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের জীবনচেতনা গভীরতর মুক্তির ইঙ্গিতে অর্থপূর্ণ। কী সে যুগ-সংকট, যার থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার-কামনাই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী অতন্দ্র সাধনা?

সে সংকট দেখা দিয়েছিল সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর একপেশে জীবন-সাধনায়। বস্তুধর্মী পাশ্চাত্য সভ্যতার নবালোকে জাতি তখন একটি নবীন জীবনস্বপ্নে বিভোর। ইংরেজ বণিকরাজের সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিজীবী বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থলাভের উপায়-সন্ধান পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে বাষ্প, বিদ্যুৎ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত বস্তুর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একটা সম্ভাবনাময় নতুন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সে জগৎ ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস ও বাহ্য আড়ম্বরের জগৎ। সে ভোগৈশ্বর্যময় স্থূল বস্তুজগতে সার্থকতা লাভ করাই ছিল সে দেশের জীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সে আসক্তি ক্রমশঃ আকৃষ্ট ক'রল পাশ্চাত্য ভাবধারায় অভিষিক্ত বাঙালী মনকে। চিত্ত-প্রকর্ষহীন এ আর্থিক ভোগলোলুপতা সে যুগের হঠাৎ-বড়লোকদের জীবনকে কিভাবে ক্লেদাক্ত ক'রে তুলেছিল, তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন গত শতাব্দীর ও এ-শতাব্দীর বহু সংস্কৃতি-সমালোচক।

শুধুমাত্র অর্ধশিক্ষিত লোকের প্রচুর অর্থাগম-চিন্তা বা ভোগলোলুপতায় নয়, সে যুগের শিক্ষিত-মনের চিন্তা ও ধ্যানধারণা ছিল প্রায় একই বস্তুধর্মী। যে যুক্তিবাদী, হিতবাদী বা মানবতা-বাদী পাশ্চাত্য দর্শন সে যুগের শিক্ষিত মনের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে, সে দার্শনিক আদর্শও মূলতঃ ইহজীবনসর্বস্ব। কেশবচন্দ্র নিজে সে যুগাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে:

'The politics of the age is Benthamism, its ethics utilitarianism, its religion rationalism, its philosophy positivism.'[১]

কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মার জাগরণ। সেজন্য শুধুমাত্র ঐহিক ভাবনাপূর্ণ পাশ্চাত্য জীবনদর্শন তাঁর কাছে মনে হ'ল— 'dull, mechanical unspiritual and lifeless.'—(যান্ত্রিক, জড় ও নির্জীব)।

ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে সে যুগের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে গতানুগতিক বিচারহীন সংস্কারের আনুগত্য, আর নবীনপন্থীদের মধ্যে চিন্তাস্বাধীনতার নামে সংশয়বাদ। এ উভয়শ্রেণীর বাঙালীর অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের গভীরতার অভাব ছিল সে কালের যুগসংকটের অন্যতম প্রধান কারণ।

সে যুগসঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ভাবপ্রবণ কেশবচন্দ্র সবল কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে-

১ K. C. Sen, Lectures in India, Great men (Sept, 1866), P. 81.

ছিলেন সমকালীন মানসিক জড়তাগ্রস্ত জাতিকে :

'The people of India must be roused from their lethargy and apathy, and saved from the dangers of smooth but treacherous materialism. The life of spiritual stagnation that we see around us is woeful; this spreading infection of sceptical fancies is apalling. The enslaved spirit of nation must rise and bestir itself freely to the holy activities of the higher life.'[২]

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনে পরবর্তীকালে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবেগকম্পিত কণ্ঠে আমরা যে বাণী শুনেছি, তারই পূর্বধ্বনি শুনতে পাই আচার্য কেশবচন্দ্রের কণ্ঠে। সে ১৮৬৬ খৃঃ-র কথা। কেশবচন্দ্র তখন আটাশ বৎসরের যুবক মাত্র।

আর ১৮৮২ খৃঃ (৪৪ বৎসর বয়সে) মৃত্যুর মাত্র দুবছর আগে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হ'তে কেশবচন্দ্র উচ্চারণ ক'রে গেছেন তাঁর পরিণত জীবনোপলব্ধির কথা সংযত গম্ভীর ভাষায় যে সত্য বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বকালের যুগসংকট হ'তে একটি জাতির মুক্তির ইঙ্গিত :

'সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ।...আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা......প্রথমেই বেদ-বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।

আমি বিশ্বাসী। বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না'[৩]

প্রার্থনা আর বিচারনির্ভর প্রত্যয়ের পথেই চালনা করতে চেয়েছিলেন তিনি জাতিকে জীবনের শ্রেয়োলাভের জন্য। প্রেয়লাভের পথকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। কিন্তু শ্রেয়োবোধহীন প্রেয় বস্তু লাভের পথ ছিল তাঁর কাছে ঘৃণিত। সে প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আলোচ্য।

জাতীয় জীবনের স্খলন দূর ক'রে জাতিকে মহত্তর জীবন-স্বপ্নে উন্মুখ ক'রে তোলবার জন্যে বহু সংস্কারমূলক কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যুগের কোন কোন সংস্কারক। সে যুগের ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সংস্কারকমাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঘোরতর বিপ্লবী। অন্যায় অধর্ম বা পাপ ব'লে যা তাঁর মনে হ'ত, তার সঙ্গে আপস করতে তিনি জানতেন না। সে জন্যে জাতীয় মনের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন তিনি—জাতীয় জীবনের উজ্জীবনের জন্যে। জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় মানসের জাগরণের জন্যে যেমন জোর দিয়েছিলেন তিনি প্রার্থনা ও প্রত্যয়ের উপর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তেমন জোর দিয়েছিলেন পাপবোধের উপর। এ পাপবোধের উৎসস্থল ব্যক্তিচিন্তা ও হৃদয়োত্থিত বিবেক। এ বিবেকের পথেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন তিনি আত্মভ্রষ্ট স্বদেশবাসীকে :

জীবনগ্রন্থের দ্বিতীয় কথা কি ? এ বিষয়েও আমার সঙ্গে অপরের অনৈক্য দেখিবে। পাপবোধ আমার অনেক প্রবল, অনেক জীবনে এত প্রবল নয়।......পাপদর্শনে পাপবোধ হইল ; পলকের মধ্যে সহজে পাপবোধ করিলাম।......আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি।[৪]

পাপ শুধু মানুষের বাইরের দুষ্কৃতির মধ্যে নয়, মনের মধ্যেও যদি মিথ্যাচার থাকে কেশবচন্দ্র তাকেও বলেছেন পাপ। এ পাপবোধের চেতনা কেশবচন্দ্রের চিত্তে সৃষ্টি করেছিল এক উচ্চ নীতিধর্মের (Ethics) প্রেরণা, আর এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক আদর্শ বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি।

২ K. C. Sen, Lectures in India, Great men (1866), P. 39.

৩ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ (১৮৮২) পৃঃ ১—৩

৪ কেশবচন্দ্র সেন, জীবনবেদ, পৃঃ ৮

এ উচ্চ জাতিবোধের চেতনা ক্রমশঃ সঞ্চারিত হ'ল 'কেশবচন্দ্রে'র[৫] মধ্যে, আর তাঁরা জাগিয়ে তুললেন দেশের মধ্যে একটা নতুন ভাবান্দোলন—নীতিধর্মের অনুশীলন ছিল যে ভাবান্দোলনের ভিত্তিমূলে। কেশবচন্দ্রের এ নীতিধর্মের আন্দোলন শুধু বাক্যসীমায় আবদ্ধ হ'য়ে রইল না, মহৎ নীতিভিত্তিক একটা আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সে যুগের তরুণ ছাত্রদের নিয়ে গঠন করেছিলেন 'আশালতা দল' (Band of hope) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে—সুরাপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা ছিল যে নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সে বিদেশী চিন্তা ও ভাবানুকরণের উৎকেন্দ্রিকতার যুগে কেশবচন্দ্রের এ নীতিধর্মীয় আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়েছিল? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে যুগের বাঙালীর ক্রম অভ্যুদয়ের কারণ হ'ল পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও সে জীবন-সংস্কারের প্রভাব। কিন্তু একটু সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে, কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত এ উচ্চনীতিধর্মের প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো সে যুগের শিক্ষিত মানসে প্রবাহিত হ'য়ে দেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে আর একটা প্রবল ভাবান্দোলন, সর্বযুগের উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা-কামনা যে আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। সমকালীন রসবাদী সাহিত্যিক বঙ্কিমের মানস প্রবৃত্তির বিবর্তন-রেখা অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে এ রোমান্টিক কথাশিল্পী জীবনের শেষ স্তরে একান্তভাবে আপনাকে নিয়োগ করেছেন নীতিধর্ম ও অনুশীলন-তত্ত্বের আলোচনায়। শুধু জীবনের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনায়ও বঙ্কিম সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে নীতিধর্মের প্রেরণাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ চরিত্র-প্রভাবে তিনি এতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁর সুবিখ্যাত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি আচার্য কেশবচন্দ্রকে 'সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত' ও 'সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র' ব'লে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। শুধু সমসাময়িক কালে নয়, কেশবচন্দ্রের এ উচ্চ নীতিধর্মের আন্দোলন পরবর্তী কালে জাগিয়ে তুলেছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো সাধুমহাত্মার উদার প্রাণকে। নীতিধর্মী জ্ঞান ও কর্ম এবং ভক্তিপ্রবণ প্রেমের ভিত্তিতে এ মনীষী তাঁর সমকালে পূর্ববঙ্গে যে প্রবল ভাবান্দোলনের সৃষ্টি করেন, জাতীয় জীবনের শ্রেয়োলাভের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের এ সবল ভাবান্দোলনের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

॥ চার ॥

সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে প্রবল লোকহিতব্রতের উচ্চ আদর্শ যুক্ত হ'য়ে কেশবচন্দ্রের মহিমান্বিত জীবন হ'য়ে উঠেছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। কেশব-চরিত্রের এ উভয় বৈশিষ্ট্য-বিকাশের কারণ অনুসন্ধানে স্বতই মনে আসে প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও সেই মহাত্মার মহান্ জীবনের প্রভাবের কথা। কিন্তু কেশব-জীবনের কর্মধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে—এ দুটি উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল কেশবচন্দ্রের সহজাত। দেবেন্দ্রনাথের প্রখর ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়তো বা তারা বিকাশের সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগেই কেশবচন্দ্র অনুভব করেছিলেন একটা সংযমপূত

৫ কেশবচন্দ্র—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, এবং উমেশচন্দ্র দত্তের মতো চিন্তানেতা ও কর্মীদের সম্মেলন।

নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনীয়তা। এ ছাড়া 'কলুটোলা ইভনীং স্কুলে' দরিদ্র ও শ্রমিকশ্রেণীর বালকদের শিক্ষাদান কার্যে এবং সেন-পরিবারের 'গুড্ উইল ফ্র্যাটারনিটি সভা'র কার্যকলাপের মধ্যেই তাঁর লোকহিতব্রত ও আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৮ খৃঃ কেশবেরই আগ্রহাতিশয্যে উক্ত সভায় মহর্ষির আগমনের পর থেকে কেশবের ধর্মজীবনে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, আর এ পরিবর্তিত হৃদয়ভাব একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে কেশবচন্দ্রের চলমান জাগ্রত জীবনকে উৎক্ষিপ্ত করেছে নিত্যনতুন জীবনভাবনা ও দেশোন্নয়নমূলক বিচিত্র কর্মের ক্ষেত্রে।

কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা হয়েছে—অগ্নিমন্ত্রের উপাসনাই ছিল সে মহাজীবনের প্রধানতম আকর্ষণ। এ অগ্নিমন্ত্রকে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় অভিহিত করেছেন 'Enthucism' ব'লে। এ Enthucism-এর প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্র সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের। কি মহামারীর সময় সেবাকার্যে (১৮৬১-৬২), কি শিক্ষা সংস্কারে, কি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে, কি জাতীয় জাগরণের জন্যে পত্রিকা-সম্পাদনায়, কি নব-উপলব্ধ ধর্মপ্রচারে—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ Enthucism-এর তাড়নায় কেশবচন্দ্র মেতে উঠেছিলেন একটা সেবাময় ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্নে। এ স্বপ্নই পরবর্তীকালে সার্থকতার রূপলাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায়, এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রসারিত করেছে মানবমহিমাবোধের উদারতর প্রাঙ্গণে।

ধর্মই হ'ক, কর্মই হ'ক—কোন কিছুকেই কেশবচন্দ্র অন্ধ অনুরাগের সহিত কোনদিন গ্রহণ করেননি। তাঁর সক্রিয় জীবনের সচলতার প্রেরণা ছিল একটা সুগভীর প্রত্যয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়ের ফলে কেশবচন্দ্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে সবলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের নব-উপলব্ধ ধর্মমত, আর নিজের যুক্তি ও বিবেকের উপর সুদৃঢ় প্রত্যয়ের প্রভাবে তিনি তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গঠন করেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে)। স্ব-ধর্ম ও স্ব-মতের প্রতি এ গভীর নিষ্ঠা সে যুগের বাঙালী মানসে সৃষ্টি করেছিল সুগভীর আত্মপ্রত্যয়—আর আত্মপ্রত্যয়ই (self-reliance) হ'ল সব রকমের নতুন সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণা। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-বিস্তারের ক্রম অনুসরণে এ সত্যটি আমাদের অনুধাবনযোগ্য।

[ক্রমশঃ]

মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম

শ্রীমতী সুজাতা দেবী

'ধর্ম' শব্দটি একবারও উচ্চারণ করেননি, এমন চিন্তাশীল মানুষ জগতে নেই বললেই চলে, তা তিনি ধর্মের পক্ষেই বলুন আর বিপক্ষেই বলুন। পৃথিবীতে আর কোন শব্দেরই বোধহয় এত রকম ব্যাখ্যা হয়নি এবং আর কোন বস্তুই জীবনে এত রকম সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ধর্মের বাহ্য রূপায়ণ দেখেও তার সম্বন্ধে কিছু বোঝার উপায় নেই। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় এই ধর্ম একদিকে মানুষের মধ্যে যেমন দুস্তর ভেদ এনেছে, ঠিক অপরদিকে এনেছে ঐকান্তিক একাত্মতা। ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে বহু রক্তপাত ঘটেছে; আবার এই ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষ যখন মানুষকে কাছে টেনেছে, তখন যোগ যেমন সুদৃঢ় ও গাঢ় হয়েছে, অন্য কোন নীতিবাদের ভেতর দিয়ে তেমনটি হয়নি। এতেই বোঝা যায় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। তবুও এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা প্রয়োজন, কেননা তার সাহায্যে 'ধর্ম' কি, তা হয়তো বুঝে ফেলা যাবে না, কিন্তু 'ধর্ম' কি নয়—তা কিছুটা বোঝা যাবে। আলাপ-আলোচনার সাহায্যে বস্তুলাভ ঘটবে না বটে, কিন্তু এই বহু-আলোচিত শব্দটি নিয়ে যে বিভ্রান্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তার কিছুটা অবসান হবে।

প্রথমতঃ ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিচার করা যাক্। 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা। অর্থাৎ যা জীবনকে ধারণ ক'রে থাকে বা পোষণ ক'রে থাকে। তাকেই আমরা সাধারণভাবে ধর্ম বলিতে পারি। 'ধারণ করা'র অর্থ ধরে থাকা অর্থাৎ যার সাহায্যে বস্তুটি স্থিতি ও পরিপুষ্টি লাভ করে। আগুনের ধর্ম দহন করা, অর্থাৎ এই দহন-ক্রিয়াতেই অগ্নির অগ্নিত্ব, তাতেই অগ্নির স্থিতি। দহন করে না—এমন আগুনকে আমরা আগুন বলতে পারি না। এখন মানুষের ধর্ম বিচার করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে, মানুষের ক্ষেত্রে কে তাকে ধারণ ক'রে আছে। মানুষের মনুষ্যত্ব যার উপর নির্ভর করে, তাকেই আমরা ধর্ম বলতে পারি।

মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। পশুত্ব বা দেবত্বের সঙ্গে তুলনা করলে তার স্বরূপটি বোঝা যাবে। রাস্তায় যে কুকুরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ধর্ম বা স্বভাব কি? তাকে যদি পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব—দিনের পর দিন সে খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, সন্তানের জন্ম দিচ্ছে এবং জন্মমৃত্যুর অধীন হ'য়ে তার সারাটা জীবন কেটে যাচ্ছে। তাহলে আহার-নিদ্রা-বংশবৃদ্ধি—এই তার স্বভাব, এ গুলি পশুরই লক্ষণ। অন্য প্রাণীর ভেতর যদি শুধু এই লক্ষণগুলি থাকে, তবে তাকেও আমরা পশুই ব'লব। আবার দেবতা কাকে বলি? দ্যোতনশীল যিনি জ্যোতির্ময়, মালিন্যহীন, তাঁকে আমরা দেবতা বলি। মানুষ নিঃসন্দেহে এর কোনটাই নয়। শুধু আহার নিদ্রা নিয়েই মানুষ থাকতে পারে না; যদি থাকে, তাহলে সে মানুষ মানুষই নয়, পশুই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (২।৩।১৮): বৃক্ষগণ কি বাঁচিয়া থাকে না? হাপর কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামপশুগণ কি আহার মৈথুন করে না? আবার মানুষের জীবন নিয়ত সংগ্রাম; তার দুঃখ, গ্লানি, শোক, মৃত্যু প্রমাণ করছে সে দেবতাও নয়। পশুত্ব ও

দেবত্বের মাঝামাঝি স্তরেই মানুষ বিরাজ করছে। পশু দেহপ্রধান জীব; তাই দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ইত্যাদিই তার জীবন, সেখানে মনের কোন স্থান নেই। কিন্তু মানুষ বলতে তার দেহকেই বুঝি না; তার মন, তার চিন্তাশক্তিকেও বুঝি। এই দেহমনের সমষ্টিই মানুষ। সেজন্য তার যেমন দৈহিক বৃত্তি আছে, তেমনি মানসিক বৃত্তিও আছে। সে একদিকে পশুরই মতো ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়, আবার অন্যদিকে শুধু দৈহিক ভোগ নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দেহকে পরি-পোষণের সঙ্গে সঙ্গে সে মনেরও চর্চা করে। তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সে জগতের এপার থেকে ওপার তোলপাড় করছে।

কেন করছে, তা বুঝতে গেলেই আমরা মনুষ্যত্বের আর একটা লক্ষণ ধরতে পারব। সৃষ্টির সেই আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত জীব-জগতের ধারাবাহিক আলোচনা করলে দেখতে পাব—সেদিন পশুরা যে স্তরে ছিল, আজও তারা ঠিক সেই স্তরেই আছে। তখনও মাংসাশী জন্তু অন্য দুর্বল প্রাণীকে সুযোগমত হত্যা ক'রে কাঁচা মাংস খেয়েছে, আজও খায়; তারা সেই নখদন্তই ব্যবহার করে; অ্যাটম বোমা দূরে থাক, সামান্য একটা অস্ত্রও তারা ব্যবহার করতে শেখেনি। নিরামিষাশী পশু সেই যে ঘাস লতা পাতা খেত, আজও তাই খায়; রান্না ক'রে খাদ্যকে অধিকতর লোভনীয় করার কোন উদ্যম বা সামর্থ্য তাদের আজও জন্মায়নি। পাশাপাশি আমরা যদি মানব-জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটি দেখি তবে বুঝব, মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায়? হাজার হাজার বছর আগে পশুরা যে স্তরে ছিল, আজও সেই স্তরে আছে। কিন্তু সেই প্রস্তরযুগের মানুষের সঙ্গে আজকের দিনের মানুষের কত তফাৎ! সে যুগে মানুষ পশুদেরই মতো জীবহত্যা ক'রে কাঁচা মাংস খেয়েছে, পর্বতগুহায় বাস করেছে, কিন্তু পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য এই—পশু সেখানে থেমে থাকলেও মানুষ থেমে থাকেনি। ক্রমে ক্রমে সে আগুনের ব্যব-হার শিখেছে, গুহার বদলে সে ঘর নির্মাণ করতে শিখেছে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত থেকে উন্নততর হ'য়ে মানুষ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এই যে নিয়ত এগিয়ে যাওয়া এবং ক্রমোন্নতির ইচ্ছা ও চেষ্টা—এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি, মানুষ শুধু দেহবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই নয়, সে দেহমন দুই-এরই সমষ্টি। একদিকে তাকে যেমন দেহের ক্ষুধা মেটাতে হয়, অপর দিকে তেমনি তাকে মনের তৃষ্ণাও মেটাতে হবে। আগে সে কাঁচা মাংস খেত, এখন নানাজাতীয় খাদ্য মসলা-সংযোগে রন্ধন ক'রে সুস্বাদু ক'রে নেয়, কিন্তু এই রসনাতৃপ্তির উৎকর্ষই তার উন্নতির লক্ষণ নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সে জগৎকে আগে উপভোগ করেছে, এখনও যদি তাইই সে করে উন্নততর প্রণালীতে, তবে তাকেই আমরা মনুষ্যত্বের বিকাশ ব'লব না, যদি না পাশাপাশি তার মনের উৎকর্ষ দেখি। কিন্তু আমরা দেখি, একদিকে যেমন তার দৈহিক ভোগ উন্নততর হচ্ছে, অপরদিকে তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি উন্নত হচ্ছে; বিজ্ঞান-কাব্য সাহিত্যাদির ভেতর দিয়ে সে পরিচয় আমরা পাচ্ছি। এই ক্রমোন্নতির চরম সীমা কোথায়? আজকের ইওরোপ-আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যায় মানুষ তার বৃত্তি এবং শক্তিকে কতদূর কাজে লাগিয়েছে। জগতে কোন কাজই তারা এখন অসম্ভব মনে করে না। প্রকৃতির সাথে অহরহঃ সংগ্রাম ক'রে মানুষই সর্বক্ষেত্রে জয়ী

হয়েছে—তুস্তর সাগর, তুরারোহ পর্বত, উষর মরুভূমি; কিছুই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না; কিন্তু তবু আমরা বলতে পারছি না যে সে উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে। ঝড়ঝঞ্ঝা, তুষারপাত, বন্যা ইত্যাদি সে রোধ করতে পেরেছে; কিন্তু চোখের সামনে থেকে প্রিয়জনকে যে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যায়—কই মানুষ তো আজও তার কোন প্রতিবিধান করতে পারল না? আর দুঃখ কি শুধু এইটাই,—মানুষের মনের দ্বেষহিংসা, ক্ষমতাপ্রিয়তা জগতে যত অকল্যাণ ও সর্বনাশ টেনে এনেছে, লক্ষ লক্ষ বন্যা বা ভূমিকম্প তা পারেনি।

মানুষ যদি সত্যি এগিয়ে যেতে চায় কল্যাণের পথে, তবে শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করলেই হবে না। সে প্রথমে ছিল প্রাকৃতিক শক্তির শিকার, পরে দীর্ঘ সংগ্রামে তার উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। বাহ্য যে বস্তুগুলি তাকে পীড়ন করেছে, কষ্ট দিয়েছে—তাকে সবলে সে দূরীভূত করেছে, কিন্তু বাইরের শত্রু জয় করলে কি হবে? অন্তরে তার প্রবলতর শত্রু বিদ্যমান। যে অন্তরায় তাকে দেহের সুখ ভোগ করতে দেয়নি, তাকে দূর করলে দেহের সুখ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের সুখও যদি সে পেতে চায়—যা তাকে পেতেই হবে, কেননা মন বাদ দিলে মানুষ মানুষই থাকবে না—তবে মনের শত্রুর সঙ্গেও তাকে সংগ্রামে নামতে হবে। রৌদ্র বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা সে করতে পেরেছে বটে, কিন্তু লোভ হিংসা দ্বেষ থেকে পেরেছে কি? পারেনি। তাই ইওরোপ ও আমেরিকা সর্বত্র আজ মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জগতের সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকা, কিন্তু তারাও তো শান্তির জন্য হাহাকার করছে। তারা যদি পশু হ'ত, তবে যা পেয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারত; কিন্তু তারা মানুষ, তাই তারা সেখানে থেমে থাকতে পারছে না। দেহের দাবি মেটাতে তারা আকাশ পাতাল মন্থন করেছে, মনও তার দাবি ছাড়বে কেন? সেও সম্পদ আহরণ করতে চায়, অন্তরের ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে চায়। মানুষের স্বভাব এই যে, সে আরও পেতে চায়—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'; দেহের সুখ সে অনেক পেয়েছে এবং পাচ্ছেও অনেক, কিন্তু মনের সুখ কই? মনের সুখকে অবহেলা ক'রে এসেছে বলেই সে শান্তি পাচ্ছে না। তাইতো এখন আমাদের মনের দিকে তাকাবার সময় এসেছে।

দেহ পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ চায়, কিন্তু মন কি চায়? বর্তমান বিজ্ঞান কাব্য সাহিত্য তার সন্ধান কম করেনি, কিন্তু ঠিক বস্তুর সন্ধান তারা দিতে পারেনি। তাই বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করুক, সে দেহের সুখকে ছাড়িয়ে মনের নাগাল পায়নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভোগের সামগ্রীর সংখ্যা ও প্রকার বাড়ছে। যা গতকাল বিলাস ছিল, আজ তা প্রয়োজনে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু মনের তৃপ্তি একচুলও বাড়েনি। বনের ফলমূল খেয়ে তৃণশয্যায় শুয়ে মানুষ যে তৃপ্তি পেয়েছে, আজকের রাজপ্রাসাদ ও চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় পেয়েও তার তৃপ্তির পরিমাণ কিছু বেড়েছে কি? ঐশ্বর্যের উপর ঐশ্বর্য স্তূপীকৃত হচ্ছে, কিন্তু পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ও তৃপ্তি এখনও 'দুর অস্ত'। তাই এখন প্রয়োজন বাহ্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর ঐশ্বর্যের সন্ধান করা। এ বিষয়ে প্রধানতম অসুবিধা এই যে বাইরের বিষয় ধরাছোঁয়ার মধ্যে—বাড়ী, গাড়ী, টাকা সবই বেশ স্থূল দৃষ্টিগোচর, কিন্তু আন্তর ঐশ্বর্য তা নয়। প্রেম, ভালবাসা, নিঃস্বার্থপরতা ঠিক দৃষ্টি-গোচর বস্তু নয়, যা দশ জনের বাহবার সম্মুখে

তুলে ধরা যায়। এই দশ জনের সামনে নিজেকে তুলে ধরবার লোভ মানুষকে দিয়ে অনেক সৎ ও অসৎ কাজ করিয়েছে। ঠিক যাতে ঢাক পেটানোর সম্ভাবনা নেই, সে কাজে মানুষের উৎসাহ খুবই কম, তাই মনের দিকে মানুষ তাকায় না, তাকাতে চায় না। কিন্তু যদি যথার্থ'ই শান্তি ও তৃপ্তি তার কাম্য হয়, তবে তাকে এদিকে তাকাতেই হবে; এবং শান্তি পাবার জন্য যা যা অনুশীলনের দরকার তাও করতে হবে।

এই যে পরম শান্তি লাভের উপায় একেই আমরা সাধারণভাবে 'ধর্ম' ব'লে থাকি। কেননা এর মধ্যেই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ নিহিত রয়েছে। এই দয়া পরোপকার নিরভিমানতা নিঃস্বার্থপরতা অনুশীলনের সাহায্যেই আমরা সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হব এবং এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলনই মনুষ্য-ধর্ম। জাতিভেদে, পরিবেশভেদে অনুশীলন-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে, কিন্তু মূল বস্তু একই। মতামতের চর্চা ও আচারবিচারই সাধারণভাবে 'ধর্ম' নাম নিয়ে চলে এসেছে, তাই এই নিয়ে এত বিভেদ, এত সমস্যা। কিন্তু ধর্ম যে একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়, ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের মতোই তার অনুশীলন সম্ভব, প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, এ কথা জানলে ধর্ম নিয়ে বহুযুগব্যাপী অনেক হানাহানির অবসান হবে, এবং মানুষ যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারবে। এ শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, জীবনে এ সত্যকে যে সফলভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার পরিচয় ইতিহাসে বহু মেলে। জগতে বহু অশান্তি এসেছে, বহু দুঃখ বহু গ্লানির ভেতর থেকে এক-একটি জীবন সব কিছু থেকে আলাদা হ'য়ে আন্তর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে জগৎকে শান্তির পথ দেখিয়েছে।

বেশী দিনের কথা নয়, এই কিছু দিন আগে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে এক পূজারী তাঁর নতুন জীবন-দর্শনের এক আলেখ্য আমাদের সম্মুখে স্থাপন ক'রে গেছেন। তিনি দরিদ্র সন্তান, বাইরের সাধারণ শিক্ষা তাঁর কিছুই ঘটেনি। কিন্তু আজ জগতের লোক তাঁর মহিমার কাছে মাথা নোয়ায়। রাজ্যসম্পদ, ধন-ঐশ্বর্য কিছুই তাঁর ছিল না; না ছিল তাঁর লোককে আকর্ষণ করার মতো মোহন রূপ বা কোন বিদ্যা। কিন্তু বাইরের এই সাধারণ আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য প্রকাশমান, যার আকর্ষণের ক্ষমতা আরও বেশী! তাঁর সর্বগ্রাসী ভালবাসা, কঠোর বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সর্বোপরি তাঁর চিত্তবিচ্ছুরিত শান্তি ধর্মের সাক্ষাৎ ফলরূপে বিরাজমান। তিনি যে শুধু নিজেই জীবনের উচ্চতম আদর্শ লাভ করেছেন তা নয়, তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছে। তাঁর কাছে এসে লোকের আর্থিক ঐশ্বর্য বা বিদ্যার গৌরব কিছুই বাড়েনি, কিন্তু তারা জীবনের এক উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে, যে পথ অবলম্বন ক'রে যথার্থ শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেই পথের নিশানা তারা পেয়েছে। এইরূপ ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনের উদাহরণের সাহায্যেই বোঝা যায় যে 'ধর্ম' একটা পুঁথিগত শব্দমাত্র নয়, সাধনার সাহায্যে তাকে জীবনে লাভ করা যায়; এবং যতদিন না মানুষ এই সকল মহৎ-চরিত্রের প্রদর্শিত পন্থা অনুশীলন করবে, ততদিন মনুষ্যত্বের স্তরে তারা স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে না। বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে দমন ক'রে অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলার যে সংগ্রাম তাই মনুষ্য-জীবন। মানুষ যদি যথার্থ মানুষ হ'তে চায়, তাহলে এই মহাজনগত পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই;

কবি ঈশ্বর গুপ্ত

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাঁর প্রখর বুদ্ধিসমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতার উৎস হৃদয় নয়, বুদ্ধি। হয়তো সেই কারণেই তাঁর কবিতায় নতুন শব্দসৃষ্টি বা মৌলিক চিত্রকল্প বিশেষ চোখে পড়ে না। কিন্তু সমাজ-সংসারের নানা বিচিত্র অসঙ্গতি ব্যঙ্গকৌতুকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রকে প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি এবং ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক কাব্যধারার প্রথম কবি বলা হয়। কথাটি বিশ্লেষণযোগ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভারতচন্দ্র অবধি মঙ্গলকাব্যের ধারা চলেছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ভক্তিবিহ্বলতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে এসে হাস্যরঙ্গে বিলুপ্ত হ'ল। ভারতচন্দ্রের দেবভক্তি কাব্যের আঙ্গিকের প্রয়োজনে, তা নইলে শুধু 'বিদ্যাসুন্দর' নামেই তিনি কাব্য লিখতেন, দেবী কালিকার উপস্থিতির প্রয়োজন হ'ত না। দেবতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফল অসংযত উচ্ছ্বাস, প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের যা স্বধর্ম। ভারতচন্দ্র দেববন্দনায় অনুচ্ছ্বসিত। তাঁর পূর্বসূরী মুকুন্দরাম শ্লেষাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন টাইপ-চরিত্র সৃষ্টি ক'রে, কিন্তু দেবতার বেলায় তিনি ঐতিহ্যানুযায়ী ভক্তিবিহ্বল। ভারতচন্দ্রের শ্লেষাত্মক মনোভাব দেবতার স্তবের বেলায়ও বাক্যবিন্যাস আর ছন্দকৌশলে সচেতন। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে গানগুলি তিনি কালিকামঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নিবিষ্ট করেছেন, সেগুলির লিরিক-সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিকতা নেই। আসল কথা, মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম ব্যক্তিসচেতন কবি। বাংলাদেশের নিজস্ব পুরাণকল্পনার রহস্যময় অতীতের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের এতদিনের যোগ ছিল। ভারতচন্দ্র সেই অতীতের দেবলোক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে বেশী পরিমাণে আকর্ষণ করলেন মানবলোকের দিকে। তার ফলে মঙ্গলকাব্যেরও রূপান্তর ঘটল। এই রূপান্তরের মধ্যেই নতুন যুগের নিশ্চিত আভাস ছিল। তার ফলে মঙ্গলকাব্যধারার শেষ উজ্জ্বল স্বাক্ষর রইল ভারতচন্দ্রের রচনায়। বাংলার কবিপ্রতিভা এর পর থেকে নতুন পথের অনুসন্ধানী হ'ল।

ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের মধ্যে কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই একদিকে—আর একদিকে রামপ্রসাদ-পরবর্তী শাক্ত-পদাবলীর ধারা—এরাই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নূতনত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করেছে। কবিগান ঠিক লোকসাহিত্য না হলেও গণরুচির সমর্থনেই গড়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের পর ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের মাঝখানে এই কবির দলের কথা যদি মনে থাকে, তাহলে বোঝা যায়—ভারতচন্দ্রের ঐশ্বর্য ঈশ্বর গুপ্তে পাই না কেন। আসলে ভারতচন্দ্রী মনোভাব থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদেরই সগোত্র। তবে কবিওয়ালাদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের পার্থক্য এই যে তিনি মূলতঃ বস্তুবাদী এবং যুক্তিপ্রধান মনোভঙ্গীর কবি। পারিপার্শ্বিক সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে কবি-হিসাবেও তিনি সচেতন। নিজে ইংরেজী-শিক্ষিত না হলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে যাতায়াতের ফলে এবং সাংবাদিক জগতের লোক হওয়ার দরুন বহির্বিশ্বের প্রতি তাঁর এই

সচেতনতা আরও সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের মনোজগতের যে পরিবর্তন ঘটছিল, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তার পরিচয় মেলে; কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে কবিমানসের যে গভীর উপলব্ধির সম্পদ পরবর্তী কালের বাংলা কবিতায় আমরা পাই—ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তা আশা করা যায় না। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তখন অবধি আমাদের সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রাণের যোগ ঘটেনি। এমন অবস্থায় যে ধরনের কবিতার সৃষ্টি সম্ভব, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তাই হ'য়ে উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক, কিন্তু গঠন-ভঙ্গীতে প্রাচীন; পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী, কিন্তু আপন গভীরে ডুব দিতে নারাজ—এমনি এক বিশেষ ধরনের কবিতা তিনি লিখেছিলেন। সেই সব রচনার অধিকাংশই স্মৃতিচিহ্নমাত্র। কিন্তু কিছু রচনা সমকালীন আসর পেরিয়ে একালের আসরেও পাঠক বা শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। তাই ঈশ্বর গুপ্ত আজও আমাদের স্মরণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের মনোভঙ্গীর পরিচয় হিসাবে প্রথমেই তাঁর ধর্মবিষয়ক কবিতা থেকে দু'চারটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মধ্যযুগের কোন কবি দেববন্দনার কালে যুক্তি বা শাস্ত্র বিচার করতে বসেননি। তাঁদের দেববন্দনায় আত্মনিবেদনই বড় কথা। ঈশ্বরগুপ্তের দেববন্দনায়ও বিতর্কের ছোঁয়া লাগে, ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকেও জাহির করতে কম উৎসুক নন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বঙ্কিমের মতো সমালোচকও মনে করতেন, 'রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বর-চন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প'। কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে এ যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, একথা বঙ্কিমেরও মনে হয়নি!

এবার উদাহরণের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমেই ধরুন গুপ্ত-কবির ঈশ্বর-বন্দনা:

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন, গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?

এ ধরনের 'পিতৃপ্রেমে'র সঙ্গে রামপ্রসাদী ভক্তিরসের কোন তুলনাই করা চলে না।

'সংসার-জাঁতা' কবিতায় গুপ্ত-কবি একটি যুক্তি-আশ্রয়ী উপমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও সংসারের স্বরূপ বুঝাতে চেয়েছেন:

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয় পূর্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥

উপমা অবশ্যই সার্থক, কিন্তু এ কবিতার মূল অবলম্বন যুক্তি। মাঝে মাঝে এই যুক্তির সঙ্গে সরল ধর্মবোধের আন্তরিকতা এসে মিলেছে:

লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর পণ্ডিতপ্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥ (শাস্ত্রপাঠ)

ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসী। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধি ও নীতিগত সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিকতা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মচেতনা এদেশে কিছু নতুন নয়। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ধর্মচেতনার এই যুক্তিনির্ভর

প্রকাশভঙ্গীটাই নতুন। একদিক দিয়ে ইংরেজ কবি ড্রাইডেনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মিল আছে। যুক্তিশৃঙ্খলার প্রতি এই আনুগত্যের দরুন তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে তির্যক দৃষ্টির তীব্রতা সঞ্চারিত। নীতিবিষয়ক কবিতা থেকে তার একটু উদাহরণ দিই :

শিষ্যের সম্পদ ছলে যে করে গ্রহণ,
গুরু ব'লে কিসে তারে করিব বরণ ?
শিষ্যের সন্তাপ যত যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু ব'লে পূজা করি তারে ॥ (গুরু)

সাধুত্বের খাঁটি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে সাধুনামধারী অসাধুদের প্রতি কটাক্ষ :

সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু অনেকেই নয় ॥
যেমন পোস্তের ফুল সাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয় ॥ (সাধু)

কিন্তু এই ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও তির্যক দৃষ্টির সমন্বয়ে গুপ্ত-কবি ভারতচন্দ্রের মত নিপুণ কাব্যকলা সৃষ্টি করতে পারেননি; অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যকর বাচালতায় মুখর হয়েছেন :

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক ॥
বাবা মিছা কর জাঁক ॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক।...ইত্যাদি।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যছন্দ প্রাচীন পয়ার। এই পয়ারের যে দৃঢ় সংবদ্ধ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষময় রূপটি দেখি, সেটি ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পয়ারের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুইই বেশী। ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দ একটু একঘেঁয়ে। তবে বিষয়বৈচিত্র্যের দরুন সেই একঘেঁয়েমি কিছুটা কমেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্ঘাত ও সম্মিলনের প্রথম প্রতিক্রিয়াজনিত বিদ্রূপভঙ্গী ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অন্যতম লক্ষণ। তখনও ইংরেজী কবিতার গভীরতর রসধারার সঙ্গে বাঙালীর আত্মিক পরিচয় ঘটেনি, তাই বাইরের অসঙ্গতিগুলি গুপ্ত-কবির শ্লেষপ্রধান মনোবৃত্তিটিকে পরিপুষ্ট করেছে। এই অসঙ্গতি আবিষ্কারের একটি সহজাত প্রবণতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। সেই কারণে ব্যঙ্গরসের কবিতায় আজও তিনি শীর্ষস্থানীয়। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত লক্ষণীয় : '—ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের গালাগালি শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত 'কবির লড়াই'য়ে শিক্ষিত—সে ধরনটা তাঁহার ছিল।' কবির লড়াই সব সময় শত্রুতাশূন্য ছিল কি না সন্দেহ; ঈশ্বর গুপ্তও সব সময় অপক্ষপাতী নন। তবু তাঁর কবিতায় ঈর্ষাদ্বেষ-মুক্ত ব্যঙ্গের রসিকজনোচিত প্রসন্নতা আমাদের মুগ্ধ করে। সমসাময়িক জীবনধারার প্রতি তাঁর অজস্র কটাক্ষের কিছু উদাহরণ দিই :

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে তাঁর বিখ্যাত আবেদন :

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিঙ্ বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস ॥
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি খেলেই খুশি হব
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

সেকালের 'বাবু'-র বর্ণনা :

কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, কেমন হাতের কোড়া,
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া।
দেখ না কেমন, চিকন বসন, পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন, আর কি কাহারো হবে ?

সমকালীন সমাজের পরিবর্তন :

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব ॥
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেভিল খায় খানা ॥
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র দেয় কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে ॥
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে 'রাধাকৃষ্ণ', ছেলে বলে 'যিশু' ॥
(অনাচার)

ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবে সমাজে যে আচারগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার এই সরস বর্ণনাটি আজও সমান উপভোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর গুপ্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে তিনি 'মেকির শত্রু'। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের মুখে এমন সমালোচনা-প্রবণতা যুগলক্ষণ, কিন্তু এই সমালোচনার মধ্যে একটি দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লক্ষণীয়। ইতিহাসের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে জাতির পক্ষে কোন্ আদর্শ বা পন্থা গ্রহণীয় এ সম্বন্ধে কোন ধ্রুব মনোভাব রক্ষা করা কঠিন। তাই দেখতে পাই সিপাহী-বিদ্রোহের সম্বন্ধে তিনি রীতিমত বিরক্ত, অথচ দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি তাঁর কবিতায় উচ্ছ্বসিত। দেশপ্রেমিক হলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা। ভারতবর্ষের হিন্দুয়ানির ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তাই বিধবাবিবাহের প্রস্তাবে তিনি বিক্ষুব্ধ ; ওদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাছে রদ হ'য়ে যায়—এজন্যও তিনি চিন্তিত। এই অসঙ্গতি স্বাধীন ভারতের সমালোচকদের কাছে অসহনীয় মনে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মোগল-সাম্রাজ্যের শেষভাগের শাসনক্ষেত্রে অব্যবস্থার তুলনায় ইংরেজ-শাসনের আপাত সুবন্দোবস্ত ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকেই মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। আর সিপাহী-বিদ্রোহ যে সাধারণ বাঙালীর মনে তেমন কোন সাড়া জাগায়নি, সে কথা রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' অথবা শশিশেখর বসুর 'যা দেখেছি, যা শুনেছি' বই-দুটি পড়লেই বুঝা যায়। তাছাড়া সিপাহী-বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার সহায়ক হলেও সামগ্রিক গণচেতনা তাতে অনুপস্থিত ছিল বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা আরও আলোকপাত করতে পারেন।

বঙ্কিমের মতে—"ভারতচন্দ্রী ধরনটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র। কিন্তু আর একটা ধরন ছিল যাহা কখন বঙ্গভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাংলা ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা—এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা 'প্রভাকর'ই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনরী, কাল উমেদারী, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী তাহা 'প্রভাকর'ই প্রথম দেখাইয়াছেন।" এইভাবে বাস্তব জীবনধারার সঙ্গে কাব্যের যোগসাধন ক'রে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কবিতায় মানবমুখী মনোভাব গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক বস্তুবাদী না হলেও বাস্তবের নিজস্ব সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতনতায় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত অগ্রগণ্য। আধুনিক বাস্তবতাবাদীদের মতো বাস্তবের একমাত্র দারিদ্র্যদীর্ণ রূপটিকেই তিনি সাহিত্যের সম্পদ ব'লে মনে করেননি। বরং জীবনরসরসিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা।'

রসনাব্যাপারে কবির অক্লান্ত উৎসাহ দেখে মনে হয়—আধুনিক বঙ্গসন্তানের আভিজাত্য-

লক্ষণ অজীর্ণরোগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। হেমন্তে বিবিধ খাদ্যের বিস্তারিত বর্ণনায় তাঁর শ্রান্তি নেই। পৌষড়ার গীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাওয়ার অপূর্ণ সাধের মধ্যেও দারিদ্র্যের বেদনা অনুপস্থিত। 'পৌষপার্বণ', 'পাঁটা', 'আনারস', বিশেষতঃ 'তপসে মাছ' চিরপ্রসিদ্ধ কবিতা:

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে;
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে॥

মধ্যযুগের সাহিত্যেও বাস্তবতার দিকে প্রবণতা ছিল; যেমন মুকুন্দরামের কবিতায় দুর্বলাদাসীর হিসাব দেওয়া, ভাঁড়ুদত্তের বাজার করা, ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনা। বিজয়গুপ্ত, দ্বিজমাধব, রূপরাম চক্রবর্তী এদের কবিতায় বাস্তব রসের সন্ধান মেলে। কিন্তু এই বাস্তবতা অনেকটাই ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। প্রথাবদ্ধ সংকীর্ণতার দরুন সেই বাস্তব রস দানা বাঁধতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কোন কবিরই নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব দৃষ্টি ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বুদ্ধিগত প্রেরণা বাস্তবধর্মী। কিন্তু এই বাস্তব প্রেরণাকে মননশীলতার দ্বারা যতটা বিশুদ্ধ ও মহৎ ক'রে তোলা যেত, ঈশ্বর গুপ্তের শিক্ষাগত সাধনার স্বল্পতায় তা সম্ভব হয়নি। একথাও স্মরণীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিছক বস্তুবাদের কোন স্থান নেই। ঈশ্বর গুপ্তের ঋতু-বিষয়ক কবিতাবলী—যেগুলিতে তিনি কেবলমাত্র দৈনন্দিন সুখসুবিধার বিচারে ঋতুবর্ণনা করেছেন -- সেগুলি তাই কাব্যালোচনায় বর্জনীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের মানসলোকে উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের যে অরুণরাগ দেখা দিয়েছিল, পরবর্তী বাংলাকাব্য-ধারায় তার দূরবিস্তৃত প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। রঙ্গলাল, মনোমোহন বসু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি এই আদর্শে প্রভাবিত। 'স্বদেশ' কবিতায় গুপ্ত-কবি লিখেছেন:

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমাকে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

অবশ্য বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুর কখনই বরণীয় নয়, তবে পরাধীন জাতির কবির এই উগ্র স্বাদেশিকতা মার্জনীয়। সেই সঙ্গে এর আন্তরিকতা আজও শ্রদ্ধেয়।

গুপ্ত-কবির মননভূমিতে স্বদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রবল ছিল। 'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ গদ্য কি পদ্য কিছুই লেখেন নাই।'—বঙ্কিমের এই 'খাঁটি বাঙ্গালা'র মতবাদ আজ সর্বাংশে গ্রহণীয় না হলেও দেশের মাটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের নিবিড় যোগের দিক থেকে কথাটি সত্য। ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির আবর্তে তখনকার পাশ্চাত্যমুখী জীবন-রুচির পটভূমিতে ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশিয়ানা লক্ষণীয়। অবশ্য ডিরোজিও-শিষ্যেরাও তখন ধীরে ধীরে আত্মস্থ হ'তে শুরু করেছেন। আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাভাবসম্পন্ন একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-

প্রভাকরে' টমাস পেইনের Age of Reason-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে (জানুআরি, ১৮৩২) ; কিন্তু 'নব্যবঙ্গে'র প্রগতিবাদের সঙ্গে গুপ্ত-কবির যেমন সহানুভূতি ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল দেশীয় সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতি আস্থা। এ দুই মনোভাবের টানাপোড়েনে মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। সে ত্রুটি মোচন করেছেন ব্যঙ্গরসের আয়োজনে।

উনিশ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে যে গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বব্যাপী প্রভাব ছিল, ভারতচন্দ্রেই তার অবসান সূচিত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতির শেষ স্বাক্ষর দেখা দিল। এর পর থেকে বাংলা সাহিত্য নাগরিক জীবনবোধের পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে।

বাংলা কবিতার জগতে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান খুব উঁচুতে নয়। জীবনের বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের দিকে তাঁর যতটা লক্ষ্য ছিল, অনুভূতির অতলে ডুব দিতে তিনি ততটা দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু যথার্থ সাহিত্যরসিকরূপে তাঁর পরিচয় চিরকাল আমাদের স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। বাংলার প্রাচীন কবিকুলের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টায় তাঁর দান 'কবিজীবনী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় মূল্যবান সম্পদ। প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনী" এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের স্নেহস্পর্শে বাংলাসাহিত্যের যে সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মানস মুকুলিত হ'য়ে উঠেছিল—সেই রঙ্গলাল, মনোমোহন, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র —এঁদের স্মরণ করেও আমরা এই সাহিত্যগুরুর প্রতি বাঙালী জাতির অপরিশোধনীয় ঋণের কিছুটা পরিমাপ করতে পারি।

সন্ধানী মন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

মন-তরী বেয়ে চলি আমি সারা বিশ্বে,
চঞ্চল বায়ু থির মোর গতি-দৃশ্যে।
বিশ্বের পারাবার করি আমি মন্থ,
খুঁজি সে অতল তল অমৃত পন্থ।

উদ্দাম উত্তাল ঘূর্ণী আবর্তে
ওঠে যদি হলাহল জীবনের পাত্রে,
আকণ্ঠ করি পান অকুণ্ঠ চিত্তে,
হবো নীলকণ্ঠ মৃত্যুরে জিততে।

ওঠে যদি অমৃত জীবনের পাত্রে
মৃত—হবো অমৃত পরশন মাত্রে।
সন্ধানী মনে মোর, আছে দৃঢ় প্রত্যয়—
মরি, বাঁচি, তীরে উঠি, নাহি ভয় সংশয়।

বিশ্বের পারাবার করি' আমি মন্থ
পেয়েছি অতল তল অমৃত পন্থ।
মনের গহনে জ্ঞান জলে অফুরন্ত—
প্রাণের জ্যোতিতে সে যে চির প্রাণবন্ত।

সমালোচনা

The Last Days of Mohenjodaro: স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ৭৩নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। ইহা ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতি সিরিজের চতুর্থ পুস্তক। ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮৲ টাকা।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার এশিয়া, আফ্রিকা, ইওরোপ এবং আমেরিকাতে পরিব্যাপ্ত চৌত্রিশটি স্থানের ভাষার অক্ষর এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিগণ কোথায় কোথায় বসতি করিয়াছিলেন। মহেনজোদারোর উপরে সিন্ধু-সরস্বতীর বদ্বীপে (Delta) ভারতীয় আর্যগণের আদিনিবাস ছিল, ইহা তিনি প্রমাণসহ আলোচনা করিয়াছেন। এই বদ্বীপ হইতে তাঁহারা একদিকে সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে, অন্যদিকে আফগানিস্থান ও পারস্যে এবং ইউফ্রেটিজ ও নাইল নদীর উপত্যকাতে, ফিনিসিয়া এবং ক্রীটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মহেনজোদারোর অধিবাসিগণ পরে যেখানে গিয়াছিলেন সর্বত্র তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বেদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উল্লিখিত দুইটি সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িলে অনেক অভিনব তত্ত্ব ও জ্ঞাতব্য নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। পুস্তকখানি প্রণিধানযোগ্য। —**মৈথিল্যানন্দ**

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব (প্রথম খণ্ড): শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক —শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমাখনলাল ভৌমিক, ৭১।২৫সি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৮৪, মূল্য—টাকা ১·২৫।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 'সাধনসমর' গ্রন্থ লিখিয়া যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব—পূর্বনাম শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থে সত্যদেবের জন্ম ও বাল্য, নবানুরাগ, জীবন-সমস্যা, গুরুলাভ ও সাধনা, সমাধি ও সিদ্ধি, বিশ্বনাথ-দর্শন, জীব-সেবা, অলৌকিক পূজা, ভক্তগণ সঙ্গে তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং গতানুগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা ও ব্যাকুলতা সহায়ে যে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ হয়, শ্রীশ্রীসত্যদেবের জীবন তাহাই প্রমাণ করে।

গ্রন্থের ভাষা সাবলীল ও সুখপাঠ্য, তবে ভক্তির আতিশয্যে কোন কোন স্থলে ভাষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভে যত্নশীল, তাঁহাদের সম্মুখে এইরূপ একটি আদর্শ জীবন রাখা অত্যাবশ্যক।

গুরুবাণী (হিন্দী): গুরু তেগ বাহাদুরজী প্রণীত, সন্ত করতার সিং অনূদিত। লিভারপুল প্রেস, ১০, শিবচরণ লাল রোড, এলাহাবাদ হইতে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা—১৪৮; মূল্যের উল্লেখ নাই।

তেগ বাহাদুরজী নবম শিখগুরুরূপে চির-স্মরণীয়। তাঁহার জীবন বৈরাগ্যোজ্জ্বল ও তপস্যাপূত। দীর্ঘ ২৬ বৎসর তিনি এক গিরি-গুহায় তপস্যা করেন। তাঁহার ছন্দোবদ্ধ বাণী তৎকালীন প্রচলিত হিন্দীতে প্রচারিত হইয়াছিল। এই বাণী শিখদিগের নিকট 'গ্রন্থ-সাহেবে'র মতোই সমাদৃত। প্রত্যেকটি কবিতায় শিখদিগের আদিগুরু নানকের নাম লিপিবদ্ধ।

সন্ত করতার সিং সহজ সরল হিন্দী অনুবাদ সহ এই কবিতাবলী প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—**জীবানন্দ**

অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা)—দ্বিতীয় সংস্করণ : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত ; প্রকাশক : স্বামী অভয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৪২১+৪৪ ; মূল্য টাকা ৫.৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের জন্ম ও জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরগণের সান্নিধ্যে তাঁহার সাধনার জীবন এবং সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের বিকাশ ও গতি এই গ্রন্থে সময়ানুক্রমিক ভাবে সুখপাঠ্য ভাষায় সুবিন্যস্ত। এই পুস্তক ঠিক জীবনী-গ্রন্থ বা ইতিহাস পর্যায়ভুক্ত নয়, পূজ্যপাদ মহারাজের জীবন ও কর্মের কতকগুলি নির্বাচিত ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩৬৩ সালে। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর কিছু কমাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্ট হইতে পূজ্যপাদ মহারাজের রচনাবলীও কিছু কমানো হইয়াছে। এই সংস্করণে মোট ৬ খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের ৩ খানি।

আশ্রম (ত্রয়োদশ বর্ষ—১৩৬৬): সম্পাদক—শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, প্রকাশক—স্বামী পুণ্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা—১১৬।

রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রদের এই পত্রিকাখানি পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা ও রচনাসম্ভারে সুমুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা : প্রাচীন ভারতে শিক্ষা, সোনার তরী ও রবীন্দ্রজীবন-দর্শন, বস্ত্রশিল্পের ইতিকথা, পরমাণুর আত্মকথা, জাতীয় জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা, চরিত্র। 'আশ্রম-সংবাদ', 'সম্পাদকের কথা' পাঠ করিলে সারা বছরের কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি ছবিতে বালকাশ্রমের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

সন্দীপন (প্রথম সংখ্যা—১৯৬০): সম্পাদক—শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—স্বামী বিমুক্তানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা—৬৪।

বেলুড়ে অবস্থিত সারদাপীঠের অন্তর্গত এই শিক্ষণ-মন্দিরটি (B. T. College) অল্পদিনের মধ্যেই সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে বিরাট ও মহান্ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযত্ন প্রয়োজন। দেশের বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ সন্তানগণ যদি ত্যাগ ও সেবার ভাব লইয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন, তবেই দেশের কল্যাণ। ইংরেজী ও বাংলায় লিখিত ১৪টি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ 'সন্দীপন'-পত্রিকাটি পড়িয়া মনে হইল, উক্তরূপ ছাত্রগণই ক্রমশঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর আশীর্বাণীপূত পত্রিকাটির দীর্ঘ এবং কল্যাণময় জীবন প্রার্থনা করি। অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 'Foreword'-এ স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ অতি অল্প কথায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনটি বাংলা কবিতা ও একটি সংস্কৃত রচনা 'শিক্ষায়াম্ ধর্মস্য স্থানম্' শিক্ষক-ছাত্রদের উৎকর্ষেরই ইঙ্গিত দেয়। 'আমাদের কথা'য় প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

মেদিনীপুর: ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ৯ই মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জন্মতিথি-দিবসে মঙ্গলারতি, উষা-কীর্তন, চণ্ডী-পাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন-সঙ্গীতাদি হয়। বেলা ৮টা হইতে বিশেষ পূজার পর হোম ও ভোগারতি হয়। দ্বিপ্রহরে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৬ই মার্চ সাধারণ উৎসব-দিনেও ভোর হইতে উষা-কীর্তন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ ও ভজন-সঙ্গীতাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৪ হাজার নর-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত হয়।

৯ই মার্চ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপরেশনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে, স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

টাকী: গত ২০ শে মার্চ রবিবার হইতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসত্রয়ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলে।

প্রথম দিন প্রভাতে মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ দ্বারা উৎসব আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, প্রধান অতিথি স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, হুগলী মহাসন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং স্বামী দেবানন্দজীর বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন গানের পর ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যায় স্বামী জীবানন্দ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতালোচনার পর পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক বাউল-সঙ্গীত এবং রাত্রি ১০ ঘটিকায় ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র এবং স্থানীয় যুবকবৃন্দ কর্তৃক ব্যায়াম প্রদর্শনের পর আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'অভিষেক' নাট্যাভিনয়ের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

পাটনা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে পালিত হয়। ঐ দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ প্রাতঃকালের অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। ৩রা মার্চ হইতে দ্বার-ভাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ কথক কীর্তনাচার্য সূর্যনারায়ণ ঠাকুর তিন দিন কথকতা করেন। ৬ই মার্চ সন্ধ্যারতির পর একটি জনসভায় বিহার পাবলিক সারভিস্ কমিশনের সদস্য শ্রীবিশ্বমোহন কুমার সিন্‌হার সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভায় হিন্দীতে মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত ভাষণ দেন পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিহর প্রসাদ উপাধ্যায়। স্বামী নিরাময়ানন্দের বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেন। উৎসব

সমাপ্ত হয় কাশী হইতে আগত শ্রীমোহনলাল ব্যাসের দুই দিন 'রামচরিতমানস' প্রবচনের পর।

জামসেদপুর: স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ 'সিষ্টার নিবেদিতা উচ্চ বিদ্যালয়' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের' ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে শিক্ষার উচ্চাদর্শ উপস্থাপিত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তিনি বিবেকানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সিদ্‌গোড়া ও বিবেকানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (হরিজন বিদ্যালয়) পারিতোষিক বিতরণ সভায়ও সভাপতিত্ব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লেডী ইন্দ্রসিংহ উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ২০শে মার্চ শ্রীসেনের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই সভায় অধ্যাপক এ. মিশ্র এবং শ্রীযুত শিবদাস মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।

সোসাইটি-প্রাঙ্গণে গত ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ বিরাট জনসভায় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে অতি সুললিত ভাষায় বিশদ আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। বক্তৃতান্তে দুই দিনই শ্রীযুত বিশ্বনাথ মৈত্র মহাশয় (বেতারশিল্পী) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় ভজনগান করিয়া সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করেন।

নারায়ণগঞ্জ: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২২শে ফাল্গুন পর্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ মঙ্গলা-রাত্রিক, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়।

প্রথম দিন অপরাহ্ণে স্বামী শর্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করিয়া এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যহ প্রায় ৩০০০ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন বিদ্যার্থী-ভবনের ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-নাটক অভিনীত হয়। পঞ্চসহস্রাধিক দর্শকমণ্ডলী উভয় দিবস অভিনয় দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। তৃতীয় দিন কৃষ্ণলীলা, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়।

১৯শে ফাল্গুন শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় বিদ্যার্থী-ভবনের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক বৈদিক শান্তিবচন পাঠ, উদ্বোধন-সঙ্গীত ও স্বামীজীর লেখা 'অম্বাস্তোত্রম্' এবং 'সখার প্রতি' আবৃত্তির পর ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। ২০শে ফাল্গুন বিকালে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় প্রথমেই স্থানীয় কেন্দ্রের অধ্যক্ষ উক্ত কেন্দ্রের ১৯৫৯ খৃঃ কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি সাহেব ইস্‌লাম ধর্ম, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী খৃষ্টধর্ম, শ্রীগগন চন্দ্র আচার্য ব্রাহ্ম ধর্ম এবং শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পঞ্চসহস্রাধিক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। ২১শে মহিলাসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচিত হয়। ২২শে ১০,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় গত ৭ই হইতে ১৩ই মার্চ নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত

হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বহু শিক্ষণীয় জিনিস দেখানো হয়। 'অম্বর চরকা'য় সুতা কাটা দর্শকগণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আনন্দদায়ক বিষয়গুলির মধ্যে ছিল কথকতা, তরজা, বাউলগান, কীর্তন, যাত্রা, থিয়েটার, পুতুলনাচ, গাদিখেলা, বাজিপোড়ানো প্রভৃতি।

উৎসবের শেষ দিনে ছিল পুরস্কার-বিতরণ; ৪৫০৲ টাকার পুরস্কার কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২০শে হইতে ২৬শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির (B. T. College) কর্তৃক শিক্ষা-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রীঅনাথনাথ বসু মহাশয় শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দশ হাজার দর্শক এই প্রদর্শনীটি দর্শন করেন। প্রদর্শনীতে প্রাচীরপত্র, মডেল, ছবি, হাতের কাজ প্রভৃতি দেখানো হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিচিতিটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে স্বামীজীর একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি রাখা হয়। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত স্বামীজীর পুস্তকাবলী এবং তাঁহার হস্তাক্ষর আকর্ষণের বস্তু ছিল। একটি কক্ষে সারদাপীঠের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ও ইহাদের কার্যাবলী দেখানো হয়। ২৩শে জানুআরি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

কাঁথি (মেদিনীপুর): গত ১৮ই চৈত্র শুক্রবার হইতে রবিবার পর্যন্ত নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৫ তম শুভ জন্মোৎসব দিবসত্রয়ব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক ও চণ্ডীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য অনেক আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রা সহযোগে মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্বক বেদীতে দেবতা প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়; সবৎসা গাভীর পশ্চাতে নারায়ণ-শিলা ও বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ লইয়া ব্রহ্মচারিগণ বেদপাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ও স্বামী মহেশ্বরানন্দ যাইতে থাকেন এবং ছত্র চামর ও ব্যজনী হস্তে সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের অনুসরণ করেন; পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্তন করিতে করিতে আসিতে থাকেন। শুভক্ষণে ৮টা ২২ মিঃ-এ একটি প্রাণস্পর্শী পরিস্থিতির মধ্যে বেদীতে প্রতিকৃতি স্থাপনের পর বেদমন্ত্র আবৃত্তি ও যজ্ঞমণ্ডপে বাস্তযাগ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে নবনির্মিত মন্দিরে বিশেষ পূজা চণ্ডীপাঠাদি আরম্ভ হয়। এইদিন প্রায় ২৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় এক ধর্মসভায় স্বামী জপানন্দের বক্তৃতার পর সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী প্রার্থনা করেন, 'এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী বহু ভক্তের কল্যাণ করিবেন।'

পরদিন সকালে সপ্তশতী হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী জপানন্দজীর সুললিত ভাষণের পর শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য কর্তৃক গীত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত সঙ্গীতগুলি বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন রচয়িতা স্বয়ং। ডঃ রমা চৌধুরীর মনোজ্ঞ ভাষণের পর ডঃ শ্রীযুত চৌধুরীর ভাষণ ও শ্রীভট্টাচার্যের

গানগুলি ভক্তগণকে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখে। পরদিন বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণকে সেবা করা হয়। ভক্তগণ ৩।৪ মাইল দূর হইতে দলে দলে কীর্তন সহকারে আসিয়া আশ্রম প্রাঙ্গণ খোলকরতাল-ধ্বনির সহিত নৃত্যগীতাদির দ্বারা মুখরিত রাখিয়াছিল। কয়েকটি দলে ৭।৮ বৎসরের বালকগণ মূল গায়েনের কাজ করিয়াছে। সন্ধ্যায় হাওড়া সমাজ কর্তৃক 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয়ে সহস্র সহস্র নরনারী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্মৃতি-উৎসব

সারগাছিঃ গত ৪ঠা এপ্রিল সোমবার শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা-দিবসে সারাদিনব্যাপী কর্ম-স্থচীর মাধ্যমে ১৮৯৭ খৃঃ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবা-কার্যের এবং ১৯২৮ খৃঃ ঐ দিনেই সারগাছি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে মঙ্গলা-রতি, বিশেষ পূজা, হোমের পর সমাগত ভক্ত ও গ্রামবাসিগণ প্রসাদ ধারণ করেন। আশ্রমস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরাট হলে সকালে ভজনগান ও শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত' পাঠের পর একটি ভক্তের ডায়েরি হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা পঠিত হয়। বৈকালে সভায় এই দিনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় এবং ভক্তগণ স্বামী অখণ্ডানন্দের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবনঃ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৭ খৃঃ হইতে আর্তসেবারত। রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্রগুলির সেবাকার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই সেবাশ্রম তাহাদের অন্যতম। ১৯৫৮ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা:

অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল: শয্যা ৫৫; ২,৭৪৯ রোগী ভর্তি হয়, অস্ত্র-চিকিৎসা ১,৬৪৬টি।

বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়: রোগী-সংখ্যা —পুরাতন ৭৫,৩৩৬, নূতন ৫০,৯৪৭; অস্ত্র-চিকিৎসা ১,৬৬৯টি, দৈনিক ৩৪৬টি রোগী চিকিৎসিত হয়।

চক্ষুচিকিৎসালয়: এই বিভাগটি ১৯৪৩ খৃঃ খোলা হয়। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের চক্ষুচিকিৎসা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর নিকট ও দূরাঞ্চলের সহস্র সহস্র চক্ষু-রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ: এই বিভাগে নূতন ৯,২৮২ এবং পুরাতন ২১,১৯২ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

৪৫৬টি এক্স-রে পরীক্ষা ও ইলেক্‌ট্রো-থেরাপি বিভাগে ১৫০ জনের চিকিৎসা হয়। ক্লিনিক্যাল লেবরেটরির পরীক্ষা-সংখ্যা ৪,১৪৮।

সাহায্য: ৮জন নিরাশ্রয় বিধবাকে মাসিক ও সাময়িক সাহায্য বাবদ ২৩৯ টাকা দেওয়া হয়।

স্থান-পরিবর্তন: জয়পুর মন্দিরের বিপরীত দিকে মথুরা-বৃন্দাবন রোডের পার্শ্বে প্রায় ২৩ একর পরিমিত জমির উপর সেবাশ্রমের সমুদয় বিভাগ স্থানান্তরিত করার জন্য ভবন-নির্মাণ-কার্য চলিতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্‌কোঃ প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং প্রতি বুধবার বেলা ৮ টায় তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ অথবা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সোসাইটির নিজস্ব নূতন ভাষণগৃহে বেদান্ত ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

নভেম্বর '৫৯: শক্তিমান্‌রাই ধন্য; মৌনাভ্যাস; মনঃসমীক্ষণ, ঈশ্বরলাভের জন্যই বাঁচা; শ্রীকৃষ্ণের চিরন্তন নৃত্য; চিন্তার শক্তি;

শাশ্বত শান্তি ও শাশ্বত জ্যোতি; ব্যক্তি-মানস ও বিশ্ব-মানস ; ঈশ্বরের পথ মানুষের সঙ্গেই।

ডিসেম্বর '৫৯ : অহংকার ও আত্মার পার্থক্য; বিবেককে কিরূপে জাগানো যায়; হিন্দুধর্মে মুক্তির অর্থ; ধ্যান কাহাকে বলে? অন্তরের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দাও; ঈশ্বর কি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন? শ্রীমা সারদাদেবী; দেবমানব খৃষ্ট।

জানুআরি '৬০ : নববর্ষে আমরা কি করিব? বেদান্তের সমাধি ও বুদ্ধের নির্বাণ, কে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ? হিন্দুর দৃষ্টিতে স্বর্গ ও নরক; আত্মিক শক্তি কি? আমরা মানুষের কি করিতে পারি—সাহায্য, না সেবা? স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান মানবের আদর্শ; ঈশ্বর ও ব্রহ্ম; শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বারাসত : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত ২১শে, ২৩শে ও ২৪শে জানুআরি ভাব-গাম্ভীর্যের সহিত পালিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ২৮শে ফেব্রুআরি এবং ৪ঠা ও ৫ই মার্চ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর প্রথম দিন চণ্ডী গীতা ও উপনিষদ্‌পাঠ, বিশেষ পূজা হোম আরাত্রিক ও ভোগনিবেদনান্তে বেলা ১২টা হইতে সহস্রাধিক ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও সায়াহ্নে ভজন হয়। পরদিন উদয়াস্ত অখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হয়। সন্ধ্যারতির পর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দির কর্তৃপক্ষ আলোকচিত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। শেষদিন প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পারায়ণ-পাঠ হয়, অপরাহ্নে একটি জনসভায় শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ভাষণ দিলে পর সভাপতি স্বামী জপানন্দ বলেন। সভান্তে শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী সঙ্গীত সহযোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাবির্ভাব-লীলা সম্বন্ধে কথকতা করেন।

হাফলং (আসাম) **:** শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে উহার উপজাতীয় আবাসিক ছাত্রাবাসে গত ২৮শে ফেব্রুআরি মঙ্গলারতি, পূজার্চনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতপাঠ, ভজনসঙ্গীত ও প্রসাদবিতরণাদির মাধ্যমে হাফলং-এর সুরম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আধ্যাত্মিক ভাব-গাম্ভীর্যে বহু লোকের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়।

আজমীর : গত ১৫ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্বাহ্নে মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, ভজন, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ হয় এবং অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, ভজন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী এক জনসভায় আলোচিত হয়। ২২শে ফাল্গুন আজমীর টাউন হলে আয়োজিত ধর্মসভায় রাজস্থান পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীলক্ষ্মীলাল জোশী সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিত কিষণলাল দ্বিবেদী, কুমারী শান্তিদেবী শর্মা, স্বামী একাত্মানন্দ ও স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও অমৃতময়ী বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সালেপুর (উড়িষ্যা): রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১লা জানুআরি কল্পতরু, ২৮শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের এবং ২৮শে ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হয়, এই দিবসত্রয় সকাল হইতে বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ এবং জনসভা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী ভজন-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-দিনে অপরাহ্নে জনসভায় উভয়ের মহিমামণ্ডিত জীবন বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

কদমতলা (হাওড়া): শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সঙ্ঘ-ভবনে সঙ্ঘের ১১শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে ফেব্রুআরি শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী সংশুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও স্বামী জীবানন্দ। সভার পর শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

২৮শে ফেব্রুআরি রবিবার ভজন, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া শোভাযাত্রা ও নগর-প্রদক্ষিণ, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, নরনারায়ণ-সেবা ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা' গীতাভিনয় হয়। দিবসদ্বয়ব্যাপী উৎসব বিশেষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সহিত সুসম্পন্ন হয়।

কুমিল্লা: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১লা হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্যন্ত। প্রথম দুইদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও পুঁথিপাঠ হয়। তৃতীয় দিবসে সাধারণ সভায় আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন ভাবধারা অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হয়; সভাপতিত্ব করেন ঢাকার অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার গুহ। চতুর্থ দিবসে সারাদিনব্যাপী উৎসবে সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। চার দিনই সন্ধ্যার পর রামায়ণ গান হয়।

তেজপুর: গত ২৮শে ফেব্রুআরি রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পূর্বাহ্নে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, যোড়শোপচারে পূজা, আরাত্রিক, ভোগ, প্রভৃতির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্মার সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলালহরী (কথিকা) সঙ্গীত সংযোগে বর্ণিত হয়। রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পঞ্চম পায়োনীয়ার: যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় গত ১১ই মার্চ পঞ্চম পায়োনীয়ারকে মহাশূন্যে পাঠানো হইয়াছে।

রকেট-যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত পঞ্চম পায়োনীয়ার উপগ্রহটির চরম গতিবেগ হইয়াছিল ঘণ্টায় ২৪,৮৬৯ মাইল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-সীমানা ছাড়াইয়া যাইবার পর গতিবেগ কমিয়া দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৭,৬৬৯ মাইল। পঞ্চম পায়োনীয়ার এখন পৃথিবী হইতে ৭,১৩৮৯৪ মাইল দূর পথ দিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

গোলাকৃতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ব্যাস ২৬ ইঞ্চি। ইহার চারিদিকে চারটি 'প্যাডল' বা পাখনার মতো আছে। ইহার ওজন ৯৪.৮ পাউণ্ড। মহাশূন্য হইতে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট পঞ্চম পায়োনীয়ার নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছে:

(১) তেজোবিকিরণ সংক্রান্ত, (২) মহাশূন্যের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কিত, (৩) মহাশূন্যে বিচরমাণ প্লাজম-মেঘের গ্যাসময় রূপের ক্রিয়াকলাপ, (৪) মহাশূন্যে ধাবমান অতি ক্ষুদ্র উল্কারাশির কার্যকলাপ এবং (৫) সূর্যমণ্ডলের জলন্ত শিখার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াদি সংক্রান্ত বিষয়।

[আমেরিকান রিপোর্টার হইতে সংকলিত]

বৈদিক প্রার্থনা

[বসিষ্ঠ ঋষি রাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ]

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎপুনানা যংত্যনিবিশমানাঃ।
ইংদ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ১
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবংতি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ২
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাং।
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ৩
যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জং মদংতি।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবংতু ॥ ৪

[—ঋগ্বেদ সংহিতা, ৭ম মণ্ডল—৪৯ সূক্ত]

বৈদিক ঋষিগণ আকাশে বাতাসে মেঘে আলোকে জলে দেবতাশক্তির সঞ্চরণ অনুভব করিতেন। সেই সকল শক্তিকে মিত্র বরুণ ইন্দ্র আদিত্য অপ্—কত নামে ডাকিতেন, এবং সরলভাবে তাঁহাদের তুষ্ট করিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা তাহাদিগকে জানাইতেন, হৃদয়াবেগপূর্ণ সেই স্তুতিগুলি সূক্ত নামে পরিচিত। বর্তমান সূক্তটির ঋষি বসিষ্ঠ, দেবতা অপ্, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্।

অপ্‌সমূহের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন—হে সমুদ্র, সর্বদা গতিশীল ও পাবনকারী! তোমার অন্তর হইতেই বাষ্পাকারে উঠিয়া জলরাশি মেঘরূপে অন্তরীক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে! বজ্রধারী ইন্দ্র সেই মেঘে বন্দী অপ্‌দেবতাকে মুক্ত করিলেন। তিনি এই স্থানে আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ১

যে অপ্‌দেবতা দ্যুলোকে উৎপন্ন হইয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হন, যে জলরাশি পৃথিবীর উপরিভাগে প্রবাহিত অথবা অন্তর্দেশে লুক্কায়িত, যাহাকে খনন করিয়া লাভ করা যায়, যে জলরাশি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে—সেই সুন্দর উজ্জ্বল পবিত্র অপ্‌দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ২

যে অপ্‌সমূহের স্বামী সর্বাবরক বরুণ দেবতা জলমধ্যে সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী স্বরূপ হইয়া হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে আছেন, মধুর উজ্জ্বল পবিত্র সেই অপ্‌দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ৩

যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহা সোমরসের অধিষ্ঠান, যাহার শক্তিতে বিশ্ব দেবগণ অন্নলাভ করিয়া আনন্দিত হন, বৈশ্বানর অগ্নি (প্রাণিদেহস্থিত পাচনশক্তি) যাহাতে প্রবেশ করেন—সেই দ্যুতিমান্ অপ্‌দেবতা আমা(দিগ)কে রক্ষা করুন। ৪

কথাপ্রসঙ্গে

বিদেশী সাংবাদিকের চোখে

অতীতে বিদেশী পর্যটকদের চোখে ভারতবর্ষ চিরদিন শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তাহার বহু নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বর্তমানেও দেশবিদেশের বিশিষ্ট নেতারা ভারতে আসেন—রাজধানীর সমারোহ দেখিয়া, বড় বড় শহর ও শিল্পকেন্দ্রে গিয়া ভারতকে আধুনিকীকরণের বহুমুখী প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। একটি দেশে বেড়াইতে আসিয়া সে দেশের প্রশংসা করিয়া চলিয়া যাওয়াই শিষ্টাচার। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। না, আমরা মিস্ মেয়ো বা তাঁহার মতো ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা বিশেষ উদ্দেশ্যে বই লিখিবার জন্যই কোন দেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, এবং খুঁজিয়া-পাতিয়া সে দেশের শুধু নর্দমা দেখিয়াই তাহার বিবরণী লিখিতে বসেন।

সে যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন ভারতে রাষ্ট্রীয় আহ্বানে আগত বিদেশী নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বহু ভ্রমণকারী, বহু বিদেশী সাংবাদিক আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতকে ভালবাসেন।

সম্প্রতি এমন একজনের লেখা পড়িয়া আমরা অপরের চোখে প্রতিফলিত আমাদের প্রকৃত রূপ—কিছুটা দেখিতে পাইলাম। লেখিকা ইঙ্গ ডয়েট্‌স্‌ক্রন, জার্মান সাংবাদিক। Hindusthan Standard-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধটির নাম 'India Revisited' *। তিনি পূর্বেও ভারতে আসিয়াছেন, চলিয়া গিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে আবার ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্বে কিছু লেখেন নাই, কারণ তাঁহার ভয় ছিল—সদ্য সদ্য কিছু লিখিলে বোধ হয় ভাবাবেগই প্রাধান্য লাভ করিবে।

অতি নিকটে থাকিয়া প্রিয় জনকে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তাই বুঝি মাঝে মাঝে দূর হইতে দেখারও প্রয়োজন আছে! অপরের চোখে পরিবর্তন যতটা ধরা পড়ে, নিজের চোখে ততটা পড়ে না; তাই অপরের সমালোচনার বা নিন্দাপ্রশংসার মূল্য শুধু উন্নতি-অবনতির গতিরেখা জানিবার জন্যই নয়,—অপরের দৃষ্টিতে প্রতিভাত নিজের দোষত্রুটি সময়মত জানিতে পারিলে সংশোধনের ব্যবস্থাও সম্ভব।

একথা অবশ্য স্বীকার্য এই মহিলা একজন সাংবাদিক মাত্র; কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নন, বিখ্যাত কোন মনীষীও নন, যাঁহার লেখার উপর এতটা প্রাধান্য দিতে হইবে। লেখিকা বিশ্ব-বিশ্রুত কোন ব্যক্তি নন বলিয়াই আমরা তাঁহার মতামতের অধিকতর মূল্য দিতেছি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি—বিশেষত রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিদের উক্তি দুর্বোধ্য যুক্তিজালে, পরিসংখ্যানের গোলকধাঁধায় বা কূটনৈতিক কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন থাকে; তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করিতে হইলে দুইটি লিখিত পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী আর একটি অলিখিত পঙ্‌ক্তি পড়িতে হয় ও তাহার মর্ম বুঝিবার কৌশলও আয়ত্ত করিতে হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রনেতাগণের গতিবিধি তো ছককাটা, তাঁহাদের মতামতও সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা।

* Inge Deutschkron, Bonn Correspondent, Hindusthan Standard.

বর্তমান লেখিকার রচনা এরূপ নয়, ইহাতে আমাদের আত্মসমালোচনার যথেষ্ট খোরাক রহিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে লেখিকা ভারতে আসিয়াছেন, আশা করিয়াছিলেন—অনেক কিছু পরিবর্তন দেখিবেন। তিনি শুনিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর জাপান কি দ্রুত উন্নতি করিয়াছে; তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর জার্মানিও কি ভাবে পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়া পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; বিপ্লবোত্তর চীনের বৈষয়িক উন্নতিও জগৎকে চমকিত করিয়াছে; তাই তিনি আশা করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে ভারতে আসিয়া বিপুল পরিবর্তন দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। ভারতে যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহা নয়; কালপ্রভাবে সকল দেশেই পরিবর্তন ঘটিতেছে, এখানেও ঘটিয়াছে। কিন্তু কই?—ভারতের জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের অভাব কি দূরীভূত হইয়াছে? তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কি কিছু উন্নতি হইয়াছে? বিশেষ কিছু পরিবর্তন তাঁহার চোখে পড়ে নাই। দরিদ্র জনসাধারণ যেরূপ অসহায়ভাবে শহরে আসিয়া জটলা করিত পাঁচ বৎসর আগে, এখনও তাই করে ক্ষুধার তাড়নায়—কাজের সন্ধানে। তাহাদের দেখিলে তো মনে হয় না যে তাহারা ভাল খাইতে পায়, ভাল পরিতে পায়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও ভারতের উন্নতি বিষয়ে পূর্বের মতোই সংশয়াকুল, নৈরাশ্যব্যঞ্জক সমালোচনায় মুখর, নিজ নিজ সংসার-পরিবারের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছন্দ পরিচালনা-ব্যাপারে সর্বদা উদ্বিগ্ন; তাহারা যে সুখী—একথা একবারও মনে হয় না।

তবে পরিবর্তন কোথায়? বাহির হইতে দেখিলে বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলিলে পরিবর্তনের কথা কানে আসে, প্রাণে বাজে—তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা। পাঁচ বৎসর আগে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীর যে গর্ব বোধ ছিল, আজ তাহা দেখা যায় না, অথচ এই প্রকার গৌরববোধ ছাড়া কি করিয়া একটি জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে? আশা আজ অবসাদে পর্যবসিত। একটা আলস্য জাতির বৃহৎ অংশকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। স্বার্থপরতা সরীসৃপের মতো জাতির দেহমনকে জড়াইয়া ধরিতেছে, সমাজের প্রায় সর্বস্তরে দুর্নীতি দেখা দিতেছে।

লেখিকার মন্তব্য: ভারতের ধনী সম্প্রদায়—যাহাদের তুলনা ইওরোপে নাই, আমেরিকায় অবশ্য আছে—তাহারা আরও ধনী হইতে চায়, তাহাদের কোন জাতীয়তাবোধ নাই, জাতির পুনর্গঠনে তাহাদের কোন দায়িত্ববোধ নাই। ধনসঞ্চয়ের ঊর্ধ্বসীমা বাঁধিয়া দিয়া রাষ্ট্রনেতারা ধনীদিগকে হতাশ করিয়া রাষ্ট্রের শত্রু করিতে চান না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: এই ধনীরা কি অপরিমেয় ধন-সঞ্চয়ের দ্বারা এখনই স্বদেশের ও স্বজাতির শত্রুরূপে পরিগণিত হইতেছে না? দরিদ্র দেশবাসীর সহিত তাহাদের যোগাযোগ কোথায়? তাহারা কি সর্বতোভাবে নাগরিকের কর্তব্য পালন করিতেছে? তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে—অদূর ভবিষ্যতে তাহারও কোন আশা নাই।

ভারতের ধনীর তুলনা যেমন ইওরোপে নাই, লেখিকার মতে ভারতের দরিদ্রের মতো এত দরিদ্রও ইওরোপে নাই, ভারতের দরিদ্র যেন আজ হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, সে মনে করে—তাহার আর উন্নতির আশা নাই। আজ সেও শিখিতেছে সরলতা ছাড়িয়া কপটতা,

সেবার ভাব ছাড়িয়া স্বার্থপরতা। বিনা পয়সায় কেহ এখন আর গ্রামরক্ষার বাঁধে এক ঝুড়ি মাটিও দিতে রাজী নয়, নলকূপের সামান্য মেরামতটুকু করিতেও গ্রামবাসীরা নিজেরা সমর্থ নয়। সব কিছু সরকার বা সরকারী কর্মচারীরা করিয়া দিবে—ইহারাই তাহাদের আশা, ইহাই তাহাদের দাবি।

ভারতের মানুষ কেন এত অলস? কেন এত উদাসীন—উৎসাহহীন? জাতীয় উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় কেন এই সহযোগিতার অভাব? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের আস্থা কেন দৃঢ় হইতেছে না? ভাসা-ভাসা দেখিলে কিছুই ধরা পড়ে না, তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায়—এমন কিছু ঘটে নাই, যাহা জনসাধারণের জীবন স্পর্শ করিয়াছে বা করিতে পারে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বা সময়ের প্রয়োজনে ভারতে বড় বড় কল-কারখানা গোটাকতক হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সমগ্রভাবে জাতির জীবনধারা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। মানুষের মুখের গ্রাস বাড়ে নাই, বাড়িবার আশাও বাড়ে নাই।

শিল্পযুগ ভারতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইস্পাত কারখানা—একটির পর একটি স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু তাহা দেশবাসীর মনে কোন আশার সঞ্চার করিতেছে না। ইস্পাত-কারখানায় খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে না; খাদ্য উৎপন্ন করিবার যন্ত্রপাতি লাঙ্গল-কোদালও নয়,—ক্ষেতখামারে জলসেচ করিবার পাম্পও নয়। সাধারণ মানুষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মহিমা বুঝিতে পারে না। ক্ষুধার্ত মানুষ চোখের সামনে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইতে দেখিলে সুখী হইত, নিশ্চিন্ত হইত, জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় বর্ধিত বেগে আগাইয়া আসিত।

দেশে উন্নয়ন-পরিকল্পনার অভাব নাই, ইহার অধিকাংশই উপর হইতে নীচে নামিতেছে, কিন্তু যথার্থ উন্নয়নের গতি নিম্ন হইতে উপরে। গ্রাম-উন্নয়নে গ্রামবাসিগণ দর্শক মাত্র, বড় জোর শ্রোতা। গ্রামে যাঁহারা উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে আসেন, তাঁহারা গ্রামবাসীদের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন না; গ্রামবাসীরাও তাঁহাদের ভাষা শুনিয়া ও ভূষা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিদেশীই মনে করে, তাঁহাদের খুব কাছে আসিতে সাহস করে না।

এখানে-সেখানে দুই একটি আদর্শ গ্রাম স্থাপিত হইলেও সাধারণ গ্রামের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই, গ্রামের অভাব-অভিযোগ শুনিয়া সেগুলি দূরীভূত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, গ্রামবাসী যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। গ্রামের উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন পথ-ঘাট ও কৃষির উন্নতি, তারপর কুটির শিল্পের,—যাহাতে গ্রামবাসী গ্রামে থাকিয়াই নিজেদের সংসারের উন্নতির সহিত দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারে। ভারী শিল্প অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাহা যেন কৃষি ও কুটির-শিল্পকে ব্যাহত না করে। যদি ব্যাহত করে—তবে দেখা দেয় দেশব্যাপী অভাব ও অসন্তোষ।

বিদেশ হইতে খাদ্য ভিক্ষা করিয়া একটি জাতি দীর্ঘদিন তাহার মেরুদণ্ড সোজা রাখিতে পারে না। অর্থ, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু উন্নয়ন করা যায় তাহাই স্থায়ী হয়, কল্যাণকর হয়; ধার করা উন্নয়ন চমকপ্রদ হইলেও স্থায়ী হয় না, কল্যাণপ্রদ হয় না।

লেখিকা লক্ষ্য করিয়াছেন, নেতারা আজ একটিও নূতন ভাব দেশবাসীকে দিতে পারিতে-

ছেন না। পুরাতন বুলিগুলিই বিভিন্ন ভাবে বলিয়া আসর গরম রাখিতেছেন। ব্যক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরতা বাড়িয়াছে। দেশ বা নীতি বড় কথা নয়, ব্যক্তিই বড়; গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা বড়ই বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব জাতির জীবন ক্ষুণ্ণ করে, নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, নূতন ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, নূতন চিন্তার স্রোত চালু হইতে পারে না। এই ভাবেই জাতীয় জীবনে ভাটা পড়ে, জড়তা আসিয়া যায়, জাগরণের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অবশ্য এ কথা ঠিক—ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যখন আবার নূতন ভাবের আত্মপ্রকাশের সময় আসে, তখন কেহই তাহাকে রোধ করিতে পারে না। সে জাগরণের আন্দোলন তাহার নিজস্ব গতিবেগ নিজেই রচনা করিয়া অগ্রসর হইবে! এরূপ সামগ্রিক জাতীয় জাগরণ এখনও কতদূরে—কে বলিতে পারে?

ভারতের উপেক্ষিত কৃষক, তাঁতি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিজেতার নিপীড়ন এবং স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা সত্ত্বেও স্মরণাতীত কাল হইতে নীরবে কাজ করিয়া আসিতেছে, এবং ইহার জন্য কোন দিনই তাহারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় নাই। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষা চাষী, মুচি, ঝাড়ুদার প্রভৃতির কর্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা অনেক বেশী। তাহাদেরই নীরব অকুণ্ঠ পরিশ্রম যুগ যুগ ধরিয়া দেশের যাবতীয় ধন সম্পদ উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

ভারতের এই সব কৃষক ও শ্রমিকবৃন্দ যদি তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মত দুচারখানা কেতাব না পড়িয়া থাকে, বা তাহাদের মত পোষাকী সভ্যতা বরণ না করিয়া থাকে, তাহাতে কী আসে যায়? এগুলির মূল্য কতটুকু? মনে রাখিও—সব দেশে ইহারাই জাতির মেরুদণ্ড। ইহারা যদি কাজ বন্ধ করে, তোমাদের অন্নবস্ত্র আসিবে কোথা হইতে?

* * *

বহুলোকের উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কাপুরুষও অনায়াসে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু সকলের দৃষ্টির অগোচরে সামান্য কাজেও যে ব্যক্তি ঐ প্রকার স্বার্থশূন্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে, সেই যথার্থ ধন্য। হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমিকবৃন্দ, তোমাদের কর্ম বাস্তবিকই এই পর্যায়ের। তোমাদের অভিবাদন করি।

* * *

মনে রাখিও দরিদ্রের কুটিরেই ভারতীয় জাতির বসতি। কিন্তু হায়, তাহাদের জন্য কেহ কখনও কিছু করে নাই।

—বিবেকানন্দ

চলার পথে

'যাত্রী'

ধর্মের ইতিহাস যাদুঘরের ইতিহাস নয়। পুরাতত্ত্ব এর মধ্যে থাকলেও যদি তাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তাকে আমরা আর যাই কিছু বলি না কেন, তা যে যথার্থ অধ্যাত্ম-রাজ্যের বিষয়ীভূত নয়, এ কথা বলতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি: বুদ্ধের জীবন ২৫০০ বছর আগেকার ইতিহাস বলেই তা ধর্ম নয়, সেই ইতিহাস বা সেই সময় আজও কোন-না-কোন আনন্দময় ভাবরূপে বিভিন্ন মানব-মনে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাকে সুন্দর, পবিত্র ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে উদ্বুদ্ধ করছে বলেই বুদ্ধের জীবনীকে ধর্মের জীবনী ব'লে মানবো। ধর্মের ইতিহাসে তাই অতীত ঘটনার বিষয়-বিচিত্রার কোন দাম নেই, যদি না তা আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সৌন্দর্য, তার পবিত্রতাটুকুকে আমরা আমাদের বর্তমান জীবনে আবার গভীরভাবে ধরতে না পারি। তাই পুরাতত্ত্বের শিলাখণ্ড বা প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সন্ধান করা ধর্মের কাজ নয়; ধর্মের কাজ—জীবন্ত বস্তুকে নিয়ে, আজকের জিনিসকে নিয়ে, বাস্তবকে নিয়ে। আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয়, ধর্মের কাজ—জীবনকে নিয়ে, প্রাণবন্ত দেহকে নিয়ে, মনকে নিয়ে, আত্মাকে নিয়ে—নব সৃষ্টির প্রেরণায় 'আমাকে' নিয়ে। এই 'আমার' সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু ও পৃথিবীর সম্বন্ধ কি এবং এই জগৎ থেকে আমি চলে গেলেই বা তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ দাঁড়াবে—এই সব জড়িয়েই ধর্মের জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে।

এ কথা ঠিক, ধর্মের প্রচণ্ড চলার গতি তার দেশের ভাস্কর্যে, শিল্পে, কাব্যে, কলায় দাগ রেখে গেছে; কিন্তু সেই দাগ বা আঁকের সমগ্র সূচীপত্রই কিছু ধর্ম নয়। তাছাড়া এই বাংলাদেশেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বামাক্ষ্যাপা বা রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন বলেই আমাদের ধর্মের উত্তরাধিকার-সূত্র থেকে গেল--এ কথা ভাবাও ভুল। কারণ অন্যের কি হ'ল বা কি হয়েছিল, তা নিয়ে ধর্ম নয়। নিজের কি হ'ল, বা কতখানির জন্য চেষ্টা চলছে, তার ঐকান্তিকতা নিয়েই ধর্মের বিচার। ধর্ম তাই 'হওয়ার' জিনিষ। অতীতের নিশ্চিন্ত রোমন্থন বা ভবিষ্যতের উদ্যমহীন স্বপ্নালু আশ্বাস নিয়ে আর যাই কিছু হোক, ধর্মের ইমারত নিজ জীবনে গড়ে তোলা যায় না,—এ শুধু জলের ওপর দাগ কেটে তাকে চিরস্থায়ী করবার অসম্ভাবনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া।

তা ব'লে কি ধর্মের দিকপালদের জীবনী নিয়ে আলোচনা ক'রব না, তাঁদের মধ্যে আমার অনুভূতির উৎস খুঁজব না?—খুঁজব ততখানিই, যতখানি আমার জীবনকে ধর্মময় ক'রে তোলার প্রয়োজনে লাগে। যীশুর জীবন যদি একদিন মরণ থেকে বেঁচে উঠে থাকে, তাহলে আমিও একদিন ঐ ভাবে বেঁচে উঠতে পারবো; শ্রীরামকৃষ্ণ যদি জীবনে 'মা, মা' ক'রে আকুল ক্রন্দনে ভাসিয়ে 'মা'কে সত্যসত্যই পেয়ে থাকেন, তাহলে আমিও আশ্বাস পাবো এই ভেবে যে আমার জীবনেও ঐ ভাবে ঐ ঘটনা একদিন ঘটতে পারে। আরও সহজ কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়: সমুদ্রের দুর্গম পথে চলতে চলতে কোন এক নাবিক 'উত্তমাশা অন্তরীপে' পৌঁছেছিলেন; আমিও সেইদিকে আমার জাহাজ চালিয়ে, আমার পথিকৃৎ ঐ নাবিককে অনুসরণ করেই একদিন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো,—ধর্মের পথে পূর্বাচার্য সাধকদের বাণীর ও জীবনের সার্থকতা এইরূপই। আমি যদি কোনরূপ প্রচেষ্টার জাহাজ না চালিয়েই ভাগ্যের দোলায় দুলি

এবং একজন জাহাজ চালিয়ে 'উত্তমাশা'য় পৌঁছেছিল—শুধু এইটুকু জেনেই এবং সেই রক্তরাঙা পায়ের ছাপ স্মরণ করেই স্বপ্নের জাল বুনি, তাহলে কি 'উত্তমাশা'য় পৌঁছতে পারবো?—পারবো না। কারণ ধর্ম উপলব্ধ বস্তু নিয়ে বেসাতি করে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে কারবার চালায়। পরের মুখে ঝাল খেয়ে আর যাই কিছু হোক, নিজের জীবনে কোন সত্য বা সান্ত্বনা লাভের সম্ভাবনা ধর্মপথে অন্ততঃ নেই।

উচ্চতম সাধকজীবনের দর্শন-স্পর্শনেই যে মানব-মনে ধর্মের প্রেরণা জেগে ওঠে, তাও নয়। হীরকের উজ্জ্বল দ্যুতি, নীলাকাশের স্বচ্ছতা, সূর্যাস্তের বর্ণালী লীলা, চাঁদের হাসির উচ্ছলতা, নদীর নিরন্তর প্রবাহ, রাতের আকাশে তারার ঝিকিমিকি, বনানীর অতন্দ্র জাগরণ, পাখীর কাকলি, শিশুর হাসি, জননীর স্নেহ, পরার্থে জীবনাহুতি—এমন কত কি কখন কোন ফাঁকে এসে যে আমাদের সুপ্ত মহত্ত্বের উৎসমুখের পাথরকে সরিয়ে জলোচ্ছ্বাস জাগায় তা কে জানে! কিন্তু একবার যদি ঐ মুখ খুলে যায়, তাহলে সেই অবারিত জলপ্রবাহ যে স্বাধীনতার ব্যাপ্তিতে উন্মাদ হ'য়ে—অন্ততঃ কিছুটাও ছুটে চলবেই এটা ঠিক। আধ্যাত্মিক প্রবাহের এই উৎসমুখ খোলাটাকেই সুধীজন 'বৈরাগ্য' আখ্যা দিয়াছেন, যা এলে ধর্মের পথে চলার সঠিক প্রেরণা এল।

ঐ প্রাথমিক প্রেরণাটিকে—ঐ বৈরাগ্যকে কিন্তু সদাই উদ্দেশ্যমুখী রাখা চাই। নদী যদি একবার পর্বত-কন্দর ভেদ ক'রে নেমে আসে, তাহলে তাকে সমুদ্রে পৌঁছবার 'নিষ্ঠা' রেখে চলতে হবে। তা না হ'লে মাঝপথেই তার প্রবাহ শুকিয়ে যাবে! আমাদের 'বৈরাগ্যপ্রবাহ'ও যাতে ঈশ্বর-সমুদ্রে মিশতে পারে, তার জন্য চাই ব্যাকুলতা।

মোটকথা ধর্ম মানবজীবনের একটি ক্ষণিক বেগের প্রচণ্ড আলোড়ন নয়, বরং ঐ বেগের প্রবহমানতাকে অব্যাহত রেখে পরমার্থকে লাভ করাতেই তার সার্থকতা। আর এই সার্থকতা লাভের পথে কোন আপোষ নেই, কোন থেমে যাওয়া নেই, নেই কোন তটের সীমান্বিত বন্ধনকে স্বীকার করা, নেই কোন বনানীর সবুজতার মোহে আটকে পড়ার ইঙ্গিত, কিংবা নিজেকে পথিমধ্যে বিলিয়ে দেবার মোহময় উন্মত্ততা।

ধর্মের পথের এই 'নিষ্ঠা' ও 'বৈরাগ্য' আনন্দ নিয়ে গড়া। স্বাধীনতার খোলা হাওয়ায় তাদের বাস—এতে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, নেই কোন আনন্দহীন জীবন-বিপাক। তাই তো জীবনের যে কোন মুহূর্তে বীতরাগ সাধু পারে তার ক্ষণিকের সুখ-নীড়কে নির্মোহ অবসানের মধ্যে টেনে আনতে, পারে তার এগিয়ে চলার প্রয়োজনে আবার দুরন্ত দুঃখের ঘূর্ণিপাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ধর্মের এই অবাধ সামগ্রিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেই বোধ হয় কবি বলেছেন—আমি ভগবানকে ভালবাসি, কেননা তিনিই আবার আমাকে তাঁকে অস্বীকার করার অধিকারও দিয়েছেন।

তাই চল পথিক, আর্তির কঙ্কাল ছেড়ে জীবন্ত স্বাধীনতার পথে চল। আনন্দের পথে প্রবাহিত কর তোমার মানসিক গতিকে, দৈহিক স্থিতিকেও। মনে রেখো, মুক্তির ঐ মহান্ আনন্দকে লাভ করার জন্য সকলকেই একদিন না একদিন এই পৃথিবীতে মানুষ হয়েই আসতে হবে—কারণ স্বর্গের দেবতাদেরও অধিকার নেই এই আনন্দে। তাই বলি, মানুষ-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কি অবহেলায় বিলিয়ে দেবে? মহান্ আনন্দের উত্তরাধিকারী হয়েও এই জীবনের সুন্দর সম্ভাবনাকে বিফলতায় দেবে লুটিয়ে? না, তা হয় না। তুমি যে অমৃতের সন্তান। চল চল, এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সৌর-কলঙ্কের মত দেখি কত কি যে!

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মেঘের লাগিয়া নদী ঊর্ধ্বপানে চেয়ে চেয়ে থাকে,
সূর্যতরে সূর্যমুখী চির অপেক্ষিতা।
নদীরে লভিতে বক্ষে সিন্ধু ডাকে কত অনুরাগে,
মায়ামৃগ কেন ভীতা?
কাল-ব্যাধ অন্তরালে লক্ষ্য করে তার গতিপথ
কে জানে কখন তারে তীর হানি' ক'রে যাবে বধ?

উদয়-অস্তের পারে আঁখি মোর আবেশ-বিহ্বল,
সীমা মাঝে অসীমের রূপ-সমাবেশে
জীবন-উৎসব শেষে
কাল স্রোতে মিশে যায় অশ্রু-শতদল।
আজ আমি রহি একা, কোন কাজে লাগে নাক' মন,
দুদিনের আয়ুনীড়ে থেমে গেল কাকলী-কূজন।

সংশয়-দ্বিধায় ভরা এ সংসারে রহস্যের বুকে
সৌর-কলঙ্কের মত দেখি কত কি যে!
বিরহ-মিলন মিছে
আশা ভয় ভালবাসা সাথে নিয়ে আসে সুখে দুখে।
অন্তরের বাসনারে দেখেছি যে মেরু-জ্যোতি সম,
আলোক-মেঘের খেলা ভুলায়েছে উগ্র চিত্ত মম।

বৈদিক মন্ত্রের মতো কথা যত চির কাল ধরি'
শব্দ তরঙ্গের সনে করে কানাকানি;
তারা কি ভূমারে বরি'
জ্ঞানঘন-রসানন্দে শুনাবে না দেবতার বাণী!
নৃত্য করে গ্রহ তারা, জগন্ময় প্রভু যে আমার,
তবুও আকাশ ডাকে, সমুদ্রের আর্ত হাহাকার।

অগ্নিগর্ভ বাণী

[নব পর্যায়]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

'সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকলে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।' —শ্রীরামকৃষ্ণ

'চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। —বিবেকানন্দ

কোথায় আমাদের চরিত্রের সব চেয়ে বেশী গলদ, তার ফলে কি হীন অবস্থা আমাদের ঘটেছে, এবং এ দূরীভূত না হ'লে আমাদের কি পরিণাম, তা যেন এই বাক্যগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের জীবনে, আমাদের আচরণে ও কাজকর্মে চালাকির মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গোড়াতে হিন্দুজাতির মধ্যে পৌরুষ ও সরলতারই প্রাধান্য ছিল—চালাকির স্থান ছিল না। কি ক'রে এই বিষ সমাজ-দেহে সংক্রামিত হ'ল—তা তলিয়ে দেখা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

হিন্দুজাতির চরিত্র যুগে যুগে কিরূপ ছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ আচার্য ম্যাক্সমূলর আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।[১] তা থেকে কিছু সংকলন ক'রে এখানে দিচ্ছি। তৎপূর্বে ব'লে রাখা দরকার যে ম্যাক্সমূলর নিজেই পাঠকদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে—সকল সমাজেই ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর লোক বরাবর ছিল এবং থাকবে। সুতরাং সকল ভারতবাসীকে এক তুলিতে রং করা যায় না। যদি বলি ভারতবাসী মাত্রই সত্যবাদী এবং ধার্মিক, কিংবা তার বিপরীত, তবে তা কখনই বাস্তব হ'তে পারে না। তথাপি একটা জাতি অথবা সমাজের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণদোষের প্রাধান্য তা একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ ম্যাক্সমূলর খুব সঙ্গত কারণেই ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক সীমারেখা টেনেছেন। তিনি লিখেছেন যে ভারতবর্ষ চিরকাল গ্রাম-পঞ্চায়েতের দেশ। বিদেশী প্রভাবে প্রভাবিত শহর ও শহরবাসীদের দেখে এবং শুধু সেই পর্যবেক্ষণের বলে সত্যিকারের ভারতীয় সমাজকে বিচার করতে গেলে ভুল হবে। কালের দিক্ থেকে ম্যাক্সমূলর ১০০০ খৃষ্টাব্দকে একটি ছেদরেখা ব'লে গণ্য করেছেন। তখন থেকেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের এবং পরাধীনতার ফলে হিন্দুদের চরিত্রের গভীর পরিবর্তন শুরু হয়। এগুলি খুবই ভাববার কথা।

এবারে আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত কালানুক্রমিক বিবরণে আসা যাক্। গ্রীক লেখকদের মধ্যে হিন্দুদের সম্পর্কে প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া যায় ক্তেসিয়াসের (Ktesias) রচনায়। ইনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষে বিদ্যমান ছিলেন। পারস্যের রাজসভায় হিন্দুদের ন্যায়পরায়ণতার প্রভৃত গুণকীর্তন তিনি শুনেছিলেন এবং তা লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন।

তৎপরে পাওয়া যায় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা। তিনি লিখেছেন : ভারতবর্ষে চুরি প্রায় অজ্ঞাত,

[১] দ্রষ্টব্য—India, What Can It Teach Us? গ্রন্থের দ্বিতীয় বক্তৃতা—Character of the Hindus.

এবং জনসাধারণ সত্য ও ধর্মকে অতিশয় মান্য করে।

আরিয়ান (Arrian—দ্বিতীয় শতাব্দী) লিখে গিয়েছেন যে গুপ্তচরেরা রাজার কিংবা শাসন-কর্তাদের নিকট প্রজাবর্গের আচরণ সম্পর্কে সর্বদাই খবর সংগ্রহ ক'রে আনত। তাদের বিবরণে অন্য দশ রকম অসদাচরণের কথা থাকলেও মিথ্যাভাষণের দৃষ্টান্ত কিংবা অভিযোগ একটাও পাওয়া যায় না।

গ্রীকদের পরেই চীনা পর্যটকদের বিবরণ। ভারতবাসীদের সততা ও সত্যকথন সম্পর্কে তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন। হিউয়েন্থ সাং বলেছেন, 'ভারতীয়েরা আমোদ-প্রিয় হলেও তাদের চরিত্রের লক্ষণীয় গুণ সরলতা ও সততা। অন্যায়ভাবে তারা কখনও অপরের ধন গ্রহণ করে না; পাছে অন্যায় হয়, এই ভয়ে তারা নিজেদের দাবি সর্বদাই সংকুচিত করে।...... শাসনকার্যেও দেখা যায়, সর্বত্র বেশ সোজাসুজি ব্যবহার, কোথাও প্যাঁচোয়া ভাব নেই।'

তার পরে পাওয়া যায় মুসলমান বিজেতাদের বিবরণ। বিজিতদের সম্পর্কে তারা যে অযথা প্রশংসাবাক্য ব্যবহার করেছেন, এরূপ মনে করবার কোনই হেতু নেই। একাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিসি তৎপ্রণীত ইতিহাসে লিখেছেন, 'ন্যায়পরায়ণতা ভারতবাসীদের স্বাভাবিক গুণ; ন্যায়পথ থেকে তারা কখনও বিচলিত হয় না। তাদের সততা, সত্যপরায়ণতা এবং একবার কথা দিলে সেই কথা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা —এত সুবিদিত যে এর ফলে চারদিক থেকেই লোক ভারতবর্ষে এসে ভিড় করে।'

ত্রয়োদশ শতকে বেদি এজ্‌র্ জেনান (Bedi ezr zenan) নামক লেখকের উক্তি আর একজন মুসলমান লেখক (শামসুদ্দীন আবু আবদাল্লা) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আছে, 'ভারতীয়েরা বালুকণার ন্যায় সংখ্যায় অগুনতি; কিন্তু তাদের মধ্যে কোন রকম প্রতারণার অথবা জোর জুলুমের ভাব নেই। তারা জীবনকেও ডরায় না, মৃত্যুকেও না।'

চতুর্দশ শতকে খৃষ্টান পাদ্রী জর্ডানাস (Friar Jordanus) দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা সত্যবাক্ এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ।

পঞ্চদশ শতকে কামালেদ্দীন আবদের্ রাজাক্ সমরখন্দী খাকানের রাজদূত হ'য়ে প্রথমে কালিকটে এবং তৎপরে বিজয়নগরে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঐ দুই রাজ্যে সওদা-গরেরা টাকাকড়ি ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে নির্ভয়ে চলাফেরা ক'রত।

ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল-ফজল সুবিখ্যাত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন, 'হিন্দুরা ধর্মপরায়ণ, অমায়িক, প্রফুল্লচিত্ত, ন্যায়বান্, নির্জনতাপ্রিয়, কার্যকুশল, সত্যসন্ধ, হিতকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং নিরতিশয় বিশ্বাসভাজন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কাকে বলে, তা তাদের সৈন্যেরা জানে না।'

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও অনেক মুসলমান লেখকই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন যে মুসলমানেরা পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করে, তার তুলনায় হিন্দুদের পরস্পরের ব্যবহার অনেক বেশী সরল এবং উদার। এ বিষয়ে মীর সালামত আলী নামক একজন বৃদ্ধ এবং অতিশয় ধর্মপরায়ণ মুস্লিমের উক্তি কর্নেল শ্লীম্যান উদ্ধৃত করেছেন; যথা—'কচিৎ কোন হিন্দু হয়তো মনে করতে পারে যে মুসলমানকে ঠকালে দোষ নেই, বরঞ্চ পুণ্য কাজ; কিন্তু স্বজাতীয়কে ঠকানো পুণ্য কাজ ব'লে কিছুতেই মনে করবে না। মুসলমানদের ব্যবহার ঠিক

তার বিপরীত। তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৭২টি সম্প্রদায় আছে; আর এদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর শুধু অপর ধর্মাবলম্বীদের নয়, পরন্তু স্বধর্মান্তর্গত অপর ৭১টি সম্প্রদায়ের লোকদের নিঃসঙ্কোচে ঠকিয়ে থাকে, এবং প্রতারিত ব্যক্তি যত নিকটতর সমাজের লোক হয়, ততই অধিকতর পুণ্যসঞ্চয় হ'ল ব'লে মনে করে।'

ম্যাক্সমূলর বলেছেন: এইরূপে আমি বইয়ের পর বই থেকে বিদেশীয়দের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে যেতে পারি এবং সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, যে সমস্ত বিদেশীয়েরা ঘনিষ্ঠভাবে ভারতবাসীদের জেনেছেন, তাদের প্রত্যেকের নিকটেই একটা জিনিস বিশেষভাবে চোখে লেগেছে, সেটি হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা। কেউ তাদের প্রতি মিথ্যাভাষণ কিংবা মিথ্যাচারের অভিযোগ আরোপ করেননি। এর একটা হেতু নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বর্তমান যুগেও পর্যটকেরা এরূপ মন্তব্য বড় একটা করেন না যে অমুক দেশের লোকেরা সর্বাবস্থায়ই সত্য কথা বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের সম্পর্কে ইংরেজ পর্যটকদের বৃত্তান্ত পড়ুন, তার মধ্যে ফরাসীদের সততা কিংবা সত্যনিষ্ঠার কোন উল্লেখ পাবেন না। আর ইংলণ্ড সম্পর্কে ফরাসী পর্যটকদের বর্ণনায় ইংরেজ-চরিত্রের সম্পর্কে একটি বক্রোক্তি প্রায়শঃ চোখে পড়বে, সেটি হচ্ছে 'বিশ্বাসঘাতক' —(Perfide Albion).

ইংরেজেরা এদেশে এসে প্রথমাবস্থায় ভারতীয়দের যেমন দেখেছিলেন, তারও কতক বর্ণনা ম্যাক্সমূলর উদ্ধৃত করেছেন। হিন্দুদের সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসের উক্তি: তারা বিনম্র এবং উদার, সামান্যতম উপকারের জন্যও কৃতজ্ঞ থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য এই যে অনিষ্টকারীর প্রতিও তারা কোনরূপ হিংসার ভাব সাধারণতঃ হৃদয়ে পোষণ করে না। হিন্দুরা বিশ্বাসী, দয়ালু, স্নেহপ্রবণ এবং সর্বদা আইন মেনে চলতে প্রস্তুত।

বিশপ হিবার বলেছেন, 'হিন্দুরা সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানলাভের এবং আত্মোন্নতির জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত,—ধীরস্বভাব, পরিশ্রমী, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল। সদয় ব্যবহারের দ্বারা তাদের হৃদয় এত সহজে জয় করা যায় যে, এর তুলনা অপর কোন জাতি অথবা সমাজের মধ্যে আমি দেখিনি।'

এলফিনষ্টোন লিখছেন: আমাদের (ইংলণ্ডের) বড় বড় শহরের নিম্নস্তরের লোকেরা যেরূপ হীনচরিত্র, হিন্দুদের কোন শ্রেণীর লোকই সেরূপ অধম নয়। ভারতের সর্বত্র গ্রামাঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত অমায়িক,—পরিবারের ভিতরে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ এবং সদয়। শুধু সরকার ব্যতীত অপর সকলের প্রতিই তাদের আচরণ অতিশয় সরল এবং অকপট। 'ঠগ' এবং 'ডাকাত'দের যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায়, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে দণ্ডনীয় অপরাধের সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক কম। 'ঠগ'দিগকে ভারতবাসী না ব'লে একটা আলাদা জাত বলেই গণ্য করা উচিত; আর 'ডাকাত'রা হচ্ছে বেপরোয়া, গুণ্ডাশ্রেণীর লোক। হিন্দুদের স্বভাব অতিশয় নম্র এবং শান্ত। এমনকি বন্দীদের প্রতিও এশিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় তারা খুবই সদয় ব্যবহার ক'রে থাকে। ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে,—এবং এখানেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সব চেয়ে চোখে পড়ে। তাদের আচার-ব্যবহারের শুচিতা দেখলে আমাদের নিজেদের আত্মশ্লাঘায় আঘাত না পড়ে যায় না।

এই সাধুবাদের মূল্য খুবই বেশী, যেহেতু এলফিনষ্টোনই অন্যত্র অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ভারতীয় চরিত্রের সত্যিকার দোষত্রুটির নিন্দা করেছেন! তিনি লিখেছেন যে, এখনকার দিনে অর্থাৎ এলফিনষ্টোনের সময়ে সত্যের অপলাপই ভারতীয়দের একটি প্রধান দোষ; আবার সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছেন, 'কিন্তু এই মিথ্যাপরায়ণতা অথবা শঠতা তাদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী দেখা যায়, যারা সরকারের সঙ্গে জড়িত;—আর এই শ্রেণী সংখ্যায় অনেক, যেহেতু ভূমিরাজস্ব-আদায়ের বেড়াজাল এমন দেশব্যাপী, এবং রাজস্ব আদায় এমনই একটা ব্যাপার যে নিতান্ত গরীব গ্রামবাসীও অনেক সময়ে অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।'

স্যার টমাস মনরো লিখেছেন, 'উত্তম কৃষি-ব্যবস্থা, হাতের কাজে অতুলনীয় দক্ষতা, নিত্য-প্রয়োজনীয় এবং বিলাসের দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ক্ষমতা—সাধারণ লেখাপড়া ও হিসাবপত্র শেখাবার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়—পরস্পরের মধ্যে প্রচুর দয়াদাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তা—সর্বোপরি স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার,—এগুলি যদি সভ্যজাতির লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুরা কিছুতেই ইওরোপীয় জাতিদের তুলনায় সভ্যতায় ন্যূন নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 'সভ্যতা' যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির সামগ্রী হয়, তবে ইংলণ্ড এই জিনিসটি ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করতে পারে এবং করলে লাভবান হবে।'

যে সকল ভারতবাসীর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ঘটেছিল, তাদের কথা উল্লেখ ক'রে ম্যাক্সমূলর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলেও ভারতীয় চরিত্রের খুব সুখ্যাতি করেছেন। পরিশেষে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার থেকে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন যে হিন্দুদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হ'তে সত্যের প্রতি একটা অপরিসীম শ্রদ্ধার ভাব বরাবর রয়েছে।

* * *

এই সমস্ত বিবরণ পড়বার পর একটা দারুণ জিজ্ঞাসা আমাদের মনে স্বভাবতই জাগে যে, যদি হিন্দুজাতির চরিত্র এতই উন্নত ছিল, তবে বর্তমানের অধঃপতন ঘ'টল কেমন ক'রে? ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অল্প কয়টি কথায় এর কারণ সুষ্ঠু ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বহুমূল্য কথাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করছি:

'বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্বে, হিন্দুরাজত্বের অভ্যুদয়ে ও প্রভাবকালে প্রাচীন গ্রীক পর্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দুজাতিকে সাহসী, সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতি, আতিথেয়, স্বদারনিরত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিল।[২] স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাঁহাদের রাজসভার দূষিত সংস্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের সর্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা। যদিও বহুবিবাহ

২ হিন্দুদের চরিত্রে এমন কোন গুরুতর দোষত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল যার ফলে এত সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েও তারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এখানে সেই বিচারে আমরা যাচ্ছি না।

হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, এবং কৌলিন্যপ্রথা-নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনীদিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং সেটা যেন এক প্রকার সম্ভ্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংস্রবে হিন্দু ধনীদিগের মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য হইত, সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইত। এইটি মুসলমান অধিকারের সর্বপ্রধান কলঙ্ক। ইহা জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কারণে দেখিতে পাই, মুসলমান অধিকার-কালে সে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি এই অধিকার-কালে যে সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতেও ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্মের নাম ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে।

মুসলমান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা-পরতা। দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্ম-গোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় অপর সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইরূপে পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পাইত না। তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরেজদিগের রাজস্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইয়া তাহাও অন্তর্হিত হইল। লোকে দেখিল, সত্য নির্ধারণ করা ইংরেজের আইন বা আদালতের লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি না—তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকে জানিল যে, যে যত মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহারই জয়াশা তত অধিক। এইরূপে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যাসাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইল।[৩] লোকে জালজুয়াচুরি দ্বারা কৃতকার্য হইয়া স্পর্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজ মধ্যে গৌরবলাভ করিতে লাগিল। দেশের এরূপ দুর্দশা না ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালী জাতির প্রতি যেরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন না।'

ইংরেজ-শাসনের উল্লিখিত দোষত্রুটি সত্ত্বেও একথা অবিসম্বাদিত যে পাশ্চাত্য জ্ঞান আমদানির ফলে এবং অনেক উন্নতচরিত্র ইংরেজের দৃষ্টান্তের প্রভাবে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই একদল ইংরেজীশিক্ষিত শহরবাসী হিন্দু—চরিত্রগঠন, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি কার্যে অসীম উৎসাহ সহকারে আত্ম-নিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে বহু দিক্‌পাল-সদৃশ ব্যক্তির নাম সহজেই আমাদের মনে আসে। আর মনে পড়ে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনের ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অসীম প্রভাব। এ সমস্তই জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে পুনর্গঠিত করেছে—তাতে সন্দেহ নেই। আবার স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলন জাতির চরিত্রকে এক অগ্নিশুদ্ধির ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সব দিক্ বিচার করলে সম্ভবতঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে

৩ তুলনীয়—(১) 'Litigation is the first lesson we taught the people and now we blame them for learning the lesson so well'

—Justice C. D. Field.

(২) 'বৃটিশের বিচারালয় বারাঙ্গনার মন্দির।'—বঙ্কিমচন্দ্র

পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমাদের জাতীয় চরিত্র মোটের উপর এক-টানাভাবে উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গান্ধীজী শুরু করেন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। একটা নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসাবে এর তুলনা হয় না; এবং ঘোষণা অনু-যায়ী এ যে শুধু ইংরেজ-বিতাড়নের সংগ্রাম ছিল, তা নয়—এ ছিল সত্য, ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন। কিন্তু আজ পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্টই চোখে পড়ে যে এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল বহুল পরিমাণে ধোঁয়াটে চিন্তা, এবং ভাবের ঘরে অনেক চুরি। তাই এই আন্দোলনের পরিণাম জাতির পক্ষে এবং দেশের পক্ষে খুব কল্যাণকর হয়নি। উপরন্তু দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নীতির প্লাবন। আর দেশবিভাগের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ফলে সর্বত্র দেখা দিয়েছে বিকৃত গণতন্ত্রের, এবং ক্ষমতালোভীদের তাণ্ডব। শহরবাসী ও পল্লীবাসীদের ধর্মবুদ্ধিতে ও আচরণে যে পার্থক্য চিরকাল বিদ্যমান ছিল,—নানা কারণে তাও প্রায় ঘুচে গিয়েছে। বহু চেষ্টা ও কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে জাতীয় চরিত্রের যে বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তা আজ চারদিক থেকেই আক্রান্ত এবং বিপন্ন। দলীয় রাজনীতি, ব্যবসাদার সংবাদপত্র, আত্মপ্রশংসার ও অপ-প্রচারের সাড়ম্বর আয়োজন—ইত্যাদির প্রাবল্যে দেশময় মিথ্যাচার ও কপটতার দারুণ প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সঙ্গে তুলনায় বাঙালীর আলস্যপরায়ণতা তাকে আরও বিশেষ ক'রে চালাকির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরি-শ্রম বাঁচিয়ে নিছক ফাঁকিবাজী দ্বারা কিরূপে সাফল্য লাভ করা যায়—আমাদের উচ্চনীচ ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই যেন এই এক চিন্তা। ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাস করা, ফাঁকি দিয়ে রোজগার করা—এ সমস্তই বাহাদুরির সামিল।

কিন্তু হায়! চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ তো হয়ই না, জীবনসংগ্রামে টিঁকে থাকাও যে যায় না। বিশেষ ক'রে, যন্ত্রযুগে চালাকি অত্যন্ত মারাত্মক। যে শিল্পায়ন ব্যবস্থায় প্রত্যেক কাজে বহু লোকের সমবেত চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজন, সেখানে সততার অভাবে সব কিছু পণ্ড হ'য়ে যেতে বাধ্য। একটি সামান্য স্ক্রু যদি ঠিকভাবে তৈরি না হয় বা ঠিকভাবে লাগানো না হয়, যদি কোথাও চালাকি কিংবা গোঁজামিল থাকে, তবে সমগ্র যন্ত্রপাতি বিকল হ'য়ে যায়। শুধু বেঁচে থাকার জন্যেও আজ আমাদের বিশেষ ক'রে প্রয়োজন—অসত্যের এবং চালাকির সর্বথা বর্জন।

বিবেকানন্দ স্মরণে

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

জন্মোৎসব পালন করা একটা সামাজিক রীতি। সংসারে ও সমাজে যাঁহারা লোকহিতের জন্য কাজ করেন তাঁহাদের জন্মোৎসব জনসাধারণের উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের একটা বিশেষত্ব আছে। স্বামীজীর আবির্ভাব সাধারণ ভাবে শুধু লোকহিতের জন্য নয়। স্বামীজীর আবির্ভাব মানুষের আত্মার মুক্তিসাধনের জন্য, মানুষকে তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রার স্তর হইতে উর্ধ্বতর আধ্যাত্মিক স্তরে উঠাইবার জন্য। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন সেই বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করিতে হইলে তাহার অনুরূপ পরিবেশ চাই, যে পরিবেশে মানুষের মন নম্র হয়, শান্ত হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হয়।

সংসারে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়; প্রথম সুবিধাবাদী ও দ্বিতীয় আদর্শবাদী। সংসারে প্রথম শ্রেণীর মানুষের আধিক্য বেশী, কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। তবু প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ সুবিধাবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও পৃথিবী চিরকাল মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদীর জীবনশক্তিতে পরিচালিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীরাই যুগে যুগে সমাজ ও মানুষের সংস্কৃতিকে অবক্ষয় ও অবলুপ্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আদর্শবাদীদের জীবনের বনিয়াদ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ়। যাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক স্তর যত দৃঢ়, তাঁহার জীবন তত সার্থক—তত অনুকরণীয়।

এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিব। স্বামীজীর কথা আলোচনা করিতে গেলে সুভাষচন্দ্রের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। সকলেই জানেন—স্বামীজীর আদর্শেই সুভাষচন্দ্র কৈশোর হইতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিলেও উভয়েই মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা, উভয়ের মূল প্রকৃতি এক। সুভাষচন্দ্রকে আমরা রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে নায়করূপে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বাহিরের সমস্ত কর্মপ্রয়াসের অন্তস্তলে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ফল্গুধারার মতো সর্বক্ষণ প্রবাহিত ছিল। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই জানেন—ইহা কতখানি গভীর। নেতাজীরূপে যখন তিনি বহির্বিশ্বের ঘটনার নায়ক, তখনও এই আধ্যাত্মিক প্রেরণা সমানভাবে কাজ করিয়াছে। তৎকালীন জীবনে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছি।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় যান, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশও নয়। চিকাগোয় বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে (১৮৯৩) দেশবিদেশ হইতে বিশিষ্ট ও বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তানায়কেরা সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সম্মেলন এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ত্রিশ বৎসরের যুবকের মধ্যে এমন কি দেখিয়াছিল, যাহাতে মুহুর্মুহু অভিনন্দনধ্বনি উচ্চারিত হয়। পাশ্চাত্য জগৎ স্বামীজীর মধ্যে এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দর্শন করিয়া অভিভূত হইয়াছিল। তিনি যখন

ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'তুমিই সেই'—মানুষ তাহার পার্থিব অস্তিত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু অসীম আত্মা, তখন সকলে বিস্ময়ে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে তিনি তাহার বৃহত্তর এবং সত্যকার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই আবেদন সেখানকার মানুষের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারা সেই আবেদনের মর্ম উপলব্ধি করিয়াছিল এবং এই বাণীর প্রচারককে অভূতপূর্ব মর্যাদা দিয়াছিল।

স্বামীজী মানবসমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন; সে সমাজের ভিত্তি হইবে বেদান্তের তত্ত্ব। এইজন্য সকলকে তিনি বেদান্তের বাণী উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান জানান। শঙ্করাচার্য বেদান্তকে দার্শনিক মতরূপে প্রচার করিয়াছিলেন; স্বামীজী যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 'প্রাক্‌টিক্যাল বেদান্ত', বেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগ। শঙ্করাচার্য 'নির্বাণষট্‌কে' বলিতেছেন, 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্'। 'নির্বাণদশকে' বলিয়াছেন, 'শিবঃ কেবলোঽহম্'—আমি শিবই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যত্র জীব তত্র শিব।' স্বামীজী—ইহাই জীবনে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন এবং ইহার অনুসারে সমাজে কাজ করিতে বলিয়াছেন—'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। প্রত্যেক মানুষই শিবাংশ—এই উপলব্ধি যদি আসে, তাহা হইলে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সহজ হইয়া যায়, সমাজের গঠন ও লক্ষ্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। সমস্যা এই, আদর্শের কথাটা মুখে আসিলেও উপলব্ধিটা মনে আসে না। মন মুখ এক হয় না। আদর্শ প্রচার করিলেও আচরণে তাহা ফুটিয়া উঠে না।

বাধাটা কোথায়, স্বামীজী নিজে তাহা বুঝিয়াছিলেন। বাধা ভয়। সেইজন্য তিনি প্রচার করিয়াছিলেন 'অভীঃ'-মন্ত্র—'অভীরভীহুঙ্কারনাদিত-দিঙ্‌মুখ-প্রচণ্ডতাণ্ডব-নৃত্যম্' —এইভাবে স্বামীজীর ভক্তশিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। 'অভীঃ'-মন্ত্র প্রচার করিয়া মানুষের মনকে মুক্তিসাধনার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দেশের মনকে মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। যে ভূমিকায় ভারতের মুক্তিসংগ্রামের উদ্ভব ও অগ্রগতি, সে ভূমিকা স্বামীজীর রচনা। এই অভয়মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

এই 'অভীঃ' মন্ত্রেরই প্রকাশ দেখিতে পাই গান্ধীজী ও নেতাজীর জীবন-সাধনায়। পুলিশের নাগপাশ এড়াইয়া নেতাজী যখন ইওরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা কি দুঃসাহসিক প্রয়াস! পুনরায় ইওরোপ হইতে জাপানে যে বিপৎসঙ্কুল পথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা কি অধিকতর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা নয়? নেতাজী ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। গান্ধীজীর মহাজীবনেও এই 'অভীঃ' মন্ত্রের সাধনারই চরম পরীক্ষা। বাংলার বিপ্লবীরা যে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইয়াছিল, স্বামীজীর নিকট হইতে এই মন্ত্র তাহারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া। এই 'অভীঃ' মন্ত্রের সাধনাই আমরা স্বামীজীর নিকট হইতে উত্তরাধিকার-রূপে পাইয়াছি।

স্বামীজী যে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন বেদান্তের বাণী হইতে। সে বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারিলে, নিজের জীবনকে সকলের জীবনের মধ্যে প্রসারিত করিতে পারিলে সেবা তখন স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইয়া ওঠে; তখন মানুষ নিজের জন্য যেমন চেষ্টা করে, অপরের জন্যও ঠিক তেমনি করিয়া থাকে; অপরের জন্য যাহা করা যায়, তখন তাহা নিজের জন্যই করা হইল বলিয়া বোধ আসে। সেবার এই মহৎ আদর্শ লইয়াই স্বামীজী প্রত্যেক মানুষকে বড় করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইভাবেই সকলকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সমাজের বিধানে যাহারা ছোট বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহাদের ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ মহিমায় তোমরা জাগিয়া ওঠ।' সমাজকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই নিগৃহীত জনমণ্ডলীর মধ্যে যে মানব-মহিমা আছে তাহাকে স্বীকার করিয়া লও—তাহাই কল্যাণের পথ।'

স্বামীজীর সাধনা, আদর্শ ও প্রচার—সব কিছুর মূলে হইল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্তিকতা। বিশ্বাস থাকা চাই। স্বামীজী যে সম্পূর্ণ সম্বলহীনভাবে আমেরিকা যাত্রা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রীগুরুর উপরে বিশ্বাস এবং নিজের উপরে বিশ্বাস। চিকাগোর বিশ্বসভায় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রথমেই তিনি স্মরণ করিয়াছিলেন—ভারতের চিরকালের আরাধ্যা দেবী সরস্বতীকে, 'হে নিত্যকালের জননি, আজ এই পরমক্ষণে জিহ্বাগ্রে আবির্ভূতা হও।' আমি বিশ্বাস করি যে বাগ্‌দেবী তাঁহার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন—স্বামীজীর বাগ্‌বিভূতি জগৎকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল।

শক্তি সকল মানুষের মধ্যেই আছে—কাহারও প্রকাশ হয়, কাহারও হয় না; কখনও প্রকাশ হয়, কখনও হয় না। মানুষের এই শরীরটাই তাহার সব কিছু নয়। মানুষ মহাশক্তির অংশ; যে শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহা কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে, আবার সৃষ্টি করে। দেবী ভবতারিণীর কৃপায় এই শক্তির সঞ্চার হয় পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে; তিনি উহা সঞ্চারিত করেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনে এই মহাশক্তির বিকাশ নানাভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই মহাশক্তির অনুগ্রহ চাই। তাহা ছাড়া অগ্রসর হওয়া যায় না। আর তাঁহার প্রসাদের কণামাত্রও যদি কাহারও উপরে বর্ষিত হয়, তখন সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে যখন স্মরণ করি, তখন একই সঙ্গে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আর দেবী ভবতারিণীকেও প্রণাম জানাই। শিষ্য, গুরু এবং ইষ্ট—এই তিন একত্র না হইলে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না।*

* গত ২৪শে জানুআরি শ্রীরামপুর সংস্কৃতি-পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় টাউনহলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদের সাম্য বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অবশ্য এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় দর্শনে যে একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে, এবং পাশ্চাত্য দর্শনে অন্য আর একটি মাত্র চিন্তাধারা আছে, তাহা নহে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উভয় দর্শনেই একাধিক চিন্তাধারা প্রবহমান এবং একটিতে যে-সব চিন্তাধারা আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই অপরটিতে বিদ্যমান। তথাপি এ কথা সত্য যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান চিন্তাধারার মূলগত এবং প্রায় সর্বগত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেইরূপ পাশ্চাত্য দর্শনেরও প্রধান এবং বহুমত চিন্তাধারায় অন্য প্রকার বিশেষ লক্ষণ আছে। এই বিশেষ লক্ষণগুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারাকে এক এক প্রকার বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। উহাদের উৎপত্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতি, প্রমাণপদ্ধতি ও চরম লক্ষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

দর্শনের উৎপত্তি

ইতর প্রাণী হইতে মানুষের মূলগত ভেদ এই যে ইতর প্রাণীরা তাহাদের জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। মানুষের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলিয়া একটি প্রবল পিপাসা আছে; এ পিপাসা মানুষের চিরসাথী। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। মানুষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়াস তাহার স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শনশাস্ত্র মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। ইহাতে মানুষ—জীব, জগৎ ও পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের মূল প্রেরণা—বিস্ময়ানুভূতি ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা

যদিও মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধিতেই দার্শনিক চিন্তাধারার সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে তাহার প্রেরণা ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণা প্রাচীন গ্রীকদের বিস্ময়ানুভূতি ও প্রাকৃত জ্ঞানানুসন্ধিৎসা হইতে আসিয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে গভীর বিস্ময় বোধ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন, এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনানিচয়ের কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতেই পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দর্শনে বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক নীতি, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর আলোচনাও করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য দর্শনের

মূল ও প্রবল চিন্তাধারার মধ্যে বহির্জগৎ এবং মানুষের বাহ্যপ্রকৃতি ও তাহার কল্যাণ সাধনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনের মূল প্রেরণা--দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা

পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের প্রেরণার উৎস হইতেছে প্রাচীন আর্য ঋষিদের দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে মানুষ জীবনে যে সকল সুখ ভোগ করে, তাহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে সকল মানুষকেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ অনিবার্যভাবে ভোগ করিতে হয়। অন্য সকল প্রকার দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করা কোন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ নাই। জীবনে দুঃখের এই সর্বব্যাপী ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব দেখিয়া প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কারণ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই সূত্রে জীব ও জগতের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইলেও, তাহার আধ্যাত্মিক সত্তা—সকল শোক, দুঃখ ও ও মোহের অতীত, চিরশান্তি ও আনন্দের অধিকারী। মানুষ তাহার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরা শান্তি ও আনন্দানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য ভারতীয় দর্শনে প্রধানতঃ অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করা হইয়াছে এবং দর্শনকে আত্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা হইলেও উহাতে প্রসঙ্গক্রমে জড়-প্রকৃতি ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের সমস্যাগুলির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণাস্থল।

ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নহে

দুঃখানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ এবং জীবনে দুঃখের অনিবার্য প্রভাব স্বীকার করায় কোন কোন সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে দুঃখবাদদুষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা হইতে পরিত্রাণের সম্ভাব্যতা ও অমোঘ উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ভারতীয় দার্শনিকের মতে মানুষ সুখদুঃখের অতীত, পরা শান্তি ও আনন্দানুভূতির অবস্থাও লাভ করিতে পারে; এবং এই অবস্থা লাভের উপায় নির্ধারণ করাই প্রায় সব ভারতীয় দর্শনশাখার মূল উদ্দেশ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নিত্য আনন্দানুভূতি যে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাকে দুঃখবাদ বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গত নহে।

ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জড়বাদী চার্বাক দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের মতে মানুষ দেহমাত্র নহে, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বা মনমাত্রও নহে। মানুষ দেহমন-বিশিষ্ট, কিন্তু তদতিরিক্ত চৈতন্যবিশিষ্ট বা চৈতন্যময় আত্মা; তাহার দেহমন জন্ম-মরণের অধীন হইলেও আত্মা অজর অমর

নিত্য শুদ্ধ ও বুদ্ধ। সেইরূপ এই বৈচিত্র্যময় জগৎ এক আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ও উহা হইতে উদ্ভূত; ইহা জড়প্রকৃতি হইতে যদৃচ্ছ-ভাবে উৎপন্ন নহে। ঐহিক ভোগবিলাস মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে, আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ এবং অমরত্ব-লাভই তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সমগ্র জীব-জগৎ এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মের বশবর্তী ও তাহার দ্বারা পরিচালিত। এই নৈতিক অনুশাসনের বলেই জীবনে আমাদের সুখদুঃখ ভোগ হয় এবং এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু কোন জীবই চিরকাল এই জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া থাকিবে না। সকল জীবেরই চরম গতি ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। আধ্যাত্মিক অনুশাসনের বশে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবের এই চরম উৎকর্ষ লাভ হইবে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাহার সহিত ধর্মের নিকটতম সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ধর্মের সহিত দর্শনের কোন বিরোধ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। অনেক স্থলে দর্শন ধর্মানুভূতি হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে এবং ধর্মানুভূতিকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী ও বিজ্ঞানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে তাহাতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রবল ও ব্যাপক। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনেও কোন কোন স্থলে এক প্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। কিন্তু তাহা ঠিক ভারতীয় দর্শনের মত নহে এবং সেরূপ প্রবল ও ব্যাপক নহে। বরং পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাকৃতিক (naturalistic) দৃষ্টিভঙ্গীই ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জড়-প্রকৃতিকে অথবা প্রাণ বা মনের শক্তিকে মূল তত্ত্ব ধরিয়া তাহা হইতেই জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাখ্যা এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলিরও সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে ধর্মের সহিত দর্শনের বিরোধ এবং অপরদিকে জড়বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের অবিরোধ ও ঐক্যভাব প্রায়শঃ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রগতি প্রধানতঃ বিজ্ঞানমূলক, উহা বৈজ্ঞানিক সত্যনিচয়ের আলোকে ও সাহায্যে পরিচালিত ও নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসিদ্ধ না হইলে অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থন না পাইলে দার্শনিক মতের কোন মূল্য থাকে না। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকস্থলে দর্শনকে বিজ্ঞানের সহিত একীভূত বা এক প্রকার বিজ্ঞানে পর্যবসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক মনে করেন যে দর্শন বিজ্ঞানেরই এক প্রকার উচ্চাঙ্গের তর্কশাস্ত্র।

ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি ও শাস্ত্র প্রামাণ্য

ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি বা শব্দ ও আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে তাহারই ভিত্তিতে দর্শন-শাখাগুলির প্রগতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। অবশ্য জড়বাদী চার্বাক-দর্শনে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। চার্বাকমতে বেদ বা শ্রুতির কোন প্রামাণ্য নাই এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণই গ্রাহ্য নহে। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় দর্শনশাখায় শ্রুতি বা আপ্তবাক্যকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং বেদানুগ। ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-যোগ দর্শনগুলি স্বতন্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে নাই; বরং বেদ ও উপনিষদের বাণীর সহিত যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক মতগুলির সম্বাদ-প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে আরও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনেও শব্দ বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার উপরই উহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী নিহিত আছে, তাহাই বৌদ্ধদর্শনের মূল গ্রন্থ এবং পরবর্তী কালের বৌদ্ধদর্শনশাখাগুলির মতবাদ রচনার প্রধান উপাদান ও তাহাদের বিচারের মানদণ্ড। সেইরূপ জৈনদর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি মহাবীর ও তাঁহার পরবর্তী তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় দর্শনের শাখা ও দার্শনিক সম্প্রদায়

এ স্থানে সবিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি বা আপ্তবাক্যমূলে যে সব দার্শনিক মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের এক একটিকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় (School of Philosophy) গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা—বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ ইত্যাদি। প্রত্যেক দার্শনিকসম্প্রদায়গত দার্শনিকগণ তাহাদের মূল শাস্ত্র বা গ্রন্থগুলির ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া নিজ নিজ দর্শনশাখার প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই নিজেকে নূতন দর্শনের প্রণেতা বলেন নাই। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের দর্শনের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে এরূপ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থে এক প্রকার নূতন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে শ্রীশংকরাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামানুজাচার্যকৃত শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্থাপনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পাশ্চাত্য দর্শনে শাস্ত্রের প্রামাণ্য গৌণ, এবং দার্শনিক সম্প্রদায় বিরল

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে, অথবা উহাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মমতের কিছু প্রাধান্য দেখা যায় এবং তাহার ভিত্তিতে এক প্রকার দর্শনমত গড়িয়া উঠে, উহাকে ধর্মযাজকদের দর্শন (Patristic philosophy) বলা হয়। কিন্তু ইহা অতি অল্পকালস্থায়ী হয়, এবং কখনও উহা সর্বজনস্বীকৃত হয় নাই। পরন্তু উহাকে সব সময়েই প্রবল বাধা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক স্বতন্ত্র যুক্তিবলেই নিজ নিজ দার্শনিক মত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতবাদের পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার ফলে উহার প্রগতি ঘটিয়াছে। কোন কোন স্থলে কোন দার্শনিকের মতবাদকে অবলম্বন করিয়া কোন দর্শনশাখারও উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার অনুগামী দার্শনিকদের ঐ-শাখীয় দার্শনিক বলা হয়। কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদকে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যের সম্মান দেওয়া হয় নাই। কেবল তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার অনুকূলে যুক্তিতর্ক দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হইয়াছে।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রমাণ-পদ্ধতির প্রভেদ

দার্শনিক প্রমাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভেদ আছে।

ভারতীয় দর্শনে সাধারণ লৌকিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনারূপে একাধিক প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল জড়বাদী চার্বাক-দর্শনেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য সব প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দর্শনশাখার মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকে, কোথাও প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিকে, এবং কোথাও প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিটিকে, স্বতন্ত্র ও যথার্থ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে তাহাদের সঙ্গে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামক আরও দুইটি প্রমাণ যুক্ত হইয়াছে, এবং সেখানে এই ছয়টিকেই অপরিহার্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কোন কোন দর্শন-শাখায় এতদ্ব্যতীত অন্য প্রমাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক তত্ত্ববিষয়ে বিভিন্ন দর্শনশাখায় বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন-সংখ্যক প্রমাণের উল্লেখ থাকিলেও পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বা উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনশাখার মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। তাহাদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ অপরোক্ষানুভূতি বা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (intuition)। অতীন্দ্রিয় সত্য বা পারমার্থিক সত্যের জ্ঞানলাভে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ বা মানুষের বিচারবুদ্ধি পর্যাপ্ত নহে। এজন্য আমাদিগকে যৌগিক সাধনপথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে যম, নিয়ম প্রভৃতি ব্রত পালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে; পরে পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ে অনুক্ষণ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার হইবে। এই জন্যই চার্বাক-দর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সব শাখাতেই তত্ত্বদর্শনের জন্য যোগ বা তদনুরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রেও তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য যোগোপদিষ্ট সাধন-মার্গের নির্দেশ আছে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের ইহাই একমাত্র উপায়; বিচারবুদ্ধি বা তর্কযুক্তির সাহায্যে তাহা লাভ করা সম্ভব নহে। অবশ্য তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের সৌকর্যার্থে এবং উহার প্রতিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির জন্য বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

অপর দিকে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে লৌকিক জ্ঞানের সাধনরূপে কেবল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তিপ্রয়োগ অনুমানকেই (inductive and deductive inference) প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আধুনিক কালে শব্দ বা আপ্ত-বাক্যকেও (testimony) কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক আর একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে উপমান অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি নামক প্রমাণগুলির কোন স্বীকৃতি বা উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যও পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (sense-experience and reason) উপর নির্ভরশীল দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ প্রজ্ঞাই (reason) সব বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং তন্মূলক বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা-বৃত্তি (thought and reasoning) ব্যতীত অন্য প্রকার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানলাভে অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক তাহা পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণতঃ

স্বীকার করা হয় নাই। অবশ্য কতিপয় পাশ্চাত্য দার্শনিক দর্শনে এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (intuition) আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মনন বা বিচার-বুদ্ধিরই একরূপ প্রকর্ষ বা একরূপ বৌদ্ধিক সহানুভূতি (intellectual sympathy)। উহা ঠিক ভারতীয় দর্শনসম্মত তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি নহে। উহাতে চিত্তশুদ্ধি ও যোগজ প্রত্যক্ষের কোন আভাস নাই।

দর্শনের উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে উভয় দর্শনের পার্থক্য

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে দর্শনের চরম উদ্দেশ্য ও জীবনে দর্শনের স্থান সম্বন্ধে যে পার্থক্য আছে, উপসংহারে তাহার আলোচনা করা হইতেছে। জড়বাদী চার্বাক-দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য জীবাত্মার বা মানবাত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। এ দর্শনের মতে মানুষ দেহেন্দ্রিয়মন-বিশিষ্ট আত্মা। তাহার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন নশ্বর ও অল্পকালস্থায়ী; কিন্তু তাহার আত্মা অবিনশ্বর ও নিত্য। দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয় না। পরন্তু জীবাত্মা কর্মানুসারে এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে এবং তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। আত্মার কোন দেহের সহিত সংযোগের নাম জন্ম, এবং দেহ-বিয়োগের নাম মৃত্যু। জীবাত্মা অজ্ঞানবশে এবং কর্মানুসারে জীবনে নানাপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করে এবং শেষে মৃত্যুরূপ মহাকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে। সুখ-দুঃখবিজড়িত জন্মমরণের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইতেছে অজ্ঞাননিরোধক তত্ত্বজ্ঞান। এরূপ তত্ত্বজ্ঞান সহায়ে দুঃখনিবৃত্তি বা পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করাই জীবাত্মার মুক্তি। ভারতীয় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মুক্তি বা মোক্ষ মানুষের পরম পুরুষার্থ হইলেও ভারতীয় দর্শনে কাম অর্থ এবং ধর্মকেও পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে এবং জীবনে সেগুলি লাভ করিবার উপদেশও দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এসব পুরুষার্থ মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে এবং উহাদের সন্ধান ও ভোগ এরূপভাবে করিতে হইবে যে উহারা মোক্ষমার্গের পরিপন্থী না হইয়া তাহারই সহায়ক হয়। অতএব ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য মানুষের মুক্তি হইলেও উহাতে মানব-জীবনের অন্যান্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি অস্বীকৃত বা অবহেলিত হয় নাই।

মানবের মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া ভারতবর্ষে দর্শনের সহিত জীবনের নিবিড় সম্বন্ধ দেখা যায়। জীবমাত্রেই দুঃখ পরিহার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং অবিমিশ্র ও অপরিচ্ছিন্ন সুখ, মানুষের অধিগম্য অন্য কোন উপায়ে লাভ করা সম্ভব নহে। এজন্য দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র সম্ভাব্য উপায় ও অপরিহার্য সাধন। অতএব মানুষের পক্ষে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভের চেষ্টা যেমন অপরিহার্য, তেমনি দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাও অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান মানবের মুক্তির সাধন, তাহা মাত্র বৌদ্ধিক বোধ (intellectual understanding) বা যুক্তি-তর্কলভ্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র নহে। উহা তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সাক্ষাৎকার। মানুষ তাহার বদ্ধাবস্থায় যেরূপ জড়জগৎ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করে, জীবনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ

করিতে হইবে। আবার ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন যেমন পরিচালিত হয়, সেইরূপ দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। দর্শনে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়াই তাহাকে ভারতীয় সাহিত্যে 'দর্শন' বলা হয়। এই দার্শনিক জ্ঞান শুধু বিচারের বস্তু নহে, উহা জীবনে অনুভূতির বিষয়, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এবং জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

পাশ্চাত্য দর্শনের চরম লক্ষ্য কিন্তু জীবাত্মার বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ নহে। ইহাতে জীবাত্মা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে জীবাত্মার দেহাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। এরূপ স্থলে তাহার জন্মমরণ-নিবৃত্তিরূপ বা অন্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের কোন কোন শাখায় জীবাত্মার আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্থলেও তাহার দেহমনের অতিরিক্ত সত্তা এবং দেহবিনাশের পর ঊর্ধ্বদৈহিক অস্তিত্ব ও দেহান্তর প্রাপ্তির কথা মহামতি প্লেটোর দর্শন ব্যতীত অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য এই সব দর্শনশাখায় এই দেহে এবং এই জীবনে জীবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে! পাশ্চাত্য দর্শনের চরম উদ্দেশ্য দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানে সীমাবদ্ধ এবং উহা জীবাত্মার ঐহিক কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত বলিয়া মনে হয়। তারপর জীবজগৎ সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য, উহা বিচারবুদ্ধি বা তর্কলভ্য একরূপ পরোক্ষ জ্ঞান, উহাতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের বা তাহার অপরোক্ষানুভূতির কথা বিশেষভাবে দেখা যায় না। ফলে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জীবনে সম্যক্ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের জীবন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সম্যক্‌রূপে প্রভাবিত ও পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে তাঁহাদের দর্শন জীবজগতের আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং অনেক প্রকার দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা যেন বিচারবুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বের বা সত্যের প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়া জীবনে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান নহেন।

অতএব আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মার মুক্তি, আর পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে জীবজগৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান এবং তাহার দ্বারা মানবের ঐহিক জীবনের উন্নতি। ভারতীয় দর্শন মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক, আর পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ জীবজগতের বিচারসঙ্গত জ্ঞানপ্রদায়ক। অন্যভাবে আমরা একথাও বলিতে পারি যে পাশ্চাত্য দর্শন প্রবৃত্তিমার্গের সহায়ক, আর ভারতীয় দর্শন নিবৃত্তিমার্গের নির্দেশক; পাশ্চাত্য দর্শন প্রেয়োভিমুখী, ভারতীয় দর্শন শ্রেয়োভিমুখী।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[দশম অধ্যায়—পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪

এখন আপনার বাক্যরূপ সূর্যকিরণের বিকাশে ঋষিগণ যে মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে। ইহাদের বাক্যরূপ জীবনের বীজ আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উপর আপনার কৃপা বর্ষণ হওয়ায় সংবাদরূপ ফল লাভ হইল।

অহো, নারদাদি সাধুগণের বচন নদীস্বরূপ, আমি তাহা দ্বারা সংবাদসুখের অপার মহোদধি হইয়াছি। হে প্রভু, আমি জন্ম-জন্মান্তরে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম করিয়াছি, আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু থাকায় তাহা উপযোগী হইল না (নিষ্প্রয়োজন হইল)। ১৫০

নতুবা আমি বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিগণের মুখে আপনার এবম্বিধ বর্ণনা শুনিয়াছি, পরন্তু আপনি কৃপা না করা পর্যন্ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং ভাগ্য যখন অনুকূল হয়, তখনই যেমন উদ্যম সফল হয়, তেমনি গুরু-কৃপা পাইলেই শাস্ত্রাদি সফল হয়। মালী সারা জন্ম বৃক্ষের জন্য পরিশ্রম করে, পরন্তু বসন্ত আসিলেই ফুলফল লাভ হয়।

অহো, বিষয়াসক্তির নিবৃত্তি হইলে মাধুর্যের আস্বাদন পাওয়া যায়; রোগের প্রশমন হইলেই ঔষধের মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক্ ও প্রাণ তখনই সার্থক হয়, যখন চৈতন্য আসিয়া তাহাদের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে। তেমনি শাস্ত্রের আলোচনা অথবা যোগাদির অভ্যাস তখনই উপযোগী হয়, যখন শ্রীগুরুর আজ্ঞা পাওয়া যায়। এইভাবে আত্মানুভবে মত্ত হইয়া অর্জুন নিঃশঙ্ক-চিত্তে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—হে দেব, আপনার বাক্য আমি মানিয়া লইলাম। সত্যই আমার প্রতীতি হইয়াছে যে আপনি দেব ও মানবের বুদ্ধির অগম্য। আপনার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ না করিয়া যে নিজ বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে জানিতে চেষ্টা করে, সে কখনই আপনাকে জানিতে পারে না—এই বিশ্বাস আমার নিশ্চিতভাবে হইয়াছে।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

আকাশ যেমন আপনার বিস্তার আপনিই জানে, পৃথ্বীর ঘনত্ব কতখানি তাহা যেমন পৃথিবী জানে; তেমনি হে লক্ষ্মীপতি, আপনার সর্বশক্তি কেবল আপনিই জানেন, এ সম্বন্ধে বেদাদির বুদ্ধি বৃথাই প্রজ্ঞার বড়াই করে।

মনের গতিকে কি করিয়া পশ্চাতে ফেলিবে? পতনকে কে ধরিয়া রাখিবে? অনাদি মায়াসমুদ্র পার হইয়া যাইবে—এমন সামর্থ্য কাহার? আপনাকে জানাও ঐরূপ কঠিন, এইজন্য কেহই আপনাকে জানিতে পারে না,—আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান আপনারই যোগ্য (অর্থাৎ শুধু আপনার দ্বারাই সাধ্য)। আপনাকে আপনিই জানেন, এবং অপরকে এ সম্বন্ধে উপদেশ করিতে আপনিই

সমর্থ, যদি আপনার মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমি আপনার পাশে দাঁড়াইবার যোগ্য নহি, পরন্তু ইহা মনে করিয়া যদি আপনাকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিনতি করিতে ভয় পাই, তবে আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। সমুদ্র ও নদী জলে পূর্ণ হইলেও চাতকের পক্ষে উহা নিরর্থক, কারণ মেঘ হইতে জলবিন্দু পড়িলেই চাতক জল পান করিতে পারে। তেমনি শ্রীগুরু আছেন, পরন্তু আপনিই আমার গতি, এখন ইহা থাকুক। আপনি আমাকে আপনার বিভূতির কথা বলুন।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

হে প্রভু, আপনার দিব্য বিভূতি—যাহা নানা আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। হে অনন্ত, যে বিভূতি দ্বারা আপনি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মনামাঙ্কিত বিভূতিগুলি প্রকট করুন। ১৭০

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥ ১৭

হে প্রভু, আমি আপনাকে কেমন করিয়া জানিব? কিভাবে আপনাকে ধ্যান করিব? যদি আপনার সমস্ত রূপই চিন্তা করিতে হয়, তবে তো ধ্যান করা হয় না। তবে আপনি পূর্বে যেমন আপনার ভাবের কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন, এখন একবার বিস্তার করিয়া বলুন। যে যে ভাবে আপনাকে চিন্তা করিলে আমার কষ্ট হইবে না, আপনার সেই যোগ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করুন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

আর প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আপনার যে বিভূতি, তাহা বর্ণনা করুন; যদি বলেন—'আমি বারবার কি বলিব?' হে জনার্দন, এভাব মনে আসিতে দিবেন না; অমৃত সেবন করিতে করিতে কেহ বলে না 'যথেষ্ট হইয়াছে'। যাহা কালকূটের সহোদর, যাহা দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে অমর হইবার জন্য পান করিয়াছিলেন, যাহা পান করা সত্ত্বেও ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে ও নাশপ্রাপ্ত হয়; আপনার বচনামৃত লাভের জন্য মন্দরাচলকে মন্থন-দণ্ড করিয়া ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিতে হয় নাই। ইহা অনাদি, স্বভাবতই স্বয়ংসিদ্ধ; ইহা দ্রব হয় না, ইহা ঘনীভূতও নহে, ইহাতে রসভেদ নাই, যে কেহ ইহাকে স্মরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহার মিষ্টত্বের অনুভব হইলেই সমস্ত সংসার মিথ্যা হইয়া যায়, এবং নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০

জন্মমৃত্যুর বার্তা নিঃশেষে নষ্ট হয়, অন্তরে ও বাহিরে মহাসুখ বাড়িতে থাকে, দৈবযোগে যদি কেহ ইহা সেবন করে, তবে তদ্রূপ হইয়া যায়; সেই পরমামৃত আপনি আমাকে দিতেছেন, আমার চিত্ত কখনও 'যথেষ্ট হইল' বলিতে পারে না।

আপনার নামই তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আপনার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। সর্বশেষে আপনি আনন্দের সহিত সুখ-সংবাদ বলিতেছেন। এই সুখ কিসের সমান, তাহা বলা যায় না—পরন্তু ইহাই জানি যে এ সুখের তুলনা নাই। সূর্য কি কখনও পুরানো হয়? (চন্দ্রের কলার ক্ষয় হইলেও) চন্দ্র কি একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়? গঙ্গার জল কি পর্যুসিত হয়? আপনি

যাহা বলিলেন তাহাতে শব্দব্রহ্মের রূপ দেখিলাম; আজ চন্দন-বৃক্ষের সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলাম। পার্থের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ দুলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন—'পার্থ, তুমি ভক্তি ও জ্ঞানের আধার হইয়াছ।'

এইভাবে প্রেমাস্পদের সন্তোষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে প্রেমের বেগ উছলিয়া উঠিল,—তাহা সযত্নে সংবরণ করিয়া বলিলেনঃ শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি (আমার) যে বিভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা এত অসংখ্য (অপার) যে, আমার হইলেও আমার বুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য আমি কিরূপ, কত বড়, তাহা আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, এইজন্য আমার প্রধান বিভূতিগুলি, যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই শ্রবণ কর। হে কিরীটী, যাহা জানিলে সমস্ত বিভূতির জ্ঞান হইবে—যেমন বীজ হাতে আসিলেই বৃক্ষও করতলগত হইল, বলা যায়; কিংবা উদ্যান হস্তগত হইলে ফুল আপনা-আপনিই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি বিভূতিগুলি দেখিলে সকল বিশ্বই দেখা হইয়া যায়। হে ধনুর্ধর, যথার্থই আমার বিস্তারের অন্ত নাই,—দেখ গগন এমন অপার, অথচ ইহাও আমারই মধ্যে অবস্থিত।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

হে গুড়াকেশ, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী অর্জুন, শুনঃ আমি প্রাণিমাত্রের মধ্যে আত্মা হইয়া আছি। ভিতরেও আমি ইহাদের অন্তঃকরণে আছি, বাহিরেও আমি ইহাদের আচ্ছাদন করিয়া আছি, আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত। যেমন মেঘের তলে ও উপরে, অন্তরে ও বাহিরে, এক আকাশই আছে; আর মেঘ আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই থাকে; পরে যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও আকাশই হইয়া থাকে, তেমনি আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত—সৃষ্টি, স্থিতি ও শেষগতি। এইভাবে, আমার বিভূতিযোগের দ্বারা আমার বিস্তার ও ব্যাপকতা বুঝিয়া লও, হৃদয়কে শ্রবণ (কর্ণ) করিয়া সমস্তই শ্রবণ কর।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

ইহা বলিয়া কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, (দ্বাদশ) আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, প্রভাবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে আমি কিরণসংযুক্ত রবি। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি, আকাশের অঙ্গনে তারাগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২২

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমিই মদনারি শঙ্কর, ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না। যক্ষরক্ষগণের মধ্যে শম্ভুর সখা ধনবান্ কুবেরও আমি। অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক (অগ্নি), সমস্ত শিখরবান্ পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুমেরু আমিই।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২৩

বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাগণের মধ্যে আমি প্রসিদ্ধ মহেন্দ্র। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একাদশ যে মন, তাহাও আমি জানিবে, ভূতগণের মধ্যে স্বাভাবিক চেতনাও আমি।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সহায় সর্বজ্ঞ পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিও আমি। সেনানায়কের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয়—হরবীর্যে যাহার জন্ম, কৃত্তিকাগণ যাহার মাতা।২১০

বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে বৃহত্তম জলরাশি সমুদ্র আমি, মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। সমস্ত বাক্যের মধ্যে সত্যের ক্রীড়াস্থল যে একাক্ষর ওঁ, তাহাও আমি। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, যাহা ইহলোকে কর্মাদির মধ্যে কর্মত্যাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। স্থাবর গিরির মধ্যে পুণ্যরাশি যে হিমালয়, তাহাও আমি।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭

কল্পবৃক্ষ, পারিজাত চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ। হে পাণ্ডব, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ। হে প্রবুদ্ধ জ্ঞানী অর্জুন, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি আমি কপিলাচার্য, প্রসিদ্ধ তুরঙ্গমের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা। হে অর্জুন রাজ্যের ভূষণস্বরূপ গজগণের মধ্যে আমি ঐরাবত,—ক্ষীরসাগর মন্থনকালে যাহা উঠিয়াছিল। সর্বলোক প্রজা হইয়া যাহাকে সেবা করে, নরগণের মধ্যে যে রাজা, সেও আমারই বিশেষ বিভূতি।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯

হে ধনুর্ধর, নানাবিধ শস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, যাহা শতযজ্ঞকারী ইন্দ্রের হস্তে শোভা পায়।২২০

ধেনুর মধ্যে আমি কামধেনু, আমিই জন্মকারণ মদন জানিবে। হে কুন্তীসুত, সর্পকুলের নায়ক বাসুকি আমিই, নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত। জলদেবতাগণের মধ্যে পশ্চিমদিক্‌পতি বরুণও আমি। আর হে পাণ্ডুকুমার, সমস্ত পিতৃগণের মধ্যে যে অর্যমা সেও তত্ত্বতঃ আমিই। যাঁহারা জগতের শুভাশুভের নিয়ন্তা (প্রাণিগণের) মনের অনুসন্ধানকারী, যাঁহারা কর্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন, সেই নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে আমি যম, যিনি কর্মসাক্ষী ধর্ম।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০

দৈত্যকুলের মধ্যে ভক্ত প্রহ্লাদও আমি, সেইজন্যই সে দ্বেষভাবাদি দোষে লিপ্ত হয় নাই। গ্রাসকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল, শ্বাপদের মধ্যে সিংহ আমারই রূপ। পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় আমারই বিভূতি, তাই সে আমাকে নির্ভয়ে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১

হে ধনুর্ধর, পৃথিবীর বিস্তারের মধ্য হইতে এক লাফে উড়িয়া যে দ্বিতীয় স্বর্গ সৃজন করিতে পারে, সেই গতিশীল পদার্থের মধ্যে যে পবন সেও আমি,—হে পাণ্ডুসুত, সমস্ত শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমিই শ্রীরাম, যিনি ত্রেতাযুগে সঙ্কটে পতিত ধর্মের পক্ষ লইয়া কেবল আপনার শরাসনের সাহায্যে বিজয়লক্ষ্মীকে স্বাভিমুখিনী করিয়াছিলেন; অনন্তর সুবেল পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রতাপে আকাশে জয়ঘোষণাকারী ভূতগণকে লঙ্কেশ্বরের মস্তকপঙ্‌ক্তি বলি দিয়া উপহার দিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্মের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি সূর্যবংশে সূর্যরূপে উদিত হইয়াছিলেন, সেই শস্ত্রধারিগণের মধ্যে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র আমিই। আর জলচরগণের মধ্যে আমিই মূর্তিমান্ মকর। সমস্ত প্রবাহের মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা, যাহাকে জহ্নু মুনি পান করিয়াছিলেন, পরে আপন জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। হে পাণ্ডুসুত, সমস্ত জলপ্রবাহের মধ্যে ত্রিলোকে প্রবহমানা যে জাহ্নবী তাহাও আমিই জানিবে।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রত্যেক বিভূতির বর্ণনা করিতে গেলে, সহস্র জন্মেও অর্ধেক বিভূতির বর্ণনা হইবে না। সমস্ত নক্ষত্রগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে, অন্তঃকরণে এই প্রকার ইচ্ছার উদয় হইলে যেমন গোটা আকাশকেই গ্রহণ করিতে হয়, পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে হইলে যেমন ভূমণ্ডলকেই গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি হে পাণ্ডব, আমার বিস্তার জানিতে হইলে আমাকেই জানিতে হয়। ২৪০

শাখা, ফুল, ফল—এ সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন সমগ্র বৃক্ষকে ধরিতে হয়, তেমনি আমার বিশেষ বিভূতিগুলি সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে আমার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, নতুবা পৃথক পৃথক বিভূতির কথা আর কত শুনিবে? সুতরাং হে মহামতি, একেবারেই জানিয়া লও যে সবই আমি। হে কিরীটী, আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত, তন্তু যেমন বস্ত্রে ওতপ্রোতভাবে আছে, আমাকে এইরূপ ব্যাপকভাবে জানিলে বিভূতিভেদ কেন করিবে? এক একটি বিভূতি পৃথকভাবে জানিবার কি প্রয়োজন? পরন্তু ব্যাপকভাবে জানিবার যোগ্যতা তোমার নাই, সুতরাং এ কথা থাকুক। তুমি আমার বিভূতির কথা জানিতে চাও, সুতরাং তাহাই শুন:

বিদ্যার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্যা, তাহা আমিই। আমিই তার্কিকগণের তত্ত্বনির্ণায়ক বাদ, যাহার জন্য শ্রবণকারীর তর্কের বল বৃদ্ধি পায় এবং বক্তারও বাক্যের মাধুর্য হয়। এইভাবে প্রতিপাদনের মধ্যে যে 'বাদ' তাহা আমিই, অক্ষরের মধ্যে বিশুদ্ধ অ-কারও আমি। সমাসের মধ্যে আমি 'দ্বন্দ্ব' জানিবে, যে কাল—মশক হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলকে গ্রাস করে, সে কালও আমি। ২৫০

হে কিরীটী, যাহা প্রলয়তেজকে আলিঙ্গন করে, সারা পবনকে গিলিয়া খায়, আকাশ যাহার উপরের মধ্যে স্থান পায়, এমনি যে অনন্ত 'কাল'—তাহা আমিই—লক্ষ্মীর সহিত লীলাবিলাসকারী ভগবান কহিলেন, সৃষ্টিসমূহের সৃষ্টিকর্তাও আমি।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

আর, সৃষ্ট ভূতগণকে আমিই ধারণ (পালন) করি, আমিই সকলের জীবন, আর অন্তে যখন ভূতগণকে সংহার করি, তখনও মৃত্যুরূপে আমিই। স্ত্রীগণের মধ্যে আমার আরও সাতটি বিভূতি আছে, তাহা বর্ণনা করিতেছি, শুন। হে অর্জুন, নিত্য নূতন যে কীর্তি তাহা আমারই মূর্তি, ঔদার্যযুক্ত যে সম্পত্তি তাহাও আমি—জানিবে। স্ত্রীলোকের মধ্যে সে দৈনন্দিন (অখণ্ড) স্থৈর্য ও মেধা, তাহাও আমি, ধৃতি এবং ক্ষমাও আমি। নারীগণের মধ্যে এই সাতটি শক্তি আমারই বিভূতি জানিবে।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

রমাপতি বলিলেন, হে প্রিয়োত্তম, বেদত্রয়ের সামবেদের মধ্যে যে 'বৃহৎসাম ; তাহা আমিই। সকল ছন্দের মধ্যে যাহাকে গায়ত্রীছন্দ বলে, তাহা আমারই স্বরূপ—ইহা তুমি নিঃসন্দেহে জানিবে। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে আমি কুসুমাকর বসন্ত। ২৬০

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭

হে বিচক্ষণ অর্জুন, কৌশলপূর্ণ খেলার মধ্যে যে দ্যূতক্রীড়া, তাহাও আমি, এজন্য প্রকাশ্য চৌরাস্তার উপর খেলিলেও ইহা নিবারণ করা যায় না। সমস্ত তেজস্বী পদার্থের মধ্যে যে তেজ, তাহা আমিই—নিশ্চয় জানিও, সকল কার্যের যে উদ্দেশ্য তাহাও আমি। ব্যবসায়ের মধ্যে নীতি-পূর্ণ উদ্যমই আমার বিভূতি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের মধ্যে আমি সত্ত্ব,—যাদবকুলের মধ্যে যে শ্রীমন্ত (ঐশ্বর্যশালী) সেও আমি, জানিবে। দেবকী-বসুদেব হইতে উৎপন্ন আমি যশোদার কন্যার বদলে গোকুলে গিয়াছিলাম ও (স্তনপান করিয়া) পূতনার প্রাণ সম্পূর্ণভাবে হরণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্বেই সৃষ্টিকে দানবশূন্য করিয়াছিলাম—হস্তে গিরিবর গোবর্ধনকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছিলাম।

কালিন্দীর হৃদয়শল্য (কালীয়নাগকে দমন করিয়া) দূর করিয়াছিলাম। জলন্ত গোকুলকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং গোবৎসের বিষয়ে বিরিঞ্চিকেও পাগল করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থার প্রথমেই

কংসের ন্যায় ঘোরবিক্রমী দৈত্যকে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অনায়াসে বধ করিয়াছিলাম। এক একটি করিয়া কত আর বলিব? তুমিও এ সমস্ত দেখিয়াছ অথবা শুনিয়াছ,—যাদবগণের মধ্যে ইহাই আমার স্বরূপ জানিবে। আর চন্দ্রবংশের পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমিই আমার বিভূতি জানিবে—এইজন্যই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত প্রেমভাব।২৭০

মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাসদেব, কবির মধ্যে ধৈর্যের আধার উশনা কবিও আমি।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

নিয়ন্ত্রণকারীর মধ্যে আমিই দণ্ড জানিবে—যাহা পিপীলিকা হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহা সারাসার নির্ণয় করে, ধর্মজ্ঞের পক্ষ অবলম্বন করে—সকল শাস্ত্রের মধ্যে সেই যে নীতিশাস্ত্র, তাহা আমিই। হে সখা অর্জুন, সমস্ত গূঢ় বিষয়ের মধ্যে আমি 'মৌন'—এইজন্য রহস্য বক্তার সম্মুখে স্বয়ং ব্রহ্মাও অজ্ঞানী হইয়া যান। জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান; এখন এই বিভূতি বর্ণনা আর কত করা যায়? ইহার কোন পার দেখা যায় না।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

হে ধনুর্ধর, দেখ, বর্ষার বারিবিন্দু গণনা করা কিংবা তৃণাঙ্কুরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। মহাসমুদ্রের তরঙ্গের সংখ্যা গণনা করা যায় না, আমার বিভূতির কোন হিসাব নাই। কয়েকটি প্রধান বিভূতির কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাও মনে হইতেছে, ভাসা ভাসা বর্ণনা করা হইয়াছে।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

বিভূতিবিস্তারের কোন হিসাব করা যায় না; তুমিই বা কত শুনিবে, আর আমিই বা কত বলিব? এই কারণেই এখন আমি তোমাকে একেবারে আমার রহস্য বুঝাইয়া বলিতেছি,—সমস্ত ভূতাঙ্কুরের যে বীজ বিস্তার লাভ করে, তাহাই আমি। ২৮০

অতএব ছোটবড় ভেদ করিবে না, উচ্চনীচ ভাব পরিত্যাগ করিবে, সমস্ত বস্তুজাত আমারই বিভূতি জানিবে। এখন হে অর্জুন, ইহা অপেক্ষা আর একটি সাধারণ চিহ্নের কথা বলিতেছি শুন—উহা দ্বারা তুমি আমার বিভূতি জানিতে পারিবে।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

হে ধনঞ্জয়, যে যে স্থানে ঐশ্বর্য ও দয়া, এ দুটি গুণই আসিয়া একত্র বাস করে, সেই সেই স্থানেই আমার অংশ জানিবে। গগনে সূর্যবিম্ব একটিই, পরন্তু তাহার প্রভা যেমন ত্রিভুবনে প্রসারিত হয়, তেমনই সকল লোক এক আমারই আজ্ঞা পালন করে। কামধেনুর নিকট যে যখন যে বস্তু প্রার্থনা করে, সে ঐ সব বস্তু একসঙ্গেই উৎপন্ন করিতে থাকে, সমস্ত বৈভব তাহার অঙ্গে ভরিয়া আছে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

আর ইনি সামান্য, উনি অসাধারণ—এই প্রকারভেদ করাও দোষের, কারণ এক আমিই সমগ্র বিশ্বরূপে আছি। ইহার মধ্যে সাধারণ আর উত্তম, এইরূপ বিভাগ কিরূপে কল্পনা করা যায়? দৃষ্টিতে ভেদের কলঙ্ক কেন স্পর্শ করিতে দিবে? ঘৃতকে কেন মন্থন করিবে? অমৃতকে কি ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে? বৃষ্টির কি দক্ষিণ বাম অঙ্গ আছে?

সূর্যবিম্বের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দেখিতে গেলে চক্ষুর দৃষ্টিই নষ্ট হয়, আমার স্বরূপে 'সামান্য' 'বিশেষ'ও তেমনি। আর বিভিন্ন বিভূতির মধ্যে, আমার অপার বিকাশের আর কত মাপ করিবে? সুতরাং উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দেখ, আমার এক অংশ এই জগৎ ব্যাপিয়া আছে, এইজন্য ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র সমবুদ্ধিতে ভজনা কর।

জ্ঞানী পুরুষের সাধনা-উপবনের বসন্ত, বৈরাগ্যশীল পুরুষের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে অর্জুন বলিলেন, হে স্বামিন্, আপনি তো এইরূপ এক রহস্যের কথা বলিলেন—যে ভেদ এক বস্তু, আর আমি তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া ভেদভাব পরিত্যাগ করিব। অহো, সূর্য কি জগৎকে বলে—এই অন্ধকারকে দূরে তাড়াইয়া দাও। তেমনি আপনি অনুচিত কথা বলিতেছেন, ইহা বলাও আমার পক্ষে অধিক বলা হইবে। আপনার নাম যদি কোন এক সময়ে কেহ মুখে উচ্চারণ করে, কিংবা কর্ণে শ্রবণ করে, তবে ভেদভাব তাহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার পরও কি আলোকের উষ্ণতা থাকিবে?

তখন ভগবান সহজে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার কথায় ক্রোধ করিও না। ভেদের রীতিতে আমি যে তোমাকে আমার বিভূতির কাহিনী বর্ণনা করিলাম, তাহা অভেদ বুদ্ধিতে নিজের অন্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছ কি না? ইহা দেখিবার জন্যই আমি বাহ্যভঙ্গীতে (বহিরঙ্গভাবে) কিছু বলিতেছিলাম—এখন দেখিতেছি বিভূতি সম্বন্ধে তোমার উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। তখন অর্জুন বলিলেন—হে দেব, আপনার কথা আপনিই জানেন, আমি দেখিতেছি সমস্তই আপনি আরম্ভ করিয়াছেন।

'হে রাজন্, পাণ্ডুসুত অর্জুন এইরূপ অনুভবের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'—সঞ্জয়ের এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র অবিচলিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সঞ্জয় অন্তঃকরণে দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, ইনি যে (নিজের) সৌভাগ্য ফেলিয়া দিতেছেন, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই,—আমি ভাবিয়াছিলাম ইহার অন্তঃকরণ সুস্থ হইয়াছে, দেখিতেছি অন্তরেও ইনি অন্ধ।

পরন্তু এ কথা থাক, অর্জুন এইভাবে অদ্বৈতভাবের মান বাড়াইতেছিলেন,—কারণ ইহার পর অন্য এক বিষয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল, বলিলেন: অন্তরের অন্তরে (আত্মানুভবের) যে প্রতীতি জন্মিয়াছে তাহাই বাহিরে চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হউক—চিত্তের এই মার্গে আমার বুদ্ধি চালিত হইতেছে। আমার এই দুটি চক্ষু দ্বারাই সমগ্র বিশ্বরূপ আলিঙ্গন করিব। এত বড় ইচ্ছা তিনি ভাগ্যবান্ বলিয়াই করিতে পারিয়াছিলেন।

আজ তিনি কল্পতরুর শাখাই হইয়াছেন, সুতরাং তাহাতে বন্ধ্যাত্ব-দোষ দেখা যায় না, তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই সত্য করিয়া দিতেছেন। যিনি প্রহ্লাদের কথায় স্বয়ং সকল বস্তু হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই আজ অর্জুন সদ্‌গুরুরূপে পাইয়াছেন।

নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন—বিশ্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য পার্থ কিভাবে উদ্যোগ করিলেন, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে। ৩১০

'নূতন তীর্থে'—নূতন পথে

[কামারপুকুর জয়রামবাটী দর্শন]

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার বসু

বহুদিনের সাধ—কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন ক'রব। ভক্তমুখে শুনি, চুপ ক'রে থাকি। হুস্ ক'রে জ্বলে ওঠে আকাঙ্ক্ষার শিখা, আবার তখনই নিভে যায়—কখনও শারীরিক অপটুতা, কখনও প্রকৃষ্ট সুযোগের অভাব। কত ভক্ত যায় ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ায়, কেহ বা যায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে, আবার কেউ যায় অক্ষয় তৃতীয়ায়; বছরের সব সময়েই ভক্তেরা যায়, যখন যার সুযোগ মেলে; ফিরে এসে বলে কত কথা, চুপ ক'রে শুনি।

জনৈক ভক্ত-বন্ধুর সাথে অনেক তীর্থে গিয়েছি; তিনি একদিন এসে বললেন, 'চলুন, আসছে ২৩শে জানুআরির ছুটিতে কামারপুকুর জয়রামবাটী যাওয়া যাক্। বেলুড় মঠ থেকে অনুমতি নেওয়া হ'ল। পূর্বদিন সন্ধ্যায় সব গোছগাছ করছি, এমন সময় খবর এল—যাওয়া হবে না। কেন?—মঠ থেকে ফোন ক'রে জানিয়েছেন: এখন ওখানে খুব ভিড়।

কি আর করা যাবে? যাওয়া হ'ল না। মনতো খারাপ হবেই। ভাবলাম, ঠাকুর নিশ্চয়ই সময় ও সুযোগ ক'রে দেবেন।

দিন কেটে যায়, বন্ধুর আর সুবিধা হ'য়ে ওঠে না। একদিন আর এক বন্ধু আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে কথায় কথায় বললেন যে তাঁর মা কলকাতা থেকে চলে যাবার পূর্বে একদিন তাঁকে নিয়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যাবেন। আমাদের যাওয়া হয়নি শুনে তিনি বললেন, 'চলুন না আমাদের সাথে। রবিবার—সকালে বের হ'য়ে সন্ধ্যার পর ফিরে আসব।'

রবিবার এল। সকাল ছটায় আমরা সকলে যাদবপুর (ওখানেই আমাদের সবার বাড়ী) হ'তে রওনা হই। পথের সম্বন্ধে আরও অনেক খোঁজখবর নিলাম, শুনলাম—৩ ঘণ্টা ৩।॰ ঘণ্টা লাগবে; গবর্ণমেণ্ট হাউস থেকে ৬৫ মাইল। পথতো অজানা, জেনে জেনে যেতে হবে। তবে এটা ঠিক বুঝেছিলাম যে তারকেশ্বরের পথে যেতে হবে। মানচিত্র থেকে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিলাম: তারকেশ্বর ডাইনে রেখে সোজা পথে চাঁপাডাঙ্গা হ'য়ে আরামবাগ, সেখান থেকে কামারপুকুর—পরে জয়রামবাটী। আমাদের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর দিয়ে গঙ্গা পার হ'য়ে চলল। গাড়ীর পিছনে নতুন রিং পরানো হয়েছে। ড্রাইভারের পাশে বসে বন্ধু গাড়ীর গতিবেগ কিছুতেই ২৫ মাইলের উর্ধ্বে উঠতে দিচ্ছিলেন না। তারকেশ্বর যখন ছাড়িয়ে যাই, তখনই দেখি ৯টা বেজে গেছে। একবার ট্যাক্সিতে তারকেশ্বর এসেছিলাম—সময় লেগেছিল দু ঘণ্টা। তাই ভাবলাম—কামারপুকুর কখন পৌছব তার ঠিক কি? কিছু বাদে চাঁপাডাঙ্গার পরেই দামোদর, বন্যার তাণ্ডবলীলায় দামোদরের খেলা দেখেছি; এই নির্জীব শান্ত শীর্ণ জলধারা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। একটা কাঠের পুল এপার ওপার যোগ ক'রে রেখে দিয়েছে। পার হবার সময় দেখলাম ডাইনে কংক্রিটের একটা ভাল পুল নির্মাণের চেষ্টা চলেছে। সেখান থেকে হরিণখোলা ৪ মাইল। এখানে আবার মুণ্ডেশ্বরী নদী। লৌহতরীতে (Steel Boat)

মোটর পার করতে হ'ল। নদী প্রায় দু ফার্লং চওড়া। কিন্তু জলস্রোত বর্তমানে মাত্র শ-খানেক ফুট জুড়ে ওপার ঘেঁসে চলেছে। বাদবাকীটা বালুর চর। এই চড়ার উপর দিয়ে সমান্তরাল ভাবে দুই সারি লোহার পাত পেতে মোটর যাবার রাস্তা করা হয়েছে সোজা জলের ধার পর্যন্ত। সেখানে লৌহতরী ভিড়বার ঘাট। জলের ধারে গিয়েও নিস্তার নেই। ঘাটে নৌকা নেই। খরস্রোতা ক্ষীণকায়া নদী কখন বা প্রচুর জল বহন ক'রে স্ফীতা, তখন পারাপারের লৌহতরী সহজেই তার নির্দিষ্ট ঘাট খুঁজে পায়। আবার অন্য সময়ে দেখা যায় নদীবক্ষে চড়া জেগে উঠেছে। তরী খুঁজে পায় না তার ভিড়-বার ঘাট। ভিড়তে হয় যত্র তত্র, তখন জল ঘেঁসে নদীর কোল বেয়ে যেতে হয় লৌহতরীর কাছে। হয়তো বা এক চাকা জলে, এক চাকা ডাঙায়। সিক্ত বালুকায় চাকা না চালালে গাড়ী যাবে অচল হ'য়ে—শুষ্ক বালুকা গ্রাস করবে রথ-চক্র। অবশ্য জীপ গাড়ী হ'লে কতটা নিরাপদ।

অনেক সময় লাগল এই নদী-অতিক্রম-পর্বে, ওপারে ঢালু রাস্তায় উঠতে হয়। পাড়ের উপরে উঠে দেখলাম যাত্রীবাহী কয়েকখানা মোটরবাস দাঁড়িয়ে আছে। তারকেশ্বর হ'তে নদী পর্যন্ত এক সার্ভিস, আবার নদী পার হ'য়ে অন্য সার্ভিস। তারকেশ্বর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেনে অথবা বাসে এসে শুধু বাসে-বাসেই কামারপুকুর যাওয়া যায়। একখানা ব্যক্তিগত গাড়ীর (private car) আরোহীসহ দামোদর নদ ও মুণ্ডেশ্বরী নদী পার হ'তে প্রতি ক্ষেত্রে ১।৹ টাকা ক'রে ট্যাক্স লাগে। আমরা গাড়ীতে উঠে আবার চলতে লাগলাম। কিছু বাদেই আরামবাগ ও কালীপুরের মধ্যে দ্বার-কেশ্বর নদে কাঠের পুল—বর্ষার সময় সাময়িক-ভাবে খাড়া করা হয়। এই পুল পার হ'য়ে প্রায় মাইল খানেক পথ ভাল নয়। কালীপুর থেকে কামারপুকুর ৮মাইল।

বেলা প্রায় ১১।৹ টায় বহু আকাঙ্ক্ষার কামারপুকুর গ্রাম দেখা গেল; উদ্দেশে প্রণাম করলাম। গ্রাম আরম্ভ হ'ল—বসতির মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে গাড়ী চলতে লাগল। সব বাড়ীরই মাটির দেয়াল; কিছু খড়ের ছাউনি, কিছু টিনের ছাদ। গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে ইটের প্রাচীরঘেরা শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণের প্রবেশ-দ্বারে গাড়ী দাঁড়াল,—মিটারে ৭৮ মাইল যাদবপুর থেকে।

আমাদের বড় দেরি হ'য়ে গেছে। সময়-মতো চিঠি লিখে সংবাদ দিতে পারিনি। তার ওপর এই অসময়ে এসে আশ্রমবাসী দের বিরক্ত করতে কেমন লাগে! কিন্তু উপায় কি? আমি একাই গাড়ী থেকে নেমে ছুটলাম। মন্দিরে প্রণাম ক'রে অধ্যক্ষ মহা-রাজকে খুঁজে নিয়ে কথা ব'লে দেখব। প্রথমেই মন্দিরে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। একে বেলা হয়েছে, ক্ষুধায় কাতর, তার উপর ৺ঠাকুরের দর্শনও পেলাম না। মন বেশ খারাপ হ'য়ে গেল। কি করি? উপায় নেই—রুদ্ধ মন্দির-দ্বারেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে নাট-মন্দির ঘুরে দক্ষিণ দিক দিয়ে অগ্রসর হই। নাটমন্দিরে কয়েকজন তীর্থযাত্রী স্নান সেরে জামা-কাপড় পরছে। আর বলাবলি করছে—'মহারাজরা কোথায়? কাউকেই তো দেখছি না।' পশ্চিম দিকে লতাপাতার বেড়া-ঘেরা অংশের কাছে গিয়ে দেখি—প্রবেশ-দ্বারে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখাটি ঝুলে আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে এদিক ওদিক তাকাই, কাউকে ঘর থেকে বাইরে আসতে দেখি না। অবশেষে উচ্চকণ্ঠে ডাকি—'কে আছেন? মহারাজ—?' একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে

এলেন। আমি তাঁকে নোটিশটি দেখিয়ে বললাম, 'ভিতরে আসতে পারি?' তিনি বললেন, 'আসুন।' প্রণাম ক'রে বললাম, 'শুনেছি এখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ বেলুড় গেছেন। এখন কে তত্ত্বাবধান করছেন?' তিনি বললেন, 'আমিই অধ্যক্ষ।'

কি আর বলি? সংবাদ না দিয়ে অসময়ে এসে পড়েছি, প্রসাদ পাব কিনা—ক্ষুধায় কাতর; শুধু নিজের হ'লে এক কথা—আরও ২।৩ জন রয়েছেন। ৺ঠাকুর দর্শনও হ'ল না। মনে হয়, দর্শন তো আর বিকাল ৪টার পূর্বে হবে না। এই অসময়ে ওঁদের অসুবিধায় ফেলে প্রসাদের কথাই বা বলি কি ক'রে? জয়রামবাটী গিয়েও লাভ নেই; সেখানেও সেই একই সমস্যা। মহারাজ নিজের থেকেও তো কিছু বলছেন না! কি করি? শেষে আমৃতা আমৃতা ক'রে নিজেদের পরিচয় দিলাম। বেলুড় মঠের অনুমতির কথা—সব কিছুই বিস্তারিতভাবে বললাম। আলাপ-পরিচয়ের পর অধ্যক্ষ মহারাজ একজন আশ্রমকর্মীকে ডেকে অতিথিশালায় একটি কামরা খুলে দিতে বললেন। মাদুর, সতরঞ্চ প্রভৃতি দিতে ব'লে তাকে স্নান-ঘরে জল দিতেও ব'লে দিলেন। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ঠাকুর দর্শন তো হয়নি। ভোগ নিবেদনের পর এখনই পাঁচ মিনিটের জন্য মন্দির খুলবে। যান, ঠাকুর দর্শন ক'রে স্নান ক'রে প্রস্তুত হোন। শীঘ্রই প্রসাদের ঘণ্টা পড়বে। দেরি করবেন না।'

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহারাজের নিকট হ'তে আমরা মন্দির অভিমুখে চলি। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে পুজোর জন্য আনীত সন্দেশের বাক্স নিয়ে আবার মহারাজের কাছে যাই। 'পুজো ও ঠাকুর-সেবার জন্য' ব'লে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি গ্রহণ ক'রে বললেন, 'শীঘ্র যান, মন্দির খুলেছে, এখনই আবার বন্ধ হ'য়ে যাবে।' ছুটে এসে দেখি মন্দিরদ্বার খোলা। কি আনন্দ! আমরা এক নয়নে চেয়ে আছি শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তির পানে। এক ঝলক মাত্র দেখে নিয়েই প্রণাম করলাম। সময় যে নেই! প্রণাম শেষ হ'তে না হতেই শুনতে পেলাম দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মাথা তুলে দেখি সত্যই দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। ভাবলাম, যতটুকু প্রাপ্য আছে, তাই তো পাব? অতৃপ্ত মন নিয়েই আমরা শ্রীমন্দিরের আশেপাশে কি আছে, দেখতে লাগলাম। বন্ধু তাঁর মাকে নিয়ে অতিথিশালায় গেলেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাখা পাত্রটি থেকে চরণামৃত গ্রহণ ক'রে পশ্চিমের ছোট উঠানটি পার হ'য়ে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের বারান্দায় উঠি। শুনলাম—ঐ ঘরই এখন ঠাকুরের শয়ন-ঘর।

আশ্রমের ফটক দিয়ে ঢুকতেই ডাইনে লতাপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা মন্দিরসংলগ্ন অঙ্গনে ঠাকুরের বাল্যলীলার স্মৃতি বহন ক'রে রয়েছে তাঁরই স্বহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ। ঠাকুর আম খেয়ে আঁটিটি পুঁতে দিয়েছিলেন এই উঠানের উত্তরে। দেখলাম, গাছে কচি আম অনেক রয়েছে। গাছটির পশ্চিমে এক সারিতে তিনখানা সুন্দর চালাঘর। ঝকঝকে তকতকে মাটির দেওয়াল। সদর রাস্তার উপর আশ্রমের উত্তর সীমানায় প্রাচীরগাত্রের অনতিদূরেই অবস্থিত। ঘর সব কয়খানাই দক্ষিণমুখী। প্রথমখানা বাড়ীর বৈঠকখানা। মাঝের খানা মাঠকোঠা দোতলা—ঠাকুরের ভাইদের ছিল। শেষের খানা ঠাকুরের নিজের ঘর। ঘর কখানা খুব কাছাকাছি। ঘরগুলি বর্তমানে সযত্নে রক্ষিত। ঠাকুরের ঘরে—খাটে ঠাকুরের পট, আর দেয়ালে শ্রীশ্রীমায়ের

ও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের পট টাঙানো। অতি নিপুণ হস্তে ঘরটি সাজানো। ঠাকুরের ঘরের সামনেই দক্ষিণে ৺রঘুবীরের সুন্দর মন্দির—পূব-মুখো, পাকাবাড়ী—তবে ছোট। পূজো ভোগ শেষ ক'রে উঠেছেন এক যুবক পুরোহিত—কানাই ঘোষাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শিবরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, রঘুবীরের বর্তমান পূজারী—অতি যত্নসহকারে গৃহদেবতা শীতলা, রঘুবীর শিলা ও ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামেশ্বর হ'তে আনীত শিবলিঙ্গ দেখালেন।

৺রঘুবীরের মন্দিরের পূবে ছোট উঠানটির অপরদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির—জন্মস্থান ঢেঁকিশালের উপরেই নির্মিত। যে শ্বেত-প্রস্তরের বেদীতে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদীগাত্রে সম্মুখেই ছোট একটি ঢেঁকি, উনান ও একটি প্রদীপ খোদাই করা হয়েছে—ভক্তদের জানিয়ে দিতে যে এখানেই ছিল সেই ঢেঁকিশাল। ধূসর চুণার প্রস্তরে নির্মিত দক্ষিণমুখো মন্দিরটি দেখতে খুব সুন্দর। বেশী বড় নয়। মন্দির-শীর্ষ ৩০ ফুটের বেশী উঁচু ব'লে মনে হ'ল না। দক্ষিণে ১০।১২ ফুট পাথর-বাঁধানো খোলা জায়গা, পরে নাট-মন্দির—'মোজেক' করা ঝক্‌ঝকে মেঝে। নাটমন্দিরের তিন দিকেই তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ। ৺রঘুবীরের মন্দিরের পিছনে পশ্চিম ধারে ভোগ রান্নার ঘর ও আশ্রমবাসীদের আবাস-স্থল।

আমরা আশ্রম-আঙিনা হ'তে বাইরে এসে সদর রাস্তা পার হ'য়ে উত্তরে অতিথি-শালায় যেতে প্রথমেই পাই বাঁ-হাতে মিশন-কর্তৃক সংস্কৃত যুগীদের পূর্বমুখী শিবমন্দির। দেখলাম, দ্বার রুদ্ধ। দুচার পা এগিয়ে যেতেই ঘন পাতায় আচ্ছাদিত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একটি আম্রবৃক্ষ। তারই শান্ত শীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে আমাদের গাড়ীটি। আর একটু এগিয়ে গেলেই ডাইনে বাঁয়ে দুটি পাকাবাড়ী—একটি অতিথিশালা, অপরটি দাতব্য চিকিৎসালয়। রাস্তার উত্তরে হালদারপুকুরের দক্ষিণে বিস্তৃত খোলা জায়গায় পূর্বদিক ঘেঁসে এই দুইটি বাড়ী—পাশাপাশি একতলা দক্ষিণমুখো পাকা বাড়ী—উত্তরও খোলা। চমৎকার বাড়ী দুটি। অতিথিশালায় দুটি স্যানিটারি প্রিভি ও দুটি স্নানাগার সহ তিনখানা শয়নঘর—মাঝের ঘরখানা বেশ বড়। দেখলাম—আর একখানা বাড়ী উঠছে, বোধ হয় অতিথিদের জন্যই, পশ্চিমে একসারিতেই পুকুর ঘাটে যাবার রাস্তার ওপরে। হালদারপুকুরে জন-সাধারণের ব্যবহারের ইষ্টকনির্মিত দুইটি বড় ঘাট তৈরী হয়েছে—মেয়েদের জন্য পূর্বপারের মাঝেখানে, আর পুরুষদের জন্য দক্ষিণ পারের মাঝামাঝি। আমরা হাতমুখ ধুতেই প্রসাদের ঘণ্টা পড়ে গেল। আমরা ও অন্যান্য অতিথিরা—সবাই মিলে ৭।৮ জন আশ্রম-প্রাঙ্গণে ঢুকলাম। একজন ব্রহ্মচারী আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন। মেয়েদের পাশের ঘরে বসতে বললেন। আরও ৮।১০জনকে দেখলাম বারান্দায় বসেছেন প্রসাদ পেতে। আমরা সাধুদের সাথেই বসে প্রসাদ পেলাম। সুন্দর সুগন্ধ প্রসাদ, প্রচুর খেয়ে ফেললাম।

আহারান্তে আমরা অতিথিশালায় ফিরে যাই। কি রোদ! উত্তর দক্ষিণ খোলা থাকাতে আমাদের বিশ্রামকক্ষটিতে বেশ হাওয়া। সবাই শুয়ে পড়লাম; আমার কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করি, আর মাথায় কত রকমের চিন্তা—একের পর এক উদয় হ'য়ে আবার লয় পাচ্ছে। বিশেষ কোন কর্মসূচী তৈরী ক'রে নিয়েতো আসিনি।

আসার পূর্বে এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হ'য়ে জেগেছিল—কামারপুকুর জয়রামবাটী যাব, ঠাকুর আর মাকে দেখব। আর কিছু দেখার আছে কিনা, দেখতে হয় কিনা—দেখতে হ'লে কি ক'রে দেখা যায়, কিছুই ভাবিনি।

যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টির প্রতিটি স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত, যিনি জগৎব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক, তিনিই অহেতুকী কৃপায় অলক্ষ্য হস্তে আমাদের জন্য যে এক অপূর্ব কার্যসূচী রচনা ক'রে রেখেছেন, তা কে জানত?

ঘুম আসে না। হঠাৎ মনে হ'ল কি শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি সময়? যাই না, একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসি আশ্রমের কাছাকাছি আশেপাশের জায়গাগুলি।—মনে উঠতেই উঠে পড়লাম। সহধর্মিণীও সাথে সাথে উঠে পড়ে বললেন, 'আমিও যাব।' আমরা ঘর থেকে বের হ'য়ে খোলা জায়গায় পড়ে ডাইনে ঘুরে হালদারপুকুরে পুরুষদের ঘাটের দিকে গেলাম। দেখি ঘাটের মাথায় এক বিজ্ঞাপন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের নির্দেশ—শিক্ষাকেন্দ্র (Training Centre). ঘাট দেখে আমরা সদর রাস্তায় উঠে পশ্চিমের দিকে হাঁটতে লাগলাম। ভীষণ রোদ। একটু এগোতেই দেখি, আশ্রম-সীমানার মধ্যেই আর একটি অতি সাধারণ প্রবেশদ্বার। ঢুকলাম—সম্মুখে অদূরে দক্ষিণে গোশালা। প্রবেশদ্বারের বাঁপাশে প্রায় সীমানার প্রাচীর-ঘেঁসা একখানা বড় চালাঘর। একজন লোক বেরিয়ে আসতেই বুঝলাম যে সে এখানে কাজ করে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম—গোশালায় চাষের বলদ ও দুগ্ধবতী গাভী আছে; জমি আছে আশ্রমের,—চাষ হয়। লোকটি গেট দিয়ে বাইরে গেল। আমরাও তার পিছন পিছন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। লোকটি বললে, কাছেই ভূতির খাল। কথা বলতে বলতে আমরা পশ্চিমে একটু এগিয়ে পড়েছি, সামনেই দেখি রাস্তার বাঁ-ধারে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছায়া ছড়িয়ে আছে। পূর্বদিকে একটি প্রসারিত শাখা থেকে ঝুরি নেমে মাটিতে প্রবেশ করেছে। বৃক্ষের মূল-গুঁড়ি, তার প্রসারিত শাখা আর এই ঝুরির গুঁড়ি দিয়ে চমৎকার একটি প্রবেশদ্বারের মতো শোভা পাচ্ছে। এই প্রবেশপথের ফাঁকে ভেসে ওঠে আলেখ্য—অদূরে এক শান্ত সরোবর, নাম লাহাপুকুর, আর তার ওপারে সাঁওতালদের শ্রেণীবদ্ধ পর্ণকুটীর। কি সুন্দর দৃশ্য! কত তীর্থ-যাত্রী—কত দেখে-বেড়ানোর দল এখানে আসে, তুলে নেয় কত আলোকচিত্র! প্রকৃতির খেয়ালে রচিত এই মনোরম প্রবেশপথে বাঁধিয়ে রাখা এই ছবিটি কি কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? যাক্—একটি স্ত্রীলোক ঐ জলাশয়ের দিক থেকে এই প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। আমাদের কথাবার্তায় ও বেশভূষায় সে ধ'রে নিয়েছে যে আমরা তীর্থযাত্রী। তাই অযাচিত উপদেশ দিল সে আমার স্ত্রীকে, 'মা, যাও—ধাইমার বাড়ী দেখে এস গিয়ে—ঐখানে।' আঙুল দিয়ে নির্দেশ ক'রে দেখাল পুবের দিকে। আরও ব'লল—'ছেলেরা যদি জেগে থাকতো তবে তোমাদের সব দেখিয়ে আনতো।'

ভাবলাম সত্যি তো দেখবার অনেক কিছুই তো আছে। কিন্তু কে দেখাবে? ক্ষণিক দাঁড়িয়ে কিছুই ঠিক করতে না পেরে এগিয়ে যাই পশ্চিমে বটগাছের দিকে। সোজাসুজি যেতে উঠে পড়ি রাস্তার ডাইনে উঁচু জমিতে। প্রায় পার হয়েছি, দূরে দেখি একদল লোক ফিরছে সে দিক থেকে—অন্য পথ দিয়ে। তাদের মধ্যে একজন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, 'ও দিক দিয়ে যাবেন না, ওদিক দিয়ে যাবেন না, এদিক দিয়ে আসুন।' আমরা প্রায় সেই উঁচুজমিটা পার হয়েছি, সামনে

চেয়ে দেখি শ্মশান। এক সারিতে একটার পর একটা ক'রে ৬।৭টা চুল্লীর জায়গা। ডাইনে দূরে শেষ চুল্লীটির কাছে দেখি কয়েকজন লোক একটি শব নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার শুনে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।—কেন ডাকছে? ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ঐ ভদ্রলোকের কথা মেনে নিয়ে একটু এগিয়ে দেখি সেই ঘোষাল! তিনি বললেন, 'ওদিক দিয়ে কোথা যাচ্ছিলেন, শ্মশানের মধ্য দিয়ে? আর ওদিকে এগোবেন কি? ঐতো বটগাছ, আর ঐ যে ভূতির খাল।' শহরতলীর জল নিকাশের বড় পয়ঃপ্রণালীর মতো এঁকে-বেঁকে-যাওয়া একটা নালা। আরও বললেন, 'আপনারা ঘুমিয়েছেন ভেবে আর ডাকিনি। এঁরা বললেন তাই এঁদের নিয়ে বেরিয়েছি। আসুন, আপনাদেরও সব দেখিয়ে দি।' এই কথা ব'লে ভদ্রলোকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; তাদের সব দেখা হ'য়ে গেছে। আমরা তাঁর সাথে সাথে চললাম। খুব রোদ—ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিশাল প্রান্তরের পর আমোদর, তার ওপারে দূরে একটা টিনের ঘর দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেরে গ্রাম। ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস্তভিটা ত্যাগ ক'রে এখানে এসে বাড়ী করেছিলেন।'

ঘোষাল মশাইকে নিশ্চয়ই ঠাকুর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন আমাদের জন্য। নইলে কে আসে যেচে দেখাতে? ঠাকুরের জন্মভূমি, বাল্য ও কৈশোর লীলার পটভূমি এই কামারপুকুর, ভক্তের শ্রেষ্ঠ তীর্থ—এ যুগের মথুরা-বৃন্দাবন! এই গ্রামের প্রতি গৃহ, প্রতি বন, প্রতি মাঠ ঘাট পথ, প্রতি ধূলিকণা ঠাকুরের চরণ-স্পর্শে পবিত্র।

ফেরার পথে চলতে চলতে আমরা আশ্রম ছাড়িয়ে গেলাম। পথিপার্শ্বে বাঁয়ে একটি ছোট ঘর দেখিয়ে ঘোষাল বললেন, 'শিবমন্দির, এখানেই গোপেশ্বরের কাছে ঠাকুরের মা ৺চন্দ্রাদেবী পূজা দিয়েছিলেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন খবর এল যে তাঁর ছেলে পাগল হ'য়ে গেছে।' ঘোষাল সব কিছুই খুব যত্নসহকারে দেখিয়ে চলেছেন। তাঁর ব'লে যাওয়া কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে আমরা তাঁর সাথে এগিয়ে চলেছি। একটু এগিয়েই দেখা গেল পাঠশালা। লাহাবাবুদের পূজা-মণ্ডপের সামনেই নাটমন্দিরে এই পাঠশালা—টিনের ঘর। এখানেই আসতেন গদাধর, বাল্যে সাথীদের সঙ্গে বই আর তালপাতা বগলে ক'রে দোয়াত-কলম হাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য। লাহাবাবুদের পুজোর দালানে দেখলাম ভাসানের পর তুলে আনা দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো। তারপর ঘোষাল আমাদের নিয়ে গেলেন একটি ছোট বাড়ীতে। বাইরের দিকে একটি ছোট মন্দিরে দরজার শিকল খুলে দেখালেন ভিতরটা। বেদীতে ঠাকুরের বড় পট, আর তার পেছনে উপরে টাঙানো আর একটি পট—ধনী কামারনী সদ্যোজাত শিশু গদাধরকে কোলে নিয়ে আসন ক'রে উপবিষ্টা। শুনলাম এটি শিল্পী এন্. সি. দাসের কল্পনার সৃষ্টি।

ঐ বাড়ীটি বাঁয়ে রেখে পড়লাম গিয়ে পিছনের রাস্তায়। রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে আশ্রমের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ঐ রাস্তা থেকে পশ্চিমে একটি রাস্তা গেছে। তার উপর ৺দুর্গাদাস পাইনের বাড়ী—যে বাড়ীতে গদাধর তন্তুবায় রমণীবেশে অন্দরে প্রবেশ ক'রে পাইন মহাশয়ের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। আর ৺সীতানাথ পাইনের বাড়ী তারই পাশে—গদাধর যেখানে যাত্রায় শিব সেজে অভিনয় করতে গিয়ে সমাধিস্থ হন। ফিরবার পথে বাঁ-ধারে দেখলাম লাহাবাবুদের ধানের মরাই আর ডাইনে লাহাবাবুদের ঠাকুর বাড়ী। স্বয়ং মা লক্ষ্মী চন্দ্রাদেবীকে দর্শন দিয়ে

সান্ত্বনার কথা ব'লে এই ধানের মরাইয়ে অন্তর্হিতা হয়েছিলেন।

শুনলাম কিছু দূরে চিনু শাঁখারির বাড়ী। এত অল্প সময়ে সব কিছু দেখে পূর্ণ আনন্দ লাভ সম্ভব নয়। মনে হয় এই জন্যই তীর্থে ত্রিরাত্রি বাসের ব্যবস্থা আছে। তা হ'লে ধীরে-সুস্থে সবটুকু প্রাণের ভাব নিয়ে ভগবানের লীলাখেলার স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি উপভোগ করা যায় না। যা হ'ক এই অল্প সময়ের মধ্যে যে আমাদের এতগুলি লীলাস্থল দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে—এ শুধু তীর্থদেবতার কৃপা, শ্রীগুরুর আশীর্বাদ। ঘোষালকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমরা ফিরে এসে অতিথিশালায় একটু বিশ্রাম করলাম। আবার বেলা তিনটায় বেরুতে হবে; সাড়ে তিনটায় জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির-দ্বার খোলা হয়। আমরা প্রায় ৩টা ১০ মিনিটে গাড়ীতে উঠি। পথে ভূতির খাল পার হ'য়ে একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি আহুড়ের রাস্তা সোজা চলে গেছে ৺বিশালাক্ষীর মন্দির লক্ষ্য ক'রে। বাঁয়ে জয়রামবাটী যাবার পথ। ঐ পথে পড়বার পূর্বেই ভূতির খালের এপারে বাঁধারে খোলা মাঠে বেসিক ট্রেনিং স্কুলের পাকাবাড়ী—জুনিয়র, সিনিয়র দুই বিভাগই খোলা হয়েছে। লাহাদের ছেলেরা এসেছিল অতিথিশালায়, তাদের কাছে শুনলাম। তাদের মধ্যে একটি ছেলে সিনিয়রে পড়ে, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি হাতের কাজ কি শিখেছ?' সে উত্তর দেয়, 'ছোট ছোট কাঠের কাজ করতে শিখেছি।' যাক্, জয়রামবাটীর রাস্তায় পড়েই দেখলাম বাঁদিকে (তিন বৎসর ডিগ্রি কোর্সের) কলেজের বাড়ী উঠছে। ভিত পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। শুনলাম ঐ অঞ্চলে গ্রামের লোকেদের উদ্যোগে সরকারী সাহায্যে বাড়ীগুলি তৈরী হচ্ছে।

এরপরেই বাঁ-ধারে প'ড়ল মাণিকরাজার আমবাগান। বাগান আর নেই। এখন শুধু ৩/৪টি গাছ সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে স্থানটি নির্দেশ ক'রে দিতে। এই জায়গায় আসতেই মনে গানের সুর বেজে উঠল— 'বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।' রাখাল বালকদের সাথে কতই না লীলা করেছেন গদাধর এই বনে!

আমরা সাড়ে তিনটার আগেই জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হই। আমোদর নদের পুলের কাজ তখনও শেষ হয়নি, প্রায় জলশূন্য নদের বক্ষে গাড়ী চালিয়ে পার হ'তে হয়েছে। কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ বলেছেন, মেপে দেখা হয়েছে কামারপুকুর মন্দির হ'তে জয়রামবাটীর মন্দির ঠিক সাড়ে তিন মাইল।

বন্ধু ও তাঁর মা গাড়ীতেই রইলেন, মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হবার অপেক্ষায়। আমরা দুজন মন্দির-বারান্দায় উঠে প্রণাম ক'রে তিন দিক ঘুরে দেখতে থাকি। মন্দির পূর্বমুখী দক্ষিণের বারান্দায় ক্রমে ক্রমে এগিয়ে মন্দিরের পিছন ভাগে গিয়ে পড়ি। একজন সন্ন্যাসীকে সম্মুখে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, মন্দির-দ্বার কখন খোলা হবে। তিনি বললেন, 'এখনই খোলা হবে।' অধ্যক্ষের খোঁজ করলে তিনি একজন লোককে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। মন্দিরের পিছনে সংলগ্ন বাড়ীটি ডাইনে রেখে আমরা আরও ভিতরের দিকে চললাম।

এখানেই একখানা ঘরে অধ্যক্ষ থাকেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে পূজোর মিষ্টি ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য কিছু দিয়ে তাঁর সাথে একটু আলাপ ক'রে আমরা মন্দিরে ফিরে আসি। মহারাজদের মিষ্টি ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হই। মন্দিরে ফিরে এসে দেখি মন্দির খোলা হয়েছে। বহুকালের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হ'ল—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে তাঁর মর্মর-মূর্তি দর্শন হ'ল। এতক্ষণে সত্যই বলতে পারি কামারপুকুর-জয়রামবাটী দেখেছি, ঠাকুর আর মায়ের জন্মভূমির স্পর্শ পেয়েছি! আনন্দে মন ভরপুর। ভগবান্ যে এত শীঘ্র এত সুন্দর ও সহজ ভাবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, তা কি ভাবতে পেরেছি? সন্ন্যাসী আশ্রমের পাচককে সঙ্গে দিয়ে দর্শনীয় সব কিছু দেখিয়ে দিতে বললেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির ঠাকুরের মন্দির অপেক্ষা বড় ও উঁচু। ১৯২৩ খৃঃ স্বামী সারদানন্দজী এই মন্দির শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর নির্মাণ করেন। পরে তা বর্তমান বর্ধিত আকারে রূপায়িত হয়েছে। মন্দিরের চারিদিকেই বারান্দা তবে বর্তমানে উত্তর দিকের বারান্দার কতক অংশ টিনের বেড়ায় আবদ্ধ থাকায় ভক্তগণের প্রদক্ষিণের সুযোগ নেই। আমরা চার জন—পাচকের সাথে চলতে লাগলাম। দক্ষিণদিকে ২।৪ পা হেঁটেই রাস্তার বাঁ-ধারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌছানো গেল। ভক্ত-যাতায়াত বাড়লে থাকার অসুবিধা হওয়ায় ১৯১৬ খৃঃ স্বামী সারদানন্দ এখানেই শ্রীশ্রীমায়ের থাকার বাড়ী তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। দেখলাম, খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বেদীতে শ্রীশ্রীমায়ের বড় একখানা পট। ঘর দক্ষিণমুখী। একটি বর্ষীয়সী সধবা পটের বাঁপাশে বসে জপ করছিলেন। ঐ ঘরের পূবে রান্নাঘর। ছোট্ট উঠানের অপর পারে মায়ের ঘরের মুখোমুখী আর একখানা ঘর। শুনলাম, বর্তমানে স্ত্রীভক্ত-যাত্রীরা এলে ঐ ঘরে শুতে দেওয়া হয়। জয়রামবাটীতে এখনও ভাল যাত্রী-নিবাস গড়ে ওঠেনি, তবে শীঘ্রই উঠবে—শুনলাম। আমরা আবার রাস্তা পার হ'য়ে ঘনকুটীর-সন্নিবেশিত এক পল্লীর এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে একটি কুটীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম, শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটী আসতেন, তখন এই ঘরেই থাকতেন। ঘরে ঠাকুরের পট ও শ্রীশ্রীমায়ের পটও আছে। খুব যত্ন সহকারে সব কিছু রক্ষিত। আর বিশেষ কিছু দেখবার বোধ হয় নেই। এক আছে পুণ্যিপুকুর, শুনলাম—সেটা রাস্তার ওপারে যে পুকুর দেখলাম, যার পাড়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী সেটিই।

আর একটি আছে আমোদর নদের ঘাট, স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী এই সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটু দূরে ব'লে আর যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি—সময়ের অভাব। বাকী রইল সিংহবাহিনীর মন্দির। আমরা সব দর্শন ক'রে মন্দিরে ফিরে এসে মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেক সন্দেশ প্রসাদ দিলেন। আমরা চাওয়াতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণামৃত একটি অগুরুর শিশিতে যত্ন ক'রে ভরে দিলেন। আমরা চারটা বেজে পাঁচ মিনিটে জয়রামবাটী হ'তে রওনা হই। গ্রামের শেষে বাঁ-ধারে একটা কাঁচা রাস্তায় ২।১ মিনিট হাঁটাপথে সিংহবাহিনীর মন্দির। গাড়ী বড় রাস্তাতেই দাঁড়াল। বন্ধু আর এবারে নামলেন না। আমরা তিনজন খালিপায়ে হেঁটে চললাম। কাঁকরের পথ—অনভ্যস্ত লোকের হাঁটতে একটু কষ্ট হয়। একটা বড় আঙিনা—চারপাশে লোকের বসতি—সব সদ্গোপ, আর তারাই নাকি এখন মন্দিরের সেবাইৎ, আঙিনার পশ্চিম পাশে একটি পোড়ো ভিটে বিদ্যমান—সেটাই নাকি আদি মন্দিরের স্থান। প্রতিমা পূর্বমুখো ছিল। এখন উঠানের পূর্ব ধারে ইট বাঁধানো মেঝে, টিনের ছাউনির ঘরে প্রতিমাকে পশ্চিমমুখো ক'রে সাময়িক ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। শুনলাম একটি মামলা চলছে, মামলা মিটলে আদি ভিটেতে পাকা মন্দির নির্মাণ করা হবে। উঠানে আগেকার ও বর্তমান মন্দিরের মাঝে টিনের ছাউনি ছোট নাটমন্দির।

সিংহবেদীর উপর 'মা' উপবিষ্টা; পাশাপাশি ৩টি মূর্তি। শুনলাম—চণ্ডী, সিংহবাহিনী, মহামায়া। মূর্তির ডাইনে ৺মা মনসার মূর্তি—সর্প-বেদীতে আসীনা।

দেখা হ'য়ে গেলে ফিরে এসে গাড়ীতে উঠি। রাস্তার দক্ষিণ দিকে তালপুকুর, শুনলাম শ্রীশ্রীমা এখানে স্নান করতেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই মুণ্ডেশ্বরী পার হ'তে হবে; কামারপুকুরেও একটু দেরি হবে, ভাল ক'রে ঠাকুর দর্শন হয়নি। অধ্যক্ষ এত আদর যত্ন করেছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

কয়েক মিনিটেই কামারপুকুর এসে আমরা গাড়ী থেকে নামলাম। এবার মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত। প্রাণভরে দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ ক'রে ভাল ক'রে দেখে নিলাম—আবার কবে আসা হয়! দর্শনান্তে আমরা অধ্যক্ষের নিকট বিদায় ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে ফটকের কাছ পর্যন্ত আসেন। আসতে আসতে বললেন, 'এবার তো শুধু পথ চিনে গেলেন। আবার আসবেন, ২।৪ দিন থাকবেন।' বললাম, 'নিশ্চয়ই আসব। আশীর্বাদ করুন যেন শীঘ্র আসা হয়। এবারে দেখা ক্ষণিকের।' তবে বলতে পারব: 'কামারপুকুর দেখেছি, জয়রামবাটী দেখেছি।'

অধ্যক্ষের পদধূলি নিয়ে গাড়ীতে উঠি। যে পথে যাওয়া, সেই পথেই ফিরে আসা। রাত ১০॥০ টায় বাড়ী পৌঁছাই।

* * *

পায়ে হেঁটে তীর্থ করার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, কিন্তু সবাই সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়, সময়ের এবং সামর্থ্যেরও অভাব।

মূক বন্ধু

'অনিরুদ্ধ'

কথা তার কোনো দিন শুনি নাই কানে
তবু বাণীহীন ভাষা ধ্বনিছে পরাণে।
নয়ন দেখেনি কভু কেমন মূরতি
অন্তর আঁখিতে তবু ধরা পড়ে গতি।
যদিও ইন্দ্রিয়-দ্বারে স্পর্শ নাহি পাই
দেহের প্রত্যেক স্পন্দে নাচে সে সদাই।
মনের অসংখ্য চিন্তা সন্ধান না পায়
তবু যত জানাজানি তাহারি বিভায়।
কাছে তবু, দূরে কেন সে রহস্যময়—
লুকোচুরি খেলি' কেন জাগায় সংশয়?
হাসিয়া কহিছে, যদি হ'ত ঠিক চেনা
তবে মোরে জনতার ভিড়ে ডাকিতে না।
অন্তরালে থাকাই যে আমার গৌরব
আমি কায়াহীন সঙ্গী মূক বন্ধু তব।

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

॥ ৫ ॥

উদার মানসিকতা উচ্চতর সংস্কৃতির একটা অন্যতম প্রধান লক্ষণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে না হ'ক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে আজও ভারতে বিভিন্ন জাতির কাছে শ্রদ্ধেয়, তার কারণ বাঙালী একদিন নিজ জন্মভূমির ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিল। বৃহত্তর ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাঙালী মনীষী রামমোহন; সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'ভারতপথিক' ব'লে। রামমোহনের পরে ভারতচেতনার পরিচয় দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে যাঁরা সহায়তা করেছেন, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

১৮৬৪ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত-পরিক্রমা কেশবচন্দ্রের ভারতচেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল, সন্দেহ নেই। এ ভারত-পরিক্রমার উদ্দেশ্যও ছিল সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ, ধর্মভিত্তিক একটা বৃহৎ ভারতীয় জাতি গঠনের অভিপ্রায়। কেশবচন্দ্রের সমষ্টিগত চেতনা সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন :

> আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকে সমষ্টিগত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ভারত পরিক্রমায়ও তাঁহারা লিপ্ত হন। বর্তমান কালে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইহার পথ দেখান।[১]

উত্তরভারত পরিক্রমায় যাবার আগেই ধর্মকেন্দ্রিক একটা অখণ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন কামনায় কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' বা The Brahmo Samaj of India. ধর্মের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সমস্ত ভারতীয় জাতির ঐক্য বিধানই ছিল এ 'সমাজে'র উদ্দেশ্য। এ ঐক্যবোধের আদর্শ শুধু যে সমসাময়িক ধর্মবৃত্তের মধ্যে সীমায়িত ছিল তা নয়, সে যুগের কোন কোন কবির হৃদয়কেও এ উদার আদর্শ জাগ্রত করেছিল। আচার্য মোহিতলাল মনে করেন—সমসাময়িক মহাকবি নবীনচন্দ্র 'এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান'-ভিত্তিক যে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার প্রেক্ষাপটে ছিল কেশবচন্দ্রের ঐক্যবোধের আদর্শ প্রেরণা।[২] পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' পরিকল্পনায়ও দেখি এ উদার ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা।

কেশবচন্দ্রের মনে ভারতচেতনা আরও তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান—বিশেষ ক'রে পাঞ্জাব—পরিক্রমার ফলে। সে বছর বেথুন সোসাইটিতে তিনি এ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি নিজ দেশবাসীকে শিখ-সমাজের

১ কেশবচন্দ্র সেন—সাহিত্যসাধক চরিতমালা—পৃঃ ৩৬

২ বাংলার নবযুগ—মোহিতলাল মজুমদার—পৃঃ ২৯৭

গণতান্ত্রিক জীবনপ্রণালী গ্রহণ করবার জন্যে আহ্বান জানান। বেথুন সোসাইটির এ স্মরণীয় বক্তৃতায় তিনি ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমবায়ে একটি সংঘ গঠনের উপরও জোর দেন। সমগ্র ভারতের নবজাগরণের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতীয় জাতিদের নিয়ে এ মিলনক্ষেত্র রচনার পরিকল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও কুড়ি বছর আগের কথা। কেশবচন্দ্রের এ ভারত-চেতনা জাতীয়তার ক্ষেত্রে বাঙালীর দৃষ্টি-সীমাকে প্রসারিত করতে সহায়তা ক'রল সর্বভারতীয় জীবনের বিস্তৃত পরিবেশে। ক্রমে ক্রমে বাঙালী সংস্কৃতি রূপান্তরিত হ'তে লাগল এ উদার ভারতচেতনার স্পর্শে।

সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতির একটা প্রধান লক্ষণ। এ সাম্যভাবের প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম ছিল সারাজীবন অবিরত। এ মনোভাবের ফলে 'মন্থরগতি' ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ছেদ ক'রে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ', আর প্রধান আচার্যের পদ উন্মুক্ত ক'রে দিলেন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতীয় লোকদের জন্যে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যে নতুন ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সে মন্দিরের দ্বারও উন্মুক্ত হ'ল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট। হিন্দুর বহুযুগ-প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে সকল জাতির মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে কেশবচন্দ্র বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিবাহ-বিষয়ক '৩ আইন'কে বৃটীশ রাজদরবারে বিধিবদ্ধ করিয়ে। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এ আমূল সংস্কার-কামনা দেখে সেদিন যে শুধু প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তা নয়, নরমপন্থী ব্রাহ্মেরা পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে তীব্র সমালোচনা না ক'রে ছাড়েনি। ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারে তাঁর এ বৈপ্লবিক কর্মধারার প্রতিবাদ করেন সে যুগের ব্রাহ্মধর্মের প্রবীণ নেতা রাজনারায়ণ বসু তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত ক'রে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। এ প্রবন্ধে প্রধান ব্রাহ্মনেতা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলনের দ্বারা একটা সাম্যের সমাজ গঠনের স্বপ্নে রইলেন একনিষ্ঠ।

একটা জাগরণোন্মুখ জাতির সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্যে একমাত্র পুরুষের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য চাই নারীরও সক্রিয় সহযোগিতা। নারীশক্তির জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মিকা সমাজ।' সেই বছরই ভারতহিতৈষী মিস্ মেরী কার্পেন-টারের কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সকল রকম নারী-কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায়। উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের ইতিহাসে ধর্মবীর কেশবচন্দ্রের নামও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মহামতি বেথুনের পাশে। এ নারীশিক্ষাই সৃষ্টি করেছে বাঙালী নারীর মনে একটা প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ, আর এ নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বাঙালী সমাজ নতুন রূপ লাভ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও। বাঙালী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ-প্রসঙ্গে এ সত্যটি ভুলবার নয়।

॥ ৬ ॥

'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইওরোপ-যাত্রাকে তুলনা করেছিলেন তীর্থ-যাত্রার সঙ্গে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের

ইওরোপ-যাত্রাকেও বলা চলে, সে যুগের মুক্তিসন্ধানী একজন বাঙালী সত্যসন্ধ যাত্রীর সংস্কৃতি-সঙ্গমে তীর্থযাত্রা। এ বিদেশযাত্রার ফলে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি হ'ল আরও বহুদূর প্রসারিত, চিত্তে এল নব বল, জাতীয় সর্বাঙ্গীণ সংস্কারমূলক কাজে জাগ্রত হ'ল নিত্যনতুন এষণা—এক কথায় কেশবচন্দ্রের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতিও নতুন অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে গেল।

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশে ইংরেজ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ, এবং ইংরেজ জাতির প্রগতিশীলতার কারণগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সে অভিজ্ঞতা নিজের দেশোন্নয়ন কার্যে ব্যবহার। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড গমন সম্পর্কে একটা কথা স্মরণযোগ্য, সে যুগের দেশহিতব্রতী বাঙালী মনীষীরা তখনও এ দেশ শাসনে ইংরেজের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠেনি। পূর্বযুগের মুসলমান-শাসনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরে তাঁরা ভারতে ইংরেজের আগমনকে গ্রহণ করেছিলেন বিধাতার আশীর্বাদ-রূপে; আর পরমতসহিষ্ণু, জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রচণ্ড শক্তিমান্ সুসংস্কৃত ইংরেজ জাতির সংস্পর্শ ভারতের জাতীয় জাগরণে কল্যাণপ্রসূ হবে—এই ছিল সে যুগের বাঙালী মনীষীমাত্রেরই সুচিন্তিত ধারণা। শুধু কেশবচন্দ্র কেন, সে যুগের 'জাতীয় জাগরণ-মন্ত্রের ঋষি' বঙ্কিমও ভারতে ইংরেজ আগমনকে মনে করতেন দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা ব'লে, আর ভারতের নিজস্ব স্বার্থে ইংরেজ অধিকার এ দেশে আরও কিছুকাল স্থায়ী হ'ক—এই ছিল তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায়।

অতএব বিলেতে কেশবচন্দ্রের তেজোগর্ভ বক্তৃতা সে দেশবাসীর নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল সহৃদয় ইংরেজের নিকট ভারতের উন্নতি-কামনায় আবেদন-নিবেদনের সীমায় আবদ্ধ। ইংরেজ যখন বিধাতার রহস্যময় করুণায় ভারত শাসনের জন্যে প্রেরিত হয়েছে, তখন শাসকজাতির কর্তব্য ভারতবাসীকে ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, তারপর শিক্ষিত ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকার্যে প্রতিষ্ঠিত করা। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে প্রদত্ত 'England's duty towards India' নামক বিখ্যাত বক্তৃতার (১৮৭০) প্রধান বক্তব্য ছিল এই। 'Female Education in India' নামক বক্তৃতায়ও তিনি আবেদন জানান সে দেশীয় সমাজসেবী মহিলাদের নিকট—ভারতীয় নারীর অজ্ঞানতা দূর ক'রে তাদের সুপ্ত ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করবার জন্যে।

কোন কোন বক্তৃতায় তিনি তদানীন্তন সরকারের সমালোচনা যে করেননি, এমন কথা বলা যায় না। 'Liquor traffic in India' নামক বক্তৃতা সরকারের রাজস্ব-নীতির তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ভরা। আবেগকম্পিত কণ্ঠে এ বক্তৃতায় তিনি বলেন:

And here I would ask, is not this liquor traffic carried on in India simply, solely, and exclusively for the sake of revenue? (Hear). Is there any other motive that actuates the British Government? (Cries of 'No'). It is simply a question of money.........If revenues increase in this way from the sufferings, wickedness, and demoralisation of the people, better that we should have no revenue at all. (*Cheers*).

সুরাপান-রূপ জাতীয় দুর্নীতির মূল কারণ অপসারণের জন্যে কেশবচন্দ্রের এ আবেগধর্মী বক্তৃতা সমকালীন এক শ্রেণীর ইংরেজের মনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করলেও ভারতবর্ষের

জাতীয় জীবনে বিলাতী সভ্যতাসৃষ্ট এ পাপ দূর করবার জন্যে ইংরেজ সরকার যে সচেষ্ট হয়নি, তার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। তবে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের আবেগময় বর্ণনা শুনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজদের মন যে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে, এবং মিস্ মেরী কার্পেনটার, মিস্ এনেট একরয়েড্ (পরে মিসেস বিভারিজ)-এর মত মহীয়সী কোন কোন সমাজসেবী ইংরেজ মহিলা শিক্ষায় অনগ্রসর ভারতীয় নারীজাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ দেশের নারীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন ঘটাবার জন্যে ভারতের পক্ষ থেকে এত বড় দৌত্যকার্য রামমোহনের পরেই কেশবচন্দ্র করেছেন।

জাতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রচারে স্বেচ্ছাবৃত দূতের কর্তব্য গ্রহণ ক'রে কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্যকে সমকালীন বাঙালী জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী ক'রে তুললেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ তীর্থযাত্রায় কেশবচন্দ্রের সব চাইতে বড় সঞ্চয় হ'ল— ইংরেজ জাতির জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ। পারিবারিক জীবনে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি ইংরেজ সমাজ-জীবনকে একটা বলিষ্ঠ রূপ দান করেছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'য়ে প্রায় সাত মাস পরে তিনি স্বদেশে ফিরলেন নিজের দেশকে নতুন ক'রে গড়বার স্বপ্ন নিয়ে।

॥ ৭ ॥

কেশবচন্দ্রের জাতিগঠন-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ ক'রল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একটা বিরাট গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা নিয়ে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করলেন 'The Indian Reform Association' বা 'ভারত সংস্কার সভা'। এ সংস্কার পঞ্চমুখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে (স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা, সুলভ সাহিত্য প্রচার, সুরাপান ও মাদক নিবারণ, আর দাতব্য) তিনি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন একটা বলিষ্ঠ জীবনবোধে। বাংলাদেশ তাঁর কর্মের কেন্দ্রস্থল হলেও সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতি কামনায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান, আর এ প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বভারতীয়ের জন্যে। যে কেশবচন্দ্রকে আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি আত্মিক সাধনার ভিত্তিতে দেশের অভ্যুদয়-কামনায় তন্ময়, সে কেশবচন্দ্রকে আমরা এখন দেখি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজ গঠনের জন্যে তৎপর। দেহ ছাড়া আত্মার সাধনা অর্থহীন—এ বোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র গ্রহণ করলেন একটা সর্বাত্মক উন্নয়ন-পরিকল্পনা। জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় কেশবচন্দ্রের তিনটি কার্যক্রম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে: শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, সুলভ সাহিত্য প্রচার, আর দাতব্য। এ তিনটি কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়েছিল দেশের অগণিত সহায়হীন শ্রমজীবী ও দরিদ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার জন্যে। কেশবচন্দ্রকে এতদিন যাঁরা বাংলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের নায়ক ব'লে ভেবেছিলেন, তাঁরা তাঁর শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জন্যে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, জনসাধারণের জ্ঞানোন্নয়নের জন্যে এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' নামক পত্রিকা প্রকাশ, দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ বধির বিধবা ও দুঃস্থদের জন্যে অর্থ সাহায্য, ঔষধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি সেবাকার্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখে বিস্মিত হলেন। এ সেবাধর্মের প্রেরণা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের

জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ ক'রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এনে দিয়েছিল বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে এক বিরাট জাগরণ, আর সৃষ্টি করেছিল লোকহিতব্রতের ভিত্তিতে এক উদার সংস্কৃতির।

ভারত-সংস্কার-সভার সংস্কারের লক্ষ্য ছিল, 'to promote the social and moral reformation of India.' সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত বাস্তব। স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কোন বাঙালী মনীষী ইতিপূর্বেও আন্দোলন করেছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টিরও প্রয়াস—ইতিপূর্বে না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু এ সমস্ত সংস্কারকার্যে কেশবচন্দ্রের পরিকল্পনার মৌলিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যাপক ও কার্যকরী ভিত্তিতে স্থাপন করবার অভিপ্রায়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়', এবং এ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাদের নিয়ে স্থাপন করলেন তিনি 'বামাবোধিনী সভা' ও 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। এ সভা ও পত্রিকা বাংলার নারীজাগরণে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা সে সভার কার্যবিবরণী পাঠে জানা যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রেরই প্রদীপ্ত উৎসাহে 'ব্রহ্মবন্ধু সভা'র সভ্যেরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বব্যাপী করবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন। এ প্রচেষ্টায় উৎসাহী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মনীষী।

সরকারী সাহায্যের অভাবে 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়' বন্ধ হ'য়ে গেলে কেশবচন্দ্রের অক্লান্ত উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল' ১৮৭৯ খৃঃ। এ বিদ্যালয়েও নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা এবং নারীদের উপযোগী। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এ বিদ্যালয়টি পরিবর্তিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজে, যার বর্তমান নাম হ'ল ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন। বাঙালী নারীকে ভারতীয় নারীজীবনের ঐতিহ্যে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্রের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'আর্য নারী সমাজ'; আর 'পরিচারিকা' নামক মাসিক পত্রিকাখানি হ'ল সে সমাজের মুখপত্র। এক কথায় বাংলা দেশের নারী-জাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেথুন, মিস্ মেরী কার্পেনটার, প্যারীচরণ সরকার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পার্শ্বে।

কেশবচন্দ্রের নারী-হিতৈষণা শুধু সামাজিক নারীদের উন্নতি-কল্পেই নিয়োজিত হয়নি, পতিতা নারীদের সৎ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েও তাঁর নারীজাতির প্রতি দরদের গভীরতা স্পষ্ট দেখা যায়। এ দিক দিয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে।

দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্যে এত সহজ ভাষায় ও নামমাত্র মূল্যে 'সুলভ সমাচারের' মতো পত্রিকা প্রকাশ ছিল সে যুগে অকল্পনীয়। পত্রিকাখানি সে যুগের জনসাধারণের কাছে কিরূপ সমাদৃত হয়েছিল তা বোঝা যায় পত্রিকার ব্যাপক প্রচার দেখে। প্রথম প্রকাশের চৌদ্দ মাসের মধ্যে পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়, ২,৮১,১৪৯ সংখ্যা। বাংলা সংবাদপত্র-সাহিত্যে শারদীয়া

সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজও সৃষ্টি করে এই স্বল্পমূল্যের 'সুলভ সমাচার'।

দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে সুরাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টির জন্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'মদ না গরল' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেই কেশবচন্দ্র ক্ষান্ত হননি, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার যাতে সরকারী আইন প্রয়োগে নিষিদ্ধ হয়, সেজন্যে জনমত সংগ্রহ ক'রে ভারত-সরকারের নিকট তিনি আবেদনও করেছিলেন। এ আবেদনের ফলে সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রয় আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিল।[৩]

এ সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের দ্বারা জাতীয় সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করবার চেষ্টার মধ্যে কেশবচন্দ্রের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে।

জাতিগঠনের অতন্দ্র স্বপ্নে কেশবচন্দ্রের কর্মোদ্যম আরও বেগ প্রাপ্ত হ'ল ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞানসভা ও ভারত-বর্ষীয় বিজ্ঞানসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সমাজ-বিজ্ঞানসভার শিক্ষা-শাখার সভাপতিরূপে এ সময় 'ভারতের নারীজাতির উন্নতি' ও 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন' (Reconstruction of Native Society) নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় ভারতের নারীজাতির শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক নীতিশিক্ষাকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেবার জন্য কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলতা তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের নিকট 'Indo-Philus' (ভারতবন্ধু) ছদ্মনামে লিখিত ও 'Indian Mirror'-এ প্রকাশিত কেশবচন্দ্রের নয়খানি পত্র ভারতের শিক্ষা-সংস্কারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দলিল ব'লে বিবেচিত হবার যোগ্য। কেশবচন্দ্রের এ শিক্ষা-আন্দোলন সদ্য সদ্য কোন ফল প্রসব না করলেও তা সে যুগের শিক্ষাব্রতী ও সুধী মনীষী এবং সরকারের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করেছিল জাতিগঠনমূলক অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা'র অন্যতম পরিচালকরূপে ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে এ অধ্যাত্মবাদী গৃহী-সন্ন্যাসীর অক্লান্ত কর্মোদ্যমও আমাদের কম বিস্মিত করে না। জাগ-রণোন্মুখ ভারতীয় দৃষ্টিকে বিজ্ঞানমুখী করার প্রচেষ্টায় কেশবচন্দ্র এখানে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সমকালীন চিন্তানেতা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। বিজ্ঞানচর্চার ফলে বাঙালী—তথা ভারত-বাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই সৃষ্টি করছে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতির আন্তরিক যোগ বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এ সত্যটিও স্মরণযোগ্য।

সংস্কৃতি-রচনায় কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের সাধক। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঙালীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করায় ইংরেজ শাসনের সদভিপ্রায় সম্পর্কে এক শ্রেণীর রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তির ইংরেজ-প্রীতির ভিত্তি টলে উঠেছে; দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ উঠেছে প্রবল হ'য়ে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষিত বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির জন্যে বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী মতবাদ ও মনোভাব। স্থিতধী কেশবচন্দ্র অনুভব করলেন, সংস্কৃতি-আন্দোলনের দ্বারা জাতীয় চিত্তকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার পূর্বে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে জাতির আত্মহত্যারই সামিল। সে জন্যে

৩ দ্রষ্টব্য—বাংলার নব্যসংস্কৃতি, যোগেশচন্দ্র বাগল: পৃঃ ৮২—৮৯

সমসাময়িক ইংরেজ-বিদ্রোহী জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দিয়ে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করলেন ভারতের সর্বজাতির মিলনের ভিত্তিতে একটি উদার সংস্কৃতি-সংস্থার (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে), যার নাম দিলেন 'এলবার্ট ইনষ্টিটিউট'। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সংস্কৃতি-সংস্থা পরে ভারতের সর্বজাতি ও সর্বমতবাদী বাঙালীর মিলন-সভারূপে বিখ্যাত হয় 'এলবার্ট হল' নামে। 'হলে'র পরিচালক-সভায় গ্রহণ করেন তিনি—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দেশীয় খৃষ্টান, ব্রাহ্ম—সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোককে। এ 'হল' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন :

In the midst of jarring and conflicting interests and the numerous growing political and religious divisions in native society, consequent on a state of excitement which a liberal education has produced, it was thought desirable to provide a place for kindling social intercourse, when men of all classes and creeds at least for the time being might forget their differences and enter into social fellowship and friendly communion. The Hall will not belong to any exclusive political or religious party, but will be the common property of all classes of native society. [৪]

[৪] উদ্ধৃতিটি—The Indian Daily News, April 28, 1876 থেকে, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কৃত; দ্রষ্টব্য কেশবচন্দ্র সেন, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬১

সমকালীন রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলন হ'তে দূরে থেকে এ সংস্কৃতি-আন্দোলন নিয়ে মেতে থাকা আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের পরিচায়ক বলেই মনে হয়; কিন্তু মতবাদের স্বাতন্ত্র্যে স্পর্ধাশীল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজনীতি-ধুরন্ধরদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন বারে বারে কি ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস তার অভ্রান্ত সাক্ষী। বিস্তৃত জ্ঞানানুশীলন ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা পরস্পরকে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই জাতীয় ঐক্য সম্ভব, এবং জাতীয় ঐক্যবোধহীন মুক্তি-আন্দোলন যে অর্থহীন—রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এ দূরদৃষ্টি সে যুগের পক্ষে নিঃসন্দেহ প্রগতিশীল। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এ সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের আলোচনা ও মত-প্রকাশের কেন্দ্রস্থলরূপে পরবর্তীকালে সমস্ত ভারতবর্ষে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রবল জনমত-গঠনে সহায়তা করেছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। জনমত গঠন ছাড়া কোন আন্দোলনই কোনদিন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। এ দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের জাতীয় জীবনে কেশবচন্দ্রের দান উপেক্ষণীয় নয়। (ক্রমশঃ)

সাক্ষী

শ্রীমতী যমুনা দেবী

জড়ত্বের শুষ্ক আবরণে,
প্রচ্ছন্ন রয়েছে সদাশিব!
সমাধিস্থ নিশীথ শয়নে
অতল সে শান্তির অধিপ।
জীবনের কোন চিহ্ন নাই,
তবু তার নাম চিরজীব!

সৃষ্টির প্রথম হ'তে তাই
সাক্ষীরূপে বিনিষ্কম্প দীপ!
আনন্দের অনুভূতি-পীঠে,
যুগান্তের স্থির নিস্তব্ধতা,
অনন্তের অব্যক্ত সঙ্গীতে,
বিরাটের চির তন্ময়তা।

মহাবট

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শান্তি-ব্যাপ্ত জীবন আমার, স্তব্ধ বিপুল গম্ভীর,
বনসম্রাট যুগ যুগ ধরি বাঁচি;
লক্ষ লক্ষ সুদৃঢ় শাখার বাহু মেলি আমি মহাবীর,
বসুধারে যেন রক্ষা করিতে আছি।

স্তম্ভ শতেক চারিদিকে রচি' উন্নত আমি ন্যগ্রোধ—
শিল্পীর মন্তো রেখেছি কত না ভঙ্গে;
রৌদ্র-দাহেরে শীতল করিয়া পুষ্ট পাতার সম্পদ
সঘন হইয়া রয়েছে আমার অঙ্গে।

লম্বিত ঝুরি দুলিছে অথবা মৃত্তিকা 'পরে লুণ্ঠিত,
জটা ধ'রে আছে কটা বরণের কেশ;
রুদ্রাক্ষের মতো ফলে-ভরা ভাগ্যেও নহি কুণ্ঠিত,
বিস্তর সেই মালাতে সেজেছি বেশ।

ভগ্ন কখন করিতে পারেনি ঝঞ্ঝার ভীম তাণ্ডব,
জীবন-যুদ্ধে পরাজিত কভু নহি;
বজ্রাঘাতের দাগ আছে, তবু ধ্বংস হয়নি সম্ভব,
গ্রীষ্মে শীতল, শীতেও উষ্ণ রহি।

সিন্ধুর সনে সঙ্গম তরে বন্যা আসে কি রঙ্গিণী!
লয়ে যায় বেগে, যাহা কিছু পায় পথে;
গ্রাহ্য করিনে শিকড়ের মাটি বন্যার হ'লে সঙ্গিনী,
নির্মূল কভু হই না কোনও মতে।

পার্শ্বে শ্মশানে অগ্নিশিখায় মৃত্যু নাচিছে উল্লাসে
সম্মুখে মোর নিঃশেষ করি' শব;
স্পর্শ তাহার অঙ্গে পেতেছি তপ্ত বায়ুর নিঃশ্বাসে,
বিকারবিহীন—উঁচু হ'তে দেখি সব।

শাস্ত আমার শ্রান্তিবিহীন অন্তবিহীন উদ্যম,
যত্ন বিনাই বাড়িতেছে অবিরত;
স্বতন্ত্র আমি, অশেষ শোভার কুঞ্জ গড়িতে সক্ষম,
নির্মোহ, তবু আশ্রিত রাখি কত।

বৃদ্ধ কেবল বয়সে হয়েছি, সরস জীবন অক্ষয়,
যৌবন ধীরে বাড়িয়া যেতেছে যেন;
অদম্য আর সহজ সতেজ, দুর্জ্ঞেয় মহা বিস্ময়,
ভক্তিভীতির পাত্র ভবেশ হেন।

খাদ্য লভিছে কত বিহঙ্গ রহিয়া মুক্ত আশ্রয়ে,
শাখামৃগ আর পিপীলিকা পায় গেহ;
রন্ধ্রে রেখেছি সুপ্ত করিয়া সর্পেও আমি নির্ভয়ে;
বিশাল আলয়ে সকলেই পায় স্নেহ।

নিম্ন শাখাতে দোদুল ঝুরিতে দীর্ঘ দোলনে ঝম্পনে
পাঠশালা ছাড়ি' দস্যি ছেলেরা মাতে;
ব্রহ্মদৈত্য নিভৃতে রয়েছে,—বক্ষে সে-ভীতি কম্পনে,
সদলে তাহারা সদা রহে এক সাথে।

সূর্য যখন পৃথ্বী পোড়ায়, দীপ্ত যখন অম্বর,
ক্লিষ্ট পথিকে দিয়েছি স্নিগ্ধ ছায়া;
ব্যর্থ প্রেমিক—তপ্ত জীবন—বক্ষ লইয়া দুর্ভর,
হেথায় আসিয়া ভুলেছে মোহের মায়া।

মহেশ্বরের মন্দির আছে লক্ষ্মীর ঘটা বর্জিত,
শ্যামল শীতল সঘন আচ্ছাদনে;
সন্ন্যাসী সেথা যোগাসনে বসি—চিত্ত গভীরে মজ্জিত,
দীপ্তি তাহার ব্যাপ্ত আমার বনে।

মহাবীর্যের বিরাটত্বের তৃপ্তিতে ভরা অন্তর—
আসক্তিহীন স্নেহেই পিতার সুখ;
শক্তের মাঝে গুপ্ত অঝোর স্নিগ্ধ রসের নির্ঝর,
আত্মপ্রসাদে পূর্ণ রয়েছে বুক।

আর্ত জীবের দুঃখ দেখিয়া অন্তরে আমি উন্মাদ,
নিষ্কাম সেবা সাধ হয় শুধু দিতে;
পূর্ণানন্দে অনন্ত কাল বর্ষিয়া প্রেম নির্বাধ,
নিজের মুক্তি ভুলি' রবো ধরণীতে।

সম্পদ আর সঙ্গ আমার সজ্জনে আর দুর্জনে,
সমভাবে পারে পরাণ ভরিয়া নিতে;
শুদ্ধ সুচির সমাহিত সুখ সঞ্চারি' হেথা নির্জনে,
শান্তি ঢালিব মুক্তি-ব্যাকুল চিতে।

সমালোচনা

উত্তরস্যাং দিশি: স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩; পৃঃ ৯২, সচিত্র। মূল্য—তিন টাকা।

ভারতবাসীর চিরদিনের ভক্তিতীর্থ দুটি—কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ—প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন 'উত্তরস্যাং দিশি'—উত্তর দিকে দেবতাত্মা হিমালয়ের বুকে। দুর্গম পথের সব দুঃখ কষ্ট ধন্য হ'য়ে ওঠে ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসায়। তাই যুগে যুগে ভক্ত, সাধক, সন্ন্যাসীরা এই তীর্থপথে চলেছেন দেবদর্শনে। স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দও একদা এই পথে গিয়েছিলেন; তীর্থদর্শনের পুণ্য প্রশান্তি হৃদয়ে বহন ক'রে এনেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্মৃতি ও অনুভবের বাঙ্ময় প্রকাশ 'উত্তরস্যাং দিশি' পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছে হিমালয়ের বার্তা। সমগ্র ভ্রমণ কাহিনীটির ভাষায় যেমন স্বচ্ছতা, অনুভূতিতে তেমনি তন্ময়তা। বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও মানসভ্রমণ সম্পূর্ণ হ'য়ে যায়।

আধুনিক ভ্রমণসাহিত্যে না-ভ্রমণ না-উপন্যাস জাতীয় যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়, তার পাশাপাশি এই ভ্রমণ-কাহিনীটির আশ্চর্য সরলতা ও বস্তুনিষ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। —প্রণব ঘোষ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব: স্বামী সারদেশানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শিলং। পৃষ্ঠা ৪০১, ডিমাই। মূল্য—৮৲।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন লইয়া নানাদিক হইতে গবেষণা শুরু হইয়াছে, ইহা খুবই আশার কথা, আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে আত্মসচেতন করিতে ইহা অনেকখানি সহায়তা করিবে।

আলোচ্য গ্রন্থটি সাধারণ গবেষণা-গ্রন্থ নহে, ইহা প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ (বিশেষতঃ সর্বজনমান্য 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত') অবলম্বনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অনুধ্যান; প্রয়োজনীয় সমালোচনা সহ আধুনিক ভাবে ও ভাষায় গ্রন্থখানিকে লেখক এ-যুগের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক সন্ন্যাসী, তাই শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের দিকটিতে স্বভাবতই একটু জোর দিয়াছেন। লেখক সাধক, তাই জীবনালেখ্যের স্তরে স্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনার অবস্থাগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখক সমালোচক, তাই শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল ভ্রমাত্মক ধারণা প্রচলিত, যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ সমালোচনা সহায়ে তিনি সেগুলি দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রস্তাবনায় সেগুলির প্রারম্ভিক আলোচনা পাঠককে পুস্তকটি পড়িতে আকৃষ্ট করিবে। পুস্তকের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি-চয়ন গ্রন্থকারের চিন্তাসূত্রে গ্রথিত হইয়া মাল্যের আকার ধারণ করিয়াছে। গরুড়স্তম্ভের নিকট শ্রীচৈতন্য ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ—এই দুইখানি ত্রিবর্ণ চিত্র পুস্তকখানির অলংকার। এরূপ পুস্তকের প্রুফ সংশোধন আরও যত্নসহকারে করা উচিত ছিল। ৩৬৭ পৃঃ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতিতে তিনটি ছাপার ভুল চোখে পড়িল।

The Message of Vivekananda—Published by Advaita Ashrama, 4, Wellington Lane Cal 13. Pp. 26. (Pocket size), Price 25 n.P.

ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, আত্মবিশ্বাস, কর্ম, জ্ঞান, সেবা, হিন্দুধর্ম, ভারত, গীতা, বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বাছা বাছা কয়েকটি উদ্দীপনাময়ী উক্তি সংগ্রহ করিয়া পুস্তিকাটি গ্রথিত হইয়াছে। পকেট সাইজ হওয়ায় এবং প্রচ্ছদপটে স্বামীজীর একটি সুন্দর ছবি থাকায় পুস্তকখানি আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা: শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে ১৫ই হইতে ২২শে ফাল্গুন উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই কয়দিবস বিশেষ পূজা, ভজন-সঙ্গীত, রামায়ণ-গান, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত পাঠ ও আলোচনা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় বিচারপতি এস্, মোর্শেদের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকগণ অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতিও একটি মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল ভাষণ দেন। সভার প্রারম্ভে মিসেস্ মোর্শেদ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করেন, তৎপূর্বে মিশনের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হয়।

তমলুক: রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়, সন্ধ্যায় ঠাকুরের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যকুমার সেন ও শ্রীহরিদাস মজুমদার।

পরে ১৯শে মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত উৎসব উপলক্ষে বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, হোম, পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কথকতা করেন। ৩০০০ নরনারীকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়। এতদ্ব্যতীত ভজন, কীর্তন, 'শ্রীশ্রীকথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ প্রভৃতি হইয়াছিল। উৎসবের কয়দিন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা করেন।

এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী অন্নদানন্দের প্রারম্ভিক ভাষণের পর কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বলেন। সুরশিল্পী শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী ও তাঁহার সম্প্রদায় ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দ দেন।

আসানসোল: গত ১৩ই হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণের সহিত বিভিন্ন দিনে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, অধ্যাপক গোপিকানাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক হরিহর উপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ভবরঞ্জন দে, স্বামী জপানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী প্রত্যয়ানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বেতারকথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথকতা, বেতারশিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্রের সঙ্গীত, কলিকাতার পাঁচালী-ভারতী-সংঘের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মলীলা এবং স্থানীয় গৌরাঙ্গ-নাম প্রচার-সমিতির কীর্তন, ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দান করে। উৎসবের পঞ্চম দিনে তিনসহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, শেষদিবসে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বার্নপুরের ইস্পাতকারখানার জেনারেল ম্যানেজার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। বিভিন্ন বক্তা এই দিন স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতির প্রচারকার্য

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড শহরে এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র। গত ২৮শে ফেব্রুআরি কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। সমিতির মন্দিরে ঐদিন বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান এবং সমবেত সভ্য ও বন্ধুগণকে হিন্দুমতে মধ্যাহ্ন ভোজন করানো হয়। স্বামী ঋতজানন্দ ফেব্রুআরি মাসে এই কেন্দ্রে 'মনের প্রকৃতি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং প্রতি মঙ্গলবারে নারদভক্তিসূত্রের ক্লাস করেন। বাকী দুইটি রবিবারে বক্তা ছিলেন স্বামী বন্দনানন্দ। বিষয়: 'যোগপন্থা' ও 'দৈবী করুণা'। এই মাসের তিনটি বৃহস্পতিবার স্বামী বন্দনানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্লাস লইয়াছিলেন।

মার্চমাসের রবিবাসরীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'ভক্তের জীবন-ধারা,' 'নিজের চেষ্টা ও দৈবী কৃপা' 'ঈশ্বরানুসন্ধান,' 'কর্মজীবনে বেদান্ত'। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতা দেন স্বামী প্রভবানন্দ। প্রথমটির বক্তা ছিলেন স্বামী ঋতজানন্দ এবং তৃতীয়টির স্বামী বন্দনানন্দ। এই মাসেও 'নারদভক্তিসূত্র' ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্লাস তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হলিউড হইতে প্রায় আশি মাইল উত্তরে সমুদ্রতটে এবং পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত স্যাণ্টা বারবারা শহরে বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও প্রতি রবিবারে ধর্মবিষয়ক ভাষণ এবং প্রতি সোম বা মঙ্গলবারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা করেন স্বামী প্রভবানন্দ। ফেব্রুআরি মাসে স্বামী প্রভবানন্দজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল--'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী'; স্বামী ঋতজানন্দ—'কর্মতৎপরতা বনাম ধ্যান-নিষ্ঠা' ও 'ধর্মমতসমূহের মিলনভূমি' এবং স্বামী বন্দনানন্দ 'যোগ এবং উহার প্রণালীসমূহ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। মার্চ মাসে বক্তৃতার বিষয় ছিল: স্বামী প্রভাবনন্দ—'পুরুষকার ও কৃপা', স্বামী বন্দনানন্দ—'কর্ম ও মুক্তি' এবং 'ইচ্ছা ও জ্ঞান', স্বামী ঋতজানন্দ—'ধ্যানের প্রণালী'। উভয় মাসেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা করেন স্বামী প্রভবানন্দ।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৫৪,১৭৫ ('৫৮ খৃঃ ১,৪২,৫৮৬); এক্স-রে, চক্ষু, দন্ত, E. N. T. বিভাগে রোগীর সংখ্যা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮,২৮৩ রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশু স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোট ১,০৭,১৭৮ জনকে দুধ দেওয়া হয়। রোগনির্ণায়ক লেবরেটরিতে ৮১৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা করেন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির ক্রমবিস্তারে সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ-মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের তিনটি প্রধান বিভাগ: কলিজিয়েট, টেকনিক্যাল ও মাধ্যমিক। আলোচ্য বর্ষের শেষে তিনটি বিভাগে যথাক্রমে ৩৭, ৯৬ ও ১৭০ জন ছাত্র ছিল। সব বিভাগেরই ছাত্রগণ বৃত্তি বা সাহায্য লাভ করে। পরীক্ষা-ফল প্রশংসনীয়। আলোচ্য

বর্ষের উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়রিং ডিপ্লোমা-কোর্স শিক্ষাদানে ভারত সরকারের অনুমোদন-লাভ।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার): প্রতি শনিবার নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
১৯৫৯—নভেম্বর:	
কঠোপনিষৎ	স্বামী জীবানন্দ
ডিসেম্বর:	
কঠোপনিষৎ	স্বামী জীবানন্দ
উপনিষদের মাধুর্য (শুক্রবার)	„ রঙ্গনাথানন্দ
ভগবদ্‌গীতা	„ দেবানন্দ
কঠোপনিষৎ	„ জীবানন্দ
শ্রীশ্রীমা ও স্বামী শিবানন্দ	„ জ্ঞানাত্মানন্দ

বিষয়	বক্তা
১৯৬০—জানুআরি:	
স্বদেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ	স্বামী সুন্দরানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের কথা	„ ঈশানানন্দ
ভাগবত	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ	স্বামী মহানন্দ
ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ফেব্রুআরি:	
ভাগবত	স্বামী বোধাত্মানন্দ
গীতায় কর্মযোগ	„ জ্ঞানাত্মানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ	„ ধ্যানাত্মানন্দ
রামায়ণ	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী
ধর্ম ও সংস্কৃতি	অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

ব্রহ্মচারী তারক: আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ১৬ই এপ্রিল বেলা ১২-৪৮ মিঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে সোসাইটির একনিষ্ঠ কর্মী ব্রহ্মচারী তারক ইষ্ট-লোকে গমন করিয়াছেন, কিছুকাল ধরিয়া তিনি হাঁপানি ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। কাশীমিত্র ঘাটে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

১৯০১ খৃঃ ২৪ পরগনার অন্তর্গত গড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই পিতৃবিয়োগের পর তারক কলিকাতায় মাতুলালয়ে পালিত হন। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে পাঠকালে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯২০ খৃঃ মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি সোসাইটির কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দীর্ঘ ৪০ বৎসর কলিকাতা নগরীতে ও তাহার উপকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) মন্ত্রশিষ্য তারক মঠের প্রবীণ সাধুদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। সোসাইটি পরিচালন-ব্যাপারে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী আত্ম-বোধানন্দজী সর্বদা তাঁহাকে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই একনিষ্ঠ সেবকের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীমৎ স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য মন্মথনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে মার্চ ৮৬ বৎসর বয়সে পাঞ্জাবে ফাগোয়ারায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস-ভবনে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিগত দুই মাস যাবৎ তিনি শোথ ও হৃদ্‌রোগে

ভুগিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রায় সকল সন্ন্যাসী শিষ্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

কার্যোপলক্ষে এলাহাবাদে অবস্থান-কালে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সহিত পরিচিত হন ও কতিপয় বন্ধু মিলিয়া সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেজর বি. ডি. বসু ও তাঁহার সুপণ্ডিত ভ্রাতা উক্ত ক্লাবের সভ্য ছিলেন।

কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিতও তিনি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন ও সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আর্ত নারায়ণের সেবা করিয়া ছিলেন।

শেষজীবন তিনি ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধুগণ তাঁহার নিকট মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার স্মৃতি-কথা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে শান্তি লাভ করুক—ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

ডক্টর রাজশেখর বসু : আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি, গত ২৭শে এপ্রিল বুধবার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ডক্টর রাজশেখর বসু ('পরশুরাম') ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় বকুলবাগান রোডে তাহার বাস-ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

'পরশুরাম' ছদ্মনামেই পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সুপরিচিত এই তীক্ষ্ণধী বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন লেখক বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক স্যাটায়ার রচনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আবার গুরুগম্ভীর রচনাতেও তাঁহার সমান কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার 'কজ্জলী', 'গড্ডালিকা', 'হনুমানের স্বপ্ন' ও 'আনন্দীবাই' একদিকে হাসির সহিত চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছে; আবার তাঁহার 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র সারানুবাদের সহিত 'চলন্তিকা' ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে।

১৯৫৫ খৃঃ রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৫৮ খৃঃ সাহিত্য আকাদামি পুরস্কার তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার স্বীকৃতি, এতদ্ব্যতীত ১৯৫৬ খৃঃ তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম. এ (১ম বিভাগে ১ম) পাস করিয়া তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ররায়-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমি-ক্যালের কার্যে যোগদান করেন; বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্মনিষ্ঠার বলে ক্রমশঃ তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করিয়া সসম্মানে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত ইহার অন্যতম পরিচালক ছিলেন (member of the Board of Directors)। অবসর গ্রহণের পর বৈজ্ঞানিকের অন্তঃস্থিত সাহিত্যের ফল্গুধারা নিয়মিত ভাবে বহিতে থাকে। সাহিত্যিক ও আভিধানিক রূপে বাঙালী তাঁহাকে চিরকাল মনে রাখিবে। আমরা তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা) : গত ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এক বিশেষ ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি) : গত ২০শে চৈত্র স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম, মধ্যাহ্নে সমবেত ২৫০০ নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে জনসভায় স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও সেবাধর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

সিন্দ্রি : গত ২৬শে হইতে ২৮শে মার্চ স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী যুক্তানন্দ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন।

আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) : স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়, এতদুপলক্ষে স্বামী যুক্তানন্দ প্রত্যহ প্রায় ৪০০০ শ্রোতার সমক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন।

কোচবিহার : গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই বৈশাখ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিন দিনই স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রত্যহ প্রায় ৪ হাজার নরনারীর উপস্থিতিতে যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। সভান্তে প্রতিদিনই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন জনসাধারণকে আনন্দ দান করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিন প্রায় ৩ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

হায়দ্রাবাদ : ১৯শে মার্চ সেকেন্দ্রাবাদ মহবুব কলেজে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ইংরেজীতে স্বামীজীর সম্বন্ধে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দেন। স্বামী তপস্যানন্দ তেলুগুতে 'স্বামীজীর জীবনে ভক্তির সাধনা' সম্বন্ধে বলেন। স্বামী কৈলাসানন্দজী 'স্বামীজীর অতিমানবিক শক্তি' বিষয়ে বলেন।

২০শে মার্চ (রবিবার) হায়দ্রাবাদ বেগমপেটে বিশেষ পূজা হোমের পর ১৫০০ দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন করানো হয়, শ্রীকৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রীর 'কৃষ্ণপ্রেম' ব্যাখ্যানের পর শ্রীনটেশ আয়ার 'গোটুবাদ্যম্' শোনান। স্বামী কৈলাসানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বেগমপেট রামকৃষ্ণ মঠের কার্যবিবরণী পঠিত হইলে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী তপস্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন। অন্ধ্রের মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রমৌলি 'শক্তিপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

২১শে মার্চ সেকেন্দ্রাবাদ মহবুব কলেজে শিক্ষকসমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় কলেজের অধ্যক্ষ সকলকে জানান, গত শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন এই হলে বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামী কৈলাসানন্দ ও শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ত্যাগ ও সেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিক্ষকগণকে শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী হইতে বলেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংবাদ

ম্যালেরিয়া : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) দ্বাদশবার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে ঘোষণা করিয়াছেন : পৃথিবীর ২৮০ কোটি লোকের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার ভয়ে জীবন ধারণ করে। ১৯৫০ খৃঃ পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। ১৯৫৫ খৃঃ ৩০% কমে, ১৯৫৭ খৃঃ আরও ২০% কমে। এই সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ হইতে কমিয়া ১০ লক্ষে দাঁড়ায়।

১৯৬১ খৃঃ পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থায় ৮০ লক্ষ ডলার প্রয়োজন। কয়েকটি দেশের হিসাব :

দেশ	রোগভয়ে ভীত বা রোগাক্রান্ত (১৯৫৯)	প্রতিরোধের জন্য ব্যয় (১৯৪৯-৫৯)	ম্যালেরিয়ার জন্য বার্ষিক আয়ের ক্ষতি
আফগানিস্থান	১০ লক্ষ	৭.৫ লক্ষ ডলার	২ কোটি ডলার
সিংহল	০ (দূরীভূত)	৫০ " "	৩ " "
ভারত	৫ কোটি	১৯ কোটি "	৫০ " "

(দূরীকরণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়)

বৈরাগ্যশতকম্

[শ্রীভর্তৃহরি বিরচিত : স্বামী ধীরেশানন্দ অনূদিত]

পরিচিতি : 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থখানি মুমুক্ষু সমাজে পরম সমাদৃত। ইহাতে সর্বশুদ্ধ এক শতটি শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে লিখিত। সংসারের অসারতা, আপাতরমণীয় ভোগসুখের তুচ্ছতা, তথাকথিত নাম, যশ প্রতিষ্ঠাদির অন্তঃসারশূন্যতা এই গ্রন্থে মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকর্তা ভর্তৃহরি জনশ্রুতি-মতে—খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিক্রমাদিত্য, যাঁহার নামে বিক্রমাব্দ প্রচলিত। কথিত আছে যে যৌবনে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াও বিলাসভোগের নিমিত্ত রাজকার্য পরিচালনার ভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমের উপর অর্পণ করিয়া তিনি আকণ্ঠ বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত হন।

কিন্তু অচিরকাল মধ্যে বিলাসের নগ্নমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করত তিনি পরম বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার তপস্যা-জীবন উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে অতিবাহিত হয়। অদ্যাবধি উজ্জয়িনীর 'ভর্তৃহরি গুম্ফা' নামক গুহা তাঁহার তপস্যা-স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থখানি তাঁহার এই তপস্বী জীবনেই লিখিত।

তৃষ্ণা-দূষণম্

চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্ভারমুচ্চাটয়ং
শ্চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ॥১

শিরোপরি অলঙ্কাররূপে শোভিত মনোহর চন্দ্রকলার স্নিগ্ধচপল কিরণে যাঁহার কলেবর সমুদ্ভাসিত, লীলাচ্ছলে যিনি কামকে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছেন, সর্বলোকের কল্যাণবিধানে যিনি প্রকট, যিনি জীবের অন্তরের মোহরূপ অজ্ঞানের গুরুভার সমূলে নাশ করিয়া থাকেন, যিনি বিমল জ্ঞানের প্রকাশক, সর্বপাপহারী সেই ভগবান্ শিব যোগিগণের মনোগৃহে সদা আপন মহিমায় বিরাজিত থাকুন।১

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেষ্বাশংকয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি॥২

ধনলোভে আমি অনেক দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল লাভ হয় নাই। জাতি ও কুলের উপযুক্ত মর্যাদা বিসর্জন দিয়া ধনাঢ্যগণের বহু পরিচর্যা করিয়াছি, তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে (তাহাদের নিকট হইতেও কিছুই পাই নাই)। ভয়চকিতচিত্তে উচ্ছিষ্টভোজী বায়সের ন্যায় পরগৃহে অপমানের সহিত প্রদত্ত অন্নপিণ্ডদ্বারা উদর পূরণ করিয়াছি; তথাপি হে তৃষ্ণে! পাপকর্মপ্রবৃত্তিকারিণী তুমি আজও তৃপ্ত হইলে না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছ?২

উৎখাতং নিধিশংকয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্॥৩

গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় আমি কত ভূমিতল খনন করিয়াছি, সুবর্ণপ্রাপ্তির লোভে পর্বতের অনেক ধাতু ওষধিযোগে উত্তপ্ত করিয়াছি, ধনসম্পদের ইচ্ছায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে কত কষ্টে সাগর উল্লঙ্ঘন করত দেশান্তরে গমন করিয়াছি। অনুবর্তনাদি (অনুগমনাদি) প্রযত্ন দ্বারা নৃপতিদিগের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছি এবং মন্ত্রসিদ্ধিবাসনাবশে মন্ত্রজপাদিতে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া কত রাত্রি প্রেতালয় শ্মশানভূমিতে অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু হায়! এত কষ্ট করিয়াও আমার একটি কানা কড়িও লাভ হয় নাই। হে বিষয়তৃষ্ণা! এখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।৩

খলালাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা।
কৃতো বিত্তস্তম্ভ-প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে মোঘাশে কিমপরমতো নর্তয়সি মাম্॥৪

হায়! স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্জনসেবাতৎপর হইয়া তাহাদের কত নীচ ভাষণ অতিকষ্টে আমি সহ্য করিয়াছি ও তাহাদের কটুভাষণ জনিত অন্তরের অশ্রু সযত্নে নিরোধ করিয়া উদাসমনে বাহিরে তাহাদের নিকট কপট উৎফুল্লভাব দেখাইয়াছি, ধনমদে অন্ধ পুরুষদিগের নিকট করজোড়ে বিনয়, শ্রদ্ধা, নমস্কারাদিও প্রদর্শন করিয়াছি (কিন্তু লাভ কিছুই হয় নাই)। হে ব্যর্থ তৃষ্ণা ইহার পরও কি তুমি আমাকে আরও নাচাইতে চাও?।৪

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিং নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসজ্ঞমনসাং
কৃতং মানব্রীড়ৈ র্নিজগুণকথাপাতকমপি॥ ৫

কমলপত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল, নশ্বর এই প্রাণরক্ষার জন্য সদসৎ-বিচারবিহীন হইয়া কোন্ দুষ্কর্ম করি নাই? (—অর্থাৎ সকলই করিয়াছি)। হায়! ঐশ্বর্যমদে মত্ত ধনীদের কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের সম্মুখে নির্লজ্জভাবে স্বগুণকথনরূপ মহাপাতকও করিয়াছি (কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র লাভ হয় নাই)।৫

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপন-ক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিতপ্রাণৈর্ন শম্ভোঃ পদং
তত্তৎ কর্ম কৃতং যদেব মুনিভি স্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতাঃ॥ ৬

অপমানিত হইলে অপরকে ক্ষমা করিয়াছি বটে, কিন্তু উহা চিত্তের অনুদ্বেগবশে করি নাই; (প্রতিকারের অক্ষমতা বশতই করিয়াছি)। গৃহসুখ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু (উহা তুচ্ছত্ববুদ্ধিসহায়ে) স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে করি নাই। (দেশান্তরভ্রমণকালে) কত দুঃসহ বায়ু, শীতাতপজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু ক্লেশভয়ে চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্যা করি নাই। অহর্নিশি বিত্তচিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু প্রাণনিয়মন করত শ্রীশম্ভুপদ চিন্তন করি নাই। বিবেকী মুনিগণ যাহা যাহা

অর্থাৎ যে দুঃখ সহন ও তপশ্চর্যাদি করিয়া থাকেন, (বাহ্যতঃ) সে সমস্ত করা সত্ত্বেও (অযথাচরণহেতু) যথার্থ ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি (—ফললাভ কিছুই হয় নাই)। ৬

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥ ৭

আমরা বিষয়ভোগ করি নাই, বিষয়ই আমাদিগকে ভোগ করিয়াছে অর্থাৎ দুরন্ত বিষয়চিন্তা আমাদের মন প্রাণ অধিকার করিয়া (আমাদিগকে তাহার দাস করিয়া ফেলিয়াছে)। ব্রত, উপবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্যা আমরা কখনও করি নাই, বরং তাপত্রয় দ্বারা সতত-সন্তাপিত হইয়া আমরাই দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছি। কাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—কারণ উহা অনন্ত, নিত্যবর্তমান, আমরাই আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে গতপ্রায় হইয়াছি। বিষয়বাসনা আমাদের একটুও শিথিল হয় নাই, বিপরীতক্রমে বরং আমরাই তৃষ্ণা দ্বারা জর্জরিত হইয়া শিথিলাঙ্গ হইয়াছি। ৭

বলীভির্মুখমাক্রান্তং পলিতেনাংকিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে॥ ৮

জরাবশতঃ আমার মুখচর্ম কুঞ্চিত হইয়াছে, মস্তকের কেশরাশি ধবলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, করচরণাদি সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হায়! বিষয়তৃষ্ণাই কেবল নিত্য নবীন শক্তিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ৮

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো মূঢ়ঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ॥ ৯

আমার বিষয়ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে। পরাক্রম, উদ্যম প্রভৃতি আর নাই বলিয়া আমার পুরুষত্বাভিমানও বিনষ্ট হইয়াছে, (অথবা পূর্ববৎ লোকের সম্মানও আর পাই না), প্রাণপ্রিয় সমবয়সী বন্ধুগণ (অথবা প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ সসম্মানে জরাপ্রাপ্তিরূপ দুর্দশার পূর্বেই) স্বর্গ গমন করিয়াছেন, বৃদ্ধাবস্থায় কম্পিত পদে এখন আমি কেবল যষ্টির সাহায্যে আসন হইতে উত্থান করিতে সমর্থ, আমার নেত্রদ্বয়ও ঘনতিমিররোগে (ছানিতে)দৃষ্টিশক্তিবিহীন, তথাপি অহো! আমার এই মূঢ় শরীর মৃত্যুভয়ে শিহরিয়া উঠে, ইহাই আশ্চর্য। ৯

আশানাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥ ১০

আশা-নাম্নী যে নদী, মনোরথরূপ তাহার সলিল তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে পরিপূর্ণ, তাহাতে বিষয়প্রীতিরূপ কুম্ভীরাদি রহিয়াছে, নানা বিতর্করূপ পাখী সেখানে উড়িতেছে ও তরঙ্গাঘাতে তটস্থিত ধৈর্যরূপ মহাবৃক্ষ উৎপাটিত হইতেছে মহাবর্তসঙ্কুলা সুদুস্তরা, অতিগভীর ও বিশাল দুশ্চিন্তারূপ তটবিশিষ্টা এই নদীর পরপারে (জ্ঞানরূপ তরণী সহায়ে) গমন করত শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ১০ [ক্রমশঃ]

কথাপ্রসঙ্গে

'বাঙালীর কর্মসংস্থান'

মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটনাবহুল কলিকাতা নগরীতে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার একদিকে আশঙ্কা এবং অপরদিকে আশা—আর মধ্য স্থলে আছে সংগ্রাম ও সাধনা।

কলিকাতায় সভাসমিতি শোভাযাত্রা তো লাগিয়াই আছে। ইহার অধিকাংশই কোন না কোন দলের আয়োজিত। কিন্তু বাংলাদেশে বেকার বাঙালীর কর্মসংস্থানের দাবী লইয়া এই যে সভা, ইহা কোন দলীয় বা রাজনীতিক সভা নহে; ইহাকে প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইহা একটি জাতির জীবন-মরণের সমস্যা।

বাঙালীর সমাজ ও সংসার অনেক দিন হইতেই ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রসাদপুষ্ট বাঙালীর বিরাট একান্নবর্তী পরিবার আজ ইতিহাসের পাতায়, যৌথ পরিবারও লুপ্তপ্রায়। এখন একক পরিবারের সীমিত সংসার; তাহাও চালানো কঠিন। একটির উপর আর একটি সন্তানকে মানুষ করিবার জন্য স্বামী স্ত্রী—উভয়কে চাকরির সন্ধানে বাহির হইতে হয়! সদুপায়ে বারো ঘণ্টা খাটিয়া কেহ বা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। তাহারই পাশে দেখা যায়, আর একজন বাড়ীর পর বাড়ী তুলিতেছে, গাড়ীর পর গাড়ী কিনিতেছে। অসম সুযোগসুবিধাপূর্ণ এই অবস্থায় বাঙালী কি করিয়া বাঁচিবে? চারিদিকে যেরূপ দেখিতেছে শুনিতেছে, সে-ও যদি নিজেকে তাহার অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারে, তবে তাহাকে নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হইতে হইবে। কেহ তাহাকে রক্ষা করিবে না।

সকলে বলে, বাঙালী ভাবুক জাতি। এতদিন বাঙালী সেটাকে সুনাম বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু আর তাহা করিতে পারিতেছে না। তাহার উদার ভাবের মোহ কাটিতেছে।

যথাসম্ভব নিজ নিজ রাজ্যে অধিবাসিগণ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জন করিয়া জীবন যাপন করিবে—ইহাই কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ। প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসীর এই অধিকার আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ (রাজ্য) গুলি এ বিষয়ে সচেতন। যে বাঙালী ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তদুদ্দেশ্যে প্রায় প্রতি পরিবার অন্ততঃ একটি সন্তান বিসর্জন দিয়াছিল, সে কিন্তু নিজের ঘর দেখিতে শিখে নাই।

আজ ভাবুকের ভুল ভাঙিয়াছে। স্বপ্ন টুটিয়াছে। ঘুম ভাঙিয়া সে দেখিতেছে ছিন্নভিন্ন নিজের ঘরে তাহার মাথা গুঁজিবার জায়গাটুকুও নাই, দুবেলা দুমুঠা খাইবার সংস্থানও আজ তাহার নাই।

আজিকার নবজাগ্রত বাঙালী জনতার আন্দোলন বৈদেশিক শাসনযন্ত্র বিকল করিবার জন্য নয়, স্বদেশী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যথার্থ কল্যাণ-চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। বেকার-সমস্যা আজ বাঙালী জাতির জীবনীশক্তি শুষিয়া লইতেছে, তাহার জাতীয় জীবন ধ্বংস করিয়া দিতেছে। বেকার-সমস্যার জন্যই বাংলাদেশ আজ 'সমস্যার প্রদেশ'! এই জন্যই যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল, প্রৌঢ়গণ হতাশায় পূর্ণ, বালকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! ইহাকে কখনই একটি স্বাস্থ্যকর

অবস্থা বলা চলে না। যাঁহারা সমগ্র দেশের কল্যাণকামী, তাঁহারা কখনও কোন একটি প্রদেশের অকল্যাণ চিন্তা করিতে পারেন না। ব্যষ্টির কল্যাণের উপরই সমষ্টির কল্যাণ নির্ভর করে। সমগ্র শরীরের যত্ন লওয়ার অর্থ হাত-পায়েরও যত্ন লওয়া; বিস্ফোটকযুক্ত আঙুলটিকে অবহেলা করিয়া, অপরিচ্ছন্ন রাখিয়া হাত-পা বা শরীরকে সুস্থ সবল রাখা যায় না।

* * *

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অবশ্যই খাদ্য চাই, খাদ্যের জন্য চাই কাজ। ক্রমবর্ধমান লোক-সংখ্যার উপযোগী কর্মসংস্থান করাই কল্যাণ-রাষ্ট্রের কৃতিত্ব। হয় সরকারীভাবে, নয় আধা-সরকারীভাবে কর্মসংস্থান করা আধুনিক 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের' রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান যুগে বেকার একটি বিশ্বসমস্যা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং উত্তরোত্তর যন্ত্রের ব্যবহার ইহার প্রধান কারণ। সেদিক দিয়া প্রথম হইতে সমস্যাটিকে অন্ততঃ জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়া পরিকল্পনা-অনুযায়ী প্রাদেশিক ভিত্তিতে সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে সমস্যা এত জটিল হইয়া উঠে না।

সপ্তাহব্যাপী 'বাঙালীর কর্মসংস্থান' আন্দোলনের শেষদিনের জন-সভায় অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তদনুযায়ী আত্মরক্ষা-মূলক নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:

(১) বাংলা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৩০ হইতে ৪০ (!); এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে আগামী ২০ বৎসর ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে শতকরা অন্ততঃ ৮০জন বাঙালী লওয়া হউক। (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল কাজই বাঙালীর জন্য সংরক্ষিত থাকুক।

সভায় আরও দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে: (১) কর্মহীন বাঙালী যুবককে কাজ দিতে হইবে, নতুবা ৬০৲ বেকার ভাতা! (২) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করা হইয়াছে—উচ্চশ্রেণীর চাকুরীতে যোগ্য বাঙালীকে সংখ্যানুপাতে নিযুক্ত করা হউক, এবং তাঁহারা সহানুভূতিশীল হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নশ্রেণীর চাকুরীতেও বিভিন্ন স্থানে বেকার বাঙালী কিছু কাজ পাইতে পারে।

এই দাবিকে প্রাদেশিকতা বলা চলে না। ইহা যে কোন প্রদেশের ন্যায্য দাবী।

* * *

প্রশ্ন উঠিতে পারে—সহসা বাঙালীর মধ্যে এত বেকার দেখা দিল কেন? চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—বাঙালী অলসপ্রকৃতি, বাঙালী শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারে না। এই সমস্যা লইয়া আজকাল অনেকে চিন্তা করিতেছেন। পরিসংখ্যানমূলক গবেষণাও চলিতেছে, যদিও উহা এখনও অসম্পূর্ণ। যাঁহারা বলেন বাঙালী অলস, তাঁহারা বাঙালী চাষীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; রৌদ্রে বৃষ্টিতে, বাংলার মাটি চাষ করা কি শ্রম-সাধ্য কাজ নহে? কলিকাতার বাহিরে—হাটে বাজারে গঞ্জে মোট বহন করে, নৌকা চালায়, কাঠ কাটে এই চাষীরাই—চাষের অবকাশে।

কলিকাতায় ও বৃহত্তর কলিকাতার কারখানায়, হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে, খিদিরপুরের ডকে উদ্বাস্তু বাঙালীও যে কাজ পায় না—তাহার কারণ শুধু মাত্র শ্রমবিমুখতা নয়, তাহার কারণ আরও জটিল। সম্প্রতি হলদির বন্দরের এবং বার্নপুর বা দুর্গাপুরের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন—এসব ব্যাপারে 'সর্দার' ও 'ঠিকাদারে'র ক্ষমতা কতখানি, স্থানীয় লোকের দাবি কিভাবে অগ্রাহ্য হয়।

বাঙালীর শক্তি সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচির উপযোগী কর্ম ও পরিবেশ যদি বাংলাদেশে না

থাকে, তবে তাহা সৃষ্টি করা তাঁহাদেরই কর্তব্য, যাঁহারা দেশের আইন প্রণয়ন করেন এবং সেই আইন কার্যে পরিণত করেন।

* * *

বাংলা দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বর্তমান বেকার-সমস্যার যে সকল কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেগুলি জানিলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।

(১) জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙালীকে মাটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যবিত্তগণ জমির আয় ঠিক রাখিয়া শহরে কিছু উপার্জন করিত। দরিদ্র কৃষক কখনও শহরে মজুর খাটিতে আসিত না। চাষের পাশেই বাস—ইহাই ছিল বাঙালী জীবনের মূল সূত্র।

(২) 'ঘরমুখো' বাঙালী—ইহা তাহার গুণ না দোষ, তাহাও আজ বিচার্য। গৃহমুখীনতাই সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রধান উপাদান। 'কৃষ্টি' ও 'কৃষি' শব্দ সমধাতুক, শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়—পাশ্চাত্য ভাষাতেও (তুলনীয় : culture and agriculture)। ক্ষেত খামারের পাশেই সভ্যতা চিরদিন গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং কারখানা বা কয়লাখনির পাশে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

(৩) বাঙালী বহুদিন চেষ্টা করিয়াছে মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে। ভূমি-সংস্কার আইন ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত বাঙালীকে শহরে টানিয়া আনিয়া একান্তভাবে চাকুরীনির্ভর করিতেছে। তাহার ভূমি গিয়াছে, পরিবর্তে ব্যবসার মূলধনও সে পায় নাই, তাই কর্মসংস্থানের দাবি এত তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে।

(৪) দেশ-বিভাগের দরুন যে পরিমাণ লোক পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, সে পরিমাণ লোক ওদিকে যায় নাই। উপরন্তু বহু বিদেশীও এদেশে কাজ করিয়া এদেশের অধিবাসীদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতেছে।

(৫) পরিশেষে বাংলাদেশে অবাঙালী (ভারতীয় এবং অভারতীয়) ব্যবসায়ীরা কল্পিত বাস্তব নানা কারণে ক্রমশ বাঙালী কর্মী ছাঁটাই করিতেছেন। ইহাও বর্তমানে সমস্যাকে জটিলতর করিয়াছে।

রাজনীতি ও প্রাদেশিকতা বাদ দিয়া সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে আর্থনীতিক ও মানবিক ভাবে দেখিতে হইবে। দেশের সন্তান যদি দেশে খাইতে না পায়, কাজ চাহিলে কাজ না পায়, তখন তাহাকে গালি দিলে চলিবে না, তাহাকে কাজ দিতে হইবে; কুটির শিল্পের প্রসার দ্বারা গ্রামেই বহুলোকের কর্মসংস্থান করিতে হইবে। গান্ধীজীর স্বরাজের অর্থ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ্য'—এই কথাই এক সময় প্রচারিত হইত,—তাহার অর্থ প্রত্যেক গ্রামই নিজ নিজ অন্ন বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিবে।

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে সে আদর্শ হয়তো অচল। তবে স্বায়ত্তশাসনশীল প্রদেশের নিজস্ব এলাকায় সুস্থ সবল কর্মপ্রার্থী যুবকের কর্মসংস্থান করা কল্যাণ-রাষ্ট্রেরই একটি প্রধান কর্তব্য—একথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত।

অন্যান্য প্রদেশে এই দাবি যতটা সরব, বাংলাদেশে সে তুলনায় কিছুই ছিল না বলিয়া এই দাবি আজ বেসুরা শুনাইতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য বাঙালীকেও যুগান্তের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে। তাহার বহু দোষ-ত্রুটিই আজ তাহাকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির বৃথা গর্ব ছিল, আজ তাহা ধূলিসাৎ হইতেছে। তাহার চোখের সামনে অপরাপর জাতিগুলি কিভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিলেও বাঙালী শিখিবে উন্নতির প্রথম সোপান একতা, উন্নতির প্রশস্ত পথ পরিশ্রম। ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও পরনির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, এখনও একতাবদ্ধ হইয়া সহযোগিতামূলক পরিশ্রম করিতে পারিলে সমবায়-ভিত্তিক কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের পথে অচিরেই তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

চলার পথে

'যাত্রী'

কলিকাতা মহানগরীর এই আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায় নানা কথা ভাবতে ভাবতে হিমালয়ের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল সেখানকার সেই সুগভীর বনানীর মধ্যকার আশ্রমের কথা-—যেখানে উত্তরদিকে তাকালেই 'নন্দাদেবী', 'আপি', 'পঞ্চচুল্লী', 'কামাথ', 'ত্রিশূল', 'কৈলাস' প্রভৃতি উত্তুঙ্গ পর্বত-শৃঙ্গ শুভ্রতার সৌন্দর্য নিয়ে চোখের সুমুখে ভেসে উঠত। সেখানকার গাছ কলকাতার হাত-পা-কাটা কোন-রকমে মুখশ্রী বাঁচিয়ে রাখা ফুটপাতের সঙ্কুচিত গাছ নয়; শিবপুর বৃক্ষোদ্যানের সাজিয়ে রাখা, তকমা-আঁটা গাছের কুণ্ঠিত বাহারও সেখানে নেই। সেখানে যারা আছে, তারা আদিমতায় বন্য, শ্যামলতায় সুশ্রী, স্থান-সংকুলনের প্রতিযোগিতার মাঝেও দুর্বার, দামাল, অকুণ্ঠ-প্রসারী। এদের নিটোল সৌন্দর্য স্তরে স্তরে সাজানো নয়; কেমন একটা উচ্ছল বেদুইন-স্বাধীনতার মাঝে উদ্দেশ্যহীন সৌষ্ঠবের মনোমুগ্ধকর রূপায়ণে উতরোল। এই আকাশস্পর্শী 'দেওদারের' পাশেই হয়তো আর একদল দেওদার দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই 'সুঁই', তার পাশেই 'ওক্' কিংবা 'চির্' মাথা তুলেছে। দ্বন্দ্বহীন সমাজের নিবিড় বন্ধনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লতাগুল্মকেও এরা হাত ধরে নিয়েছে তুলে—আলোকের আহ্বানে এরা সকলকেই ঊর্ধ্বে তুলে নিতে চায়!

এই হিমালয়-আশ্রমে সন্ধ্যা নামছে। তরল অন্ধকারে একে একে সব কিছু ডুবে গেল। আর সেখানে 'আপি' নেই, 'নন্দাদেবী' নেই—সূর্যের শেষ রশ্মি তাদের মাথা ছুঁয়ে নেমে গেল। এখন সব কিছু মহামৌনতায় একাকার হ'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। এখানকার এই অন্ধকার গভীর গূঢ়, অথচ ভাবৈশ্বর্যে বাঙ্ময়। দূরের কোন এক বৃক্ষপত্রের সামান্য অঙ্গুলি-সঞ্চালনেও মনে হয়, ঐ অন্ধকারের ঘুম ভেঙে যাবে। তাই এর মাঝে সামান্য কোন শব্দও কানে এলে মনে হয়, এক অদ্ভুত তপস্যাপূত কারুণ্যের আর্তনাদে তা ভরা—কাকে যেন না-পাওয়ার নিরুপায় নৈরাশ্যে ক্রন্দনাতুর।

এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে 'নাইটিঙ্গিলের' লীলায়িত মধুছন্দা গানের সঙ্গে যখন হিমালয়ের নিঃসীম স্তব্ধতা কানাকানি করে, তখন মানবের অনাদিকালের মন এই পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনের কথা ভুলে যায়; ভুলে যায় তার 'বাস্তব' বর্তমানকেও। কেবল এক দেহাতীত সত্তাকে সে তখন আলিঙ্গন করে—এমনকি আস্বাদনও করে। তাই আমাদের নিঃসঙ্কুচিত মনে প্রশ্ন জাগে—কেন এ জীবন? কেন মৃত্যু? কেন যাওয়া আসা? সত্যই, এই অপূর্ব অন্ধকার-মহলে ব'সে এ ছাড়া অন্য কোন ছোট কথা মনকে নাড়া দিতে পারে না। মনে হয়, মহাবিশ্বের সঙ্গে মনটি তখন একই কারুণ্যে ও দাক্ষিণ্যে গাঁথা। রূপের সঙ্গে রসের যথার্থ মিলন এই সময়েই ঘনিয়ে ওঠে। তাই 'রসো বৈ সঃ' শুধু রসের আয়োজনে নয়, রূপের ব্যাখ্যানেও যথার্থ সত্য-সন্ধানের নিরিখ জোগায়। ভারতীয় সৌন্দর্যবোধের 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-দৃষ্টি যে রসোপলব্ধির চরম কথা, এ কথা এই পরিবেশেই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

হিমালয়ের বুকে এই সময়ে নিবিড়তার এক ঐশ্বর্যময়তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে। এই ঐশ্বর্যময়তা একান্তভাবে এই সন্ধ্যার দান। আর এই সন্ধ্যাকে ডাকতেই গোধূলির রক্তিম সূর্য আপনার সর্বোত্তম রঙের আল্‌পনা সাজায়। এদিক দিয়ে উষার সঙ্গে সন্ধ্যার প্রভেদ অনেক। উষার মাঝে আছে আলোকের ইঙ্গিত ; সন্ধ্যার মাঝে রয়েছে আঁধারের আবাহন। প্রথমটায় আমাদের চর্মচক্ষে দেখার সীমায়িত উন্মেষ ; শেষেরটিতে মনশ্চক্ষুর মহাজাগতিক দৃষ্টিপাত। উষা মানুষের সুমুখে ভূমির ভৌগোলিক সত্তাকে খুলে ধরে ; সন্ধ্যা ভূমার রসতীর্থের মহাদিগন্তকে করে অবারিত। এক কথায়—উষায় চোখ দিয়ে দেখি, সন্ধ্যায় মন মেলে খুঁজি। তাই উষায় জাগে জীবনের আকুতি, আর সন্ধ্যায় ভাসে অন্তরঙ্গ প্রেরণার সীমাহীন মুক্তি। প্রথমটায় নিজেকে আঁকড়ে ধরি, শেষেরটায় নিজেকে বিলিয়ে দিই। একটায় 'আমি' থাকে, আর একটায় 'আমি' যায় মুছে।

উষা বলে : ওঠো, জাগো, পৃথিবীর নিত্যকার খেলার মধ্যে আবার ফিরে চল। দেখছ না, এই পৃথিবী অন্ধকার থেকে আবার আলোকে জন্ম নিল যে—এখন কি আর অপার্থিব চিন্তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা চলে ? আর সন্ধ্যা বলে : সমস্ত দিবাভাগে নিজের দৈহিক আঁখি মেলে মায়ার অনেক খেলাই তো দেখলে, আর কেন ? এখন এস, আমার এই বিজন তমিস্রায়। এর মাঝে তোমার গর্বের চোখ, দম্ভের বিচার, তোমার চোখে-দেখার অহমিকাকে আর টেনে এনো না, ও-সব দূরে সরিয়ে রেখে তোমার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিকে মেলে ধর দেখি। তাহলেই দেখতে পাবে তোমার স্বরূপটিকে আমার এই অন্ধকারের আয়নায়। মনে রেখো, এই অতন্দ্র অন্ধকারে তুমি জেগে রয়েছ সদা জাগ্রত মহাবিশ্বের সঙ্গে—একেবারে এক হ'য়ে, একাকার হ'য়ে! আমার মাঝে এসেও কি তুমি অনুভব করছ তোমার দেহের খাঁচাটার স্বাতন্ত্র্য, তোমার মাংসের স্থূলবন্ধনের জড়িমা বা তোমার মধ্যকার হৃৎছন্দের ইতিকথাকে ? এখন তোমার সবখানিই তো বিশ্বময়, আবার বিশ্বময়ের সবটুকুই তো তুমি-ময়। মহাজাগৃতির এক নিবিড় স্পর্শ এখন তোমাকে তার আপন হৃদয়ের গভীরতায় জড়িয়ে ধরেছে। তার অরূপ বাঁধনে অতনুসত্তা তার জৈবিক স্পন্দনকে ফেলেছে হারিয়ে। এখনো কি অনুভূত হচ্ছে তোমার বাহ্য সত্তা ? দিবাভাগে তুমি যে দেবতা, যে মন্ত্র, যে গুরু, যে ইষ্টকে বাইরে খুঁজে ফিরছিলে—এই অবাধ অন্ধকারে তোমার অন্তর পূর্ণ ক'রে তাঁরাই তো এখন তোমার মাঝে গেছেন মিশিয়ে। এখন বাইরে দেখার আর কিছু নেই। অন্তরের আপনতায় তোমার ইষ্ট আর তুমি—এক সত্তায় ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, একই পরমস্পর্শে বিলীন!

তাই বলি, চল পথিক, এই ধূলিময় পৃথিবীর আলোক ছেড়ে সন্ধ্যার নির্মোহ মুক্তির মধ্যে বিচরণ করি। মনে নেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—'ঈশ্বরদর্শন কেন হয় না? তা বল্লুম যে লোকমান্য, বিদ্যা, এ সব নিয়ে আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে ছেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। কোলে তুলে নেয়।' তাই এস পথিক মোহের চুসী ফেলে সন্ধ্যার সঞ্জীবিত অন্ধকারে তন্ময় হ'য়ে মাকে ডাকি, চল। আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীশ্রীমায়ের কথা*

স্বামী ঈশানানন্দ

যেখানে ভগবান লীলা করেছেন আর যেখানে তাঁর নাম-গুণ-গান হয়, সেই সব স্থান পুণ্যস্থান—তীর্থ। তীর্থ দু'রকম; ভূমিতীর্থ আর মানস তীর্থ। ভূমিতীর্থ যথা—অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, বৃন্দাবন। আর মানসতীর্থ হ'ল ভক্তের হৃদয়, যাকে ঠাকুর বলেছেন 'ভগবানের বৈঠকখানা'। তাহলে এ যুগের ঠাকুর যাঁকে পূজা করেছেন—যেখানে তাঁর বিষয়ে কিছু বলা হয় ও শোনা হয়, সেও এক তীর্থ।

* * *

শ্রীশ্রীমায়ের লীলা সংবরণের পর একবার কাশীতে প্রাচীন সাধুরা স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন, 'আপনি মায়ের বিষয় লিখে রাখলে পরবর্তী কালের মানুষ জানতে পারবে মা কি ছিলেন। আপনি ঠাকুরের কথা লিখে জগতের মহা উপকার করেছেন। মায়ের কথা আপনি লিখলেই ভাল হয়। আপনিই লিখুন।' উত্তরে বিশেষ কিছু না বলে সারদানন্দ মহারাজ এই গানটি গেয়েছিলেন :

রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক্ হয়েছি
হাঁসিব কি কাঁদিব, তাই বসে ভাবছি।
এত কাল রইলাম কাছে, ফিরিলাম পাছে পাছে
কিছু বুঝতে না পেরে হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুই বেলা
ঠিক যেন ছেলে খেলা বুঝতে পেরেছি॥

স্বামী সারদানন্দজীর ভাব জানলে তবেই মাকে বোঝা সম্ভব। তবু আমরা তাঁর কথা বলার সাহস করছি, এই জন্য যে মধুরতম স্মৃতিগুলি মনে এলে আনন্দ হয়, তাই বলবারও লোভ হয়।

মাকে আমার এগার বৎসর বয়সে প্রথম দর্শন। ধীরে ধীরে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, আর এগার বৎসর তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল—অর্থাৎ প্রায় ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা করবার সময় তখন হয়নি, বা তাঁকে কোন প্রশ্ন করবারও সময় ছিল না—মন সর্বদা আনন্দে ভরপুর হ'য়ে থাকত। সেই প্রথম দিনের দর্শনে সামান্য দু-চারটি কথায় ও স্নেহ-ভালবাসায় মনে হ'ল জগতে তিনিই আমার অতি আপনার। সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে থাকবার আকাঙ্ক্ষা হ'ল। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ভালভাবে পড়লাম। 'লীলাপ্রসঙ্গে' মায়ের বিষয়ে যে ক-টি কথা লিপিবদ্ধ আছে, মনে হয় তাতেই মায়ের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে।

* * *

একই বস্তুকে আমরা সকলে একই দৃষ্টিতে দেখি না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় মায়ের কাছে আসেন। মা তাঁদের কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথের মন্দির, তারপর বেলুড় মঠ দেখার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁরা ফিরে এলেন। সন্ধ্যারতি শেষ ক'রে মা তাঁদের বললেন, 'হ্যাঁ গো, তোমরা বেলুড় মঠে গিয়ে কি রকম কি দেখে এলে বল।' একটি মহিলা বললেন—'আহা মা কি বলব, বেলুড় মঠে কি বড় বড় গরু, ও রকম গরু আমাদের দেশে

* গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ও তাহার উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে ভক্ত-সমাবেশে কথিত প্রসঙ্গ হইতে সংগৃহীত।

নেই।' সে কেবল গরুই দেখেছে—যার যে রকম দৃষ্টিভঙ্গী। মা বৃদ্ধাকে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ঠাকুর ঘরে যাওনি? আর ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিষপত্র কি পরিপাটি ক'রে সাধুরা সব সাজিয়ে যত্ন ক'রে রেখেছেন—দেখনি?'

মহিলা—হ্যাঁ দেখেছি।

মা—ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের দর্শন করেছ? প্রণাম করেছ?

মহিলা—করেছি। কত যত্ন করলেন তাঁরা; কারণ আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি।

মা—আর সেই ফুলের মত পবিত্র ব্রহ্মচারী-গুলিকে দেখনি?

মহিলা—হ্যাঁ, কত যত্ন করলেন তাঁরা, কি শ্রদ্ধা তাঁদের! তাঁরা আমাদের পরিবেশন ক'রে খাওয়ালেন।

মা—তারা কিভাবে কত কাজ করছে; তা দেখেছ, আহা তাদের দেখলেও কত পুণ্য! গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর দেখেছ?

মহিলা—সবই দেখেছি, কিন্তু ও রকম গরু দেখিনি।

যার যে রকম দৃষ্টি! তাই বলছিলাম মায়ের কথা বলা বড় শক্ত। শরৎ মহারাজের কথাতেই মায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

ঠাকুর যখন সমস্ত সাধনার পর দেশে গিয়েছেন, তখন মায়ের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। বিবাহ হয়েছে ছ-বছরে। ইতিমধ্যে দু-চার বার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছেন,—ঠাকুর তখন কামার-পুকুরে ছিলেন না। ১৪ বৎসর বয়সে বাল্য অতিক্রম ক'রে কৈশোর বা যৌবনভাব আসে। মা এসেছেন ঠাকুরের কাছে। তিনি মাকে সাংসারিক সামাজিক আধ্যাত্মিক—সকল বিষয়ে শিক্ষা দিলেন; বললেন, 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন।' পান সাজা, প্রদীপের সলতে পাকানো, গুরু অতিথি সাধু ভক্তদের সেবা, অর্থের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিলেন। মা তাঁর জীবনভোর আচরণের দ্বারা সেইগুলি পালন ক'রে গেছেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'ভগবানের চরণে সব সমর্পণ ক'রে নিজে স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবে।' তারপর ঠাকুর চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। মা যেন অপার্থিব সম্পদের অধি-কারিণী হ'য়ে পিত্রালয়ে ফিরে এলেন।

সেই থেকে তিনি সর্বদা বোধ করতেন তাঁর ভেতরে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রয়েছে। মায়ের এত আনন্দ, কিন্তু প্রগল্‌ভতা নেই। ঠাকুরের সঙ্গ তাঁকে "শান্তস্বভাবা" ও "চিন্তাশীলা" করেছিল, "স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা" না ক'রে তাঁর মনে "সর্বপ্রকার অভাববোধ"-রাহিত্য এনেছিল। নিজের ব'লে কোন কিছু চাওয়া ছিল না। আত্মীয়-স্বজনদের অনাদর কখনও তাঁকে পীড়া দিত না। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তিনি কি দেখেছিলেন, কি শুনেছিলেন—সম্পদ, সমৃদ্ধি, স্বামীর সুখ্যাতি? না, বরং লোকে তাঁকে 'পাগলের বউ' বলত। তার ফলে কি হ'ল—না, জগতের মানুষের অশেষ দুঃখকষ্টে "অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না" হ'য়ে তিনি একটি "করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায়" পরিণত হলেন। মানুষের কত রকম দুঃখ! ত্রিবিধ দুঃখ তো আছেই, তা ছাড়াও আছে পঞ্চক্লেশ। সর্ব-রকমে অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন মাতৃত্বের বিকাশ তাঁতে ছিল। তিনি উপদেশ খুব বেশী দেননি, কিন্তু তাঁর চালচলন আচার-ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেকটিতে যে উপদেশ ফুটে উঠত, তা ভাষার দ্বারা বলা বড় শক্ত—তাঁর দৈনন্দিন জীবনই তাঁর বাণী।

কত রকম লোক যে আসত, কত রকম পরিবেশের যে সৃষ্টি হ'ত, তা বলে বোঝানো যায় না। আমরা তো সেই পাশের গ্রামের লোক, আমাদের সব সংসারেও মায়ের সংসারের মতো এত অশান্তি দেখিনি। মায়ের সঙ্গিনীরা—আত্মীয়েরা সব বিচিত্র! মাকে কেন্দ্র ক'রে তাদের পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষ, অথচ তিনি যেন এই জগতেরই নন, আবার দরদ দিয়ে সবই করছেন, অথচ তাঁরা যে মাকে কিছুই বোঝেননি, তাও নয়,—সময় সময় তাঁদের ব্যবহারে দেবীবুদ্ধিও দেখা যেত।

এ ছাড়া ভক্ত-সন্তান যাঁরা, তাঁরাও এসেছেন, এক এক জনের আচরণ দেখে রাগ হ'ত, হাসি পেত, আবার কারো কারো আচরণ দেখে মুগ্ধ হতাম। যখন চটে গেছি বা হেসে ফেলেছি এক-একদিন, মা বলেছেন—মানুষ যে কত বেদনা নিয়ে আসে, তা তোমরা বুঝবে না। বড় হ'লে হয়তো কিছু কিছু বুঝবে। আর তুমি তো মা নও।

কেউ বা বকর বকর বকছে, মনে হয় সবই যেন উজাড় ক'রে দিতে চায়। কেহ বা সামান্য সময়েই সব কিছু আদায় ক'রে নিতে চায়। কেউ বা কিছুই না ব'লে প্রণাম ক'রে চলে গেল। কারো বা মুখের কথায় যেন মধু ঢালছে। কেউ বা এমন মাথা ঠুকে প্রণাম করলে যে তার কপালও ফুলে উঠল, মায়ের পাও ফুলে উঠল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল—এমন করলেন কেন? উত্তর এল—মায়ের পায়ে ব্যথা রেখে গেলাম। মায়ের মনে পড়বে অমুক ব্যথা দিয়েছে প্রণাম করবার সময়। কিন্তু মা আমার নির্বিকার। কেউ বা কত জটিল প্রশ্ন করেছে, অশান্তি দূর করবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে, এই রকম কত বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু যাবার সময় সবাই দেখেছি একটি নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে গিয়েছে। তাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। জানিয়ে যাচ্ছে তারা—মা আমাকে যেমন আদর করেছেন, আপনার ক'রে দেখেছেন, আর কাউকে অতটা করেননি। ভক্তের অন্তরের অপূর্ণতা ভরে যেত মায়ের স্নেহদৃষ্টিতে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও মায়ের কি অন্তর্দৃষ্টি! একটি ভক্ত ছেলে সন্ধ্যাবেলায় এসেছেন মায়ের কাছে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ বাবা, যুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেল কেন?'

ভক্ত—মা, ওদের সন্ধি হ'ল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ১৪ দফা চুক্তিতে সই দিলেন, তাই সন্ধি হ'ল।

মা—কি রকম চুক্তি?

ভক্ত—পরস্পর প্রীতি, পররাজ্য অনাক্রমণ ইত্যাদি।

মা—ওটা কি অন্তঃস্থ না মুখস্থ?

—এটা মনের না মুখের? মা বুঝেছিলেন, এদের এ শান্তি-প্রীতি মনের নয়, মুখের।

* * *

তিনি তাঁর সব সন্তানের কল্যাণচিন্তাই করতেন। যার যে রকম চাহিদা, মা তাকে সেই রকম বিধান দিতেন। সংসারীকে বলছেন, 'সংসার-ধর্ম সকল ধর্মের মূল, তা পালন করবে। সবই তো দুটি দুটি গো। ভগবানে মতি রেখে সৎ-পথে চলবে।' ত্যাগীকে বলছেন ত্যাগের কথা, 'এর চেয়ে শান্তি কি আর আছে বাবা! আর কিছু না হ'ক সুখে নিদ্রা যাবে।' যে ছেলের যে রকমটি হ'লে সুখ আনন্দ, তাই তাঁর চিন্তা। এই তো সমবেদনা। তিনি এ সবের ঊর্ধ্বে। শোক তাপ জগতে থাকবেই, কিন্তু মুক্ত পুরুষদের তা বিচলিত করে না।

মায়ের কাছে অনেকে অনেক কিছু কামনা নিয়ে এসেছেন। নফরচন্দ্র কোলে—কোয়াল-পাড়ায় বাড়ী, ছোট বেলা কাকার কাছে মানুষ, কলকাতায় এসে মাথায় ক'রে কেরো-সিন তেল ফেরি করতেন, শুনেছি; পরে লাখপতি হয়েছেন। ১৯১৮ খৃঃ ভীষণ ইন্‌-ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী। তাঁর ১০৷১২টি নাতনি, ২টি নাতি। নাতনি কয়েকটি মারা গেল, নাতিও গেল একটি। একটি নাতি ভুগছে। ডাক্তারেরা তাকেও জবাব দিয়ে গেলেন। বাড়ীর মেয়েরা বুড়োকে (নফর কোলেকে) মায়ের বাড়ী পাঠিয়েছেন। ভাবনা এই নাতি মরে গেলে বিপুল বিত্তের মালিক কে হবে, কে ভোগ করবে ধনসম্পদ, বংশ যে লোপ পাবে! রাত দশটায় বৃদ্ধ 'উদ্বোধনে' এসে হাজির। শরৎ মহারাজ ডাকলেন 'বরদা, শীগ্‌গির এস।' আমি নীচে এসে দেখি নফর বাবু বসে। মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে পড়ল। দুটি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কাতর হ'য়ে কাঁদছেন।

মা—এত রাতে কেন এসেছেন?

বৃদ্ধ—আমার বংশরক্ষা হবে কি না বলুন? আমার সংশয় এসেছে, বোধ হয় নাতি থাকবে না। আমার এত ধনদৌলত কে ভোগ করবে?

মা কত বোঝাচ্ছেন। বলছেন—চিন্তা কেন উঠুন। আপনি লক্ষ্মীমন্ত লোক।

বৃদ্ধ—যে জন্যে এসেছি, তা সমাধান না ক'রে যাব না।

মা—আচ্ছা ঠাকুরকে জানাব।

বৃদ্ধ—দেখুন, আমি তো ঠাকুরের কাছে আসিনি, আপনার কাছে এসেছি। ঠাকুরকে আমি জানি না।

বৃদ্ধ কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন—আমায় যেন বংশলোপ দেখে যেতে না হয়। মা তখন স্থির হ'য়ে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রেখে বলছেন—সে আশঙ্কা নেই আপনার, উঠুন। যাবার সময় বৃদ্ধ দুটি সন্দেশ প্রসাদ বেঁধে নিয়ে গেলেন। একেবারে নিঃশঙ্ক ভাব।

* * *

একদিন মা তাঁর একটি ভক্ত-ছেলের সঙ্গে কথা কইছেন। ভক্তটি ব্রাহ্মণ—তার খালি গায়ে সাদা পৈতে ধবধব করছে। এমন সময় এক বাগ্দী যুবক এসে মায়ের কাছে দীক্ষার কথা বলেছে। মায়ের একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব, পল্লীগ্রামে তিনি স্থানীয় রীতিনীতি মেনেই চলতেন, কলকাতায় অন্যরকম।

বাগ্দী ছেলেটি মায়ের অনিচ্ছা বুঝে চটে গেছে—বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠেছে, 'ও, সেই মাঠের মাঝে ভর-সন্ধ্যায় ভয়ের চোটে বাগ্দীর 'মেয়ে' হ'তে তোমার বাধেনি, এখন বাগ্দীর 'মা' হ'তেই তোমার যত আপত্তি, বুঝেছি।'

মা হেসে উঠলেন, ছেলেটির আগ্রহ দেখে অচিরে তার শুভ বাসনা পূর্ণ করতে রাজী হলেন।

* * *

মাঝি-বৌ অনেকদিন আসেনি; মা জিজ্ঞেস করলেন—আসনি কেন এতদিন? মাঝি-বৌ কেঁদে উঠল। তার পুত্রশোকের কথা শুনে মা এমন কাঁদতে লাগলেন যে বোঝা শক্ত কার পুত্রশোক—মাঝি-বৌয়ের না মায়ের। সহানুভূতির দরদ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, অর্থ দিয়ে নয়। অর্থসাহায্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়? সমবেদনা চিরস্থায়ী। পাঁচটি টাকা দিলে পাঁচ দিনেই ফুরিয়ে যেত, কিন্তু মায়ের এই সহানুভূতি তাকে নতুন জীবনের শক্তি দিল।

* * *

তারপর শিবুদার ঘটনাটি (মায়ের জীবনীতে প্রকাশিত) মায়ের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে। শিবুদা ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। কামারপুকুরে রঘুবীর ও

মা শীতলার সেবা পূজা করছেন। মা তাঁর খুড়ী। একদিন অনেক বেলায় শিবুদা মাকে দর্শন করতে এলেন জয়রামবাটীতে। এসেই জানালেন,—আজ আর যাবো না। তোমার কাছে থাকবো খুড়ীমা।

মা—সে কি ক'রে হবে, সন্ধ্যায় রঘুবীর-শীতলার সন্ধ্যারতি শীতল দিবি না?

শিবুদা—না, ওসব শেষ ক'রে এসেছি।

মা—সে কি রে? জানিস তো আমার শ্বশুর কত নিষ্ঠা ক'রে রঘুবীর-শীতলার পূজা অর্চা ক'রে গেছেন, আর তোরা এখন থেকে যদি এই রকম করিস, তাহলে পরে কি হবে? যা, এখন যা, আবার ঠাকুরদের উঠিয়ে শীতল দিবি, সন্ধ্যারতি করবি।

মা বার বার বলাতে অগত্যা শিবুদা রাজী হলেন। হাতে তাঁর সেই লাঠিটি।

মা বললেন, রঘুবীরের জন্য ফলমিষ্টির পোঁটলা নিয়ে বরদা তোকে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

আমি পুঁটলিটি নিয়ে চলেছি। শিবুদা কোন কথা বলছেন না। আমি তাঁকে নদী পার ক'রে দিয়ে প্রণাম ক'রে ফিরে এলাম।

একটু পরেই দেখি, কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ শিবুদা ফিরে এলেন। তাঁর মুখ চোখের ভাব অন্য রকম—যেন থম্‌থম্ করছে, বেঁটে মানুষটি। মা—তাঁর অবস্থা দেখে বঁটি সরিয়ে দাঁড়ালেন। তখন মা কুটনো কুটছিলেন। শিবুদা আবার মার কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে মায়ের পা-ছুটি ধরে বলছেন,—বল, তুমি আমার ভার নিলে কি না।

মা শিবুদাকে ঐ ভাবে দেখে কিছু বিচলিত। একেবারে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলছেন, শিবু তোর মনে সংশয় কেন? তুই তো জীবন্মুক্ত। ঠাকুরের অত সেবা করলি। তাঁর কত ভালবাসা পেয়েছিস, তোর ভয় কি?

শিবুদা বললেন—না, তুমি বল আমার সব ভার নিয়েছ? আর সেই যা বলেছিলে তাই কিনা?*

তখন মা একবার ঠাকুরের দিকে একবার শিবুদার দিকে চেয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, ধীরভাবে বললেন—'হ্যাঁ তাই'; এবার শিবুদা প্রণাম ও স্তব ক'রে প্রফুল্ল মনে উঠলেন। মায়ের আদেশে আমি আবার এগিয়ে দিতে চললাম। পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে চলেছি। এবার শিবুদা কথা বললেন, বললেন—দেখ ভাই বুঝলে মা-ই কপালমোচন। কপালের লেখা মুছে দেবার শক্তি আর কারও নেই। একমাত্র মহামায়াই কপালমোচন করতে পারেন।

মাতৃশক্তি সন্তানের কল্যাণকামী। স্নেহ এবং করুণা ব্যতীত মায়ের আর কিছু নেই। সর্বদা সন্তানের কল্যাণচিন্তা, প্রতিদান চায় না।

মা সব সময়েই ঠাকুরের ওপর নির্ভরশীলা।

তাঁর একটি উপদেশ, 'বাবা, সহের সমান গুণ নেই—সন্তোষের সমান ধন নেই।"

মায়ের কি সন্তোষ-ভাব! এমনটি কোথাও দেখিনি। দুঃখ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ঐশ্বর্য সহ্য করা যায় না। টাকাকড়ি সম্মান পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান হয়।

* * *

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ। স্বামী সারদানন্দ পুরী থেকে তার করুণ বর্ণনা দিয়ে মায়ের কাছে চিঠি দিয়েছেন। মা কাঁদছেন, আর ব্যাকুল হ'য়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন; আবার বলছেন, 'যেখানে জল পড়ে শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে।'

* এটি একটি পূর্বের ঘটনা : কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসবার পথে শিবুদা পথিমধ্যে বসে পড়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' অনেক পীড়াপীড়ির পর মা স্বীকার করেছিলেন, 'লোকে যাকে কালী বলে।'

* * *

মায়ের অন্তর্ধানের পর একজন সাধু আমায় বললেন, 'আচ্ছা ভাই বলতো মায়ের কাছে থেকে মায়ের এমন কি মহৎ গুণ তুমি দেখলে? এক কথায় বল।'

আমি একটু চিন্তা ক'রে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ভাই, মা তো চলে গেছেন। জগতে অনেককে তো দেখলুম, কিন্তু ভাই যে কিছু চায় না, এমন লোক তো চোখে ঠেকে না। ঐ একটি লোক দেখেছি, যে জীবনে নিজের বলতে কিছু চায় নি—মান, ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্য সেবা ইহজগতের কিছুই চান না। ৬৬।৬৭ বৎসরের বৃদ্ধা ম্যালেরিয়া রোগী নিজের শুকনো কাপড় নিজেই তুলে আনছেন। কত সম্মান তিনি পেয়েছেন, মানুষ কি পারে তা সহ্য করতে? সবই ঠাকুরের উপর সমর্পণ।'

কিছু না চাওয়ার প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি ছোট মেয়ের কথা। মেয়েটি ভারী দুরন্ত। বাড়ীতে খুব দুষ্টুমি উৎপাত করত, 'এটা চাই ওটা চাই' করত, কেউ তাকে শোধরাতে পারেনি। সে তার মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসা যাওয়া করত, এসেই মাকে জড়িয়ে ধরত। মাও তার দুহাত ভরে সন্দেশ-মিষ্টি প্রসাদ দিতেন। কিছুদিন পর মা যখন দেশে যাবেন, এমন সময় একদিন মা তাকে বললেন, 'খুকু, তুমি যে এখানে আস, আমাকে খুব ভালবাস?'

—হ্যাঁ আমি তোমাকে খুব ভালবাসি!

—কতখানি ভালবাস?

খুকু দুখানি হাত প্রসারিত ক'রে বললে—এতখানি!

—আমি দেশে চলে গেলে কি আমার ওপর তোমার ঐ ভালবাসা থাকবে?

—হ্যাঁ সেই রকম ভালবাসব, ভুলে যাব না।

—তা বুঝব কি ক'রে?

—কি করলে বুঝবে বলো।

—বাড়ীর সকলকে যদি ঐ রকম ভালবাসো, তবেই বুঝব।

—হ্যাঁ তাই বাসব, আর কোন দুষ্টুমি ক'রব না।

—তা তো ঠিক, কিন্তু সকলকে যে সমান ভালবাসবে, কমবেশী করবে না, সেটি কি ক'রে বুঝব?

—সেটি কি রকম করলে হয় বল, তাই করব।

—সেটি কি করলে হয় জানো? যাদের ভালবাসবে, তাদের কাছে কিছু চাইবে না। যদি কিছু চাও তো কেউ বেশী দেবে, কেউ কম দেবে। ভালবাসাও তখন কম বেশী হ'য়ে যাবে; আর সকলকে তাহলে সমানভাবে ভালবাসতে পারবে না।

খুকু রাজী হ'য়ে গেল, সে সকলকে সমান ভালবাসবে—কারো কাছে কিছু চাইবে না।

* * *

নলিনী একদিন বললেন—পিসিমা, লোকে তোমায় বলে তুমি নাকি অন্তর্যামী।

মা—চুপ কর্। লোকে ভক্তিতে বলে। আমি কিছু নয়।

নলিনী—না, তুমি বল, আমার মনে কি চিন্তা এখন।

মা—না নলিনী ও সব নয়, আমার আমিত্ব যেন না জাগে, তুইও ঠাকুরের কাছে বল আর আমিও বলি। এই বলে জোড় হাতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

স্বামীজীর স্মৃতি

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় *

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীর দ্বিতলে, রাস্তার দিকে বড় হলে একদিন সকালে গিয়া বসিলাম। শুনিলাম স্বামীজী হলঘরের পাশের একটি কক্ষে আছেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম মিস্ নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) একটি দরজা দিয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল হালকা হলদে রঙের পুরা-হাতা আলখাল্লা, পা পর্যন্ত লম্বা। তাঁহার গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। মনে হইল যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি।

স্বামীজী যে ঘরে ছিলেন তাহার চৌকাঠের কাছে গিয়া সিস্টার হলঘরের মধ্যেই নতজানু হইয়া বসিলেন, দুই হস্ত যুক্ত করিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া রহিলেন। স্বামীজী নিজ কক্ষ হইতেই তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। তাহার পর স্বামীজীকে পুনর্বার প্রণাম করিয়া সিস্টার চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট খোল ও করতাল ছিল। হলের একটি পাশে তাঁহারা সকলে বসিলেন। গোঁসাইজী আসিয়া বসিতেই স্বামীজী নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং গোঁসাইজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ সকলেই এককালে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোঁসাইজী স্বামীজীকে প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামীজী সরিয়া গিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলেন। কেহই কাহাকেও প্রণাম করিতে পারিলেন না।

অবশেষে স্বামীজী গোঁসাইজীর হাত ধরিয়া সতরঞ্চির উপর বসাইলেন। গোঁসাইজী সে সময় ভাবমগ্ন, একেবারে বিভোর অবস্থা! কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে রহিলেন, পরে স্বামীজী গোঁসাইজীকে বলিলেন, 'ঠাকুর সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।' গোঁসাইজী সেইরূপ বিভোর থাকিয়াই অতি ধীরে শুধু বলিলেন, 'ঠাকুর! —আমাকে কৃপা করেছিলেন।' ইহার অধিক তিনি বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু এবং গদগদ-বাণী সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইল। তখন গোঁসাইজীর সঙ্গিগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সংকীর্তন আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ কীর্তন হইলে পর তাঁহারা গোঁসাইজীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমি স্বামীজীকে দূর হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম।

একদিন বেলুড় মঠে গিয়াছি। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। স্বামীজী রান্নাবাড়ীর সম্মুখে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিলেন—মাথায় গেরুয়া রঙের উলের টুপী এবং পরনে ড্রেসিং গাউন। তাঁহার গায়ের রঙ খুব সুন্দর—ফর্সা। চক্ষু খুবই বড়, এত সুন্দর চোখ আর কখনও দেখি নাই। নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। নিকটেই একটি তাঁবু ছিল। তাহার মধ্যে একটি সাধারণ টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার পাতা ছিল। স্বামীজী একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন চা আনিতে।

* জ্যৈষ্ঠের 'উদ্বোধনে' লেখকের দেহত্যাগ সংবাদ দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ২৭৮।

তাঁবুর মধ্যে আমাকে চা ও ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হইল।

ইহার পর স্বামীজী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথায় থাকি, কি করি ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন এবং আমি জানাইলাম এলাহাবাদে থাকি। মঠে ইহার পূর্বেও আমি যাইতাম এবং সম্ভবতঃ কাহারও নিকট আমার নাম শুনিয়া ছিলেন। এলাহাবাদে আমার কয়েকটি বন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো রাখিয়া পূজা করিতেন। আমরা যেখানে পূজা করিতাম, সেইখানেই জপ ধ্যান ও ধর্মগ্রন্থাদির পাঠ ও আলোচনা হইত। ইহার নাম ছিল 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব'। স্বামীজীর সহিত সেই সময় এই বিষয় কিছু আলোচনা হয় নাই, তবে ভাবে মনে হইল এই কথা তিনি শুনিয়াছেন। ইহার পর স্বামীজী মঠের ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং আমি অন্যান্য ভক্তদের নিকট বসিয়া রহিলাম।

ইহার কিছুক্ষণ পর—তখন বেলা আন্দাজ দশটা—মঠের ভিতরকার বারান্দায় একটি চেয়ারে স্বামীজী বসিয়াছিলেন ও তাঁহার সম্মুখে একটি ছোট টেবিল ছিল। বারান্দার তিন পাশে তিনখানি বেঞ্চ পাতা ছিল। মহাপুরুষ মহারাজ, রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ একটি বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন। অদূরে অন্য একটিতে আমি বসিলাম। স্বামীজী সম্মুখে আসীন গুরুভ্রাতাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন এবং আমি নীরবে শ্রোতারূপেই বসিয়া রহিলাম, কারণ স্বামীজীকে খুব ভাল লাগিলেও তাঁহাকে ভয় ও সমীহ করিতাম এত বেশী যে উপযাচক হইয়া কথা বলার মতো সাহস ছিল না।

স্বামীজী বলিতেছিলেন, 'শিকাগোতে যখন হিন্দুধর্মই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রমাণিত হ'ল, তখন পাদ্রীদের ভীষণ গাত্রদাহ। তারা স্থির করলে ফ্রান্সে আর একটা Parliament of Religion (ধর্মসভার আয়োজন করা) হবে। তারা ভেবেছিল এ (স্বামীজী) তো আর ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে না, অতএব এইবার তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।'

প্রথমবার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামীজী অধিক কাল ভারতে থাকেন নাই। দ্বিতীয়বার হরি মহারাজকে সঙ্গে করিয়া আমেরিকা লইয়া গেলেন। তাহার পর ইওরোপ যাত্রার সময়ে ফ্রান্সে যান ও অল্পকাল মধ্যে ফরাসী ভাষা শিখিয়া বক্তৃতা দিলেন। তাঁহাকে ঐ ভাষায় এত সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতে দেখিয়া ইওরোপবাসীরা আশ্চর্য হইল। তখন তাহারা বুঝিল তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার আর কোন আশা নাই।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, সে সময়কার নানা ঘটনা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরের বাহিরে একটি লেটার-বক্স্ থাকিত। পোষ্ট-পিওন আসিয়া তাঁহার সকল পত্রাদি তাহাতে ফেলিয়া যাইত। স্বামীজী তাহা চাবি বন্ধ রাখিতেন। মাঝে মাঝে চাবি খুলিয়া পত্রাদি বাহির করিতেন। অন্যান্য পত্রের সহিত সময় সময় উচ্চ শিক্ষিতা ও ধনী (মার্কিন) কন্যারা তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দিতেন। স্বামীজী সে সকল পত্রের উত্তর দিতেন না, পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন।

অবশেষে কেহ কেহ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাতে ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের বলিতেন, 'আমি সন্ন্যাসী। ভারতে সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না। সকল স্ত্রীলোকই আমার মা বা ভগিনীর সমান। অতএব বিবাহ করিবার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।' তাঁহারা এই ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না এবং আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া যাইতেন।

সেদিন আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছিলাম। আমেরিকার নানা শহরে অনেক বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজীর মনে হইল 'আর কি ব'লব! বলার যা সবই তো বলেছি।' সে সময় একস্থানে যে বিষয়ের অবতারণা করিতেন, অন্যত্র আর সেই কথা উত্থাপন করিতেন না। একটি বড় শহরে বক্তৃতা দিবেন এবং ঠিক কি বিষয় বলিবেন, তাহা যেন ভাবিয়া পাইলেন না। গভীর রাত্রে একটি আরাম-কেদারায় বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের বাণী শুনিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। কেবল তাঁহার অশরীরী বাণী বেশ উচ্চৈঃস্বরে অনর্গল উচ্চারিত হইতেছিল। সেই সকল কথা স্বামীজী স্পষ্টভাবে শুনিতেছিলেন; বক্তৃতায় কি কি বলিতে হইবে তাহা বেশ কিছু সময় ধরিয়া ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঙলায় যেমন কথা কহিতেন সেইরূপই বলিয়াছিলেন। পরদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী সেই বিষয় অবতারণা করিয়া মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ঐদিন প্রভাতে স্বামীজীর পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল রাত্রে আপনার ঘরে কে আসিয়াছিলেন?' কি ভাষায় কথা হইয়াছিল বা কি কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া স্বামীজী নিজেই অবাক হইয়া রহিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে আমেরিকায় একবার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত ত্যাগের বিষয় বলিতেছিলেন।—ঠাকুর টাকা পয়সা ছুঁইতে পারিতেন না। যদি স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে আঙুল বাঁকিয়া যাইত এবং অব্যক্ত যন্ত্রণাভোগ করিতেন। একদিন তিনি রাত্রে ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় একটি টাকা ঠাকুরের অঙ্গে (পায়ে) স্পর্শ করাইতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঘুম তো ভাঙিলই এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে এই ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন, 'নিদ্রিত অবস্থায়ও ঠাকুরের কাঞ্চন-স্পর্শে কেন এমন হইত, তা দার্শনিকরা গবেষণা ক'রে আবিষ্কার করুন।'

ইহার কিছুক্ষণ পরেই রাখাল মহারাজ স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন—ঠাকুরের জীবনী লিখিতে। তাহা শুনিয়া স্বামীজী চমকাইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'ও আমার দ্বারা হবে না। আমি কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ব!' তাহা শুনিয়া 'মহারাজ' বলিলেন, 'তুমি যদি না পার তো ঠাকুরের জীবনী আর লেখা হবে না।' উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় তো অন্য কাকেও দিয়ে লিখিয়ে নেবেন।'

আচার্য কেশবচন্দ্র ও বাঙালী সংস্কৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

॥ ৮ ॥

কেশব-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই বলা হয়েছে একটা সুগভীর প্রত্যয় ও সক্রিয় ধর্ম-চেতনা ছিল কেশবচন্দ্রের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে। কর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রগাঢ় ধর্মবোধের সমন্বয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। জীবনবোধের প্রতি এ গভীর-তর প্রেরণা কখনও করেছে তাঁকে ধর্মোন্মাদ, আবার কখনও ধর্মের ভিত্তিতে কর্মজীবন প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ধর্ম ও কর্ম—এ উভয়ই ছিল তাঁর গতিশীল জীবনের যুগল-অশ্ব। তাঁর গৌরবোজ্জল জীবনের শেষ ক'টি বৎ-সর নিয়োজিত হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কর্মময় একটি উচ্চ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার অক্লান্ত প্রয়াসে।

এ স্তরে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা-বক্তৃতাগুলি সুগভীর অধ্যাত্মচেতনার সুরে অনুরণিত। তাঁর এ বক্তৃতাগুলি সমকালীন যুব-মনকে যে শুধু স্পর্শ করেছিল তা নয়, দেশী-বিদেশী বহু জ্ঞানী-গুণীর চিত্তকেও উদ্বোধিত করেছিল একটা গভীর ধর্মচেতনায়। এ ধর্মোপদেশ জনচিত্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে দেখে কেশবচন্দ্র গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপলব্ধি করলেন, কোন ধর্ম-সংস্থার মাধ্যমে সে আদর্শগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম না হ'লে সে আদর্শ দেশের মধ্যে স্থায়ী মূল্য লাভ করতে পারবে না। এ দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন 'ভারত আশ্রম' (বেলঘরিয়ায়)—যে আশ্রমে গোষ্ঠীগত জীবনভিত্তিতে তিনি তাঁর পরিকল্পিত সব রকম সংস্কারমূলক কাজের বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। এর পর প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি সুবিখ্যাত 'সাধন-কানন' (কোন্নগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী স্থানে), যে প্রতিষ্ঠান হ'য়ে উঠল কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও কর্ম সাধনার পীঠভূমি। এ 'সাধন-কাননে'র অন্যতম কর্ম-সূচী ছিল গ্রামোদ্যোগ, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর সেবাগ্রামকে। গ্রামকে আত্মসম্পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নবীন ভারত জন্মলাভ করবে, এ সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির দিক দিয়ে কেশবচন্দ্র আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁর উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সঙ্গে।

১৮৭৩-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিজের পরিকল্পিত ভারতধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র অন্ততঃ তিনবার উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। কেশব-চন্দ্রের উদার ধর্মমতের কথা শুনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। এ ঐক্যচেতনাই পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেত্রে এনে দিয়েছিল ভারতের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি—এ সত্যও স্মরণযোগ্য।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে একটা উল্লেখযোগ্য দিক্‌পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ধর্মনেতা হ'য়ে উঠলেন ভক্তিরহস্য-সচেতন মরমী অধ্যাত্ম সাধক। যে হৃদয়োচ্ছ্বাসের বাহ্য প্রকাশ ও ভগবানের নাম-স্মরণে সাড়ম্বর কীর্তন ছিল ব্রাহ্মসমাজের বিধিবহির্ভূত, অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ

সেই গীতবাদ্যনির্ভর কীর্তনকেই অবলম্বন করলেন তিনি ধর্মসাধনার অন্যতম অঙ্গরূপে। ধর্মানুশীলনে কেশবচন্দ্রের এই সাড়ম্বর হৃদয়োচ্ছ্বাস শুধুমাত্র গৃহসীমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল না; তাঁর এই নবজাগ্রত ধর্মোন্মাদনা মুখরিত ক'রে তুলল নগরীর রাজপথ পর্যন্ত। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাচরণ-বিধিতে এ যে কত বড় ব্যতিক্রম, সেদিন তা বুঝতে বাকী রইল না কারও। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেশবচন্দ্রের এই রীতিবিগর্হিত ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনার কণ্ঠ আত্মপ্রকাশ ক'রল কখনও মৃদু গুঞ্জনে, কখনও সরবে। কিন্তু কেশবের হৃদয়োত্থিত ধর্মবিবেক প্রচণ্ড বেগ ও বলিষ্ঠতা নিয়ে তখন জেগে উঠেছে আত্মপ্রকাশের আন্তরিক অভিপ্রায়ে। এই জাগ্রত বিবেকের প্রভাবে সকল প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনাকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি সবলে প্রবেশ করলেন সহজ ভক্তি ও বিশ্বাসের উন্মুক্ত রাজ্যে।

পরব্রহ্মের নাম স্মরণ ও কীর্তন, স্রষ্টার বিভূতি-অনুভবের প্রয়াস ও ধ্যানতন্ময়তা ছিল এই সময় কেশবচন্দ্রের ভগবন্মুখিতার অন্যতম নিদর্শন। তাঁর বহির্মুখী কর্মপ্রয়াস ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হ'ল অন্তর্মুখী ভগবৎপ্রেমানুশীলনে। এই ধ্যানতন্ময়তা ভক্ত কেশবের মনে এনে দিল পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে 'মিষ্টিক' চেতনা। দিব্য জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠল মরমী কেশবের ভাবধর্মী জীবন। ধর্মগুরু কেশব বাস করছেন তখন বেলঘরিয়ায় 'ভারত-আশ্রমে'।

* * *

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মতো (কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের কাল) কেশবচন্দ্রের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরের প্রথম ভাগে তাঁর প্রবল ধর্মানুরক্তির কথা শুনে দক্ষিণেশ্বরের দিব্যোন্মাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন ভক্ত কেশব-সন্দর্শনে। তখন থেকে আরও দশ বৎসর পূর্বে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশব যখন তত্ত্বান্বেষী যুবক মাত্র, তখনই আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁর ধ্যানগম্ভীর মূর্তি দেখে ঠাকুর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে আকর্ষণ তীব্রতর হ'ল, যখন লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন—লোকহিতব্রতী কেশব সংস্কারকের কর্মতৎপর জীবন অতিক্রম ক'রে প্রবেশ করেছেন ধ্যানতন্ময় জীবনে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর উদার ধর্মবোধ, বিশ্ববোধ এবং বিশ্বমৈত্রীর ক্রমবর্ধমান দিগন্তসীমায় শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাপূত ধ্যানগম্ভীর জীবন যেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, এই জ্যোতিষ্কের ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে শতাব্দীশেষে বহু ধর্মনেতার অন্তর; আর সেই আলোকিত অন্তরের দীপ্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বাত্মা, বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের পরম ঐক্য। কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনেও এই ধর্মগুরুর প্রবল প্রভাব সর্বপ্রথম অনুভূত হ'ল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এই বছরই বেলঘরিয়ায় কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণরেখায় অঙ্কিত করেছেন পাশ্চাত্য মনীষী রমাঁ রলাঁ তাঁর বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী গ্রন্থে।[১] কেশবচন্দ্র তখন দেশে ও বিদেশে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্ম- ও কর্মনেতা বলে স্বীকৃত, আর দক্ষিণেশ্বরের 'ভগবদ্‌ভাবে উন্মাদ' ('Madman of God') শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে তখনও প্রায় অজ্ঞাত! এই অবস্থায় স্বীয় আশ্রমে এই 'অদ্ভুত উন্মাদে'র সমাধি-অবস্থা এবং সমাধিভঙ্গে তাঁর মুখে এক

১ Romain Rolland, The Life of Ramakrishna, Ed. by Advaita Asrama, Mayavati, Almora, Himalayas, Pp, 168—169.

ও অনন্ত ভগবানের ('One and Infinite God') স্বরূপ বিশ্লেষণ শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন ভক্ত ও ব্রহ্মতত্ত্বপিপাসু কেশবচন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবোন্মাদ, গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও কেশবচন্দ্রের মনের উপর তাঁর অনতিক্রমণীয় প্রভাব সম্পর্কে মঃ রলাঁ লিখছেন :

Thereupon he (Ramakrishna) began to sing a famous hymn to Kali, and in the midst of it he fell into an ecstasy. Even for Hindus enlightened by reason this was an ordinary sight; and Keshab, who, as we have seen, was sufficiently suspicious of such other morbid manifestations of devotion, would hardly have been struck by it, if, on coming out of Samadhi at the instance of his nephew, Ramakrishna had not forthwith launched into a flood of magnificent words regarding the One and Infinite God. His ironic good sense appeared even in his inspired outpouring, and it struck Keshab very forcibly. He charged his disciples to observe it. After a short time he had no doubt that he was dealing with an exceptional personality, and in his turn went to seek it out. They became friends.

অন্তরে তিনি এক গভীর পরিবর্তন অনুভব করলেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্ত কেশব আরও সশ্রদ্ধ ও প্রীতিমান্ হ'য়ে উঠলেন এই অসাধারণ ব্যক্তিটির প্রতি।

ক্রমশঃ আত্মার আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ল এই দুই ভগবৎ-প্রেমিকের মধ্যে। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করলেন কেশব এই আত্মভোলা দিব্যোন্মাদের প্রতি। সে তীব্র আকর্ষণে ছুটে যেতেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে, আর এই আত্মার আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষে নৌকায় ষ্টীমারে চলত তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান। শ্রীরামকৃষ্ণের মনও ভক্ত কেশবের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব ক'রত। তিনিও তাঁর স্নিগ্ধ উপস্থিতিতে সজীব ও ভাবগম্ভীর ক'রে তুলতেন ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানগুলিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে কেশবের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলেও ব্রাহ্মসমাজ এবং তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে কেশবের সংযোগ তখনও অব্যাহত। বাঙালীর ধর্মজীবনে তাঁর তখন অপ্রতিহত প্রভাব। সেই প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করলেন তিনি তাঁর মহান্ অধ্যাত্মসঙ্গীর অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব-প্রসঙ্গকে শিক্ষিত বাঙালীর গোচরে আনবার জন্য। এই প্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ লিখছেন :

'...and since his generous soul was obliged to share his discoveries with others, he spoke everywhere of Ramakrishna, in his sermons, and in his writings for journals and reviews, both in English and in his native languages. His own fame was put at Ramakrishna's disposal, and it was through Keshab that his reputation, which until then had, with a few more exceptions, not reached the popular religious masses, came to be known in a short time within the intellectual middle class of Bengal and beyond.'

ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও এই পুঁথিগত-বিদ্যাবিহীন মৌলিক ধর্মদ্রষ্টার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ধর্মাদর্শ প্রচারের মধ্যে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি কেশবচন্দ্রের যে শ্রদ্ধা সূচিত হয়েছিল, সে শ্রদ্ধা ক্রমে ক্রমে গভীরতর হ'ল তাঁর সাহচর্যের ফলে। অচিরেই কেশবচন্দ্রের মনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব মুদ্রিত হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের যে দিক্‌টি কেশবচন্দ্রের সদাজাগ্রত মনকে অভিভূত করেছিল, সে হ'ল ঐহিক পারত্রিক সব কিছুর প্রতি এই ভগবৎ-প্রেমিকের অন্তর্ভেদী ও অভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টির সম্মুখে ভক্ত কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শিষ্যের মত শ্রদ্ধাবনত হ'লেন, যেমন হয়েছিলেন পাশ্চাত্য

ভাবে শিক্ষিত যুক্তিবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ। কেশবচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের অনতিক্রমণীয় প্রভাব-বর্ণনাপ্রসঙ্গে মনীষী রলাঁ বলছেন :

'The modesty shown by noble Keshab, the illustrious chief of the Brahmo Samaj, rich in learning and prestige, in bowing down before this unknown man, ignorant of book-learning and Sanskrit, who could hardly read and who wrote with difficulty, is truly admirable. But Ramakrishna's penetration confounded him and he sat at his feet as a disciple.'

কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের দিক্‌পরিবর্তন আলোচনায় এইখানেই প্রশ্ন ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের প্রভাবে এই মহান্ ধর্মনেতা বাস্তবিকপক্ষে ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা। এই বিতর্কে নতুন ক'রে প্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয় না; কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাবেন রমাঁ রলাঁর সুবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী গ্রন্থের পরিশিষ্টে (Note II, pp. 310-319)। উত্তরকালে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় প্রভাবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য বন্ধু মনীষী ম্যাক্স মূলর এবং তাঁর শিষ্য জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন আর না করুন, অন্ততঃ দুটি বিষয়ে তাঁর পরিণত ধর্মোপলব্ধির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ভগবৎ-স্বরূপের ধারণা 'পিতৃভাবকে' অতিক্রম ক'রে কেশব কর্তৃক ভগবানকে 'মাতৃভাবে' অনুভব। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় এই অনুভব অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সাধনার এ দিকটি আংশিকভাবে স্বীকার করলেও ধর্মানুশীলনে প্রাধান্য অর্পণ করেছিলেন ভগবানের ঐশ্বর্যময় পিতৃভাবের উপর। ভগবানকে সর্বশক্তিমান্ এবং দণ্ডদাতা পিতারূপে ধারণার মধ্যে কল্পনার বলিষ্ঠতা আছে, মাতৃভাবে উপাসনায় মাধুর্য বর্তমান। হিন্দু-সাধনার ঐতিহ্যে মাতৃরূপিণী ঐশীশক্তি শুধু মাধুর্যে কোমলা নন, প্রয়োজনবোধে তিনি শক্তিময়ী, রুদ্রাণী। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপরূপ সম্মেলন ঘটেছে এই মাতৃভাবসাধনায়। কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত এই ধর্মবোধের আবেদন তাই শুধু নীরস তত্ত্বচিন্তায় নয়, সরস প্রেমের জগতেও। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা এই কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত সাধনা। এই সাধনায় অদ্বৈতবাদের যেমন স্থান আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ মাতৃভাবের অনুভূতিতেও এই সাধনা প্রাণবন্ত। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সাধনা সামঞ্জস্যপূর্ণ; শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য সংস্কারমুক্তিতে নয়, সুগভীর প্রাণধর্মের মুক্তিতেই এর পূর্ণ বিকাশ। ১৮৭৫ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শুভ মিলনের পর কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন মুখ্যতঃ এই হৃদয়ধর্মী মাতৃভাবপ্রধান ধর্মসাধনার দিকে। ব্রাহ্মসমাজের সাধনাবহির্ভূত এই নবতর ভগবৎ-অনুভূতিকে প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য শুধুমাত্র স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট নয়, স্বীয় অন্তরঙ্গ অনুবর্তীদের নিকটও তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু হৃদয়োত্থিত বিবেক অনুসরণে কেশবচন্দ্র রইলেন অটল।

দ্বিতীয়তঃ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খৃঃ 'নববিধান' (New Dispensation) নামক যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন, তার উপরও শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মবোধের প্রভাব গভীর বলেই মনে হয়। পৃথিবীর সকল ধর্মমতের ভিতর যে শাশ্বত সত্য আছে, সেই সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ব-জীবনে গ্রহণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই আদর্শ অনুপ্রাণিত

ক'রল কেশবকে 'নববিধান'-পরিকল্পনায় ও তার প্রচারে। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র এই নতুন ধর্মমত প্রচার করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই এই সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মাদর্শের দিকে কেশবচন্দ্রের চিত্ত প্রসারিত হয়, এটা খুবই সম্ভব। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে উদার ভাব পূর্ব থেকেই ছিল, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই তাঁর এই ভাব দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত হয়, এবং 'নববিধানে'র মাধ্যমে তিনি এই ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারে ব্রতী হন।

শতাব্দীর শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় দিব্যজীবনের প্রভাবে সংস্কারকামী ধর্মমতগুলি কিভাবে সমন্বয়ভিত্তিক উদার ধর্মোপলব্ধির স্তরে উপনীত হবার পথ খুঁজছিল, তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'।

কেশবচন্দ্রের উদার ধর্মভাবনা দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হ'ল বিশ্বমানবধর্মের উদার প্রাঙ্গণে। বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে এ উদার ধর্মচেতনাও একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্যপ্রমুখ জগতের যে সমস্ত ধর্মনেতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হ'য়ে ত্যাগ, প্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার সাধনায় মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতির প্রতি কেশবচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অপরিমেয়। কেশবচন্দ্র শেষ বয়সে এ সকল মহাপুরুষ-প্রচারিত ধর্মের সার সংকলন ক'রে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যবিধানে সযত্ন হলেন। তাঁর অনুবর্তী কয়েকজন কর্মীর ওপর তিনি ভার দিলেন এ মহৎ কাজ সম্পাদন করবার জন্য। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরীশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল যথাক্রমে খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইস্‌লাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা-গবেষণায় যে গভীর পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন, তা বর্তমান গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা দেশে ধারণা করা অনেকটা দুঃসাধ্য।

* * *

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে কেশবচন্দ্র বৃহত্তর ভারতীয় জাতিগঠনের কাজে একদিকে ব্যস্ত, আর একদিকে কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের একটি ব্যক্তিগত কাজকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে এমন একটা বিক্ষোভের তরঙ্গ উত্থিত হ'ল, যাতে কেশবচন্দ্রের এতদিনকার স্বপ্ন ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল। এ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'কুচবিহার বিবাহ'কে কেন্দ্র ক'রে। তাঁর অনুবর্তীরা অভিযোগ করলেন, কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই; আর কেশবচন্দ্রের কথা হ'ল—তাঁকে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এতবড় একজন ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারক নেতার পক্ষে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'কুচবিহার বিবাহে' সম্মতি দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে একটি অন্যায় কাজ বলেই মনে হয়। কোন কোন সহানুভূতিশীল কেশব-সমালোচক বলেন, কেশবচন্দ্রের এ কাজ পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতা-প্রসূত। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহযোগী ও চরিতকার উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'আচার্য কেশবচন্দ্রে' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, দুটো প্রধান কারণে কেশবচন্দ্র কুচবিহার-রাজার সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। প্রথমত, এ বৈবাহিক সম্পর্ক কুচবিহার-বাসীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে, এ সম্বন্ধে ভগবানের প্রত্যাদেশ; দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ব্রাহ্মপ্রণালীতে অনুষ্ঠিত হবে—

এ বিষয়ে কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার ডাল্টনের (Dalton) কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন। প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য কিছুই নেই, কারণ এরূপ প্রত্যয় একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু ব্রাহ্মমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান-ব্যাপারে কেশবচন্দ্র যে প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।*

এ মতান্তরের ফলে কেশব-বিরোধীরা তাঁর ভারতধর্ম-প্রতিষ্ঠার আশ্রয়ভূমি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে); আর বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন আদর্শের ভিত্তিতে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজ। এ 'নববিধান'-প্রতিষ্ঠাই হ'ল কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ কীর্তি। বস্তুতঃ অসুস্থ শরীরে এ গুরুতর শ্রমসাধ্য গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলেই তাঁর দেহাবসান ঘটে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে।

আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ সঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণের মতো কেশবচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন, জগতের প্রধান ধর্মমতগুলি একটি শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ উদার ধর্মোপলব্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি তাঁর 'নববিধান'। কেশবচন্দ্র-পরিকল্পিত 'নববিধান' শুধু অধ্যাত্ম-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রমাত্র নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জড়রাজ্যের রহস্যভেদও এ নতুন বিধানের অন্যতম লক্ষ্য। 'নববিধানে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বলেছেন:

> 'নববিধানে' বেদের অন্ত নাই, কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদয় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। ...জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, সমুদয় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম,—ইহার মধ্যে কোন ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবেন।

কেশবচন্দ্র আশা করেছিলেন ঐহিক ও আধ্যাত্মিক—এ উভয় জীবনের ভিত্তিতে রচিত এ উদার ধর্ম ভারতবাসীর পক্ষে হবে পরম কল্যাণকর। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী নিজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম ক'রে ব্যাপকভাবে এ উদার ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেনি; কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত মনোভাব বাঙালীর দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত ক'রে পরবর্তী-কালে জগৎ-সচেতন এক মহৎ সংস্কৃতি নির্মাণে সক্ষম হয়েছে।

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারে সহায়তা করেছে পঞ্চম-দশকোত্তর সজীব প্রাণধর্মী সাহিত্য। সাহিত্য পাঠের প্রতি কেশবচন্দ্রের সহজাত অনুরাগ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ-ভাবে তিনি কোন সাহিত্য রচনা করেননি। তবে নীতি ও ধর্মব্যাখ্যা সম্পর্কে কেশবচন্দ্র জাতিকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছে কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনোপলব্ধি। এমন জীবনধর্মী আন্তরিক ভঙ্গীতে রচনা সে যুগে ছিল দুর্লভ। স্পষ্ট ঋজুরেখায় অঙ্কিত হয়েছে সে সত্য-উপলব্ধি তাঁর গদ্য-রচনায়। ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছতা যদি গদ্য-রচনার অন্যতম প্রধান গুণ হয়, তবে কেশবচন্দ্র সে যুগের আড়ম্বরপূর্ণ রচনার ক্ষেত্রে একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী। গভীর জীবন-সত্যকে সহজ, সরল, সর্বজনবোধগম্য অথচ প্রত্যয়শীল সবল ভাষার মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্র ও

* 'কুচবিহার বিবাহ' সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কৃত আচার্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড।

বিবেকানন্দ ছাড়া খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কেশবচন্দ্রের এ শক্তিশালী অথচ সহজ গদ্যরীতি বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পরে আর বেশী অনুসৃত হয়নি। স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর স্থলে এসেছে অলংকারপ্রিয়তা। ফলে সে গদ্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়লেও জনচিত্তে আবেদন সৃষ্টির দিক দিয়ে তার দুর্বলতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্রের স্বচ্ছ অথচ অন্তঃস্পর্শী স্বচ্ছ গদ্য-রচনাভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে আরও বেশী অনুসৃত হ'লে বাঙালী সংস্কৃতির দিগন্ত যে আরও প্রসারিত হ'ত, তাতে সন্দেহ নেই। কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম', 'আচার্যের প্রার্থনা', 'সুলভ সমাচারে'র রচনা ও পত্রাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রচনা।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকের তরঙ্গমুখর বাঙালী জীবনকে বেগ ও বলিষ্ঠতা দান করেছে কেশবচন্দ্রের ক্লান্তিহীন সংস্কৃতিসাধনা। এ সাধনার আশ্রয়স্থল ছিল ধর্ম ও সমাজসংস্কার। এ দুই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের জাগরণের মন্ত্র বাঙালী দৃষ্টিকে করেছিল মোহমুক্ত, এবং সে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিই সৃষ্টি করেছিল গত শতাব্দীর সব চাইতে ফলপ্রসূ জাগরণের আন্দোলন। রাজনীতিক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ছিল ভূদেব, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমের মতোই গঠনশীল। সেজন্য উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন জাতির ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠনের উপর। তাঁর জাতীয়তাবোধের গভীরতা সন্দেহাতীত; সে যুগের পক্ষে পরম লোভনীয় কে. সি. এস. আই. খেতাব প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। কিন্তু যুগসুলভ ভাবোদ্বেলতা তাঁর প্রশান্ত ও সুগভীর জাতীয় চেতনাকে কখনও অতিক্রম ক'রে তটপ্লাবী হ'য়ে ওঠেনি। একবার তিনি সমসাময়িক ভারত-বরেণ্য রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যেন তার রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের আগে কেশবচন্দ্রকে সুযোগ দেন ভারতীয় জনগণের সমাজ- ও নীতিবোধকে উন্নত করবার। তা না হ'লে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না।*

বর্তমান স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আচার্য কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি কতটা স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী ছিল, তাঁর এ গভীর অর্থপূর্ণ উক্তি হতেই তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

* A. C. Bannerjee, Brahmananda Keshab Chandra Sen—Studies in the Bengal Renaissance, pp. 90.

অভিনয়

শ্রীনারায়ণ পাত্র

দু' দণ্ডের অভিনয়—এইতো নটের পরিচয়!
কখনো জয়ের হাসি, কখনো বিষণ্ণ পরাজয়।
কখনো সম্রাট সে, কখন বা পথের ফকির—
এইতো জীবন তার; এই তার সুষ্ঠু অভিনয়!
কখনো দয়াল আর, কখন সে নির্মম বধির!
নাটকের অঙ্কে অঙ্কে যাওয়া-আসা-মাঝে
দর্শকের বুকে নট তোলে আলোড়ন;
কখন দর্পিত রোষে—কখন সে একান্ত সলাজে
রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে, বন্ধ করে সকল স্পন্দন!
তারপর শেষ অঙ্কে যবনিকা চোখের উপরে
নেমে আসে ধীরে ধীরে, ফেরে সবে নিজ নিজ গেহে;
নাটক-শেষেতে নটে কারো জানি মনে নাহি পড়ে,
একান্তে হেলায় ফেরে একা একা অবসন্ন দেহে।
জীবনের শেষে তবে বোঝা গেল দামী অভিনয়!!

নিরভিমান মাষ্টার মহাশয়

শ্রীফণিভূষণ সান্ন্যাল

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ মহেন্দ্রনাথ—ঠাকুর যাঁহাকে 'মাষ্টার' বলিয়া ডাকিতেন এবং শ্রীগুরুর এই স্নেহ-সম্বোধনেই যিনি ভক্তজনের নিকট পরিচিত—রামকৃষ্ণলীলার একটি অনবদ্য চরিত্র। যুগাবতারের বার্তা যিনি ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছেন, ভক্তি ও নিরভিমানতার প্রতিমূর্তি সেই মহেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। ভক্তসঙ্গে পরমসুন্দরের লীলাস্মরণে দক্ষিণেশ্বরের ঘরটিতে ঠাকুর ছোট তক্তপোশটির উপর বসিয়া এবং মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পদতলে মেঝের উপর উপবিষ্ট—এই চিত্রটিই মনশ্চক্ষে প্রথম ভাসিয়া ওঠে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুলে পাঠসমাপনান্তে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতেই ১৮৭৪ খৃঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন ও এণ্ট্রান্স, এফ.এ. এবং বি.এ. প্রত্যেকটি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। সমগ্র উত্তর ভারত তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। মহেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয় স্থান, এফ.এ-তে অঙ্কের একটি পত্র পরীক্ষা না দিয়াও পঞ্চম স্থান এবং বি.এ.-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'শিক্ষাব্রতী' কথাটি বহুল প্রয়োগে ম্লান না হইলে মুষ্টিমেয় মহাজনদেরই এই উচ্চ পদবীতে ভূষিত করিতে হইত। আজীবন গভীর নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানের অনুশীলন ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া এবং বহু ছাত্রের প্রেরণাদাতা হইয়া (যে প্রেরণায় তাহারা জীবনের কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছিল) এই মাষ্টার মহাশয়টি বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্রতী-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। যদি ঐ শিক্ষার ইতিহাসে বহু নামের ভিড়ে মহেন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত দেখিতে না পাই, তবে দুঃখের কথা। অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকার মানুষ গড়ার কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহারা নীরব কর্মীই হইবেন; আন্দোলনের বাহিরে থাকিলেও তাঁহারাই শিক্ষাব্রতী।

কলিকাতার বহু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করা ছাড়াও রিপন, সিটি, মেট্রোপলিটান কলেজে মহেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছেন। 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থে রিপন কলেজে অধ্যাপনারত মহেন্দ্রনাথের বেশ সুন্দর একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই শান্ত-স্বভাব গম্ভীর প্রকৃতির অধ্যাপকটিকে ছাত্রেরা বিশেষ সমীহ করিত। কেবল একটি বিষয় তাহাদের কৌতূহল উদ্রেক করিত। টিফিনের সময় অধ্যাপক মহাশয়কে সহকর্মীদের সঙ্গে তো দেখা যায় না। তিনি কোথায় অন্তর্হিত হন? আবিষ্কৃত হইল—এই সময় তাহাদের প্রিয় মাষ্টার মহাশয় কলেজ ভবনের নির্জন চিলেকোঠায় একান্তে বসিয়া একটি ছোট খাতা মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন! এই খাতা মহেন্দ্রনাথের ডায়েরীর কোন একটি,—বহু পরে প্রকাশিত 'কথামৃতে'র পাণ্ডুলিপি। মাষ্টার মহাশয়ের বিশেষ অধ্যাপনানৈপুণ্য ছিল, একথা উল্লেখ করা বাহুল্য হইলেও করিতে হইল।

* * *

১৮৮২ খৃঃ ২৬শে ফেব্রুআরির অপরাহ্লে মহেন্দ্রনাথের জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গের বন্ধুটি প্রস্তাব করিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে যাওয়া যাউক। সেখানে একজন সাধু থাকেন। হাঁ, ইহার কথাই তো মহেন্দ্রনাথ কেশববাবুর কাগজে সম্প্রতি পড়িয়াছেন। আকর্ষণ অনুভব করিলেন, উপস্থিত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে। প্রথম দর্শনেই মন মুগ্ধ হইল এবং পরিপূর্ণভাবে আত্ম-নিবেদন করিতেও বিলম্ব হইল না। রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে তাঁহার মনোমধুপ মধুপানের জন্য সদাই আকুল। রবিবার বা ছুটির দিন পাইলেই প্রাণপ্রিয়ের কাছে যাওয়া চাই; সমস্ত দিন তো অতিবাহিত হইতই, এমন কি ঠাকুর কলি-কাতায় কোন ভক্তগৃহে শুভাগমন করিয়াছেন—সংবাদ পাইলে টিফিনের ছুটিতেও সেখানে গিয়া প্রিয়তমকে দর্শন করিয়া আসিতেন। তবু মন তৃপ্ত নয়। গুরু-পদাশ্রয়ে বাস করিবার অভিলাষ চরিতার্থ করিতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের জানুআরি মাস পড়া অবধি এক পক্ষকাল মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাপন করিলেন। কত অনুরাগের সহিত মাষ্টার মহাশয় 'কথামৃতে' তাঁহার গুরুগৃহবাসের এই দিনগুলির কথা লিখিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ধ্যান, রামকৃষ্ণ জ্ঞান; রামকৃষ্ণ বই মাষ্টার মহাশয় আর কিছু জানিতেন না। তাঁহার কথায় সত্যই রামময় মহাবীরের কথাই মনে হয়।

এরূপ আত্মবিলুপ্তিকে (Self-effacement) নিরভিমানতা বলিলে কম বলা হয়, 'আমি'কে একেবারে মুছিয়া ফেলা অদ্ভুত ব্যাপার! এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া-ছেন, 'মাষ্টার বড় শুদ্ধ। এর অভিমান নাই।' ইহার বাড়া প্রশংসা নাই। বহুদিন মাষ্টার মহাশয় গভীর রাত্রে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সিনেট হাউসের বারান্দায় পথের ভিক্ষুক-দের সহিত শয়ন করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে শেষ রাত্রে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার শয়ন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—দেশের ও বিদেশের সুধীজন যাঁহার সাহচর্যলাভে মুগ্ধ হইতেন, সেই মহেন্দ্রনাথ রথযাত্রার পর অপেক্ষা করেন হাওড়া স্টেশনে—৺জগন্নাথের প্রসাদের আশায়।

বহু উপদেশার্থী আসিয়াছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু একটিও নিজের কথা নাই। বীণাবিনিন্দিত কোমলকণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, 'ঠাকুর বলতেন'—আর সেই ঠাকুর আর ঠাকুর! শ্রোতারা অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন; ঠাকুর যে 'ডায়লুট' (dilute) হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যে কি বস্তু—তাহা তাঁহারা দেখিলেন, বুঝিলেন। একজন সত্যসন্ধানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনেও মাষ্টার মহাশয় কী গভীর রেখাপাত করিয়া-ছেন, তাহা বুঝা যায় Dr. Paul Brunton-লিখিত A search in secret India নামক পুস্তকটি পাঠ করিলে।*

*And so I am in Calcutta itself, searching for the house of the 'Master Mahasaya' the aged disciple of Rama-krishna.

I climb up a dark stairway and find myself in a small room which opens out on to the flat, terraced roof of the house. A young man bids me wait for the coming of his master who is on a lower floor.........

When at last--for he moves with ex-treme slowness—he enters the room, I need no one to announce his name. A vene-rable patriarch has stepped from the pages of the Bible, and a figure from Mosaic times has turned to flesh!

He takes his seat on a divan, and then turns his face towards mine. How noble and dignifed the man looks. In that grave, sober presence I realise inst-

পল ব্রাণ্টন তাঁহার এই সুপরিচিত পুস্তকের ১৮১ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মাষ্টার মহাশয়ের গৃহের ছাদের উপরকার ঘরে একজনের নির্দেশে বসিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। দশ মিনিট পরে মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাণ্টনের মনে হইল বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে যেন একজন গোষ্ঠীপতি (Patriarch) বাহির হইয়া আসিতেছেন, মোজেসের সময়ের কোন মহাপুরুষ যেন রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন!

আসন গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রনাথ লেখকের সামনাসামনি বসিলেন। ব্রাণ্টন লিখিয়াছেন: কী মহিমামণ্ডিত তাঁহার চোখমুখ! তাঁর উপস্থিতির গম্ভীর পরিবেশে কোন সন্দিগ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন বা নগ্ন সমালোচনা সম্ভব নয়। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আচরণে মহত্ত্ব—যেন তাঁর চোখে মুখে মুদ্রিত রয়েছে।

ব্রাণ্টন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেন। এই সামান্য কয়েক-দিনের সঙ্গ-লাভেই সংশয়বাদীর মন নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

তাহারই স্বীকৃতি ব্রাণ্টনের লেখার শেষ দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে: যদিও আমি ধর্ম-বোধহীন, তবু এই দেবদূতের মতো মানুষটির কাছে আমি শ্রদ্ধায় নত হই, তিনি আমার অন্তরদেশ আলোড়িত করেছেন। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতায় বসে ভাবি, যদি কেউ আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিগত সন্দেহবাদ থেকে মুক্ত ক'রে আমাকে সরল বিশ্বাসের জীবনে আকৃষ্ট করতে পারে তো সে মাষ্টার মহাশয়!

* * *

মহেন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ছিল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্যস্বরূপ। 'মায়ের কথা'র পাঠকেরা সেই চিত্রটি স্মরণ করিবেন। মাষ্টার মহাশয় গরুর গাড়ী করিয়া কামারপুকুরে পৌঁছিয়াছেন। গাড়ী হইতে নামিয়া একদৃষ্টে ঠাকুর যে কুটিরে বাস করিয়াছিলেন, সেইদিকে তাকাইয়া আছেন; চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে।

ঝামাপুকুরের যে মিত্র-বাড়ীতে (বর্তমান কেশব সেন স্ট্রীটের 'নববিধান মন্দিরে'র পার্শ্বের অট্টালিকা) ঠাকুর কলিকাতায় প্রথম আসিয়া কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন; যাতায়াতের পথে সেখানে মাষ্টার মহাশয় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, মহেন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপ নাই। বলেন, 'জানো এই রাস্তায় কেউ যদি বেড়ায়, সেও যোগী হ'য়ে যাবে।'

কখনও বা দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়াছেন—সঙ্গে আনিয়াছেন অমূল্য সম্পদ—একটি ভিজা

antly that there can be no utterance of harsh cynicism and dark scepticism which overshadow my soul from time to time. His character with its commingling of perfect faith in God and nobility of conduct is written in his appearance for all to see.

Night after night I come to bask in the spiritual sunshine of the presence. The atmosphere around him is tender and beautiful, gentle and loving; he has found inner bliss and the radiation of it seems palpable. I began to understand how potent must have been the influence of the Teacher (Sri Ramakrishna) when the disciple exercises such a fascination on me.

I bow humbly before this angelic man, irreligious though I am. He has strangely stirred me. In midnight stillness I reflect that if anyone could free me from the intellectual scepticism to which I cling and attach me to a life of simple faith, it is undoubtedly *Master Mahasaya*.

Paul Brunton—A search in secret India. Pp. 181—185.

গামছা; তাহাই নিঙড়াইয়া ভক্তদের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করতেন—সেই ঘাটের জল আছে এই গামছায়।'

এই সব যিনি করিয়াছেন, তিনি ভাবপ্রবণ বাতিকরোগগ্রস্ত বা গ্রাম্য অন্ধবিশ্বাসী নন, তিনি একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি—ধীর, গম্ভীর; ঠাকুরের ভাষায় বলিতে গেলে—'গম্ভীরাত্মা'।

'কথামৃত' জগতের আধ্যাত্মিক সাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে জগতের ধর্মপিপাসু লোক যে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোধ্য, অথচ লেখক নিজ কৃতিত্বের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, বরং নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য কতই না প্রয়াস করিয়াছেন, বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহারেই তাহা প্রমাণিত।

আর কত ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন এই 'কথামৃত'। 'কথামৃতে'র লেখার কাজ আরম্ভ হইলেই মাষ্টার মহাশয় হবিষ্যাশী একাহারী হইয়া দিন যাপন করিতেন; যতদিন পর্যন্ত মুদ্রণ শেষ হইয়া পুস্তক প্রকাশিত না হইত, ততদিন এইরূপ করিতেন। এ সব মনে করিলে তাঁর অপূর্ব জীবনাবসান খুবই অর্থপূর্ণ মনে হয়। 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগের মুদ্রণ ছাপাখানায় চলিতেছে, জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে। ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে মাষ্টার মহাশয় অসুস্থ হইলেন। পরের দিন ভোর বেলা 'ঠাকুর, মা, আমায় কোলে তুলে নাও' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীজীর ভাষায় বলিতে হয়—'meeting such souls here and there repays for all the nonsense of this life'

ঝরনার গান

শ্রীমতী গীতা হাজরা

(ঐ) নির্ঝরে ঝরে পড়ে স্বপ্নের গান
শুনিতে কি পাও কভু পাতিয়া কান?

সুমধুর সঙ্গীতে
কহে যেন ইঙ্গিতে:
প্রকৃতি লীলায় আছে নিজে ভগবান—
সকলি তাঁহারই রূপ, সবই তাঁর দান।

ঈপ্সিত কামনায়,
লাঞ্ছিত বেদনায়
সবার মাঝারে বাজে অপরূপ তান
সবারি প্রাণের মাঝে আছে তাঁর প্রাণ।

নির্মল সলিলে
আধফোটা কমলে
তাঁহারই অমিয় হাসি করেছেন দান;
অপরূপ স্নেহে ভরা তাঁহার পরাণ।

ভ্রমরের ছলনায়
পুষ্পের বেদনায়
তিনিই তো হ'য়ে যান শুষ্ক ও ম্লান
মায়ার বাঁধনে কাঁদে নিজে ভগবান!
নির্ঝরে বাজে তারই মুক্তির গান।

সাধু শ্রীমাণিক ভাসগর

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

চারজন বিখ্যাত শৈব সময়াচার্যের মধ্যে তিন জনের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন আমরা—তাঁদের অন্যতম শ্রীমাণিক ভাসগরের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

মাদ্রাজ প্রদেশের মাদুরা সহরের নিকট-বর্ত্তী ত্রিভাডাকুর নামক স্থানে শ্রীমাণিক ভাসগর এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম দেওয়া হয় ভাডাবুরার। তাঁর জন্মের সময় নিরূপণ আজ পর্যন্ত সঠিক-ভাবে হয়নি। এই নিয়ে বহু তামিল ও বিদেশী পণ্ডিত অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে কোন দু'জন একমত হ'তে পারেননি। কথিত আছে, অন্য কোন মহাপুরুষের জন্ম তারিখ নিয়ে এত বেশী বাদানুবাদ কখনও হয়নি। খৃঃ প্রথম শতাব্দী হ'তে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বছরকেই বিভিন্ন পণ্ডিতেরা তাঁর জন্মকাল বলে নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। সাধু আপ্পার, জ্ঞান সম্বন্ধর, ও সুন্দররের রচিত 'তেবারমে' মাণিক ভাসগরের উল্লেখ থাকায় ইনি যে ওঁদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। খৃঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সব যুক্তিতর্ক পাঠ ক'রে এইরূপই অনুমিত হয়।

বাল্যকালেই ভাডাবুরার বেদ ও আগমশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অচিরেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাদুরার তদানীন্তন পাণ্ড্যরাজা অরিমর্দন পাণ্ড্য তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে আরূঢ় হলেও তিনি অতি সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। ভোগ-ঐশ্বর্য বা মান-সম্মানের দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। নানারূপ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হলেও তাঁর মনের সাম্য কখনও নষ্ট হয়নি। প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব যথাযথ পালনের পর অবসর সময়ে তিনি ভাবতেন, কিভাবে তিনি তাঁর আচার্যের সন্ধান পাবেন, যিনি তাঁকে চিরমুক্তির পথের সন্ধান ব'লে দেবেন। হৃদয়ের আকুলতা ক্রমশই তীব্রতর হ'তে থাকে। অবশেষে তাঁর জীবনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণ এক আশ্চর্যভাবে উপনীত হ'ল।

রাজা অরিমর্দন শুনতে পেলেন যে তাঞ্জোর জেলায় পেরুন্দুরায় বন্দরে পাঁচটি অতি সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব এসেছে। রাজা ঘোড়া খুব ভালবাসতেন। খবর পাওয়া মাত্র অরিমর্দন বহু টাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ঐ ঘোড়া পাঁচটি কেনবার জন্য পাঠালেন। বন্দরের কাছাকাছি এসে মন্ত্রী মহাশয় হঠাৎ শুনতে পেলেন দূরে জঙ্গল থেকে এক সুমিষ্ট স্তবের আওয়াজ আসছে। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই শব্দ ধরে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন একটি কুরুন্দ বৃক্ষের তলে বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ শিষ্য-পরিবৃত হ'য়ে প্রার্থনা করছেন। তাঁদের দেখেই তাঁর অন্তরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক ভাব ঘন বর্ষার নদীর ন্যায় দু-কূল ছাপিয়ে উঠল। তিনি তাঁর পদমর্যাদা ভুলে গেলেন, উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন। দায়িত্ব, কর্তব্য সব বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদতলে নিপতিত হ'য়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ হ'তে অতি সুন্দর, সুমিষ্ট ও গম্ভীর এক স্তোত্র উচ্চারিত হল। মুক্তার মত স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুন্দর স্তব শ্রবণে গুরু তাঁর নাম রাখলেন, 'মাণিক ভাসগর' (শ্রীমাণিক্য-বাচকর)। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত 'পঞ্চাক্ষর মন্ত্র' পেয়ে তিনি ধন্য হলেন। পুনরায় গুরুর চরণ বন্দনা ক'রে তিনি গভীর সাধনায় ডুবে গেলেন। ঘোড়া কিনবার জন্য যে অর্থ এনেছিলেন, তা দিয়ে সেখানে এক সুন্দর শিবমন্দির নির্মাণ ক'রে দিলেন।

দেরী দেখে রাজাও এদিকে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, এমন সময় অনুচর এসে সব কাহিনী বিবৃত ক'রল। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে প্রধানমন্ত্রীকে তলব করলেন। শঙ্কিত চিত্তে রাজার সম্মুখে এলেন তিনি; রাজার ক্রোধ আরও বর্ধিত হ'ল এবং ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসিত হ'য়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলে ফেললেন 'আবনী' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে শুভ মূলা নক্ষত্রে ঘোড়া এসে পৌছবে। এ-কথায় রাজা বিশ্বাস না ক'রে তাঁকে জেলে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতি নানারূপ অত্যাচারও করা হ'ল। আশ্চর্যের বিষয় নির্ধারিত দিনে দৈব উপায়ে পাঁচটি অতি সুদৃশ্য অশ্ব রাজার আস্তাবলে দেখা গেল। পরীক্ষান্তে অশ্বগুলিকে সর্বোৎকৃষ্ট ব'লে অনেকেই নির্ধারিত করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আস্তাবল থেকে সমস্ত রাত ভীষণ শব্দ আসতে লাগল এবং সকালে উঠে দেখা গেল যে নবাগত অশ্বগুলি বিরাটকায় হিংস্র বন্য শৃগালে পরিণত হয়েছে এবং রাজার পুরাতন অশ্বটিকে মেরে ফেলেছে। রাজার ক্রোধের সীমা রইল না। মাণিক ভাসগরের প্রতি আবার অত্যাচার সুরু হ'ল। তিনি নীরবে সব অত্যাচার সইলেন; কারও প্রতি কোন দোষারোপ করা নেই, নেই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা। কিন্তু ভগবানের আসন টলে উঠল। ভক্তের দুঃখ আর তিনি দেখতে পারলেন না। হঠাৎ দেখা গেল মাদুরা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভৈগাই নদীতে বন্যা সুরু হয়েছে।—সে কি জলস্রোত! সমস্ত শহর জলমগ্ন হওয়ায় আশঙ্কা দেখা গেল। রাজার মনে হ'ল এই সব দৈব দুর্বিপাক মাণিক ভাসগরকে অত্যাচারের ফল। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। ছুটে গিয়ে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তিনি তাঁকে মুক্ত ক'রে দিলেন।

মুক্তি লাভ ক'রে মাণিক ভাসগর মন্দির হ'তে মন্দিরান্তরে তীর্থপর্যটন শুরু করলেন। প্রত্যেক মন্দিরে গিয়েই সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বন্ধে অতি মধুর ভক্তিমূলক স্তবস্তুতি রচনা করতে লাগলেন। তিরুপেরুন-দুরাই মন্দিরে তিনি যে স্তব রচনা করেছিলেন সে গুলি ভক্তির আতিশয্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং দৈবভাবের অভিব্যক্তিতে অতুলনীয়। চিদাম্বরম্ যাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি দৈবাদেশ হ'ল। পথে উত্তর কোশমাঙ্গাই। তিরুকলু-কুণ্ডরম্ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন ক'রে তিনি চিদাম্বরমে উপস্থিত হলেন। সেখানে লঙ্কাদ্বীপ থেকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সে দেশের রাজা ও তাঁর মূক কন্যা এসেছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুর উদ্দেশ্য ছিল রাজার সহায়তায় সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। মাণিক ভাসগরের সঙ্গে তাঁর এক তর্কসভার আয়োজন হ'ল। বহুলোক উপস্থিত। তর্ক শুরু হ'ল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে দেখলেন যে বাক্‌পটু বৌদ্ধভিক্ষু ক্রমশঃ চুপ ক'রে আসছেন। শেষ পর্যন্ত মূকের ন্যায়

তিনি মৌন হ'য়ে রইলেন। মাণিক ভাসগরের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে রাজা তাঁকে সবিনয়ে বললেন, 'মহাশয়, আপনি বাচালকে মূক ক'রে দিলেন, অদ্ভুত আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতা! আপনি দয়া ক'রে আমার এই মূক মেয়েটির মুখ ফুটিয়ে দিন।' মাণিক ভাসগরের দয়া হ'ল মেয়েটির জন্য তিনি অনেকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে তাকে বললেন, 'মা, আমি তোমায় যে সব প্রশ্ন করছি, তার জবাব দাও।' সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে মেয়েটি সুন্দরভাবে কথা কইতে লাগল। রাজা তখন তাঁর অনুগামী সব বৌদ্ধদের নিয়ে শৈবধর্মে দীক্ষিত হলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্বে আবার উড্ডীন হ'ল। মাণিক ভাসগরকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

কথিত আছে, মাণিক ভাসগর যে সব সব রচনা করেছিলেন, শিব নিজে মানুষের রূপ ধরে সেগুলি সঙ্কলন করেন। চিদাম্বরমের অধিবাসিবৃন্দ তাঁকে তাঁর গীতিগুচ্ছের সারাংশ ব্যাখ্যা করবার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সকলকে নিয়ে প্রসিদ্ধ নটরাজের মন্দিরে গমন করেন এবং দেবতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলেন, 'উনিই আমার স্তবস্তুতির লক্ষ্য ও বিষয়, উনিই ভাষা, উনিই ভাব, উনিই ছন্দ এবং উনিই অর্থ।' আশ্চর্যের বিষয়—এই কথা বলার পর সেখানেই সাধক সাধ্যের সহিত মিলিত হলেন। ভৌতিক দেহে মাণিক ভাসগরকে আর দেখা গেল না।

সাধু জ্ঞানসম্বন্ধর, আপ্পার ও সুন্দররের রচনাবলী বিখ্যাত 'তেবারম্' নামে খ্যাত। মাণিক ভাসগরের রচনাবলীকে বলা হয় 'তিরুবাচকম্'। 'তিরু' অর্থে পবিত্র। কথিত আছে যে 'তিরুবাচকম্' পাঠ ক'রে যদি কারও মন না গলে; তবে অন্য কিছুতেই তার মন কখনও গলবে না। যে স্থানে মাণিক ভাসগর প্রথম তাঁর গুরুর দর্শন পান এবং আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেন, তাঞ্জোর জেলার সেই স্থানে মাণিক ভাসগরের অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন—উহা 'আবাডিয়ার কোয়েল' নামে বিখ্যাত। তামিলে 'কোয়েল' বা 'কোবিল' শব্দের অর্থ মন্দির। ঐ মন্দিরে মাণিক ভাসগরের মূর্তি আজও বিদ্যমান।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক রচনাবলীর মধ্যে মাণিক ভাসগরের রচনা অন্যতম। তাঁর রচিত স্তব পাঠে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং ঘোর পাতকীও তার পাপ থেকে মুক্ত হয়। ঈশ্বরের ভাবে সম্পূর্ণ বিভোর হ'য়ে থাকাকালীন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঐ সব স্তবস্তুতি রচিত হয়েছিল। কাজেই সেগুলি পাঠ করলে এখনও বহু ভক্তের শরীর পুলকে শিউরে ওঠে। তাঁর রচিত দু-একটি স্তবের অনুবাদ :

হে দিব্য নর্ত্তক, হে বিভূতিভূষিত ত্রিলোচন, হে পরম পুরুষ, তোমার জন্য কত কেঁদেছি, তোমাকে দেশ-দেশান্তরে কত খুঁজেছি, কই এখনও তো তোমার দেখা পেলাম না! হে আমার পিতা, আমি বড় ক্লান্ত, আর বেশীদিন এখানে থাকব না। তুমিই এ শরীর দিয়েছিলে, তুমিই তা নিয়ে নাও প্রভু। হে ভগবান! তোমার পাদপদ্ম দেবতারাও দর্শন করতে পান না, আমি তোমার বদনকমলের মহিমা দেখার জন্য পাগল, তোমার মধুর হাসি দেখে আমার জীবন সার্থক হবে। আমি যশ চাই না, ধন চাই না, পৃথিবীর সুখও চাই না, স্বর্গও চাই না। পুনর্জন্মেও আমার স্পৃহা নেই, মৃত্যুতেও আমার ক্ষোভ নেই। যারা ভগবান শিবকে চায় না, আমি তাদের স্পর্শ করতেও রাজী নই।

হে তিরুপেরুনতুরাই-এর অধীশ্বর! আমি তোমার চরণকমলে পৌঁছেছি, আর কখনও তা ছাড়ব না। আমার বক্ষে তোমার শ্রীপদ একবার ধারণ করেছি, আর কখনও যেতে দেব না। হে ভগবান! তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কৃপা ক'রে আমার হৃদয়ে তুমি আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তোমার কৃপায় আমার অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, আমার বন্ধনরজ্জুকে তুমি কৃপা ক'রে কেটে দিয়েছ। তুমি আমার অন্তর আলোকিত ক'রে রয়েছ এবং উহা প্রেমে পূর্ণ করেছ। হে প্রভু! কৃপা ক'রে যখন তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছ, তখন আমি আর কিছুই চাই না।

মাণিক ভাসগরের অন্তর ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ, তার মন ছিল অহরহঃ ইষ্ট-চিন্তায় নিরত, জিহ্বা ক'রত সর্বদা ইষ্টেরই গুণগান, কর্ণকুহর সর্বদা উন্মুক্ত থাকত তাঁর কথা শোনবার জন্য। কায়মনোবাক্যে তিনি একেবারে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলেন তাঁর ইষ্টের চিন্তায়। মাত্র বত্রিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। অপূর্ব ছিল তাঁর সাধন-জীবন, অলৌকিক ছিল তাঁর কার্যকলাপ!

যে চারজন বিখ্যাত সময়াচার্যের বিষয় আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, এঁরা বহুসহস্র ভক্তহৃদয়ে আলোকবর্তিকা হ'য়ে বিরাজ করছেন। ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর তাঁদের দিব্য জীবন অনুধ্যান করলে জগতের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, সংসারাসক্তি কমে যায়, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ইহজীবনেই ইষ্টকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষাও মনে জাগে।

প্রকাশ

শ্রীমতী বিভা সরকার

চিত্তের গভীর হ'তে উৎসারিত আলো—
সে তোমারই আলো!
আত্মার অমিত মুক্তি সেথায় প্রকাশে
মৃত্যুহীন প্রাণের উল্লাসে।

হৃদয়ের চির চাওয়া জাগে চিরন্তন
ভাঙে তাই মাটীর বন্ধন।
লোকোত্তর অভিযাত্রী আনন্দ-মহিমা
ছেড়ে যায় এই মর্ত্য-সীমা।

অসীমের পূর্ণলোকে ওঠে সে আকুলি,
যায় স্তব্ধতার দ্বার খুলি।
জীবন-জিজ্ঞাসা ধন্য সেই যে ভূমায়
ধন্য প্রাণ প্রণমে তোমায়।

পরম অমৃত রসে কুম্ভ পূর্ণ আজ,
ধন্য আমি ওগো রসরাজ!
ঘুমন্ত চৈতন্য মোর চিদানন্দে জাগে,
মন মোর জাগে অনুরাগে!

'মহামানবের সাগরতীরে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের Human Society in Ethics and Politics-এর একটা জায়গায় এসে দেখতে পেলাম:

But schools are out to teach patriotism: newspapers are out to stir up excitement: and politicians are out to get re-elected.

বিদ্যালয়গুলি ঝুঁকেছে উগ্র দেশপ্রীতি শেখানোর দিকে, সংবাদ পত্রগুলির ঝোঁক উত্তেজনা সঞ্চারের প্রতি, আর রাজনীতিকদের চিন্তা—আবার কি ক'রে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়।

এর পরেই লেখা রয়েছে—এই তিনের কোনটাই মানবজাতিকে পারস্পরিক আত্ম-হত্যা থেকে রক্ষা করতে সমর্থ নয়। তবে আশা কোথায়? রাসেল্ বলছেন:

The only thing that will redeem mankind is co-operation, and the first step towards co-operation lies in the hearts of individuals.

মানবসমাজকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখে যে একমাত্র বস্তুটি, তা হচ্ছে সহযোগিতা; আর এই সহযোগিতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের উন্মেষ।

আমরা ভিতরে যা, বাহিরে তো তারই প্রকাশ। সুন্দরকে যেখানে অন্তর দিয়ে ভালবাসি, সেখানে কি কখনো স্বেচ্ছায় নোংরামিকে সহ্য করি? মনের মধ্যে ভয় ঢুকলে পৈতৃক প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছায় পা-দুটো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ক্রোধ ঢুকলে মার-মুখো হ'য়ে উঠি। আমাদের বাহিরের আচরণের মধ্যে মনের খেলাটাই প্রায় ষোল আনা। তাই জ্ঞানীরা হৃদয়ের পরিবর্তনের উপরে এতটা জোর দিয়ে থাকেন। যদি মহাযুদ্ধের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত দেখতে চাই, তবে অন্তর থেকে বিদ্বেষভাব তাড়াতেই হবে। যাদের অসাধু মনে করছি, তাদের প্রতি ঘৃণা মানব-সমাজকে কোনকালেই মঙ্গলপথে অগ্রসর ক'রে দিতে পারবে না। আর সত্য-সত্যই এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি, যাকে ঘৃণা করা যেতে পারে? আমরা নিজেরা এমন কি শুভ্রশুচি যে অন্যদের ঘৃণা করবার স্পর্ধা রাখি?

যা কিছু অপরিচিত, তাকে ভয় করাই আদিম নরনারীর স্বভাব। সেই আদিম বর্বরকে রক্তের মধ্যে কি আমরা আজও বহন ক'রে আসছি না? 'ফরাসীরা ব্যাঙ খায়'—তাই ইংরেজের চোখে একজন ফরাসী কি ইংরেজের মতো ভালো হ'তে পারে? ফরাসীদের গুণগান শুনলে সাধারণ ইংরেজ বলবে, 'Nonsense, they talk French and eat frogs.' জেলখানায় আমাদের মধ্যে একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন যিনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন, মেমসাহেবেরা কখনও সতী হ'তে পারে না, কারণ তারা শূকরের মাংস খায়। 'ছাতু', 'মচ্ লিখোর' 'পৌত্তলিক' ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে যে বিদ্বেষবুদ্ধির অভিব্যক্তি, সেই বুদ্ধিতেই ফরাসী ইংরেজের কাছে শুধুই ব্যাঙ-খোর। যাকে জানিনে তাকেই ভয় করি, তাকে ঘৃণাও করি। সেই জন্যে ভয়কে জয় করবার উপায় হ'ল অজ্ঞতা দূর করা—ভয়কে জয় করতে পারলে মন বিদ্বেষবুদ্ধি থেকেও মুক্ত হবে।

কেবল নিন্দাবাদের ছড়াছড়ি! সব কিছুর মধ্যে ছিদ্রান্বেষণের এই মনোবৃত্তিই মারাত্মক। পৃথিবীতে ভালো ব'লে যদি কিছু থাকে সে

হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক দলটি, আমাদের গোষ্ঠীর মানুষগুলি ; আর সবই অপাঙ্‌ক্তেয় —এই রকমের নিন্দাবাদ দূর থেকে দূরান্তরে যারা ছড়াতে থাকে, তারাই কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে ডেকে আনে না? রাসেল্‌ বলছেন:

It is from just such condemnations, when wide-spread, that wars proceed. I have never heard of a war that proceeds from dance-halls.

এই রকমের নিন্দাবাণী যখন দূরপ্রসারী হয় তখনই যুদ্ধবিগ্রহ বাধে। আমি কখনও শুনিনি, নাচঘর থেকে কোন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

* * *

এই দিক থেকেই রামকৃষ্ণ-অবতারের পরম সার্থকতা। 'কথামৃতে'র মধ্যে কারও প্রতি একটিও বক্রোক্তি নেই। সব ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই স্বীকৃতির ঔদার্য 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায়। যত মত, তত পথ—এই সার্বভৌম সত্যকে সকলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব! তাঁর আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর সংগ্রাম, তাঁর ঈশ্বরীয় আনন্দের অনির্বচনীয় অনুভূতি, বিচিত্র সাধনার পথে তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি—এগুলির কি প্রয়োজন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত কোন লাভের জন্যে? শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিতেই যদি তিনি পরিতৃপ্ত থাকতেন, তবে আরতির সময় কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়' ব'লে দিগ্‌দিগন্তে ডাক পাঠাতেন কেন? প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবার সহানুভূতিসূচক উদার মনোভাবের মধ্যেই তো মানবসমাজের ভবিষ্যতের আশার অরুণজ্যোতি! সহানুভূতির ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবার কোন সুযোগকেই আজ আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না।

আর এজন্যে জ্ঞানকেই প্রধান হাতিয়াররূপে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। রাসেলের ভাষায়:

The main thing needed to make the world happy is intelligence, and intelligence can be fostered by education.

জ্ঞান এলে তবে প্রেম আসবে। যেখানে অপরিচয়ের ব্যবধান, সেখানেই ভয়; যেখানে ভয়, সেখানেই তো ঘৃণা।

কত শত বৎসর ধ'রে আমরা হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে পাশাপাশি বাস ক'রে আসছি। ক'জন হিন্দু উপনিষদ্‌ পড়েছে?—জানে হিন্দুধর্মের মর্মকথা? কয়জন মুসলমানই বা কোরানের বাণীর সঙ্গে পরিচিত? নিজের ধর্মই জানে না, পরের ধর্মকে জানতে উৎসাহিত হবে—এমনটি আশা করা ঠিক নয়। তবুও বলবো, হিন্দুমুসলমান উভয়ের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে যে অজ্ঞতা আছে, তা অপসারিত হলেই অপরিচয়ের বিলুপ্তি ঘটবে, জ্ঞানের এই সম্প্রসারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করবে।

* * *

কিছুদিন আগে পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে আরম্ভ করেছি। ইউসুফ আলির অনুবাদের ভাষা চমৎকার। যতই পড়ছি ততই মনে হচ্ছে, সব ধর্মই মূলতঃ এক এবং সত্য। সব ধর্মেই দুটো আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হ'ল ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার আদর্শ দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে মানব-প্রীতির কথা। বাইবেলে সেণ্ট ম্যাথু লিখিত সুসমাচারের দ্বাবিংশতম অধ্যায়ে পড়েছি:

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

This is the first and great commandment and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets.

যীশু তাকে বললেন, তোমার প্রভু জগদীশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত আত্মা দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে। এইটাই হ'ল প্রথম এবং প্রধান অনুশাসন। দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই তুল্য, তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসবে। এই দুটি অনুশাসনই সকল শাস্ত্রের ও সকল ধর্মগুরুর অবলম্বন।

খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসের গুণগান আছে যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাচাই করবার শেষ কষ্টিপাথর তো কর্ম। সাধু জেম্‌স্‌ তাই বলছেন :

What doth it profit my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him?

কেউ যদি বলে তার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তার কর্মের ঘরে থাকে শূন্য ; তবে সেই একক বিশ্বাসের দ্বারা তার কি লাভ হবে? বিশ্বাস কি তাকে বাঁচাতে পারবে?

Thou believest that there is one God, thou doest well: the devils also believe, and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?

তুমি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ভালো কথা। শয়তানেরাও তা বিশ্বাস ক'রে এবং ভয়ে কাঁপে। কিন্তু হে অহঙ্কারী মানব, কর্ম ছাড়া বিশ্বাস প্রাণহীন—এ সত্য কি উপলব্ধি করবে?

সাধু জেম্‌স্‌ বলেছেন আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্মকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসও মৃত। তাঁর কথায় মধ্যেই আছে :

If a brother or sister be naked, and destitute of daily food. And one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body; What do it profit.? Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.

যদি কোন ভাই অথবা বোন বস্ত্রহীন এবং অন্নহীন হয়, এবং তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বলে, শান্তিতে চলে যাও, পেট ভরে খাও এবং শীতের হাত থেকে বাঁচো, অথচ তাদের শরীরের পক্ষে যে সব বস্তুর প্রয়োজন ছিল, সে গুলি তাদের না দেয়, তবে লাভ কি? সেই রকম বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম যুক্ত না হ'লে একা বিশ্বাস মৃতের পর্যায়ে।

কোরানের প্রথম সুরার বা অধ্যায়ের সাতটি আয়েতের পঞ্চমটিতে আছে : Thee do we worship, And Thine aid we seek. করুণাময় তিনি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন কর্তা তিনি, সর্বশক্তিমান্‌ তিনি। শেষ বিচারের দিনে বিচারকও তো তিনিই। এই উপলব্ধি থেকেই ঈশ্বরের ভজনা এবং তাঁর শরণাগতি। বাইবেলে যেমন ঈশ্বরপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে—কোরানেও তেমনি। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ধর্ম হতেই পারে না। আসলে ধর্ম তো 'life before God and in God.' জীবনকে ঈশ্বরের সামনে আরতির দীপশিখার মতো জ্বালিয়ে রাখা, তাঁর মধ্যে জীবনকে নিরন্তর ডুবিয়ে রাখা—এমিয়েল্‌ একেই বলেছেন ধর্ম।

ধর্মের অপরিহার্য দ্বিতীয় অঙ্গটি অর্থাৎ মানবপ্রীতিও কোরানে প্রশংসিত। ঈশ্বরে বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, সেই বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হবে জীবসেবায়। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি কোরানে মর্যাদা পেয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জীবে প্রেম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসকেই বলা হয়েছে ধর্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রেমের

যথার্থ পরিচয় তো কথায় নয়, রসনার মধুতে নয়,—কাজে। সাধু জন্ বলছেন, My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed in truth. কোরানেও কর্মের মাধ্যমে জীব-সেবার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো এবং মানুষকে ভালোবাসো, শুধু এই দুটি কথা বলেই কোরান ক্ষান্ত থাকেনি; কোরানের দ্বিতীয় সুরায় ১৭৭ আয়েতে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

It is not righteousness
That ye turn your faces
Towards east and west;
But it is righteousness—
To believe in God
And the Last Day,
And the Angels,
And the Book,
And the Messengers;
To spend of your substance,
Out of love for Him,
For your kin,
For orphans,
For the needy,
For the wayfarer,
For those who ask,
And for the ransom of slaves.

—কেবল পূর্বে অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করো—এটাই ধর্ম নয়। বাহ্যানুষ্ঠানের উপরে অন্যান্য ধর্মের মতো কোরানেও জোর দেওয়া হয়নি। জোর দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাসের ওপর; বলা হয়েছে, 'আমানা বিল্লা'—ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই ধর্ম। বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, He that loveth not his brother abideth in death, কোরানেও তেমনই বলা হয়েছে। আমাদের ভালোবাসতে হবে পরস্পরকে; সেই ভালোবাসা সত্য হয়ে উঠবে পুণ্যকর্মে, মানুষের অকুণ্ঠ সেবায়। তবেই বিশ্বাসের সার্থকতা! তাই কোরান বলছে : তোমার যা আছে তার থেকে অন্যকে দাও। খ্যাতির লোভে দিও না; দাও ঈশ্বরকে ভালোবেসে। কাদের দেবে? যারা তোমার আত্মীয় স্বজন, যারা 'জিল্ কোরবা' তাদের দেবে। আর কাদের? 'ওয়াল এতামা' অর্থাৎ যারা পিতৃমাতৃহীন তাদের। 'এয়াল মোশা-কিনা' এবং যারা অভাবগ্রস্ত তাদেরও দেবে। 'ওরা ইব্না সাবিল' অর্থাৎ যারা পথের পথিক তাদের প্রতিও সদয় হবে। হিন্দুরা যেমন 'অতিথিদেবো ভব' বলেছে, মুসলমান ধর্মেও তেমনি অতিথি-সৎকারকে ধর্মের কাজ বলা হয়েছে। ধর্মের কাজ বলা হয়েছে, যারা ক্রীতদাস, যারা বন্দী—তাদের মুক্তির জন্য অর্থ সাহায্য করাকে। আত্মকেন্দ্রিকতাকে (Self-centredness) যেমন হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টানধর্ম পাপ বলেছে, মুসলমান ধর্মও তেমনি তাকে পাপই বলেছে। হিন্দুধর্ম এবং খ্রীষ্টানধর্মে যেমন জীবে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তেমনি কি মুসলমান ধর্মেও হয়নি?

হিন্দুধর্মও খ্রীষ্টান এবং মুসলমান ধর্মের মতো ঈশ্বর-প্রীতিকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, জীবে সেবা—এদের আসন ঈশ্বরপ্রেমের নীচেই। 'তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং'—অর্থাৎ প্রীতি-পূর্বক ঈশ্বরকে ভজনা করার আদর্শ গীতার পাতায় পাতায় কীর্তিত হয়েছে। সাধনের রাজা তো স্মৃতি-সাধন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর', নিয়ত তাঁর স্মরণমনন। 'কথামৃতে' পাই :

শম্ভুমল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হ'য়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়; ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়।........ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে

তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারি ক'রে দাও? ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে, ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।' ভক্তির উপরেই ঠাকুর সমস্তটা জোর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভক্তিযোগই যুগধর্ম। কথামৃত—যার মধ্যে হিন্দুধর্মের নির্যাস—সেখানেও দেখি ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্মের মূল। ঠাকুর বলেছেন:

'একটা দৃঢ় ক'রে চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছলে তেলিপাড়াও জানতে পারবে, জানতে পারবে যে তিনি শুধু আছেন—তা নয়। তিনি তোমার সঙ্গে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু মানবপ্রীতির দিকটাকে কি ঠাকুর তবে উপেক্ষা করেছিলেন? তা কেন হবে? হাজরার মায়ের অসুখের সংবাদ এসেছে। ছেলেকে দেখবার জন্যে শয্যাশায়িনী মায়ের মন আকুল। ঠাকুর হাজারাকে বলেছিলেন, 'মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়?' মা যে কাঁদবে—এই ভেবেই না ঠাকুর বৃন্দাবন থেকে দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছিলেন সেজো বাবুর সঙ্গে। নিজে শুষ্ক সাধু ছিলেন না, আমাদেরও শুষ্ক হতে বলেননি। মানুষকে ভালোবাসার কথা বারংবার তিনি বলে গেছেন। তাঁর সংগ্রাম, তাঁর সত্যোপলব্ধির আনন্দ, তাঁর বিচিত্র পথে সাধনা—তাঁর নিজের মুক্তির জন্য কি এগুলির প্রয়োজন ছিল? জগদ্ধিতায়, সারা মানবজাতির মঙ্গলকামনায় কি বিবেকানন্দকে তিনি উৎসর্গ ক'রে দেননি—তাঁর সমন্বয়ের বাণী দিগ দিগন্তে প্রচার করবার কাজে? কি তাঁর প্রয়োজন ছিল তরুণ সন্ন্যাসীদের একসূত্রে বাঁধবার? তাদের জীবনগুলিকে রূপান্তরিত ক'রে দেবার? কী অপূর্ব ভাষায় রলাঁ লিখেছেন:

> This great moulder of souls cast with his fingers of fire the bronze of Vivekananda as well as the delicate and tender wax of Yogananda and Brahmananda.

বজ্রকঠিন বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ, পুষ্পকোমল যোগানন্দের আর ব্রহ্মানন্দের মোম্—সবই নিয়েছেন নিজের হাতে আর আগুনের অঙ্গুলির স্পর্শে সেই মহাশিল্পী প্রত্যেককে গড়ে তুলেছেন তার স্বাতন্ত্র্যের মহিমায়।

কোরানের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে পড়তে দ্বিতীয় সুরার ২৫৬ আয়েতে দেখলাম স্পষ্ট লেখা রয়েছে: Let there be no compulsion in religion. ধর্মের রাজ্যে জোরজুলুমের স্থান নেই। মূল আরবীতে আছে, 'লা একরা ফিদ্‌দীন্'—ধর্মে কোন জোর নয়। ধর্ম তো বিশ্বাসের ব্যাপার। জোর ক'রে কি কাউকে কিছুতে বিশ্বাস করানো যায়? ঐ সুরারই ২৭২ আয়েতে বলা হয়েছে:

> It is not required of thee (Oh Apostle),
> to set them on the right path,
> But God sets on the right path
> Whom He pleaseth.

একথা বলা হয়েছে দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশের সম্পর্কে। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান দান করবার বেলায় ধর্মীয় বাছবিচার করবেন না। ধর্মের ব্যাপারে বিচার করবার মালিক ভগবান—মানুষ নয়। ধর্মান্তরিত করবার জোরজুলুম কেবল যে তরোয়ালের মুখেই প্রকাশ পায়, তা নয়। দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়েও অন্যকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার নজির আছে যথেষ্ট। মুসলমানধর্ম টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অন্যকে

ধর্মান্তরিত করার বিরোধী। ইউসুফ আলি ২৭২ আয়েতের ভাষ্যে লিখেছেন :

For compulsion may not only be by force, but by economic necessity. In matters of religion we must not even compel by a bribe of charity.

* * *

দিল্লীতে টয়েনবী কিছুদিন পূর্বে যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে আছে, বাঘ-সিংহ মানুষকে বিপন্ন করেছে—একথা সত্য। কিন্তু মানুষের কাছে মানুষ আজ যত বিপজ্জনক, বাঘ সিংহ কি তত বিপজ্জনক ? মানুষ রোগের বীজাণুকে জয় করেছে, কিন্তু নিজেকে কি জয় করতে পেরেছে ? আর কি রকমের সব মারাত্মক অস্ত্রে মানুষ আজ সজ্জিত! এই সব মারাত্মক অস্ত্রের কাছে বাঘ আর ব্যাকটিরিয়া তো কিছুই নয়। এই সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে একটা সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যদি যুদ্ধকে বিলুপ্ত না করি, যুদ্ধ নিশ্চয়ই আমাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনার দৃষ্টান্ত আজ সর্বত্র পরিবেশিত হোক্।

'ভারতবর্ষের আদর্শ আজ মানব-সমাজকে পারস্পরিক হানাহানি থেকে মুক্ত হ'তে যতখানি সাহায্য করতে পারে—এমন আর কিছুতেই নয়।'

টয়েন্‌বীর কণ্ঠে বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা ভারত আবার দিগ্বিজয় করবে। সেই দিগ্বিজয়ের ভূমিকায় ভারতবর্ষের অবতীর্ণ হওয়ায় দিন কি এখনও আসেনি ? মত ও পথের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকার করার মধ্যেই কি পৃথিবীর শান্তির ও মানুষের মুক্তির পথ প্রসারিত নয় ?

ধূপগন্ধ

'অনিরুদ্ধ'

ধূপের গন্ধ মন্দির-গৃহ ছায়,
দেবতার স্মৃতি চিত্তে বহিয়া আনে—
স্নিগ্ধ ভকতি উছলি উঠিতে চায়,
ইন্দ্রিয় ধায় ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানে।

ধূপের সুবাস খুলি দেয় রূপ দ্বার,
রূপ গিয়া মিশে অরূপ-বিভব মাঝে;
ভাষা নাই সেই মহিমা বর্ণিবার—
যে মহিমা শুধু আপন সত্যে রাজে।

ধূপ-সৌরভে তাঁহারি স্পর্শ পাই—
অন্তর হ'তে অন্তরতম যিনি,
সকল কামনা তাঁরে নিবেদিতে চাই—
শুভ্র শান্ত পূর্ণ স্বরূপে চিনি।

ধূপের গন্ধে শুনি অনাহত ধ্বনি,
গুঞ্জরি তাহা দশ দিকে তোলে গান;
নিখিল ভুবন আনন্দরূপে গনি,
সে পরম রসে মাতিছে গভীর প্রাণ।

ধূপের গন্ধে নিজেরে মিশায়ে দিয়া
নীরবে একাকী চলি দেবতার পানে,
যত অনুভূতি যতেক প্রকাশ নিয়া
অখিল চেতনা স্তব্ধ নিগূঢ় ধ্যানে।

মধ্যভারত-পরিক্রমা

[গোয়ালিয়র—খাজুরাহো—চিত্রকূট—]

শ্রীঅমরনাথ বসাক

ভ্রমণের নেশা আমার চিরদিনের। সময় সুবিধা পেলেই যাযাবরের মত বেরিয়ে পড়ি। বেশ কিছুদিন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে আসি অভ্যস্ত পরিবেশের পিঞ্জরে। সে-বার ছুটিতে মধ্যভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখব মনে ক'রে একখানা টুরিস্ট গাইড ('Tourists' guide) নিয়ে বসে গেলাম দুই বন্ধুতে।

প্রধান প্রধান স্থানগুলির তালিকা তৈরী ক'রে মানচিত্রে সেগুলির অবস্থান দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে গোয়ালিয়র থেকে যাত্রা শুরু ক'রে খাজুরাহো, চিত্রকূট, অমরকণ্টক, জব্বলপুর ওঁকারেশ্বর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, সাঁচী হ'য়ে কানপুরে ভ্রমণ শেষ করলেই সুবিধা হয়, এবং বেশ একটা পরিক্রমার মতও হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোন্ আস্তানায় আশ্রয় নেওয়া হবে, কদিন কোথায় কাটানো হবে, তার পর অর্থ ও সময়-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান ক'রে ভ্রমণের একটা সূচীপত্র ছকে নেওয়া হ'ল।

অবশেষে আগ্রা হ'য়ে গোয়ালিয়রের পথ ধরেই যাত্রা সুরু করার সিদ্ধান্ত ক'রে দুই বন্ধুতে 'জনতা এক্সপ্রেসে'র জনতায় মিশে গেলাম—১৫ই অক্টোবর।

১৭ই ভোর ৪ টায় টুণ্ডলা ওয়েটিং রুমে বসে আছি। আগ্রার ট্রেনের বিলম্ব আছে। কিছুক্ষণ বাদে কুলি এসে জানালো—দেড় ঘণ্টা বাদে আগ্রা অভিমুখে একটি বাস ছাড়বে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি সুন্দর একখানা আগ্রা-গামী বাস অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র চাপিয়ে বাসের সম্মুখদিকের দুটি আসন দখল ক'রে বসে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসটি যাত্রীতে ভরে গেল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, পূর্ণিমা রাত্রের জ্যোৎস্নাস্নাত 'তাজ' দেখার জন্যই আজ আগ্রাযাত্রীর ভিড়। যাই হোক আগ্রায় পৌছে 'বেঙ্গলী লজে' মালপত্র রেখে, তাজমহল ফোর্ট প্রভৃতি দেখতে বেরুলাম। আগ্রা পূর্বেও এসেছি, কাজেই এ-দুটি দেখা ছিল। দ্বিতীয়বার দেখার সময় প্রথমবারের সে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য থাকে না। সেজন্য পুরানো পড়ার মতো কেবল একবার চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। তাজ-দর্শন-পিয়াসী জনতা চলেছে, পুরুষ নারী চলেছে, চলেছে কৌতূহলী ছেলের দল—মহা উল্লাসে ক্যামেরা নিয়ে।

'তাজ' দেখে ফোর্টে যাবার পথে একটি গাইড জুটে গেল। নানা আখ্যায়িকার অব-তারণা ক'রে সে বিগত দিনের স্মৃতি উদ্গীরণ করতে থাকে। মোগল বাদশার সভাস্থল, বিচার-স্থান, বেগমদের স্নানের জায়গা,—শীতল ও উষ্ণ জলের অভিনব ব্যবস্থা—কোন কিছুই সে বাদ রাখে না। ইতিহাসের পাতায় যে সব খবর পৌছয় না, গাইডদের মুখে তাও শোনা যায়; জানি না, কোন্ সূত্রে তারা এ-সব জেনেছে। বন্দী শাজাহান যে স্থান থেকে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন, যে স্থান গাইড যত্নের সঙ্গেই দেখায়।

ফোর্ট দেখা শেষ ক'রে আমাদের ডেরায় ফিরে আসি। মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রামের পর সন্ধ্যার ট্রেনেই গোয়ালিয়র রওনা হই।

গোয়ালিয়র পৌঁছে স্টেশনের কাছেই অবস্থিত 'অশোক হোটেলে' আশ্রয় পাই। পরদিন সকালে ফোর্ট দেখতে বেরুলাম একটি টাঙ্গা ক'রে; পথে মহম্মদ ঘাউস ও তানসেনের সমাধিস্থানে নামলাম। প্রায় একশতফিট-বর্গ পরিমিত স্থান জুড়ে স্মৃতি-মস্‌জিদ, সমাধিস্থানের উভয় পার্শ্বে দালান। প্রস্তরের দেওয়ালে ঝিলিমিলির মধ্য দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ ক'রে মস্‌জিদের অভ্যন্তর আলোকিত করে। এই সুবৃহৎ স্মৃতি-সৌধের পাশেই নজরে পড়ে তানসেনের ছোট্ট সমাধি-স্থানটি। কথিত আছে, এর পাশেই একটি তেঁতুল গাছ ছিল, তার পাতা চিবুলে নাকি গলার স্বর মিষ্টি হ'ত। বলা বাহুল্য, এ গাছটির আজ আর কোন অস্তিত্বই নেই,—পাতার সঙ্গে ডালপালা শিকড়ও গেছে।

অল্প কিছু দূরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র ফোর্ট। উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত দুর্গটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। দুর্গের সামনে গাড়ী থেকে নেবে দেখি, খাড়া পাহাড় উঠেছে; উপরে সুবিস্তৃত ফোর্টের এলাকা। ওঠবার রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে। শত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য পাঁচ-পাঁচটি সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বারগুলি যে কত সুদৃঢ় ক'রে তৈরী করা হয়েছিল, না দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না। বিশেষ ক'রে মানসিংহের নির্মিত হাতী-ফটকের বৃহৎ ও উচ্চ এবং কারুকার্য-খচিত প্রস্তর স্তম্ভগুলি দেখলে মনে যুগপৎ কৌতুহল ও বিস্ময় জাগে—কেমন ক'রে ঐ বিরাট স্তম্ভযুক্ত প্রবেশদ্বার নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

দুর্গের ভেতর মানসিংহের প্রাসাদ একটি দর্শনীয় বস্তু। নাববার সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদের বেশ নীচে আসা যায়। এখানে রাজা ও মহিষীদের বিশ্রামের স্থান। গ্রীষ্ম অপনোদনের সুন্দর ব্যবস্থা। উপরের অলিন্দপথ দিয়ে নেমে-আসা শীতল বায়ুর স্পর্শ শরীর জুড়িয়ে দেয়। এই সব অভ্যন্তর প্রদেশে আলোকপাতের ব্যবস্থাও মনোরম। এমনভাবে ফোকরগুলি নির্মিত যে সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ করে।

মধ্যে হোমকুণ্ডের মত একটি স্থান নজরে পড়ে। গাইড বলে যে এই স্থানটি রঙীন জলে পূর্ণ করা হ'ত। যুদ্ধ-যাত্রার সময় রাজা এই জলে স্নান করতেন। এর চারিদিকে মানসিংহের আট রানীর ঝুলন। রাজা মধ্যস্থলে থাকতেন, তার চারিপাশ হ'তে রানীদের দোলন স্পর্শ লাগত। গাইড আর একটি স্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যেখানে রাজার পরাজয়ের সংবাদে রানীগণ জহর ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে নিজেদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতেন। একটি তালাবদ্ধ ঘর নজরে পড়ে, এটিতে নাকি পুস্তকাগার ছিল।

মানসিংহের আর একটি কীর্ত্তি 'গুজারি-মহল'। মৃগনয়না-নাম্নী গুজরবংশীয় রমণীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তারই মনোরঞ্জনের জন্য এই প্রস্তর-নির্মিত মহল তিনি তৈরী করান। এই দ্বিতল মহলটির দেওয়ালে রঙীন টালি বসানো আছে, তাতে নানা রকমের প্রাচীন প্রতিকৃতিও বর্তমান। দরজার খিলানে নিখুঁত কারুকার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাসাদের মধ্যে দালান, আর চতুর্দিকে প্রকোষ্ঠ। এই প্রাসাদের মধ্যে মধ্যভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্য-কলার নিদর্শন স্বরূপ বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, পাথরের মূর্ত্তি প্রভৃতি একটি যাদুঘরে (museum) রক্ষিত আছে।

মানসিংহের এই দুটি স্মরণীয় প্রাসাদ ছাড়া ফোর্টের মধ্যে আরও কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু রয়েছে। অনতিদূরে দুটি বিষ্ণু মন্দির, এর

পর 'তেলি' মন্দির দক্ষিণ ভারতের রীতিতে নির্মিত, উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিটেরও বেশী হবে। আরও অগ্রসর হ'লে সূর্যকুণ্ড। জৈনসম্প্রদায়ের কয়েকটি অতি বৃহৎ দিগম্বর মহাবীরের মূর্ত্তিও দুর্গের প্রাচীরগাত্রে দেখতে পাওয়া যায়। পাথরের কাজ—দেখলে মনে হয় সচল, সজীব মূর্ত্তি। বিশেষ ক'রে আদিনাথের ৫৭ ফিট উঁচু দণ্ডায়মান পাথরের মূর্ত্তিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফোর্ট দেখা হলে, গোয়ালিয়রে আর বিশেষ কিছু দেখবার থাকে না। ঝান্সী-রাণীর সমাধি-স্মৃতিটুকু সযত্নে রক্ষিত আছে। গোয়ালিয়রের রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন; তবে বড় জন-বিরল,—কলিকাতাবাসী আমাদের চোখে।

এর পর 'হরপালপুর' স্টেশনে নেমে খাজুরা-হোর বাস ধরি। মাত্র ৬৩ মাইল পথ; কিন্তু পৌছতে সময় নেয় অনেক; মধ্যে 'ছতরপুর' নামক স্থানে বাসটি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। খাজুরাহোতে পূর্ব হতেই সার্কিট হাউসে আমাদের জন্য ঘর সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা ছিল। এখানে সব কিছুরই সুবন্দোবস্ত। চতুর পরিচারক 'ছোটন' অতিথির সুখ-সুবিধার জন্য সব সময় তৎপর। 'ছোটন' বলে হাঁক দিলেই হ'ল, নিমেষে এসে দাঁড়ায়—হুকুম তামিল করে। রাত্রে অতি পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহারের পর সুকোমল শয্যায় আশ্রয় নেবামাত্র চোখে নেবে এল গভীর সুষুপ্তি।

পরদিন দুইবন্ধু ক্যামেরা নিয়ে বেরুলাম প্রাচীন চণ্ডেলা বংশের নৃপতিদের রাজত্বকালে নির্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখতে। প্রত্যেক মন্দিরই বেশ উঁচু পোতার উপর স্থাপিত। নির্মাণ-কার্যে কেবলমাত্র বেলে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। অতি নিপুণভাবে বিরাট বিরাট পাথরে গড়া এই মন্দিরগুলি তদানীন্তন স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করে। মন্দিরের চূড়াগুলি খুব উঁচু ও গম্বুজাকৃতি—বহুদূর থেকে দেখা যায়। মন্দিরগুলি অল্পবিস্তর প্রায় সবগুলি একই ধরনের; সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রশস্ত চাতাল, মধ্যে মন্দির,—যাতে মন্দিরের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করা যায়। মন্দিরের সামনে চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট খিলান, কারুকার্য-সমন্বিত চন্দ্রাতপের ন্যায় আস্তরণ। আরও অভ্যন্তরে নয়নাভিরাম দেবতার বিগ্রহ। খাজুরাহোর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে যে এখানে শিল্পী সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গিয়ে পাশাপাশি শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ ক'রে গেছে। মাতঙ্গেশ্বরের শিবমন্দিরের বিরাট শিবলিঙ্গ দর্শন ক'রে পাশেই অবস্থিত লক্ষ্মণজীর মন্দিরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় শিল্পীর ভেদাভেদ চিন্তার সময় ছিল না। মন্দিরের প্রতিটি অংশে ফুটে উঠেছে ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক চরিত্রগুলি সজীব বলে মনে হয়। শিল্পীর বহুপ্রসারী মন মর্ত্ত্যের সৌন্দর্যও অতি সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই সব মন্দিরগুলির কিছু দূরেই অবস্থিত চতুর্ভুজের মন্দির; যেতে হয় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, পাকা রাস্তা এখনও হয়নি। পায়ে চলা পথ কুলবনের মধ্য দিয়ে, ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে। অপূর্ব এর পরিবেশ! দিক্ চক্রবালের চারিদিকে ঘেরা পাহাড়, দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট গাঁ; মাঝে লতা গুল্ম শোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমস্ত মিলে একটি সুন্দর আলেখ্য। প্রকৃতির পটভূমিকায় বিখ্যাত এই বিষ্ণুমন্দির স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের বিগ্রহ যে এত সজীব, এত স্নিগ্ধ কোমল হ'তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিগ্রহের আয়ত নয়নে যেন শতধা ঝরে পড়ছে অসীম মাধুরী। এ মন্দিরে পূজারী নেই, প্রকৃতিই পূজারিণী। নীরব উপাসনা সতত চলেছে শিশিরে, ফুলসম্ভারে। নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশে বহির্মুখী মন স্বতই গুটিয়ে আসে। ক্ষণেকের জন্য মনের চাঞ্চল্য থেমে যায়। মনে হয় এ দেবতা সহজলভ্য নয়। সাধারণ টুরিষ্টরা

কষ্ট স্বীকার ক'রে এখানে আসে না। কিন্তু যে আসে, সে ধন্য হ'য়ে ফিরে যায়—মনের মণিকোঠায় অমূল্য সম্পদ নিয়ে।

সম্পূর্ণ অন্যদিকে রয়েছে জৈন মন্দিরগুলি। মন্দিরের আকৃতি ও গঠননৈপুণ্য একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে মন্দিরের ভেতর মহাবীরের ছোট বিগ্রহ। শান্তিনাথের বিরাট মর্মর মূর্তি দর্শনে শিল্পীর নিপুণ হস্তের প্রশংসা করতে হয়। আদিনাথ ও পরেশনাথের মূর্তিদুটিও অনুরূপ নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

খাজুরাহের মন্দির গুলির মধ্যে কয়েকটির শেষ অবস্থা। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আজ আর নেই; রয়েছে যোগিনীর কয়েকটি মূর্তি মাত্র। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু কিছু এমন জিনিস পাওয়া গেছে, যেগুলি সযত্নে রক্ষা করা দরকার। এরূপ বহু ভগ্ন মূর্তি বা মন্দিরের দেওয়ালের অংশ-বিশেষ রক্ষিত আছে একটি মিউজিয়ামে।

বিকালের বাসে খাজুরাহো থেকে ফেরার পালা। যতদূর চোখ যায়, সোজা রাস্তা—দুপাশে ঘন জঙ্গল, রাস্তার পাশে মহুয়ার সারি। বাস উর্ধ্বশ্বাসে দৈত্যের মত ছুটে চলেছে। ধীরে ধীরে নেমে আসে রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকার; তারই মধ্যে হেড্‌লাইটের তীব্র আলো দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে চলতে থাকে আমাদের বাস। অবশেষে সন্ধ্যার পর হরপালপুরে ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনেই চিত্রকূট রওনা হলাম।

চিত্রকূটে ভাল আস্তানাই পাওয়া গেল। এই সেই চিত্রকূট, শ্রীরামচন্দ্র ও জনকনন্দিনীর ব্যথাবেদনাময়, আবার তাঁদের নিরন্তর মিলনের পুণ্য স্মৃতিতে যার প্রতিটি ধূলিকণা ধন্য হ'য়ে আছে। এই সেই চিত্রকূট—যার মাহাত্ম্য অমর হ'য়ে আছে বাল্মীকির মহাকাব্যে, তুলসীদাসের 'মানস'-ঝঙ্কারে!

প্রথমে পূতসলিলা মন্দাকিনীতে স্নান ক'রে মন্দির দর্শন করতে বেরুলাম। বহু দেবদেবীর মন্দির রয়েছে এই পবিত্র ভূমিতে। বিশেষ ক'রে 'ভরতমিলনের' মন্দির শ্রীরামচন্দ্র ও ভরতের মিলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। মত্তগজেন্দ্রেশ্বর, রাঘবজীর মন্দির, ব্রহ্মযজ্ঞবেদী, তুলসীদাসের মন্দির প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য মন্দির রয়েছে মন্দাকিনীর ধারে ধারে। তীর্থ-পরিক্রমার চার মাইল পথ একটি পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। ভক্ত জনগণ শ্রদ্ধানত হ'য়ে এই রাস্তা পরিক্রমা করে। লোকে বলে, এই সেই পাহাড় যেখানে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের প্রথম অবস্থায় ছিলেন। যুক্তির জাল না বুনে, ভক্তি-মদিরায় মাতোয়ারা হ'য়ে চলে ভক্তের দল শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত ক'রে।

চোখে পড়ে 'জানকীকুণ্ড'—মন্দাকিনীর এই স্থানেই জানকীদেবী স্নান করতেন। পাথরের ওপর একটি শ্রীচরণের প্রতিকৃতি অদ্যাপি ভক্তিভরে পূজিত হয়। আর ঐ দেখা যায় 'রাঘব প্রয়াগ'—মন্দাকিনী ও পয়স্বিনী নদীর সঙ্গমস্থান, শ্রীরামচন্দ্র এইখানেই স্বর্গত পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করেছিলেন। তুলসীদাসের স্বহস্তরোপিত পিপুলবৃক্ষটিকে নত মস্তকে প্রণাম ক'রে চলে যাত্রীর দল।

ভক্তির জয় এখানে, সরল বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে যুক্তিতর্কের জাল ছিন্ন ভিন্ন। 'হনুমান-ধারা' পুণ্যার্থীদের আর একটি দর্শনীয় স্থান: প্রায় তিনশত সিঁড়ি ভেঙে খাড়া পাহাড়ে উঠতে হয়। উপরে হনুমানের শয়ান মূর্তি, চোখ দুটিতে যেন জীবন্ত দ্যুতি খেলছে। শিয়রে ঝরে পড়ছে একটি ঝরনার জল। অতি পবিত্র ও সুস্বাদু এই বারিধারা। আরও ওপরে একটি গহ্বর—সীতার স্মৃতিতে মধুর ও মহান্ হ'য়ে রয়েছে। (ক্রমশঃ)

পরশুরাম ঃ রাজশেখর বসু

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, বাংলা সাময়িকপত্রগুলির শারদীয়-সংখ্যায় তাঁর একটি রচনা-প্রকাশের জন্য সম্পাদকদের চেষ্টার অন্ত থাকত না। আর গত চার-পাঁচ বছর ধরে শারদীয়-সংখ্যার ভূষণরূপে পরশুরামের রচনা-সংগ্রহের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বহু বিচিত্র নয় পরশু-রামের রচনা-সম্ভার। সেই 'গড্ডালিকা'র যুগ থেকে তিনি প্রধানতঃ হাস্যরসের স্রষ্টা এবং এই হাস্যরসের সৃষ্টিতেই বাংলার একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তিনি হ'তে পেরেছিলেন, এ কম বিস্ময়ের কথা নয়।

পরশুরামের আসল নাম রাজশেখর বসু—সে নামে তিনি 'চলন্তিকা'র সঙ্কলয়িতা, 'লঘু-গুরু', 'বিচিন্তা', 'চলন্তিকা' প্রভৃতি মননশীল প্রবন্ধগ্রন্থের লেখক; 'কুটীরশিল্প', 'ভারতের খনিজ' পুস্তিকা দুটিতে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-প্রচেষ্টায় বিশিষ্ট সহায়ক; রামায়ণ, মহাভারতের সারানুবাদ ও কালিদাসের মেঘদূতের সম্পূর্ণ অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতের সাহিত্য ও সাধনার যোগ্য উত্তরসাধক; বেঙ্গল কেমিক্যালের সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ পরিচালক; সমকালীন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকর্মী ও চিন্তানায়ক। কিন্তু এসব কিছুর উর্ধ্বে ছিল তাঁর প্রজ্ঞাগম্ভীর সংযতবাক্ স্থিতধী ব্যক্তিত্ব। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে সর্ব-শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কাছে রাজশেখর বসু গুরুতুল্য সম্মান পেয়েছিলেন এবং সে সম্মানের কারণ তাঁর বয়সের প্রবীণতা নয়, মননের সিদ্ধি।

কিন্তু বাংলাসাহিত্য ও বাঙালী পাঠক তাঁকে বেশী ক'রে মনে রাখবে তাঁর ছোট গল্পের জন্য। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'—এ তিনখানি গল্পসংগ্রহ পর পর প্রকাশিত হবার পরই পরশুরামের নাম বাংলা সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তাঁর 'গল্পকল্প', 'ধুস্তুরী মায়া', 'কৃষ্ণকলি', 'নীলতারা', 'আনন্দীবাঈ', 'চমৎকুমারী' প্রভৃতি গল্পসংগ্রহ একে একে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি গল্পসংগ্রহের সৃষ্টিসৌন্দর্য পরবর্তী গল্পগুলিতে স্তিমিত হলেও কল্পনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার সংযোগে তাঁর শেষ বয়সের রচনাগুলিও সুসমৃদ্ধ। তাঁর রচনা সংখ্যাবহুল নয় বলেই শারদীয়া সংখ্যা মারফৎ যে দু-চারটি পাওয়া যেত. তাই আমাদের কাছে অনেক বলে মনে হ'ত। আজ সেই মুষ্টি-ভিক্ষাও বন্ধ হ'ল, বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের কাছে এ বেদনা মর্মান্তিক।

রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামটি নিয়েছিলেন পরিবারের স্যাকরা পরশুরামের নাম থেকে। যোগাযোগটি আকস্মিক; তবু যেন পুরোপুরি আকস্মিক নয়। পরশুরামের নির্মমতা তাঁর রচনায় নেই; কিন্তু জাতীয় জীবনের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল সদা-জাগ্রত। 'পরশুরাম' নামটি পৌরাণিক সাহিত্য থেকে এসেছে। 'পরশুরামে'র রচনাবলীর পটভূমিতে ভারতীয় পুরাণ-কাহিনী—বিশেষতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এমন আত্মিক সংযোগ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কারো রচনায় এত গভীরভাবে সাধিত হয়নি। 'রামায়ণ-মহাভারত' চিরায়ত সাহিত্য

(classic literature)[১]—এ দুই মহাগ্রন্থের প্রেরণাস্পর্শে রাজশেখর-তারাশঙ্করও চিরায়ত সাহিত্য-স্রষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। জাতীয় ঐতিহ্যের গভীরে যে প্রাণরস নিহিত আছে, তার দ্বারা পরিপুষ্ট সাহিত্যই চিরন্তনতার অধিকারী। একথা ভেবে দেখবার সময় আধুনিক সাহিত্যিকদের হবে কিনা, জানি না। কিন্তু রাজশেখর ও তারাশঙ্করের রচনাবলীর সার্থকতা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার বিস্তার সম্বন্ধে পাঠকেরা চিরদিন কৌতূহলী। কিন্তু রাজশেখর বসু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন—'জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা, তা ওই রামায়ণ-মহাভারত পুঁথিশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা।'[২] এখানে রাজশেখর নিজের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করেছেন—বাস্তবিক ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও তাঁর দেখার এবং লেখার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি যা দেখেছেন, যেমন ক'রে দেখেছেন—এর আগে আর কেউ তেমন ক'রে দেখেননি। তাঁর সেই দৃষ্টিরহস্য কোথায় ?—একথা চিন্তনীয়। রামায়ণ-মহাভারতের চোখ দিয়ে দেখলে জগৎ সম্বন্ধে কি ধারণা হয়, এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

'মানুষ চিরজীবী নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পনিক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। …এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সুখদুঃখ, মিলনবিরহ প্রভৃতি জীবনদ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনে অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশানবৈরাগ্য প্রচার করেননি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন :

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥

(স্ত্রীপর্ব—মহাভারত)

—সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।'[৩]

এই নির্লিপ্ত দৃষ্টিই রাজশেখর বা পরশুরামের বৈশিষ্ট্য। জীবনের সুখে দুঃখে অচঞ্চল প্রশান্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের আদর্শ; আর ভালো-মন্দ, সঙ্গত-অসঙ্গত, উদ্ভট ও শোভন—সব শ্রেণীর মানুষের দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত—এই ছিল তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে তিনি হাস্যরসেরই স্রষ্টা; তবু তাঁর রচনা পড়ে কোন মানুষ বা শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা বা আক্রোশের ভাব কখনো চোখে পড়ে না। মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েই পরশুরাম হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করতেন। তাই তাঁর হাস্যরসের মর্মস্থলে শান্তরসের প্রসন্ন আবির্ভাব পাঠক হৃদয়কে নিরঞ্জন শুভ্রতায় শুচিস্নাত ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।'[৪] সেদিক থেকে পরশুরাম বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

সাহিত্যে চিরন্তনতার উপাদান সৃষ্টির কারণ সাহিত্যিকের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য, বিষয়বস্তুর

১ মহাভারত (সারানুবাদ) : রাজশেখর বসু (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

২ কথাসাহিত্য, শ্রাবণ (১৩৬০) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ—'শ্রীরাজশেখর বসু'।

৩ মহাভারত (সারানুবাদ) : রাজশেখর বসু (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৪ আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ ('বঙ্কিমচন্দ্র দ্রষ্টব্য)।

মহিমা নয়। পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রগুলি সিদ্ধরস; কিন্তু সমসাময়িক জীবন ও জগৎ থেকেও যে সিদ্ধরসের উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে সেকথা প্রমাণিত হয় আধুনিক শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের রচনায়। পরশুরামের শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া, কেদার চাটুজ্জে,[৫] রায়বাহাদুর বংশলোচন, ভূশণ্ডীর মাঠের শিবু ভট্টাচার্য, নাদু মল্লিক, কারিয়া পিরেত, জিগীষা দেবী, শিহরণ সেন, দোদুল দে, লালিমা পাল (পুং), বিরিঞ্চিবাবা, জটাধর বক্সী, বটস্তীকুমার প্রভৃতি অজস্র চরিত্র এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিদিনের পরিচিতমণ্ডলী থেকেই সাহিত্যের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ।

ঘটনাসংযোগ ও সংলাপবৈচিত্র্য—এ দুয়ের ক্ষেত্রেই পরশুরামের নৈপুণ্য অসাধারণ। তাঁর পাত্রপাত্রীদের সংলাপ থেকে অনেক অংশই বাংলায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। 'হয়, ৼানতি পার না'[৬], 'যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলস হয়েছে',[৭] 'হাড়্ডি পিলপিলায়া গয়া'[৮], 'মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে',[৯] 'মাই ঘড্',[১০] 'আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি',[১১] 'সেকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী'[১২]—এমনি অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে, সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ কৃতিত্ব। সেই সঙ্গে অসামান্য তাঁর বর্ণনাশক্তি। ব্যক্তিবর্ণনায় এ দক্ষতা তো মুগ্ধ করেই, প্রকৃতি-বর্ণনার ক্ষেত্রেও এর নূতনত্ব চমক লাগায়। যেমন ধরুন, 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের' শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী—'শ্যামবাবু বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই......ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর-মত তান্ত্রিক সাধনা করেন।...শ্যামবাবু তাঁহার অফিসঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধ ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—'বাঙ্কা ওরে বাঙ্কা';......বাঙ্কা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দুর-চর্চিত রবার-স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়।' এই 'অটো দুর্গাগ্রাফে'র আবিষ্কর্তা শ্যামবাবুর শ্যালক শ্রী—বি.এস.সি.; কোম্পানীর নামটিও লক্ষণীয়—"ব্রহ্মচারী অ্যাণ্ড ব্রাদার ইন ল"।

'লম্বকর্ণ' থেকে একটি ঝড়ের বর্ণনা: 'ক্রুম্ দুদ্দুড় দুড়্ দড়দড় ড়! আকাশে কে ঢেঁটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসারঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পলাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি

[৫] 'কেদারবাবুকে একবার বললুম, মশাই, আপনার নামটি ব্যবহার করছি, আপত্তি নেই ত? ......অবিশ্যি আমার গল্পের কেদার চাটুজ্জের চেহারা বা চরিত্রের সঙ্গে আপনার কোন মিল থাকবে না।' (কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৬০), পৃঃ ৬৪৫।

[৬,৭,৮] চিকিৎসা-সঙ্কট—গড্ডলিকা।

[৯] লম্বকর্ণ—গড্ডলিকা।

[১০] বিরিঞ্চিবাবা—কজ্জলী।

[১১] মহেশের মহাযাত্রা—হনুমানের স্বপ্ন।

[১২] রাতারাতি—হনুমানের স্বপ্ন।

নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন।··· সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ—ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশানকোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা লম্বা তালগাছগুলো প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগণ্য উইটিবি—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।' এই সঙ্গে 'ভূশণ্ডীর মাঠের' বসন্তবর্ণনা এবং 'জাবালির' আশ্রমে হঠাৎ বসন্তের আগমন ও পলায়নের বর্ণনা স্মরণীয়। প্রকৃতিবর্ণনার মাধ্যমে এমন নিগূঢ় হাস্যরসের সঞ্চারের তুলনা মেলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে এ ব্যাপারে পরশুরামই সার্থকতর।

'ভূশণ্ডীর মাঠে' থেকে আর একটি চরিত্র: 'বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খান্‌কতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া সাদা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয়, সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে গরদের ধুতি, পায়ে তালতলার চটি।···শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ।—ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা?'

মহৎ স্রষ্টার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাঁর সৃষ্টি আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত বন্ধু-স্বজনদের মতই অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠে। রামায়ণ-মহাভারত থেকে পরশুরামের কাল অবধি কল্পনা সৃষ্টি অথচ একান্ত বাস্তব চরিত্র গুলির কথা মনে করলেই এ কথা বুঝতে পারি। পরশুরামের কল্পনা-জগৎ থেকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা একেবারে আমাদের পাড়ার লোক ও আড্ডার সহচর হ'য়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, তাঁর প্রথম যুগের রচনার চেয়ে শেষ যুগের রচনার চরিত্রগুলি একটু বেশী মুখর; প্রথম দিকের গল্প-রচনায় তিনি মূলতঃ গল্পকার, কিন্তু শেষের দিকের রচনায় তিনি প্রধানত ভাষ্যকার। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর সৃষ্ট সব চরিত্র ও গল্প প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক সত্তার অস্তিত্ব-মনস্তত্ত্ববিদেরা প্রায়ই আলোচনা ক'রে থাকেন। রাজশেখর বসুর ভ্রাতা সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসু যদি রাজশেখরের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতেন, তাহলে তাঁর ব্যক্তিত্ব-রহস্য হয়তো অনেকটা ধরা দিত। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের চোখেও পরশুরাম ও রাজশেখর বসু—এ দুটি সত্তার পার্থক্য ও পার্থক্যের অন্তরালে সূক্ষ্ম একটি যোগসূত্র ধরা পড়ে। রাজশেখর নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে

প্রথমাবধি বিনীত ও সঙ্কুচিত। এমন কি কিছুদিন আগে তাঁর জন্মদিনে সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধাভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে 'আমি সাহিত্যিক নই।' সাহিত্য-পণ্ডিত বলতে যা বোঝায়, তাঁর রচনা পড়ে সে পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে না ; কিন্তু যা মেলে তা আসল সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাই রাজশেখর-সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখেছেন "...আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" রাজশেখর বসুর সঙ্গে প্রথম আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শ্রীঅমল হোমকে "ওঁর হাতে কুঠার আছে কি না জানি না, কিন্তু ওঁর অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবুদ্ধির আবর্জনা। --(দ্রষ্টব্য কথাসাহিত্য : শ্রাবণ, ১৩৬০ পৃঃ ৬৫৩,৬৫৪)

পরশুরাম ও রাজশেখর—এ দুই সত্তার মধ্যে যোগ রয়েছে ওই অন্তরের পাবকশক্তিতে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে রাজশেখর মানুষকে দেখেছেন, জীবনকে অনুভব করেছেন। 'কৃষ্ণকলির ভবতোষ ঠাকুর তাই তাঁর' ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন—"মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। এদেশের জ্ঞানীরা একদেশদর্শী নন। তাঁরা অত্যন্ত realist, মঙ্গল অমঙ্গল দুই শিরোধার্য করেছেন, বিরোধ মেটাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বলেছেন—ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। আবার পরেই বলেছেন—"গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্"......গীতায় বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তা ভয়ংকর, কিন্তু তা ধ্যান করলে মনের ক্ষুদ্রতা কমে।......'সকলের দুঃখ বোঝাবার চেষ্টা কর, তোমার দুঃখ কমবে। সকলের সুখে সুখী হও, তোমার সুখ বাড়বে।' মনে হয়, এই ছিল পরশুরামেরও জীবনদর্শন। তাঁর 'জাবালি' ও 'দশকরণের বানপ্রস্থ'—গল্প দুটিতে এই জীবনদর্শনের সার্থক প্রকাশ।

সার্থকতা

শ্রীশান্তশীল দাশ

জীবনে আসেনি জোছনা রজনী
　　তাই কি চোখের জলে
দিবানিশি শত মরম বেদনা
　　জাগে অন্তর তলে?

ব্যর্থ সাধনা, বিফল জীবন—
প্রতি নিমিষেই ছুঁয়ে যায় মন;
ঘন-আঁধারের বুকে ধীরে ধীরে
　　যায় যে জীবন চলে।

মিছে অভিমানে ওরে অভিমানী!
　　করিস নে সংশয়;
কিছুই রে তোর হয়নি বিফল,
　　হয়নি কো অপচয়।

কত ফুল ফোটে, কত ঝরে যায়;
বিফল কিছু তো হয় না ধরায়—
ফোটা কুসুমের সাথে ঝরা ফুল
　　যায় তাঁরই পদতলে।

রোল্যাণ্ড জেনেট

নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির পত্রে জানিয়া আমরা গভীর বেদনা বোধ করিলাম, সোসাইটির একনিষ্ঠ কর্মী রোল্যাণ্ড জেনেট (Rolande Genet) দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেদান্তের শিক্ষা অনুযায়ী তিনি অদ্ভুত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। রোল্যাণ্ডের শরীর যাইবার পর তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীরা সকলে একবাক্যে বলিতেছেন, 'আমাদের সামনে সে মস্ত একটা আদর্শ দেখাইয়া গেল।' সুদূর আমেরিকায় বেদান্তের সম্পর্কে আসিয়া একজন এরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন—এ সংবাদ এ-দেশের ভক্তদেরও প্রাণে প্রেরণা জোগাইবে, মনে করিয়া 'পাশ্চাত্য শিষ্যে'র মর্মস্পর্শী চিঠিখানির ভাবানুবাদ আমরা প্রকাশিত করিতেছি :

বেদান্তের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি জীবন

রোল্যাণ্ড জেনেট বেদান্তের ছাত্র বা ভক্ত ছিলেন, শুধু এইটুকু বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করা হইবে না; তাঁর জীবন ছিল কর্মে পরিণত বেদান্ত। তাঁর জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল—উপনিষদের আদর্শে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবশিব-বোধে সকলের প্রতি সেবা ও সহানুভূতি।

রোল্যাণ্ড জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০৭ খৃঃ ক্যানাডার একটি ফরাসী পরিবারে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

১৯২৪ খৃঃ আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য তাঁদের পরিবার নিউ ইয়র্কে উঠে আসে, রোল্যাণ্ডকে কিছুদিন নৃত্যশিল্প প্রদর্শন ক'রে অর্থ উপার্জন করতে হয়। কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল পড়াশুনায় ও আধ্যাত্মিক চিন্তায়; তিনি ভাবছিলেন, কি ক'রে রোম্যান ক্যাথলিক সংঘে যোগদান করা যায়।

এমন সময় রমাঁ রলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থ (Prophets of the New India) তাঁকে দিল নবজীবনের দিগ্‌দর্শন। স্বামী বোধানন্দজী-পরিচালিত নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে এসেই তিনি অনুভব করলেন, 'এই আমার নিজের ঘর'। স্বামী বোধানন্দের শিক্ষায় দীক্ষায় তাঁর জীবন এগিয়ে চলে।

১৯৫০ খৃঃ শেষ অসুখের সময় রোল্যাণ্ড প্রাণপণে গুরুর সেবা করেন। স্বামী বোধানন্দের দেহত্যাগের পর নবাগত স্বামী পবিত্রানন্দজীকেও তিনি সমভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল উপাসনা, সোসাইটি ছিল তাঁর মন্দির। নিজের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন; গত নয় বৎসর যাবৎ প্রতিদিন তিনি বিশ্রাম না ক'রে দৈনিক ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা কাজ করতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'কাজে আমি আনন্দ পাই।'

যতই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকুন, সহানুভূতির সঙ্গে সকলের কথা শোনবার সময় তিনি পেতেন, রোগীদের সেবা করবার সময়েরও অভাব তাঁর হ'ত না। সকলের দোষত্রুটি ঢেকে রেখে তাদের গুণগুলির উপরই তিনি জোর দিতেন।

এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর স্বভাব ছিল মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত একটি শিশুর মতো। তিনি ছিলেন যেন সকলের ছোট বোনটি।

তাঁর শেষ অসুখের সময় যখন ক্যানসারে শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে—যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি, তখনও তাঁর আনন্দের অভাব নেই, প্রীতিরও অভাব নেই। মৃত্যুর তিনদিন আগে বলেছেন, 'আমার খুব সৌভাগ্য!' তার পরদিন বলছেন, 'যদিও বাইরে আমি দুর্বল, ভেতরে আমি একটা শক্তি অনুভব করছি।' এই রোল্যাণ্ড আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ১৫ই এপ্রিল বিকেলে।

সমালোচনা

Philosophy and Religion: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৬৷৷০।

এই পুস্তকে ১৪টি অধ্যায়ে দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে জটিল তত্ত্বগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আমেরিকাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধানতঃ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সেইগুলি এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে। ১৪টি বক্তৃতার মধ্যে প্রথম দুইটি নূতন এবং কখনও প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই পুস্তকের মুখবন্ধ এবং বিস্তৃত সূচী সম্পাদন করিয়া পাঠকবর্গের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে বেদান্ত দর্শন, সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, শব্দব্রহ্ম, পাপপুণ্যের মীমাংসা, ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা, মুক্তির দিগ্‌দর্শন এবং অন্যান্য বিষয়ে তুলনামূলক (Comparative Study) আলোচনা করা হইয়াছে। নানা ধর্ম ও দর্শনের উদ্ধৃতি থাকায় পুস্তকখানির মূল্য বাড়িয়াছে। গ্রন্থকার শুধু দার্শনিক নহেন, সাধক ও মনীষী। অতি সহজ ইংরেজীতে আলোচনা করায় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকও বিশেষ উপকৃত হইবেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনের দিগ্‌দর্শন করায় যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাও বিশেষ লাভবান্ হইবেন। গ্রন্থকারের বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি পুস্তকখানিকে মর্যাদামণ্ডিত করিয়াছে।

—মৈথিল্যানন্দ

সংগীত কণিকা—১ম ভাগ: শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক: ব্রহ্মময়ী আশ্রম, আকনা, হুগলী। পৃঃ ৩৮, মূল্য ২৲।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে বিশেষ নজর রাখিয়াছেন। গানের স্বরলিপিতে সুরের আলাপের মতো অংশটুকু যোজনা আরও ভাল হইয়াছে। একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। রাগ নির্বাচনে আর একটু দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, মনে হয়। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রথমতঃ বেশীর ভাগ শুদ্ধ স্বর-যুক্ত রাগের চর্চা করা দরকার। এ বিষয়ে পণ্ডিত ও ভাতখণ্ডেজীর রাগনির্ণয় আমাদের সাহায্য করিতে পারে, আর একটি জিনিষ ভাবা দরকার, পুস্তক-রচয়িতা তাঁর পুস্তকে উচ্চাঙ্গ ভক্তিমূলক গান খেয়াল, ঠুংরি, বাউল ও পল্লীগীতি ছাপাইয়াছেন। স্বরলিপি মোটামুটি ভাল। রাগের ও তালের নাম ও পরিচয় পুস্তকটির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

অঞ্জলি: কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসীতানাথ চৌধুরী, ৫।২ মহেশ চৌধুরী লেন হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য টাকা ২'২৫।

লেখক ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁহাদের জীবনীতে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আমাদের সঙ্গীতধারাকে ঠিক কিভাবে চালিত করা দরকার, তাহা বিশেষ করিয়া স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা নিজের নিজের সমালোচনা নিজেই করতে পারি। লেখকের প্রচেষ্টা শুভ, গানের সুরগুলি বর্তমান যুগের মিশ্রণধর্মী ও গতানুগতিক। শুদ্ধরাগের প্রতি লেখকের আরও অনুরাগ থাকা উচিত ছিল।

—'ষড়্‌জ সন্ধানী'

ত্রয়ী—তৃতীয় সংখ্যা (১৯৫৯), বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (L.C.E.) বিভাগের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত।

ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের পত্রিকা 'ত্রয়ী'র তৃতীয় সংখ্যাটি পেয়ে আমরা এই দেখে আনন্দিত যে, যন্ত্রশিল্প লেখার শিল্পকে ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ না ক'রে নতুন নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে সমৃদ্ধ করছে। অবশ্য সব লেখাই যে যন্ত্রশিল্প নিয়ে তা নয়। জীবনের সবটুকুই তো যন্ত্র নয়—জীবন-শিল্প যে আরও ব্যাপক এবং কিছুকেই বাদ দিয়ে নয়, ত্রয়ীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এই কথাই মনে হয় বার বার।

বাংলায় ২২টি (৫০ পৃষ্ঠা) এবং ইংরেজীতে ২০টি (৫০ পৃষ্ঠা) বিষয়সম্ভারে এবারের ত্রয়ী সমৃদ্ধ। এরই মধ্যে আছে সম্পাদকীয়, আমাদের কথা, গল্প, কবিতা; ইংরেজী অংশে পরীক্ষার ফল (Results) এবং বিভিন্ন বিভাগের সচিত্র বার্ষিক বিবরণ (Annual report) ছাত্রদের বহুমুখী সাফল্যের ইঙ্গিত দেয়। টেকনিক্যাল বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যালয়-পত্রিকা ঃ বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় শিক্ষাবিভাগে বিভিন্ন স্তরে তিনটি বিদ্যালয় আছে—নিম্ন বুনিয়াদী, প্রাথমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক। প্রত্যেকটি হইতে এবার এক একখানি বার্ষিক পত্রিকা পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দুটি বিদ্যালয়ের পত্রিকার নাম (১) কচি ও (২) মুকুল। তৃতীয়টির বিশেষ নামকরণ এখনও হয় নাই।

পত্রিকাগুলির বিষয়-নির্বাচন, মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রকাশকদের সুরুচির পরিচায়ক। 'কচি'তে আছে ছোট বড়দের লেখা মোট ৩১টি প্রবন্ধ, 'মুকুলে' ৪০টি। উচ্চতর বিদ্যালয় পত্রিকায় ৩৫টির মধ্যে ৫টি ইংরেজীতে। গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী ছাড়া দু-একটি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা পত্রিকা-গুলির ক্রমোন্নতি কামনা করি।

নির্বাচিত প্রবন্ধ (আর. ডব্লু. এমার্সন): অনুবাদক—অজিত চক্রবর্তী। প্রকাশক—গ্রন্থম্। পৃষ্ঠা ২৬৭, মূল্য টা. ১.৫০।

আমেরিকার মহামনীষী রালফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন—পারিভাষিক বিচারে দার্শনিক নন, কারণ তিনি কোন বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত ক'রে যাননি, তবে তাঁর গভীর জ্ঞান-দৃষ্টি নিয়ে কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের বিষয় তিনি লিখে গেছেন সহজ সরল স্পষ্ট ভাষায়। তাঁর সংগ্রাম ছিল কপটতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। 'কংকর্ড' থেকে প্রকাশিত তাঁর বিরাট গ্রন্থাবলী শুধু আমেরিকারই গৌরব নয়, মানবজাতির গৌরব। চিন্তার জগতে তিনি দেশকাল অতি-ক্রম করেছিলেন, তাই তিনি সর্বকালের—সর্ব-দেশের। সব দেশের মানুষই চাইবে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। মূল গ্রন্থ যাঁরা পড়তে পারবেন না, তাঁদের অবশ্যই অনুবাদের আশ্রয় নিতে হবে। সমগ্র গ্রন্থাবলী পড়বার সময় সকলের হয় না, 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' তাঁদেরই জন্য। বর্তমান গ্রন্থে যে ন'টি প্রবন্ধ বেছে নেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে এমার্সনের আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও দার্শনিক একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। অনুবাদ ভাল হয়েছে—একথা বলতে পারলাম না। শব্দচয়নও সর্বত্র সার্থক হয়েছে—তাও বলা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিদ্যামন্দির—ডিগ্রি কলেজে উন্নয়ন

বেলুড়ঃ—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি আবাসিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, প্রতিবৎসর গড়পড়তা ২০০ জন ছাত্র এই এই শিক্ষায়তনে পড়ে। বিগত ২০ বৎসর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি এই শিক্ষায়তনের সম্প্রসারণ আশু প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ায় মিশন-কর্তৃপক্ষ আগামী জুলাই মাস হইতে ইহাকে একটি তিন বৎসরের ডিগ্রিকলেজে রূপান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এবং আরও বেশী সংখ্যক ছাত্রের জীবনে আদর্শ শিক্ষা যাহাতে সহজ লভ্য হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্তৃপক্ষ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দীর্ঘদিনের আয়াসলব্ধ বিদ্যামন্দিরের উন্নততর শিক্ষামান এবং জীবনধারার গৌরবময় ঐতিহ্য যাহাতে রূপান্তরিত অবস্থায় বজায় থাকে, তাহার জন্য ইহার আবাসিক রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে অধিকসংখ্যক ছাত্রের জন্য নূতন আবাসভবন, ল্যাবোরেটরি, এবং অধ্যাপক ও কর্মীদের জন্য স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

সমস্ত পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে মোট ৩৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মিশন-কর্তৃপক্ষ জমি, গৃহাদি এবং সাজ সরঞ্জাম বাবদ ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সরকারও এই বিষয়ে যথেষ্ট অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও এই পরিকল্পনা কার্যকর করিতে আরও কয়েক লক্ষ টাকার ঘাটতি পড়িবে। জনসাধারণের উদার সাহায্যই ইহা পূর্ণ করিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক (পোঃ বেলুড়মঠ, হাওড়া) আবেদন করিতেছেন। যে কোন প্রকার সাহায্যই ধন্যবাদের সহিত সাদরে গৃহীত হইবে।

কার্যবিবরণী

বিশাখাপত্তনম্‌ঃ বঙ্গোপসাগরের মনোরম উপকূলে ১৯৩৮ খৃঃ এই আশ্রমটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমে নিত্যপূজা, একাদশীতে রামনাম এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠ হয়। সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১,৮৮১; পাঠাগারে ৬টি সংবাদপত্র এবং ১৩টি সাময়িকী পত্রিকা রাখা হয়। আশ্রম-পরিচালিত মধ্য বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৯২টি ছাত্র ও ৩০টি ছাত্রী পড়ে। অল্পবয়স্ক ছাত্রদের খেলাধূলার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে তাহাদের জন্য বহু সচিত্র পুস্তক রাখা হয়। শ্রুতিচাক্ষুষী (audio-visual) শিক্ষার প্রতি এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং মধ্যে মধ্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রদিগকে সরল সংস্কৃতে পাঠ দেওয়া হয়।

ম্যাঙ্গালোরঃ ১৯৪৭খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ কেন্দ্রটি ১৯৫১ খৃঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। এখানে দৈনিক নিয়মিত পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবাদি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা

আছে। আলোচ্য বর্ষে বাল্মীকি-রামায়ণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নিয়মিত আলোচিত হইয়াছিল। আশ্রম-পরিচালিত গ্রন্থাগারে পাঠক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রম কন্নাড় ভাষায় কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বিষ্ণু-সহস্রনাম উল্লেখযোগ্য।

উৎসব-সংবাদ

রাঁচি: গত ২৮শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিশেষ পূজা, ভজন, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে আহূত এক সভায় আদিবাসীদের অন্যতম নেতা শ্রীরামনারায়ণ খালখো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভান্তে ৩৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তনের পর উৎসব শেষ হয়।

ফরিদপুর: গত ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়; অবশেষে সমাগত দশ সহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত উৎসবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

করিমগঞ্জ: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে ও ২১শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিষ্ঠা ও সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে শ্রীধর্মদাস দত্ত এডভোকেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় স্বামী সৌম্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের আদর্শ আলোচনা করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমতের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল হইতে আবেদন জানান।

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা বেজবরুয়া শ্রীসারদাদেবীর জীবনাদর্শের উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করেন ও বর্তমান যুগে নারীসমাজকে শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। স্বামী প্রণবাত্মানন্দও এক সারগর্ভ ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

তারপর ছায়াচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার নরনারী যোগদান করেন।

বরিশাল: গত ২০শে চৈত্র, বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনে শান্ত পরিবেশে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার তিন দিনই শত শত ভক্ত নর-নারী প্রতিমা দর্শন ও উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। মহাষ্টমীর দিন স্থানীয় বিবেকানন্দ ব্যায়াম সঙ্ঘের ব্যায়াম প্রদর্শন সকলকে মুগ্ধ করে। মহানবমীর দিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ রামনামসংকীর্তন করে। প্রায় হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)**:** বহরমপুর শহরে গত ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে মার্চ দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ধর্মসভাতে পৌরোহিত্য করেন যথা-ক্রমে—শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল, এম. এল. সি. শ্রীদ্বিজোত্তম চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীঅপূর্বকুমার মৈত্র। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভার পরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথকতা, খাগড়া-নিবাসী শ্রীসুবোধ-কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের 'রামকৃষ্ণায়ণ গীতি' এবং কীর্তন-রসসাগর শ্রীনন্দকিশোর দাস মহাশয়ের কীর্তন সমবেত জনসাধারণকে আনন্দ দান করে।

এতদ্ব্যতীত বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল। বহু নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সরিষা (২৪ পরগণা) গত ২৪শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় স্বামী বেদান্তানন্দ ও স্বামী রঘুবীরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে বলেন। কলিকাতা ও বেলুড় হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগমে পল্লীর আশ্রমটি আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে।

বক্তৃতা সফর : স্বামী যুক্তানন্দ

তারিখ	স্থান	বিষয়
ফেব্রু ১২	কয়লাঘাট	স্বামী বিবেকানন্দ
মার্চ ৮.	'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চ-	শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৮-২০	আলিপুরদুয়ার—	শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও মা
২২.	আঁটপুর (বিদ্যালয়)	
২৬.	সিঙ্গি	স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম
২৭.		শ্রীরামকৃষ্ণ ও সেবাধর্ম
২৮.		শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা
এপ্রিল ১.	ভাটপাড়া	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন
৩.	ভাঙ্গামোড়া (হুগলী)	"
১৮.	বিষ্ণুপুর	"
২৪.	বলরামপুর	"

বক্তৃতা-সফর : স্বামী প্রণবাত্মানন্দ

গত জানুআরি হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসামের শিলং, হোজাই, করিমগঞ্জ, পাণ্ডু, ধুবড়ী, গৌরীপুর এবং বাংলার আলিপুর দুয়ার জংশন, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, তমলুক, নাটশাল ও মহিষাদল প্রভৃতি স্থানে 'যুগ প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারী ও মাতা সারদা দেবী', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও আচার্য বিবেকানন্দ', ও 'ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে মোট ৩০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৩টি ছায়াচিত্রযোগে প্রদত্ত।

ইংলণ্ডে বেদান্ত-কেন্দ্রের কার্যধারা

লণ্ডন : ৬৮ ডিউক্স এভিনিউ, মাস্ওয়েল হিল, (London, N. 10) অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দের পরিচালনায় প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে ৫ ঘটিকায় উপনিষদ্ আলোচনার পর ধ্যান ধারণার একটি পরিবেশ রচিত হয়। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ টায় সহায়কস্বামী মুখ্যানন্দ শঙ্করাচার্যকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' ব্যাখ্যা করেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ টায় কিংস্ওয়ে হলে প্রার্থনা ও ধ্যান চিন্তার পর বক্তৃতাকারে বেদান্তের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। দুএকটি বিষয় যথা : জ্ঞানের সহজ ও কঠিন পথ, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ, আলোচনার পর প্রশ্নের উত্তর দিয়া সন্দেহ দূর করা হয়। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিলে স্বামী ঘনানন্দ ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাধ্যমেও প্রকৃত জিজ্ঞাসুকে সাহায্য করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-তীর্থ: আমরা গভীর দুঃখের সহিত স্বনামধন্য পণ্ডিত ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হরিদ্বার গুরুকুলে তর্কতীর্থ মহাশয়ের অধ্যাপক জীবন শুরু হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পর কিছুকাল তিনি গবেষণা-অধ্যাপকের কাজও করেন। সংস্কৃত-বিদ্যার উন্নতিকল্পেই তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। প্রাচ্যবাণী মন্দির ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি-রূপে তিনি ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পণ্ডিত—কেহ তাঁহার ছাত্র, কেহ বা গবেষণার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন সাধুও তাঁহার নিকট ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান: প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, ভারতের দর্শন-সমন্বয়, অদ্বৈতসিদ্ধি। এই পরম পণ্ডিতের দেহত্যাগে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা অপরিপূরণীয়। আমরা তাঁহার দেহমুক্ত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

ভক্ত অন্নদারচণ সেনগুপ্ত: গত ২৩শে ফেব্রুআরি (১৯৬০) শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত ৭৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি পূর্ব-বঙ্গের খুলনা জেলার ভট্টপ্রতাপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডাকঘরের সরকারি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশবিভাগের পর তিনি কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। অন্নদা বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের অনেকের সংস্পর্শেই আসিয়াছিলেন। সময় পাইলেই মিশনের বিভিন্নকেন্দ্রের সেবাকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার আত্মা চির-শান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

মৃৎশিল্পী নিতাইচন্দ্র পাল: আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি কুমার-টুলীর খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ দেহত্যাগ করিয়াছেন। উদ্বোধনের সহিত তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন, পূজাসংখ্যায় তাঁহার নির্মিত শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রতিকৃতি একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

উৎসব-সংবাদ

শোভাবাজার (কলিকাতা): শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৬ই এপ্রিল ১এ অমৃতলাল বসু ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সারাদিন পূজা, হোম, ভজন, কীর্তন, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, সাধু-সেবা, প্রসাদবিতরণ, হয়। অপরাহ্নে স্বামী সাধনানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনবেদ আলোচনা করেন।

বলরামপুর (মেদিনীপুর): গত ২৪শে এপ্রিল বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনমঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়, এই উপলক্ষে প্রভাতে উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা এবং পূর্বাহ্নে বেদ উপনিষদ্‌ গীতাপাঠ ও বিশেষ পূজা হোম ভজন কীর্তন ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। মধ্যাহ্নে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ এবং পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিভিন্ন দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গীত সহ কথকতা বিশেষ উপভোগ্য হয়।

বাঁকাটি (মেদিনীপুর) : গত ৬ই চৈত্র রবিবার বাঁকাটি গ্রামে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মস্থান জয়রামবাটী মাতৃ-মন্দিরের নিকটবর্তী এই গ্রামখানি মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই তিন জেলার অন্তর্গত পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসিগণের সমবেত চেষ্টা ও আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব এখানে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ ও অন্যান্য সাধুগণ এই উৎসবে যোগদান করায় গ্রামবাসিগণ বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করেন। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতিসহ ভজন-গান সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। পরে যোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ হয়। প্রায় ২০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

বাবুগঞ্জ (হুগলী) : ২৬শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি হুগলী জেলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী অভজ্ঞানন্দ এবং শ্রীহরিপদ ভারতী। চণ্ডীপাঠ, পূজা, আরাত্রিক, ভজন, হোম, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের প্রাত্যহিক অঙ্গ ছিল। সমাপ্তি-দিবসে নরনারায়ণ-সেবা হয়।

নূতনপুকুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, কালীকীর্তন, প্রসাদবিতরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য-কীর্তন উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ ও সভাপতি বারাসতের মহকুমা-শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সরল ব্যাখ্যা করেন।

কলাইঘাটা : গত ২০শে চৈত্র রাণাঘাটের নিকটস্থ চূর্ণীনদীতীরে কলাইঘাটায় রাণাঘাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা, হোম প্রভৃতি বিভিন্ন পবিত্র অনুষ্ঠানের সহিত পালন করা হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের নরনারী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি ও আনন্দ-কীর্তনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় সংঘের সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদস্পর্শপূত স্থানটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে পর স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সরল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য—নদীতীরে বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়াতলে উৎসব এবং সেইখানেই সহস্রাধিক নরনারায়ণের একত্র প্রসাদগ্রহণ।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে উৎসবের সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতি দোমড়া, (বর্ধমান)। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরারিয়া, (পূর্ণিয়া)। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম, খড়ি-বেড়িয়া, বজবজ। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব-সমিতি, তারকেশ্বর, (হুগলী)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (পূঃ পাকিস্তান)। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খেপুত (মেদিনীপুর)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চক্ কাশীপুর (২৪ পরগণা)। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ঢাকুরিয়া।

টোকিও : জাপানের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে গত ১৪শে মে অপরাহ্ণে—

টোকিওতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষে একটি সভায় ভারতীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ডক্টর পি. কে. বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন জড়বাদী বা যুদ্ধবাদীদের আবেদন ভারতীয় মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না; বেদান্ত দর্শনের প্রতিমূর্তি স্বার্থশূন্য মহাপুরুষেরাই জীবন দিয়ে সে দেশে শিখিয়েছেন, আধ্যাত্মিক শক্তির তুলনায় পার্থিব শক্তি, সম্পদ ও গৌরব অতি তুচ্ছ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভারতের এই ঐতিহ্যের ধারা বর্তমান যুগের ইতিহাসে নিয়ে এসেছেন। স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর প্রেরিত বাণীও সভায় পঠিত হয়।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান

খাদ্য: জাতিসংঘের সদ্যঃপ্রকাশিত (১৯৫৯) বার্ষিক পরিসংখ্যানের যে ৪০টি দেশের হিসাব আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ভারতের খাদ্যমান সর্বপেক্ষা কম। ১৯৩৪-৩৮ খৃঃ এক জন ভারতীয়ের খাদ্যমান ছিল ১,৯৫০ ক্যালরি, ১৯৫৪-৫৬ খৃঃ উহা দাঁড়াইয়াছে ১,৮৯০। ইহার পরবর্তী হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

পুস্তক: উক্ত পরিসংখ্যানে আরও প্রকাশ: যে ৭টি দেশ সর্বাপেক্ষা বেশি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে তন্মধ্যে ভারত পঞ্চম। সোভিয়েত রাষ্ট্র (U. S. S. R.) প্রথম, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) ষষ্ঠ। এই দেশগুলি ১৯৫৮ খৃঃ ১০,০০০-এর বেশি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে।

সংবাদপত্র: প্রতি হাজার জনে সংবাদপত্র প্রচলন এই কয়টি দেশে সর্বাধিক:

যুক্তরাজ্য (U. K.)	৫৭৩
সুইডেন	৪৬২
ফিনল্যাণ্ড	৪২০
জাপান	৪০০

[United Nations' Statistics হইতে সংকলিত]

মস্কোতে বুদ্ধ-দিবস

মস্কোতে সিংহলী দূতাবাসে বুদ্ধপূর্ণিমা (১১ই মে) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার বিখ্যাত সোভিয়েত পণ্ডিত অধ্যাপক রোরিচ (Prof. Yuri Rœrich) বলেন: রাশিয়াতে বৌদ্ধ দর্শন ও কৃষ্টি গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আলোচিত হইতেছে; সম্প্রতি রাশিয়ান একাডেমি হইতে প্রকাশিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর ৩১তম খণ্ডে 'ধম্মপদ' অনূদিত হইয়াছে মূল পালি হইতে রাশিয়ান ভাষায়।

সিংহলের রাষ্ট্রদূত ডক্টর মললশেখর, এখন মস্কো বিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন; এই সভায় তিনি বলেন, বুদ্ধের প্রধান শিক্ষা অহিংসা ও যুদ্ধবিরতি। ভারত, ব্রহ্ম, তাইল্যাণ্ড ও জাপানের রাষ্ট্রদূতগণও নিজ নিজ দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে বলেন।

[Tass হইতে সংকলিত]

বিশ্বশান্তি

শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় ছয় জন বিশ্ববিখ্যাত নোবেল 'শান্তি' পুরস্কার-প্রাপ্ত মনীষী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিবসব্যাপী একটি সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন।

ক্যানাডার মিঃ লেস্টার পিয়ার্সন উহার সভাপতি, অন্য পাঁচজন সভ্য: স্কটল্যাণ্ডের মিঃ জন বয়েড অর, বেলজিয়ামের রেভাঃ পায়ার, ইংলণ্ডের মিঃ ফিলিপ নোয়েল বেকার ও সার নর্মাল এঞ্জেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ র‍্যালফ বুঁশে। [রয়টার

গঙ্গাস্তুতি

অভিনব-বিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
শৈলপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥

[মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত 'গঙ্গাষ্টকম্' হইতে]

নারায়ণের চরণকমলের অপরূপ মৃণাল-লতা, মদনজয়ী মহাদেবের জটাজালের মালতীমালা, মুক্তিলক্ষ্মীর বিজয়পতাকা স্বরূপ ইনি কে জানি না, ইঁহার জয় হউক। কলিকালের কলুষনাশিনী জাহ্নবী আমাদিগকে পবিত্র করুন।

পাপনাশকারিণী, দুষ্কৃতি-নিবারিণী, তরঙ্গভঙ্গিমায় ধাবমানা, পর্বতবিহারিণী, হিমালয়গুহাবিদারিণী ঝঙ্কারমুখরিতা, শ্রীহরির চরণধূলা সিক্তকারিণী মঙ্গলময়ী গঙ্গার বারিধারা সর্বদা আমাদিগকে পবিত্র করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

বাধ্যতামূলক সেবা ও শিক্ষা

দেশরক্ষার জন্য সামরিক বিভাগের স্থান যদি হয় প্রথম সারিতে, শিক্ষাবিভাগের স্থান ঠিক তাহারই পিছনে দ্বিতীয় সারিতে। বিশেষতঃ যে দেশের সীমান্ত বিপন্ন, সে দেশকে সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার দিকে। জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও শৃঙ্খলা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলাও শিখিতে হইবে। শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা দেশ রক্ষা করা যায় না, দেশের সাধারণ উন্নতি-সাধনও সম্ভব নয়। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শিক্ষার সহিত শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজন।

ছাত্র-বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া কয়েক মাস পূর্বে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম, ব্যাপারটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় সমস্যা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার বর্ষশেষে ঋতুচক্রের পুনরাবর্তনের মতো আবির্ভূত হয়।

তবে শুভ লক্ষণ এবার এই যে শিক্ষাবিদ্‌গণ ব্যাপারটি সব দিক দিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ কোন কোন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ-বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষগণের মতামত আহ্বান করেন, কোন কোন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য (Chancellor) সেই প্রদেশের উপাচার্যগণকে লইয়া আলোচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় - সাহায্য - মঞ্জুরি - সমিতি (U.G.C.) কিছু কাল পূর্বে এই সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তাঁহারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বহুক্ষেত্রে তাঁহারা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাহির হইতে বিভিন্ন রাজনীতিক দল ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলাভঙ্গে উত্তেজিত করে। এ বিষয়ে কমিটির প্রস্তাব: রাজনীতিক দলগুলি যেন ছাত্রদের লইয়া টানাটানি না করে; শিক্ষার পবিত্র প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে।

ছাত্রদের অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিচিত্র রূপ ও বহুবিধ কারণ তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান—শিক্ষার সহিত পরীক্ষার যোগাযোগের অভাব। পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে, কিন্তু সহসা কোন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার অভাব দূরীকরণে কমিটির প্রস্তাব: ছাত্রানুপাতে শিক্ষক-সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, এবং শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন দিতে হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে তবেই শিক্ষার, শৃঙ্খলার ও ছাত্রদের উন্নতি হইবে; নতুবা নয়।

উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিহীন বহু ছাত্র কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, এবং শিক্ষালয় বাজারে পরিণত হয়। ছাত্র-ভরতির ব্যাপারে গুণানুসারে নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। যাহারা উচ্চশিক্ষায় আসিতে পারিল না, তাহাদের জন্য শিল্প- ও জীবিকাশিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যাহাদের উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা আছে

তাহারা যাহাতে উপার্জনক্ষম হইয়া সান্ধ্য শ্রেণীতে এক-একটি বিষয় পড়িতে পারে, এরূপ কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহা হইলে আর উচ্চশিক্ষার দ্বার কাহারও নিকট চিরতরে রুদ্ধ করা হইল না।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় অবলম্বিত 'আইন অমান্য'-নীতিটি ছাত্রেরা জীবন-নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং রাজনীতিক নেতারাই আজ তাহাদের জীবনের আদর্শ, ইহাও কমিটির দৃষ্টি এড়ায় নাই।

সংবাদপত্রে রাজনীতি ও ছাত্র-আন্দোলনের সংবাদগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই ছাত্রেরা ঐ বিষয়ে উৎসাহ বোধ করে। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমেই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে দেশের নেতা হইবার পথ প্রস্তুত হয়,—একথা আজকাল স্কুলের ছাত্রেরাও বুঝিতে শিখিয়াছে।

ভারতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেইজন্যই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বাড়িতেছে;—কমিটির এ কথার তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দু-চার জন হয়তো ১৪।১৫ বৎসর বয়সে উচ্চবিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে, কিন্তু অধিকাংশই করে ১৬।১৭ বৎসরে। অথচ এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীদেশমুখ বলিতে চাহিয়াছেন, অতি অল্প বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া আরম্ভ না করিয়া মাঝে এক বছর বাধ্যতামূলক জাতীয় সেবায় কাটাইয়া ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হউক,—এ প্রস্তাবেরও তাৎপর্য দুর্বোধ্য!

অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিয়া শেষে আমরা এইটির সমালোচনা করিব।

কমিটি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। শিল্প ও জীবিকার্জনের বিদ্যালয়-সমূহে—যেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ব্যবহার শান্ত, সংযত; তাহাদের মধ্যে একটা দায়িত্বের ভাবও লক্ষিত হয়।

শিক্ষার মাধ্যম ছাত্রদের অশান্তি ও অসন্তোষের আর একটি কারণ, ইংরেজী আজ-কাল অনেক ছাত্রই বুঝে না; অথচ ছাত্রের মাতৃভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। দুই মিলিয়া ছাত্রের মন একটা হতাশা ও বিফলতার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন পড়াশুনার বাহিরে সে যে আনন্দ পায়, যে সার্থকতা অনুভব করে, তাহাতেই সে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়। ছাত্র-পরিষদগুলি এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি-গুলিকে কমিটি বলিয়াছেন, ছাত্রদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগ শীঘ্র মিটাইয়া দিবার প্রয়াস করিলে ছাত্রেরা কর্তৃপক্ষকে শ্রদ্ধা করিবে। কোন ছাত্রের গুরুতর দুর্ব্যবহারের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে। অবশ্য শাস্তি দেওয়াই শিক্ষকের বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়, সংশোধনের জন্য এবং প্রতিষেধক হিসাবেই শাস্তি দিতে হইবে। শিক্ষকেরাই ছাত্রদের বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পথ-পরিদর্শক। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে চমৎকার উপাদান আছে, তাহারাই আমাদের ভবিষ্যতের আশা, উপযুক্ত শিক্ষা ও সময়োপযোগী নির্দেশ পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই দেশকে গৌরবান্বিত করিবে।

ছাত্রদের শৃঙ্খলা-শিক্ষা দেওয়ার একটি পরিকল্পনা রচনা করার জন্য আর একটি কমিটি গঠিত হয়, তাহার নাম 'জাতীয় সেবা কমিটি' (National Service Committee)। ইহার সভাপতি স্বয়ং শ্রীদেশমুখ, তিনি অনুমোদন করি-য়াছেন : বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রকে কমপক্ষে নয় মাস বা এক বছর সামাজিক

বা শারীরিক পরিশ্রমের কোন সেবাকার্য করিতে হইবে। উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরই তাহারা এই বাধ্যতামূলক সেবাকার্যে নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলে দেশ-সেবার সহিত শৃঙ্খলা-শিক্ষার পর একটু পরিণত বয়সে অর্থাৎ একবৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হইয়া শান্তভাবে তাহারা পড়াশুনা করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনায় সামরিক শৃঙ্খলা-শিক্ষা, শারীরিক পরিশ্রম এবং কিছু সাধারণ শিক্ষাও অন্তর্গত হইতে পারে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার ভার থাকিবে—এজন্য গঠিত একটি জাতীয় পরিষদের (National Board) উপর। ইহা চালু করিবার পূর্বে শিক্ষাবিদ্‌গণ, শাসন-বিভাগের কর্মচারিগণ এবং দেশরক্ষা-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ মিলিয়া শিক্ষা-সূচী ও কর্মসূচী প্রস্তুত করিবেন।

গত ১৫ই ও ১৬ই জুন পুনায় জাতীয় আরক্ষা শিক্ষায়তনে (National Defence Academy) অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-গণের সম্মেলনে শ্রীদেশমুখ আমাদের বর্তমান উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া শৃঙ্খলা-শিক্ষার উপর অধিকতর জোর দিয়া বাধ্যতা-মূলক জাতীয় সেবার পরিকল্পনাটি আলো-চনার জন্য উপস্থাপিত করেন। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলেন : সমাজের কোন সেবা না করিয়া যুবকেরা সমাজের নিকট সুখ-সুবিধা আশা করে। তাহারা কর্তব্য না করিয়া অধিকার দাবী করে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহারা দেশের সেবা করিতে শিখিবে, শৃঙ্খলা শিখিবে, ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হইবে।

কেহ কেহ সমালোচনা করেন, যুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলক জাতীয় সেবার কর্মসূচী থাকিলেও শান্তির সময় থাকা উচিত নয়। তাহাদের উদ্দেশ্যে ডঃ শ্রীমালীর উত্তর : যদিও দেশে এখন তেমন কোন সঙ্কট নাই, তথাপি সীমান্ত আর পূর্বের মতো নিরাপদ নয়, দেশের অন্ত-র্নিহিত শক্তি সর্বদা সংগঠিত করিয়া রাখিতে হয়, উহা শান্তিকালেও কাজে লাগিবে, সঙ্কট-কালেও কাজে লাগিবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাও দেশমুখ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন, তিনি এই প্রস্তাব সর্বতোভাবে সমর্থন না করিয়া ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত, এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-মূলক ভাবে ছোটখাটো একটি অগ্রগামী দলের ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তবে ইহাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ প্রস্তাব-টির মহৎ উদ্দেশ্য সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন, এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ডিগ্রি কলেজে যাইবার পূর্বে একটি বৎসর শৃঙ্খলা, সহ-যোগিতা, জাতির সেবা প্রভৃতিতে কাটানোর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন; তবে তাঁহারা সরকারকে পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে বলেন, শিক্ষাসূচী প্রস্তুত ও শিক্ষক-শিক্ষণের পর সকলের সম্মতি সংগ্রহ করিয়া তবে এই ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনা চালু করা উচিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জীবনে ব্যাপারটি গুরুতর, তাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্যাটির প্রকৃত রূপ ও সমাধান-প্রচেষ্টার প্রস্তাব-গুলি আমরা উপস্থাপিত করিয়াছি। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় সমস্যা, আবার প্রত্যেক ঘরেরও সমস্যা। প্রত্যেক পিতামাতা, অভি-

ভাবক, শিক্ষক—সকলেরই এ বিষয়ে চিন্তা করিবার এবং কিছু বলিবার অধিকার আছে।

প্রথমতঃ বয়সের প্রশ্ন ধরা যাক। ১৪ বৎসরের ছাত্র কোথায় ক-জন ডিগ্রি কলেজে ভরতি হইতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমরা যতদূর জানি ১৪ বৎসর বয়সে ছাত্র জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে। ৮ম শ্রেণীর পরে সে হয় সাধারণ পড়া শেষ করিয়া শিল্পবিদ্যালয়ে যাইবে; নতুবা বহুমুখী (৯ম-১১শ শ্রেণীর) বিদ্যালয়ে ভরতি হইবে। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭ বৎসর বয়স ডিগ্রি কোর্সের ১ম বর্ষে ভরতি হওয়ার পক্ষে এমন কিছু কম বয়স নয়।

আমাদের মনে হয়, এই জ্ঞানোন্মুখ বয়সে ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যাহত করা সমীচীন নয়। অব্যাহতভাবে ডিগ্রি কোর্স অথবা শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জাতীয় সেবার স্থচীতে ছাত্রদের যোগদান করা উচিত। যদি জীবিকার্জনের তাগিদে তাহা সম্ভব না হয়, তবে ঐ-সকল শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ঐ তিন চার বৎসরের মধ্যেই প্রতি সপ্তাহে দুদিন (যেমন পূর্বে U. T. C.তে ছিল) সামরিক শৃঙ্খলা শেখানো চলিতে পারে এবং বার্ষিক অবকাশসময়ে জাতীয় সেবার কর্মস্থচী অনুযায়ী কাজ করানো যাইতে পারে।

পরিশেষে এ সম্বন্ধে বক্তব্য উচ্চ শিক্ষার পর কেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেবা কখনও বাধ্যতামূলক হয় না, যথার্থ সেবা স্বেচ্ছামূলক; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই এমন আবহাওয়া ও আদর্শ থাকিবে, যাহা দেখিয়া ছাত্রেরা শিখিবে জীবনের প্রতিটি কাজই দেশের সেবা, মানুষের সেবা। বিনা পারিশ্রমিকে মাটি কাটা বা গ্রামে গ্রামে শিক্ষাদানই সেবা নয়। প্রয়োজন হইলে তাহা অবশ্যই কর্তব্য, এই প্রকারে সেবার মনোভাব স্থষ্টি করাই এরূপ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। প্রবন্ধ বা বক্তৃতা অপেক্ষা তার জন্য প্রয়োজন জলন্ত জীবন্ত আদর্শ—সেবায় সমর্পিত শিক্ষক ও নেতাদের জীবন।

পরিতাপের বিষয়

ধর্ম লইয়া উন্মত্ততা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তাহার বিষময় ফল—দেশবিভাগের বিয়োগান্ত নাটক আমরা দেখিয়াছি; তার পর শুরু হইয়াছে ভাষা লইয়া উন্মত্ততা এবং তজ্জনিত ভ্রাতৃ-বিরোধের পালা। অল্পসংখ্যক দুর্বৃত্ত কিভাবে শান্ত জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করিতে পারে, তাহার বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি ভারতের পশ্চিমে, দক্ষিণে, এখন এই বিপদ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। ভাষা একটু পৃথক হইলে কর্তব্যরত রাষ্ট্রসেবকেরও জীবন বিপন্ন, স্ত্রী-পুত্রকন্যা লইয়া মানুষকে জনপদ ছাড়িয়া জঙ্গলে সর্পব্যাঘ্রের নিকট আশ্রয় লইতে হইতেছে! ভ্রান্ত রাজনীতিক অধিকার-বোধ মানুষকে আজ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে!

র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব অস্বীকার করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সেই দুইটি বিষবৃক্ষেরই ফল আজ আমরা ভোগ করিতেছি। জানি না এই আত্মঘাতী ভাবের পরিণাম কি, এর পরিসমাপ্তি কোথায়?

চলার পথে

'যাত্রী'

হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটুখানি রাজত্ব। তাকে ঘিরেই সবার আজ 'সাজ সাজ' রব। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, আতুর-অভ্যাগত, বালক-বৃদ্ধ—যে যেখানে আছে সকলের মনেই সেই অপূর্ব মানবকে দেখার আশা উঁকি মারছে। সকলেই ভাবছেন, কখন আসবেন তিনি, কখন দেখব তাঁকে ? প্রতীক্ষার উত্তাল ঢেউ তখন সকলের মনের তটেই বিচিত্র লীলায় সমুদ্বেলিত। যাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে তারা, অনেক দিন, অনেক রাত ধরে, সেই তিনি আসছেন। বহুদিন পরে তাদের এই মিলন-প্রতীক্ষা সার্থক হবে, মনের আকাঙ্ক্ষাও মিটবে।

যিনি আসছেন তিনি কিন্তু রাজা নন ; রাজত্ব কেড়ে নিতেও তাঁর আগ্রহ নেই। নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হ'য়ে ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র নিয়েই তিনি ফিরছেন দেশে দেশে। কিছু নেই, তবু কি এক মহা ঐশ্বর্যে তিনি ধনবান। দানের শ্রেষ্ঠ মহিমায় চিরস্মরণীয়! একদিন এক ছোট্ট ছাগশিশুর জীবন বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণটাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে তুলে ধরতে তাঁর বাধল না! সেই রাজার রাজা আজ বহুদিন পরে নিজের জন্মস্থানে ফিরছেন।

আনন্দ ও বেদনার, অশ্রু ও পুলকের অভাবিত মিশ্রণ বহন ক'রে আজকের এই ক্ষুদ্র রাজধানী কপিলাবস্তু তাই তাঁর অভিনন্দনে মেতেছে। তাঁকে দেখবার জন্য জরাগ্রস্ত পেয়েছে যৌবনের শক্তি ; খঞ্জ পেয়েছে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মনোবল ; অন্ধ পেয়েছে দিব্যদৃষ্টি ; ভগ্নদেহ পেয়েছে স্বাস্থ্যের অরুণিমা। কেমন এক যাদু মন্ত্রবলে সবকিছুই যেন আজ আনন্দায়িত হ'য়ে উঠেছে—শুধু মানুষ নয়, পশু-পক্ষীও। বৃক্ষ-বাতাস সবকিছুই এই মহাপ্রতীক্ষায় বিভোর! সকলের চোখেই দেখার আগ্রহ পড়ছে ঝরে! প্রাণ-পুতুলি সন্ন্যাসী-পুত্রকে বহুদিন পরে দেখার আকুলিত আগ্রহে পিতা শুদ্ধোদনের প্রাণে নবজীবনের বান ডেকেছে। এক তীব্র আগ্রহ বৃদ্ধকে আজ স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এই আনন্দের মাঝেও কিন্তু বৃদ্ধের বুকে একটা পুরাতন ব্যথা রিনিয়ে উঠছে—সেই সঙ্গে একটু ভয়ও। বৃদ্ধ ভাবছেন, এই ত্যাগি-সম্রাটের সবছাড়া-নেশার টানে পড়ে বংশের একমাত্র দুলাল, উত্তরাধিকারের একমাত্র প্রদীপ রাহুল,—সে আবার রাজত্ব ছেড়ে ভিখারী হ'য়ে যাবে না তো? কি জানি তাই যদি হয়! তাই শুদ্ধোদন ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন : রাহুলকে কেউ যেন তার পিতৃ-পরিচয় না দেয়, দিলে হবে তার কঠোর শাস্তি। এই কঠিন বিধানের বাঁধ দিয়ে শুদ্ধোদন ঐ ত্যাগের মহাপ্লাবন থেকে রাহুলকে বাঁচাবেন, ঠিক ক'রে রেখেছেন। মানুষের সীমায়িত ক্ষমতার এই অক্ষম আস্ফালন দেখে সে দিন বিধাতাপুরুষ বোধ হয় অলক্ষ্যে একটু হেসেছিলেন!

বুদ্ধ এসেছেন রাজধানীতে। আজ সকলে একসঙ্গে নয়, এককভাবে—পিতা, মাতা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ গৃহে সিদ্ধার্থকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনিও প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তাই আজ বহুদিন পরে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি যশোধরারও গৃহের দরজায়। তাঁর দিগন্তবিস্তৃত ক'রুণার সমুদ্রে তাই আজ অবিরাম কলোচ্ছ্বাস!

মহাবুদ্ধের উজ্জ্বল কান্তিতে ভাসছে এক আকর্ষণ! তাঁর দেহ-মন ঘিরে কেমন এক যাদু ঘনিয়ে আছে। সাত আট বছরের পুত্র রাহুলও সেই অনন্ত আকর্ষণে কাছে এসে দাঁড়াল। এই অভাবনীয় পরিবেশে বুদ্ধের দেহের ছায়া পড়ল তার গায়ে। এই দুর্লভ ঘটনায় ঐ বালকের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল। বিস্মিত কণ্ঠে রাহুল তার মাতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, 'মা, উনি কে? ওঁকে আমার বড্ড ভাল লাগছে যে! উনি আমার কেউ হন নাকি?' যশোধরা পুত্রের এই কৌতুহলী প্রশ্নে প্রমাদ গণলেন। তাঁর স্মৃতির সমুদ্রে আজ চিন্তার তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে উঠল। ক্ষণিক বিমনা হ'য়ে আবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন। একবার ভাবেন, পুত্রকে জানিয়ে দিই— ঐ মানব-সূর্য তোমার পিতা। আবার পরক্ষণেই অবুঝ দুশ্চিন্তার পীড়নে অশান্ত হ'য়ে ভাবেন, এর ফল যে ভীষণ হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাহুলকে তাঁর ঐ পিতৃত্বের দীপ্ত পরিচয় না জানিয়ে তিনি পারলেন না। পারলেন না তাঁর মৌনবুকে আটকে রাখতে, ঐ শিশুর কাছে—নিজ স্বামীকে স্বামী ব'লে জানাবার দুরন্ত আগ্রহকে। তাই যশোধরার অশ্রুসিক্ত ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরণন উঠল, 'রাহুল, ঐ পুরুষসিংহ—ঐ ভিক্ষুই তোমার পিতা।' এক নিমেষে কি যেন কি হ'য়ে গেল! যশোধরা বলেছেন, তাই শুদ্ধোদনও আর শান্তির খড়্গ তুলে ধরতে পারলেন না। এধারে রাহুলের সুলক্ষণযুক্ত মনটি বৈরাগ্যের ভাবে ভরপুর হ'য়ে গেল। তার শিশুমন কৃতনিশ্চয় হ'ল—গৃহ ছেড়ে পিতার মতই ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সন্ন্যাসী হবে সে। বুদ্ধও সায় দিলেন তাতে। নিকটেই দণ্ডায়মান সারিপুত্রকে বললেন—রাহুলকে সঙ্ঘভুক্ত করতে। বিহ্বল মুগ্ধতায় সারিপুত্র রাহুলের ডানহাত ও শিষ্যশ্রেষ্ঠ মোদ্‌গল্লায়ন তার বাঁ হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন, দিলেন ত্যাগের সজ্জা, দেখালেন ত্যাগের শয্যা। বুদ্ধের নির্দেশে ঐ একান্ত-সমর্পিত-প্রাণ বালক তখন আবৃত্তি করতে লাগল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। অদ্ভুত পিতার অদ্ভুত পুত্র আজ নির্বাণ-সাধনায় সঞ্জীবিত। দুই আত্মা আজ জ্যোতি-সমুদ্রের মহাপ্লাবনে একাকার হ'য়ে গেল মিশে। এখানে তখন মাতা নেই, পিতা নেই, বন্ধু নেই, ইচ্ছা নেই, আকার নেই; এক তন্ময়তায় সবকিছু ভরপুর।

চল পথিক, আমরাও আমাদের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এই মন-রাহুলকে উদ্বোধিত ক'রে বৃহত্তর আনন্দের চির শাশ্বত অগ্রগতির দিকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পা বাড়াই। নিগূঢ় প্রেমের ঐ অখণ্ড সত্তার মাঝে নিজেকে দিই বিলিয়ে। চল অমৃত-সমুদ্রের মৃত্যুহীন মহাসম্ভাবনার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ি। চল, চল আর দেরি নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের (আষাঢ় সংখ্যার) উদ্বোধনে ৩২৩ পৃষ্ঠায় 'পরশুরাম: রাজশেখর বসু' প্রবন্ধের

(১) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় পঙ্‌ক্তি—'চলন্তিকা'র স্থলে পড়িবেন 'চলচ্চিন্তা'।

(২) দ্বিতীয় স্তম্ভের পঞ্চম পঙ্‌ক্তি—'চমককুমারী'র স্থলে পড়িবেন 'চমৎকুমারী'। [উঃ সঃ]

সজল মেঘোৎসবে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সন্ধ্যার যূঁথী-সৌরভমাখা স্মরণ-মধুর রাতি ;
কে জপিছে বসে মন্ত্র নীরবে পরাণের মালা গাঁথি ?
দিবসের খেলা হ'য়ে গেছে সমাপন।
নিমেষে নিমেষে চমকে দামিনী,
কোথায় জীবন-সাথী ?
পঙ্কিল পিচ্ছিল—
পথ ঘাট আর গুণ্ঠিত বাতায়ন।
ঘুমে-ঢাকা মঞ্জিল,
তারি মাঝে ধরা বর্ষা-ধারায় কার করে আরাধন !

বহু জনমের আবছায়া স্মৃতি তরু মর্মরে দোলে,
আকাশ-কুসুম স্বপ্ন-মদির গীতি-গুঞ্জন তোলে
নিশুতি নিশায় নিষ্ফল আশা লয়ে।
ছায়াতরী চলে সুদূরের পানে তটিনীর কল্লোলে,
আকাশের বুকে
মেঘের মিছিল চলেছে ঝঞ্ঝা বয়ে।
একা বসে আছি দুখে,
বিরহ-বিধুর কান্তারে শুনি কে কি কথা যায় ক'য়ে।

সীমাহীন জলধারা,
মেঘে মেঘে বুঝি ঢেকে গেছে সব
নীল আকাশের তারা।
এই পারে মঠ, ওপারে দেউল জাগে ;
সবুজ আশার স্বপন বিছায়ে নিশীথিনী চাঁদহারা
চমকে বিজলী নভে ;
বর্ষণ-ক্ষণে অদূরে দাদুরী ডাকে।
সজল মেঘোৎসবে
বাজে মেঠো বাঁশী অচেনা সুরেতে
দূরের প্রান্ত ভাগে।

এ রাতে আমি যে ক্ষীণ শিখা সম
জ্বলি ক্ষণিকের ঘরে,
আঁখি-কিনারায় স্খলিত অশ্রু ব্যথা জাগে অন্তরে।
যায় দিনগুলি ভেঙে-পড়া অবসাদে।
এ দেহ আমার ফেলে যেতে হবে সংসার-বালুচরে
জীর্ণ বসন সম,
সেই কথা ভাবি নিদ্রা-নীরব রাতে
পূরিল না সাধ মম ;
কামনার নীড়ে প্রাণের বিহগ
কেন অবিরত কাঁদে !

প্রেম, ভক্তি ও শরণাগতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

'কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার?
হ'য়ে পূর্ণকাম ব'লব হরি-নাম,
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন,
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার ॥
কবে পরশমণি করি' পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দরশন,
লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার ॥'

প্রেম হ'ল এই, যা এই গানে শুনলে। ঠিক এই ভাবটি। এ প্রেম—ভগবানের শ্রীচরণে প্রেম। প্রেমই শেষ কথা। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব! ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম। একবার ভগবানের শ্রীচরণে হাজির হ'য়ে সব শেষ।

প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ; প্রেমিক প্রেমাস্পদকে প্রেম দিয়ে বাঁধে। প্রেম যেন রজ্জু। গোপীরা এই প্রেমরজ্জু দিয়ে প্রেমাস্পদকে বেঁধেছিল। এটি হওয়া ভগবানের কৃপা।

একটা বিশ্বাস নিয়ে এগোতে হয়। ঈশ্বর আছেন—এই বিশ্বাস নিয়ে উপাসনা করতে হয়। সাধুমুখে শুনে নিয়ে চলতে হয়। কেউ কেউ বলে, 'এ-সব অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস কেন করতে যাবে?' বেশ তো নিজেদের জীবনটাই দেখ। মা চিনিয়ে দিলেন, 'ঐ তোর বাবা।' আমরাও জানলুম আমাদের বাবা কে। জটিলের মা জটিলকে বলেছেন, 'তোর মধুসূদন দাদা জঙ্গলে থাকে। ভয় পেলে তাকে ডাকবি।' মা বলেছেন, বালক বিশ্বাস করলে। আর এই সরলতা ও বিশ্বাস ছিল বলেই দাদা হ'য়ে শ্রীমধুসূদন জঙ্গলের পথে বালক জটিলের সহায় হলেন।

আরো দেখ। পাচক রান্না করলে, খেলুম এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়নি। নাপিত এল, নির্ভয়ে গলা বাড়িয়ে দিলুম এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সে গলা কাটবে না। এ রকম নিত্য নিয়ত কত ঘটনা!

বিশ্বাস—চাই। বিশ্বাস যত অন্ধ হবে, আলো তত বেশী পাবে, পথ তত স্পষ্ট হবে। ধর্মরাজ্যের এই প্রথম সোপান। এই বিশ্বাস থেকেই জ্ঞান ভক্তি। যুগে যুগে অবতার পুরুষগণ আসেন এই বিশ্বাসকে পাকা করবার জন্যে।

বৈধীভক্তি আনে রাগভক্তি। শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ, তাঁর নাম ও গুণকীর্তন এবং তাঁকে স্মরণ—এই করতে করতে তাঁর প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাবে। ভালবাসার আস্বাদন পাবে। এই আস্বাদনে একটু নেশা অনুভব করবে—তাঁর জন্য যেন প্রীতি-ভালবাসার একটা টান, তখনই হ'ল রাগাত্মিকা ভক্তি।

নেশাটুকু দরকার। ঠাকুর এটাকে বলতেন 'গোলাপী নেশা'। অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন, 'সংসারে থাকবে একটু গোলাপী নেশা ক'রে। একজনকে দিলেও সবাইকার জন্য এ উপদেশ। 'কথামৃতে'র সব উপদেশগুলিই তাই। বিষয়ের নেশা এমনি সাধারণ নেশা। প্রেম হ'লে সব ভুল হ'য়ে যাবে। তখন সংসারের

* রাঁচিতে ১০.৯-৫৭ তারিখে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীশচীন্দ্র নাথ শীল কর্তৃক অনুলিখিত।

নেশা আলুনী বোধ হবে। তাঁর প্রতি অনুরাগ এলে, রাগাত্মিকা ভক্তি এলে নেশায় ভরপুর; সব একাকার। এটি দেখতে পাওয়া যায় রাস-মণ্ডলে, সেখানে 'বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি'।

একি একবারে হয়—ধাপে ধাপে এগোতে হবে। লক্ষ্য ঠিক রেখে এগোতে হয়। মীরার সব গানে একই কথা—'দুসরা না কোই।' ভজন পূজন যা কিছু, সব সেই তার প্রেমাস্পদ গিরিধারী—গানে, প্রাণে ও ধ্যানে।

তাই বলি তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা কর। ভাবো, 'দুসরা না কোই'। চঞ্চল মনকে ঠিক রাখার জন্য সময় সময় সাধু-সঙ্গ করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, মন-ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয় সাধু-সঙ্গ ক'রে। মনের স্লো-ফাস্ট বিবেক মিলিয়ে দেবে। এমনি ক'রে ভালবাসা যেমন জমাট বাঁধবে, কর্মও এক-একটি ক'রে ত্যাগ হ'য়ে যাবে।

ফল-ভারে গাছ নীচু হ'য়ে যায়। সাধন ভজন করলে মানুষও নত হ'য়ে যায়। ঠিক ভক্তি-ভাব এলে উপদেশও ঠিক ঠিক ধারণা হয়। এ যেন ফটোর কাঁচ। নির্দিষ্ট কালি (Silver Nitrate) না মাখানো থাকলে ছবি ধরে না। ভক্তি-মসলা মনে মাখানো না থাকলে যা শুনবে তা ধারণা হবে না।

ভালবাসা ও অনুরাগ যখন আসবে, তখন সাধনভজন সোজা হ'য়ে যাবে। বিধি-নিষেধের বেড়া আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে। মাঠে যখন ধান থাকে, তখন ওপারে যেতে হয় আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে। সেই ধান কাটা হ'লে সোজা যাওয়া যায়। রাগাত্মিকা ভক্তি এলে বৈধী ভক্তি চলে যায়, দরকার হয় না বলে। তখন ভগবান ভক্তকে আকর্ষণ করেন। বৈধী ভক্তি দিয়ে ছুঁচের কাদা ধুয়ে যাওয়ায় ভগবান চুম্বক হ'য়ে আকর্ষণ ক'রে টেনে নেন। ভক্ত যেন ছুঁচ। ভক্ত ভগবানকে লাভ ক'রে আত্মজ্ঞানী হয়। এ বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা। ঐ সময় সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হ'য়ে রজ ও তম গুণকে আবরণ ক'রে রাখে। 'স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ'—এ অবস্থায় শুধু শান্তি বা প্রশান্তি, মন একেবারে পরমা প্রশান্তিতে ভরে যায়। সবই মনে, মন মুক্ত করে, আবার মনই বদ্ধ করে। মনটাকে সোনা ক'রে নাও। প্রেম লাভ কর—প্রেমিক হও। ভেতরেই যমুনা দেখতে পাবে। তার কূলে কূলে কৃষ্ণলীলা লীলায়িত দেখবে।

আবার বলি—বিশ্বাস ক'রে এগোও। বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল জিনিস। ঠাকুর কত বলেছেন এ-সম্বন্ধে! তাঁর কী বিশ্বাস ছিল শোন। দক্ষিণেশ্বরে ছোট খাটটিতে একদিন বসে আছেন; বসে বসে এই গানটি গাইছেন:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥

এই বিশ্বাস নিয়ে ভেতরে যখন তাঁতে ডুবে যাবে, তখন দেখবে এক অবিরাম আনন্দ-রসের ক্ষরণ হচ্ছে, আর তোমার মন তৃপ্তির সঙ্গে তা সর্বদা পান করছে।

তাই বলি, জেনে নিয়ে বসে পড়। মাছ ধরতে যদি চাও, যে মাছ ধরতে জানে তার কাছে যাও। কেমন ক'রে চার ফেলতে হয়, কখন কি করতে হয়, তা জেনে তবে বসতে হয়। সাধন-ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। গুরুই পথ দেখিয়ে দেন। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস রেখে এগোতে হয়। ঠাকুর বলতেন, হৃদয় ডঙ্কা মারা স্থান। হৃদয়ে প্রেমময়কে বসাও। হৃদয়ে তাঁকে স্মরণ কর। তাঁর দিকে মনকে নিয়ে যাও। তাঁর চিন্তায় মগ্ন হও। তাঁর বিষয় চিন্তাই সজাতীয়

চিন্তা, আর বাকী সব বিজাতীয় চিন্তা। মন উভয়বাহী। সজাতীয় চিন্তা ও বিজাতীয় চিন্তা নদীর জোয়ার-ভাটার মত দুই প্রবাহ। একটি প্রবাহ তুললে অপরটি যায় থেমে। সজাতীয় চিন্তা করতে এমন অবস্থা আসে, যখন আর বিজাতীয় চিন্তা মনে স্থান পায় না। চিন্তা তখন একমুখী—জোয়ারের পর প্লাবন আসে। এই সময় নদীকে আর এঁকে বেঁকে চলতে হয় না। স্রোত সোজা হয়ে যায়। শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি এলে প্রেমের প্লাবন বয়; যেমন গোপীদের হয়েছিল। আবার উর্জিতা ভক্তি এলে সাধক সব প্রেমময় দেখে। বন দেখে মনে হয় বৃন্দাবন, সমুদ্র দেখে মনে হয় যমুনা। আর বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে—যমুনার কূলে কূলে কৃষ্ণলীলা। তখন শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রেমাস্পদের শ্রীচরণে সব ভালবাসা উজাড় ক'রে দেওয়া।

আবার প্রহ্লাদকে দেখ, কী তার ভক্তি! শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে যখন বালক প্রহ্লাদকে বাৎসল্যভাবে বর দিতে চাহিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিলেন, 'হে নাথ! কি আর চাইব? সব যে ভরিয়ে রেখেছ তুমি। অবিবেকী মানুষ বিষয়ের প্রতি যে প্রীতি ও ভালবাসা দেয়—সেই প্রীতি, সেই ভালবাসা যেন তোমার প্রতি আমার হয়—এই টানটুকু যেন চির অটুট থাকে।' নেওয়া নয়, শুধু দেওয়া—এই হ'ল প্রেম, অহৈতুকী প্রেম।

'আমি তোমার, তুমি আমার'—এই অবস্থায় হয় আত্মসমর্পণ। তখনই তিনি কৃপা করেন। এক পা এগোলে তিনি একশ' পা এগিয়ে আসেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন—একজন গুরু, একজন শিষ্য। গুরু শিষ্যের সদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগ সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশ দিলেন প্রথমে। তারপর যোগ্য ও প্রিয় শিষ্যকে তার মঙ্গলের জন্য গুহ্য বিষয় অযাচিত ভাবে বলছেন:

হে অর্জুন ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য—সব কিছু ত্যাগ কর, আর আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। ঠাকুরের কথায়, 'ব-কলমা দাও'। শ্রীকৃষ্ণ আরো বলছেন: এই সকল ত্যাগ করার জন্য দুঃখ পেয়ো না; আমার শরণাগতকে আমি সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। যা কিছু ময়লা, সব ধুয়ে মুছে সাফ করে নেবো। ঠিক যেন শিশু ও মা। মা ছাড়া শিশু কিছু জানে না, নির্ভরশীল; তাই সব সাফ ক'রে শিশুকে মা কোলে তুলে নেন। মায়ার ঠুলি চোখে পরাতেও তিনি, খুলতেও তিনি। তাই রামপ্রসাদ মাকে বলছেন:

'খুলে দে মা চোখের ঠুলি
হেরি গো তোর অভয়-পদ।'

তিনি খুলে না দিলে, তিনি কৃপা না করলে কিছু হবে না। পূর্ণ নির্ভরতা করলে তিনি কৃপা করবেনই। এ কথা তিনি বার বার বলেছেন। গীতামুখে তিনি প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত ক'রে গেছেন, 'মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'। শরণাগতির কথা যুগে যুগে তিনি বলেছেন, দু-হাজার বছর আগে প্রভু যীশু ব'লে গেছেন, 'আমার কাছে এস, ভারাক্রান্ত যারা; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো'। ঠাকুরের কথাও তাই। তিনি বলতেন—ঝড়ের এঁটো পাতার মতো থাকবে। যখন যেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন সেখানে থাকবে। বেড়াল ছানার মতো থাকবে। কী সুন্দর দৃষ্টান্তগুলি! আত্ম-সমর্পণের কি উপমা!

তাই বলি, নিজের সত্তাকে আর আলাদা ক'রে রেখো না। ঠাকুরের কথায়, 'কাঁচা আমি'কে শেষ কর। আমমোক্তারনামা দাও তাঁকে। আত্ম-নিবেদন কর। তাঁর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে প্রেমিক হও, প্রেমাভক্তি দিয়ে প্রেমময়কে লাভ কর।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[বনগমন ও ভরতমিলন]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

বাল্মীকি রামের বনগমনের দুইটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একটি চিত্রে রাম লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিয়া বনে যাইতেছেন—এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। তাঁহার উদ্বেগশূন্য কিশোর-হৃদয়ে অদম্য কৌতূহল, অসীম উৎসাহ—আনন্দ। বিশ্বামিত্রের কার্যোদ্ধার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। তিনি অমিতপরাক্রমশালী, রাক্ষস-নিধন তাঁহার নিকট কঠিন নহে। দ্বিতীয় চিত্রে বন-গমনের পটভূমিকা অন্যরূপ। পিতৃসত্য রক্ষার্থে দীর্ঘকালের জন্য রাম বনে যাইতেছেন। সঙ্গে চলিয়াছেন লক্ষ্মণ ব্যতীত রঘুকুলবধূ সীতা, —আবাল্য যিনি রাজৈশ্বর্যে প্রতিপালিতা। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা ও জননীর করুণ আর্তনাদে সমগ্র অযোধ্যাবাসীর আকুল ক্রন্দনে রামচন্দ্রের কোমল চিত্ত ব্যথিত।

প্রজাবর্গের অনেকেই রামচন্দ্রের রথের দ্রুত অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাহাদের ব্যাকুলতা দর্শনে অবশেষে রাম রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলেই তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে বনবাসের প্রথম রজনী সেই নির্জন নদীতীরে যাপিত হইল। অর্ধরাত্রে ক্লান্ত প্রজাবর্গ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন সেই অবকাশে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রথে আরোহণ করিয়া তমসা উত্তীর্ণ হইলেন। রাত্রিকালেই বহুপথ অতিক্রান্ত হইল। রামের বনগমন-বার্তা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কারণ পরদিবস কোশলপ্রদেশ অতিক্রম-কালে দশরথ ও কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বহু কঠোর সমালোচনা ও মন্তব্য তাঁহারা শ্রবণ করিলেন। পথিমধ্যে প্রথমে তাঁহারা শ্রীমতী ও পরে বেদশ্রুতি নামক রম্যাবর্তশালিনী মহানদী উত্তীর্ণ হইলেন। অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণ দিক তাঁহাদের যাত্রার লক্ষ্যস্থল—

> 'ততো বেদশ্রুতিংনাম শিবাবর্তাং মহানদীম্।
> উত্তীর্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতম্ দিশম্॥'

'অগস্ত্যাধ্যুষিতম্' কথাটি প্রমাণ করে অগস্ত্য পূর্বেই দক্ষিণ দেশে বসবাস করেন। তিনিই তথায় আর্য সভ্যতার প্রথম প্রচারক। ক্রমে তাঁহারা গোমতী ও সর্পিকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। শীতাবসানে নদীগুলি অগভীর, সুতরাং রথে করিয়াই পার হইয়া সায়াহ্নে তাঁহারা বিশাল শৃঙ্গবেরপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্মুখে তরঙ্গসঙ্কুল ভাগীরথী। নদীতীরে ইঙ্গুদী-বৃক্ষতলে রাত্রির বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। রামের আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া নিষাদরাজ গুহ রাজোচিত উপহার লইয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিলেন। গুহের সহিত পূর্ব হইতেই রামচন্দ্রের সখ্যতা। তিনি মধুর সম্ভাষণে গুহকে তুষ্ট করিলেন, কিন্তু গুহ-প্রদত্ত কোন সৎকার গ্রহণ করিলেন না, কারণ তিনি বনবাসী। পরদিন সারথি সুমন্ত্র ও গুহকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা নৌকায় আরোহণ করিলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সুমন্ত্র ও গুহ চিত্রার্পিতের ন্যায় নদীতীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিয়া তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ রাত্রে এক বট-বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে দশরথ ও কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে অভিমান প্রকাশ-পূর্বক বহু বিলাপ করিলেন। সাধারণ মানবের ন্যায় রামের ঐ সকল বিলাপোক্তি প্রকৃতই

বিস্ময়কর। একমাত্র তিনিই এ পর্যন্ত দশরথ অথবা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে কোন অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মহৎ ধৈর্যশীল চরিত্রে এই সকল উক্তি অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং রামায়ণের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত কিনা বিচার্য। অথবা সেই গভীর রাত্রে অরণ্য-মধ্যে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষণকালের জন্য কি তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন? বিশেষতঃ রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতার এ ভাবে রাত্রি যাপন—নিশ্চিত তাঁহার নিকট বিশেষ ক্লেশকর হইয়াছিল। গুহ ও সুমন্ত্রের নিকট বিদায় লইয়া ভাগীরথীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অরণ্যাভিমুখে যাত্রাকালে রাম বলিয়াছিলেন :

অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু।
পৃষ্ঠতোঽহং গমিষ্যামি ত্বাঞ্চ সীতাঞ্চ পালয়ন্॥
অদ্য দুঃখন্তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং নিনাদং প্রসহিষ্যতি॥

—হে সৌমিত্রে, তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন। আমি তোমাকে ও সীতাকে রক্ষা করিয়া সর্বপশ্চাৎ গমন করিব। বনবাসের দুঃখ বৈদেহী অদ্যই উপলব্ধি করিবেন; সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহের ভীষণ ধ্বনিও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে ঐদিন হইতেই তাঁহাদের বন-বাসের আরম্ভ। আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয় স্মরণে সাময়িকভাবে অভিভূত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে নিজেকে সংবরণ করিয়া রামচন্দ্র বলেন, শোকহেতু তিনি ধৈর্যচ্যুত হইয়াছিলেন। অন্যান্য অবতারের জীবনেও ঐরূপ সাময়িক শোকবিহ্বলতা দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ দিবসে তাঁহারা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থল প্রয়াগে উপনীত হইলেন। স্থানটি বিশাল, নির্জন, রমণীয় ও তপস্বিগণ-সেবিত। অদূরে ভরদ্বাজের আশ্রম। ভরদ্বাজ রামের বনাগমন-বার্তা পূর্বেই জানিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাম তাঁহাদের সহিত ঐ তপোবনে বাস করেন। রামের অভিপ্রায়, অযোধ্যা হইতে বহুদূরে অব-স্থান করিবেন। ভরদ্বাজ তখন দশক্রোশ দূরে অবস্থিত চিত্রকূট পর্বতের সন্ধান দিলেন। ভরদ্বাজ-আশ্রমে ঋষিগণের সহিত ঐ রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভেলায় যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর ষষ্ঠ দিবসে তাঁহারা মন্দাকিনী-তীরে বিচিত্র পাদপ-শোভিত রম্যকাননবিশিষ্ট চিত্রকূট পর্বতে উপনীত হইলেন।

তখন শীতাবসানে বসন্ত-সমাগমে চিত্রকূট পর্বতের শোভা অতি রমণীয়। পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ বিহঙ্গম-শব্দ-মুখরিত, লতাবিতান-সমাচ্ছাদিত শিলাতল, নিভৃত গিরিকন্দর, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি, ইতস্ততঃ বিচরণশীল মৃগকুল, হংস-সারস-সেবিত মন্দাকিনী—সমস্তই মনোমুগ্ধকর। মন্দাকিনীতীরে দুইটি পর্ণকুটির নির্মিত হইল। রাজ্য পরিত্যাগের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ না রাখিয়া, সেই রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম মহানন্দে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

* * *

অযোধ্যাকাণ্ডের শেষ চিত্র রামের সহিত ভরতের মিলন। উদারচরিত্র ভরত রামের চির অনুগত। তাঁহার প্রীতি-সাধন আকাঙ্ক্ষায় কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহার মর্মবিদ্ধ করিয়াছিল। অযোধ্যায় আসিয়া জননীর মুখে দশরথের মৃত্যু ও রামের বনগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখে শোকে অভিভূত হইয়া তিনি জননীকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া অভিশাপ

প্রদান করিয়াছিলেন। সংকল্প স্থির করিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। নৃপতির মৃতদেহের সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে সভাসমক্ষে মন্ত্রিগণ কর্তৃক রাজ্যভার গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া ভরত দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, 'যন্মে মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদভিরোচয়ে'—আমার জননীর পাপকার্য আমার অভিমত নহে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। অন্যায়-পূর্বক তাঁহাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া আমি কি রাজ্যাপহারক হইব? তাঁহার সংকল্প—রাজ্যাভিষেকের সমগ্র আয়োজন সঙ্গে লইয়া, তিনি বনে গমন করিয়া সেখানেই রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন এবং রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং বনবাসী হইবেন।

অমাত্যবর্গ ও সৈন্যবাহিনী সহ ভরতের গমনোপযোগী পথ প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রে প্রেরিত হইলেন: যাহারা ভূমির বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন সেই ভূমিপ্রদেশজ্ঞগণ, সূত্রকর্মবিশারদ অর্থাৎ মার্গরক্ষণাদি কর্মে রত পৌরগণ, সুরঙ্গাদি-খননে নিপুণ ব্যক্তিগণ, পথিমধ্যে নদনদী উত্তীর্ণ হইবার আবশ্যক হইলে যাহারা তৎক্ষণাৎ নৌকাদি নির্মাণ করিতে পারে সেই যন্ত্রকগণ, শিল্পিগণ, মার্গবিৎ পুরুষগণ, যে সকল ব্যক্তি পথ সমতল করিতে সমর্থ তাহারা, সভাগৃহ নির্মাণ-কারকগণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ। পথ প্রস্তুতের আয়োজন দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায়, তদানীন্তন ব্যবস্থা কতদূর উন্নত ছিল।

শীঘ্রই অযোধ্যা হইতে জাহ্নবীতীর পর্যন্ত প্রস্তুত বিস্তৃত পথ ধ্বজাপতাকা ও কলসদ্বারা সুশোভিত হইলে ভরত ও শত্রুঘ্ন, মাতৃগণ, অমাত্যগণ ও সৈন্যসমভিব্যাহারে রামের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র যে পথে উপনীত হইয়াছিলেন, ভরত ঠিক সেই পথেই ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া গুহের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হন; পরে প্রয়াগে ভরদ্বাজের নিকট পথের সন্ধান লাভ করিয়া চিত্রকূটে উপনীত হইলেন।

দূর হইতে সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণে রাম উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলে লক্ষ্মণ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া পতাকা প্রভৃতি দর্শনে বুঝিলেন, উহা ভরতের সৈন্যবাহিনী। ভরতের জন্য রামচন্দ্র রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেজন্য পূর্ব হইতেই লক্ষ্মণের চিত্ত ভরতের প্রতি বিমুখ ছিল, সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি রামের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন:

সপত্নো রাজ্যকামোঽয়ং ব্যক্তং রাজ্যেঽভিষেচিতে।
আবাং হন্তুমিহাভ্যেতি ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ॥

—নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু রাজ্যাভিলাষী কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত আমাদের হত্যা করিতে আসিয়াছে।

ভাগীরথীতীরে সুসজ্জিত সৈন্যসহ ভরতকে দেখিয়া নিষদরাজ গুহ অনুরূপভাবেই ভরতের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ ঋষি ভরদ্বাজও সৈন্যসহ ভরতের আগমন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। রামচন্দ্র কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও ভরতের প্রতি স্নেহশূন্য অথবা সন্দিগ্ধচিত্ত হন নাই।

লক্ষ্মণের ক্রোধপূর্ণ উক্তির উত্তরে তিনি বিচলিত না হইয়া প্রশান্ত স্বরে বলিলেন:

যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমা বাচঃ প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তত্ত্বতঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি॥

—যদি তুমি রাজ্যের নিমিত্ত এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক, তবে ভরতকে দেখিবা-মাত্র আমি বলিব, লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। আর লক্ষ্মণ! আমি জানি, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভরত তৎক্ষণাৎ আমার আদেশ পালন করিবে। রামের উত্তরে লজ্জিত লক্ষ্মণ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

শীঘ্রই ভরত পর্ণশালায় সমাসীন, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্, কৃষ্ণাজিন ও জটাবল্কলধারী সেই রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন—

'তস্তু কৃষ্ণাজিনধরং জটিলং চীরবাসসম্।
দদর্শ রামমাসীনমমিতং পাবকোজ্জ্বলম্॥'

রাম ও ভরতের মিলন ও সংলাপ অপূর্ব। ভরতকে সাদরে গ্রহণ করিয়া রাম প্রথমেই তাঁহার কুশল-প্রশ্ন করিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে ভরত রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন,

প্রোষিতে ময়ি যন্মাত্রা পাপং মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া ন তদিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম॥

—আমার প্রবাসে থাকাকালে আমারই নিমিত্ত আমার ক্ষুদ্রহৃদয়া জননীকৃত যে পাপানুষ্ঠান, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীরামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভরত স্বয়ং বনবাসে অভিলাষী। সত্যভ্রষ্ট হইয়া রাজ্য-ভার গ্রহণে রামচন্দ্র একান্ত অসম্মত। সত্য-সঙ্কল্প রামচন্দ্র যেমন অনায়াসে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার পুনর্গ্রহণে অপারগ, ভরতও তেমনই এই ভাবে লব্ধ রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে দৃঢ়সংকল্প। উভয় চরিত্রই মহৎ ও বিস্ময়কর!—পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। রাজ্য ও ঐশ্বর্যলাভের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের শেষ নাই। নিষ্ঠুর হত্যা ও প্রতারণার কলঙ্কে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই না কলঙ্কিত! এই ভারতবর্ষেই কৌরব-বংশ ধ্বংস হওয়ার মূলে ছিল রাজ্যলোলুপতা। রাজ্য লাভের জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভ্রাতৃগণকে নিহত করিবার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যেখানে রাজ্য বা সম্পদ লাভই জীবনের চরম প্রাপ্তি, সেখানে নীতিবোধ ও মানবতার স্থান নাই; হৃদয়বৃত্তি উপেক্ষিত। কৈকেয়ীও তো সেই রাজ্য-লোভেই দশরথের নিকট এমন বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি চির-নিন্দিতা। কিন্তু এই ভারতবর্ষই আবার শিক্ষা দিয়াছে রাজ্যৈশ্বর্যকে তুচ্ছ করিতে। পরম সত্যকে স্থান দিয়েছে সকলের উর্ধ্বে। ভরতের বারংবার অনুরোধে রামচন্দ্র বলিলেন :

রাজবৃত্তং কিল লোকঃ কৃৎস্নঃ সমনুবর্ততে।
যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তা সন্তি মানবাঃ॥

—সমগ্র প্রজাবর্গ রাজার চরিত্রের অনুবর্তন করে; প্রজাগণ রাজার আচরণই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং রাজ্যগ্রহণ করিয়া তিনি কিরূপে সত্যভ্রষ্ট হইবেন? সত্য এবং সর্বভূতে অনুকম্পাই রাজধর্ম। রাজ্য সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'সত্যমূলানি সর্বাণি, সত্যান্নাস্ত্যপরং তপঃ'—সমস্তই সত্যমূলক; সত্য ভিন্ন অপর তপস্যা নাই। সত্যই প্রত্যক্ষ ধর্ম। সত্যধর্মই শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। রামাবতারে সত্য-ধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

রাজ্যগ্রহণে কোনপ্রকারে রামকে সম্মত করিতে না পারিয়া ভরত অবশেষে রামের সমক্ষে প্রত্যুপবেশন করিলেন। প্রত্যুপবেশনের অর্থ—কাহাকেও কোন কার্যে বাধ্য করিবার জন্য তাহার গৃহদ্বার-সমীপে কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনশন-ব্রতের

সহিত আমরা পরিচিত। কেহ কেহ ঐ সংকল্প করিয়া শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও বরণ করিয়াছেন। দেশের চরম সঙ্কটকালে যাহা মহৎ উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহার অপপ্রয়োগ পরবর্তীকালে বহুবার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। উদ্দেশ্য অভিসন্ধিমূলক প্রতিপন্ন হইলে মহৎ উপায়ও হীনতা প্রাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র ভরতের প্রত্যুপবেশন অনুমোদন করিলেন না, কারণ ক্ষত্রিয়ের উহাতে অধিকার নাই। তাঁহাকে কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রামচন্দ্র অবশেষে বলিলেন, 'ন চ ত্বাম-ভিভাষেয়ং যদ্যযোধ্যাং ন গচ্ছসি'—আমি দিব্য করিতেছি, তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাও, তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব না। তখন ভরত অশ্রু সংবরণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন :

অলং শপ্তেন যাস্যামি যদ্যেবং পরিতপ্যসে।
অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্যাং তব প্রভো॥

—দিব্য দিবার প্রয়োজন নাই। যদি আপনি এইরূপ পরিতাপ অনুভব করেন, তবে আমি চলিয়া যাইব। হে প্রভো, জীবন দান করিয়াও আমি আপনার প্রিয় কার্য সাধন করিতে প্রস্তুত।

ভরতের নিকট রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন, চতুর্দশ বৎসরান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।

ভরত যখন সৈন্যসামন্তসহ প্রস্থানোদ্যত, তখন শরভঙ্গ নামক ঋষির শিষ্যগণ রামচন্দ্রের জন্য উপহারস্বরূপ কুশপাদুকাদ্বয় লইয়া আগমন করিলেন। বশিষ্ঠের নির্দেশে ভরত সেই পাদুকা-দ্বয় রামচন্দ্রকে পরিধান করাইয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাম-বিরহিত অযোধ্যায় বাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অযোধ্যা প্রবেশের পথে নন্দি-গ্রামে রাজধানী স্থাপনপূর্বক সিংহাসনে রামের পাদুকাদ্বয় অভিষিক্ত করিয়া ভরত নিজেই তাহার উপর রাজছত্র ধারণ করিলেন। এই ভাবেই সেই মহাত্মা ভরত রামের প্রত্যাগমন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

বিজন-সাথী

'অনিরুদ্ধ'

সকল আলো নিভিয়া যদি যায়
প্রদীপ তার জ্বলিয়া উঠে ধীরে,
সকল ছবি বিলোপ যবে পায়
মূরতি তার ভাসে নয়ন-নীরে।

সকল ডাক যখন আসে থামি
মনের রহে নীরব অবসর,
আড়াল হতে তখনি সে তো নামি
দাঁড়ায় হাসি হৃদয়-গুহাচর।

সকল চাওয়া ভুলিতে যদি পারি
চকিতে পাই তাহারে অযাচিত,
বিভব যার দৈন্য-গ্লানিহারী
অন্তহীন সকল সীমাতীত।

সকল ভয় নিমেষে যায় টুটি
ঝলকে তার অভয় রূপ যবে,
পরম প্রেম কমল হ'য়ে ফুটি
ঘুচায়ে দেয় বাঁধন যত ভবে।

মুছিয়া যায় যতেক ব্যথা মোহ
নিবিড় প্রাণ মিলনে রয় মাতি,
নাহিরে প্রিয় এমন আর কেহ
জীবনে চির জাগে বিজন-সাথী।

রবীন্দ্র-মন ও মানব-ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল নাথ

॥ এক ॥

রবীন্দ্র-মনের এক বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে 'মানুষের ধর্ম' উপলব্ধিতে। মানবজীবন-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র-মনের ব্যাপ্তি কত উদার, তারও বিশিষ্ট পরিচয় তাঁর এই মানব-ধর্মবোধ। কবির বোধির (intuition) সঙ্গে মনীষীর বোধের (intellect) এক অপরূপ সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মানুভূতি। এই প্রসারিত ধর্মচেতনা রবীন্দ্র-মনকে উর্ধ্বমুখী করেছিল তাঁর সীমাবদ্ধ জীবন-বৃত্ত হ'তে ব্যাপক বিশ্ববোধের ক্ষেত্রে। সেই সীমাতিক্রান্ত মনের স্বাক্ষর তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও কর্মপ্রচেষ্টা।

সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির থেকে সেই বিশিষ্ট ধর্মাদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি বহুসংখ্যক ভাষণে। আর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র অক্সফোর্ডে ব্যাখ্যা করলেন তিনি 'মানুষের ধর্ম' বা Religion of Man. সে ১৯৩০ খৃঃ কথা। কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা ও জীবনবোধের ফসল অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে প্রদত্ত এই 'হিবার্ট বক্তৃতামালা'। অহং-বাদী উগ্র স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ পাশ্চাত্য দেশবাসীর কানে এবং মনে তিনি উদার মানবত্বাবোধের মন্ত্র দিলেন এই বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে। মহা উৎসাহে অভ্যর্থিত হ'ল সে মানবমাহাত্ম্য-বোধের উদার অনুভূতি-নির্ভর বাণী জড়-সভ্যতাধর্মী পাশ্চাত্য দেশে। হিবার্ট বক্তৃতামালা শেষ হ'ল; কিন্তু রবীন্দ্রমনে এই ধর্মবোধ যে গভীর সুরের অনুরণন তুলেছিল, তা যেন সুযোগ খুঁজতে লাগল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবার জন্য। সুযোগও জুটে গেল মাত্র তিন বৎসর পরে, যখন ১৯৩৩ খৃঃ জানুআরি মাসে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হলেন 'কমলা বক্তৃতামালা' দেবার জন্যে। এই বক্তৃতায় তিন পর্যায়ে তিনি স্বদেশবাসীকেও শোনালেন 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর উদার উপলব্ধির কথা। হিবার্ট লেকচারস্ ও কমলা লেকচারস্ পরস্পরের পরিপূরক; এই উভয় বক্তৃতায় অনুস্যূত হ'য়ে আছে 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধ।

মানবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা আগে প্রয়োজন। 'Religion of Man' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের' অর্থ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে বিশেষ মতবাদ বা ক্রিয়াকাণ্ড; এ ছাড়া ইহলোক, পরলোক, আত্মা, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বহু বিষয় জড়িত থাকায় ধর্ম-বস্তুটি যুগে যুগে সকল দেশের মানুষের কাছে একটি জটিল ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছে। ধর্ম কি কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের ধর্মশাস্ত্র মাত্র? তাই যদি হ'ত, তাহলে ধর্মের কোন সর্বজনীন আবেদন থাকত না। আসলে ধর্মের অর্থ বিচিত্র। 'ধর্মশাস্ত্রে'র প্রকৃত অর্থ হ'ল 'Code of laws or conduct'—যে সমস্ত নিয়ম ও সদাচার মানব সমাজকে ধারণ ক'রে আছে তাই হ'ল ধর্ম। এ ছাড়া ধর্মের একটা সাধারণ অর্থ আছে, যে অর্থে বুঝায় বস্তুর গুণ—যেমন জল বা অগ্নির ধর্ম শীতলতা বা উষ্ণতা। এ ছাড়া

'বিশেষ' ধর্মও আছে—যেমন রাজার ধর্ম, প্রজার ধর্ম, সর্পের ধর্ম, ব্যাঘ্রের ধর্ম। কিন্তু নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক মানুষের কোন সাধারণ ধর্ম আছে কিনা, 'Religion of Man' গ্রন্থে তাই হ'ল কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার বিষয়।

ব্যক্তি- সম্প্রদায়- বা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ব্যষ্টি-মানবের ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে নিজের মননজাত অভিজ্ঞতা ও স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'Religion of Man' ও 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে। এই উভয় গ্রন্থের বক্তব্য প্রায় এক ব'লে মানবধর্ম বিশ্লেষণে আমাদের আলোচনার ভিত্তি হ'ল 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থখানি।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় মানব-মনের দুটি সুস্পষ্ট প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ : এক প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ শুধু নিজের সংকীর্ণ বিষয়বুদ্ধি, নিজের স্বার্থবোধ নিয়েই বাঁচতে চায়। মানুষের এই প্রবৃত্তিকে বলা চলে জীবভাব। কিন্তু এই মানুষের জীবনেই আর একটা দিক আছে—'যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন-যাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি, তাই লাভ; যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন, সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।'

বর্তমান জীবনের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনবোধকে অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের বিশ্বমানবের আদর্শ-লাভের অভিমুখিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বিশ্বভাব। জীবভাবকে অতিক্রমণের মধ্য দিয়েই মানব-অন্তরে বিশ্বভাবের সূচনা। এই বিশ্বভাবের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা। এ তপস্যা কঠোরের তপস্যা। এই তপস্যার সিদ্ধিতে যে দুর্লভ ধর্মলাভ হয়, তাকে বলা চলে 'মানবধর্ম'।

মানুষের অন্তরে এই জীবভাব ও বিশ্বভাব দুই-ই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। তপস্যার দ্বারা জীবভাবকে অবদমিত ক'রে জীবন ও মনে বিশ্বভাবকে বিমূর্ত ক'রে তোলাতেই মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়। এই সাধনাই সাধারণ মানুষকে ক্রমশঃ এনে দেয় 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানবে'র সান্নিধ্যে। —'তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে, সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে এই উত্তরণ-প্রক্রিয়া সহজসাধ্য নয়, এই প্রক্রিয়া অনুশীলন-সাপেক্ষ। বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগেও এই বিশ্বমানবের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, তাই 'মানুষ আজও মানুষ হয়নি'। তা হলেও আশার কথা এই যে, এই অসম্পূর্ণ মানুষও বিশ্বভাবের ও বিশ্বমনের আকর্ষণ নিত্য নিয়ত অনুভব করছে। এই জন্যই 'আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই পূর্ণ মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে—এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে :

স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

'সেই মানব সেই দেবতা,···যিনি এক'—তাঁর পরিচয়কে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম-আলোচনায়। এখন রবীন্দ্র-মনের এই উদার উপলব্ধির বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

॥ দুই ॥

অভিব্যক্তি-ধারায় চতুষ্পদ প্রাণী যতদিন দ্বিপদ মানুষে পরিণত হয়নি, ততদিন তার প্রয়োজন-বোধ ছিল দেহের সীমায় আবদ্ধ। মনের বিকাশ তখনও হয়নি, জৈবিক প্রয়োজনের বাইরে তার গতিবিধি ছিল না। মনের বিকাশ হ'ল তখন, যখন চতুষ্পদ প্রাণী দ্বিপদ মানুষে পরিণত হ'ল। তার প্রয়োজনের সীমাও তখন প্রসারিত হ'ল। শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সে তৃপ্ত থাকতে পারল না, মনের তৃপ্তির জন্য সে চাইল আরও কিছু। পশুর মধ্যে দেখা যেত সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা, আর মনের অধিকারী মানুষের মধ্যে দেখা গেল একের সঙ্গে অপরের সহযোগিতা।—'মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।'

ব্যক্তিমন এভাবে বিশ্বমনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ক্রমশঃ ব্যাকুল হ'ল। সে বুঝতে পারল 'জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।' সকলের সঙ্গে এই যোগযুক্ত মনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সর্বজনীন মন'।—'এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ ক'রে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ।' এই অভিব্যক্তির ফলেই মানুষ নিজের পরিবেশের সংকীর্ণ সীমানা অস্বীকার করেছে, আর নিযুক্ত করেছে নিজেকে 'বৃহৎ মানুষে'র সাধনায়। 'এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই নির্বিশেষ মানবের ঐক্য-উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সত্য-উপলব্ধি। এই সত্যকে বলা চলে মানব-সত্য। মানবসত্যের শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য হ'ল—সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা, প্রত্যক্ষ বর্তমান ও দেশসীমাকে অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের সর্বদেশের মানবমনের সঙ্গে সহজ আনন্দের যোগ স্থাপন। মানুষ 'যে পরিমাণে…এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে,—মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।'

আত্মগত আত্মসম্পূর্ণ জীবন-প্রচেষ্টায় মানুষ পশুধর্মী; আর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির ঔৎসুক্যের মধ্য দিয়ে তার মানব ধর্মের উন্মেষ। এই পশুধর্মের আত্মমগ্নতার সঙ্গে মানবধর্মের উন্মুক্ত প্রসারের ভেদরেখা চিহ্নিত করেছেন 'মননধর্মী কবি ও কবিধর্মী মনীষী'[১] রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে, প্রাণী-জগৎকে তুলনা করেছেন একটি চলমান রেলগাড়ীর কামরার দুই শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে। এক কামরার যাত্রী জন্তু, আর এক কামরার যাত্রী মানুষ।—'এ গাড়ী সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ীর নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ীর সীমানার মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধা বিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানালা পর্যন্ত পৌছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।'

কিন্তু একই গাড়ীর আর এক কামরায় মানুষ-যাত্রীর অবস্থা আলাদা। সে কামরায় 'মানুষ খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানালা। জানতে পেরেছে গাড়ীর মধ্যেই সব কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩।

হয়েও যা বাকী আছে, তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না।'

এই দুর্নিরীক্ষ্য সীমাহীন বাইরের দিকেই মানুষের আকর্ষণ সহজাত। 'সুদূরের পিয়াসী' স্বভাবচঞ্চল মানুষ অনুভব ক'রল: 'তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই, যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতি নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য-প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সে জয় করতে বেরল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।'

দেহের দিক থেকেও চতুষ্পদী পশুর সঙ্গে দ্বিপদী মানুষের পার্থক্য বিস্তর। চার পায়ের উপর ভর ক'রে চলার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা যত সহজ, শুধুমাত্র দুই পায়ের উপর ভর ক'রে চলা তত সহজ নয়। 'ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উন্নত ভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবনত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা ক'রে উঠে দাঁড়াল।'

দুই পায়ের উপর ভর ক'রে দাঁড়াবার ফলে মানুষের চলার প্রয়াস কষ্টসাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে সে যা পেল, তা মানুষকে দান ক'রল মনুষ্যত্বের গৌরব। 'নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ।··· দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায়, সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের।' কিন্তু 'উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলো দৃশ্যকে, অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।'

এই মুক্তদৃষ্টি মানুষকে আকর্ষণ করেছে অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে। এই মুক্তদৃষ্টির সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হ'ল মানুষের কল্পনাদৃষ্টি। এই দৃষ্টির সাহায্যে 'সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়···। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের-আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।'

এই জ্ঞানের জগতে বিচরণ ক'রে মানুষ আনন্দ পেল। ক্রমানুশীলনের ফলে উপলব্ধি ক'রল সে এই বিরাট বস্তুবিশ্ব একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জালে ঘেরা। এই রহস্য আবিষ্কার ক'রল সে নিজের অন্তরের ভিতরও। শুরু হ'ল তখন মানবমনের রহস্য-উদ্ঘাটনের পালা। সে প্রয়াস মানুষের এখনও সমাপ্ত হয়নি। যতই সে এই রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে যায়, ততই সে নতুনতর জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই মানুষের পূর্ণ রূপ এখনও মানুষের কাছে অনুদ্ঘাটিত।

মননশীল কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌঁছন-নি।'

অনিশ্চিত অভাবনীয়ের দিকে মানুষের যে এই যাত্রাপথ, সে পথ বিঘ্নসংকুল, পদে পদে তার বাধা। তথাপি পূর্ণের অভিলাষী মানুষ কোন বাধা মানেনি, দুঃসহ দুঃখকে সে স্বীকার করেছে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে। বাস্তবিকই পূর্ণের প্রকৃত প্রকাশ 'দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে'। স্বেচ্ছায় এই দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ

ক'রে নেবার অভীপ্সার মধ্যে মানুষ পরিচয় দিয়েছে যে মহৎ প্রবৃত্তির, তাকে বলা চলে 'মানবধর্ম'। নিজের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন-পরিবেশের ক্ষেত্রে বৃহৎ ভাব ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের মন যদি মুক্তি-প্রার্থী হ'ত তাহলে 'পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাক-প্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।' সীমাকে মানুষ স্বীকার করে, স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, কিন্তু চরম বলে মানে না। 'যদি মানত তাহলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ ক'রত।' মানুষের মনে এই অনন্ত অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আছে বলেই তথ্য হ'তে সত্যের আদর তার নিকট বেশী। 'তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো।' পৃথিবীতে মহামানব তাঁরা, যাঁরা উপলব্ধি করেছেন সত্যের ঐশ্বর্য, তাই অল্পসুখের মোহ তাঁদের মনকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন ভূমার সুখ, প্রকাশ করেছিলেন বৃহতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বৃহতের এই ঐশ্বর্য-উপলব্ধির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের ধর্ম।

মানুষের অন্তর্নিহিত পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে হয় মানবধর্মের বিকাশ। মানুষের ভিতর যে আদিম পশুপ্রবৃত্তি আছে, সে প্রবৃত্তি মানুষকে প্ররোচিত করে ভোগের পথে; আবার তার অন্তরে যে আদর্শবাদী মহৎ প্রবৃত্তি আছে, সে প্রবৃত্তি আকর্ষণ করছে মানুষকে দুঃখ-বরণের পথে, ত্যাগের পথে, কঠোর তপস্যার পথে। মানুষ যে পরিমাণে সহজ ভোগপ্রবৃত্তির বশীভূত, সে পরিমাণে মনুষ্যধর্মবিচ্যুত; আর যে পরিমাণে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত, সে পরিমাণে মানব-ধর্মবোধে উন্নীত।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—অর্থাৎ রহস্য-ময়তার প্রচ্ছায়ে নিহিত আছে ধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্ব। চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, মানবধর্মের তত্ত্বও অত্যন্ত জটিল। তার ভিত্তি শুধু মানুষের ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের মননের উপরও স্থাপিত। এই মহৎ ধর্মোপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন অন্তরে ধ্যান ও বাইরে কর্ম। অন্তরের ধ্যান দিয়ে মানুষ পায় শ্রেয়কে, বাইরের কর্মের সাহায্যে মানুষ লাভ করে প্রেয়কে। এই শ্রেয় ও প্রেয়-র দ্বন্দ্ব মানুষেরই দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানব-ধর্ম ধীরে ধীরে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।

এই শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু লাভের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। প্রেয় বস্তু ঐহিক, শ্রেয় আত্মিক। প্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এসে মানুষ অনুভব করে সে কিছু পেয়েছে—যেমন জাগতিক ধন, মান, ঐশ্বর্য, যশঃ। কিন্তু শ্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এলে মানুষ অনুভব করে সে কিছু হয়েছে। সেজন্য শ্রেয় ও প্রেয়-র দ্বন্দ্ব 'হওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব'। জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান পেলে মানুষ হয় নির্মোহ, জাগতিক ধনৈশ্বর্যকে সে অত্যন্ত সহজেই উপেক্ষা করতে পারে—যেমন পেরেছিলেন মহামানব বুদ্ধদেব। মানব-ধর্মের প্রকৃত উদ্বোধন এই শ্রেয়োবোধের জাগরণে।

এই শ্রেয়োবোধেরও স্তরবিভাগ আছে। ব্যক্তির মুক্তিকামনার মধ্যে যে শ্রেয়োবোধের প্রকাশ সে শ্রেয়োবোধ খণ্ডিত, আর সমষ্টির মুক্তি-কামনায় যে শ্রেয়োবোধের বিকাশ মানবধর্ম সেখানে সহস্রদল পদ্মের মতো বিকশিত। এই সর্বমানবের মুক্তি-কামনার মধ্য দিয়ে মানবধর্মের পরিচয় হয় সার্থক। মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদার উপলব্ধি তাঁর জাগ্রত মনকে মিলিত করেছে বুদ্ধ, চৈতন্য,

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবদের বিশ্বচৈতন্যযুক্ত মনের সঙ্গে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার দুই রূপ : এক রূপ অহং, আর এক রূপ আত্মা। অহং-এর প্রভাবে মানুষের মনের হয় সঙ্কোচ, আর আত্মার বিকাশে মনে আসে উদার বিস্তৃতি। ব্যক্তিগত 'আমি' লোভী, আর নৈর্ব্যক্তিক 'আত্মা' সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই আত্মিক সাধনাতেই মানুষের মনে জ্বলে ওঠে আলো,—'তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে—বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা।'

এই দুই ভাবের প্রচণ্ড বেগ লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ বর্তমান মানুষের মধ্যে : 'একদিকে ব্যক্তিগত 'আমি'র টানে ধনসম্পদ ও প্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে, আর একদিকে অতিমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশ্যে ত্যাগ।'

এই ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও ক্ষমার দ্বন্দ্বে মানবধর্ম আজ আন্দোলিত। একদিকে অহং-এর প্রসারে আত্মার অবক্ষয়, আর একদিকে আত্মার মহিমায় অহং-বোধের পরাজয়। 'মানুষের অন্তরে একদিকে পরম-মানব, আর একদিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীব-মানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।'

কিন্তু এই সামঞ্জস্য-সাধনায় মানবধর্মের বিকাশ সম্ভব নয় ; রবীন্দ্রনাথের মতে মানবধর্মের প্রকৃত বিকাশ হবে আত্মার উন্মেষে। মননধর্মী কবি বলেন :

> অহং সীমার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ, আত্মার সীমায় তা রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অর্থ তার কাছে উলটো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখের স্বীকার ক'রে দুঃখকে অতিক্রম করে।

আত্মার সংস্পর্শে আগত এই রূপান্তরিত মানুষের সকল প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে সর্বযুগে 'মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সেই সত্য, যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথামত-বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই।' সেই সত্য উপলব্ধিতেই মানবধর্মের প্রকৃত পরিচয়।

॥ তিন ॥

মানবধর্ম ও মানবসত্যের মহত্তম স্বরূপ উপলব্ধির জন্য রবীন্দ্র-মন একদিকে যেমন অবগাহন করেছে হিন্দুর সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও উপনিষদের জগতে এবং মহামানবদের জীবন ও বাণীর মধ্যে, তেমনি সহজপন্থী বাউলদের স্বতঃ উৎসারিত মর্মসঙ্গীতের মধ্যেও সে ভাবগ্রাহী মন শুনতে পেয়েছিল মানবধর্মের সত্যবাণী। উপনিষদের ঋষির মতো ব্রাত্য বাউলও দেবতাকে অন্বেষণ করে নিজের মধ্যে, আর তাকে বলে 'মনের মানুষ'। দেবতার এই আন্তর উপলব্ধির দ্বারা বাউল আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে। বাউলদের মতো 'বৃহদারণ্যক'ও বাহ্যিকতাকে হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক্ ক'রে বাইরে স্থাপন করি, তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।'

দেবতাকে স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি-প্রয়াসের মধ্যে 'অহং'-ই প্রাধান্য পায় ব'লে প্রথমে ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাউলের 'সোঽহং' তত্ত্বে 'অহং'-এর স্থান গৌণ। নিজের মন বা আত্মার মধ্যে নিখিলের যোগ বা

বিশ্বানুভূতিই বাউলের আন্তর সাধনার প্রধান কথা। এই সাধনা কঠিন এবং দুঃসাধ্যব্রতী মানুষেরই উপযুক্ত। বৃহতের উপলব্ধি 'বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ; কিন্তু আপনার চিন্তায় কর্মে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।' মানুষের রিপু যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ পরমাত্মা থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রে অহং-বোধের প্রভাবে অহংকৃত হ'য়ে ওঠে। তখনই মানুষ হয় মানবধর্ম হ'তে ভ্রষ্ট। সেজন্য তত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে অনুভূত হচ্ছে, সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি।

অভিব্যক্তি-ধারায় মানুষের মন অন্তর্মুখী হয়েছে, অনুভব করেছে স্বীয় মনের ভিতর বিশ্ব-চৈতন্যকে। 'জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি, তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে।' মধ্যযুগের সাধক রজ্জবের বাণীর ভিতর তত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্র-নাথ শুনতে পেলেন মানবধর্মের সত্য বাণী, 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁট', অর্থাৎ সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে।

স্বীয় অন্তরে এই বিশ্বচৈতন্যের জাগরণের ফলেই ব্রাহ্মণ রামানন্দ একদিন আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন নাভা চণ্ডালকে, জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। ব্রাহ্মণেরা সংস্কারবশে সেদিন তাঁর এই সামাজিক কাজকে ধিক্কৃত করেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল। অনুরূপ উপলব্ধির ফলে যীশুখৃষ্টও বলেছিলেন, 'আমি আর আমার পরমপিতা একই'। কেন না তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহং-সীমা ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে নিজেকে অভেদ দেখেছিলেন। বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন ব্রহ্মবিহার, তারও অর্থ হ'ল—অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। অন্তরালোকে এই বিশ্বচৈতন্যের অনুভবই মানুষকে জাগ্রত করেছে মানবধর্ম-বোধে।

প্রাণী-জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু অমেয় প্রাণশক্তিতে নয়,—তাকে ঘিরে মানবমহিমার যে অম্লান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে জ্যোতিই দিয়েছে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব। এই মহিমাই তাকে সবল করেছে 'সোঽহম্' তত্ত্ব প্রচারে—মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে যে তত্ত্বে। এই 'সোঽহম্' অবশ্য ব্যক্তিগত মুক্তিই ঘোষণা করেনি—সমষ্টিগত মানুষের সম্মিলিত অভি-ব্যক্তির মন্ত্র ঘোষিত হয়েছে এই তত্ত্বের মধ্যে। মানবধর্ম উপলব্ধিতে যাঁদের জীবন সার্থক হয়েছে, তাঁরা শুধু নিজের মুক্তিচিন্তা নিয়েই তৃপ্ত থাকেন-নি। তাঁদের জীবনের রথ অগ্রসর হয়েছে বিশ্বজনের কল্যাণকামনায় বিচিত্র কর্মের পথে। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতের 'সোঽহম্' তত্ত্ব উপলব্ধি ধ্যানস্তব্ধ নয়, কর্মনির্ভর।—'কেন না যাঁরা মহাত্মা, তাঁরা বিশ্বকর্মা'।

মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন আশাবাদী, অহং-সীমায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে মহামানবের আবির্ভাব দেখে তিনি মনে করেন, ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জীব-মানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।' আমরা যারা ক্ষুদ্র

মানুষ, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমরা বর্তমান মানুষের অহংবোধ ও মানবধর্মচ্যুতি দেখে ক্ষুব্ধ হই, দুঃখবোধ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সীমাহীন অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অমিতবীর্য মানুষের অক্লান্ত জয়যাত্রা দেখে মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হয়েছেন আশান্বিত। তাঁর এই আশাবাদ শুধু কবির ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই আশাবাদের ভিত্তিভূমি সমাজ-তাত্ত্বিকের বস্তুদৃষ্টি ও তত্ত্বান্বেষীর ভাবদৃষ্টি। স্বীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তিনি বলেছেন:

জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণ-কণায়, তারপর জন্তুতে, তারপর মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল, তখনই যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা 'সর্বমেবাবিশন্তি'—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।...আলো-কেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকীরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে তার মহামানবকে...দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত ক'রে বলতে পারুক 'সোঽহম্'।*

'মানুষের ধর্ম' উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মননশীল কবিকে উত্তীর্ণ করেছে সর্বযুগের মানবহিতব্রতীদের সমপর্যায়ে।

* এই প্রবন্ধে সকল উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' থেকে।

অমৃত সাধনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

মরণের তীরে বসে অমৃত সাধনা ক'রে যাই:
একদিন এ জীবন অমৃত পরশ পেয়ে জেগে
উঠবে; সেদিন কবে আসবে কিছু তো জানা নাই;
সাধনা সফল হবে একদিন তার ছোঁয়া লেগে,
এ প্রত্যয় মনে মনে আজো জাগে; বেদনা-বন্ধুর
পথে চলি হাসিমুখে; মাঝে মাঝে কত না নিরাশা
পথ ঢেকে দিয়ে যায়; তবু চলি সে পথে সুদূর
অমৃত-মন্ত্রটি সাথে; সে পথের সকল কুয়াসা
দূরে সরে যায় সব; আলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতিধারা
নেমে আসে সারা অঙ্গে; মন ভরে ওঠে সুনিবিড়
কী আশ্বাসে! আকাশের অগণিত চন্দ্র সূর্য তারা
চলে মোর সাথী হ'য়ে; দিকে দিকে বাজে সুগম্ভীর
কী উদাত্ত শঙ্খধ্বনি! মনে হয় তীর্থযাত্রী আমি—
চলেছি সে তীর্থপথে, যেখানে সে শাশ্বত সুন্দর
রয়েছে অমৃত-ভাণ্ড সাথে নিয়ে সদা দিনযামী
জাগ্রত; আসবে কবে সে ভক্ত পিপাসু—নিতে বর।

জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী

মানবসমাজে জীবন, জীবিকা ও শিক্ষার মধ্যে যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিবিশেষের বেলায় এমন হ'তে পারে যে তিনি জীবিকার্জনের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু জীবনটি উচ্চতম আদর্শে খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। অল্পে সন্তুষ্ট থাকার এক আদর্শ আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য বেশী চেষ্টা না ক'রে ভগবানের উপর নির্ভরতা রেখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা—এখানে প্রশংসিত। এই ভাব কায়মনোবাক্যে যিনি বজায় রাখতে পারেন, তাঁর কথা আলাদা; তিনি সমাজে থাকলেও সমাজের বহু উর্দ্ধে। এরূপ ব্যক্তি দশলাখে একজন মেলে কি না সন্দেহ। জনসাধারণ এই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সর্ব চেষ্টা পরিত্যাগ করলে কোন সমাজ যে টিকতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। অল্পকালের মধ্যেই সেই সমাজের নির্বাণ অবশ্যম্ভাবী।

জীবনধারণের জন্য পরিশ্রম অত্যাবশ্যক

জনসাধারণের বেলায় আমরা এটাই দেখতে পাই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম না করলে অন্ন জুটে না। সুদূর অতীতে হয়তো এমন যুগ ছিল, যখন প্রকৃতির অবারিত দানরূপে খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যেত। কিন্তু তখনও ফলমূল কিংবা খাদ্যশস্য কুড়িয়ে আনতে হ'ত, জলের মাছ কিংবা বনের পশুপক্ষী শিকার ক'রে আনতে হ'ত, একেবারে বিনাশ্রমে কিছুই মুখে এসে হাজির হ'ত না। আর মানুষের দেহযন্ত্রের গঠন এমনই যে বিনা পরিশ্রমে খিদেও তেমন পায় না, হজমও ভাল হয় না। যাই হোক, সেই স্বর্ণযুগের প্রকৃতিদত্ত প্রাচুর্যের কথা ভেবে লাভ নেই। বর্তমান যুগে—এটা কঠোর হলেও নিরেট সত্য যে, আমাদিগকে জীবিকা 'অর্জন' করতে হয়। অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অবশ্য এমন আছেন, যাঁরা বসে বসে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত বিত্ত কিংবা নিজেদের হঠাৎ-পাওয়া বিত্ত শুধু ভাঙিয়ে খাচ্ছেন, কোন পরিশ্রমের বালাই নেই। কিন্তু এঁদের উপর এখন জনসাধারণের বিষ-নজর। রাজা-জমিদার শ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত,—আর নির্ভাবনায় নিছক সুদের টাকায় কিংবা শেয়ারের মুনাফায় জীবিকানির্বাহের দিনও বিগতপ্রায়।

জীবিকা ও জীবন—যেন ভিত্তি ও ইমারত

জীবিকা না হ'লে জীবন টিকে না। আর মানবসমাজ যে অবস্থায় পৌছেছে তাতে কায়িক পরিশ্রম না ক'রে জীবিকার সংস্থান হয় না। জীবিকা শুধু যে দেহরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন তা নয়; জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থান ব্যতীত উচ্চতর জীবনবিকাশেরও দারুণ ব্যাঘাত ঘটে। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট,' 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—ইত্যাদি প্রবাদবাক্যের মূল এখানে। জীবন ও জীবিকার সম্পর্ককে—ইমারত ও ভিত্তির সম্পর্কের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। ভিত্তি ছাড়া ইমারত দাঁড়াতে পারে না; আর উপরে যদি ইমারত না গড়ে ওঠে, তবে ভিত্তির কোনই সার্থকতা নেই। ইতর প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই জীবন; কিন্তু মানবের পক্ষে তা নয়। প্রকৃত মানবজীবন বলতে

বুঝায় উচ্চতর জীবন—দৈহিক জীবনকে অতিক্রম ক'রে মননের ও আত্মবিকাশের অবিরত চেষ্টাই জীবন।

ধর্ম ও অর্থ—মানবেতিহাসের প্রধান দু'টি নিয়ামক। ধর্মের প্রভাব সাময়িকভাবে অধিক বলশালী; কিন্তু অর্থের প্রভাব ব্যাপক ও চিরন্তন।

আর এক দিক থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হচ্ছেন আলফ্রেড মার্শাল। তাঁর দু-একটি সিদ্ধান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলছেন যে, শুধু এক ধর্মের প্রভাব বাদ দিলে কোন ব্যক্তি কি উপায়ে জীবিকার্জন করে এবং কি পরিমাণ রোজগার করে, তা দ্বারাই তার চরিত্র প্রধানতঃ গঠিত হয়।

মানবেতিহাসে চিরকাল দু'টি শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার ক'রে আসছে—একটি 'ধর্ম', অপরটি 'অর্থ' (=পার্থিব অভাব-মোচনের সর্ববিধ প্রয়াস)। ধর্মের প্রভাব খুবই বলশালী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক-একবার কোন সমাজে, দেশে কিংবা মহাদেশে এমন এক-এক ধর্মান্দোলন অথবা ধর্মের উন্মাদনা ঘটে গিয়েছে যে তখনকার মতো মনে হয়েছে বুঝি তার বন্যার মুখে সব কিছু ভেসে যাবে। কিন্তু ইতিহাসে বারংবার দেখা গিয়েছে, অতি বড় আধ্যাত্মিক শক্তির কিংবা অতি উৎকট ধর্মোন্মাদনার (Fanaticism) বেগও কালক্রমে মন্দীভূত কিংবা তিরোহিত হ'য়ে যায়।

রোজগারের প্রণালী ও পরিমাণ, জীবনের উপর উভয়ের প্রভাব

পক্ষান্তরে, মানুষের আর্থিক কার্যকলাপের প্রভাব চির-বিদ্যমান। ওতে জোয়ারভাটা থাকলেও গতির কোন বিরাম নেই। এই হিসাবে ধর্মের চেয়েও আর্থিক প্রচেষ্টার প্রভাব অনেক বেশী ব্যাপক এবং গভীর। যে কাজের দ্বারা কোন ব্যক্তি তার জীবিকার্জন করে, সেই কাজের চিন্তা দিবসের বেশীর ভাগ সময় তার মনবুদ্ধিকে ব্যাপৃত রাখে, আর সেই সময়টাতেই মনবুদ্ধি থাকে সব চেয়ে বেশী সজাগ এবং সক্রিয়। ঐ সময়ে সে যে যে বিষয় চিন্তা করে, যেভাবে হাত পা ও মস্তিষ্ককে খাটায়, যেভাবে সহকর্মীদের এবং উর্ধ্বতন ও অধস্তন ব্যক্তিদের—অথবা মক্কেল ও খরিদ্দারদের—সহিত ব্যবহার করে, তা দ্বারাই বহুলাংশে তার স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ কি উপায়ে, কি কাজের দ্বারা, কি রকম পরিবেশে ও সংসর্গে কোন ব্যক্তি জীবিকার্জন করে—জীবনের উপর তার প্রভাব অনেকখানি। আবার আয়ের প্রভাবও যথেষ্ট। মাসিক আয় যদি ২৫০ টাকা হয়, তবে হয় তো কোন রকমে সংসার চলে যায়। কিন্তু যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে খুব সম্ভবতঃ অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটে, অসুখবিসুখে চিকিৎসা অসাধ্য হয়, ছেলেমেয়েদের সাধারণ লেখাপড়াও শেখানো চলে না—ইত্যাদি। সমস্ত জীবনটাই তখন অত্যন্ত নীচু পর্যায়ে নেমে যায়। সুতরাং জীবন, জীবিকা ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

যে শিক্ষায় জীবিকার্জনের সামর্থ্য না জন্মায়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

আলফ্রেড মার্শাল তাই বলেছেন যে, পার্থিব অভাবমোচনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াসকে অবহেলা ক'রে মানবসমাজ ও মানবজীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই যুক্তি যদি আমরা মেনে নিই—আর না মানবার কোন হেতু দেখা যায় না—তবে অনিবার্যরূপে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীর জীবিকাসংস্থানের উপায় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর জীবনবিকাশের আগ্রহ জন্মে।

জীবিকার্জন ও শিক্ষা, প্রাণিজগতের দৃষ্টান্ত

জীবজগতের প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, অত্যন্ত নিম্নবর্গের প্রাণীর মধ্যে জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। একমাত্র সহজাত সংস্কারের সাহায্যেই তারা আহার্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় ও সমর্থ হয়; পিতামাতার নিকট হ'তে কোন শিক্ষালাভের অথবা সাহায্যের দরকার হয় না। আর পিতামাতাও এ বিষয়ে সন্তানের প্রতি কোন দায়িত্ব স্বীকার করে না। মক্ষিকা ডিম পেড়েই খালাস; ডিম আপনা হ'তে ফুটে, তা থেকে বাচ্চা বেরোয়, এবং বাচ্চা তার নিজের পথ নিজেই দেখে। ক্রমশঃ যত উচ্চবর্গের প্রাণীর দিকে যাওয়া যায়, ততই লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় চোখে পড়ে। পক্ষী-মাতা এবং ধাড়ী-বেরাল নিজ নিজ শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ তো করেই, উপরন্তু কেমন ক'রে শিকার ধরতে হয় ও আহার্য সংগ্রহ করতে হয়—তাও পরিপাটিরূপে শেখায়।

মানবসমাজের বৃত্তিশিক্ষাই চিরকাল ছিল সাধারণ্যে প্রচলিত শিক্ষা; লেখাপড়ার চর্চা খুব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল।

মানব-পর্যায়ে এলে দেখতে পাই যে মানবশিশুর দীর্ঘকাল লালন-পালনের আবশ্যক হয় এবং তার পর জীবিকার্জন শেখাবার জন্যও অনেক যত্ন ও সময় ব্যয়িত হয়। কৃষকের ছেলে, তাঁতির ছেলে, জেলের ছেলে—সবাইকে বৃত্তিশিক্ষার জন্যে শিক্ষানবীশী করতে হয়। যে বৃত্তি যত কঠিন, তার শিক্ষানবীশীর কাল তত দীর্ঘ। প্রাচীন যুগে প্রায় সকল সভ্য-সমাজেই বৃত্তি ছিল বংশগত, এবং বৃত্তির সংখ্যা ছিল অল্প। কৃষকের ছেলে স্বভাবতই চাষবাসে লেগে যেত, তাঁতির ছেলে তাঁত বোনায়—ইত্যাদি। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে এই বৃত্তিভেদ কালক্রমে জাতিভেদের আকার ধারণ করে—ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য দেশে ও সমাজে এরূপ জাতিভেদের উদ্ভব না হলেও বৃত্তিভেদ সর্বত্রই ছিল, এবং বৃত্তি মোটের উপর ছিল বংশগত। 'শিক্ষা' বলতে বৃত্তিশিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষানবীশীই (apprenticeship) বোঝাত; লেখাপড়ার চর্চার দিকে লোকের ঝোঁক ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই লেখাপড়া শিখত, এবং তারও এক অতি ক্ষুদ্র অংশ সারাজীবন লেখাপড়া নিয়ে কাল কাটাত।*

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ও জীবনযাত্রার গভীর পরিবর্তন

ব্যাপকভাবে ইওরোপে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দরুণ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম এই বিপ্লব শুরু হয়। এতকাল যে সমস্ত শিল্পকাজ গৃহস্থেরা নিজেদের ঘরে ব'সে, কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

* প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তিন বর্ণের ছেলেদের জন্যই 'উপনয়নে'র বা গুরুগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শুধু ব্রাহ্মণের ছেলেরাই ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় গুরুগৃহে কাটাত। সবাই যে যেত, তা বলা যায় না; কতক ব্রাহ্মণকুমার যে যেত না, তার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই সুস্পষ্ট। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীরা কেবল যে বেদপাঠেই নিমগ্ন থাকত, এমন নয়;—দিবাভাগের অধিকাংশ সময় তাদিগকে কৃষি, গোপালন, কাষ্ঠাহরণ প্রভৃতি কাজে এবং আশ্রমপরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতে হ'ত। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দায়িত্ব থেকে বিদ্যাভ্যাস মোটেই বিযুক্ত ছিল না। প্রায় সবাই বেদবিদ্যার নিজ নিজ শাখা আয়ত্ত ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমের, অর্থাৎ সংসার-ধর্ম পালনের যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরত। আর এক ভাবে বলতে গেলে সমাজে ব্রাহ্মণদের যে কর্তব্য ও বৃত্তি ছিল,—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল তারই শিক্ষানবীশী।

সংস্থার সাহায্যে ক'রে আসছিল, সেগুলো এখন বাষ্পচালিত বৃহৎ কারখানায় স্থানান্তরিত হ'ল। হাতে-চালানো চরকা ও তাঁতের জায়গায় এল যন্ত্র-চালিত চরকা ও তাঁত। কাঁচা রাস্তার বদলে হলো ম্যাকাডাম প্রণালীর (ম্যাকাডাম সাহেবের উদ্ভাবিত) পাকা সড়ক,—তৈরী হ'ল রেলপথ এবং চালু হ'ল রেলগাড়ী। পণ্যদ্রব্যের চলাফেরা এবং মালপত্র আনা-নেওয়ার ব্যবস্থার ঘ'টল আমূল পরিবর্তন। ধনোৎপাদন-প্রণালীই গেল সম্পূর্ণ বদলে। তার ফলে সমাজের স্তরবিন্যাস ও বৃত্তি-বিন্যাস আগে যেমন ছিল, তেমন আর রইল না। রোজগারের জন্যে দলে দলে লোক কয়লার খনিতে এবং কলকারখানার দিকে ধাবিত হ'ল; স্ত্রীলোক ও শিশুরাও সেখানে মজুরীতে লেগে গেল। ফল যে সবদিক্ দিয়ে হিতকর হয়েছিল, তা কখনই নয়। নূতন ধনোৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে থাকার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং নৈতিক আবহাওয়া মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু কলকারখানার প্রতিযোগিতায় পুরাতন বৃত্তিসমূহের অনেকগুলিই ধ্বংসোন্মুখ হওয়াতে কারখানায় ভর্তি হওয়া ব্যতীত লোকের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং নানা অসুবিধা ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও মেয়েপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ সকলেই কারখানার কাজে লেগে গিয়েছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী গত হবার পর শ্রমজীবীদের হিতকল্পে সর্বপ্রথম ফ্যাক্টরী-আইন প্রবর্তিত হয়। জনমত, সরকারী চেষ্টা এবং শ্রমজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধতা—এই তিনের মিলনে শ্রমজীবীদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেছে। আর এখন তো রাষ্ট্রে ও সমাজে নানা বৃহৎ ব্যাপারে শ্রমিকদেরই প্রাধান্য।

শিল্পায়নের ফলে ইংলণ্ডে 'শিক্ষানবীশী' লুপ্ত হয়নি, শুধু নূতন রূপ নিয়েছে—
শিক্ষা বলতে এখনও শিক্ষানবীশীরই প্রাধান্য।

ইংলণ্ডের আর্থিক (economic) ইতিহাসের কয়েকটি বিষয় খুবই অনুধাবনযোগ্য, তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। আমরা ইদানীং শিল্পায়নের (Industrialisation অর্থাৎ কলকারখানার সাহায্যে ধনোৎপাদনের) জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। কোথায় তার বাধাবিঘ্ন, কোথায় এ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি, তার অনেক ইঙ্গিত এই ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শিক্ষানবীশী-ব্যবস্থা ইংলণ্ডে কখনও লুপ্ত হয়নি, শুধু তার রকম ও প্রণালীটাই কতক বদলেছে। আগে বৃত্তি ছিল মোটের উপর বংশগত, এবং জন্মস্থান ছেড়ে বেশী দূরে বড় কেউ যেত না। শিক্ষানবীশী শুরু হ'ত পিতার নিকট, কোন প্রতিবেশীর নিকট অথবা কোন শিল্প-পঞ্চায়েতের (guild) অধীনে। এখন আর বৃত্তি ততটা বংশগত নয়, দূর-নিকটের পার্থক্য অনেকটা ঘুচে গিয়েছে এবং শিক্ষানবীশী করতে হয় প্রধানতঃ কারখানায়। মোটামুটি ব্যবস্থা এই যে—কৈশোর অতিক্রান্ত না হতেই প্রায় সবাইকে নিজ নিজ বৃত্তি বেছে নিয়ে—কৃষিক্ষেত্রে হ'ক, কলকারখানায় হ'ক, কোন পেশাতে হ'ক, ব্যবসা-বাণিজ্যে হ'ক—যেখানেই হাতে-কলমে কাজ শেখবার সুবিধা আছে, এমন জায়গায় শিক্ষানবীশীতে ভর্তি হওয়া চাই।

আগেকার দিনে শিক্ষানবীশী শুরু হ'ত অল্প বয়সে, এখন শুরু হয় কতকটা দেরীতে। দু'কারণে শিক্ষানবীশী শুরু হবার বয়স ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। প্রথমতঃ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে যতই কাজে লাগানো হচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকরা সাধারণ লেখাপড়া না জানলে তাদের পক্ষে কাজ শেখা কঠিন হয় এবং তারা খুব উঁচুদরের কারিগর হতে পারে না। সুতরাং কর্মকুশলতার জন্যে খানিকটা লেখাপড়া জানা নিতান্ত দরকার। একটা ন্যূনকল্প লেখাপড়া

আগে শেষ ক'রে তার পর শিক্ষানবীশীতে গেলে ফল হয় ভাল। দ্বিতীয়তঃ কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশ যত সমৃদ্ধ হয়, সমাজের পক্ষে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের কাজে খাটাবার প্রয়োজন ততই কমে যায়। তখন সমস্ত বালকবালিকাদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করা—এবং অবশেষে অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া শেখা বাধ্যতামূলক করা সম্ভবপর হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই দুই কারণেই বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে, এবং এই শিক্ষার মান ও স্থিতিকাল ক্রমশঃ বাড়ছে। তারই গতিকে শিক্ষানবীশীতে ভর্তি হবার বয়স ক্রমশঃ উপরে উঠেছে এবং উঠছে।

কলকারখানা ও শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, ধনসম্পদের বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, উক্ত শিক্ষার স্থিতিকাল ও মান, বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী শুরু হওয়ার বয়স—এই সবগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মূলতঃ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জনসাধারণের পক্ষে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে বৃত্তিশিক্ষাই আসল শিক্ষা বলে পরিগণিত। গৃহস্থ-ঘরের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পক্ষে কোন একটা বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকার্জনে প্রবৃত্ত হওয়াটাই লক্ষ্য; লেখাপড়া শেখা এবং শিক্ষানবিশী করা হ'ল তারই উপায়। ইংলণ্ডের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এই মূলনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি: (১) জীবিকার্জনের সহিত বিচ্ছেদ (২) শিক্ষানবীশীর উচ্ছেদ

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তা প্রধানতঃ পোষাকী এবং পুঁথিগত। জীবিকা-সংস্থানের ব্যাপারে শুধু কেরানীগিরি, ওকালতী, মাস্টারি, ডাক্তারি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র 'ভদ্রোচিত' কাজের সঙ্গে এর সম্পর্ক। দেশের বৃহত্তর আর্থিক জীবনের সঙ্গে, ধনোৎপাদনমূলক নানাবিধ বৃত্তিতে প্রবেশলাভের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বরং শিক্ষালাভান্তে কৃষিশিল্প প্রভৃতি হাতের কাজে কেউ যাতে না যায়, স্কুল কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার প্রেরণা এবং ঝোঁক সেই দিকেই। কৃষক, কামার, কুমোর, ছুঁতোর, দর্জী—এদের ছেলেরাও স্কুলের চৌকাঠ একবার মাড়ালে আর হাতের কাজে যেতে চায় না, 'বাবু' হ'তে চায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই যে মারাত্মক ত্রুটি—তা দেশের মনীষী, দরদী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে: 'সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি, ওকালতী, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুনসেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোন শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপর নাই, তাহা পরগাছার মত, পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।' জীবিকার সহিত শিক্ষার বিচ্ছেদই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সব চেয়ে বড় ত্রুটি। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বরাজ-লাভের পর এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বেসামালভাবে বেড়েই চলেছে। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর স্মৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তার নন্দী

স্বামীজী একদিন আমাকে বলিলেন, 'তুই এলাহাবাদে থাকিস, ডাক্তার নন্দীকে জানিস?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ'। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আমি যখন ঝুঁসিতে ছিলাম, কখন কখন ডাক্তার নন্দীর বাড়ীতে ভিক্ষা ক'রে আসতাম। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল।' ডাঃ নন্দী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতেন। তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিলাম—ঠাকুরের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাস গঙ্গার অপর পারে —যেস্থানে সাধুসন্ন্যাসীরা থাকেন—সেইস্থানে ছিলেন। সেই সময়টা ছিল দারুণ গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা খালি-পায়ে আধখানা ভোটকম্বল কোমরে জড়ানো আর আধখানা গায়ে দিয়া ডাঃ নন্দীর বাড়ী পাঁচ ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতেন এবং ভিক্ষা গ্রহণের পর হাঁটিয়া ফিরিতেন। এইরূপ তিতিক্ষা উত্তর পশ্চিমের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বামীজীর কঠোরতা তাঁহাদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

স্বামীজীর মাতৃদেবীকে দর্শন

প্রায়ই কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে যাইতাম। যুবা ও প্রৌঢ় বহু ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শন পাইবার আশায় মঠে যাইতেন। কিন্তু সদা সর্বদা তাঁহার 'দর্শন' হইত না। অধিকাংশ সময় স্বামীজী নিজ কক্ষে থাকিতেন; সে সময় তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি ছিল না। তিনি নিজেই যখন বাহিরে আসিতেন, সর্বসাধারণ তখনই তাঁহার কাছে আসিতে পারিত। স্বামীজীর গুরুভ্রাতারাও যখন তখন তাঁহার কাছে যাইতেন না। সাধারণতঃ স্বামীজী ঘরের বাহিরে থাকিলে তাঁহাদের সহিত স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাস—সবই হইত!

একদিন সকালে স্বামীজীর মাতাঠাকুরানী মঠে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমারও মনে তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তাঁহার শরীরের গঠন ছিল বলিষ্ঠ, চক্ষু দুইটি বৃহৎ এবং আয়ত—চলিত ভাষায় যাহাকে বলে 'পটল-চেরা চোখ'। তাঁহার মধ্যে সবল দৃঢ় চিত্ত ও তেজস্বিতার ভাব যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইত। দেখিয়া মনে হইল, এমন মাতারই স্বামীজীর মতো পুত্র হওয়া সম্ভব। মঠের দ্বিতলে উঠিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—'বিলু-উ-উ'। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অল্পক্ষণেই দেখি, স্বামীজী মায়ের সহিত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছেন। বাহিরের বাগানে উভয়ে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং মাতা ও পুত্রে নিম্নস্বরে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ী মাঝে মাঝে যাইতেন। সেখানে গেলে মায়ের কাছে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। যখন মঠে থাকিতেন, তখনও মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া মাকে দেখা দিয়া আসিতেন। কদাচিৎ অনেকদিন না দেখিলে তাঁহার মা

নিজে মঠে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। তবে মঠে তিনি খুব কম আসিতেন। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে মঠে দেখিতে পাইলাম। আরও দেখিলাম মাতার কাছে সেই জগদ্‌বিখ্যাত স্বামীজী যেন একটি ছোট শিশু।

জাপানের রাজদূত

জাপানের কনসাল একদিন প্রায় বেলা চার ঘটিকার সময় মঠে আসিয়া স্বামীজীর দর্শন-প্রার্থী হইলেন। মঠের উঠানের পাশের বারান্দায় যে বেঞ্চিগুলি পাতা থাকিত, তিনি এবং তাঁহার দোভাষী সেখানেই বসিলেন। স্বামীজীকে খবর দেওয়া হইল। এরূপ করা সাধারণ নিয়ম না হইলেও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিলে তাঁহাকে খবর দেওয়া হইত। কিন্তু সকল সময়ে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিতেন না। দেখা করা বা না করা সম্পূর্ণ তাঁহার তাৎকালিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কখনও তিনি অল্পক্ষণেই নামিয়া আসিতেন আবার কখন বা দেখাই হইত না। সেদিন তাঁহাকে খবর দেওয়া হইলে আমরা ভাবিলাম, তিনি এখনি আসিবেন ; কিন্তু তাহা হইল না। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল এবং জাপানের রাজদূত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামীজী আসিলেন এবং শিষ্টাচার সম্ভাষণ শেষ হইলে দোভাষী মারফৎ রাজদূত বলিলেন, 'আমাদের মিকাডো আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনি জাপানে চলুন। ইহা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। হিন্দুধর্ম সেখানে প্রচার করবেন এবং তাতে জাপানের মঙ্গল হবে। আপনি সম্মত হলেই সেখানে রাজোচিত সম্বর্ধনার জন্য মিকাডো ব্যবস্থা করবেন।'

স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'শরীর আমার অসুস্থ। এখন জাপান যাওয়া সম্ভব হবে না।' রাজদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি সুস্থ হ'লে যাবেন, এই কথা কি মিকাডোকে জানাতে পারি?' তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'এ শরীর জাপানে যাবার মতো আবার হবে, তা আমার মনে হয় না।'

স্বামীজী ডায়াবিটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন এবং তাঁহার দেহ কৃশ হইয়াছিল, মুখের চেহারাও খারাপ হইয়া গিয়াছিল। রাজদূত তখন ফিরিয়া গেলেন এবং স্বামীজী পুনরায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাধারণতঃ এই সময় তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। কিন্তু সেদিন আর গেলেন না।

রাখাল মহারাজ

ইহার পর অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ফিরিয়া আসিলাম। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তখন আমি থাকিতাম। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের ক্লাবে আসিয়া থাকিতেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা তখন মঠ হইতে বাহির হইত। ঐ নামটি আমাদের মনে ধরিয়াছিল এবং তদনুসারে ক্লাবের নামকরণ হইয়াছিল। ছুটী পাইলেই কলিকাতা ও বেলুড় যাইতাম। কিন্তু সব সময় স্বামীজীর দেখা পাইতাম না। একবার এইরূপ বেলুড় গিয়া শুনিলাম, তিনি অন্যত্র গিয়াছেন। পূঃ রাখাল মহারাজ মঠে ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার কাছে বহুবার গিয়াছি। তাঁহাকে দেখিতাম, কথা খুব কম বলিতেন এবং অনেক সময় ভাবস্থ হইয়া থাকিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা খুব উচ্চ। ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে মানস-পুত্র বলিয়াছেন ; কিন্তু একথার গভীরতা বুঝিবার সাধ্য আমার ছিলনা। তিনি অন্তর্যামী, একথা শুনিতাম এবং বিশ্বাসও করিতাম। এই সময় আমার মনে কয়েকটি সংশয় ছিল।

আমি না বলিলেও তিনি তাহা বুঝিয়া আমার সংশয় নিবৃত্তি করিয়া দিবেন—এই আশা লইয়া আমি তাঁহার নিকটে চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তিনিও কোন কথা না বলিয়া আপনার ভাবে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, 'মন্মথ! এস একটু বেড়িয়ে আসি।' তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মঠ হইতে গেট পর্যন্ত রাস্তা। গঙ্গাতীরে তখনও কোন মন্দিরাদি হয় নাই। অধিকাংশ স্থান ফাঁকা। দক্ষিণে জাহাজ-ঘাটের দিকের গেট পর্যন্ত আমরা বারকয়েক হাঁটিয়া গেলাম আবার ফিরিলাম। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার সব প্রশ্নেরই সুমীমাংসা করিয়া দিলেন।

তাহার পর মঠের সামনে ঘাটের উপর একটি রানার উপর নিজে বসিলেন এবং আমাকেও পাশে বসিতে ইসারা করিলেন। আমি একটি সিঁড়ি নীচে তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম। 'স্বামীজী' বলিলে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বুঝায়, সেইরূপ 'মহারাজ' বলিলে রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই বুঝাইত। মহারাজের প্রতি আমার তখন অতিশয় শ্রদ্ধা হইয়াছে। আমিও ভাবিলাম ইঁহার নিকট দীক্ষা পাইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আমি তাঁহাকে কাতর ভাবে বলিলাম, 'ঠাকুরের পূজা জপ ধ্যান করি, কিন্তু মনে হয় দীক্ষা হইলে ভাল হয়। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।'

রাখাল মহারাজ অল্পক্ষণ অন্তর্মুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'তোর গুরু আমি নই। তোর গুরু স্বামীজী।'

একথা শুনিয়া আমি হতাশ হইলাম। মনে হইল তাহা হইলে দীক্ষা আর হইল না। বামন হইয়া চাঁদ ধরাও যেমন, স্বামীজীর শিষ্য হওয়াও আমার পক্ষে তেমন। মন্ত্র-শিষ্য তাঁহার খুব কম ছিল। আমার আর কি সুকৃতি, যে তিনি মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। মনটা খুবই দমিয়া গেল এবং অল্পদিনে এলাহাবাদ ফিরিলাম।

স্বামীজীর মহাবীর-ভাব

ইহার পর যে সময় বেলুড় মঠে গেলাম, দেখিলাম স্বামীজী মঠেই আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যেরও একটু উন্নতি হইয়াছে—মনে হইল। আর এক দিন সকালে আসিয়া দেখি, স্বামীজী মঠের পুরাতন ঠাকুর ঘরের সামনে পায়চারী করিতেছেন। বারে বারে এই শ্লোকটি অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিতেছেন :

গর্জন্তং রামরামেতি, ব্রুবন্তং রামরামেতি।
গর্জন্তং রামরামেতি, ব্রুবন্তং রামরামেতি॥

শ্রীরাম-জানকীর দেউড়ি পাহারা দিতেছেন স্বামীজী,—স্বয়ংই যেন তিনি মহাবীর হইয়া গিয়াছেন। মহাবীরের হুঙ্কারে একমাত্র 'রাম রাম' ধ্বনি শুনা যাইত। তাঁহার প্রতিবাক্যেই 'রাম রাম' এই কথাটিই প্রতিধ্বনিত হইত।

মহাবীরজীকে স্বামীজী মহাশক্তিমান্ বলিতেন। স্বামীজীকে সেদিন দেখিয়া মনে হইল তিনি মহাবীরের মতই বিরাট শক্তিশালী। তাঁহার প্রতি হাবভাব ও পদক্ষেপে সেই শক্তিরই প্রকাশ হইতেছিল। মুখ তাঁহার ভাবে থম থম করিতেছে, হাত-দুইটি বুকের কাছে,—শিকাগোতে লেকচার দেওয়ার যে ছবি দেখা যায়—সেইরূপ। ঈষৎ মাতোয়ারা হইলে পা যেরূপ পড়ে—সেইরূপ। অথচ গতি ক্ষিপ্র এবং তির্যক। কখনও হাত-দুইটি পাশে দোলাইয়া চলিতেছেন, কিন্তু সেই একই ভাবে ক্রমান্বয়ে পরিক্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বাহিরের দরজার কাছে আসিয়া থামিলেন। তাহার পর

বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া দুই বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহা পরাক্রমে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি সূর্য চন্দ্রের গতি রোধ করতে পারি।'

অপূর্ব সেই দৃশ্য! একদা লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময় মহাবীর সূর্যকে কুক্ষিগত করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যের জন্য স্বামী বিবেকানন্দও পুনর্বার তাহা করিতে প্রস্তুত। হেন অসাধ্য কর্ম নাই, যাহা তিনি করিতে পারেন না। সূর্য বা চন্দ্রের গতি রোধ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য কি?

একটি যুবককে স্বর্ণঘড়ি দান

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দশ বারো জন যুবক আসিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে উপরের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী ঘর হইতে বাহিরে আসিলে তাহারা তাঁহাকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। স্বামীজীও সহজভাবে সকলের সহিত কথা বলিতেছিলেন। কখন কাহারও কাঁধে হাত দিয়া, কখন কাহারও পিঠে চাপড় মারিয়া এমনভাবে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, যেন তিনি তাহাদেরই একজন। তাঁহার গলায় ছিল একটি সোনার ঘড়ির চেন। সেকালে সোনার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন ব্যবহার করার প্রথা ছিল, কিন্তু স্বামীজীকে কখনও এই ঘড়ি ও চেন ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তাঁহার সুন্দর রঙে এই সোনার চেনটি দিব্য মানাইয়াছিল। একটি যুবক ঐ চেনে হাত দিয়া বলিল, 'এ চেনটি তো ভারী সুন্দর!' স্বামীজী তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; পরক্ষণে ঘড়ি ও চেনটি খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'নে, এটা তোকে দিলুম। তোর খুব পছন্দ হয়েছে—তা তুইই এটা রাখ।' ছেলেটি বিস্ময়ে হতবাক্। ঘড়ি ও ঘড়ির চেন লইয়া সে কি করিবে বা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। পরক্ষণে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'এটা তোকে দিলুম; কিন্তু দেখিস—বিক্রী করিস নে যেন। নিজের কাছেই রাখিস।'

শুনিয়াছি বিলাতে থাকাকালে কোন বিশিষ্ট মহিলা স্বামীজীকে ঘড়িটি উপহার দিয়াছিলেন। এমন মহামূল্য বস্তুটি স্বচ্ছন্দে এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন কেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইলাম না। তবে তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল, সন্দেহ নাই। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রাপ্ত বস্তুর ত্যাগই ত্যাগ। যার সব আছে—অথচ উদাসীন, তারই ঠিক ত্যাগ। যে নিজেই ভিখিরী—তার আবার ত্যাগ?'

কিন্তু আমরা ত্যাগ বলিতে যে ধারণা করি, স্বামীজী তাহার বহু উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁহার মনটি ছিল অতি সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী যন্ত্রের মতো; তাঁহার কোন বস্তুর প্রতি অপরের মনের ছায়াপাত হইলেও তাহা তিনি কাছে রাখা কষ্টকর মনে করিতেন। যুবকটির মনে যে লুক্কায়িত ভাবটি ছিল, তাহা লোভ হইতে পারে অথবা সন্ন্যাসীর নিকট স্বর্ণ আছে বলিয়া বিরূপতাও হইতে পারে। তাহার ভাব বুঝিয়া স্বামীজী সহজেই তাহাকে ঘড়িটি দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কে জানে স্বামীজীর এই স্বর্ণ ঘড়ি দেওয়ার সহিত মনোজগতে সেই যুবককে আর কি সম্পদ দিয়াছিলেন?

অধ্যাপকদিগের মধ্যে

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বামীজীকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা হইত; এজন্য বড়দিনের ছুটিতে দূর হইতেও তাঁহারা আসিতেন। আগ্রা হইতে কয়েকজন বাঙালী

ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন অধ্যাপক ছিলেন। মঠের উঠানে কয়েকটি সাধারণ বেঞ্চির উপর তাঁহারা বসিলেন এবং অদূরে একটি চেয়ারে স্বামীজী ছিলেন। অধ্যাপকবৃন্দ নানা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং স্বামীজীও হাসিতে হাসিতে যথাযথ উত্তর দিতেছিলেন। দার্শনিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি—কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে আগন্তুকগণ উঠিলেন। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল তাঁহাদের চিত্তে প্রসাদ আসিয়াছে।

এই সময় একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। একই সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে প্রশ্ন বর্ষণ করিতেছিলেন, স্বামীজী সে সকলের এমন একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন, যাহার সূত্র ধরিয়া সব কিছুর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সকলেই স্বামীজীর কথায় পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিশ্চিতই ছিল, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি এমন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাহা সিদ্ধান্তরূপে মানিয়া লইতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অসুবিধা হইত না।

সাধু অমূল্য

একবার স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এলাহাবাদে সাধু অমূল্য থাকে—তাকে চিনিস্?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' 'তার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? সে কেমন আছে? তার কথা আমায় বল্।' সংক্ষেপে তাঁহার সব কথা জানাইলাম। অমূল্য সাধু এক কালে প্লেগ ও কলেরা রোগীর খুব সেবা করিয়াছিলেন। তখন তিনি গেরুয়া পরিতেন না। লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পরে তিনি একদল গঞ্জিকা-সেবীর 'গুরুজী' হইয়া পড়িলেন, তখন গেরুয়া পরিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অধঃ-পতনের শেষ সীমানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অঘোর-সম্প্রদায়ীদের মতো কতকটা তাঁহার আচরণ ছিল। বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তিনি নাগাদিগের মতো থাকিতে আরম্ভ করিলেন। নিজেকে সোঽহং-সম্প্রদায়ের বলিতেন।

একবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সাধু অমূল্যকেও দেখিলাম। কিন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার ভক্তদিগের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। এক সময় তাঁহার সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, পরে তাঁহার চূড়ান্ত পতন দেখিয়া তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী এ-সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, 'Ah! a great soul! a great soul!' (আহা, একটি মহান্ আত্মা)।

এমন অধঃপতনের পরও স্বামীজী সাধু অমূল্যের নির্ভীক হৃদয় ও সেবাগত প্রাণটাই দেখিলেন। তাঁহার দোষের কথা একবারও মনে করিলেন না। আমাকে বলিলেন, 'তার এ জন্মটা নষ্ট হ'ল। যাক্, পরজন্মে মুক্ত হ'য়ে যাবে।' প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেন: অমূল্য তাঁহার সহিত একই কলেজে পড়িত। সে ছাত্র জীবনে ভাল ছেলে ছিল—মেধাবী ও বুদ্ধিমান্। তখনই তাহার হৃদয় উদার ও জ্ঞান-মার্গের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। সে গুরু-করণে বিশ্বাসী ছিল না। তাহার সাধনার জীবনে পুস্তক ও নিজের সংস্কারই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল।

কলেজ-জীবনে অমূল্য নরেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন, মনে হয়। শেষ

দিকে অঘোর ও নাগা সম্প্রদায়ের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব। তবে তাঁহার ভক্ত ও স্তাবকবৃন্দ বিশেষ মার্জিতরুচি ছিল না। এজন্য বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের সহিত নিম্নস্তরের সাধনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

যাহা হউক, স্বামীজীকে তাহার জন্য বিশেষ বিচলিত হইতে দেখিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্বামীজী বলিলেন, 'মন্মথ! তুই এলাহাবাদে গিয়ে একবার অমূল্যর সঙ্গে দেখা করিস। আর তাকে বলিস, তোকে আমিই পাঠিয়েছি। তাকে জিগ্যেস করবি, তার কি চাই। সে যা বলবে, তা তুই তাকে এনে দিস।'

এলাহাবাদে ফিরিয়াই 'গুরুজী'র কাছে অনেক কাল পরে গেলাম। গিয়াই বলিলাম, 'মশাই! আপনার কাছে এসেছি স্বামীজী পাঠিয়েছেন ব'লে; তা না হ'লে আসতাম না। আপনার কি কি চাই আমাকে বলুন; তা আমি এনে দেব। স্বামীজী আমাকে এই রকম আদেশ করেছেন।'

অমূল্য আমার কথায় শ্লেষের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'অ্যাঁ, স্বামীজী তোকে পাঠিয়েছে? স্বামীজী! তা সে কি বললে আমার কথা?' আমি যথাযথ সবিস্তারে জানাইলে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন এবং তাঁহার দুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হইল। কিছুটা ভাবাবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, 'তুই আমাকে চার পাঁচ সের গাওয়া ঘী এনে দিস, আর কিছু ফল এনে দিস্।' কয়েক দিনেই এক ভাঁড় গব্যঘৃত সংগ্রহ করিলাম। পশ্চিমে গাওয়া ঘী দুষ্প্রাপ্য বস্তু, ভয়সা ঘী প্রচুর পাওয়া যায়। কোন ক্রমে গব্যঘৃত কয়েক সের এবং কিছু ফল লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলাম। জিনিষগুলি সামান্যই। কিন্তু অমূল্য সাধু সেগুলি পাইয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। ইহাই আমার তাঁহার কাছে শেষবার যাওয়া। কিছুদিন তাঁহার কোন খোঁজ রাখি নাই। পরে শুনিলাম, তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে।

সাধু অমূল্য স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন। কৈশোরে যে বেদান্তদর্শন তাঁহার লক্ষ্যবস্তু ছিল, তাহার আভাস স্বামীজীর কৃপাবলে তাঁহার লাভ হইয়া থাকিবে। বন্ধুভাবে স্মরণ করিলেও স্বামীজী তাঁহাকে গুরুকৃপা করিয়াছিলেন মনে হয়। শেষের দিকে অমূল্য প্রায়োপবেশনের সংকল্প লইয়া জাহ্নবীতটে মাতা ভাগীরথীর কোলে তাঁহার পাপপুণ্যের সংস্কার ফেলিয়া দিয়া সাধনার জগতে প্রবেশ করিলেন। কে জানে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলাভের জন্য আবার কোথায় তপস্যা করিতেছেন!

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'সাধু অমূল্য গুরু করেনি, তাই এ-রকম হ'ল। সাধকের পতনের উপক্রম হ'লে তার গুরুই তাকে unbalanced (বে-সামাল) হ'তে দেন না। গুরুই তাকে রক্ষা করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মশায়, আমার যদি পতন হয়, তাহলে কি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন?'

স্বামীজী গভীর স্বরে বলিলেন, 'নিশ্চয় ক'রব। তোর সাধ্য কি তোর পতন হয়! আর যদি তুই নরকেও যাস্, তোর টিক্‌কি ধরে তোকে তুলে আনব।

(ক্রমশঃ)

'মানব-জমিন'

ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

সবই কি ছায়াবাজী ?

কয়েকদিন আগে ট্রেনে ক'রে চলেছি। দু-পাশে কত ক্ষেত, কত নদী, কত বন, কত জঙ্গল ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে আমার মনেও ঐ রকম ভাবেই কত দৃশ্য, কত ঘটনা উঠছে, থাকছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সবই ছায়াবাজী। ভাবছি জীবনও কি এই রকম? —ক্ষণস্থায়ী, অর্থহীন, স্থায়িত্ব নেই, উদ্দেশ্য নেই? তাই যদি হবে, তবে জীবনটাকে এত গুরুতর ব্যাপার মনে করি কেন? জীবনের ভার দুর্বহ মনে হয় কেন? কোথায় আটকাচ্ছে? কোথায় ভুল হচ্ছে?

পতিত মানব-জমিন

এমন সময় রামপ্রসাদের গানটি মনে উঠল :

মনরে, তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত—
আবাদ করলে ফ'লত সোনা।

ঠিক সেই সময়ে একটা জঙ্গল চোখে পড়েছে। আগাছায় লতায়-পাতায় সব মিশে একটি ঘন বন তৈরি হয়েছে। জমি যে আছে, তা দেখাই যাচ্ছে না। স্বতঃস্ফূর্ত আলোক, সর্বগ বাতাস, এ-সব প্রবেশের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ। তখন মনে উঠল, ঠিক তাই তো। কামনা বাসনা আসক্তিতে আমার মন যে একেবারে পরিপূর্ণ; এতে জ্ঞানের প্রকাশ, ভূমার উপলব্ধি যে একেবারেই অসম্ভব।

আবাদ আরম্ভ

কিন্তু ক্ষেত্রের আবাদ করতে হবে। তার আগে আগাছা কাটতে হবে। ক্ষেত্রজ্ঞ এলেন। এসে প্রথমেই বড় বড় গাছের বড় বড় ডালপালা কাটলেন, তাতে জড়ানো লতাপাতাগুলি কাটলেন। তাতে খানিকটা জমিতে সূর্যালোক ও বায়ুর প্রবেশ সম্ভব হ'ল। কিন্তু যেখানে যেখানে গাছের গুঁড়ি ছিল, সেগুলি সেখানে রয়েই গেল। সেখানটা সাফ হ'ল না। শ্রীগুরু এসে কিছু কিছু কামনা-বাসনার বিনাশ করেন বটে, শিষ্যের তখন মনে হয়, সে বড় সাধু হয়েছে, আসক্তি জয় করেছে। এ কথা সে হয়ত মুখে বলে না। কিন্তু তার মনে জাগে যে অপর সকলে আসক্তির দাস, আমি অনাসক্ত। আসক্তির প্রকোপ একটু কমেছে, শ্রীভগবানের আভাস কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অহঙ্কারের মূলগুলি এখনও যায়নি। এই অহঙ্কারের মূলগুলি উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত আবাদ সম্ভব নয়।

অহঙ্কারের মূল

মূলগুলি কাটবার কথা বলিনি। ওগুলি উৎপাটিত করার কথা বলছি। এইজন্য বলছি যে মূলই তো সর্বনাশ করে। মূলের দুটি কাজ : এক—অন্য স্থান থেকে রস আকর্ষণ ক'রে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা, দ্বিতীয়তঃ—গাছটিকে জমিতে দৃঢ়সংলগ্ন ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। কিন্তু এই দুটি কাজই অলক্ষ্যে মাটির তলাতে হয়, চোখেই পড়ে না যে কখন কি হচ্ছে। শ্রীগুরুর কাছে আসবার আগে আমরাও বুঝতে পারি না, আমাদের মনে কিভাবে অহঙ্কার সূক্ষ্মভাবে সঞ্জীবিত হচ্ছে, কি ক'রে অহঙ্কার সুদৃঢ় হচ্ছে। হায়, এতদিন তো ভেবেছিলাম,—ভদ্রতা, শিষ্টাচার—যেগুলিকে সংসারে ভালো বলে, সেই রকম কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তাই যথেষ্ট। শ্রীগুরু এসে বুঝিয়ে দেন, এর ভেতরে ফাঁকি কোথায়। ভদ্র ব্যবহার করি, অন্যে আমার সঙ্গে ভদ্র আচরণ

করবে ব'লে, অপরের কাছে বিনয় দেখাই, অপরের কাছে মান পাব ব'লে—শিষ্টাচার করি, সমাজের শাসনে, রাষ্ট্রের শাসনে—এগুলি যে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। শ্রীভগবানের পথে এগুলির যে কোনও মূল্য নাই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'তে হবে। তবে সেই নিরপেক্ষ সত্তার সন্ধানে বেরুতে এ পথের এই একমাত্র পাথেয়।

জমির সমতা থাকে না

মূল উৎপাটিত করাতে জমি বিপর্যস্ত হ'ল। জমির সমতা রইল না; বিষম হ'ল। আবাদের সময় এ 'বিষম' সমুপস্থিত হবেই। এই 'বিষম' না এলে ক্ষেত্র বুঝতেই পারে না যে ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে। অর্জুন জানতেন—তিনি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনই তাঁর কর্তব্য। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখলেন বিষম ব্যাপার। আত্মীয়বধ, স্বজনবধ, গুরুজনবধ—এ সব না ক'রে ক্ষাত্রধর্ম পালন করা যায় না। তখন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের কাছে ক্ষেত্রের ধর্ম বুঝতে চাইলেন। এবং তার পরেই ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব বুঝতে পারলেন। যিনি শুধু সখা বা স্বজনমাত্র ছিলেন, তিনি যে কি হলেন সে কথা দূরে থেকে স্মরণ করেও সঞ্জয়ের পুনঃ পুনঃ রোমহর্ষণ হ'তে লাগল। তাই বলছিলাম, ক্ষেত্র বিষম না হ'লে ক্ষেত্রজ্ঞ আসেন না, তাঁর মহিমা বোঝা যায় না, আবাদ হয় না।

সর্বত্র হলচালনা

ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের কোন অংশই বাদ দেন না। যেখানে মূল গভীরভাবে প্রোথিত আছে সেখানেও হলচালনা করেন। ক্ষেত্রের বুক বিদীর্ণ হয়। তখন সে অনুভব করে, বাসনা-কামনা কি নিবিড় ভাবেই তাকে ছেয়ে রেখেছিল। যাদের আদর ক'রে সে একদিন বুকে তুলেছিল, এখন তাদের সরাতে হচ্ছে—এতে ব্যথা আছে বই কি! ত্যাগে কষ্ট আছে বই কি! কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ শুধু হল-চালনা করছেন না, তিনি যে তাঁর শ্রীচরণের স্পর্শ দিচ্ছেন ক্ষেত্রের সর্বত্র। আহা, সে স্পর্শ যে ক্ষেত্র পেয়েছে সে তো বলবেই, 'প্রভুজী, চরণকী পাশ বুলাও। অঙ্গসুঁ অঙ্গ লাগাও।'

আগাছার রূপান্তর

তখন বিষম থেকে সমে এসেছি। জমিটা আর বন্ধুর নেই, সমতল হয়েছে। কিন্তু তবু কি ক্ষেত্রের খেদ যাচ্ছে? ভাবছে, 'প্রভু, কই তুমি আমার কামনা-বাসনাগুলিকে দূর করলে না তো, সেগুলিকে চাপা দিলে মাত্র। আমার বাসনা সব রয়েই গেল যে। একি হ'ল ঠাকুর!' ক্ষেত্রজ্ঞ হাসেন বলেন, 'থাম্, থাম্, তুই ক্ষেত্রজ্ঞ—না, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ? তুই ক্ষেত্রের কি বুঝিস্ বল্‌তো? ত্থাখ না যা করেছি, তার ফল কি হয়! তোর জমিটা যে পালটে দিয়েছি। আগে জমিতে কেবল কাঁটা-জঙ্গল ছিল, মনেতে ছিল কেবল কামনা-বাসনা। এখন যে তাতে আলোকের, বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিস। আর ঐ যে ঘাসগুলি ফেলে দিইনি, তার কারণ ওগুলিতেই জমির উর্বরা শক্তি বাড়বে। যে কামক্রোধগুলি আগে তোকে কত কষ্ট দিয়েছে, এখন সে গুলিই কত উপকারে আসবে। মনটা যে পালটে দিয়েছি। এখন ঠাকুরকেই কামনা করবি। তাঁকে না পাবার জন্য ক্রোধ হবে। তিনি যে লোভের জিনিস, এটা ঠিক বুঝবি। তুই যে সামান্য নয়, তিনি যে তোর আপনার—এই মদ বা গর্ব আসবে। 'সে রূপ একবার হেরে কলুষ হরে, কিবা করুণাভরা আঁখিরে'—এতে তো মোহ হবেই। অপর ভক্তদের কেমন সুন্দর হচ্ছে, তোর কিছু হচ্ছে না,—এ মাৎসর্য হবে বই কি! তুই কি ক্ষেত্রজ্ঞ? তুই কেমন ক'রে বুঝবি যে, কবে ক্ষেত্র নরম হয়েছে, কবে তাতে বীজ

প্রোথিত করেছি। কবে তোকে ব্যাকুলতা দিয়ে ক্ষেত্রে অশ্রু-জল ফেলিয়েছি, কবে পচা কামনা-বাসনাকে সারে রূপান্তরিত করেছি—এসব তুই বুঝবি কেমন ক'রে? তুই শুধু এইটে জেনে রাখ, এইটে বোঝ্ যে তোর ক্ষেত্রের জন্য একজন ক্ষেত্রজ্ঞ তুই পেয়েছিস্। তোর আর ভাবনাচিন্তা নেই।'

অঙ্কুরোদ্গম

তবু কি ক্ষেত্র আশ্বস্ত হয়? তবু কি সে এ আশ্বাস মানে? যখন অঙ্কুর হয়েছে, তখনও ভাবছে, 'একি হ'ল? এই কি ভগবান-লাভ? যে কামনা-বাসনার নাশ করা হ'ল, সেগুলি কত প্রকাণ্ড ছিল। আর এতো একরত্তি। বাতাসে কাঁপে, রোদ্দুরে শুকোয়, দেখতেও তো ঠিক ঘাসেরই মতন। ঠাকুরকে পেলুম না, এক একবার মনে হয় মাত্র। এ চাওয়া কি চাওয়া হচ্ছে?' ক্ষেত্রজ্ঞ হাসেন, বলেন, 'তুই কি কখনও ধান দেখেছিস যে ধান জানবি? আমি ধান জানি, এককে বহু করাই যে আমার কাজ। আমার অন্য কাজ নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলানো, এই আমার খেলা।'

সফলতা

কি আশ্চর্য! কিছু বাদে ক্ষেত্র অনুভব করে—তাই তো ক্ষেত্রজ্ঞ ঠিকই বলেছেন। ঈশ্বর-বাসনা তো অন্য কামনার মতো নয়। এই ক্ষীণ বাসনার কী বিপুল শক্তি! সে অনুভব করে—'যে জন চতুর সুমেরু শিখর সুতায় বাঁধিতে পারে; মাকড়ের জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে এসব মিলয়ে তারে।' যতই সে এই চিন্তা করে, ততই সে সমুন্নত হয়, অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়। শ্যামলতা আর থাকে না। সে যে শুধু সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয় এমন নয়, সেই আভা তার সারা গায়ে ফুটে ওঠে। শিশিরের পেলবতাতে আর সৌকুমার্যে সে মণ্ডিত হয়। বাতাস এসে তার কানে কানে কি মেদুর বাঁশীর সুর বাজিয়ে তাকে দোলা দিয়ে যায়। সে থেকে থেকে কেঁপে ওঠে; কখন বা অশ্রুসিক্ত, কখন বা হাস্যদীপ্ত। তার শীর্ষদেশে সে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বর্ণপ্রভ আশীর্বাদ বহন করছে। সে জানে, তাতে ক'রে যে জগতের ক্ষুধা মিটবে এই শুধু নয়, তাতে তার নিজের অমৃতত্বও নিহিত আছে। সে মরেও মরবে না। সে মরতে পারে না। সেই অমৃতের সুবাস আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

পতিত যে পতিতই রইল

ট্রেন ছুটে চলেছে। তখন মনে উঠছে, 'হায়, ঠাকুর, এ সবই কি কথার কথা? ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ—এসব কি পুঁথির পাতাতেই নিবদ্ধ থাকবে? তুমি কি শুধু গুটিকয়েক ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলাবার জন্যই আস? বন বাদাড়, পতিত জমি—এইতো বেশী দেখতে পাচ্ছি। কটি ক্ষেত্রে ধান ফলছে?' তখন মনের মধ্যে ঠাকুরই উত্তর দিচ্ছেন, 'তুই কি জানিস্ না যে আমি শুধু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, ক্ষেত্রস্বামীও। জমি পতিত হ'ক আর যাই হ'ক, ও আমারই জমি। ওর এক ইঞ্চিও অপরে নিতে পারে না। সামান্য জমিদার কত কাণ্ড ক'রে, কত ফৌজদারী ক'রে নিজের অধিকার বজায় রাখে, আর আমি বুঝি ছেড়ে দেব? পতিত রেখেছি—সে আমার ইচ্ছা। আমার কাছে পতিতই বা কি, আর শস্যপূর্ণই বা কি—দুই-ই আমার জমি। আজ যে ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ, কাল সে পতিত; আবার আজ যে ক্ষেত্র পতিত, কাল সে শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কে বুঝবে বল্ তো?'

'তুঁহু জগন্নাথ'

এ কী ঠাকুর! একী হ'ল? পতিত থাকবার গ্লানি আমার মন থেকে চলে যাচ্ছে যে, আমি কি একেবারেই জড়? তোমাকে চাই না। তবু ব্যাকুলতা নেই! না, না, তুমি যে ব্যথাহারী, তাই ব্যথা দূর হয়েছে। সত্যি তো, আমি কেন ব্যাকুল হবো? তুমি তো স্বীকার করেছ, প্রভু, যে আমি তোমার,—আমি যাই হইনা কেন, আমি যে তোমার,—তুমি জগন্নাথ, আমি তো জগৎছাড়া নই,—তুমি আমারও নাথ, আমার স্বামী, আমার প্রভু, আমার দয়িত, আমার প্রিয়, আমার ঠাকুর। তুমিই তো বলেছ যে তোমারই সব, আমিও তোমার, তাহলে মানব-জমিন পতিত থাকুক আর সোনাই ফলুক, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। তোমারই জমি, তোমারই ফসল!

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

বিষয়-পরিত্যাগ বিড়ম্বনা

তৃষ্ণানদী উত্তীর্ণ হইয়া যোগিগণ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, কিন্তু বিষয় পরিত্যাগ করা কিংবা তৃষ্ণারহিত হওয়া অসম্ভব। বিষয়-ত্যাগ বড়ই দুষ্কর, কারণ মোহ-প্রভাবে সে চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিরল কোন ভাগ্যবান পুরুষই উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন—ইহাই বর্তমান দশটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরপরিগৃহীতাশ্চ বিষয়াঃ
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্ ॥১১॥

অনাদি সংসার-পরম্পরায় (জন্ম পরম্পরায়) সকাম পুণ্যকর্মসমূহে আমি কোন কল্যাণ দেখিতে পাই না। পুণ্যকর্মাদির ফল (সম্পদাদি) বিচার-দৃষ্টিতে (অনিত্য ও দুঃখদ বলিয়া) আমার চিত্তে ভয়ই উৎপন্ন করিতেছে। মহা পুণ্য দ্বারা সঞ্চিত দীর্ঘকালব্যাপী বিষয়ভোগ বিষয়াসক্তদের অশেষ দুঃখদান করিবার জন্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়া
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তা হ্যেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি ॥১২॥

বিষয় সর্বদা পরিত্যাজ্য। পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্বক বিষয় ত্যাগ করিলে উহা তাহার পরম আনন্দের হেতু হইয়া থাকে—তাই বলিতেছেন: দীর্ঘকালস্থায়ী ভোগও একদিন অবশ্য শেষ হইয়া যায়। বিষয় নিজেই নিঃশেষিত হ'ক বা পুরুষ তাহাকে ত্যাগ করুক, উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ের সহিত বিচ্ছেদ—এই দুই প্রকার বিচ্ছেদের প্রভেদ কি? তবে বিষয়াসক্ত মানব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করে না কেন? বিষয় স্বয়ং পুরুষকে ত্যাগ করিলে (অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে) উহা ঐ ব্যক্তির অসীম মানসিক পরিতাপের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু পুরুষ স্বয়ং তুচ্ছত্ববুদ্ধি সহায়ে উহা ত্যাগ করিলে ঐ ত্যাগ তৃষ্ণোপশমরূপ অসীম সুখের কারণ হইয়া থাকে।১২

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্মলধিয়ঃ কুর্বন্ত্যহো দুষ্করম্
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ।
সম্প্রাপ্তান্ন পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়ান্
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহানপি পরং ত্যক্তুং ন শক্তা বয়ম্ ॥১৩॥

বিষয়-ত্যাগে সমর্থ নিঃস্পৃহ বিবেকিপুরুষগণকে অভিনন্দন করত মনোরথমাত্রলব্ধ ধনাদিতে স্পৃহাযুক্ত ব্যক্তিকে ভর্তৃহরি নিন্দা করিতেছেন: ব্রহ্মজ্ঞান-বিচার সহায়ে নির্মলচিত্তে মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণ

স্পৃহাশূন্য হইয়া দারাপুত্রধনাদি প্রাপ্তভোগ্যবস্তুও ত্যাগ করিয়া থাকেন; অহো! ইঁহারা কি দুষ্কর ব্রতই না সাধন করিয়া থাকেন! আমরা কিন্তু—যে বস্তু অতীতে লব্ধ হয় নাই, বর্তমানেও যাহা হস্তগত নহে এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইলেও যাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না, এমন কল্পিত বিষয়সমূহে অর্থাৎ বিষয়ের আশাও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নই।১৩

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাম্
আনন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ।
অস্মাকং তু মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥১৪॥

নির্জনসেবী আত্মচিন্তনপরায়ণ পুরুষগণই ধন্য, সুখচিন্তন-তৎপর ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ, তাই কবি বলিতেছেন: নির্জন গিরিকন্দর-নিবাসী জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানকারী পুণ্যাত্মা মহাত্মাগণের নেত্রবিগলিত আনন্দাশ্রু তাঁহাদের অঙ্কোপবিষ্ট বিহঙ্গকুল নির্ভয়ে পান করিয়া থাকে। অহো তাঁহারা ধন্য! আমাদের জীবন মনোরথরচিত ভবন ও জলাশয়তটের ক্রীড়াকাননে বিহারকৌতুকাসক্ত হইয়াই ব্যতীত হইয়া গেল, (অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনাতেই অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে)।১৪

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রং বিশীর্ণ-শতখণ্ডময়ী চ কন্থা হা হা তথাপি বিষয়া ন পরিত্যজন্তি ॥১৫॥

বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। বিষয়াভিভূত অথচ অনুতপ্ত পুরুষের ভাব লইয়া লেখক বলিতেছেন: আমি মধুরাদিরসবিহীন ভিক্ষান্নে প্রাণ ধারণ করিতেছি, আহার একবার মাত্র। ভূমিতলই আমার শয্যা অর্থাৎ শয্যাচ্ছাদন কিছুই নাই ও একমাত্র স্বদেহই আমার কুটুম্ব অর্থাৎ সেবক-স্বজনাদি আমার কেহই নাই; শতবিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড-রচিত কন্থাই আমার পরিধেয় বসন অর্থাৎ বাহ্য ভোগসাধন সর্ববস্তুই আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু হায়! কি আশ্চর্য, এরূপ অবস্থাতেও বিষয়বাসনা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না।১৫

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনকলশাবিত্যুপমিতৌ মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরশিরঃস্পর্ধি জঘনং মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিজনবিশেষৈর্গুরুকৃতম্ ॥১৬॥

কবিগণ অতি রমণীয় বলিয়া বর্ণনা করিলেও বিচারদৃষ্টিতে কামিনীর রূপ ভোগ্যবিষয়, সুখ ও দুঃখের কারণ তাহা ত্যাগের জন্য এই শ্লোকে তাহার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে।১৬

একো রাগিষু রাজতে প্রিয়তমা দেহার্ধধারী হরো
নীরাগেষু জনো বিমুক্তললনাসঙ্গো ন যস্মাৎ পরঃ।
দুর্বারস্মরবাণপন্নগবিষব্যাবিদ্ধমুগ্ধো জনঃ
শেষঃ কামবিড়ম্বিতান্ন বিষয়ান্ ভোক্তুং ন মোক্তুং ক্ষমঃ ॥১৭॥

একমাত্র মহাদেবই যথার্থ অনুরাগী ও বিরক্ত;—অনুরাগিপুরুষগণের মধ্যে আপন প্রিয়তমা পার্বতীর অর্ধাঙ্গ বামাঙ্গে ধারণকারী মহাদেব অতুলনীয়রূপে বিরাজমান, অর্থাৎ ক্ষণমাত্রবিচ্ছেদেও অসহিষ্ণু হইয়া বামাঙ্গে প্রিয়তমাকে ধারণ করাতে সদাশিব প্রেমিকশ্রেষ্ঠ; পুনঃ বীতরাগ পুরুষ-

গণের মধ্যেও মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নাই, কারণ ললনার প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি নাই। এই দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত অপর সকলেই দুর্নিবার মদনবাণরূপ সর্পের বিষে বিদ্ধ হইয়া মূঢ় হইয়া আছে, তাহারা কামপ্রেরণায় সংগৃহীত (স্ত্রী-অন্ন- পানাদি) বিষয় ঠিক ঠিক ভোগ করিতেও পারে না, ত্যাগ করিতেও পারে না। ১৭

অজানন্ দাহাত্ম্যং পততু শলভস্তীব্রদহনে
স মীনোঽপ্যজ্ঞানাদ্ বড়িশযুতমশ্নাতু পিশিতম্
বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥১৮॥

মোহের দুর্নিবারত্ব বর্ণিত হইতেছে : রূপমুগ্ধ পতঙ্গ অগ্নির দহন-সামর্থ্য (ও দহন-যন্ত্রণা) না জানিয়া জাজ্বল্যমান অগ্নিতে প্রবেশ করে ও বিনষ্ট হয়, মৎস্যও আসন্ন বিনাশ বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়াই বঁড়শি-গ্রথিত মাংসখণ্ড গিলিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হায়, কি আশ্চর্য, আমরা বিচারে সমর্থ হইয়াও অশেষ অনর্থ-সঙ্কুল ভোগ্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিতে পারি না। অহো! মোহের মহিমা কি দুর্বিজ্ঞেয়!১৮

তৃষা শুষ্যত্যাস্যে পিবতি সলিলং শীতমধুরম্
ক্ষুধার্তঃ শাল্যন্নং কবলয়তি মাংসাদিকলিতম্
প্রদীপ্তে কামাগ্নৌ সুদৃঢ়তরমালিঙ্গতি বধূম্
প্রতীকারং ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্যস্যতি জনঃ ॥১৯॥

অজ্ঞান-প্রভাবেই ভোগবিষয়ে পুরুষ সুখবুদ্ধি করিয়া থাকে।—তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মানুষ শীতল সুমিষ্ট জল পান করিয়া থাকে, ক্ষুধার্ত হইলে দধি-ঘৃত-মাংসাদিসহ সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে, ইত্যাদি। বিচারদৃষ্টিতে ঐগুলি তত্তৎ রোগের প্রতিষেধক ঔষধমাত্র, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ লোকে ঐগুলি সুখ—এইরূপ বিপরীত জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

তুঙ্গং বেশ্ম সুতাঃ সতামভিমতাঃ সংখ্যাতিগাঃ সম্পদঃ
কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চ নবমিত্যজ্ঞানমূঢ়ো জনঃ
মত্বা বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকারাগৃহে
সংদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুরং তদখিলং ধন্যস্তু সংন্যস্যতি ॥ ২০ ॥

সংসারবিষয়াসক্তিবশতঃ অজ্ঞানী বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।—সমুন্নত গৃহ, বিদ্বজ্জনপ্রশংসিত বিদ্যাবিনয়াদিগুণবিশিষ্ট পুত্রগণ, অপরিমিত ধনরাশি, কল্যাণী পত্নী ও নব যৌবন লাভ করত মোহমুগ্ধ মানব ঐ গুলি চিরস্থায়ী মনে করিয়া সংসাররূপ কারাগৃহে প্রবেশ করে এবং আসক্ত হয়। কিন্তু ভাগ্যবান পুরুষই সম্যক্ বিচার সহায়ে সর্ববিষয়ভোগ ক্ষণস্থায়ী জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শ্রীশৈলম্-যাত্রা

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

বহুদিন হইতে বিখ্যাত শিবক্ষেত্র 'শ্রীশৈলম্' দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দেবাদিদেব মহাদেবের অশেষ কৃপায় সম্প্রতি উহা পূর্ণ হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী-উৎসবে স্থানীয় ভক্ত ও বন্ধুদের সাগ্রহ আহ্বানে হায়দ্রাবাদ যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। সেকেন্দ্রাবাদের উপকণ্ঠে বেগমপেট এরোড্রোমের পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ সুন্দর ও নির্জন পরিবেশে অবস্থিত। মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শিষ্য স্বামী যোগেশ্বরানন্দ কর্তৃক উক্ত মঠ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত। বর্তমানে স্থানীয় কয়েকজন ভক্ত উহার পরিচালনা করিতেছেন। এই দূর দেশেও শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতি অশেষশ্রদ্ধাসম্পন্ন বহুসংখ্যক ভক্ত ও বন্ধু দর্শনে আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছিল। এই আনন্দ পরিপূর্ণতা লাভ করে—যেদিন সেকেন্দ্রাবাদে মহবুব কলেজ হলে স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু বলিবার আহ্বান আসে, কারণ ঐ হলের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াই আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ১৮৯৩ খৃঃ ১২ই ফেব্রুআরি প্রায় একসহস্র শ্রোতার সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম সাধারণ অভিভাষণ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ঐ হল আমাদের নিকট একটি তীর্থস্থান।

হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহর দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার মাইল। সেকেন্দ্রাবাদ শহরে বিখ্যাত পুরাতন কালীমন্দির দর্শনে খুব আনন্দ হইল। উভয় শহরের এবং উহাদের নিকটবর্তী অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ, যথা—সালর-জঙ্গ মিউজিয়াম, গোলকুণ্ডা ফোর্ট, ওসমান সাগর প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্বক সেকেন্দ্রাবাদ হইতে রাত দশটায় বাঙ্গালোর-গামী ট্রেনে উঠিয়া ১৫১ মাইল দূরে কার্নুল শহরে অবতরণ করি ভোর পাঁচটায়। কার্নুল অন্ধ্রপ্রদেশের একটি জিলা-শহর। অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর কার্নুলেই প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। বেশ বড় শহর। মাদ্রাজ হইতে ইহার দূরত্ব ৪০৭ মাইল। বোম্বাই লাইনের গুণ্টাকল জংশনে ট্রেন বদল করিয়া মিটার গেজ ট্রেনে কার্নুল যাইতে হয়।

কার্নুল হইতে রোজ দুইখানি বাস শ্রীশৈলম্ যায়—প্রথমখানি ছাড়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় এবং দ্বিতীয়খানি দুপুর সাড়ে বারোটায়। কার্নুল হইতে শ্রীশৈলম্ ১১০ মাইল। পথে বাসের দুইটি প্রধান বিরতিস্থান; প্রথমটি ৪৫ মাইল দূরে আত্মকুরে, পথ সমতল; দ্বিতীয়টি দোরনালে, আত্মকুর হইতে ইহার দূরত্ব ৪০ মাইল—কিছু কিছু চড়াই উৎরাই আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর—দুই পাশে শাল ও বাঁশের ঘন জঙ্গল। কোথাও ক্বচিৎ আবাদী ক্ষেত্র দেখা যায়। দোরনাল হইতে প্রকৃত পাহাড়ী রাস্তা শুরু হইল—এখান হইতে শ্রীশৈলমের দূরত্ব ৩৫ মাইল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পথের দুধারে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা পুষ্প-পরিপূর্ণ জঙ্গল। দৃশ্য অতি মনোহারী। সর্বোচ্চ স্থান যাহা অতিক্রম করিতে হয়, সমুদ্র হইতে তাহার উচ্চতা ২৮৩৫ ফুট। উহার পরই আবার উৎরাই শুরু। পাঁচ-ছয় মাইল

দূর হইতেই শ্রীশৈলম্‌ পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মন্দির এবং তাহার পাশেই কৃষ্ণানদী দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণানদীকে এখানে পাতাল-গঙ্গা বলা হয়। মন্দির হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। জল স্পর্শ করিতে হইলে অনেক নীচে নামিতে হয়। অনেক যাত্রী এই পবিত্র নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া থাকেন। মন্দিরের খুব কাছেই বাস-স্ট্যাণ্ড। কার্নুল হইতে শ্রীশৈলম্‌ পৌঁছাইতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগে, এবং বাসের ভাড়া টাকা ৬৩৭। এছাড়া অন্ধ্র-প্রদেশের অন্যতম জিলা-শহর গুণ্টুর, মহকুমা-শহর নন্দীয়াল এবং রেলওয়ে জংশন গুণ্টাকল হইতেও শ্রীশৈলম্‌ পর্যন্ত সোজা বাস চলে। 'শ্রীশৈলম্‌ দেবস্থানম্‌' কর্তৃক বাসগুলি পরি-চালিত; ঐ গুলি মন্দিরেরই সম্পত্তি। উহা হইতে মন্দিরের বেশ আয় হয়। রাস্তা বরাবরই পিচের; গত দুই বৎসর হইতে শ্রীশৈলম্‌ পর্যন্ত বাস যাতায়াত করিতেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ঐ তীর্থ দর্শন করিতে আসেন, তখন রাস্তাগুলি নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য, দূর হইতে হাজার হাজার দর্শনেচ্ছু ভক্ত নরনারীর মন্দির-দর্শনের খুবই সুবিধা হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বেও আত্মকুর হইতে বাসে নাগলুটি পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে পদব্রজে ২৫ মাইল অতিক্রমপূর্বক শ্রীশৈলমে পৌঁছিতে হইত। পাকদণ্ডী পথে দূরত্ব কম ছিল। যাঁহারা পদব্রজে যাইতেন, তাঁহারা শ্রীশৈলমের পাঁচ মাইল পূর্বে 'শেখর' নামক মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ পূর্বক সেখান হইতে প্রথমে মন্দির দর্শন করিতেন। শেখরের উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফুট; উঠিবার সিঁড়ি আছে। এখনও গরীব যাত্রীরা নাগলুটি হইতে পদব্রজেই গমন করিয়া থাকেন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্মরণ মনন করিতে করিতে মনোরম লতাপুষ্প-শোভিত পাহাড়ী পথ ধীরে ধীরে অতি-ক্রম পূর্বক অবশেষে গন্তব্যস্থল—শ্রীভগবানের পদতলে উপস্থিত হইতে পারিলে যাত্রীর মন বিমল আনন্দে ও স্বস্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইত। আজকাল সর্বত্র যানবাহনের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গম তীর্থগুলি অনেকেই হয়ত দর্শন করিতে পারিতেছেন, কিন্তু ঐ স্থানগুলির গাম্ভীর্য যেন কমিয়া যাইতেছে।

সহজলভ্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ সাধারণতঃ কমই হইয়া থাকে। যাহা দুর্লভ ও কষ্টসাধ্য—তাহা পাইলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়! শ্রীভগবান ভক্তানুগ্রহার্থেই যেন স্বীয় আবাসস্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন বিপৎসঙ্কুল ও অত্যন্ত দুর্গম পাহাড় পর্বত গুহা ও জঙ্গলের মধ্যে। বদরীনাথ, কেদারনাথ, কৈলাস, অমরনাথ প্রভৃতি উহার সাক্ষ্য দেয়। স্বভাবতই ঐসব তীর্থদর্শনে পূর্বে অনেক সময় লাগিত এবং তীর্থযাত্রীরা ঐ সময় শ্রীভগবানের স্মরণ মননে অতিবাহিত করিত।

যাহা হউক, এখন আমরা পূর্বকথার অনুসরণ করি। পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী কার্নুলের পরিবহণ-পরিচালক শ্রীশৈলম্‌-গামী একখানি বাসে আমা-দের জন্য আসন পূর্বেই সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভোর ৬টায় তাঁহার বাসা হইতেই আমরা বাসে উঠিলাম। এতদিনের স্বপ্ন শীঘ্রই সফল হইবে ভাবিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। দ্রুতগামী (express) বাসটি পথে মাত্র ৩।৪ জায়গায় থামিয়া দীর্ঘ ১১০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক দুপুর সাড়ে বারোটায় আমাদের মন্দিরের প্রায় সামনে আনিয়া উপস্থিত করিল। এখানে প্রথমে ধুলাপায়ে ঠাকুর-দর্শনের বিধি আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে আমাদের বিছানাপত্র রাখিয়া তাড়াতাড়ি গোপুরম্‌ অতিক্রমপূর্বক

গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত কোনরূপ দর্শনী না দিয়া সকলেই দর্শন করিতে পারেন। অন্য সময় যাইতে হইলে যাত্রীপিছু ১৲ টাকা প্রবেশ-ফি দিতে হয়। মন্দিরের কর্মচারীকে ১৲ টাকা দিয়া আমরা গর্ভমন্দিরে একেবারে দেবতার সামনে আসিয়া পড়িলাম। ভিড় কম থাকায় খুব ভালভাবেই দর্শনাদি হইল। দর্শনী দিয়া যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলেই ভগবানকে মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন।

মন্দিরের কর্মচারীকে পূর্বেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাথরুমসহ দুইকামরার একটি কুটীরে (cottage) আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের একটি প্রাক্তন ছাত্রও আমার সঙ্গে হায়দ্রাবাদ হইতে আসিয়াছিল। এই কুটীরগুলির ২৪ ঘণ্টার ভাড়া ১০৲। ইলেকৃটিক লাইট আছে, কিন্তু জলের ব্যবস্থা তখনও হয় নাই। কুটীরের রক্ষক রাস্তার ধারে অবস্থিত জলের কল হইতে জল আনিয়া দেয়। আসবাবের মধ্যে দুই খানি লোহার খাট, টেবিল, চেয়ার, জলের কুঁজা, ঘড়া ও বাথটব আছে। এইরূপ মাত্র ৫টি কুটীর আছে। আমার পাশের কুটীরে শৃঙ্গেরী-মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য সদলবলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনদিন পূর্বে তিনি শ্রীশৈলম্ দর্শনে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে প্রায় ৭০।৮০ জন লোক, ২টি মটরগাড়ী, ১টি লরী ও ২টি ছোট বাস, সবই ওঁর নিজের। অন্ধ্র গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫।৬ জন পুলিশ কনেস্টবল তাঁহার শরীর-রক্ষক হিসাবে আসিয়াছিল। উনি ঐদিনই বিকালে রওনা হইবেন, কাজেই স্নানের পরই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া ২০।২৫ মিনিট হিন্দীতে কিছু আলাপ করিলাম। রামকৃষ্ণ মঠের কোন কোন সাধুকে তিনি চেনেন, কয়েকটি আশ্রমেও গিয়াছেন; উদারভাবসম্পন্ন দেখিয়া আনন্দ হইল। আমাদের কিছু কিছু পুস্তকাদিও পড়িয়াছেন, অনেক ভাষা জানেন; সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁহার মাতৃভাষা তেলুগু। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিলেন, 'উনি তো সমাধিমান্ পুরুষ ছিলেন।' আরও বলিলেন, 'আজকাল সাধুরা কিছু সেবাকাজ না করিলে দেশের লোক তাহাদের পছন্দ করে না, কিন্তু আমাদের কোন কাজ করার উপায় নাই, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা দেশের সেবা করিয়া আমাদের মুখ রক্ষা করিতেছেন'—ইত্যাদি। তেলুগু ভাষায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' পুস্তক তাঁহাকে উপহার দিলাম, এবং তিনিও খুব আনন্দের সঙ্গে উহা গ্রহণ করিলেন। সাড়ে তিনটার সময় তিনি সদলবলে রওনা হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে মন্দিরের ভোজনালয় (canteen) হইতে বড় টিফিন-কেরিয়ারে আমাদের খাবার আসিয়া গিয়াছে। আহারের পর একটু বিশ্রামান্তে শ্রীশৈলম্ স্থানটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। সমগ্র উপত্যকাই প্রায় মন্দিরের সম্পত্তি। রাস্তার দুধারেই বিরাট বিরাট ধর্মশালা নির্মিত হইতেছে। ঐসব কাজের জন্য প্রায় পাঁচশত শ্রমিক পরিবার এখানে অস্থায়িভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। তাহাদের জীবনযাত্রা খুবই অনাড়ম্বর। 'তিরুপতি দেবস্থানম্'ও এখানে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিতেছেন। এখানে ডাকঘর, হাসপাতাল, থানা এবং একটি টুরিষ্ট-হোম আছে। দেখিলাম, কয়েকজন ইওরোপীয় ভদ্রলোকও এই স্থানটি দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। অন্ধ্র সরকারের বিশেষ আগ্রহ যে, তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সময় ২৫।৩০ কোটি টাকা

ব্যয়ে এখানে একটি জলাধার (Dam) নির্মাণ করা হয়। বলা বাহুল্য, ঐ কাজ আরম্ভ হইলে এখানকার সৌন্দর্য অনেকাংশেই ব্যাহত হইবে। কয়েকটি দোকান ও ২।৩টি হোটেল আছে। যে হারে নির্মাণকার্য চলিতেছে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই ইহা একটি ছোটখাটো শহরে পরিণত হইবে।

স্থানটি দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল ছিল বলিয়া পূর্বে বছরে মাত্র কয়েকদিন করিয়া দুইবার পুরোহিতরা আসিয়া ভগবানের পূজাদি করিতেন—শিবরাত্রির সময় কয়েকদিন এবং তেলুগু নববর্ষের (মার্চ-এপ্রিল) সময় কয়েকদিন। কিন্তু বাস-চলাচলের পর হইতে এখন রোজই নিয়মিত পূজাদি হইয়া থাকে। গত শিবরাত্রির সময় কয়েকদিন ধরিয়া প্রায় এক লক্ষ যাত্রী আসিয়াছিল। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রান্তরেই তাহারা রন্ধনাদি কার্য ও রাত্রে শয়ন করিয়াছিল। শীতকালে বাঘের উপদ্রব খুব বেশী। গত শীতের সময়ও ৫০।৬০টি গবাদি পশু বাঘে লইয়া গিয়াছে। সাপও যথেষ্ট—কখন কখন রাতে বিছানায় পর্যন্ত আসে, কিন্তু বোধ হয় শিবের স্থান বলিয়া এ পর্যন্ত কাহাকেও দংশন করে নাই।

মন্দিরের প্রবেশ-পথ বড়ই অপরিষ্কার। এ বিষয়ে মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের চারিপাশে সুউচ্চ পাথরের দেওয়াল। দেখিলেই মন্দিরটি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের উঠান পাথর দিয়া বাঁধানো।

ভারতবর্ষে বিখ্যাত দ্বাদশটি শিবক্ষেত্র আছে। ঐসব স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয়। শ্রীশৈলমে অধিষ্ঠিত দেবতা শ্রীমল্লিকার্জুন এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়। জ্যোতির্লিঙ্গগুলির নাম :

(১) শ্রীসোমনাথ (সৌরাষ্ট্রের প্রভাসপট্টনে),

(২) শ্রীমল্লিকার্জুন (অন্ধ্রদেশের শ্রীশৈলম্ পর্বতে),

(৩) শ্রীমহাকাল (উজ্জয়িনীতে),

(৪) শ্রীওঁকারেশ্বর (নর্মদাতীরে ; ইহার অপর নাম অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর),

(৫) শ্রীকেদারনাথ (হিমালয়ে),

(৬) শ্রীভীমশংকর (দুইটি স্থানকে ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া দাবী করা হয়—প্রথমটি বোম্বাই-পুনা লাইনের নিরাল স্টেশনের অন্তর্গত, দ্বিতীয়টি আসামে গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুর পাহাড়ে),

(৭) শ্রীবিশ্বনাথ (বারাণসী),

(৮) শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর (নাসিক হইতে ১৮ মাইল, গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানের নিকট),

(৯) শ্রীবৈদ্যনাথ (ইহার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রও দুইটি বলা হয়, একটি দেওঘরে এবং অপরটি হায়দ্রাবাদের নিকট পার্লীতে),

(১০) শ্রীনাগেশ্বর (ইহারও দুইটি স্থান নির্দেশ করা হয়—প্রথমটি সৌরাষ্ট্রের দ্বারকার সন্নিকটে, দ্বিতীয়টি হায়দ্রাবাদের নিকট আউধগ্রামে),

(১১) শ্রীরামেশ্বর (মাদ্রাজ প্রদেশের রামনাদ জিলায়, সমুদ্রের ধারে) এবং

(১২) শ্রীঘুষমেশ্বর (এলোরা গুহার নিকট, অওরঙ্গাবাদ জিলায়)।

শ্রীশৈলমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমল্লিকার্জুনের নাম সম্বন্ধে দু-রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, অর্জুন এখানে মল্লিকা ফুল দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব এই মন্দির-দর্শনে আসিয়াছিলেন এবং মূল মন্দিরের পার্শ্বে যে ছোট ছোট পাঁচটি মন্দির আছে তাহা তাঁহাদের দ্বারাই স্থাপিত।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণানদীতীরস্থ চন্দ্রগুপ্তপুরমের রাজার কন্যা চন্দ্রাবতী সংসারে

বীতরাগ হইয়া শ্রীশৈলমে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার একটি সুলক্ষণা গাভী কেন দুধ দেয় না, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে একদিন দেখিলেন যে গাভীটী গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গের উপর সমস্ত দুধ ঢালিয়া দেয়। মহাদেব রাজকুমারীকে স্বপ্নেও জানাইলেন যে তিনি ওখানে অবস্থান করিতেছেন। তদবধি রাজকুমারী চন্দ্রাবতী প্রতিদিন মল্লিকা ফুল দ্বারা ঐ শিবলিঙ্গের পূজা আরম্ভ করেন এবং মহাদেব তখন হইতে মল্লিকার্জুন নামে প্রসিদ্ধ হন। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক প্রস্তরফলকে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীশৈলম্ অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। মহাভারতে ইহার উল্লেখ নিম্নরূপ :

শ্রীপর্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ ॥
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥

—বনপর্ব, ৮৩ (১৯ ২০)

অর্থাৎ শ্রীপর্বতে (শ্রীশৈলে) পরম জ্যোতিষ্মান্ মহাদেব মহানন্দে দেবী পার্বতীর সহিত বিরাজমান। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও সেখানে অন্যান্য দেবতাদের সহিত বাস করেন; এখানে স্বর্গীয় হ্রদে পবিত্রমনে ও সংযতচিত্তে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সমগ্র পরিবার মুক্তিলাভ করে।

এখন অবশ্য হ্রদ দেখা যায় না—হয়ত উহা পাতালগঙ্গাকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। শ্রীশৈলমের অন্য নাম ঋষভগিরি। কোন কোন পুরাণেও শ্রীশৈলমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানের সংকল্প-মন্ত্রেও শ্রীশৈলম্-নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কথিত আছে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন এখানে কোন এক গুহায় অনেক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। নাগার্জুন খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধধর্মের মহাযান-শাখার ইনি প্রবর্তক। নাগার্জুনের পর চার পাঁচ শত বৎসর এই স্থান বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ম্লান হইবার পর ইহা পুনরায় হিন্দুদের অধিকারে আসে। ইহার পর বীরশৈব বা লিঙ্গায়েতদের ইহা একটি প্রধান ঘাঁটি হয়। পাতালগঙ্গার তীরে অনেক শিবলিঙ্গ তখন পাওয়া যাইত এবং বীরশৈবেরা ঐ সব লিঙ্গ প্রত্যেকের নিকট রাখিতেন। এখনও মহীশূর অঞ্চল হইতে বহু বীরশৈব এ স্থান দর্শন করিতে আসেন।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন ও হুয়েন সাং তাঁহাদের ভ্রমণ-বিবরণীতে শ্রীশৈলমের কথা এবং ইহার সহিত নাগার্জুনের সম্পর্ক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে যে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যে কোন হিন্দু দেবতাকে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন, ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল—এইরূপ বলা হয়।

এই মন্দিরের প্রাকারের মধ্যেই পশ্চিম দিকে দেবীর ছোট মন্দির বিরাজিত। দেবীর নাম ভ্রমরাম্বা বা মাধবী। বিখ্যাত অষ্টাদশ শক্তি-পীঠের ইহা অন্যতম। কথিত আছে মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজী এখানে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং দেবী প্রসন্না হইয়া শিবাজীকে একটি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। ঐরূপ একটি তৈলচিত্র দেবীর মন্দিরে রহিয়াছে। শিবাজী আত্মগোপন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করেন এবং তখন মন্দিরের উত্তর দিকে একটি বিরাট গোপুরম্ বা দরজা নির্মাণ করেন। এ ছাড়া মন্দিরের পূর্বে ও দক্ষিণে প্রবেশদ্বার আছে। পূর্বদিকের গোপুরমের সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। ইহাই প্রধান প্রবেশদ্বার এবং এই দ্বার দিয়াই সাধারণতঃ যাত্রীরা যাতায়াত

করেন। দেবীর আসল মূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহা দুর্গা অথবা কালীমূর্তি। পূর্বে এখানে পশুবলি হইত। দেবীর সম্বন্ধে যে শ্লোকাষ্টক আছে, অনেকের মতে উহা আদিশঙ্করাচার্য-রচিত। উহার শেষ শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

গায়ত্রীং গরুড়ধ্বজাং গগনগাং গান্ধর্বগানপ্রিয়াম্‌,
গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিসুতাং
গন্ধাক্ষতালঙ্কৃতাম্‌।
গঙ্গাগৌতমগর্গসংস্তুতপদাং
তাং গৌতমীং গোমতীম্‌,
শ্রীশৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে॥

—অর্থাৎ, শ্রীশৈলবাসিনী মঙ্গলপ্রদা মাতা ভগবতীকে আমি স্মরণ করি। তিনি গায়ত্রী, গরুড়ধ্বজা, আকাশগামিনী এবং তিনি গন্ধর্বদের গীত ভালবাসেন। তিনি অতি গম্ভীরা, গজগামিনী, হিমালয়কন্যা এবং গন্ধ ও অক্ষতের দ্বারা সুশোভিতা। তিনি গঙ্গা, গৌতম ও গর্গের দ্বারা সম্পূজিতা এবং তাঁহাকে গৌতমী ও গোমতী বলা হয়। এই শ্লোকে 'গ' অক্ষরের ব্যবহার লক্ষণীয়।

কথিত আছে যে সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্রও এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। সীতাদেবী শিবের একটি সহস্রলিঙ্গ ভ্রমরাম্বা-দেবীর মন্দিরের প্রবেশপথের বামদিকে স্থাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্রও শিবলিঙ্গ এখানে স্থাপন করেন; উহা অদ্যাপি বর্তমান। পূর্বদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের একটু উত্তরে আর একটি ছোট শিবমন্দির আছে। শিবলিঙ্গ প্রায় দেড়ফুট উঁচু—এটিকে বৃদ্ধ মল্লিকার্জুন বলা হয়। এটি অধিকাংশ সময়ই জলসিক্ত থাকে।

মন্দিরের কার্য পরিচালনার জন্য অন্ধ্র সরকার একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি যাত্রীদের সুখসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ইঁহার সহায়তায় আমি সন্ধ্যা ৭টা হইতে প্রায় ৯টা পর্যন্ত শ্রীমল্লিকার্জুনের পূজাদি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রধান পুরোহিত আমাকে তাঁহার আসনে বসাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ভগবানের পূজাদি অতি সুন্দর ভাবে করাইলেন। শ্রীমল্লিকার্জুন লিঙ্গটি পাথরের, এবং গৌরীপট্ট হইতে ৪ ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু। পূজার পর অনেকক্ষণ মন্দিরের মধ্যে একা থাকিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ মনন করিতে পারায় নিজেকে খুবই ভাগ্যবান্‌ মনে হইল।

রাত ৯টায় যখন মন্দিরের বাহিরে আসিলাম, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, শ্রীমল্লিকার্জুনের ধাতুনির্মিত উৎসব-মূর্তিটি পালকিতে বসানো হইয়াছে এবং কয়েকশত ভক্ত নরনারী—অধিকাংশই বীরশৈব—দেবতার নানারূপ স্তবস্তুতি করিতেছেন। তাঁহাদেরই চার-পাঁচজন পালকি বহন করিবেন। মশালের আলোকে চারিদিক আলোকিত, বিবিধ সুমধুর বাদ্যে দিগন্ত পরিপূর্ণ। পুরোহিত আসিয়া আরতি করিলেন এবং তারপর অনেকেই সেই পালকির নীচে দিয়া অপর দিকে যাইতে লাগিলেন। এর পরই প্রদক্ষিণ শুরু হইবে। হঠাৎ দেখিলাম পালকি যেখান দিয়া যাইবে তাহার সামনেই ৩০।৪০ জন নরনারী পাশাপাশি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। উদ্দেশ্য, শ্রীভগবান তাঁহাদের শরীরের উপর দিয়া যাইবেন। তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া পালকি একটু থামিলে আবার আরতি হইল এবং সামনে আবার ঐরূপ অনেকেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন—এইভাবে অনেক মহিলা ও পুরুষ ভক্ত একাধিকবার ঐরূপে শয়ন করিলেন এবং শ্রীমল্লিকার্জুনের পালকি তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতে লাগিল।

আমিও একবার ইঁহাদের সঙ্গে পুরা প্রদক্ষিণ করিলাম, ইহাতে প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট লাগিল। এইভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতার শয়ন দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে দেবী ভ্রমরাম্বার মন্দিরে যাইয়া তাঁহার পূজাদি করাইলাম; পুরোহিত ছাড়া দেবীকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রণামান্তে আনন্দপূর্ণ মনে প্রায় রাত ১০টায় কুটীরে ফিরিলাম। তখন মন্দিরের প্রধান কর্মচারী আমাদের খোঁজখবর লইতে আসিলেন এবং মন্দিরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। পরদিন সকাল ৬টার বাসে আমাদের ফিরিবার কথা। ভোর ৫॥ টায় মন্দির খোলা হয়। কর্মচারীটি বলিলেন, 'আপনার জন্য আমি কাল ৫টায় মন্দির খোলার ব্যবস্থা করেছি, ঐ সময় আপনি শ্রীমল্লিকার্জুন স্বামীর বিশেষ অভিষেক (স্নান) করাবেন, পুরোহিতকেও বলে রেখেছি। ভোরে গরমজলে স্নান ক'রে যাবেন, আমি গরম-জলের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।' কুটীরের রক্ষক পরদিন ভোর ৩॥ টায় আসিয়া গরমজল করিয়া দিল এবং স্নানান্তে পৌনে পাঁচটায় মন্দিরে গেলাম। কয়েকজন পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ সমস্বরে অতি সুমধুর সঙ্গীত ও শ্লোক দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে জাগ্রত করিলেন। ইহা অনেকটা তিরুপতির 'সুপ্রভাতমে'র ন্যায়। তিরুপতিতে ভোর পাঁচটায় বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া নানারূপ প্রার্থনা ও স্তবাদির দ্বারা ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করান।

ইহার পরই গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্বক শ্রীমল্লিকার্জুনের সামনেই পুরোহিতের আসনে উপবিষ্ট হইলাম। পুরোহিত পূর্বেই অভিষেকের বিভিন্ন দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নানারূপ সুন্দর সুন্দর বৈদিক মন্ত্র পাঠ করাইয়া আমাকে দিয়া শ্রীভগবানের অভিষেক ও পূজাদি করাইলেন। জল, দুধ, দই প্রভৃতির দ্বারা অভিষেক করিলাম এবং কচি কচি সুন্দর বিল্বপত্র দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিতে পারায় পবিত্র উষাকালে মন অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, এবং শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপার কথা স্মরণ করিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। প্রায় ৪৫ মিনিট লাগিল।

বাস ছাড়িবার সময় অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে এবং যাত্রীপূর্ণ বাস আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মন্দিরের প্রধান কর্মচারী তাড়াতাড়ি গরম দুধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বাসের সর্বাপেক্ষা আরামপ্রদ আসনে আমাদের বসাইয়া দিলেন; বাসের যাতায়াত ভাড়া, কুটীরের ভাড়া বা আহারাদির জন্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক শ্রীমল্লিকার্জুনের শ্রীমন্দির উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার অপার কৃপার কথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, মন্দিরের গোপুরম্ দর্শন করিতে করিতে বার বার এই কথাই মনে হইতে লাগিল, আবার কি শ্রীমল্লিকার্জুন আমাকে শ্রীশৈলমে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লইয়া আসিবেন?

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে॥
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুষ্মেশং শিবালয়ে॥

বাদল সাঁঝে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষাল

(১)

আজকে এল বাদল দোলা
আরাত্রিকের রাতি,
আঁধার ঘরে উঠল জলে
পঞ্চপ্রদীপ-ভাতি।

মেঘের কোলে ডাক এসেছে
বার্তা বুকে নিয়ে ;
পরাণ আমার উঠছে কেঁপে
মেঘের পানে চেয়ে।

মনে পড়ে জন্মতিথি
কখন সন্ধ্যা বেলা ;
মনে পড়ে অচিন আঁখি
দেখে মেঘের খেলা।

মনে পড়ে কোন গৃহটি
যেন চিনি চিনি,
মনের কোণে বাঁশী বাজে
সুরের রিনিঝিনি।

(২)

অতল জলে পৃথ্বী যখন
মগন ছিল ঘুমে,
দিনের দেখা নাই আকাশে
ছিল আঁধার চুমে ;

হঠাৎ বেজে উঠল বাঁশী
সারা আঁধার জুড়ে,
হঠাৎ ফুটে উঠল আলো
বাঁশীর সুরে সুরে।

সেই সুরেতে পাগল হ'ল
আজকে আমার মন।
না-দেখা সেই বাঁশী-বাদক
কাঁদায় অনুক্ষণ।

নিশীথ গগন গানে ভরা
বলে রে আয়, আয়।
আমার সাথে গাইবি যদি
আয় রে, চলে আয়।

সমালোচনা

বেদান্তদর্শন (দ্বিতীয় ভাগ)—অনুবাদক ও ব্যাখ্যা-কারক স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। পৃষ্ঠা ২১৩ হইতে ৪৮৪; মূল্য চার টাকা।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক এই বেদান্তদর্শনের প্রথম ভাগে চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা অনেক পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে 'ঈক্ষত্যধিকরণ' হইতে 'অন্তর্যাম্যধিকরণ' পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলির পদচ্ছেদ, অর্থ, শাঙ্কর-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যের তাৎপর্যবোধক একটি টীকা বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। সূত্র ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ মূলানুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদিত হওয়ায় বঙ্গভাষাভাষী পাঠকগণের বেদান্তদর্শন অধ্যয়নের যথেষ্ট সাহায্য হইবে বলিয়া মনে হয়। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের বিচার-পদ্ধতি পূর্বমীমাংসা-সাপেক্ষ বলিয়া পূর্ব-মীমাংসার পদার্থ-জ্ঞান না থাকিলে বেদান্তদর্শন যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। লেখক তাঁহার স্বরচিত 'ভাবার্থদীপিকা' নামক টীকাতে পূর্ব-মীমাংসার প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রদর্শন দ্বারা প্রত্যেক অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের মূল বক্তব্যগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যা বহু পূর্বেই রামচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে উহার অনুবাদ না দিলেও চলিত। বরং অধিকরণের বিষয়ীভূত শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ও 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' ইত্যাদি সূত্রে অনুমানের আকারগুলি একটু প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। —মেধাচৈতন্য

Outlines of Vedanta, by R. Krishnaswami Aiyar; foreword by T. L. Venkatarama Aiyar (Judge, Supreme Court of India). Published by Chetana, Bombay 1. Page 163+xvii, Price: Indian Edition Rs. 4·50.

বিজ্ঞানের যুগে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে যাহাদের মনে অধ্যাত্ম বিষয়ে এক প্রকার সংশয় আসিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত। শাংকর বেদান্ত-চিন্তার সহায়ক গ্রন্থখানি পাঠে মানুষের মনে জীব জগৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা হইবে। প্রথম স্তরে লেখক বিষয়-বিষয়ী পার্থক্য বিচার করিয়াছেন। জীব বিষয়ী, ভোক্তা; এবং জগৎ বিষয়, ভোগ্য। দ্বিতীয় স্তরে স্বরূপতঃ সকলই যে এক,ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য; জীব ও জগৎ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কিছু নয়। তবে এই তত্ত্ব সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তর্কের দ্বারা ইহা জানা যায় না; 'বিজ্ঞাতাকে কিভাবে জানিবে?'—এইখানেই বেদ বা শ্রুতি প্রমাণের প্রয়োজন।

অতঃপর লেখক কর্ম ও উপাসনা কিভাবে জ্ঞানলাভের সহায়ক, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। মোট ১৮টি অধ্যায়ে লেখক বিষয়গুলি বিভক্ত করিয়াছেন। অধ্যায়ের মধ্যে অনুচ্ছেদে বক্তব্য বিষয় প্রশ্নাকারে বা সিদ্ধান্তাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিভাষা-শূন্য এবং দৃষ্টান্তবহুল পুস্তকখানি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তত্ত্বান্বেষীদের উপযোগী হইয়াছে। পৃথক পরিশিষ্ট অথবা পুস্তকের কলেবরে সিদ্ধান্তের সমর্থক শ্রুতি (উপনিষদ) বা আচার্যের উক্তি থাকিলে গ্রন্থখানির মর্যাদা বাড়িত।

ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্ঃ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটক (বাংলা অক্ষরে) ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী-মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা মোট ৮২ঃ ভূমিকা ও বিষয়বস্তুর সার সঙ্কলন ৩২ পৃঃ; মূল নাটক ৩৬ পৃঃ; শ্লোকসূচী ও কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা সঙ্গীত ১৪ পৃঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার অমিয় জীবন-চরিত এ যাবৎকাল সাধারণে প্রায় অজ্ঞাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল তাঁহার সেই অপূর্ব চরিত্র-মহিমা এরূপ সুললিতভাবে সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সকলেরই অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। তাঁহার গবেষণা গ্রন্থাবলী দেশে বিদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। আনন্দের বিষয় যে,এখন তাঁহার মৌলিক রচনাও সমভাবে সমাদৃত হইতেছে। এই দিক হইতে তাঁহার বিরচিত সংস্কৃত দূতকাব্যের ইতিহাস, শাশ্বতী ও ভাস্বতী, নাটক ঘটকর্পর ও পদাঙ্ক-দূতের টীকা, সঙ্গীত ও কবিতাবলী, শক্তিসাধন কাব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর চৌধুরী রচিত 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' নামক নাটকটির ভাষা ও ভাবগৌরব অনুপম। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য কঠিন বলিয়া অকারণ ভীত হন, তাঁহারা যদি এইরূপ একটি সহজ সরল সংস্কৃত নাটক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই ভীতি নিশ্চয়ই দূর হইবে। ভাষার মাধুর্য ও ঝঙ্কার পরম রমণীয়। নাটকটির ভাষার গাম্ভীর্য, ভক্তিভাবের নিগূঢ়তা, বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব এবং আঙ্গিকের নৈপুণ্য সম্মিলিতভাবে ইহাকে একটি উচ্চশ্রেণীর নাটকে পরিণত করিয়াছে। নাটকটির আর একটি বিশেষ সম্পদ—বিভিন্ন ছন্দে বিরচিত বহুসংখ্যক কবিতা ও গান। প্রহসন দৃশ্যটিও উপভোগ্য। এই নাটকটি 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' হইতে সর্বপ্রথম আধুনিক সংস্কৃত নাটকরূপে প্রচারিত হইবার সম্মান লাভ করিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ভারতের বহু স্থানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্থার তত্ত্বাবধানে অভিনীত হইয়া যশঃ অর্জন করিয়াছে।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, এই মনোরম নাটকটির মাধ্যমে একাধারে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভক্তিধর্মের প্রচার ও প্রসার হইবে।

মহাপ্রভুহরিদাসম্ঃ নূতন সংস্কৃত নাটক (দেবনাগরী অক্ষরে) ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত। ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা; পৃষ্ঠা ৮৮+১৬।

বাংলা অক্ষরে সুবিস্তৃত ভূমিকাসহ একটি, এবং দেবনাগরী অক্ষরে আর একটি—এই নাটকটির দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। দেব-নাগরী সংস্করণটি পূর্বে সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তাঙ্ক এই নাটকে হরিদাসের জীবনের সকল প্রসিদ্ধ ঘটনাই অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাসের মিলন ও বিরহের শেষ কয়েকটি দৃশ্য সকলেরই চক্ষুতে অশ্রু সঞ্চার করিবে।

নাটকের সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও মধুর ভাষা তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বিভিন্ন ছন্দে বিরচিত বহু-সংখ্যক কবিতা ও সঙ্গীতের অপূর্ব ঝঙ্কারে ও তানে সমগ্র নাটকটি পরিপূর্ণ।

নালন্দা গবেষণা বিহারের বরেণ্য অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি গ্রন্থের উৎকর্ষ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছে।

—পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

গিরিশচন্দ্র ঃ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা (মার্চ ১৯৫৪)। প্রকাশকাল ১৯৬০। পৃঃ ১৪০ ; মূল্য—৩'০০ টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গিরিশ-বক্তৃতাবলী'।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শৈশব থেকে গিরিশচন্দ্রকে দেখেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে পরিণত বয়সে এই ভক্ত-ভৈরবের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অনুভব করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলার নাট্যজগতের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চ উনিশ শতকে যে অধ্যাত্ম-প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তার প্রধান কারণ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বইখানি পড়তে পড়তে সেই অতীত কাহিনীর স্মৃতি আবার মানস-পটে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

গ্রন্থকার মানুষ গিরিশচন্দ্র, নট গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, ভক্ত গিরিশচন্দ্র—এই কয়টি ভাগে গিরিশচন্দ্রকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের গুণাবলী সম্বন্ধে লেখক যতটা অবহিত, ত্রুটি সম্বন্ধে ততটা নন। কারণ গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও ব্যক্তি-মহিমায় তিনি মুগ্ধ। তাছাড়া গিরিশচন্দ্র সে-যুগের শ্রেষ্ঠ নট—রঙ্গমঞ্চে তো বটেই, সেই সঙ্গে জীবন-রঙ্গমঞ্চের গিরিশ-চন্দ্রের জীবনকাহিনীও এক অপূর্ব নাট্যসৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র এতটা অবিমিশ্র সাধুবাদের অধিকারী নন। তাঁর নাটকের মধ্যে লোকশিক্ষার উপকরণ যতটা মেলে, সাহিত্যিক উৎকর্ষ ততটা মেলে না। সমসাময়িক যুগে তাঁর নাটক যে পরিমাণে পাঠকচিত্তকে অভিভূত ক'রত, আধুনিককালে তার তুলনায় অতি সামান্যই করে। বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটকগুলির বেলায় একথা বলা চলে। গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনেয় গুণে সমৃদ্ধ। তাই 'প্রফুল্ল' নাটকের গতিবেগ আজ অবধি খুব কম নাটকেই দেখতে পাওয়া যায়। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের ভক্তিরস গভীরতার বিচারে অতুলনীয়। ভক্তি-সঙ্গীতেও গিরিশচন্দ্রের দান স্মরণীয়। মানুষ গিরিশচন্দ্র ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র—অধ্যায় দুটিতে লেখক গিরিশ-মানসের জটিল গ্রন্থিগুলি উন্মোচিত ক'রে এই আশ্চর্য মানুষটিকে শ্রোতা ও পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। নট-জীবনের অসম্মানকে সানন্দে বরণ ক'রে নিয়ে গিরিশচন্দ্র কেমন ক'রে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের দিব্যব্যক্তিত্বস্পর্শে ধন্য ক'রে তুলেছিলেন, অটল বিশ্বাসের বলে জীবনের সব অন্ধকারকে জয় ক'রে ভক্ত-হৃদয়ের পুণ্য আলোকে ভগবানের মহিমা উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিলেন—সে কাহিনী যুগে যুগে ব্যথিত পীড়িত মানবাত্মার সান্ত্বনা হ'য়ে থাকবে। গ্রন্থটির যোগ্য সমাদর প্রার্থনা করি।

মা-মণি ঃ শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত। প্রকাশক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, আমিনাবাদ, লখনউ। দাম—১'২৫ ; পৃঃ ৪৮।

সহজ সরল ছড়ার মধ্য দিয়া জীবনী রচনার প্রচেষ্টায় শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের আন্তরিক প্রচেষ্টার আর একটি সুন্দর নিদর্শন এই 'মা-মণি' বইটি। ছোটদের উপযুক্ত ক'রে এই কবি আরো কয়েকটি জীবনী এইভাবে লিখেছেন। কিন্তু মায়ের জীবনের মত বিষয়বস্তু পেয়ে তাঁর রচনাভঙ্গী সুন্দরতর হয়েছে। মায়ের জীবনের সেই সব ঘটনাগুলির উপরই লেখক জোর দিয়েছেন, যে সব ঘটনায় মায়ের মাতৃ-হৃদয়টি সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত। তাই 'মা-মণি' নামটি সার্থক।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট ভালই। শিশুদের মধ্যে এই বইটির প্রচার আশা করি।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর: কেন্দ্রটি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যাত্ম শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা বিস্তার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সমাজ-সেবা কার্য করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে কেন্দ্রটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সুস্পষ্ট।

প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ক্লাস ও প্রতি মাসে দুইটি অতিরিক্ত ক্লাস এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দান করা হয়।

সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' বালকদের জন্য, এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়' বালিকাদের জন্য—তামিল ভাষা শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি-দের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় মিশন-সংশ্লিষ্ট আছে। বার্টলি রোডের উপর বালক বিদ্যা-ভবন (Boys' Home) সুষ্ঠু পরিচালনায় উন্নতি লাভ করিতেছে। ৩০টি ছাত্রকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করা হয়। তাহারা বিদ্যার্থী-আশ্রমে থাকিয়া বিভিন্ন ইংরেজী স্কুলে অথবা শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। দর্জি বিভাগে ছেলেরা নিজেদের জামা তৈয়ারী করে।

মিশনের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৪,২৮০পুস্তক আছে। পাঠাগারে বহু প্রয়োজনীয় পত্র ও পত্রিকা আনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি অনুষ্ঠান পূজা ও উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

গত উৎসবে ৬ই জুন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে বালক বিদার্থী-ভবনে (Boys' Home) একটি ছাত্রাবাসের দ্বার উন্মোচন করেন।

রাঁচি: ১৯৩০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটির ১৯৫৯ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্য বিবরণী আমরা পাইয়াছি। দাতব্য চিকিৎসা-বিভাগে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় দশ হাজার রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ও বাওকেমিক ঔষধ দেওয়া হয়; বিশেষ ক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থাও ছিল। নিকটস্থ ১৪টি আদিবাসী গ্রামে গুঁড়া দুধ বিতরিত হয়, ৬৪ জন দরিদ্রকে কম্বল, জামাকাপড় দেওয়া হয়।

নবনির্মিত গ্রন্থাগারে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রায় ১৪০০ মূল্যবান্ পুস্তক ছিল। সুসজ্জিত পাঠগৃহে ১৫ খানি সংবাদপত্র, ও ৬০ খানি বিভিন্ন প্রকারের পত্রিকা (ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা) রাখা হয়। দৈনিক পাঠকের গড় সংখ্যা ছিল ২৫। মাঝে মাঝে পাঠগৃহে বিশিষ্ট বক্তারা বক্তৃতা দেন, কখন বা শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র দেখানো হয়। মাঝে মাঝে ভক্তিমূলক গানের আসরের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

আশ্রমে দৈনিক পূজা আরাত্রিক ভজন, এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম-কীর্তন হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খৃষ্টের জন্মদিন যথাযথভাবে পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর ১৩টি জনসভা, আশ্রমে ১৭০টি ও বাহিরে ৩৩টি শাস্ত্রালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রমে মন্দির-নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছে; তজ্জন্য সম্পাদক ১৫,০০০ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন।

কানপুর ঃ আশ্রমটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ একটি বৃহৎ কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতা, গবেষণা, শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এই আশ্রমের প্রধান কর্মপন্থা। ১৯৫৯ খৃঃ কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত।

দৈনন্দিন পূজা, উপাসনা, ধ্যান-ধারণা এই আশ্রমস্থ মন্দিরে সম্পন্ন হয়, এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আশ্রম-গৃহে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা হয় এবং ঐ উপলক্ষে ভজন সঙ্গীত, জীবনী আলোচনা, সাধারণ সভা ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ভগবান বুদ্ধ, শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্টের জন্মদিবস পালন করা হয়। দীপালী ও ৺কালীপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

আশ্রম-সংলগ্ন নিজস্ব গৃহে অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে কার্য করিতে থাকে। সাধারণ বিদ্যাদান ভিন্ন শারীরিক ও নৈতিক চরিত্রগঠন এই বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ছাত্রগণের দিনলিপি-লিখন-পদ্ধতির প্রবর্তন ও তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে সুপরিচালিত করা এই বিদ্যাকেন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য। গত বৎসরের শেষে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৮৩ জন। উচ্চ বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের হার ৮৩%।

এই কেন্দ্রের চিকিৎসা-বিভাগে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাখায় ১,১৮,১৫১ জন রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসালাভ করে। ১২৭৭ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত দান ১৯,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটী ছোট এক্স-রে যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। আশ্রম-সংলগ্ন শারীরিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও হরিজন-আখ্ড়ার কার্য সুনিয়মে পরিচালিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

বালিয়াটী (ঢাকা)**:** গত ২০শে হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ভজন, দ্বিতীয় দিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও অপরাহ্ণে নগরকীর্তন হয়। শেষ দিন রবিবার প্রভাতে উষা-কীর্তনের পর হইতে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে (প্রায় ৪,০০০) দরিদ্রনারায়ণ সেবার পর অপরাহ্ণে সভায় বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরিত হইলে সভাপতি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় ভক্তগণ 'কয়েদী' নাটক অভিনয় করেন।

মালদহ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমের বার্ষিক উৎসব নয় দিবস ধরিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন ২১শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী ছায়া-চিত্র ও সঙ্গীত সহযোগে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিনে 'সারদা গীতি-কথা', ৩য় ও ৪র্থ দিনে ছায়াচিত্রে সঙ্গীত সহযোগে রাম-সীতার অপূর্ব জীবন-কথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। ৫ম দিনে স্থানীয় যাত্রাদল নিমাই-সন্ন্যাস অভিনয় করে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 'বর্তমান শিক্ষা ও ধর্ম' বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় শ্রীনন্দলাল দে ভক্তিরত্ন মহাশয়ের রামনাম কীর্তন ৪ দিনই

হইয়াছিল। ২৭, ২৮, ও ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 'মা সারদাদেবী ও আদর্শ নারীচরিত্র', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ' 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব অবদান' বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর ভজন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণ শুরু হয়, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সভায় প্রত্যহ চার পাঁচ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইত। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত উদার, সহিষ্ণু, সহজ, সরল ধর্মমতের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলেন।

যুব-শিবির

জনশিক্ষা মন্দির (বেলুড়) —গত ১লা বৈশাখ হইতে পক্ষকালব্যাপী জনশিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে প্রায় ৫৬জন ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজসেবী লইয়া সারদাপীঠের মাঠে যুব-শিবির পরিচালিত হয়। বিভিন্ন দিনে প্রায় ১৬জন বক্তা সমাজশিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। সমাজসেবীদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই এই যুব-শিবিরে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, সদাচার, প্রার্থনা, কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম, প্রাথমিক সেবা, হাতের কাজ প্রভৃতি ছিল দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত। শিবিরের যুবকেরা স্থানীয় পল্লীর ড্রেন সাফ করে ও পুকুরের পানা তোলে।

এই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় সারদাপীঠের বিবেকানন্দ-উৎসব। যাত্রা, কথকতা, কালীকীর্তন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আলোচনা প্রভৃতি পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল।

শিল্পমন্দিরের উদ্যোগে একটি ছোট শিল্প প্রদর্শনী, এবং ছোটছেলের হাতের কাজ, ছবি ও প্রাচীর-পত্রিকা দেখানো হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউ ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়: [প্রধান বক্তা স্বামী নিখিলানন্দ, সহায়ক স্বামী বুধানন্দ]

জানুআরি : ব্রহ্ম-আত্মা-ওঁ; জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে সৃজনশীল করা; উচ্চতর মন ও তাহার ক্রমবিকাশ; মানুষের বুঝাপড়া ও ঐক্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ; প্রার্থনা—কেন ও কিভাবে?

ফেব্রুআরি : গৃহীর জন্য ধর্মীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা; অন্তরের যে দুইটি ধ্বনি আমাদের কাছে আসে; অবকাশের আধ্যাত্মিক ব্যবহার; ভগবৎ-প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ।

মার্চ : 'আত্মা'-কেন্দ্রিক জীবন; মরমী হিন্দু সাধক শ্রীচৈতন্য; ব্যক্তিগত আত্ম-বিকাশের রহস্য; আত্মশুদ্ধি।

এপ্রিল : পবিত্রতার শক্তি; পুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনে নারীর অনুপ্রেরণা; ক্রুশ-এর অর্থ, পুনরুত্থানের রহস্য; ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত রাণী মীরা।

মে : ব্যক্তিত্বের একীকরণ; হিন্দু ধর্মের উদ্ধারকর্তা শঙ্করাচার্য; আধুনিক যুগে বুদ্ধ-বাণীর মর্মার্থ; সাধুসঙ্গের অবর্ণনীয় উপকারিতা; আত্ম-জিজ্ঞাসার দিব্য ভাব।

এতদ্ভিন্ন প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮॥টায় রাজযোগ ব্যাখ্যা ও ধ্যান, এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮॥টায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা হয়।

যাঁহারা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জানিতে চান অথবা আধ্যাত্মিক সাহায্যলাভে ইচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া স্বামী নিখিলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

খড়্গপুর : গত ২৪শে হইতে ২৯শে জুন বুধবার পর্যন্ত স্থানীয় দুর্গামন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অষ্ট প্রহর নাম-সংকীর্তন, লীলাকীর্তন, কথকতা, বিশেষ পূজা, চণ্ডী ও গীতাপাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ২৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী যুক্তানন্দ, টাকী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ভাষণ দেন। উৎসবের শেষ তিন দিন সান্ধ্যসমাবেশে কলিকাতার বেতারকথক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সঙ্গীতসহ শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদালীলা (ষোড়শী পূজা) কথকতা করেন।

জাতীয় শৃঙ্খলা শিক্ষা

গত বৎসর (১৯৫৯-৬০) সারা ভারতের ৬২২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তিন লক্ষেরও অধিক বালকবালিকা জাতীয় শৃঙ্খলাশিক্ষা-পরিকল্পনার আয়ত্তাধীনে শৃঙ্খলার শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এই সংখ্যা পূর্ব বৎসরের দ্বিগুণ। এজন্য মাথা-পিছু বার্ষিক খরচ পড়িয়াছে পাঁচ টাকারও কম; ভবিষ্যতে খরচ আরও কম পড়িবে। যথাসময়ে উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক গড়িয়া তুলিতে পারিলে ১৯৬১ খৃঃ জানুআরি মাসে ৮ লক্ষ বালকবালিকা এই শিক্ষার আওতায় আসিতে পারিত।

[P.T.I.]

আগামী খাদ্যসঙ্কট

১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও কৃষি-বিশেষজ্ঞ (ডক্টর জে. এন. মুখার্জি, ডঃ এ. টি. সেন, ডঃ বশী সেন, বি. সি. গুহ এবং ডঃ নীলরতন ধর) তাঁহাদের গবেষণালব্ধ বিবরণী পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমীপে দিয়াছেন:

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বাংলা দেশের খাদ্যপরিস্থিতি এখন সঙ্কটজনক। এইভাবে চলিতে থাকিলে ১৯৬৬ খৃঃ খাদ্যাভাবের পরিমাণ হইবে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বা বৈদেশিক আমদানি দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ঘাটতি মিটাইতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন: (১) জলনিকাশ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ (২) কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ (২) রাসায়নিক সার।

কলিকাতা মহানগরী

পৃথিবীর একাদশতম নগরী বৃহত্তর কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম নগরী, ১৯৫১ খৃঃ গণনায় ইহার আয়তন ৩২·৩২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৫·৪৯ লক্ষ। বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৮৮,৯৫৩ বা প্রতি একরে ১৩৯ জন। উদ্বাস্তু-আগমনের পর এই সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে।

কলিকাতা পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও ব্যবসায়-কেন্দ্র। বৃহত্তর কলিকাতার দৈর্ঘ্য গঙ্গার উভয় পার্শ্বে ৪৫ মাইল। এই দীর্ঘতম শিল্পাঞ্চলে পাট, কাপড়, কাগজ ও তামাকের বহু কারখানা আছে; সহস্র সহস্র নরনারী এ সকল স্থানে কাজ করে।

১৯৫৭-৫৮ খৃঃ ফ্যাক্টরি আইন অনুসারে কলিকাতাস্থ রেজেষ্ট্রীকৃত শিল্পসংস্থার সংখ্যা ১,৩৫০; একক অঞ্চলে ইহাই ভারতের সর্বোচ্চ সংখ্যা। বোম্বাইএ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী কিন্তু কলিকাতায় টাকা লেনদেন বেশী।

বাসস্থান: শতকরা ৭·৫ জন স্বতন্ত্র ঘরে বা পুরা একটি বাড়ীতে থাকিতে পান, বাকী লোককে বহু ব্যক্তির সঙ্গে একত্র থাকিতে হয়।

পেশা :		
	ব্যবসাবাণিজ্য	প্রায় ৪০%
	পণ্য উৎপাদন	১৬%
	জন-প্রয়োজনীয় কাজকর্ম	১৪%
	গৃহকর্ম	১২%
	সরকারী ও বেসরকারী চাকরি	১২%
	নির্মাণ কর্ম	২%

[Department of Economics and Statistics—Cal. Univ.]

শ্রবণমঙ্গল

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমাস্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত, ২।৪।১৫—১৭]

জগতে যত কিছু শ্রোতব্য বিষয় আছে তন্মধ্যে ভগবৎকথাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি শত সহস্র বিষয় শ্রবণ করিয়া বৃথাই আয়ুক্ষয় করে, এবং অতর্কিতে মৃত্যুর কবলিত হয়। তাই মৃত্যুর প্রতীক্ষারত শাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুক বলিতেছেন :

যাঁহার নাম-কীর্তনে, যাঁহার স্মরণ দর্শন পূজা বন্দনা ও লীলাশ্রবণে মুহূর্তমধ্যে সকল পাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার যশোগাথা শ্রবণ করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়, তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।

যাঁহার চরণসেবা করিয়া অন্তর্মুখী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার ভোগাভিলাষ, স্থূল সূক্ষ্ম আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যশ্লোককে নমস্কার করি।

কি তপস্বী, কি দাতা, কি যশস্বী, কি মনস্বী, কি মন্ত্রজ্ঞ, কি সদাচারী—কেহই যাঁহাতে কর্ম সমর্পণ না করিয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না, সেই পূতকীর্তিকে বহুবার নমস্কার করি।

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন, তাঁহার স্মরণ বন্দন সেবন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তিসাধন-দ্বারেই মানুষ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া, দেহাত্মভাব হইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তিভূমি

যখন মানুষ চন্দ্রলোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করিতে চলিয়াছে, তখনও আমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে পারিলাম না; পরন্তু অহরহ তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত। একদিকে আন্তর্জাতিকতার বড় বড় বুলি বলিতে ও শুনিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, অন্যদিকে স্বদেশীয় স্বজাতীয়ের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করি; বিজাতি, বিধর্মী—এমনকি বিদেশী মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করি। বিশ্বভ্রাতৃত্বরূপ মহান্ ভাবের 'দিব্যালোকে' সহোদর ভ্রাতাকে—নিজ দেশবাসীকে—প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু মনে করিয়া উৎখাত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। সর্বশেষ, বিজ্ঞানলব্ধ গতির ফলে স্থান-কাল সঙ্কুচিত হওয়ায় এবং আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার-ফলে বিপন্ন মানব স্থায়ী শান্তির জন্য যখন একটি বিশ্ব-রাষ্ট্রসংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে—তখন ধর্ম, ভাষা ও ভূষার সামান্য পার্থক্য লইয়া, অসহিষ্ণু হইয়া আমরা আদিম যুগের পদ্ধতি সহায়ে নিজেদের দেশ জাতি ও সমাজের শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিতে উদ্যত। ভারতে আজ ইহা এক অভাবনীয় শোচনীয় বিস্ময়, ভয়াবহ অভিশাপ !

সত্য, অহিংসা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সকলের সমান অধিকার—প্রভৃতি কথাগুলি আজ যেন আমাদের বিদ্রূপ করিতেছে। প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া, ব্যাপক জীবনে ঐ মহান্ ভাবগুলির যোগ্যতা অর্জন না করিয়া আমরা ঐ কথাগুলির অপব্যবহার করিয়াছি। জাতীয় জীবনে ঐগুলি যত না আচরণ করিয়াছি, ততোধিক প্রচার করিয়াছি। লণ্ডনের একটি দৈনিক পত্রিকা ভারতের ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতা, কলহ ও মারামারি কাটাকাটিকে কটাক্ষ করিয়া কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছিল: 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রভৃতি কথাগুলি ভারতের রপ্তানির মাল (commodity for export) !

সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে সকল দুঃসংবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে, আমরা তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না; সেগুলি অতিরঞ্জিত মনে করিয়া উপেক্ষাও করিব না, 'সব ঠিক হইয়া গিয়াছে'—বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্তও হইব না। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি সত্য হয়, তাহার জন্য আমরা দুঃখিত, লজ্জিত, মর্মাহত। এরূপ ঘটনা যে একটি স্বাধীন দেশে ঘটিতে পারে—তাহা কল্পনাতীত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের কথা আমরা শুনিয়াছি, জার্মানির ইহুদী-বিতাড়নের কাহিনী আমরা পড়িয়াছি, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দৃশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমরা দেখিয়াছি,—এগুলির কোন্‌টির সহিত আজিকার এই নিষ্ঠুরতার তুলনা করিব ?

স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকগণের সর্বাপেক্ষা গর্বের ও গৌরবের সম্পদ সমানাধিকার; তাহারা যখন দেখে একটি শ্রেণীর মানুষের নির্যাতন করিবার অবাধ অধিকার আছে, এবং অপর শ্রেণীর মানুষের আত্মরক্ষা করিবারও উপায় নাই, নিরাপত্তার কোন আশা বা আশ্বাস নাই, তখন স্বভাবতই দেশের নেতাদের সম্বন্ধে ও সংবিধান সম্বন্ধে তাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়।

এ সংশয় দূর করিতে হইলে সবল ও বিশ্বস্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। আজ ভারতে কি

এমন নেতার অভাব হইয়াছে, যিনি সমগ্র ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া ভাবিতে পারেন, সকল ভারতবাসীকে তাঁহার ভাই বলিয়া মনে করিতে পারেন? ভাষা, জাতি, প্রদেশ, ও সাম্প্রদায়িকতা আজ ভারতবাসীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। অধিকাংশ নেতার দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে নিজ নিজ দলীয় স্বার্থের রঙীন চশমায়।

* * *

রোগের বাহ্য লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। রোগ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জানেন বাহ্য লক্ষণ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব হইতে শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়। রোগকে অস্বীকার না করিয়া, চাপা না দিয়া সর্বপ্রথম যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় করিয়া উহা দূর করিবার সকল চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে ভারতের সমাজ-শরীরে যে ব্যাপক বিভেদ-মূলক হিংসামূলক মনোবৃত্তি ও আচরণ দেখা দিয়াছে, অচিরে তাহার প্রতীকার না হইলে ভারতের ঐক্য সমূলে বিনষ্ট হইবে।

ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আচার-পালনকারী মানুষ চিরদিনই আছে; দেশের প্রাকৃতিক গঠনের বৈচিত্র্য, জলবায়ুর বিভিন্নতা, মানুষের আকার-প্রকারের পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষ্টির ও চিন্তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

ভারতীয় ঐক্যের এই সাধারণ ভিত্তিভূমি রাজনীতিকদের চোখে ধরা পড়ে না। সেই একতা খাওয়া-পরা বা কথা-বলার একতা নয়। সে একতা অন্তরের আবেদনে—ধর্মে, যাহা ভাষার ঊর্ধ্বে, পরিচ্ছদের অন্তরালে—এক অতীন্দ্রিয় ভাব-সাধনার মধ্যে নিহিত। ধর্মই ভারতীয় ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি। ধর্মই ভারতীয় মনের মিলন-সূত্র!

কামরূপ হইতে কাশ্মীর, কাশ্মীর হইতে হইতে কন্যাকুমারিকা আমরা যে পরিক্রমা করি, তাহা মন্দির-প্রদক্ষিণ। ইহাকে আমরা দেশ-ভ্রমণ বলি না, বলি তীর্থপর্যটন। আমরা মনে করি আদিজননী সতীর দেহ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পৌরাণিক এই কাহিনী সারাটি দেশকে পবিত্র করিয়া এক অখণ্ডতার আভাস দিতেছে! পূজাকালে প্রতি দিন যে আমরা গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু ও কাবেরীর সান্নিধ্য প্রার্থনা করি, তাহাও কি এই অখণ্ড স্বদেশ-চেতনার সাধনা নয়?

এই ধর্মভিত্তিক স্বদেশ-চেতনা সহস্র বৎসরের পরাধীনতার মধ্যেও, যোজনান্তরী ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও মনের মর্মমূলে ভারতীয় সাধনা ও কৃষ্টির একতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছে। তাই তো দেখিতে পাই, কোন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতে যে সময় লাগিয়াছে, তদপেক্ষা অতি অল্প সময়ে ধর্মের প্রভাব সারা ভারতে সঞ্চারিত হইয়াছে। কেহ কখনও প্রশ্ন করে নাই: বুদ্ধ বা শঙ্কর কোন প্রান্তের লোক; চৈতন্য, কবীর বা মীরাবাঈএর ভাষা কি? এই সর্ব-ভারতীয় ভাবের সাধনা ফল্গুধারার মতো উন-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই ভাবের ঐতিহ্য বহন করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সুপ্ত মহাজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিয়া-ছিলেন, 'ওঠ, জাগো, জগৎ তোমার প্রতীক্ষা-রত'। জগৎকে ভারতের মহান্ আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যখন দিবার সময় আসিয়াছে, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ কতকগুলি ভাবের অজীর্ণতা-সম্ভূত রাজনীতিক বিপর্যয়ে আমরা আত্মকলহে নিজেদের সর্বনাশের সূচনা করিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি স্বামীজীর সেই মহাবাণী, 'সদর্পে বল আমি **ভারতবাসী**! **ভারতবাসী** আমার ভাই।' ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের

এই দুর্দশা। ভারতীয় ঐক্যের মূল যে ধর্ম তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, বৈদেশিক রাজনীতির অক্ষম অনুকরণ করিয়া বিভেদগুলির উপর আমরা জোর দিয়াছি। মনে করিয়াছি, ঐহিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের মতো সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল না হইয়াই আমরা ইওরোপের মতো ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে সক্ষম হইব, আবার আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রও চালাইতে পারিব। আমরা আজ 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ'। জাতীয় ঐতিহ্য ধর্মকে হারাইতেছি, বিজাতীয় রাজনীতিক আদর্শও ধরিতে পারিতেছি না।

নিজেদের শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া, পাশ্চাত্য ভাবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আমরা ঐ দেশের দলভিত্তিক রাজনীতি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের দেশপ্রেমের বা স্বজাতিপ্রেমের অণুমাত্র আমরা শিখিতে পারি নাই।

সত্যকে চাপা না দিয়া যদি অনুসন্ধান করা যায়—ভারতের আজ এখানে, কাল ওখানে ভাষা লইয়া কেন মারমুখী আন্দোলন হইতেছে, তবে দুইটি উত্তর পাওয়া যায়, (১) অজ্ঞতা (২) ক্ষমতালোলুপতা বা স্বার্থপরতা।

স্বাধীনতার দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পরেও দেশব্যাপী বিরাট অজ্ঞতার জন্য সরকারের দায়িত্ব অনস্বীকার্য; ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী দলভিত্তিক রাজনীতি! দ্বিতীয়টির আলোচনা আমরা করিব না, প্রথমটির আলোচনাই করিতেছি; কারণ স্বামীজী বলিতেন, 'শিক্ষার যাদুমন্ত্রেই সর্ববিধ সমস্যার সমাধান হয়, শিক্ষাই সর্বরোগের মহৌষধ।' যদি সৎ শিক্ষার প্রবল স্রোত দেশে প্রবাহিত করিতে পারা যায়, তবে অবাঞ্ছিত বহু বাধা একদিনেই দূরীভূত হইবে। শিক্ষার অভাবেই মানুষ মানুষকে জানিতে পারে না; একটু বিভিন্নতা দেখিলেই ভাই ভাইকে ঘৃণা করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে শিখাইবে, ভালবাসিতে শিখাইবে।

আমরা উপনিষদে পড়িঃ সবই ব্রহ্ম, আমরা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। যদি নিজের মধ্যে ও সকলের মধ্যে এই ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে পারি, তবে আমরা নিজেকে যেমন ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—তেমনই সকলকেই ভালবাসিব ও শ্রদ্ধা করিব। একই ব্রহ্ম বহুভাবে বহুরূপে বিকশিত হইয়াছেন। 'বৈচিত্র্যে একত্ব দর্শন' করিতে বলিয়া স্বামীজী বেদান্তের মহাশিক্ষার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বেদান্তের এই শিক্ষাকে পুঁথির মধ্যে বন্দী করিয়া, বিভেদ দর্শন করিয়াই ভারতের এই দুর্দশা। তাই স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—প্রতিটি গৃহের ছাদ হইতে তারস্বরে বেদান্তের মহাসত্যগুলি ঘোষণা করিতে হইবে। তবেই দূরীভূত হইবে এই অজ্ঞতামূলক সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা; তবেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃত মনুষ্যত্বে।

আজকাল কোথাও ব্যাপকভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে প্রকৃত ব্যাপার চাপা দিয়া বলা হয়, দুর্বৃত্তেরা ইহা করিয়াছে, সমাজবিরোধীরা মাথা তুলিয়াছে। এ কথার কি অর্থ? সমাজবিরোধীরাই কি সমাজের নিয়ামক? দুর্বৃত্তেরা কি সংখ্যায় এত বেশী? জনসাধারণের অধিকাংশই যদি দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে তো আমরা একটি দুর্বৃত্তের জাতিতে পরিণত হইয়াছি। দেশের জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা বর্জন করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করার এই ফল! আর যদি মাত্র একাংশ দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে যাঁহারা এখনও সদ্‌বৃত্ত আছেন, তাঁহাদের সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য—পথভ্রষ্ট ভ্রাতাগণকে সুপথে ফিরাইয়া আনা, রাজনীতিক অধিকারবোধ দ্বারা নয়, ধর্মকে বাদ দিয়া নয়, উদার ধর্মভিত্তিক শিক্ষাদ্বারাই আধুনিক ভারতবাসীর সদ্‌বৃত্তি জাগাইতে হইবে, তাহাকে তাহার স্বধর্মে সুনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দলীয় রাজনীতির শিক্ষা আজ একদল মানুষকে কাপুরুষ করিতেছে, আর একদলকে পরপীড়ক ও পশুধর্মী করিতেছে। উদার ভাবের ধর্মশিক্ষাই উভয়কে মনুষ্যত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে; তখন একজন অন্যায় করিবে না, অন্যজন অন্যায় সহ্য না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতীকার করিবে।

আমাদের মাতৃভূমির প্রাণশক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রত্যেক জাতির একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং তদনুযায়ী তাহাকে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এক একটি জাতি যেন স্বরগ্রামের এক একটি ধ্বনি তুলিয়া জগতে এক মনোরম সঙ্গীত সৃষ্টি করে। ঐ নিজস্ব ধ্বনির মধ্যেই ব্যক্ত হয় প্রত্যেক জাতির প্রাণ। ইহাই ঐ জাতির জীবনের মেরুদণ্ড, বজ্রদৃঢ় বনিয়াদ।

আমাদের এই পুণ্যভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারতবাসীর জীবনসঙ্গীতে ধর্মই মূল স্বর। অপর জাতিরা রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যের প্রভাবে সমৃদ্ধি-লাভের মহিমা প্রচার করিয়া বৈশ্যবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করুক, অথবা রাষ্ট্রের বাহ্য স্বাধীনতার গৌরব কীর্তন করুক, ভারতের জনগণ কিন্তু এইসব বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহেও না।

ভারতে সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে প্রথমেই দেখাইতে হইবে, প্রস্তাবিত নূতন সামাজিক প্রথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কতটা উৎকর্ষ আনিতে পারে। আবার রাজনীতি প্রচার করিতে হইলে গোড়াতেই বুঝাইয়া দিতে হইবে, রাজনীতি ভারতবাসীর একান্ত কাম্য আত্মিক শক্তির বিকাশে কতটা সাহায্য করিতে পারে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়, প্রত্যেক জাতিকেও তাহাই করিতে হয়। শত শত যুগ পূর্বে ভারত এইরূপ একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইয়াছে, এবং উহাই সে আঁকড়াইয়া থাকিবে। যাহাই বল না কেন, এই লক্ষ্য নির্বাচনে ভারত ভুল কিছু করে নাই। জড়ের চিন্তা অপেক্ষা চেতনের ভাবনা, মানুষের চিন্তা অপেক্ষা ভগবানের অনুধ্যান —এমন কিছু হেয় আদর্শ নয়।

পরিণাম শুভই হউক বা অশুভই হউক, আমাদের জীবনীশক্তি নিহিত আমাদের ধর্মে। উহা আর বদলানো যায় না। উহাকে বিনাশ করিয়া উহার পরিবর্তে অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্ধিষ্ণু কোন বড় গাছ এক জমি হইতে তুলিয়া স্থানান্তরিত করিলে উহাকে সহজে বাঁচানো যায় না।

এই (ধর্মের) আদর্শ আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা শিরায় শিরায় প্রতি শোণিত-বিন্দুতে স্পন্দিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই আদর্শ আমাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া আমাদের মূল জীবনীশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য ধর্মের আদর্শ আমরা কিছুতেই বর্জন করিতে পারি না, ইহা করিতে গেলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ন্যূনতম বাধার পথ দিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধর্মের পথই ভারতে স্বল্পতম বাধার পথ। উহাই ভারতবাসীর জীবনের পথ, অগ্রগতির পথ, কল্যাণের পথ।

যুগ যুগ ধরিয়া জাতীয় জীবন যে লক্ষ্যের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই, যদি তোমরা ধর্মের পরিবর্তে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কোন কিছুকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র করিয়া বস, তাহা হইলে তোমাদের পৃথিবী হইতে লোপ পাইতে হইবে। ধর্মের পথ বর্জন করিলে তোমাদের মৃত্যু অপরিহার্য। ...ধর্ম, কেবল ধর্মই ভারতের প্রাণ, উহা যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে রাজনৈতিক প্রগতি বা সমাজ-সংস্কার সত্ত্বেও—এমনকি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য ঢালিয়া দিলেও ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, এ কথা আমি বলি না; শুধু তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—এ দেশে ঐ সব লক্ষ্য গৌণ, ধর্মই মুখ্য। [সংকলিত]

চলার পথে

'যাত্রী'

সকালের সূর্য প্রতিদিনের মতো আজও সেখানে উঠেছে। বিস্তারিত প্রান্তরের ধূধূ-করা বুকে আলোর দান অন্যদিনের মতো আজও সব কিছুকেই চোখের সুমুখে তুলেছে জাগিয়ে। সূর্য-স্নাত এই মহাক্ষেত্র অন্যদিন থাকে নির্জন। কচিৎ কোন চাষী হয়তো চাষের আয়োজনে লাঙ্গল আর বলদ নিয়ে ঐ দিগন্তবিসারী প্রান্তরের সুবিস্তৃত বুকে তাদের ছোট্ট ছায়ার আলপনা এঁকে এঁকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আজ এ সবের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়েছে। এই ব্যতিক্রম-প্রসঙ্গেই এই গৌরচন্দ্রিকা।

সরস্বতী আর দৃষদ্বতী—দুটি নদী। কালের স্রোতে তারা এখন অন্য দিগন্তে চলে গেছে। প্রাচীন এই দুই নদীর সঙ্গে ভারতের বহু ইতিহাস জড়িয়ে আছে। হয়তো ভবিষ্যতেও জড়িয়ে থাকবে। শুধু ঐ নদীদ্বয় নয়, তাদের জলধারা-ঘেরা এই সুপ্রাচীন 'সমন্ত-পঞ্চক'-প্রান্তর ভারতের মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, ইতিকথার সুগভীর শিকড়ে জড়িয়ে গিয়েছে,—জড়িয়ে গিয়েছে ঐ সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ গীতাটিও। কথাটাকে তাহলে আর একটু বিশদ ক'রে বলি।

আজ যে জলে মেঘের রূপালি ছবি ভেসে চলে, একদিন সেই হ্রদের জলই ছিল শোণিতময়। পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে সেই রক্তে এই প্রান্তরেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ তৈরি করেছিলেন। একজনের পক্ষে এতগুলি লোককে মারা এবং পঞ্চ-শোণিতহ্রদ সৃষ্টি করা অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে পারে—মনে হ'তে পারে এই আখ্যানের পেছনে হয়তো কোন 'রূপক' লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে সব চিন্তা আজকের নয়। আজ মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে গেলে দেখব—ক্ষত্রিয়-ধ্বংসের পাপরাশি থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে পরশুরাম সেই রুধিরেই পিতৃতর্পণ করছেন। তর্পণে সন্তুষ্ট হ'য়ে 'ঋচীক' প্রভৃতি পিতৃগণ পরশুরামকে তাঁর প্রার্থনামত বর দিলেন: পাপরাশি থেকে পরশুরামের হবে মুক্তি; আর এই স্থান মহাতীর্থ ব'লে পরিগণিত হবে।

মহাভারতের বনপর্বের পাতা খুলে দেখি, সেখানেও রয়েছে এই মহাক্ষেত্রের কথা। মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলছেন, এই মহাতীর্থ দর্শনমাত্র সর্বপ্রকার প্রাণীই পাপ-মুক্ত হয়; যারা এই মহাতীর্থে বাস করতে পারে না, কিন্তু সদা বাস করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদেরও পাপ থাকে না; এক্ষেত্রের ধূলিও দুষ্কৃতকর্মাকে পরম পদ প্রদান করতে পারে।

মহাভারতের শল্যপর্বেও এক্ষেত্রের আখ্যান পাওয়া যায়। সেখানে আছে: রাজশ্রেষ্ঠ কুরুরাজ স্বয়ং এই জমি কর্ষণ করছেন—দেবরাজ ইন্দ্রের নানা উপহাস উপেক্ষা করেও। কুরুরাজ জানেন, কেন তিনি এই জমি কর্ষণ করছেন; তিনি জানেন, ভবিষ্যতে এখানেই ফলবে গীতারূপ শ্রেষ্ঠ ফসল, আর ঘটবে ভীষণ এক যুদ্ধ। তাঁর উদ্যম দেখে দেবরাজ শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েই বর দিলেন, যারা আলস্যশূন্য হ'য়ে অনাহারে এই স্থানে প্রাণত্যাগ করবে এবং যারা যুদ্ধে বাণপথবর্তী হ'য়ে নিহত হবে, তারা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে এবং আর কোন স্থান এর চেয়ে পবিত্র হবে না।

মনুসংহিতাতেও রয়েছে এই প্রান্তরের কথা। মনু একেই 'ব্রহ্মাবর্ত' ব'লে নির্দেশ করেছেন। দেবতাদের যজ্ঞভূমি এই ব্রহ্মাবর্ত বা কুরুক্ষেত্র। শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে—'কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনং।'

জাবাল উপনিষদেও এর কথা রয়েছে। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, গীতা শোনালেন সে ভূমি যে পবিত্রতম হবে, পুণ্যপ্রদ হবে—এতে আর সন্দেহ কি? পরবর্তী কালেও ভারতের বহুযুদ্ধ এই প্রান্তরের উপর সংঘটিত হয়েই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথাই বলছি। কুরুক্ষেত্রে—যুদ্ধারম্ভের পূর্বে—আজও সেখানে সূর্য উঠেছে।

আজ কিন্তু এই বিস্তৃত প্রান্তর জনহীন নয়। আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য এখানে আজ ভাগ্যের দোলায় দুলছে। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক নিয়ে যার সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ! এই দুর্জয় সমর বন্ধ করবার জন্য বিদুর দুর্যোধনের কাছে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। তাও তিনি দেননি। উত্তরে দুর্যোধন বলেছিলেন, 'তিলার্ধং যবষড়ভাগং সূচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী। বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।' (বিনাযুদ্ধে আমি তিলার্দ্ধ, একটি যবের ছয় ভাগের একভাগ, কিংবা সূচের আগায় যতটা মাটি ধরে, ততটা জমিও দেব না, সত্যি সত্যি ক'রে বলছি)। এই প্রতিজ্ঞা পরিণত হয়েছিল এক মহাক্রন্দনের বিধ্বংসী ভয়াবহতায়। মনে হয় সে ক্রন্দন আজও থামেনি। আজও সেখানে রোদন-বিগলিত ব্যথা ঝরে পড়ছে। যুদ্ধশেষে ঐ বিরাট সৈন্য-সংখ্যার মধ্যে কৌরবপক্ষে তিনজন এবং পাণ্ডবপক্ষে দশজন—এই তেরজন মাত্র জীবিত ছিলেন। ধ্বংসলীলার শতকরা হিসাব করলে বর্তমান পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এর তুলনায় নগণ্য বলেই মনে হবে!

এই মহাধ্বংসযজ্ঞের পূর্বাহ্ণে অর্জুনের কপিধ্বজ রথ এসে দাঁড়াল দুই সৈন্যদলের মাঝে। অর্জুন দেখে নিতে চান, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণও আছেন সেই রথে—রথী হিসাবে নয়, সারথি হিসাবে। আত্মীয় স্বজনদের দেখে অর্জুনের হঠাৎ মোহ উপস্থিত হ'ল। রক্তে যার রোদ্দুরের গান সেই মহাধনুর্ধর আজ আর যুদ্ধ করবেন না, ব'লে বসলেন। এই হচ্ছেন সেই অর্জুন যিনি নিজের শৌর্য-বীর্য প্রভাবে স্বয়ং উমাপতি শঙ্করকেও করেছিলেন বিমুগ্ধ; এই সেই অর্জুন যিনি আত্মশক্তি-বলে স্বর্গালয়ে গমন ক'রে দেবতাগণেরও প্রীতিভাজন হয়েছিলেন এবং রণ-পাণ্ডিত্য দেখিয়ে দিব্যাস্ত্র লাভ করেছিলেন; এই সেই অর্জুন যিনি অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তরের গোধন-হরণের কালে একাই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের হতবল করেছিলেন; এই সেই অর্জুন যাঁর (পার্থ, কৌন্তেয়) নামেই তাঁর মায়ের নাম হ'য়ে উঠত উজ্জ্বল। কিন্তু মোহের জালে এই রকম মহাপ্রাণেরও মনে কি ক'রে যে জট বেধে যায়, তা কে জানে? আজ তিনি যুদ্ধ করতে চান না।

কিন্তু মোহগ্রস্ত হ'লে কি হবে? চেতনার মহা উৎস শ্রীকৃষ্ণরূপ আনন্দ-সত্তা যে আজ অর্জুনের পাশে। গীতার জাগরণী বাণী শুনিয়ে অর্জুনকে করলেন তিনি উদ্বুদ্ধ। অপনীত-মোহ অর্জুনও তখন জানালেন, 'করিষ্যে বচনং তব' (তোমার কথামতই কাজ করব)। শ্রীকৃষ্ণের বহুকীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই গীতা। এ গীতা তাঁর হৃদয়—'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ'। সেই পূর্ণাবতারের—গীতাকারের আবির্ভাব-দিন জন্মাষ্টমীর কথা স্মরণ করেই আজ এত কথা বললাম।

চল পথিক, জন্মাষ্টমীর এই পুণ্যদিনে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে মনের যাদুকরী মোহ মায়া দূর করি। চল চল, আজ তাঁকে আহ্বান জানাই আমাদের প্রাণ-বেদিকায়। তিনি এলে আমাদের মন-পঙ্কে ফুটে উঠবে পঙ্কজ। আর তার সৌরভে আমাদেরও পূত মনে প্রতিজ্ঞা জাগবে—'করিষ্যে বচনং তব'। চল চল, আর দেরি নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

কৃষ্ণাষ্টমী

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল

তারকা-স্তিমিত আঁধার রাত্রি
প্লাবন বহিয়া যায়,
ধরণীর বুকে নাহি কলরোল
বিশ্ব লুপ্তপ্রায়।

আকাশ ভেদিয়া আঁধার ফুঁড়িয়া
উঠিল আলোর রেখা,
মুগ্ধ নয়নে হেরিনু গগনে
'মাভৈঃ' বার্তা লেখা।

নাহি কোন ভুল, এসেছ যে তুমি
প্রেমময় পারাবার!
তোমার পরশ করিল সরস
প্রস্তর-কারাগার।

নিখিল বিশ্বে করিলে প্রচার—
ধর্মের হবে জয়,
নূতন পৃথিবী করিলে সৃজন
নাশি পাপ তাপ ভয়।

কুরু কংসের ধ্বংসের গাথা
নহে সব পরিচয়,
তব বিভূতির কত গুণগান
তাও নাহি মনে লয়।

মোর কাছে তুমি রাখাল বালক
মোহনমুরলীধারী,
বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন তুমি
যমুনা-পুলিনচারী।

ধর্ম তোমার সুমহান্ প্রভু
তারও বড় তব বাঁশী,
নিখিলের হিয়া ভুলায়েছ তুমি
প্রিয়তম-রূপে আসি।

আজও বাজে তব আহ্বান-সুর
আজও ওঠে সেই তান,
লুব্ধ পরান শুনিতে চাহে তা,
দাও মোরে সেই কান।

শ্রীশ্রীরাধাস্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীণ-বিরচিতা

বঙ্গানুবাদ : ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

নতোঽস্মি রাধে দুরিতবাধে নিখিলনিকেতানন্দে।
মহাভাবখনি মঞ্জুলহাসিনি সেবিতহৃন্মকরন্দে ॥১

বৃন্দাবনগত-নন্দসুতাদৃত-লম্ভিতমাদনভাবে।
বরনৃপতনুজে কতধৃতমনুজে দুরিতহুঙ্কৃতদাবে ॥২

নির্জিতাজিতে নিখিলপূজিতে চূর্ণিতমন্মথদর্পে।
প্রেমবংশবদ-যমুনার্চিতপদ-ঘাতিতদানবসর্পে ॥৩

অয়ি বরমানিনি কৃষ্ণশিখামণি-ভাস্বরচরণদ্বন্দ্বে।
তব পদকমলে নতভক্তদলে স্থাপয় বিশ্ববিবন্দ্যে ॥৪

নমো নামা রাধা অপগতবাধা নিখিলানন্দকারিণী।
মহাভাবখনি মোহনহাসিনি মনোমধুপ্রদায়িনী ॥১

বৃন্দাবনধনী কৃষ্ণবিমোহিনী হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিণী।
নৃপতিনন্দিনী মানবপাবনী পাপতাপনিবারিণী ॥২

মাধবজয়িনী ভুবনাদরিণী কন্দর্পদর্পনাশিনী।
প্রেমবিলাসিনী যমুনাতারিণী দানবসর্পঘাতিনী ॥৩

কঠোরমানিনী কৃষ্ণশিরোমণি-প্রোজ্জ্বলপদধারিণী।
শরণদায়িনী পূজকপালিনী বিশ্ব-স্তবনোল্লাসিনী॥৪

জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

শিক্ষার চিরন্তন আদর্শ ও যুগোপযোগী আদর্শ,—দূর লক্ষ্য ও নিকট লক্ষ্য

স্বামী বিবেকানন্দ একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যে আমাদের ব'লে গিয়েছেন : শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'মানুষ' তৈরি করা। 'মনুষ্যত্ব' অতি ব্যাপক জিনিস। আমাদের ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সবচেয়ে উঁচু দরের মনুষ্যত্ব শুধু ব্রহ্মজ্ঞ, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। অত উঁচু জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ না ক'রে সাধারণভাবে একথা বলতে পারা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করা ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের দিকে এগিয়ে দেওয়া। জীবনসংগ্রামে পরাঙ্মুখতা কিংবা পরাজয় মনুষ্যত্বহীনতারই পরিচায়ক। যে সমস্ত চারিত্রিক দোষত্রুটির জন্য আজ আমরা জীবনসংগ্রামে পরাঙ্মুখ কিংবা পর্যুদস্ত,—শিক্ষার নিকট-উদ্দেশ্য হবে সর্বাগ্রে সেগুলি দূরীভূত করা। আলস্য, জড়তা, শ্রমবিমুখতা, আরামপ্রিয়তা, নিয়মবিরোধিতা, বাগাড়ম্বর—এ সবই হচ্ছে বর্তমানে আমাদের—বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের—প্রধান চারিত্রিক ত্রুটি। শিক্ষাপ্রণালীর আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত এগুলির দূরীকরণ, এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন। এ জন্য পুঁথিগত ও পোশাকী শিক্ষার পরিবর্তে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তির জন্য শিক্ষানবীশীর (Apprenticeship System) পুনঃপ্রবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। 'পুনঃপ্রবর্তন' কথাটা ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করা হ'ল, যেহেতু এই শিক্ষানবীশীই ছিল এ দেশের সনাতন প্রথা। বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় এবং কালের ও রুচির পরিবর্তনে দেশের অনেক শিল্প ও তার আনুষঙ্গিক বৃত্তি ইংরেজ আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৃত্তিনাশের ফলে পুরাতন বৃত্তির জন্য শিক্ষানবীশী আপন হতেই বিলুপ্ত।

বর্তমানে সর্বাধিক প্রয়োজন—বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তির জন্য শিক্ষানবীশী

এখন নূতন নূতন বৃত্তির জন্য নূতনভাবে শিক্ষানবীশী চালু করতে না পারলে বাঁচবার উপায় নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে এই শিক্ষানবীশীর সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত না করলে আমাদের দুর্দশা ঘুচবে না। বর্তমান অবস্থায় স্কুলে ভরতি হলেই ছেলেমেয়েদের কাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস চলে যায়; কোন কাজেই তাদের মন বসে না। 'কী কাজ করতে চাও? কী হ'তে চাও? কোন্ কাজ তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?'—এরূপ প্রশ্নের সোজা ও স্পষ্ট জবাব খুব কম ছেলেমেয়েদের নিকটেই পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ এই যে, বাড়ীতে কিংবা স্কুলে কোন হাতের কাজ নিয়মিত ভাবে না করাতে কাজের আনন্দ এরা জীবনে উপভোগ করে না; এবং কাজ ক'রে নিজে খেতে হবে এবং অপরকে খাওয়াতে হবে, এই দায়িত্ববোধ তাদের মনে জাগবার ও বাসা বাঁধবার সুযোগ পায় না।

ইংলণ্ড, জার্মানি ও স্কেণ্ডেনেভীয় দেশগুলিতে প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী ব্যবস্থা প্রচলিত। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেই ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ বৃত্তি বাছাই ক'রে 'শিক্ষানবীশ' হ'য়ে সেই

বৃত্তিতে ঢুকে পড়ে, পিতামাতার বৃত্তিভোগী হ'য়ে স্কুল কলেজে গিয়ে ভিড় জমায় না। ফ্রান্সের ব্যবস্থা কিছুকাল পূর্বেও ছিল অনেকটা আমাদের মতো। ওখানে পুঁথিগত বিদ্যার কদর বেশী। এর ফলাফল সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনী'তে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক লা বোঁর (Le Bon) মত উদ্ধৃত করেছেন। পড়লে মনে হয় ঠিক যেন আমাদের অবস্থারই বর্ণনা। এই বহুমূল্য শিক্ষাপ্রদ অভিমতটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত ; পুঁথিপড়া বিদ্যার অপকৃষ্টতা ও অপকারিতা

"[ফরাসী] শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রধান দোষ এই যে, মনস্তত্ত্বের একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। ধারণাটি হচ্ছে এই যে, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করলেই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। এই ধারণার বশে পাঠ্যতালিকা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ ও ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। পাঠশালা থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দরজা পেরোনো পর্যন্ত একটি যুবক শুধু গাদা গাদা বই মুখস্থ ক'রে যায় ; তার নিজের বিচারবুদ্ধি কিংবা উদ্ভাবনী শক্তি খাটাবার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং কোন সুযোগও ঘটে না। তার পক্ষে শিক্ষা মানে শুধু মুখস্থ করা এবং মাষ্টারমশায়দের নির্দেশ পালন করা। এই যে শিক্ষা, এটা যদি অকেজো-মাত্র হ'ত, তবে ছাত্রদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকতে পারতাম। * * * কিন্তু বস্তুতঃ এটা হচ্ছে সমূহ দুর্গতির কারণ। যারা এই শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়ে যায়, তাদের মনের এক দারুণ পরিবর্তন ঘটে। যে সামান্য অবস্থার মধ্যে হয়তো তারা জন্মেছিল, তার প্রতি তাদের এক গভীর বিতৃষ্ণার ভাব উপস্থিত হয়, —ঐ অবস্থায় তারা আর কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না। মজুরের ছেলে আর মজুর হ'তে চায় না, কৃষকের ছেলে আর কৃষক হ'তে চায় না ; আর যারা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, তারা তো সরকারী চাকরি ব্যতীত আর কোন কিছুর কথা ভাবতেই পারে না। ফ্রান্সের স্কুলগুলি মানুষকে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে না। ওখান থেকে যারা বেরোয়, তারা সকলেই চায় সরকারী চাকরি,—অর্থাৎ যেখানে নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে, শুধু অপরের নির্দেশমত চ'লে, নিজের দায়িত্বজ্ঞান ও উদ্ভাবনীশক্তি একটুও না খাটিয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটানো ও রোজগার করা যায়। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারা সমাজের সব নীচের ধাপের লোক তাদের মনে দারুণ অসন্তোষ, তারা বিপ্লবের জন্য সদাই প্রস্তুত। আর সমাজের উপরের স্তরে তৈরী হয়েছে এক হাল্‌কা মনোবৃত্তির 'ভদ্রশ্রেণী'—যারা শ্রদ্ধাহীন ও নিষ্ঠাশূন্য ; 'গবর্ণমেন্ট'ই তাদের নিকট একমাত্র কর্মদাতা, সিদ্ধিদাতা 'বিধাতা', অথচ গবর্ণমেন্টকেই তারা সময়ে অসময়ে সমালোচনা করতে কসুর করে না এবং যা কিছু অভাব-অনটন, তার জন্যে গবর্ণমেন্টকেই তারা সম্পূর্ণ দায়ী বলে বরাবর অভিযুক্ত করে। পাঠ্যতালিকার সাহায্যে গবর্ণমেন্ট দলে দলে ডিপ্লোমাধারী তৈরি করছে বটে ; কিন্তু চাকরিতে স্থান পাচ্ছে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। বাকি সবাই শুধু বেকারের দল পুষ্ট করছে।"

* * *

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ফ্রান্সের সম্পর্কে এই যে সকল মন্তব্য করা হয়েছিল, আমাদের বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে তা হুবহু প্রযোজ্য। নানা দোষত্রুটিতে পূর্ণ এবং বাস্তব প্রয়োজনের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধরহিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে অর্থ, সামর্থ্য এবং সময়ের কত যে অপচয় হচ্ছে, তা ব'লে শেষ করা যায়

না। জীবন ও জীবিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা 'মানুষ-তৈরি'র বিশেষ কিছুই সাহায্য হচ্ছে না। শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হৃদয়ের শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি প্রকৃত দায়িত্ববোধ ও গভীর ভালবাসা জন্মে না—তাকে কিছুতেই হৃদয়ের শিক্ষা বলা যায় না, এবং তা দ্বারা কখনও প্রকৃত মানুষ তৈরী হ'তে পারে না।

আমেরিকা, আয়র্লণ্ড ও ইস্রাইলের দৃষ্টান্ত

জীবিকার্জনের এবং সুষ্ঠু ভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপনের শিক্ষাই বর্তমানে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী শিক্ষা। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক প্রমাণ আধুনিক ইতিহাসে দু-তিনটি সমাজের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পেতে পারি। আমেরিকায় যখন নিগ্রোদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন বিশেষভাবে এই সমস্যা দেখা দেয় যে—কি ক'রে তাদের চরিত্রবান্ ও স্বাবলম্বী করা যায়। 'হ্যাম্পটন কোর্ট' নামক স্থানে পুণ্যাত্মা জেনারেল আর্মষ্ট্রং তাদের জন্য যে বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জীবিকানির্বাহের শিক্ষা' (Education for Life)। আর্মষ্ট্রং প্রথমেই উপলব্ধি করেন যে 'ভদ্রসমাজে প্রচলিত শৌখীন কিংবা পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা নিগ্রোদের উদ্ধারসাধন হবে না। কেমন ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে দৈনিক জীবন যাপন করতে হয়, জীবিকার্জন করতে হয়, বাধাবিঘ্ন ও আপদ্‌বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়, নিজের জাতিকে ভালবাসতে হয়, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—তেমন শিক্ষাই হবে দীর্ঘকালের দাসত্ব-জর্জরিত নিগ্রোজাতির প্রকৃত শিক্ষা। সহস্র সহস্র নিগ্রো যুবক আর্মষ্ট্রংএর বিদ্যালয়েই মানুষ হয়েছিল এবং তাদেরই মধ্যে একজন (স্বনামধন্য বুকার টি. ওয়াশিংটন) পরে 'টাস্কেগী' স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় আয়র্লণ্ডে,—স্যার হোরেস্ প্লাঙ্কেট ও জর্জ রাসেল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের গঠনমূলক কাজে। জীবিকার্জনের চেষ্টার এবং তারই ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্ব-বিকাশের উপরেই তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত আজকের দিনের ইস্রাইল। ওখানেও জীবিকার্জনের ব্যবস্থাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জীবিকার্জনের জন্য হাতে কাজ করছে। স্কুল-কলেজ প্রভৃতি হচ্ছে জীবিকার্জনের ও জীবনগঠনের সহায়ক। নিছক বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানলাভের দিক্ থেকেও এই শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে যারা পাস ক'রে বেরোয়, তাদের মধ্যে ক-জন জীবনব্যাপী লেখাপড়ার চর্চা বজায় রাখে? বরঞ্চ অধিকাংশ ছাত্রের মনেই লেখাপড়া সম্পর্কে এমন একটা ভীতি, বিতৃষ্ণা এবং অবজ্ঞার ভাব জন্মে যে, পরীক্ষা পাসের পর বড় জোর উপন্যাস এবং সংবাদপত্র ব্যতীত আর কিছু কেউ পড়ে না। বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া একটু ধীর গতিতে শিখলে বরঞ্চ পাঠের অভ্যাস সারা জীবন বজায় থাকার সম্ভাবনা; আর এরূপ বজায় থাকাতেই লেখাপড়া শেখার আসল সার্থকতা।

নানাবিধ কায়েমি স্বার্থ

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী শ্রেণীবিশেষের জন্য পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল। 'ভদ্র'-শ্রেণীর ছেলেরা, যারা সরকারী চাকরিতে এবং ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট বৃত্তিতে যাবে, তাদের জন্যই এই শিক্ষা। তাও আবার ইংরেজী ভাষা যতদিন শাসনকার্য পরিচালনে ব্যবহৃত হ'তে থাকবে—ততদিনই এর বিশেষ কদর। 'ভদ্র'শ্রেণীতে প্রবেশলাভের উদ্দেশ্যে

'মহত্তে'র অনুকরণে অন্যেরাও এই শিক্ষার প্রতি ঝুঁকেছে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রচলিত ধরনে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা ছাপ-মারা ব্যক্তিদের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই প্রয়োজন না থাকলেও—এমন কি, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' জেনেও সরকারী চাকরির সংখ্যা দিন দিন বাড়াতে হচ্ছে; নইলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। একজন চাকরি পেলে আরও অন্ততঃ ৫০ জন আশায় আশায় থাকে। কিন্তু তবুও কিছুতেই কূল পাওয়া যাচ্ছে না। পাস করাবার কারখানার সংখ্যা, পাসের সংখ্যা এবং তার ফলে তথাকথিত 'শিক্ষিতে'র সংখ্যা, 'শিক্ষিত অকর্মণ্য' ও 'শিক্ষিত বেকারের' সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। নানা ধরনের কায়েমি স্বার্থ এই ব্যাপারে জড়িত আছে; তার বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুঃসহ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং বাধ্যতামূলকভাবে অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষানবীশীর প্রবর্তন। ঘোর তমোগুণে নিমজ্জিত জাতিকে কর্মঠ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করবার এই এখন প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে মনে হয়। কত বয়সে বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী শুরু হবে, তা দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, জাতীয় চরিত্র, প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের জলবায়ু ও অধিবাসীদের স্বভাবনিহিত আলস্যপরায়ণতার কথা মনে রাখলে স্বীকার করতেই হবে যে—বৃত্তিশিক্ষা এদেশে অল্পবয়সেই আরম্ভ হওয়া উচিত। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়েছে যে হাইস্কুল দূরের কথা, পাঠশালা ডিঙোলেই কোন ছেলে সাধারণতঃ আর হাতের কাজ করতে চায় না। ঘরের ভিতরে (হয়তো ইলেকট্রিক পাখার নীচে) দিনের মধ্যে ৫।৬ ঘণ্টা কাটানোতে একবার অভ্যস্ত হ'লে পর আর কেউ রোদবৃষ্টিতে বাইরের কাজে যেতে চাইবে না। এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়; সুতরাং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃত্তিশিক্ষা যথাসম্ভব অল্পবয়সেই আরম্ভ হয়, যাতে ছেলেমেয়েরা শ্রমশীলতায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে। আর লেখাপড়ার চর্চাকে বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায় এবং যারা মেধাবী তারা ক্রমশঃ উপরের দিকে যাবার সুযোগ পায়। এরূপ ব্যবস্থা করা মোটেই অসম্ভব বা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপারও নয়।*

পোশাকী শিক্ষা জাতিকে মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে

জাতিকে পরিশ্রমী, কর্মকুশল ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন না করতে পারলে আমাদের পক্ষে টিকে থাকাই অসম্ভব। এক হিসাবে বলতে গেলে—যে ইংরেজী শিক্ষা সর্বাগ্রে ও সোৎসাহে গ্রহণের ফলে বাঙালী হিন্দুরা বিগত একশত বৎসর কাল কয়েকটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য ও বাহাদুরি দেখাতে পেরেছে, সেই শিক্ষার প্রসারই আজ আমাদের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। যারা আমাদের তুলনায় অশিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত তাদের নিকট—বিহারী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, চীনা প্রভৃতি এবং বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী ও কারিগরদের নিকট—আমরা জীবনসংগ্রামে প্রতিপদেই পরাজিত হচ্ছি। লেখাপড়ার ফল যদি এই হয়, তবে এমন লেখাপড়া বন্ধ করাই উচিত।

* কিন্তু অসাধ্য অথবা দুঃসাধ্য না হলেও অদূর ভবিষ্যতে যে শিক্ষাব্যবস্থার এরূপ সংস্কার সাধিত হবে, এরূপ আশা আপাততঃ দুরাশা মাত্র, শুধু সরকারের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যাঁরা দেশের ও সমাজের প্রকৃত হিতকামী তাঁদেরও এই জীবন-মরণ সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে হবে, প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে।

আজকাল রব উঠেছে, পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে 'Practical Bias' ও 'Rural Bias' ঢুকাও, স্কুলে দু-একটা শৌখীন হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা রাখ, একটা ক'রে Hobby Centre খোল, তাহলেই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি দূর হ'য়ে যাবে, স্কুল-কলেজ থেকে 'কাজের মানুষ' বেরুবে। এগুলি ভাল জিনিস হ'তে পারে; কিন্তু এ সমস্তই হ'ল শৌখীন ব্যাপার। এগুলো ঠিকমত করলে একটু হাত-পা চালনা হ'তে পারে এবং শখ মিটতে পারে; কিন্তু বৃত্তিনির্বাচনের ব্যাপার মুলতুবীই থেকে যায়। পক্ষান্তরে কেউ শিক্ষানবীশ হয়েছে বললে বুঝতে হবে যে তার বৃত্তি নির্বাচন হয়েই গিয়েছে। শিক্ষানবীশী মোটেই শৌখীন ব্যাপার নয়। শিক্ষানবীশকে দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হয়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ প্রত্যহ ক'রে দিতে হয়। জীবনসংগ্রামে কি ক'রে সাফল্য লাভ করা যায়, তার শিক্ষা ওখানেই হাতে কলমে আরম্ভ হ'য়ে যায়।

বৃত্তিশিক্ষার প্রবর্তন যদি করা হয়, তবে তা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নতুবা শুধু ব্যবস্থায় কোনই ফল হবে না। নিয়ম করা উচিত হবে যে—মেধাবী ছেলেমেয়ে ব্যতীত কেউ উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য স্কুল-কলেজে ভরতি হ'তে পারবে না। স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলিকে সত্যিকারের বিদ্যাপরীক্ষায় পরিণত করতে হবে; নতুবা বর্তমানের গড্ডালিকা স্রোত কিছুতেই থামানো যাবে না। একে তো পাসের ও ডিগ্রির মোহ সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে; তার উপর অনেক কিছু কায়েমি স্বার্থ এই ভুয়া শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কঠোরভাবে এগুলির বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে ঈপ্সিত পরিবর্তন অসম্ভব।

কালের প্রভাবে ও শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিতে আমাদের জীবনের ভিত্তিই আজ টলায়মান। তাই জীবিকা ও শিক্ষার পারস্পরিক কথা একটুখানি আলোচনা করা হ'ল। বলা বাহুল্য এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যে এই বিরাট্ বিষয়ের বিশদ আলোচনা অসম্ভব। গোড়াতেই বলা হয়েছে যে জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থান ব্যতিরেকে মানব-সমাজের পক্ষে উন্নত জীবন সম্ভব নয়। উচ্চতর জীবনের সঙ্গে জীবিকার্জনের এবং দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মের কোন বিরোধ আছে—এ কথা মনে করা ভুল। ভারতবাসীরূপে যে মহৎ চিন্তাধারা এবং যে মহান্ সত্যসমূহ আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছি, তার মর্মকথা এই যে যদি জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে এবং জীবনকে সর্বদা সেই লক্ষ্যের অভিমুখীন রাখা যায়, তবে তুচ্ছতম দৈনিক কাজকর্মও বিরাটের পূজাতে পরিণত হয়, এবং হৃদয়ে পরা শান্তি ও আনন্দ উৎপাদন করে।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

'কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হ'ল? যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।'

[স্বামি-শিষ্য সংবাদ—পূর্বকাণ্ড, ১৭৮ পৃঃ]

বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চভাব

স্বামী জীবানন্দ

কাউকে গভীরভাবে ভালবাসলে তার সঙ্গে আমাদের কোন না কোন একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সমস্ত ভালবাসার আধার পরম আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের প্রতি ভালবাসা গভীরতর হ'লে তাঁর সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বিভিন্ন ভাবে আনন্দ আস্বাদন করবার বাসনা জাগে। যিনি নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তাঁতে একটা ভাব আরোপ ক'রে সাধক তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পেতে চেষ্টা করেন।

জগতে সকল ধর্মেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। ভারতে এই ভাবের সাধনা বিশেষ প্রচলিত; এই সাধনার সাধ্য বস্তু সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ঐশ্বরিক ভাব মানুষ নিজের মানবীয় ভাবেই বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারে; ভক্তগণ তাই ভগবানের উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার করেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবের মাধ্যমে রসস্বরূপ ভগবানকে আস্বাদনের কথা বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলা অনুধ্যান করলে পঞ্চভাবের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়। সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সব ভাব নিয়ে সম্বন্ধ স্থাপিত, শান্তাদি ভাবগুলি তারই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ রূপ। ভারতে বৈদিক যুগে শান্তভাবের, রামায়ণের যুগে শান্ত দাস্য ও সখ্যভাবের এবং পরবর্তী যুগে সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম বিকাশ হয়েছিল।

শান্তাদি পাঁচটি ভাবের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি দ্বারাই চরম উপলব্ধি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু গুণবিচারে মধুর ভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। দাস্যে শান্তভাব বিদ্যমান, সখ্যে শান্ত দাস্য, বাৎসল্যে শান্ত দাস্য ও সখ্য এবং মধুরভাবে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য চারটি ভাবই বিদ্যমান। সুতরাং পরেরটি পূর্বেরটি থেকে উৎকৃষ্ট—এইজন্য মধুর-ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ।

শান্ত-ভাব

যখন ভক্তের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি, কেবল বাহ্য ভক্তি অপেক্ষা কিছু উন্নত ধরনের ভাবের উদয় হয়েছে, তখন সেই ভক্তির নাম শান্ত-ভক্তি। ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপূর্ব মহিমাদর্শনে তার চিত্ত শান্ত হ'য়ে যায়, তখন তার মনে কোনরূপ ভেদভাব বা সুখ-দুঃখে বিচলিত ভাব থাকে না। ভগবানকে একটিবার দর্শন করতে পারলেই যেন ভক্ত কৃতার্থ হয়। মনে হয় ভগবান অপূর্ব মহিমান্বিত। শান্ত-ভক্তের মন বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হ'য়ে শান্ত ও সমাহিত ভাব ধারণ করে। বাসনাজয় ও ভগবানে অনুরক্তি শান্ত-ভক্তির লক্ষণ। এই দুটি গুণ অর্জনের জন্য শান্ত ভক্তের নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকায় তার মন থেকে দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য প্রভৃতি চলে যায় এবং তার চিত্ত নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হয়।

> কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুইগুণে
> এই দুইগুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে,
> আকাশের শব্দগুণ যেমন ভূতগণে।
> শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন
> পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ চৈঃ চঃ

শান্ত-ভক্তি দুই শ্রেণীর : পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ। ভগবৎদর্শনের পূর্বাবস্থা পরোক্ষ;

ভগবানকে দর্শন করার পরের অবস্থা সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ। পরোক্ষ শান্ত-ভক্তির আবির্ভাবে ভক্তের চিত্তে সদাই ব্যাকুলতা ভগবানকে দর্শন করার জন্য।

সাধক-কবি রজনীকান্ত সেনের একটি গানে পরোক্ষ শান্ত-ভক্তির ভাবটি পরিস্ফুট :

আছ অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়,
শশীতারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া ;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
দাওগো দেখায়ে বুঝায়ে।

শান্ত-ভক্ত ধীর স্থির, সুখদুঃখে অবিচলিত। সুখ দুঃখ সবই তাঁর কাছে ভগবানের দানস্বরূপ, তাঁর দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ, সকল জীবই ভগবানের সৃষ্ট—এই চিন্তা নিরন্তর থাকায় তিনি সকলের প্রতি কৃপাপরবশ হন। সর্বভূতে সমভাব—শান্ত-ভক্তের প্রধান লক্ষণ ; তিনি সর্বজীবে তাঁর ইষ্টকে দর্শন করেন।

মুনি-ঋষিগণই শান্তভক্তের দৃষ্টান্ত। সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার এই ব্রহ্মর্ষিগণ শান্ত-ভক্তি সহায়ে ভগবানকে লাভ করেছিলেন দেবর্ষি নারদ, শুকদেব, বিদুর প্রভৃতি শান্ত ভক্তের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

দাস্য-ভাব

ভক্তরাজ রায় রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনাকালে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য শান্ত-রসকে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রথমাবস্থা বলেছেন।

দাস বা ভৃত্যভাবে আপনাকে চিন্তা ক'রে ভগবানের যে উপাসনা করা হয়, তাকে বলে দাস্য-ভক্তি। ভগবান সেব্য, ভক্ত সেবক। দাস্য-ভক্তিতে ভগবান ভক্তের দ্বারা প্রভুরূপে পূজিত হন।

শান্তভাবে সাধক ভগবানের মহিমাদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে হচ্ছিল—ভগবান অনন্ত অসীম, ভাবাতীত ইত্যাদি। এইরূপ ঐশ্বর্য পরিচিন্তনে সেই সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি ভালবাসা উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ এই অনুভূতি হ'তে থাকে—ভগবান অনন্ত বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে আমার নিকট সম্বন্ধ, তিনি প্রভু আমি দাস। সাধকের এইরূপ মানসিক অবস্থায় ভগবান থেকে তিনি বেশী দূরে থাকেন না। তখন সাধক ভাবাবেশে আকুল হৃদয়ে প্রভুকে সেবা করার জন্য ব্যস্ত হন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভরশীল হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে,
পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর,
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।
শান্তের গুণ দাস্যে তাহে অধিক সেবন,
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ।

দাস্য-ভাবের দুইটি স্তর : প্রথম স্তর 'সম্ভ্রম', দ্বিতীয়—'গৌরব'। প্রথম স্তরে ভক্ত দাস হ'য়ে ভগবানকে সম্ভ্রমের সহিত সেবা করেন, বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই দাস্য-ভাবের আদর্শ। দাস্য-ভক্ত বলেন—

'প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম,
ম্যয় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।'

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ গৌরব-প্রীতিতে ভক্ত প্রভুকে পিতৃতুল্য মনে ক'রে সেবা ক'রে গৌরব অনুভব করেন। ভগবানে এই প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে স্নেহ মান প্রণয় অতিক্রম ক'রে 'রাগ' উৎপন্ন হ'লে দাস্য-ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে।

উদ্ধব, অক্রূর প্রভৃতি দাস্য-ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছিলেন। মহাবীর হনুমান দাস্য-ভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রভু রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে মহাবীর বলেছিলেন :

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

—হে রাম, দেহবুদ্ধিতে আমি তোমার দাস ; জীববুদ্ধিতে তুমি পূর্ণ, আমি অংশ ; আর আত্মবুদ্ধিতে তুমিই আমি—এই আমার নিশ্চিত মত।

মহাবীরের দাস্য-ভক্তি চরম অদ্বৈতানুভূতির স্তরে পৌঁছেছিল! শ্রীচৈতন্যাবতারে তাঁর নিত্য সেবক গোবিন্দ দাস্য-ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সংসারাশ্রমে দাস্য-ভাব অবলম্বন করতে পারলে জীবন-সংগ্রামে কঠিন সমস্যার অতি সহজ ও সরল সমাধান হয়। বিশ্বাসী ভৃত্যের মতো ভগবানের সংসারে আপন কর্তব্য অনাসক্তভাবে ক'রে কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করতে পারলে সংসারাসক্তি কেটে গিয়ে পরা ভক্তি লাভ হয়।

সখ্য-ভাব

সখা-ভাবে শ্রীভগবানের উপাসনার নাম সখ্য-ভক্তি। দাস্যভাবে ভগবানের প্রতি অনুরাগ যতই গাঢ় হয়, ততই ভক্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হন। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে, ভৃত্য প্রভুর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশতে পারে না। ভগবানের প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ় হ'লে এই ভেদভাব থাকে না। তখন ভক্তের মনে হয়—ভগবান আমার সখা, আমার বন্ধু, তাঁর মতো বান্ধব আমার আর কেউ নেই। এইরূপে ভগবানের সহিত ভক্তের ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা হয়, ভক্ত ভগবানকে প্রাণ ঢেলে দেন, নিজের উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেও সঙ্কুচিত হন না। ভক্তের যা প্রিয়, তাই-ই ভগবানকে দিয়ে তাঁর তৃপ্তি। ভক্ত ভগবানকে আপনার থেকেও আপনার মনে করেন।

যেমন প্রিয়তম বন্ধুর নিকট লোকে আপনার হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দেয়, জানে বন্ধু তার দোষের জন্য তিরস্কার না ক'রে যাতে হিত হয় তারই চেষ্টা করবে, সেইরূপ সখ্য-ভাবের সাধক ভগবানের কাছে অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গোপনীয় সকল বিষয় প্রকাশ ক'রে নিশ্চিন্ত হন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' সখ্য-ভক্তির গুণ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে :

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয় ;
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্য বিশ্বাসময়।
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ,
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য, গৌরব-সম্ভ্রমহীন,
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন।
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান,
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান।

সখ্য-ভাবের সাধক ভগবানের সহিত আহার বিহার শয়ন উপবেশন ক্রীড়া সঙ্গীত হাস্য পরিহাস প্রভৃতি করেন। বৃন্দাবনের রাখাল বালকগণ তাঁদের নিত্য খেলার সাথী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তাতে সখ্য-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। তাঁদের আচরণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ ছিল না, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সরলতা ও অকপট ভালবাসা ছিল। শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি ব্রজবালকগণ ভগবানকে সখ্যভাবে লাভ করেছিলেন।

বয়সভেদে সখ্য-ভাবের সাধনা চার রকম : সুহৃদ্‌রূপে (নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ

ভেবে), সখারূপে (নিজেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ভেবে), প্রিয়সখা-রূপে (সমবয়স্করূপে চিন্তা ক'রে), নর্মসখারূপে (তাঁর ক্রীড়াসহচররূপে চিন্তা ক'রে)। সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জুনাদি—সখ্যভাবের সাধনার দৃষ্টান্ত।

সখ্যভাবের সাধক ভক্ত মনে করেন, ভগবান যেন তাঁর অনন্তকালের খেলার সাথী। এই জগৎ তাঁর খেলাঘর, খেলাচ্ছলেই ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি স্থিতি লয়—সবই তাঁর খেলা—অনবরত এই খেলা চলছে, প্রতি অণু-পরমাণুতে তিনি এই খেলা করছেন।

বাৎসল্য-ভাব

ভগবানকে নিজের সন্তানভাবে—বাল-গোপাল জ্ঞানে যে উপাসনা তাকে বলা হয় বাৎসল্য-ভাবের সাধনা। এই সাধনায় স্নেহ-মমতার এমনই প্রাবল্য থাকে যে ভগ-বানকে ঠিক নিজের সন্তান ব'লে প্রতীতি হয়, ভগবানে যে ষড়ৈশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ—এ চিন্তা মনে আসে না। ঐশ্বর্যের চিন্তায় ভয় থাকে; ভগবান কত বড়, কত মহান্—এই ভয়! বাৎসল্যে সে ভয় নেই।

ভগবানের সহিত ভক্তের নিকটতা হওয়ায় ভালবাসা এতই প্রগাঢ় হয় যে তখন ভগবান ভক্ত অপেক্ষা ছোট হ'য়ে যান অর্থাৎ তখন ভক্ত মনে করেন—আমি না খাওয়ালে কে গোপালকে খাওয়াবে, আমি না দেখাশোনা করলে কে তাকে দেখবে? এই প্রকারে ভক্তের নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব উদিত হয়। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার মতো ভালবাসা লৌকিক জগতে আর দেখা যায় না। এই ভালবাসা কোন প্রকার প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, নিঃস্বার্থ ও অযাচিতভাবে মাতাপিতা তাঁদের সন্তানের ওপর ভালবাসা ঢেলে দেন; সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ক'রে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের যখন এই প্রকার ভালবাসার উদয় হয়, তখন ভক্ত ভগবানের দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন এবং অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখেন। বাৎসল্য-রস সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতের উদ্ধৃতি :

> বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন;
> সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন।
> সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার,
> মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার।
> আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান,
> চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।
> সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে,
> কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্যজ্ঞানিগণে।

নন্দ, যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ভাবের সাধন করলে ভগবান বালগোপালরূপে দর্শন দেন এবং মায়িক মনুষ্য-শিশুর ন্যায়ই বাল্য-চপলতা নিয়ে ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন।

বাৎসল্য-ভাবের সাধনার অবস্থায় ভগবানের ঐশ্বর্য-জ্ঞান একেবারেই থাকে না এবং কোন প্রকার ঐশ্বর্যের ভাব দর্শন করলে ভক্ত গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে মা যশোদা তাঁর ঐশ্বর্য না দেখে অমঙ্গল আশঙ্কাই করেছিলেন।

বাংলার আগমনী সঙ্গীতের মাধ্যমে বাৎসল্য-রসের আর একটি দিক সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মা মেনকা কন্যা উমার সুখের জন্য কিরূপ চিন্তিত হয়েছেন, তা কত শত গানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের মতো খৃষ্ট ধর্মেও বাৎসল্য-ভাবের সাধনা দেখতে পাওয়া যায়।

মধুর-ভাব

মধুরভাবে ভাবের পরাকাষ্ঠা। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' মধুরভাবের বর্ণনা :

এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার,
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন,
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে,
কৃষ্ণ-কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে।

মধুরভাবে ভক্ত আপনাকে কান্তা ও ভগবানকে কান্ত মনে ক'রে সাধনা করেন। যাঁরা এইভাবে সাধনা করেন তাঁদের মত—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ আর জীবমাত্রেই প্রকৃতি। যখন ভক্ত ভগবানের জন্য সর্বদা তন্ময়ভাবে চিন্তা করেন, তখন তাঁর অদর্শনে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। এইরূপে তাঁর প্রীতি প্রেমে পরিণত হয়। তখন ভক্ত ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করেন। সর্ব চিন্তা কান্তের চিন্তাতেই পর্যবসিত হয়। সেই অবস্থায় ভক্ত-ভগবান নেই, ধ্যাতা-ধ্যেয় নেই—সবই একত্বে বিলীন। ভক্ত ভগবানে আত্মহারা হ'য়ে যান। তাঁর অন্তর বাহির পরিপূর্ণ হয়, সর্বত্রই ভগবদ্দর্শন হ'তে থাকে।

মধুরভাবে পাঁচটি ভাবই বিদ্যমান। এই জন্য মধুর-ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ। মধুর-ভাবের সাধিকা মীরার কণ্ঠে অপূর্বভাবে ধ্বনিত হয়েছিল :

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুস্‌রা ন কোঈ।
যাকে সির মোরমুকুট মেরে পতি সোঈ॥

ভগবদ্‌বিরহে মীরা গাইছেন :

তুম্‌হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহি কেঁও তরসাও।
বিরহ-বিথা লাগী উর অন্দর
সো তুম আয় বুঝাও॥

রাসপূর্ণিমার রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী-গণকে প্রেমের পূর্ণত্ব আস্বাদন করাবার জন্য অন্তর্হিত হ'লে বিরহে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবে পূর্ণ হ'য়ে গোপীদের কেউ কেউ বলেছিলেন 'আমিই কৃষ্ণ, দেখ দেখ আমি কিরূপ মনোহররূপে গমন করছি। তোমরা ভীত হ'য়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা ক'রব।' কেউ বা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের অনুকরণ করতে লাগলেন। কেউ তাঁর শৈশব অবস্থার অনুকরণ ক'রে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন! দুই জন গোপী কৃষ্ণ-বলরাম ও অন্য দুইজন রাধা-কৃষ্ণ হ'য়ে বাঁশী বাজাতে লাগলেন। গোপীরা আর কৃষ্ণ-বিরহিণী নন, কৃষ্ণ ভেবে তাঁরা কৃষ্ণই হ'য়ে গিয়েছেন!

সৎ-চিৎ-আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির সৎ-অংশ সন্ধিনী; চিৎ-অংশ সংবিৎ, এবং আনন্দ-অংশ হ্লাদিনী নামে খ্যাত। আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপে আপনিই আপনার সুখ আস্বাদন করেন।

'সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।' চৈঃ চঃ

হ্লাদিনীর সারাংশই প্রেম। প্রেমের সারাংশই মধুর-ভাব। শ্রীমতী রাধারাণী মহাভাব-স্বরূপা। তিনি ঘনীভূত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম।

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ক'রে মধুর-রস আস্বাদন করবার জন্যে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার,
নিজরস আস্বাদিতে কৈল অবতার। চৈঃ চঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের দুটি লক্ষণ বলছেন :

প্রথম—জগৎ ভুল হ'য়ে যাবে। ঈশ্বরে এত ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে'। দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না,

দেহবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে। ঝড় উঠলে যেমন গাছপালা আর দেখা যায় না, সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবৎপ্রেমের উদয় হ'লে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়।

যখন ভক্তের মনে হবে, 'আমি জ্ঞান চাই না, শক্তি চাই না, মুক্তি চাই না—শুধু চাই তোমাকে, তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, জীবনের জীবন, তুমিই আমার সর্বস্ব; তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্থলে রেখেই আমার শান্তি, আমার পরমানন্দ'—তখন প্রকৃত প্রেমের উদয় হয়।

ভগবানের সহিত ভক্তের একাত্মবোধের নামই প্রেম। প্রেম একবার অঙ্কুরিত হ'লে সুখ দুঃখ, ভয়-সঙ্কোচ কিছুই থাকে না; থাকে শুধু আত্মহারা তন্ময়তা। প্রেমের এই চরম অবস্থায় ভক্ত সূর্যে দেখে ভগবানের জ্যোতি, চন্দ্রমায় তাঁর লাবণ্য, কুসুমে তাঁর হাসি, পাখির কুজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে শোনে তাঁরই প্রেমগীতি, নব নব ভাবের আবেশে ভগবান ভক্তকে বিভোর ক'রে তোলেন--ভক্ত তখন প্রেমাস্পদ ভগবানকে অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সর্বভূতে দর্শন ক'রে কৃতার্থ হন।

এসো হে জ্যোতির্ময়

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

মুখোসে আবরি' মুখ,—
দেখাইয়ে ভীতি আশ্রিতে কেন
কর প্রভু, কৌতুক?
কোথায় লুকালে নবনীল নভে
শ্যাম সুন্দর শোভা?
কোথায় লুকালে ফোটা পদ্মের
সৌরভ মনোলোভা?
কোথায় লুকালে শ্যাম কুঞ্জের
কুহু কণ্ঠের ধ্বনি?
কোথায় লুকালে সে যমুনা-তট,
যেথা তুমি নীলমণি?

দুর্গম পথে ভয়াল মূরতি
দেখাইয়ে বার বার;
ওহে চতুরালি, ছলনা আমাকে
কতই করিবে আর?
সারা পথ যদি, দেখাইবে ভীতি
তুমি এই বেশ ধরে,
থেক মোর সাথে, যেও নাক কভু
দূরে দূরে, সরে সরে।
সদাই দিওনা ফাঁকি,
মেঘলা আকাশে ও-চাঁদ বদনে
দিও উঁকি থাকি থাকি।

দুঃখের গুরু ভার,
বহিবারে যদি সৃজিয়াছ, প্রভু
হাসি মুখে কর পার,
(আজ) এসো হে জ্যোতির্ময়!
ঝড়ে কাঁপা তরু ফুলে-কিশলয়ে
তোমারি ঘোষুক জয়।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটী]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় অরণ্য বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। নগরের ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া ঋষিগণ অরণ্যে বাস করিয়া সমাহিতচিত্তে অমৃতত্ব-লাভের সাধনা করিতেন—ইহাই ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে নাগরিক সভ্যতা ও আরণ্য সংস্কৃতি পাশাপাশি বিরাজ করিত। নগর শিক্ষা দিত শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য—প্রলুব্ধ করিত বিলাস, ঐশ্বর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগে। অরণ্য শিখাইত কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যা, মৌন তিতিক্ষা, দর্শন, উপনিষদ্—প্রবুদ্ধ করিত ত্যাগে ও অমৃতত্বলাভে। অরণ্যের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নাগরিক সভ্যতা মানবজাতিকে সর্বাংশে গ্রাস করিয়া ভোগসর্বস্ব, জড়বাদী করিয়া তুলিতে পারে নাই। বরং জীবনযাত্রা বহু পরিমাণে অরণ্যের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সংযম, ধর্ম, ন্যায় ও নীতির অভাব ছিল না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছিল একদা ভারতবর্ষের অরণ্য-জীবনে—শান্ত নির্জন তপোবনে। নাগরিক জীবনে উচ্চচিন্তা অনুশীলনের অবকাশ বিরল। বর্তমানে অরণ্য-জীবন বিলুপ্ত, নাগরিক সভ্যতা যান্ত্রিক। এই যান্ত্রিক সভ্যতাই সর্বত্র মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জ্ঞানের আরাধনার পরিবর্তে বিজ্ঞানের উপাসনার ফলে সমগ্র মানবজাতি শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীত। কবি তাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।'

বাল্মীকি-রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্রের অরণ্য-বাস-কাহিনীর সহিত অরণ্য-জীবনের সুন্দর বর্ণনা আছে। রাক্ষস-ভয়ে সন্ত্রস্ত চিত্রকূট-নিবাসী বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণ ঐ স্থান পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলে তাঁহাদের পরামর্শে রামচন্দ্রও চিত্রকূটে বাস সঙ্গত মনে করিলেন না। অতএব পুনরায় লক্ষ্মণ ও সীতা সহ যাত্রা করিয়া তিনি প্রথমে অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি সস্ত্রীক কঠোর তপশ্চরণে রত ছিলেন। রামচন্দ্রকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তপঃসিদ্ধা, তাপসী, ব্রহ্মচারিণী স্বীয় পত্নী অনসূয়াকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন রামপত্নী যশস্বিনী বৈদেহীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া অভিলষিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন,—

পত্নীং স চ মহাবৃদ্ধাং সিদ্ধামৃদ্ধাং তপোধনাম্।
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ব্রহ্মচারিণীম্॥
প্রতিগৃহ্ণীষ বৈদেহীমিত্যাহ মুনিপুঙ্গবঃ।
যোজয়স্ব প্রকামৈস্তং রামপত্নীং যশস্বিনীম্॥

সীতা রাজকন্যা, রাজবধূ হইয়াও অতি বিনীতভাবে অনসূয়ার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। উপদেশ-প্রদানান্তে অনসূয়া তাঁহাকে বস্ত্রা-লঙ্কার উপহার দেন। নারীগণ যে কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া অলৌকিক শক্তির অধি-কারিণী হইতেন অনসূয়া-প্রসঙ্গ তাহার প্রমাণ। আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁহাদের সমান অধিকার ছিল ও ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহারাও খ্যাতি লাভ করিতেন। অত্রিমুনির নির্দেশে রামচন্দ্র অতঃপর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

বহু শতাব্দী পার হইয়া বর্তমানে

'দণ্ডকারণ্য' নামটি আমাদের নিকট বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছে। উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান-কল্পে 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা' ব্যর্থ অথবা সার্থক হইতে চলিয়াছে, তাহার সমালোচনায় সংবাদপত্রগুলি মুখর। সর্বত্র জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। বর্তমানে দণ্ডকারণ্য অন্ধ্র উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য অবলম্বনে উদ্বাস্তুগণের জীবিকা-নির্বাহের প্রচেষ্টা চলিতেছে। অরণ্যের আদিবাসিগণের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইতেছে। রামচন্দ্রকে যে দণ্ডকারণ্য আশ্রয় দিয়াছিল, তাহার সহিত আজিকার দণ্ডকারণ্যের কত পার্থক্য! ভারতবর্ষের অতীত জীবনযাত্রার সহিত বর্তমান জীবনযাত্রার সাদৃশ্য অতি অল্প। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবর্তনও কম ঘটে নাই। বিশাল দণ্ডকারণ্যে নিবিড় অরণ্যানী হয়তো এখনও কোন কোন স্থলে বর্তমান, কিন্তু বেদগান-মুখরিত আজ্যধূমে সমাচ্ছন্ন তদানীন্তন আশ্রম-মণ্ডলের চিহ্নমাত্র নাই। বহু শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদানুসরণপূর্বক বাল্মীকি-বর্ণিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলে তাহার অন্য রূপ আমাদের মানসচক্ষে আবির্ভূত হইবে।

দণ্ডকারণ্য অতি বিশাল। কোথাও বিশাল-দ্রুমরাজি-সমাচ্ছন্ন বহুদূরবিস্তৃত গহন নিবিড় অরণ্যানী, সেখানে সূর্যালোক-প্রবেশের পথ রুদ্ধ। বন্য মৃগকুল শার্দূল ও হস্তিগণে পূর্ণ, অশ্রান্ত ঝিল্লী-রবে মুখরিত, সিংহ ও ব্যাঘ্রশব্দে নিনাদিত ভয়ঙ্কর অরণ্য। আবার কোথাও সুমিষ্ট ফল-ভারে আনত পাদপসমূহে পরিবেষ্টিত রমণীয় কানন, বিচিত্র লতাপুষ্প-সমাচ্ছন্ন শিলাতল, পদ্মশোভিত সরোবর, স্বচ্ছসলিল তড়াগ ও গিরি-প্রস্রবণে পরিশোভিত, বিবিধ পক্ষীর বিচিত্র মধুর কলরবে মুখরিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিলয় দণ্ডকারণ্যের এই সকল কাননে সংসারবিরাগী ঋষিগণ আশ্রমজীবন যাপন করিতেন; সমগ্র দণ্ডকারণ্যে এইরূপ বহু আশ্রম ছিল। রামচন্দ্র আগ্রহের সহিত ঐ সকল আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছিলেন,—

প্রবিশন্ স মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমুত্তমম্।
দদর্শ রামো দুর্ধর্ষং তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
দুষ্প্রবেশং দুরালক্ষ্যং সূর্যমণ্ডলবর্চসম্॥
শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসমৃদ্ধং শ্রিয়া যুতম্।
সেবিতঞ্চোপনৃত্যঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
পবিত্রমমলং দিব্যং সিংহশার্দূল-নাদিতম্॥
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্ভাণ্ডৈ রুচিরৈঃ শুভৈঃ।
মহদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।

—কুশ ও চীরে পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাস-জনিত প্রভায় সমাবৃত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান্ আশ্রমগুলি বস্তুতঃ সাধারণের নিকট দুরালক্ষ্য ও দুষ্প্রবেশই ছিল। অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন পবিত্র নির্মল ও দিব্যভাবাপন্ন আশ্রমমণ্ডল ছিল সর্বপ্রাণীর আশ্রয়স্থল। সর্বদা বেদধ্বনি ও যজ্ঞমন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত, যজ্ঞশালায় প্রজ্বলিত অগ্নি, স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞভাণ্ডসমূহ, বৃহৎ জলকলস ও ফলমূলসমূহ আশ্রমের শোভা বর্ধন করিত।

এই সকল পবিত্র তাপসাশ্রমে বাস করিতেন ফলমূলভোজী, জিতেন্দ্রিয়, চীর ও কৃষ্ণাজিন বসনধারী তেজঃসম্পন্ন বিভিন্ন সাধনমার্গের মুনিবৃন্দ। তাঁহাদের উগ্র কঠোর তপস্যার কিছু কিছু বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের সহিত যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুনিবৃন্দ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বৈখানস মুনিগণ—অকর্ষিত ভূমিতে জাত ফলমূলাদি আহার করিয়াই তাঁহারা জীবন ধারণ করিতেন; নূতন খাদ্য প্রাপ্ত হইলে পুরাতন খাদ্য যাঁহারা ত্যাগ করিতেন, সেই বালখিল্য মুনিগণ, স্বয়ংপতিত

ফলাদি ভক্ষণ অথবা সূর্য কিংবা চন্দ্রের রশ্মি পান করিয়া জীবন-ধারণে অভিলাষী মরীচিপ-গণ, ও অপক্ক অন্ন প্রস্তর দ্বারা কুট্টিত করিয়া ভক্ষণ-কারী অশ্মকুট্টগণ। কেহ বা পত্রাহারী অথবা সলিলাহারী, কেহ বা অভ্রাবকাশী অর্থাৎ বর্ষা-কালে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা সহ্য করিতেন, কেহ বা স্থণ্ডিলশায়ী, আস্তরণশূন্য কঠিন ভূমিতলে শয়ন করিতেন। উপবাসরত কেহ হয়তো জলে কল্পান্তস্থায়ী অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল জলে অবস্থান করিতেন। অপর কেহ হয়তো পঞ্চ-তপার অনুষ্ঠানে নিরত। দীর্ঘদিন অন্তর আহার গ্রহণ করাই ছিল কাহারও তপস্যা। আবার কেহ হয়তো নিরাহার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। নিষ্কাম অথবা সকাম উপাসনায় রত অন্যান্য মুনিবৃন্দও ছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য-অন্তর্গত আশ্রমমণ্ডল পরিদর্শনকালে এই প্রকার বহুবিধ তপস্যাপরায়ণ ও ব্রতানুষ্ঠান-সম্পন্ন মুনিগণের সাক্ষাৎলাভ করেন। এইভাবে প্রসন্নচিত্তে পরম আনন্দে আশ্রমসমূহে বাস করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের দশ বৎসর অতীত হইয়াছিল।—

তথা সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমে সুখম্।
রমতাশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ ॥

রামচন্দ্রের বনবাস-বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অতুলনীয়া সুন্দরী তরুণী পত্নী সহ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনবাস করিতেছেন, এই সংবাদ স্বভাবতই বনবাসিগণের নিকট কৌতূহলের বিষয়। রামচন্দ্র যখন যে আশ্রমে গমন করিতেন, ঐ আশ্রমের এবং দূর দূরান্তর হইতে বনবাসী ঋষি ও মুনিগণ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া আসিতেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য তাঁহাদের নিকট বিস্ময়কর ছিল। রামচন্দ্রের অপূর্ব বিনয় ও উদার মধুর বচন তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিত। ইহা ব্যতীত রাক্ষস-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় তাঁহারা অমিততেজসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের শরণপ্রার্থী হইতেন।

রাক্ষসাধিপতি রাবণের ভ্রাতা খরের অত্যাচার পম্পা ও মন্দাকিনী-তীরবাসী ও চিত্রকূটনিবাসী মুনিবৃন্দের আশ্রমসমূহে ক্রমশই বর্ধিত হইতেছিল। জনপদ হইতে দূরে অরণ্যস্থিত এই আশ্রমসকল ছিল রাক্ষসগণের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। তখন দেশে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ প্রচলন ছিল। গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি ছিল তপস্বিগণের নিত্য সেব্য। ইহা ব্যতীত যখনই তাঁহারা অন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইতেন, তখনই যজ্ঞানল প্রজ্বলিত ও ধূম উত্থিত হইলেই রাক্ষসগণ দল বাঁধিয়া যজ্ঞ-বিনাশের অভিপ্রায়ে ছুটিয়া আসিত। তপস্যা-নুষ্ঠানে রত মুনিগণ জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ এবং প্রাণিনিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, সুতরাং তাঁহারা ছিলেন রাক্ষসদিগের অত্যাচার-দমনে অপারগ। রামচন্দ্রের দর্শনে তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি যেন রাক্ষস সংহার পূর্বক তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন দূর করেন।

সাক্ষাৎ সূর্যমিবোদ্যন্তং তং দৃষ্ট্বা ধর্মচারিণম্।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্ণন্ ধৃতব্রতাঃ।

—ব্রতনিষ্ঠ সেই মহর্ষিগণ উদীয়মান সূর্যের ন্যায় সুন্দরদর্শন ধর্মচারী রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া মাঙ্গলিক বাক্যসমূহ প্রয়োগপূর্বক তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

বস্তুতঃ রামচন্দ্র যে আশ্রমে গমন করিতেন, সেখানেই তাঁহাকে সকলে বন্য ফলমূল পুষ্প ও সলিল দ্বারা অর্চনা করিয়া তাঁহাদের আশ্রমে বাসের জন্য অনুরোধ করিয়া নানাভাবে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া আশ্বাস প্রার্থনা করিতেন:

ত্বং নো ধর্মঃ পিতা রাম তথা শরণদঃ সখা।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ॥

—রাম তুমি আমাদের ধর্ম, পিতা, আশ্রয়-দাতা, সখা; তুমি আমাদের পূজনীয় এবং রাজা বলিয়া সম্মানার্হ। আমরা তোমারই রাজ্যনিবাসী বনবাসী; আমাদের রক্ষা করা তোমার কর্তব্য; সুতরাং হে রঘুশ্রেষ্ঠ, নগরে অথবা বনে যেখানেই তুমি অবস্থান কর—তুমিই আমাদের রক্ষক।

আর্তাঃ স্ম শরণং রাম ভবন্তং সমুপাগতাঃ।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ সবাহুবলমাশ্রিতঃ।
ঐশ্বরোঽয়ং পরোভাবঃ শূরত্বং নাম রাঘব॥

—রাম, আর্ত আমরা তোমার শরণাপন্ন, তুমি বাহুবলে আমাদের রক্ষা কর! হে রাঘব, আত্মরক্ষণরূপ উৎকৃষ্ট স্বভাবই নৃপতিগণের বীরত্বের ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ঐ প্রকারে স্তুত হইয়া রাম কিন্তু অতি বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন :

নৈবমর্হথ মাং বক্তুমহমেব সলক্ষ্মণঃ।
তপঃশ্রুতবয়োবৃদ্ধান্ ভবতঃ শরণং গতঃ॥

—আমাকে এই প্রকার বলা আপনাদের সঙ্গত নহে, লক্ষ্মণের সহিত আমি—তপোবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ আপনাদের শরণাপন্ন।

যথাবিহিত রাজা হইয়া অযোধ্যায় অবস্থান করিলে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জক নৃপতিরূপে খ্যাতিলাভ করিতেন নিশ্চিত, কিন্তু তাহা হইলে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমন সংসাধিত হইত না। সংসার-বিরাগী তপস্বিগণ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াই কি তপস্যার ফল লাভ করেন নাই? বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার অভিলাষী হইয়াই রামচন্দ্র বিশাল দণ্ডকারণ্যস্থিত বিভিন্ন আশ্রম-মণ্ডল পরিদর্শন করেন। পরে রাক্ষস-সংহার দ্বারা সর্বত্র শান্তি ও ধর্ম স্থাপিত হয়। প্রত্যেক অবতারের জীবনই পরবর্তীকালে সুপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। রামচন্দ্রের বনবাস অসঙ্গত অথবা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। বিষ্ণুর নিকট দেবতাদিগের শরণপ্রার্থী হইয়া গমন ও তৎকর্তৃক রাবণবধের আশ্বাস-প্রদান দ্বারা ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া হয়তো সকলে তখন বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মানব নহেন। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহারা এক দিব্য অলৌকিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে আকর্ষণ সর্বযুগের অবতার-চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন আনন্দোচ্ছ্বাসে তরঙ্গস্ফীত হয়, রামচন্দ্রের দর্শনে সেই পবিত্র-চিত্ত মুনিগণ এক অপার্থিব আনন্দে মগ্ন হইতেন। বিখ্যাত ঋষি শরভঙ্গ দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রামচন্দ্রের প্রতীক্ষারত ছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনলাভে ধন্য হইয়া শরভঙ্গ তাঁহার সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেহ বিসর্জন করেন। সুতীক্ষ্ণ ঋষি রামকে দর্শন করিবামাত্র আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের দর্শন-আশাতেই তিনি জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আরোহণ করেন নাই।

নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অগস্ত্যমুনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে রামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলে শিষ্যসমভিব্যাহারে মুনি রামচন্দ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। পরে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তাঁহার অর্চনা করিয়া মুনিবর রামচন্দ্রকে ধনু ও খড়্গ উপহার প্রদান করেন। অগস্ত্যের নির্দেশানুসারে রাম অতঃপর গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটীকাননে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে যান।

রামচন্দ্র মুনিগণকে রাক্ষসবধের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া অভয় দিলে সীতা উপদেশচ্ছলে

রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের অকারণ শত্রুতাচরণ সমুপস্থিত হইয়াছে। শত্রুতা ব্যতিরেকে রাক্ষসবধ যুক্তিসঙ্গত নহে। পর-হিংসাকৃত রাক্ষসগণের সহিত বৈরতারূপ ব্রত কি তাঁহার পক্ষে হিতকর হইবে? সজ্জনগণ অহিংসা দ্বারাই পরম ধর্ম লাভ করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র যখন বনবাস করিতেছেন, তখন অহিংসা ধর্ম পালন করা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া যেন তিনি পুনরায় ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন। উত্তরে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তিনি যখন শরণাগত মুনিবৃন্দকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, তখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গে তিনি অক্ষম।

পঞ্চবটীকাননে বাসের পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু রাক্ষসগণের সহিত রামের বিরোধ বা সংগ্রামের কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই। কেবল বিরাধ-নামক রাক্ষস কর্তৃক সীতা আক্রান্ত হইলে রামচন্দ্র তাহাকে বধ করেন। বিরাধ রাক্ষস বলিয়া উক্ত হইলেও বর্ণনাপাঠে মনে হয় বনচর কোন অতিকায় হিংস্র প্রাণী। পঞ্চবটী বনে বাস করিবার অল্পকাল পরে দৈবক্রমে রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী রাক্ষসী শূর্পনখা আসিয়া উপস্থিত হইলে রাক্ষসগণের সহিত রামের সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

শূর্পনখার আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনাপাঠে তাহার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা করা যাইতে পারে। শূর্পনখা অপ্রিয়দর্শনা, বিরূপনয়না, তাম্রবর্ণকেশা, বিকৃতাকারা, অতিভীষণস্বরা, বিকটভাষিণী, দুর্বৃত্তা। রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া শূর্পনখা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চায়। সীতাকে দেখাইয়া রাম তাহাকে লক্ষ্মণের নিকট ঐ প্রস্তাব করিতে বলেন। অতঃপর শূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূর্পনখার নাসিকা কাটিয়া দেন। শূর্পনখা তাহার ভ্রাতা খরের নিকট নিজের দুর্দশা জ্ঞাপন করিলে খর দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ সহ পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামের সহিত রাক্ষসগণের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাম একাকী সমুদয় রাক্ষস বিনাশ করিলেন। দণ্ডকারণ্য রাক্ষস-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হইল না; বরং যে দুষ্টদমনের জন্য রামচন্দ্রের আগমন সেই কার্যের আরম্ভ মাত্র হইল বলা চলে।

লাঞ্ছিতা শূর্পনখা তখন ভ্রাতা খরের বিনাশ দর্শনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসাধিপতি অগ্রজ রাবণের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

প্রার্থনা

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

যে টুকু অংশ গ্রহণ করেছি
এ বিশ্ব-অভিনয়ে,
পূর্ণ যেন তা হ'য়ে যায় প্রভু
তোমার আশীষ লয়ে।
আমার বলিতে যাহা কিছু সব
হয় যেন নিরসন,
যাহা কিছু করি সবি যেন ভাবি
তোমারই অনুশাসন।

জেগে রই যবে তুমি মোরে দিও
কর্ম করিতে শকতি,
ঘুমাব যখন কর্ম-ক্লান্ত
তুমি দিও কোল পাতি।
ধূলি হ'য়ে যদি উড়ে যাই কভু
তব পদে দিও ঠাঁই,
তোমারি চরণে 'আমি ও আমার'
—সব কিছু ভুলে যাই।

ডক্টর ঝিভাগো

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বোরিস্ পাস্তারনেক (Boris Pasternak) পৃথিবীর নামজাদা ঔপন্যাসিকদের দলে ঠাঁই পেয়েছেন Doctor Zhivago লিখে। এই বইখানিকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্যজগতে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি? দেখিই না, বইখানি কেমন! দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে ডক্টর ঝিভাগো পড়া শুরু হ'ল।

উপন্যাসের আরম্ভে নায়ক ঝিভাগো মায়ের সমাধিভূমিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট। রোরুদ্যমান বালককে মামা নিয়ে চলেছে বাড়ীতে। এই মৃত্যুর পাণ্ডুর পটভূমিতে ঝিভাগোর জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়।

অভিজাত বংশের ছেলে ঝিভাগো অল্পবয়সেই মা-বাপকে হারিয়েছে। মামা তাকে শোনায় খ্রীষ্টের কাহিনী। উপন্যাসের শুরুতেই পঞ্চম পরিচ্ছেদে মামার কথাবার্তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, এ বই মার্ক্সবাদীদের মনঃপূত হবার কথা নয়। ক্যাণ্ট্ বা মার্ক্সকে ঘিরে দল বাঁধার যে মনোভাব, তার মধ্যে কি মেলে সত্যের সন্ধান? সত্যান্বেষণ ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু। সত্যনিষ্ঠা পারে না দলনিষ্ঠার সঙ্গে তালে তাল দিয়ে চলতে। আর একটা কথা। মুড়ি-মিছরির কখনো একদর হ'তে পারে না। পৃথিবীতে এমন বস্তু অল্পই আছে, যার কাছে জীবন মনপ্রাণ নিঃশেষে নিবেদন করা যায়। আমরা শুধু খ্রীষ্টের মতো অমৃতের বার্তাবহের কাছেই হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারি। খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার কথা রয়েছে, আর ভালোবাসাই হচ্ছে মামার ভাষায়: প্রাণোদ্যমের পরম প্রকাশ (the supreme form of living energy)। খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর মধ্যে রয়েছে একটি মুক্ত ব্যক্তিত্বের (free personality) আর মহাদর্শের জয়গান। মামা বলছেন বন্ধুকে: It was not until after Christ that time and man could breathe freely. —খ্রীষ্টজন্মের আগে তো তমসার যুগ, রক্তারক্তি, হিংস্রতা, পশুত্ব। একজন মানুষ অন্যদের স্বাধীনতা হরণ করলে মনুষ্যত্বের গৌরব হারিয়ে ফেলে—এ চিন্তা কারও মনে তরঙ্গ তখনও তোলেনি।

এ রকমের চিন্তা নিশ্চয়ই জড়বাদের প্রসারের পক্ষে অনুকূল হ'তে পারে না। তাই উপন্যাসের প্রথম ভাগেই দেখতে পাই, মামাকে খ্রীষ্টের কাছে আনুগত্যের জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। সিভিল সার্ভিসের চাকরিটি তিনি খুইয়েছেন খ্রীষ্টের প্রেমধর্মের জয়গান করার জন্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা মামাকে বঞ্চিত করেছে স্বচ্ছন্দভাবে কোথাও যাওয়া-আসার অধিকার থেকে।

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'—ভাগ্নে ঝিভাগো মামার সান্নিধ্যেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে। তার শিশুমনের ওপরে মামার প্রভাব সঞ্চারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ঝিভাগো এক জায়গায় স্বীকারই করেছে, 'I am supposed to have been corrupted by his influence.' —অনেকেরই ধারণা মামার ভাবপ্রভাবেই তার জীবন ও মন 'দূষিত' হয়েছে। ঝিভাগোর চরিত্রে খ্রীষ্টের প্রভাব প্রথম থেকেই আমরা

লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি তার জীবনের পবিত্রতাকে, লক্ষ্য করি তার নীরব নম্রতাকে, লক্ষ্য করি তার সত্যানুরাগের প্রবলতাকে। রোমা রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফের সঙ্গে ঝিভাগো-চরিত্রের অনেক জায়গায় মিল আছে। দু-জনেই প্রেমিক, দু-জনেই নিঃস্বার্থ, দু-জনেই সত্যানুরাগী। শুধু ক্রিস্তফের চরিত্রে পৌরুষের প্রকাশ আরও প্রোজ্জ্বল। ঝিভাগো এবং ক্রিস্তফ—উভয়কেই মূল্য দিতে হয়েছে সত্যকে গভীর ক'রে ভালোবাসার জন্যে। মিথ্যাকে দু-জনেই বরদাস্ত করতে পারেনি।

রলাঁ ক্রিস্তফের জীবন শুরু করেছেন সূতিকাগৃহ থেকে। সেই জীবন নানা অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে আবর্তসঙ্কুল বেগবান্ নদেরই মতো। অবশেষে মৃত্যুতে সেই জীবনের কী গরিমময় অবসান! ক্রিস্তফ জীবনকে কামনা করেছে, শান্তিকে নয়। কুরু-ক্ষেত্রের পর কুরুক্ষেত্রকে সে জয় ক'রে চলেছে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের মতোই। মাঝে মাঝে পরাজয়। সেই পরাজয় ক্রিস্তফকে দমাতে পারেনি, দিয়েছে তাকে নূতনতর দৃষ্টি, নূতন-তর গতিবেগ। দুঃখের হলমুখে বিদীর্ণ ক্রিস্তফের রক্তাক্ত হৃদয়ের ফাটল থেকে বারে বারে বেরিয়ে এসেছে নবজীবনের শ্যামাঙ্কুর। দুরন্ত প্রাণবন্যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে অপমানের স্মৃতি, ব্যর্থতার গ্লানি।

ঝিভাগো ক্রিস্তফের মতো সঙ্গীতজ্ঞ নয়; সে ডাক্তার। ক্রিস্তফ বিয়ে করেনি। ঘর বাঁধবার ইচ্ছে থাকলেও ক্রিস্তফের সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে গেছে। ঝিভাগো বিবাহিত। ঝিভাগোর জীবনও নদীর মতোই বয়ে চলেছে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে। 'ডক্টর ঝিভাগো' উপন্যাসকে তাই 'পথের পাঁচালি' বলা যেতে পারে। ঝিভাগোর স্বভাবের মধ্যে কোথাও উগ্রতার লেশমাত্র নেই। ঝিভাগো স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ, মেষশাবকের মতোই মৃদু, অথচ সিংহের মতো সাহসী। রাশিয়ার অন্তর্বিপ্লবের রক্তাক্ত পটভূমিতে দিগন্তপ্রসারী হানাহানির মধ্যে ঝিভাগো-চরিত্রে ফুটে উঠেছে খ্রীষ্টের করুণ কোমলতা। সে ধন চায়নি, মান চায়নি, চায়নি কোলাহলমুখর মহানগরীর উচ্ছল ফেনিলতা। ঝিভাগো চেয়েছিল পল্লীর নিভৃতে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে মাটির কাছাকাছি থাকতে। রাজধানী থেকে বহু দূরে পল্লীর আবেষ্টনীর মধ্যে গৃহ-জীবনকে গুছিয়ে তোলবার মুখে হঠাৎ তার জীবন বিপর্যস্ত হ'য়ে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনার ধাক্কায়। পল্টনের লোকেরা তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল ছাউ-নিতে। আহতদের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। কোথায় পড়ে রইল প্রিয়তম পুত্র এবং সন্তানসম্ভবা সহধর্মিণী। কঠিন বাস্তবের আকস্মিক রূঢ় আঘাতে জীবনের স্বপ্ন এক লহমায় চুরমার হ'য়ে গেল! বিপ্লবের ফেনিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ডাক্তারের জীবন চলতে লাগল এখান থেকে ওখানে। অন্তরে তার নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। পালাতে চেয়েছে কতবার! সফলকাম হ'তে পারেনি। নেতাদের হৃদয়ে দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। বিপ্লবের নামে হেন নিষ্ঠুরতা নেই, যা তারা না করতে পারে! লারা বলছে, 'নেকড়ে বাঘের চেয়েও তারা হিংস্র!' ডাক্তার ঝিভাগোর হৃদয়ের কান্না শোনবার মতো কান কোথায়? নেতাদের মনের যে-চেহারা পাস্তারনেক ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে, তাতে তাঁদের খুশী হওয়ার কথা নয়; আর সেই জন্যেই পাস্তারনেকের কীর্তি তাঁর স্বদেশে অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে রইল।

উপন্যাস পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে রক্ত হিম হ'য়ে যায়! কোন দেশে যখন রক্তাক্ত অন্তর্বিপ্লবের ঝড় বইতে আরম্ভ করে, তখন বিপ্লবের দোহাই দিয়ে যে-সব কাণ্ড ঘটতে থাকে সেগুলি কী অমানুষিক! একথা ঠিক যে এই বিপ্লবের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা (historical inevitability) থাকতে পারে। একথা ঠিক যে দীর্ঘকাল ধ'রে নির্যাতন ভোগ করতে করতে অবশেষে একদিন সর্বহারা-রা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, আর সেদিন মরিয়া হ'য়ে নিরন্নেরা কতদূর হিংস্র হ'য়ে উঠতে পারে—তার সীমারেখা ঠিক করবে কে?

তবু চারিদিকের অনিবার্য রক্তারক্তির মধ্যে যে কোন সংবেদনশীল মানুষের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে একটি মহাজিজ্ঞাসা বারংবার উঁকি মারে: হিংসার রাস্তায় কি হিংসাকে নিবারণ করা সম্ভব? কোন মানুষকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোন জাতিকে ঘৃণা ক'রে কি আমরা মানুষের সমাজকে নবজীবনের উপকূলে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল লিখেছেন:

I don't know whether anybody deserves to be hated, but I do know that hatred of those whom we believe to be evil is not what will redeem mankind. [—Human Society in Ethics and Politics]

রাসেলের এই বাণীরই প্রতিধ্বনি ডাঃ ঝিভাগোর কণ্ঠে। রেলগাড়ীতে সহযাত্রীকে তিনি বলছেন:

I used to be very revolutionary-minded, but now I think that nothing can be gained by violence. People must be drawn to good by goodness.

—আমিও ছিলাম ভাবের দিক দিয়ে বিপ্লবী, এখন কিন্তু ভাবি হিংসার দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। জনগণকে কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে কল্যাণের পথেই।

এ যেন ঝিভাগোর কণ্ঠে আমাদের অতি পরিচিত, অতি পুরাতন বাণী। হিংসার রাস্তায় শেষ পর্যন্ত একটা মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না—একথা বলছেন কে? বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন আকাশচারী কোন কবি নয়, পর্বত-গুহাবাসী কোন সন্ন্যাসীও নয়। বলছেন ডাক্তার ঝিভাগো, যিনি কবি হলেও অন্তর্বিপ্লবের আগুনে জাজ্বল্যমান দেশের বীভৎস রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত। ডাঃ ঝিভাগো অভিজাত বংশের ছেলে হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিক্রিয়াপন্থী নয়। তবু জিঘাংসার প্রাবল্যে মানুষ তার আদর্শবাদ সত্ত্বেও কত নিম্নে নেমে যেতে পারে, ক্ষমতার নেশায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে কোন্ রসাতলে তলিয়ে যায়—তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ডাক্তার ঝিভাগোর চক্ষু থেকে সমস্ত আবরণ খসিয়ে দিয়েছে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত নেতারা যেন পৌরাণিক যুগের দেবতা; বিপ্লব তাদের পায়ে সাজিয়ে রেখেছে পূজার নৈবেদ্য। ক্ষমতার মদিরা পান ক'রে তাদের ভেতর থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে সমস্ত কোমলতা। একটা উদ্দেশ্যের রথকে তারা চালিয়ে নিয়ে চলেছে, আর সেই রথের চাকায় কত যে নিরীহ জীবন গুঁড়িয়ে গেল, সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই! যেন-তেন-প্রকারেণ বিপ্লবকে জয়ী করা চাই। লারা বলছে ঝিভাগোকে তার স্বামী এবং স্বামীর সহকর্মীদের লক্ষ্য ক'রে: They are made of stone, these people, they aren't human with all their rules and principle.

—এরা পাষাণে তৈরী, এদের যতই নিয়ম নীতি থাকুক, এরা মানুষ নয়। একথা ঠিক যে, অত্যাচারকে নির্মূল করবার জন্যে বিপ্লবের

নেতৃত্ব করেন যাঁরা, তাঁদের নিষ্ঠুর হ'তেই হয়। সব দেশেই হয়, আমাদের দেশেও হয়েছে। কত মা কেঁদেছে, কত সুখের সংসার চুরমার হ'য়ে গেছে, রক্তের নদী বয়েছে দিকে দিকে। কিন্তু সে রক্ত ছিল আমাদেরই রক্ত—স্বেচ্ছায় প্রবাহিত। গণবিপ্লবের সেই অন্তরের শিখায় পুড়ে সৈনিকদের নৈতিক চরিত্র আরও মহিমময় হ'য়ে ওঠে! মৃত্যুর গর্ভ থেকেই তো জীবনের অঙ্কুর জাগে। অত্যাচারীকে বাধা দিলে সে তো মারবেই। সেই মরণকে হাজারে হাজারে বরণ করতে পারলে তবেই না অত্যাচারের অবসান সম্ভব!

মার্ক্সবাদ মূল্য দেয় লক্ষ্যকে—শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে। শ্রেণীসংগ্রাম মার্ক্সবাদের অনেকখানি জুড়ে আছে—একথা সত্য। কিন্তু মার্ক্সবাদীরা—যে লক্ষ্যে বিশ্বাস করে, সেই শ্রেণীহীন সমাজে শেষ পর্যন্ত শ্রেণী-সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মধ্যে। সেখানে ক্ষমতার প্রতীক রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব নেই—'the state withers away'. সে বিপ্লবের অন্তে যেমন প্রেম শান্তি সমন্বয়, আদিতেও তেমনি প্রেমেরই প্রেরণা! সর্বহারাদের শৃঙ্খলমুক্ত দেখবার দুরন্ত আগ্রহই কি মার্ক্স ও লেনিনকে বিপ্লবের সুদুর্গম শৈলপথে টেনে আনেনি? মার্ক্সবাদীদের লক্ষ্য তো ভালোই; কিন্তু এ লক্ষ্য যে অনেক-দূরে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের মতো! মাঝখানটাতে লড়াই, একনায়কত্বের রুদ্রলীলা, মতবাদের গোঁড়ামি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল কার্ল মার্ক্সের উপরে যে পণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, তার উপসংহারে আছে:

It is true that as a result of social revolution, the division of classes, is expected ultimately to disappear giving place to complete political and economic harmony. But this is a distant ideal, like the Second Coming; in the meantime, there is war and dictatorship and insistence upon ideological orthodoxy.

সত্যকে এবং প্রেমকে মূল্য না দিয়ে লক্ষ্যকে সর্বেসর্বা করলে বিপ্লব একটা দেশকে কোন্ নরকাগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে—তারই পরিচয় পাস্তারনেকের উপন্যাসের মধ্যে। ডাক্তার ঝিভাগো অকুণ্ঠভাষায় Sandevyatovকে বলছে: I don't know of any teaching more self-centred and further from the facts than Marxism. মার্ক্সের মতবাদে অনেক কিছুকে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলও ঝিভাগোর মতোই বলেছেন, 'a myth which cannot be accepted by anyone capable of rational thoughts'. একটা পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল লক্ষ্যে পৌছানো কি বিরোধী পক্ষকে ঘৃণা ক'রে সম্ভব? যার সঙ্গে মতে মিললো না তাকে চুরমার ক'রে দেবার যে আসুরিক ফিলজফি; সে ফিলজফি কি মানবসমাজের কল্যাণের পক্ষে আদৌ অনুকূল?—এ প্রশ্ন জেগেছে ডাক্তার ঝিভাগোর সত্যানুসন্ধিৎসু মনে। সাংঘাতিক প্রশ্ন। 'End justifies the means' —এই মতবাদকে তিনি অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করতে পারেননি। এ যুগের চিন্তাজগতের অনেক মহারথীই তো হিংসাকে সমর্থন করেননি। আলডুস্ হাক্সলি করেছেন? বানার্ড-শ বা রাসেল করেছেন? গান্ধী করেছেন? জগতে নানা মুনির নানা মত তো থাকবেই। নীটসের সুপারম্যানের আইডিয়ায় আর শ্রীঅরবিন্দের সুপার-ম্যানের আইডিয়ায় কত তফাৎ! নীটশের চোখে অতিমানব নেপোলিয়ান। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায়, দুর্জয় সাহসে, ক্ষমতার প্রতি প্রবল অনুরাগে। তাঁর মধ্যে করুণার এবং কোমলতার অল্পতা। রাসেল

বিশ্বাস করেন: নীটশের শিষ্যদের খেলা ফুরিয়ে গেছে। আশা করা যায়, সর্বজনীন প্রেমের আদর্শ ই পৃথিবীতে জয়ী হবে।

এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে ও জীবনকে দেখা, এই যে মতবাদের বৈচিত্র্য—এ বিচিত্রতা চলে গেলে পৃথিবীটা কি নিতান্ত আলুনি হ'য়ে যেত না? এ যুগের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ্ Nunn-এর লেখাতে পড়েছিলাম:

It takes all sorts to make a world, and world becomes richer the better each becomes after his own kind.

—নানারুচির নানা মতের নরনারী নিয়েই তো আমাদের এই বিচিত্রা পৃথিবী। আমাদের প্রত্যেককেই নিজের নিজের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের দ্বারাই আমরা পৃথিবীকে একটি লোভনীয় বাসস্থানে পরিণত করতে পারি। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নেই, সেখানে 'End justifies the means'-নীতি হিংসা-অহিংসার কোন ধারই ধারে না, সত্য-মিথ্যারও না। লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়ের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে—এ-কথা মার্ক্সবাদ স্বীকারই করে না। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ওর 'ism', ধরাবাঁধা কতক থিয়োরির বাইরে গেলেই তো তুমি অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে গেলে, তুমি প্রতিক্রিয়াপন্থী—সেকেলে। ঝিভাগোর কাছে এই শাসনের জয়গান দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। লারা-কে সে বলছে: I am sick and tired of it.

সব মানুষকেই একই সুরে কথা বলতে হবে, একই মতবাদের আশ্রয় নিতে হবে, একই নায়কের তর্জনী-সঙ্কেতে পথ চলতে হবে—এ তো দাসত্ব। সংখ্যাধিক্য দিয়ে কখন সত্যনির্ধারণ হয়? ইবসেনের ডক্টর স্টকম্যান* বলছে:

I propose to raise a revolution against the lie that the majority has the monopoly of the truth.

অনেক লোক এক সঙ্গে মিলে একটা বিশেষ মতের জয়ধ্বনি দিলেই যে তা সত্য হ'য়ে গেল—এমন কোন কথা নেই। Dr. Zhivago (ঝিভাগো)-উপন্যাসে সিমা বলছে: খ্রীষ্টের আবির্ভাব পৃথিবীতে আনল একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন। কি সেই পরিবর্তন?—

The reign of numbers was at an end. The duty, imposed by armed force to live unanimously as a people, as a whole nation was abolished. Leaders and nations belonged to the past. They were replaced by the doctrine of personality and freedom.

—খ্রীষ্টের আবির্ভাবে সংখ্যাধিক্যের আধিপত্য গেল শেষ হ'য়ে। জাতিহিসাবে একত্র বাস করতে হবে ব্যক্তিগত মতের বালাই বিসর্জন দিয়ে—এরও অবসান হ'ল। পুরাতনের চিতাভস্মের উপর উড্ডীন হ'ল ব্যক্তিত্বের আর স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা।

ডাঃ ঝিভাগোর মুখ দিয়ে পাস্তারনেক যত কথা বলিয়েছেন, তার মূল সুরটি হচ্ছে—ব্যক্তিত্ব আর স্বাধীনতা। এই দিক দিয়ে পাস্তারনেক ইবসেনের আর রাসেলের, হুইটম্যানের আর গান্ধীর সগোত্র। ডাঃ ঝিভাগো পাস্তারনেকের মানস সন্তান। তাই স্বাধীনতার এবং সত্যের পূজারী ডাঃ ঝিভাগো আনুগত্য স্বীকার করেছে খ্রীষ্টের কাছে, মার্ক্সের কাছে নয়। বলা বাহুল্য ডাক্তার ঝিভাগোর এই রকমের মতকে সোভিয়েত রাশিয়া সহ্য করতে পারেনি। পাস্তারনেকের এত বড়ো সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর স্বদেশে আজ অপাঙ্‌ক্তেয়। কর্তৃপক্ষের চাপে পাস্তার-

*An Enemy of the People: Ibsen.

নেককে নোবেল প্রাইজ অস্বীকার করতে হ'ল। ইতিপূর্বে আরও অনেক লেখককে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে স্বাধীনভাবে নিজের মতকে ব্যক্ত করবার দুঃসাহসের জন্যে। জীবদ্দশায় ভোল-তেয়ারের মাথা গুঁজবার জায়গা মেলেনি ফরাসীদেশে। মৃত্যুর পরে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ভোলতেয়ারের মৃতদেহ নিয়ে শোভা-যাত্রার সে কী অপরূপ দৃশ্য! এমনই হ'য়ে থাকে। তদানীন্তন ফ্রান্সের যাঁরা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের মন-যোগানো কথা বলতে পারেননি ভোলতেয়ার আর সেই জন্যেই নির্বাসনে কেটেছে তাঁর জীবনের দিনগুলি। ইবসেনের স্টকম্যানকে জনতার হাতে প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে সত্যকে ফাঁস ক'রে দেবার জন্যে। সত্য বললে শহরের বিপুল আর্থিক ক্ষতি। সত্যকে গোপন ক'রে গেলে শহরের শ্রীবৃদ্ধি। ডাক্তার স্টকম্যান সত্যকে চেপে গেলেই তো পারেন। মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে শহর যদি আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান্ হয়, তবে ডাঃ স্টক্ম্যান কেন মিথ্যাকে হজম করতে এত নারাজ? ডাক্তার তার উত্তর দিয়েছে অকুণ্ঠ ভাষায়:

Yes, my native town is so dear to me that I would rather ruin it, than see it flourishing upon a lie.

মিথ্যার সঙ্গে কখনো আপস চলে না, আর ইবসেনের সমস্ত লেখার মধ্যে সত্যের এবং স্বাধীনতার জয়ধ্বনি। পাস্তারনেকের ডাঃ ঝিভাগো ইবসেনের ডাঃ স্টকম্যানের মতোই সত্যের পূজারী। হিংসার মধ্যে, একনায়কত্বের মধ্যে, গোঁড়ামির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই—এই সত্য ডাঃ ঝিভাগোর চেতনায় অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিয়েছে। জনগণের জীবনধারায় রূপান্তর আনতে হবে, আর সেই রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের মাথায় যদি হাতুড়ি মারতে হয়—মারতেই হবে! বিশ্বসংসারে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন ক'রে ঢেলে সাজার দায় যেন একটি বিশিষ্ট মতবাদীদেরই! ডাঃ ঝিভাগো বলছে জনৈক নেতাকে: সমাজ উন্নয়নের কথা ব'লছ? কাজে তার কতটুকু হয়েছে? কোথায়, কতদূরে শ্রেণীহীন সমাজের অস্তিত্ব! অথচ ইতিমধ্যে শুধু কথা নিয়েই চলেছে নররক্তে হোলিখেলা,—'the mere talk about it has cost such a sea of blood, that I am not at all sure if the end justifies the means.' শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল করার জন্যে একনায়কত্বের নিষ্ঠুর তাণ্ডব-লীলাকে ডাক্তার ঝিভাগো কিছুতেই সমর্থন করতে পারছে না। বলা বাহুল্য, একদলীয় (tolalitarian) রাষ্ট্রে সমষ্টিরই জয়গান, ব্যষ্টির নয়, আর এই সমষ্টি বা people হচ্ছে 'an indoctrinated crowd' (জপানো জনতা)। সুরে সুর মেলাতে পারলেন না বলেই পাস্তর-নেক পৃথিবীর জয়মাল্য পেয়েও স্বদেশে আজ ব্রাত্য। তা হোক। সত্যকে এবং স্বাধীনতাকে যারা দাবিয়ে রাখতে চায় সমষ্টির দোহাই দিয়ে, তারা ব্যষ্টি-জীবনকে গ্রাহ্যই করে না:

Pulsating life no longer concerns itself with them. I am thinking of the few, the scattered few amongst us, who have absorbed new and vigorous truths.

—ইংরেজী কথাগুলি ইবসেন বসিয়েছেন সত্যের পূজারী ডাক্তার স্টকম্যানের মুখে।—জীবন ফুটছে টগ্‌বগ্‌ ক'রে। এই বেগবান্ জীবন জনতার রক্তচক্ষুর স্বল্পই পরোয়া করে। পাস্তারনেক সেই মুষ্টিমেয় মানুষের দলে, যাঁরা নূতনতর বলিষ্ঠ সত্যগুলিকে মজ্জায় ও শোণিতের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আর কর্তৃপক্ষের হাতে

পাস্তরনেকের লাঞ্ছনার কথা? আবার ইবসেনের ভাষাতেই বলি:

You should never wear your best trousers when you go on to fight for freedom and truth.

—সত্যের এবং স্বাধীনতার জন্যে যখন লড়াই করতে বেরুবে, মনে রেখো, নতুন জামা-কাপড় পরে কখনো বেরিও না। ক্রোধোন্মত্ত জনতা তোমার নতুন কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেবে।

তবুও 'ডাক্তার ঝিভাগো'কে প্রচার-সাহিত্যের কোঠায় ফেলা ঠিক হবে না। এর মধ্যে সাহিত্য-রস কানায় কানায় ভরে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি পাস্তারনেকের অনুরাগ সুনিবিড়। উপন্যাসের মধ্যে নরনারীর চিরন্তন হৃদয়ের খেলায় নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় আছে। 'ডাঃ ঝিভাগো' টলস্টয়ের War and Peace-এর কথা মনে করিয়ে দেয়; এই উপন্যাসে 'নেপোলিয়নিক্' যুদ্ধের পটভূমিতে টলস্টয় কারবার করেছেন মানুষের যত আদিম আবেগ নিয়ে। 'ডক্টর ঝিভাগো' রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় জীবন্ত অনুভূতিসম্পন্ন একটি মহৎ মানুষের আলেখ্য, যার অঙ্কনে সাহিত্য-স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিভা অনুপম ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। রলাঁর জাঁ-ক্রিস্তফকে যেমন ভোলা যায় না, যেমন ভোলা যায় না টলস্টয়ের অ্যানা কেরেনিনাকে, তেমনি পাস্তারনেকের ডাঃ ঝিভাগোকেও মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। ডাঃ ঝিভাগোর সঙ্গে আমরা সকল ক্ষেত্রে মতে না মিলতে পারি, তার সমস্ত আচরণ সমর্থন করতে না পারি, কিন্তু ঝিভাগো এমনই একটি দুর্লভ মহৎ চরিত্র, যার মৃতদেহের উপরে আমরা লারার মতো অশ্রুবর্ষণ না ক'রে পারি না।

উপসংহার

পাস্তারনেকের সাহিত্যসৃষ্টির পূর্বে রাশিয়ার আর দু-জন বিখ্যাত মহারথী তাঁদের সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের জয়ধ্বজা উড্ডীন ক'রে গেছেন। এই দুজনের একজন টলস্টয়, অপরজন ডস্টয়েভস্কি। তখন চলেছে নীটশের সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের বিরুদ্ধে নির্মম অভিযান। নীটশের সুপার-ম্যানদের বৈশিষ্ট্য?—

They will have more strength of will; more courage, more impulse towards power, less sympathy, less fear and less gentleness.

নীটসের জয়মাল্য নেপোলিয়নের কণ্ঠের জন্যে, বুদ্ধের বা লিঙ্কনের জন্যে নয়। বিশ্বজনীন প্রেমের কোন আবেদন নেই নীটশের কাছে। কোমলতা তাঁর কাছে চারিত্রিক দুর্বলতা, প্রেম কাপুরুষতা।

নীটশের Anti-Christ এর বিরুদ্ধে ইও-রোপীয় সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার মহতী প্রচেষ্টা ডস্টয়ে-ভস্কির উপন্যাসগুলিতে, তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা প্রেমের করুণ-কোমলতার প্রতিমূর্তি। ক্ষমা-গুণ তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ডস্টয়েভস্কি খ্রীষ্টের কাছে অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার করেছেন। খ্রীষ্টীয় আদর্শ হিংসার সঙ্গে কোথাও আপস করেনি, মিথ্যার সঙ্গেও নয়। মার্ক্সবাদের মধ্যে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের জয়ধ্বনি, কিন্তু সেই আদর্শে পৌছানোর জন্যে অহিংসা বা সত্যকে অপরিহার্য উপায় ব'লে কোথাও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

বলা বাহুল্য মার্ক্সবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবন দর্শনের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের জয়ধ্বজা উড্ডীয়মান, সেই হেতু বলশেভিস্টরা ডস্টয়েভস্কিকে

প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখবে, এমনটি আমরা আশা করতে পারি না। এই সব ভেবেই প্রথিতযশা জার্মান দার্শনিক স্পেংলার* বলছেন:

And if the Bolshevists who see in Christ a mere social revolutionist like themselves were not intellectually so narrowed, it would be in Dostoyevski that they would recognise their prime enemy.

—বলশেভিস্টরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে এমন গোঁড়া না হ'লে ডস্টয়েভস্কির মধ্যে তারা দেখত তাদের প্রধান শত্রুকে। আর আগেই তো বলেছি খ্রীষ্টীয় আদর্শের কাছে যে অকুণ্ঠ আনুগত্য ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যে সেই একই আনুগত্যের অভিব্যক্তি পাস্তারনেকের 'ডাক্তার ঝিভাগো'তে। কমিউনিস্টদের অকুণ্ঠ আনুগত্য কার্ল মার্ক্সের কাছে, আর পাস্তারনেকের অকুণ্ঠ আনুগত্য খ্রীষ্টের কাছে; এবং মার্ক্সের ও খ্রীষ্টের জীবন-দর্শন নৈতিক আদর্শের দিক থেকে এক নয়, সেই হেতু সোবিয়েত রাশিয়া পাস্তারনেককে কখনই সহ্য করতে পারে না।

টলস্টয়ও খ্রীষ্টীয় আদর্শের জয়ধ্বনি করেছেন, কিন্তু দু-জনের দৃষ্টিভঙ্গী (approach) ঠিক এক নয়। যাই হ'ক এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধে হ'তে পারে না; তাই আজ এখানেই শেষ করি।

* Oswald Spengler: The Decline of the West.

ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞার বাণী?

শ্রীগৌতম সেন

যুগান্ত-সন্ধ্যায় তুমি মেঘমন্দ্র স্বরে,
উচ্চারিলে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরে:
যখনি ধর্মের গ্লানি দেখা দিবে পৃথিবীর মাঝে,
তুমিও যে দেখা দিবে নব নব সাজে।
বারবার আসিয়াছ এই ধরাতলে,
ঘুচায়েছ—ক্লেদ-গ্লানি তোমারি তো বলে।
গ্রহণে চন্দ্রের মতো নিষ্প্রভ মলিন এই ধরা
ভেসে গেছে আলোর বন্যায়—
হয়েছে নতুন ক'রে গড়া।

তোমার গোপন রূপ, পারেনি চিনিতে মূঢ় জন,
তোমার সাম্যের বাণী বুঝিতে পারেনি মূঢ় মন;
তারে তুমি ক্ষমিয়াছ!
তবু তুমি আসিয়াছ নব সূর্যোদয়
বারে বারে ঘোষিয়াছ, 'প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।'
আরবার দেখা দাও—অবজ্ঞাত, ধর্মহীন দেশে,
সাম্য-প্রেম-প্রশান্তির চিরন্তন প্রতীকের বেশে।
দেশজোড়া গ্লানি মাঝে
কোথা তব বরাভয় পাণি?
এ ঘোর দুর্যোগ দিনে
ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞার বাণী?

স্বামী অখণ্ডানন্দ সমীপে চার দিন

শ্রীমতী শান্তি সেন

(১)

১৯৩৪ খৃঃ গ্রীষ্মকালে কিছুদিন নিবেদিতা বোর্ডিংএ ছিলাম। তখন প্রায়ই বিকেলে আমরা দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতাম। একদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম ক'রে বারান্দায় এসে দেখি একজন সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন—গেরুয়া-পরা, মাথায় একটি নামাবলী জড়ানো, সাদা চুলগুলি কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, ভাবলাম কে ইনি? —মঠের সাধুরা তো মুণ্ডিতমস্তক। তাঁর সঙ্গে কয়েক জন মহিলা ছিলেন, তাঁদেরও চেহারায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখান থেকে এসে আমরা বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে দর্শন ও প্রণাম শেষ ক'রে ঠাকুরের ঘরে গেলাম। ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সন্ন্যাসী বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে বসে আছেন; পা-ছুখানি নীচের থাকে রাখা। নিবেদিতা স্কুলের অধ্যক্ষা বললেন, ইনিই ঠাকুরের শিষ্য পরমপূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ, মঠের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট। স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাব্রতের কাজে জীবন সমর্পণ করেছেন, ভারতের বহু স্থানে ঘুরেছেন। তখন আমরা সকলে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, 'এই দেখ, এরা সব মঠে এসেছে। —পণ্ডিত জওহরলালের মা, স্ত্রী ও তাদের আত্মীয়া ক-জন মহিলা। এদের দক্ষিণেশ্বর দর্শন করাতে নিয়ে এসেছি।' এইরূপ কয়েকটি কথার পর আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। পূজনীয় মহারাজকে এই আমার প্রথম দর্শন।

(২)

প্রায় ছু'বছর পরে ১৯৩৬ খৃঃ ফাল্গুন মাসে একদিন সকালবেলা আমি বেলুড় মঠে যাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি, মঠের প্রেসিডেণ্ট মহারাজ তখন মঠেই আছেন। আমি তাঁকে দর্শন ক'রব বলাতে পূজনীয় ভরত মহারাজ ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে ঢুকেই তাঁকে দেখতে পেলাম, একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি প্রণাম করতেই তিনি বসতে বললেন। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী চাই। সে সময় খুব মানসিক সংগ্রামের মধ্যে আমার দিন কাটছিল, যার ফলে আমার শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। কি ক'রব ঠিক করতে পারছিলাম না। তাঁকে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা সব খুলে বলি। শুনে তিনি বললেন, 'দীক্ষা নেবে?' আমি বলেছিলাম, আমি তো দীক্ষা নেবো ব'লে তৈরী হ'য়ে আসিনি। আপনাকে পছন্দ হয় কিনা, তাই দেখতে এসেছি। —এই কথা শুনে তিনি খুব হেসে উঠলেন। এত জোরে হেসেছিলেন যে বারান্দা থেকে ভরত মহারাজ ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। পূজনীয় মহারাজ তখন আমাকে দেখিয়ে তাঁকে বললেন, 'এ কি বলছে শোন, এ নাকি দেখতে এসেছে আমাকে ওর পছন্দ হয় কিনা।' বলেন আর খুব হাসেন। পরে আমাকে সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আমাকে তোমার পছন্দ হয়?' আমি বললাম, হয়। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?' আমি বলেছিলাম, 'বাবার মতো'; শুনে উনি আমার মাথাটি ওঁর হাঁটুর ওপর রেখে চাপড়ে দিলেন। তখন ওঁকে প্রণাম ক'রে সুবিধামত আর একদিন আসব ব'লে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উনি বলেছিলেন, 'আচ্ছা'।

বাইরে এলে ভরত মহারাজ বললেন, 'প্রসাদ নিয়ে যেও।' আমি তখন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের সামনে ছোট বারান্দাটিতে গিয়ে বসে রইলাম। একজন ব্রহ্মচারী এসে ফলমিষ্টি প্রসাদ দিয়ে গেলেন। প্রসাদ পাওয়ার পরে ভরত মহারাজ এসে আমাকে বললেন, 'মহারাজ ডাকছেন, এখনই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। উনি পূজো করতে বসেছিলেন, পূজো করতে করতেই তাঁর মনে হয়েছে, এখনই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তাড়াতাড়ি যাও, উনি পূজোর আসনে বসে আছেন।' আমি বলেছিলাম, আমি যে খেয়ে এসেছি। 'তাতে কিছু হবে না।' তখন আমি বললাম, আমি তো স্নান করিনি। 'তাতেও কিছু হবে না।' শেষে বলেছিলাম, আমি যে আজ দীক্ষা নেবো ব'লে ঠিক ক'রে আসিনি। এবারে ভরত মহারাজ একটু ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার বহু ভাগ্য যে পূজার আসন থেকে উনি নিজে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন দীক্ষার জন্য। আর দেরি ক'রো না, শিগগির যাও।'

আমি তখন ধীরে ধীরে পূজনীয় মহারাজের ঘরে গিয়ে দেখি, উনি পূজো শেষ ক'রে আসনে বসে আছেন। পুষ্পপাত্রে কিছু ফুল-বেলপাতা রয়েছে। পাশে একখানি আসন পাতা। সেখানে আমাকে বসতে বললেন। কোশা-কুশি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে আমার মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর দীক্ষা দিলেন। শেষে দুই হাত অঞ্জলি ক'রে আমার সামনে রেখে বললেন, 'পুষ্পপাত্র থেকে ফুল তুলে নিয়ে তিন বার অঞ্জলি দাও আমার হাতে।' আমি দিলাম। তখন আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কি ক'রে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। ছোট ছেলের মতো পা ছড়িয়ে বসে, হাত জোড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'ঠাকুর আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, আমার সাধন নেই, ভজন নেই, আমায় তুমি দেখা দাও, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' এই কথাগুলি এত করুণভাবে বললেন যে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। শুনে আমারও কান্না পেয়ে গেল। আরও বললেন যে ঠাকুর ওঁকে এইভাবেই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। তারপর আমি প্রণাম ক'রে বাইরে গেলাম এবং প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টা পড়লে সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতে গেলাম। ঠাকুরের এবং মহারাজের প্রসাদ আমাকে দেওয়া হ'ল।

খাওয়ার পরে আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি ঘরের একপাশে একখানি ছোট তক্তপোষে বিছানার ওপরে একটি বাঘছাল বিছানো রয়েছে, তার ওপরে উনি বসে আছেন। আর নীচে সারা ঘরটি ঢেকে একটি কার্পেট পাতা আছে। ওঁর পায়ের কাছে কার্পেটের ওপরে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলে আমার ডান হাতখানি নিয়ে একটু ওজন ক'রে দেখলেন। তারপরে বললেন, 'হবে। অমুকের মতো।' কার মতো বলেছিলেন, সেকথা আমি ভুলে গিয়েছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি ভগবান দর্শন করেছেন কিনা। তিনি বলেছিলেন 'হ্যাঁ, যখন হিমালয়ে ছিলাম,—প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছিল।'

তারপরে কিছুক্ষণ ধরে ঠাকুরের কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুর ওঁদের কত ভালবাসতেন, সেইসব কথা বললেন :

ঠাকুরের কাছে যে আমরা যেতুম, সে কি অমনি যেতুম ? তাঁর ভালবাসার টানে যেতুম। তাঁর ভালবাসার কাছে মা-বাপের ভালবাসা আলুনি বোধ হ'ত। একদিন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় মাদুরের ওপরে শুয়ে আছেন। আমি প্রণাম করলে পাশে

বসতে বললেন। তারপর উঠে বসে আমার জিবে আঙুল দিয়ে মন্ত্র লিখে দিলেন। আর বললেন, 'এই তোর দীক্ষা হ'য়ে গেল।' তারপর বললেন, 'পা-টা একটু টিপে দে তো।' আমি যেই টিপতে আরম্ভ করেছি, ঠাকুর অমনি ব'লে উঠলেন, 'ওরে থাম্, থাম্, অত জোরে নয়।' এই ব'লে আমার হাত নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কেমন ক'রে টিপতে হবে। আমার তখন অল্প বয়স, ব্যায়াম করি। কোন ধারণাই ছিল না যে ঠাকুরের পা কত নরম। তাঁর পা ঠিক মাখনের মতো নরম ছিল। আর একদিন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। সকালবেলা গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাকুরের কাছে গিয়েছি। একজন ভিখিরী এসেছিল, ঠাকুর বললেন, 'ঐ কোণের তাকে চারটে পয়সা আছে, দিয়ে আয় ভিখিরীকে।' আমি দিয়ে এলে বললেন, 'গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে ফ্যাল্।' আমার হাত ধোয়া হ'লে 'হরি বোল, হরি বোল' ব'লে হাত ঝাড়াতে লাগলেন, অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর নিজেও হাত ঝাড়লেন, আমাকে দিয়েও হাত ঝাড়ালেন।

মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে সেই থেকে টাকাকড়ির ওপর ওঁর এমন একটা বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেল যে বহুকাল পর্যন্ত উনি টাকাকড়ি স্পর্শই করতে পারতেন না। পরে অনাথ-আশ্রমের প্রয়োজনে যতটা সম্ভব কম স্পর্শ করতেন।

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রাত্রি কাটাতেন। একদিন ঐরূপ রাত্রে ওখানে থাকার পর সকালবেলা গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাকুরের ঘরে এসেছেন; ঠাকুর ওঁকে নিয়ে মা কালীর মন্দিরে গেলেন। একেবারে চৌকাঠ পার হ'য়ে ভেতরে প্রবেশ ক'রে মায়ের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতিপূর্বে মন্দিরের চৌকাঠের বাইরে থেকেই তিনি মাকে এবং শিবকে দর্শন করতেন। সেদিন ঠাকুর ওঁকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ছাখ্, চৈতন্যময় শিব ছাখ্।' উনি সত্যই চৈতন্যময় শিব দর্শন করলেন। সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 'দেখলাম জীবন্ত শিব, নিঃশ্বাস পড়ছে। দেখে আমি আনন্দে ডুবে গেলাম, আর ঠাকুর যখন বেরিয়ে এলেন, মনে হ'ল নেশা করেছেন। পা টলছে, হেথায় ফেলতে হোথায় পড়ছে।' এইসব কথার পরে আমাকে বললেন, 'শনি-মঙ্গলবারে বেশী ক'রে জপ ক'রো। ঠাকুর বলতেন, শনিবার মধুবার'। একটু পরে তিনি বাঘছালটির ওপরে একটু শুলেন, এবং আমাকেও কার্পেটের ওপরে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে বললেন। বিকেল হ'য়ে গেল। ভরত মহারাজ এসে জানালেন, ভক্তেরা দর্শন করতে এসেছেন। মহারাজ তাদের ভেতরে আনতে বললেন। সকলে প্রণাম ক'রে একে একে বাইরে যেতে লাগলেন। আমিও প্রণাম ক'রে চলে গেলাম। মহারাজ ব'লে দিলেন, 'আবার এসো।'

(৩)

কয়েকদিন পরে আমার দিদি ও ভগ্নীপতিকে নিয়ে সকালবেলা মঠে গেলাম। মহারাজকে দর্শন ক'রে বললাম, এঁরাও দীক্ষা নিতে চান। মহারাজ হেসে বললেন, 'আচ্ছা।' দিদিরা তৈরী হয়েই এসেছিলেন। ওঁদের দীক্ষা হ'য়ে গেল। সেদিন খুব ভিড় ছিল, তাই বেশী কথা হ'ল না। প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা বাড়ী চলে এলাম। দিন দুই পরে একদিন বিকেলে, আবার আমি আমার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে যাই। দাদা মহারাজকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

আমরা গেলেই ভরত মহারাজ আমাদের মহারাজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মহারাজ আমাদের বসতে বললেন, আর খুব খুশী হ'য়ে বলতে লাগলেন, 'আনন্দ, আনন্দ, দুঃখ কিসের? মন খারাপ কিসের? ঠাকুর আছেন। সব ভার

তিনি নিয়েছেন।' তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুড়গুড়িটি কোথায়? তাকে আনোনি?' আমি বললাম, 'দিদি আর একদিন আসবে, আজ কাজের জন্য আসতে পারেনি।' আমার দিদি দেখতে ছোটখাট ছিপছিপে ছিলেন, তাই মহারাজ ওই কথা বলেছিলেন। সেদিনও ঠাকুরের কথা হ'ল।

(৪)

দুদিন পরে বিকেলের একটু আগে, দিদিদের নিয়ে আবার মঠে যাই, মহারাজ আমাদের নাম শুনে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন। সেদিন খুবই ভিড় ছিল। উনি চলে যাবেন ব'লে অনবরত ভক্তেরা সব আসছিলেন। তখন ওঁর শরীর অসুস্থ, তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্রাম না ক'রে অনবরত লোকের সঙ্গে দেখা করছিলেন। একজন ভক্ত মহিলা ও ভদ্রলোক এসে ওঁকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য খুব ধরেছেন। তাঁদের বাড়ী ভবানীপুরে, তাঁরা ঠাকুরের ভক্ত। এই ভদ্রলোকের বাবা ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। মহারাজ যতই বলছেন, ওঁর দেহ সুস্থ নেই, উনি যেতে পারবেন না, ভদ্রলোক কিছুতেই সেকথা মেনে নিচ্ছেন না। তখন মহারাজ করুণস্বরে মহিলাটিকে বলছেন, 'তোমরা হ'লে মা, কোথায় বলবে, মহারাজ আপনার শরীর খারাপ, এখন নড়াচড়া ক'রে কাজ নেই, বিশ্রাম করুন, তা নয়—তোমরাই জোর ক'রছ, এই অসুস্থ দেহ নিয়ে ভবানীপুর যেতে ব'লছ।' এই কথা শুনে মহিলাটি আর কিছু বলতে পারলেন না। তাদের নিরস্ত হ'তে হ'ল। আমরা কিছুক্ষণ ঘরে থেকে, মহারাজের কথা শুনে সন্ধ্যা হ'লে তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। উনি বার বার ক'রে ব'লে দিলেন, 'সারগাছি আশ্রমে বেড়াতে যেও, আর নিয়ম-মত চিঠি দিও।' আমার সঙ্গে এই ওঁর শেষ কথা বলা।

সারগাছিতে আমি চিঠি দিতাম, মহারাজও আমাকে চিঠি দিতেন। অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তখন আর আমার সারগাছি যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি, অনেক পরে গিয়েছি। শায়িত অবস্থায় মহারাজকে বেলুড় মঠে আনা হয়, সেখানেই তাকে শেষ দর্শন করি। আজ তিনি দেহে নেই, কিন্তু তাঁর সীমাহীন কৃপা ও স্নেহই জীবনের পাথেয় হ'য়ে রয়েছে।

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

যাচ্ঞাদৈন্যদূষণম্

বিষয়ই যাচ্ঞাজনিত দীনতার হেতু। অতএব বিষয়-পরিত্যাগবিড়ম্বনা বর্ণনানন্তর পরবর্তী দশটি শ্লোকে ভর্তৃহরি 'যাচ্ঞাদৈন্য' নিন্দা করিতেছেন :

দীনা দীনমুখৈঃ সদৈব শিশুকৈরাকৃষ্টজীর্ণাম্বরা
ক্রোশদ্ভিঃ ক্ষুধিতৈর্নিরন্নবিধুরা দৃশ্যা ন চেদ্‌গেহিনী।
যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদ্‌গদগলৎ ত্রুট্যদ্বিলীনাক্ষরং
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী পুমান্॥২১॥

করুণ শুষ্কমুখ ক্ষুধাতুর রোরুদ্যমান শিশুবৃন্দ জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে—এমন দরিদ্র নিরন্ন দুঃখবিহ্বল গৃহিণী যদি দৃষ্টিগোচর না হইত, তবে কেবল আপন দগ্ধোদর পূরণ করিবার জন্য কোন্ মনস্বী ব্যক্তি যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যানের ভয় থাকা সত্ত্বেও জড়ীভূত কণ্ঠনির্গত গদ্‌গদবাক্যে খণ্ডিত ও অনুচ্চারিত-প্রায় 'দেহি' (দাও) এই শব্দ উচ্চারণ করিতে স্বীকৃত হইতেন? অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রের জন্য সব কিছুই করিতে হয় ও বলিতে হয়, অতএব উহাই বন্ধন।২১

অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্রভেদপটীয়সী
গুরুতরগুণগ্রামাম্ভোজস্ফুটোজ্জ্বলচন্দ্রিকা।
বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিতানকুঠারিকা
জঠরপিঠরী দুষ্পূরেয়ং করোতি বিড়ম্বনম্॥২২॥

কবি এখন সর্ব অনর্থের মূল জঠরের নিন্দা করিতেছেন : এই দুষ্পূরণীয় জঠর-পাত্রই সর্বপ্রকার বিড়ম্বনার কারণ, ইহা আমাদের অতি প্রিয় আত্মসম্মান নষ্ট করে। চন্দ্রালোকে যেমন পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, যাচ্ঞা করিলে সেইরূপ আমাদের গুণগুলি সঙ্কুচিত হয়, আমাদের লজ্জারূপ লতার কুঠার সদৃশ এই যাচ্ঞা। ২২

পুণ্যে গ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছন্নপালিং কপালিম্
হ্যাদায় ন্যায়গর্ভ-দ্বিজহুতহুতভুগ্-ধূমধূম্রোপকণ্ঠে।
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টো বরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্তো
মানী প্রাণৈঃ সনাথো ন পুনরনুদিনং তুল্যকুল্যেষু দীনঃ॥২৩॥

অখিল শাস্ত্রে বিশারদ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আহুত যজ্ঞাগ্নির ধূমে যাঁহাদের দ্বারপ্রান্ত মলিন হইয়া থাকে, এমন সব ব্রাহ্মণের পবিত্র গ্রামে বা বানপ্রস্থীর বনাশ্রমে প্রতি কুটীরের দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার্ত হইয়া উদরগহ্বর পূরণ করিবার জন্য যে মানী পুরুষ শুভ্রবস্ত্রখণ্ডাবৃত ভিক্ষাপাত্রহস্তে প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাশনে প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিও বরং ভাল; কিন্তু তথাপি স্বজনগণের নিকট হীন হওয়া (দীনতা প্রকাশ করা) উচিত নহে। ২৩

আয়াসলভ্য পরপিণ্ড ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করা অপেক্ষা তপোভূমি হিমাচলের অরণ্যে বাসও শ্রেয়ঃ—ইহাই এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে :

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি বিদ্যাধরাধ্যুষিত-চারুশিলাতলানি।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি যৎ সাবমানপরপিণ্ডরতা মনুষ্যাঃ ॥২৪॥

গঙ্গাতরঙ্গবিক্ষিপ্ত স্থূল সূক্ষ্ম বারিকণা দ্বারা সুশীতল ও বিদ্যাধরগণ কর্তৃক অধ্যুষিত (অধিষ্ঠিত) মনোহর শিলাপৃষ্ঠযুক্ত হিমাচলের শান্ত সুপবিত্র স্থানসকল কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে? (অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিবার এমন বহু রমণীয় স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে); তবে কেন মানুষ শত অপমান সহ্য করিয়াও পরপ্রদত্ত অন্নের জন্য সচেষ্ট হয়?২৪

অনায়াসলভ্য কন্দ-ফল-মূলাদি বিদ্যমান থাকিতে কেবল জীবনধারণের নিমিত্ত খল ব্যক্তিগণের আরাধনা করা কখনই উচিত নহে, তাই কথিত হইতেছে:

কিং কন্দাঃ কন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা নির্ঝরা বা গিরিভ্যঃ
প্রধ্বস্তা বা তরুভ্যঃ সরসফলভৃতো বল্কলিন্যশ্চ শাখাঃ।
বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং
দুঃখাপ্তস্বল্পবিত্তস্ময়-পবনবশানর্তিতভ্রূতলানি ॥২৫॥

গিরিকন্দরসমূহ হইতে কন্দমূলাদি কি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে? স্বচ্ছসলিলা পার্বত্য নির্ঝরিণী সকলও কি অন্তর্হিত হইয়াছে? অথবা বৃক্ষসমূহ হইতে মধুর ফলভারনত ও বল্কলবিশিষ্ট শাখাগণও কি একান্ত অলভ্য হইয়াছে? অর্থাৎ হয় নাই। তাহা হইলে (ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির এবং পরিধেয় প্রাপ্তির জন্য প্রকৃতি-প্রদত্ত এমন সুযোগ যখন বিদ্যমান অর্থাৎ অনায়াসলভ্য এমন ব্যবস্থা থাকিতে) স্বার্থান্ধ মানব একান্ত দুর্বিনীত খলব্যক্তিগণের দুঃখলব্ধ-স্বল্পধনজনিত অহঙ্কাররূপ পবনচালিত কুঞ্চিতভ্রূ মুখমণ্ডল দর্শন করে কেন অর্থাৎ তাহাদের মুখাপেক্ষী হয় কেন?২৫

পুণ্যৈর্মূলফলৈস্তথা প্রণয়িনীং বৃত্তিং কুরুষ্বাধুনা
ভূশয্যাং নবপল্লবৈরকৃপণৈরুত্তিষ্ঠ যাবো বনম্।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকমূঢ়মনসাং যত্রেশ্বরাণাং সদা
বিত্তব্যাধিবিকারবিহ্বলগিরাং নামাপি ন শ্রূয়তে ॥২৬॥

দীর্ঘকাল দুর্বিনীত-খলসেবায় খেদযুক্ত কোন ব্যক্তির নির্বেদ-বচন অভিনয়পূর্বক বিবৃত হইতেছে: (হে প্রিয় সখে!) এখন পবিত্র ফলমূলের দ্বারা পরমসুখাবহ জীবিকা অবলম্বন কর ও অম্লান নবপল্লবরচিত ভূশয্যা রচনা কর। ওঠ, আর বিলম্ব করিও না; চল, আমরা সেই বনে যাই, যেখানে কর্তব্যাকর্তব্য বিচারহীন মূঢ়চিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও বিত্তরূপব্যাধিজনিত বিকারবশতঃ প্রলাপভাষী রাজাদিগের ও ধনবান্‌গণের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।২৬

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥২৭॥

প্রতিবনে বিনাক্লেশে স্বচ্ছন্দলভ্য (উদর-পূরণের জন্য পর্যাপ্ত) বৃক্ষফল বিদ্যমান, (তৃষ্ণা নিবারণার্থ) স্থানে স্থানে গঙ্গাসিন্ধু-আদি পবিত্র নদীসমূহের সুমধুর ও সুশীতল জলেরও অভাব

নাই, এবং মনোহর লতাপল্লববিরচিত কোমল শয্যাও সর্বত্রই সুলভ; কিন্তু অহো! কি আশ্চর্য, তথাপি ধনলিপ্সু ব্যক্তিগণ ধনীদিগের গৃহদ্বারে ধনলোভে সমাগত হইয়া কতই না লাঞ্ছনা ও সন্তাপ সহ্য করিয়া থাকে।২৭

যে বর্তন্তে ধনপতিপুরঃ প্রার্থনাদুঃখভাজো
যে চাল্পত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্যাপ্তবুদ্ধেঃ।
তেষামন্তঃস্ফুরিতহসিতং বাসরাণি স্মরেয়ম্
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ ॥২৮॥

খলজনের সেবা ও তাহাদের নিকট যাচ্ঞাপ্রসূত দৈন্যযুক্ত এবং বিষয়াসক্ত জনগণের নিন্দা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বকীয় ভাবী শ্রেয়োদশার সূচনা করিতেছেন: ধনবান্‌দিগের সমীপে যাচ্ঞাদুঃখ-ভোগীদের যে দিনগুলি অতিবাহিত হয়, ভোগ্যসংগ্রহে পর্যবসিতচিত্ত পুরুষগণ বহু নীচতা স্বীকার করিয়া যে দিনগুলি নষ্ট করে, ধ্যানাবসানে গিরিগহ্বরে পাষাণ-শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ কালে অন্তরুদ্ভূত উপেক্ষাপ্রসূত হাস্যসহকারে তাহাদের সেই দিনগুলি আমি স্মরণ করিব।২৮

যে সন্তোষনিরন্তরপ্রমুদিতাস্তেষাং ন ভিন্না মুদো
যে ত্বন্যে ধনলুব্ধসংকুলধিয়স্তেষাং ন তৃষ্ণা হতা।
ইত্থং কস্য কৃতে কৃতঃ স বিধিনা কীদৃক্ পদং সম্পদাং
স্বাত্মন্যেব সমাপ্তহেমমহিমা মেরুর্ন মে রোচতে ॥২৯॥

তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়া কঠিন সুতরাং বৃথা যাচ্ঞাদৈন্যের কি প্রয়োজন? ইহাই অগ্রে কথিত হইতেছে: যথাপ্রাপ্ত বস্তুতেই যাহাদের সন্তোষ সদা বিদ্যমান এমন পুরুষগণের আনন্দ কখনই নষ্ট হয় না (সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়); পুনঃ ধনলোভে ব্যাকুলচিত্ত পুরুষগণের ভোগতৃষ্ণারও কখন নিবৃত্তি হয় না (বরং দিন দিন অধিকই হয়)। এরূপ অবস্থায় অপরিমিত ধনসম্পদের আস্পদরূপে প্রসিদ্ধ যে কাঞ্চনময় মেরুপর্বত, যাহাতে সুবর্ণের গৌরব পর্যবসিত হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মা কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? (কারণ সন্তোষী পুরুষের মনে আনন্দলাভ বা লোভী ব্যক্তির তৃষ্ণাক্ষয়, ইহার কোনটিই উহা দ্বারা সাধিত হয় না)। এরূপ মেরুপর্বত আমার নিকট রুচিকর মনে হয় না।২৯

ভিক্ষাহারমদৈন্যমপ্রতিসুখং ভীতিচ্ছিদং সর্বতো
দুর্মাৎসর্যমদাভিমানমথনং দুঃখৌঘবিধ্বংসনম্।
সর্বত্রান্বহমপ্রযত্নসুলভং সাধুপ্রিয়ং পাবনং
শম্ভোঃ সত্রমবার্যমক্ষয়নিধিং শংসন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৩০॥

তাহা হইলে জীবনধারণ কি প্রকারে হইবে, ইহার উত্তরে তদুপায় নিরূপণ করত বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইতেছে: ভিক্ষা করায় দৈন্য নাই; ভিক্ষান্নভোজন নিরতিশয় সুখের জনক, সর্বপ্রকার ভীতিশূন্য, দুষ্টমাৎসর্যগর্বাদি বিলয়কারী, সর্ব সংসার-দুঃখের নিবর্তক, সর্বত্র সর্বদা সুখলভ্য, সাধুগণের প্রিয় এবং পবিত্র; ইহা শিবের অক্ষয় অনিবার্য ভাণ্ডার ও তাঁহার পরমপ্রিয় সদাব্রত—পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মহাযোগীশ্বরগণ ভিক্ষান্নকে এইরূপে স্তুতি করিয়া থাকেন।৩০

প্রাচীন ভারতের প্রতিভা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

১৯৫৬ খৃঃ চীন দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক লিন্ যুটাং (Lin Yutang) ইংরেজীতে 'The Wisdom of India' শীর্ষক একখানি পুস্তক সংকলন করিয়াছেন। উহাতে ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, পাতঞ্জল যোগসূত্র, রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্র, ধর্মপদ, বুদ্ধের বাণী, গল্প, পৌরাণিকী কথা, সুরঙ্গম-সূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করিতেছেন:

আমি খুবই সন্দেহ করি যে সাধারণ পাঠকশ্রেণী হয়তো জানেন না যে ভারতবর্ষও চীন দেশের মতো কি সংস্কৃতিতে, কি কল্পনাপ্রসূত সুবৃহৎ সাহিত্যে, কি হাস্যরসসম্বলিত কাহিনীতে অতিশয় সমৃদ্ধ। ধর্ম এবং কল্পনাপ্রসূত সাহিত্যে ভারতবর্ষ চীন দেশের গুরু। ত্রিকোণমিতি, দ্বিঘাতসমীকরণ, ব্যাকরণ, ছন্দ, উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, অক্ষক্রীড়া এবং দর্শনে সমগ্র পৃথিবীর গুরু। শুধু তাই নয়, বোকাচিও (Boccaccio), গ্যেটে (Goethe), হার্ডার (Harder), শোপেনহর (Schopenhauer), এমার্সন (Emerson) এবং সম্ভবতঃ বৃদ্ধ ঈশপ (Æsop)-কেও জ্ঞানের প্রেরণা দিয়াছে ভারতবর্ষ।[১]

ভূমিকায় গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন যে ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ধর্ম ও দর্শনে ভেদ নাই। চীন দেশে দর্শন ও ব্যাবহারিক নীতিতে যেমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, ভারতে সেইরূপ ধর্ম ও ঈশ্বরানুভূতিতে সুদৃঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। এই প্রসঙ্গে লিন্ যুটাং বলেন যে ভারতবর্ষ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে ধর্মের চর্চা খুব বেশী, সেই অনুপাতে চীন দেশে খুব কম। ভারত হইতে আগত সামান্যমাত্র আধ্যাত্মিকতা চীনকে ভাসাইয়া সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে প্লাবিত করিয়াছে।[২]

ঋগ্বেদ হইতে কিছু মন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার পূর্বে উপক্রমণিকায় লিন্ যুটাং বলেন যে হিন্দুরা স্বভাবতই ঈশ্বরপরায়ণ এবং ভারতবাসী ঈশ্বর লইয়া উন্মত্ত। কেহ যদি ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পড়িয়া উপনিষদ্গুলি অধ্যয়ন করে এবং (৫৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দে) ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থগুলির অনুধাবন করে, তাহারই এই ধারণা হইবে।[৩]

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের প্রতিভার কথা আলোচনা করা যাক্। বহু শিক্ষিত ভারতবাসীর স্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়া এই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা প্রয়োজন।

১ I strongly suspect that the average reader does not know that India has as rich a culture, as creative an imagination and wit and humour as any China has to offer, and that India was China's teacher in religion and imaginative literature.
—The Wisdom of India, Page 11

২ But it is evident that India is a land overflowing with religion and with the religious spirit. India produced too much of religion, and China too little. A trickle of Indian religious spirit overflowed to China and inundated the whole of Eastern Asia.—Ibid Page 14.

৩ India is a land.........intoxicated with God. This is the impression of anyone who reads through the Hymns from the Rigveda, and follows through the Upanishads to the arrival of Buddha in 563 B.C.—Ibid Page 19.

হিন্দুগণ ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Theory of Evolution) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম চিন্তা করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক হাক্সলি (Huxley) বলেন, পলের (Paul of Tarsus) জন্মের বহু পূর্বে হিন্দু ঋষিগণ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা পাকা করিয়াছিলেন।

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া স্যর মনিয়ার উইলিয়ামস্ (Sir M. Monier Williams) বলেন যে ডারউইন (Darwin) জন্মিবার বহু শত বৎসর পূর্বে হিন্দুরা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে স্পিনোজা (Spinoza)র জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বেই হিন্দুরা তাঁহার নামে প্রচলিত দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। চেম্বারলেন (Houston Chamberlain) পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে পাণিনি পৃথিবীর প্রথম বৈয়াকরণ।

পতঞ্জলি যোগসূত্র প্রণয়ন করিয়া পৃথিবীতে এক অভিনব সাধনার পথ প্রদর্শন করেন; বর্তমান যুগ পর্যন্ত সেগুলি আদরণীয় বস্তু হইয়া আছে।

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতে গিয়া সিস্টার নিবেদিতা বলিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতে নির্জন স্থানে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে আশ্রমবিদ্যালয়গুলিতে ঋষিগণ যে যোগসাধনার গবেষণা করেন, বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহার অপূর্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পতঞ্জলির যোগসূত্র সেই প্রাচীন বিদ্যার অন্যতম অত্যাশ্চর্য প্রমাণস্বরূপ হইয়া আছে। গুপ্তদের সুবর্ণযুগের কথা, যাহা আমরা ৩০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসে পাই—তাহার অধিকাংশই এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানাভ্যাসেরই ফল। প্রাচীন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি আমাদের চিন্তা করা দরকার। ভারতীয় জ্ঞান-বারি পান করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য শুধু যে ফাহিয়ান (৪০০ খৃঃ) এবং হিউয়েন সাং (৬৫০ খৃঃ) ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে বর্ণিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই জন্যই আমরা পূর্ব এশিয়ার এই দুইটি ছাত্রের নাম পাই। তাঁহাদের সঙ্গে, পূর্বে বা পরে নানা স্থান হইতে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে ভারতে আসিয়াছিলেন।[৪]

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে গিয়া ভূমিকাতে বলিয়াছিলেনঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু প্রতিভার বিকাশ নানাদিক দিয়া হইয়াছিল। সব দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতে কোন দেশ অতটা উন্নত ছিল না।

খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট্ট সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর আবর্তনই দিবারাত্রির কারণ; খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য নিউটনের (১৭শ শতাব্দী) পূর্বে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির জন্য ঊর্ধ্ব হইতে বস্তুসকল নিম্নে পতিত হয়, ইহা আবিষ্কার করেন। হিন্দুগণ ১ হইতে ৯ পর্যন্ত গণনা এবং শূন্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। দশমিক পদ্ধতি (Decimal system) হিন্দুরা আবিষ্কার করেন। পাটীগণিত (Arithmetic) এবং বীজগণিত (Algebra) হিন্দুদের নিকট আরবেরা শিক্ষা করেন। তারপর এগুলি পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়। ভাস্করাচার্য নিউটনের পূর্বে ব্যাসকলনের (Differential Calculus) মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির (Geometry) চর্চা বৈজ্ঞানিক ভাবে হিন্দুরাই সর্বপ্রথম করেন। অবশ্য পরে

[৪] Footfalls of Indian History, Page 34

গ্রীকরা ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ডক্টর ঘোষ বলেন : আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত (৭ম শতাব্দী) ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, যেগুলি ইওরোপে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দুরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও সূত্রপাত করেন। প্রাচীনকালে হিন্দু চিকিৎসকেরা সমস্ত এশিয়া খণ্ডে এবং মিশরেও চিকিৎসা করিতে যাইতেন। হিন্দুরা সর্বপ্রথম সোনা আবিষ্কার করেন। লোহা এবং ইস্পাত তৈরী বিষয়ে হিন্দুরা সব চেয়ে উন্নতি লাভ করেন। ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny, ১ম শতাব্দী) বলেন যে ভারতবর্ষেই ভাল কাচ তৈরী হইত। ভূগর্ভ হইতে হিন্দুরা রত্নাদি সংগ্রহ করিতেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা জাহাজে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের নানা দেশে যাইতেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাকডোনেল (Macdonell) সাহেব তাঁহার বিখ্যাত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' স্পষ্টই লিখিয়াছেন : সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা মৌলিক চিন্তা-রাশিতে পূর্ণ। যখন গ্রীকরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন, তাহার বহু পূর্বে ভারতীয়েরা তাঁহাদের জাতীয় কৃষ্টি সুগঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত কৃষ্টিতে কোন বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। তারপর পারসিকেরা, গ্রীকরা, সিথিয়ানরা, মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করে। পরাধীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় আর্যদের জীবন ও সাহিত্যের গতি বৃটিশরাজ্য স্থাপনের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইন্দো-ইওরোপীয় জাতির কোন শাখা এই ভাবে পৃথক্ সত্তা বজায় রাখিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। একমাত্র চীন দেশ ছাড়া কোন দেশ তিন সহস্রাধিক বৎসর অবাধ গতিতে তাহার ভাষা এবং সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপ্রথা, নাটকীয় এবং সামাজিক রীতিনীতি অব্যাহত রাখিতে পারে নাই।[৫]

পাশ্চাত্য দার্শনিক শোপেনহর (Schopenhauer) উপনিষদ্ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন : জীবিতকালে উপনিষদ্ আমায় স্বস্তি দান করিয়াছে এবং মৃত্যুর সময়ও ইহা আমাকে শান্তি দান করিবে। এই কথার উপর মোক্ষমূলর (Maxmuller) মন্তব্য করিয়াছেন : শোপেনহরের মতো দার্শনিক যা তা লিখিবার লোক নহেন এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বাণীতে একেবারে নিজেকে পরিপ্লুত করিবার ব্যক্তিও নহেন। আমি তাঁহার বাণীতে যে উৎসাহ দেখি, ইহার অংশ গ্রহণ করিয়া বলিতে চাই যে আমি বেদান্তের কাছে জীবনের অনেক সহায়তা পাইয়াছি বলিয়া ইহার নিকট ঋণী। আমি বেদান্তের পুস্তক পাঠ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সুখে কাল কাটাই। আমি বেদান্তের বাণী প্রভাতের স্নিগ্ধ রশ্মির মতো, পর্বত-প্রদেশের পবিত্র বায়ুর মতো উপভোগ করি। একবার হৃদয়ঙ্গম করিলে উহা এত সহজ ও এত সত্য বলিয়া মনে হয়।[৬]

বিশ্বের বিরাট ইতিহাস ও নানা জাতির নানা সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে ভারতীয়গণের অমৃত-ধারা জগতের কৃষ্টিতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। এক আত্মা, এক সত্তার মহিমময়ী বাণী ভারতকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য বহু সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বর্তমান জগতে যে সমস্যাগুলি মানুষের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন, দলিত মথিত এবং ব্যথিত করিতেছে, সেগুলির সমাধান ঐ অমৃতধারায় সিক্ত করিলে বর্তমান মানুষ যে শান্তির সন্ধান পাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[৫] History of Sanskrit Literature—Macdonell

[৬] I spend my happiest hours in reading Vedanta books. They are to me like the light of the morning, like the pure air of the mountains—so simple, so true, if once understood. —Maxmuller

মধ্যভারত-পরিক্রমা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসাক

চিত্রকূটের কাছে বিদায় নিয়ে চললাম 'পেণ্ড্রা' অভিমুখে, ওখান থেকেই 'অমর-কণ্টক' যেতে হবে। 'পেণ্ড্রা' পৌঁছে ধর্মশালায় মালপত্র রেখে বাসের খোঁজ করতে গিয়ে তো চক্ষুস্থির! অমরকণ্টকে যাবার বাস চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ। উপায়? আশানৈরাশ্যে মন তোলপাড় হ'য়ে গেল। অবশেষে দৈব বুঝি সহায় হ'ল। জনৈক ঘোড়াওলা দুটি ঘোড়ায় মালপত্র সমেত আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হ'ল অমরকণ্টক পর্যন্ত। যাতায়াতের ভাড়া ঠিক হ'ল ২৪৲। তাতেই রাজী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সকালবেলা দুটি ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে তারই ওপর চ'ড়ে আমরা রওনা হলাম। টাঙ্গার ঘোড়া মানুষ বা মালের ভার বইতে অভ্যস্ত নয়। তারা চলতেই চায় না। ঘোড়াওলা যদিও ঘোড়া হাঁকাবার জন্য পাশে পাশে চলছিল এবং মুখে নানাপ্রকার ইঙ্গিত ক'রে ঘোড়া-দুটিকে বেত্রাঘাত করছিল, কিন্তু বৃথা। তারা ঠিক নিজেদের খেয়ালে ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগল। এইভাবে দীর্ঘ ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে! খানিক বাদেই শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থিতে বেদনা শুরু হ'ল। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা দায় হ'য়ে উঠল। আমার বন্ধু সে কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ঘোড়া থেকে নেবে হাঁটতে শুরু ক'রে দিয়েছেন।

যতদূর চোখ যায় বরাবর সোজা রাস্তা, দিগন্তপ্রসারী পাহাড়েই দৃষ্টি ব্যাহত হয়। রাস্তার দুপাশে নানাপ্রকারের গাছ; তার মধ্যে হরীতকী, আমলকী গাছের আধিক্য। বিশেষ ক'রে আমলকী গাছগুলিতে থোলো থোলো আঙুরের মতো অজস্র আমলকী ধ'রে রয়েছে। আর কামরাঙা গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ কামরাঙা শোভা পাচ্ছে। ফলগুলি এখনও পাকেনি, হাতের বাহিরে থাকায় মানসিক রসাস্বাদনেই তৃপ্ত থাকতে হ'ল। যেতে যেতে কয়েকটি খরস্রোতা ঝরনা পার হ'তে হ'ল। ঘোটকের পদক্ষেপের ফলে জলের ছিটে লেগে বিছানার কিছুটা ভিজে গেল। আরও অগ্রসর হবার পর আরম্ভ হয় দুপাশে গভীর জঙ্গল—লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। জনমানবের বসতি দেখা যায় না—কদাচিৎ দু-একটি রাখালকে গো-মহিষের পাল নিয়ে যেতে দেখা যায়। জন-বিরল এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে বেশ ভয় হচ্ছিল। কোন বন্য জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাবের আশঙ্কায় গা ছম্‌ছম্‌ করে।

সোজা রাস্তা ছেড়ে পাকদণ্ডীর রাস্তা ধরল ঘোড়াওলা। পাহাড়ের গা দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ সরীসৃপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে। ভীষণ পিছল এই পথ, কারণ পর্বতগাত্রে নিঃসৃত জলের ধারা এই পথের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এ হেন বিপৎসঙ্কুল পথে আনবার জন্য ঘোড়া-ওলাদের ভর্ৎসনা করলাম। চারিদিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গল—দু-হাত তফাতের মানুষকে দেখা যায় না। দিনের আলো ভাল ক'রে প্রবেশ করে না, এমন স্থান দিয়ে যেতে হচ্ছে। সঙ্কীর্ণ রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁটাগাছও রয়েছে। প্রতিপদে গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হবার সম্ভাবনা। কোথাও পাথরের বড় বড় চাঁই পথের দুপাশ থেকে পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করেছে। একবার এর ভেতর দিয়ে যেতে বিছানা আটকে রয়ে গেল—ঘোড়া এগিয়ে গেল। আবার বিছানাটিকে তুলে

ঘোড়ার পিঠে বসানো হ'ল। পাথরের ঘর্ষণে বিছানার হোল্ডলটি ছিঁড়ে গেল। বলা বাহুল্য, অনেক আগেই ঘোড়া থেকে নেবে পড়েছি। খাড়া চড়াইপথে আসতে আসতে এরই মধ্যে ঘেমে উঠেছি। উপরন্তু, এই পিছল পথে অসংলগ্ন পাথরের ওপর ভারসাম্য বজায় রেখে চলা খুবই দুরূহ। বহু কষ্ট সহ্য ক'রে পরিশ্রান্ত দেহে যখন অমরকণ্টকে পৌঁছাই, তখন বেলা প্রায় বারোটা। নর্মদার হিমশীতল জলে স্নান সেরেই নর্মদাদেবীর মন্দিরে গিয়ে দেখি, দ্বার রুদ্ধ। বিকালে মন্দির খুললে দর্শন হবে। রমাবাঈ-এর ধর্মশালায় আশ্রয় নিই।

বিকালে নর্মদাদেবীর দর্শন হ'ল। দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই শিবমন্দির। চত্বরে আরও কয়েকটি মন্দির রয়েছে—লক্ষ্মী, নারায়ণ, সূর্যদেব, হর-পার্বতী প্রভৃতির মূর্তি। প্রধান মন্দিরের পাশেই নর্মদাকুণ্ড। বড় পবিত্র এই কুণ্ড। এখানে শুধু স্নান করতে দেওয়া হয়; বস্ত্রাদি ধৌত করার জন্য অন্য স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে।

নর্মদার উৎস এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, শোন-মুড়া নামক স্থানে। দু-পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। 'শোন-মুড়ায়' পৌঁছে ক্ষীণকায়া একটি পার্বত্য ঝরনা দেখা যায়। ঝরনাটি হাজার ফুট নীচে নেমে এসে, নর্মদা নামে দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত।

রাত্রিটা ধর্মশালায় কাটিয়ে পরদিন ফেরার পালা। পাকদণ্ডী রাস্তা ধ'রে আর যাবার ইচ্ছে নেই। বড় রাস্তা ধ'রে যাব, দেরি হয় হ'ক। ঘোড়াওলা কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়। বড় রাস্তা ধ'রে গেলে, অনেক ঘুরে যেতে হবে—সে আপত্তি জানায়। অবশেষে আবার সেই সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ ধরেই ফিরতে হ'ল। আবার সেই ভয়াবহ পথ—প্রতিটি পা সন্তর্পণে ফেলতে হচ্ছে। ঘোড়া-দুটির একটি পিছলে পড়ে যাওয়ায় পায়ে বেশ চোট লাগে। ঘোড়াওলা টেনে তোলে তাকে, তারপরেই শুরু হয় অশ্রাব্য গালিবর্ষণ। এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার বন্ধুবরের ঘোড়াটি পাথরে হোঁচট খেল। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে হোল্ডল ছিঁড়ে গেল। সে তো রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ঘোড়াওলাকে সম্বোধন ক'রে বললে, 'বেকুব ঘোড়সওয়ার!' বন্ধুর হিন্দীজ্ঞান টনটনে। কথাটির প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে তো হেসে খুন। ঘোড়া-দুটিকে পেটাতে পেটাতে যখন স্টেশনে (পেণ্ড্রা) এসে পৌঁছলাম, তখন ট্রেন আসবার সময় হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিতে নিতেই ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেনে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

রাত দশটায় জব্বলপুর পৌঁছে আধুনিক রুচিসম্মত একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। সকালে উঠেই মার্বেল-রক দেখতে যাব মনে ক'রে বাসের খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, 'ভেড়াঘাট' পর্যন্ত বাস যাবে। বাসে ঘণ্টাখানেক লাগলো। সেখান থেকে অনতিদূরেই নর্মদা ও মার্বেল-রক। বহুদিন থেকেই শুনে এসেছি মার্বেল-রকের কথা—মানসচক্ষে ছিল এর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু চাক্ষুষ যখন দেখলাম, তখন বুঝলাম যে মনের ছবির চেয়ে বাস্তব অনেক বেশী সুন্দর। কি অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য!

নর্মদার দু-পাশে জল থেকে খাড়া উঠে গেছে অমল ধবল মর্মর পর্বতশ্রেণী। তার উপর সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত হ'য়ে এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। সৌন্দর্যপিয়াসী মন নানাভাবে সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করতে চায়। তাই মার্বেল-রকের চূড়ার উপর থেকে দু-পাশের শুভ্র পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে পাহাড় থেকে নেবে একটি নৌকা ক'রে নর্মদার শান্ত বক্ষে ভেসে যাই।

দু-পাশে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র পর্বত-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে নৌকা চলেছে; উপরে নীল নভোমণ্ডল—খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ ভেসে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে মার্বেল-রকেরই এক একটি মায়াময় টুকুরো; সবকিছু নিয়ে এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। নৌকায় বেড়ানোর পর নর্মদার তীর ধ'রে হেঁটে চলি নর্মদা-ফল্‌স্ (প্রপাত) দেখতে। এই জায়গায় নদীর জলরাশি অনেকটা উঁচু থেকে নীচে সবেগে প'ড়ে গভীর আবর্তের সৃষ্টি করেছে। বিক্ষুব্ধ জলরাশি বহুধা বিভক্ত হ'য়ে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর সেই আবর্তের মধ্যে জল পড়ার ফলে উর্ধ্বে উত্থিত ফেনপুঞ্জ দূর থেকে 'ধূম' ব'লে প্রতীতি হয়। এরই জন্য এর নাম 'ধূমধারা'; এরই গর্জন বহুদূর থেকে শ্রুতিগোচর হয়।

প্রপাত দেখে 'বাঙ্গালী হোটেলে' এসে বিশ্রাম ক'রে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করলাম। এই হোটেলের মালিকের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হ'তে হয়। যাত্রীদের খাতায় (Visitors' Book) দেখি বহু বঙ্গনরনারীর নর্মদা-দর্শনের পর ভাবময় উচ্ছ্বাস। সকলেই হোটেলের মালিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখতে পেলাম এই খাতাটিতে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হলাম। খাতার পাতাটি জীর্ণ হ'য়ে গেছে, কিন্তু স্বাক্ষরটি আজও জলজ্বল করছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নামটিও মালিক সাগ্রহে দেখায়।

সন্ধ্যার বাসে জব্বলপুরে ফিরে পরদিন বিকালের ট্রেনে ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাত্রি তিনটা আন্দাজ স্টেশনে পৌছে গাড়ী বদল ক'রে ভোরের দিকে ওঁকারেশ্বর রোড পৌছলাম। মালপত্র স্টেশনের কাছে একটি ধর্মশালায় রেখে বাসে 'মান্ধাতা' নামক গ্রামে পৌছই। একটু হাঁটবার পর নদীর ধারে এলাম।

আবার সেই নর্মদা। তবে এখানে নর্মদা গভীর ও বিস্তৃত। দূরে দেখা যায়—পাহাড় ও জঙ্গল। নদীর অপর পারে পরম পবিত্র ওঁকারেশ্বরের মন্দির। পাশেই রয়েছে একটি সুবৃহৎ ধর্মশালা। নৌকায় নর্মদা পার হ'য়ে স্নানাদি শেষ ক'রে মন্দিরে এলাম। স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের সামনে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় ক'রে দিয়ে প্রণতি জানাই। কোন পাণ্ডার হট্টগোল নেই। শিবলিঙ্গের সামনে উপবিষ্ট জনৈক পুরোহিত; ভক্তদের পূজা দেবার সময় সাহায্য করে, কোন দাবীদাওয়া নেই।

স্বয়ম্ভুলিঙ্গের সামনে জলে পিলসুজের উপর একটি প্রদীপ। নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা মন্দিরের নীরবতা যেন আরও বাড়িয়ে তোলে; একটা আধ্যাত্মিক ভাব যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ব'লে অনুভব করা যায়। প্রাণ ভরে পূজা করলাম; পূজার উপচার নর্মদার জল আর বিল্বপত্র। পূজা সমাপনান্তে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়াই। সামনেই একটি দোকানে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে এপারে ফিরে এলাম।

ইন্দোর অভিমুখে একটি বাস অবিলম্বে ছাড়বে শুনেই উঠে পড়লাম। যাবার পথে ধর্মশালায় রাখা মালপত্র তুলে নিই। বিকালের দিকে ইন্দোর এসে পৌছই।

ইন্দোরের প্রধান দ্রষ্টব্য—কাঁচমহল বা 'শীসমহল'। জৈন সম্প্রদায়ের অভিনব এই অট্টালিকার ভেতরের অংশ সমস্তই কাঁচ দিয়ে তৈরী। মেজে, দেওয়াল, ঘরের ছাত, স্তম্ভ প্রভৃতি সকলের উপর নানা রঙের কাঁচ বসানো, আর সেই কাঁচের ওপর নানা কারুকার্য। মহাভারতের আখ্যায়িকা, জৈন সম্প্রদায়ের প্রচলিত ধর্মের কাহিনী প্রভৃতি কাঁচগুলির উপর সুন্দররূপে অঙ্কিত। শীসমহলের প্রবেশদ্বারে জুতা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।

সমস্ত ঘরে কাঁচের মেজের ওপর বিচরণ ক'রে চতুর্দিকে নিজের প্রতিবিম্ব বহুভাবে প্রতিফলিত দেখে চমৎকৃত হ'তে হয়। দ্বিতলে উঠেও সেই কাঁচের রাজ্য। পৃথক একটি কক্ষে জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। ব্রঞ্জ-নির্মিত মূর্তিগুলি আয়নায় বহুধা প্রতিফলিত।

কাঁচমহলের অনতিদূরে প্রাচীন হোলকার রাজাদের কয়েকটি স্মৃতিমন্দির রয়েছে 'ছত্রীবাগ' নামক স্থানে। এই মন্দিরগুলির ভিতর তদানীন্তন হোলকার রাজাদের মূর্তি ও সেই সঙ্গে একটি ক'রে শিবলিঙ্গ বর্তমান। রাণী অহল্যাবাঈ-এর মূর্তিও রয়েছে। আজ ছত্রীবাগ জঙ্গলে পূর্ণ, মন্দিরগুলি উপেক্ষিত, মূষিক ও আরশোলার বাসস্থানে পরিণত। দেখলেই মনে হয়, বহুদিন পরিষ্কারের কোন চেষ্টাই করা হয়নি। মানুষের 'অমর' হ'য়ে থাকবার ইচ্ছা ও চেষ্টা অনাদিকাল থেকে; স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি তারই জন্যে; কিন্তু কালের দুর্বার গতি রোধ করে, কার সাধ্য!

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে মানিকবাগ, লালবাগ নামকস্থানে মহারাজার প্রাসাদ। প্রাসাদের ভিতর সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। লালবাগের প্রশস্ত বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়া চলে, তবে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দূর থেকে রাজপ্রাসাদ দেখেই ফিরে যেতে হয়।

সকালের বাসে ইন্দোর ছেড়ে বেলা ১১টা আন্দাজ উজ্জয়িনী পৌঁছই। একটি গুজরাটি হোটেলে মালপত্র রেখে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ি। অতি প্রাচীন এই শহর—লোকের ঘন বসতি ও সরু সরু গলি বা রাস্তার আধিক্য দেখেই তা বোঝা যায়। শক্তি-উপাসনা এক সময় এখানে প্রাধান্য লাভ করেছিল—নানা শক্তিমূর্তি তার সাক্ষ্য প্রদান করে। তন্মধ্যে রাজা ভর্তৃহরির আরাধ্যাদেবী গড়-কালিকা ও রাজা বিক্রমাদিত্যের পূজিতা হরসিদ্ধি দেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ভূগর্ভ হ'তে প্রাচীন উজ্জয়িনীর বহু কিছু আজ আবিষ্কৃত হচ্ছে। বর্তমান নগরের কিছু দূরে খনন ক'রে পুরাকালের বসতির নিদর্শন-স্বরূপ বহু তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। সারনাথের মতো এখানেও ঘরবাড়ীর চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক উজ্জয়িনী আসল উজ্জয়িনী নয়; সে লুকিয়ে আছে ভূগর্ভে।

'ভর্তৃহরি কি গুম্ফা' মধ্যযুগের আর একটি কীর্তিচিহ্ন। কথিত আছে রাজা ভর্তৃহরি এই গুহায় ব'সে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মাটির নীচে অনেকদূর নেবে যেতে হয়; অন্ধকার স্বল্পপরিসর কক্ষে মাথা নীচু ক'রে প্রবেশ করতে হয়। অসাধারণ তপস্যার স্থানও অসাধারণ!

উজ্জয়িনীর ইতিহাসের প্রাচীনতম কথা বোধ হয়, সন্দীপন মুনির আশ্রম। বর্তমান লোকালয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত। কথিত আছে—এখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুদাম পাঠচর্চা করেছিলেন। মুনিবরের একটি মূর্তি রয়েছে এই আশ্রমে, আর তারই সামনে ছোট্ট একটু স্থান চিহ্নিত করা আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরুর কাছে পাঠাভ্যাস করতেন।

ভক্তদের কাছে উজ্জয়িনী তপস্যাক্ষেত্র। এখানে রয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ম্ভু শিব—মহাকালের মন্দির। পাশেই প্রবাহিত ক্ষিপ্রা (বা সিপ্রা) নদীর ধারে বহু ঘাট দেখে বারাণসীর কথাই মনে পড়ে। শহরতলীর মধ্যস্থলে গোপালজীর মন্দির অন্যতম আকর্ষণ; ভক্ত-সমাগম সব সময় লেগে আছে। রৌপ্য-নির্মিত গোপালমূর্তিটি সকলের মন হরণ করে।

শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে মানমন্দির ও কালীদহ প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহের সময়ে নির্মিত এই মানমন্দির 'যন্তর-

মহল' নামে খ্যাত। সূর্যের ছায়া অনুসরণ ক'রে সৌরজগতের নানা তথ্য সংগ্রহের বিধিব্যবস্থা রয়েছে। অজ্ঞাত জগতের তথ্য উদ্‌ঘাটনে মানুষের কৌতূহলী মন যে আবহমান কাল থেকে নিযুক্ত, তারই সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই সব স্থানে।

ক্ষিপ্রানদীর এক প্রান্তে নির্মিত কালীদহ প্রাসাদ সুলতানদের বিলাস-ভবনের নিদর্শন-স্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দ্বাররক্ষীর কাছে শুনি—কয়েকটি আসবাব ব্যতীত ভিতরে দর্শনীয় আর কিছুই নেই। নীরব পরিত্যক্ত প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক ভাবে অতীতের কথা। পাশেই প্রবাহিত ক্ষিপ্রার কলধ্বনিতে ভেসে আছে বহু পুরানো দিনের হাসিকান্নার কলগান; তারই কিছু কি ধরা পড়েছে কালিদাসের মহাকাব্যে ?

পরদিন ভূপাল। এখানকার সুন্দর বড় বড় হ্রদগুলি রাজস্থানের উদয়পুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাত্রে শহরের আলো হ্রদের জলে প্রতি-বিম্বিত হ'য়ে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। কমলাপার্ক, আয়েসবাগ প্রভৃতি রমণীয় উদ্যান-গুলি দর্শককে আকর্ষণ করে।

২৪ মাইল দূরে অবস্থিত ভোজপুর গ্রামের শিব-মন্দির অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। মুণ্ডীদ্বীপ বাসে এসে হাঁটা পথ ধরলাম। আলক্ষেতের উপর দিয়ে বহু ক্ষেতখামার ডিঙিয়ে ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। ঘণ্টা দুই হাঁটবার পর ১৪ মাইল দূরে এসে পৌছই ভোজপুর গ্রামে। এখানে এই বিখ্যাত শিবমন্দিরটি বহু দূর থেকেই দেখা যায়। মন্দিরের উপরিভাগের অংশটি ভেঙে পড়েছে। নীচে অতি বিশালাকার কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। লিঙ্গটি উচ্চতায় ৭´৪´´; আর তার পরিধি ১৭´৪´´। পাথরের মসৃণতা আজও অক্ষুণ্ণ। শিবলিঙ্গের গায়ে লাগানো একটি মই; তাই দিয়ে উঠে পূজার ফুল নিবেদন করতে হয়। আমরা আর মই বেয়ে উঠলাম না। বড় বিসদৃশ লাগল। নীচে থেকেই অন্তরের প্রণতি জানিয়ে মানসপূজা করলাম।

মুণ্ডীদ্বীপে ফিরে বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর একটি বাস পেয়ে ভূপাল পৌছলাম। রাত ১০টার গাড়ীতে রওনা হ'য়ে রাত ১১টায় সাঁচী পৌছই। স্টেশনের বিশ্রামাগার (Retiring room) খালি থাকায়, সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

সকালে সাঁচী-স্তূপগুলি দেখব মনে ক'রে বেরিয়ে পড়ি। মিনিট দশ হেঁটেই পৌছে গেলাম। ৩০০ ফুট্‌ উঁচু একটি পাহাড়ের উপর স্তূপগুলি ছড়িয়ে আছে। প্রধান বড় স্তূপটির ৪টি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত তোরণদ্বার। তোরণদ্বারগুলি পাথরের স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভগুলির উপর বহু জাতকের গল্প, বৌদ্ধযুগের ধর্মের ইতিহাসের আখ্যায়িকা অতি নিপুণভাবে খোদিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে শিল্পীর কীর্তি দেখে তদানীন্তন স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের কথা মনে করি। ধন্য সেই শিল্পিবর্গ, যারা পাথরের উপর রূপ দিয়েছে মনের ভাষাকে, প্রাণবন্ত করেছে অতীতের ঘটনাবলীকে।

স্তম্ভের বন্ধনীর কোণে দেখতে পাই যৌবন-দৃপ্তা যক্ষিণী। কালের প্রকোপে মূর্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুটা ভেঙে গেছে, কিন্তু যেটুকু রয়েছে, সেটুকুই শিল্পজগতে অনবদ্য। প্রতিটি স্তম্ভের উপর হস্তী ও বামনের মূর্তি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে স্থাপিত। অপূর্ব তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। প্রতিটি অঙ্গে যেন সজীবতা প্রকাশ পাচ্ছে। তোরণদ্বারের শীর্ষে শোভমান— বৌদ্ধ-যুগের প্রতীক ধর্মচক্র।

স্তূপের দুদিকে দুটি সিঁড়ি রয়েছে—স্তূপের মধ্যভাগে ওঠবার জন্যে। মধ্যভাগে গোলাকার সমতলভূমি—স্তূপের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করা যায়; শীর্ষদেশে ওঠা যায় না।

প্রধান স্তূপ ছাড়াও আরও ছোট ছোট কয়েকটি স্তূপ রয়েছে। অনতিদূরে দীর্ঘ অশোক-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখি। স্তম্ভশীর্ষ (capital) স্বতন্ত্রভাবে মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাতে সিংহচতুষ্টয়ের মূর্তিগুলি দর্শকের বিস্ময়ের বস্তু—বলদৃপ্ত সিংহের বিক্রম অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে প্রতিটি কুঞ্চিত কেশরদামে, গ্রীবার প্রতিটি পেশীতে।

নিকটেই বহু বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে। সারনাথের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত ঘরগুলি বিস্মৃতির গর্ভ থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে। সমস্ত জায়গাটিই একদিন বৌদ্ধ শ্রমণদের তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে পূত হ'য়ে উঠেছিল,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ তার নিদর্শন।

একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত বাটি (পাত্র) ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। কথিত আছে, এর মধ্য থেকে আহার্য ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের।

সারিপুত্ত ও মহামোদ্গালায়নের দেহাস্থি-সংরক্ষণের স্মৃতিসৌধ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি মহাসমারোহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উক্ত স্মৃতিসৌধের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

সাঁচীর অনতিদূরে অবস্থিত বিদিশা (অধুনা ভিল্‌সা) নামক স্থানে আসি। এখানে উদয়গিরিতে জৈন ও হিন্দুদের কয়েকটি গুহা আছে। অধিকাংশ গুহা শূন্য, ভিতরে কোন মূর্তি নেই। গুহাগুলির প্রায় সবই ভগ্নপ্রায়। পাথরে খোদিত তদানীন্তন প্রচলিত সংস্কৃত-ভাষায় কিছু কিছু লেখার পাঠোদ্ধার ক'রে পাওয়া গেছে : সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধজয়ের পর এই গুহা পর্যটনে আসেন। একটি গুহায় প্রস্তরে দেওয়ালে খোদিত বিষ্ণুর বিরাট বরাহাবতার মূর্তি প্রাণবন্ত হ'য়ে রয়েছে।

কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তিও গুহাগাত্রে খোদিত। জৈন মন্দিরগুলির মাত্র একটিতে দিগম্বর মহাবীরের মূর্তি, বাকিগুলি শূন্য।

বহু প্রাচীন 'খাম্বাওয়া' স্মৃতিস্তম্ভ আজও সযত্নে রক্ষিত। বিদিশা সভাগৃহের তদানীন্তন গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস্ উত্তরজীবনে বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে এই স্তম্ভ নির্মাণ করান।

বিকালে ফিরে আসি সাঁচী; সেখান থেকে ঝাঁসী হ'য়ে কানপুর। এইভাবেই মধ্যভারত পরিক্রমা শেষ হ'ল। তারপর ফিরে আসি কল-কাতা, সেখানে শুরু হ'ল গতানুগতিক জীবন।

প্রত্যাবর্তন

স্বামী চিদ্‌রসানন্দ

প্রথম প্রভাত হ'তে চলিয়াছি অনন্তের পানে,
মাঝে মাঝে থামিয়াছি বিশ্রামের তরে স্থানে স্থানে।
আবার চলেছি একা, কোন দিন নহি কোথা স্থির,
ঘুরেছি সংসার-চক্রে চিরদিন চঞ্চল অধীর।

পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পথে যদি পান্থশালা পাই,
পথকষ্ট, মনোব্যথা—ক্ষণেকেই সব ভুলে যাই।
পান্থশালে পাথেয় সঞ্চয় করি, দিই পথকর;
অদম্য উদ্যমে পুন যাত্রাপথে হই অগ্রসর।

পান্থশালে কখন বা নিদ্রাঘোরে হ'য়ে অচেতন
সুখ-দুঃখ স্বপ্ন দেখি, ভুলে যাই নিজ-নিকেতন।
চলেছি কোথায় কেন, বারে বারে অজানার দেশে
পুরাতন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যজি নব নব বেশে।

কত না বিচিত্র চিত্র পথিপার্শ্বে হেরি অবিরত,
কখন উল্লাসে চলি, কভু প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত।
কত বৃক্ষলতা পুষ্প, পদ্মপূর্ণ কত সরোবর,
অপরূপ বর্ণচ্ছটা, নীলাকাশ শোভিছে সুন্দর!

চলেছি অবশ হ'য়ে ছায়াময় অনন্তের পানে
চকিতে উঠিনু জাগি, চেনা স্বর আসিল যে কানে,
ধীরে আরো কাছে আসি মুখপানে আঁখি দুটি রাখি
অনন্ত আনন্দময় গুরুমূর্তি কহে স্নেহে ডাকি:

'যে পথে চলেছ তুমি অন্তহীন উদ্দেশ্যবিহীন,
ভ্রমে ভ্রমিতেছ খুঁজি প্রেয় প্রিয় হ'য়ে দেহাধীন,
ও পথের শেষ নাই, ও পথে তো নাহিক বিশ্রাম
বার বার যাওয়া আসা, ঘুরে মরা শুধু অবিরাম।
জানিবারে ইচ্ছা যদি শ্রেয় তব স্বরূপ আপন,
প্রাণপণ কর যত্ন—অন্তরেতে অরূপ রতন!
অসংখ্য বন্ধন-রজ্জু চারিদিকে বেঁধেছে তোমারে
সবলে সেগুলি কাটি ফিরে এস আপনার ঘরে।'

সমালোচনা

Yoga Psychology: Swami Abhedananda, Published by Ramakrishna Vedanta Math, 19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta, Pp. 408+xxiv (demy) Price Rs 10.

১৯২০ খৃঃ মার্কিন দেশের বুধমণ্ডলীর সমক্ষে পতঞ্জলির যোগসূত্রের উপর স্বামী অভেদানন্দ যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বর্তমান পুস্তক সেইগুলির একটি সুন্দর সঙ্কলন। পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্য এবং বাচস্পতির মিশ্রের টীকা বহু স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একটি মূল্যবান্ ভূমিকায় 'যোগ' শব্দের অর্থ, যোগ ও বেদান্তের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া পাঠকদের বিষয়-প্রবেশে সাহায্য করিয়াছেন।

বিভিন্ন অধ্যায়ে (১) যোগসাধনার সোপান, (২) যোগসাধনার ধারা, (৩) বিঘ্নের প্রতিকার এবং যোগ, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রাণ ও ষট্‌চক্র এবং কুণ্ডলিনী, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি, (৯) ক্রিয়াযোগ, (১০) অবিদ্যা ও জগৎ, (১১) জ্ঞান ও অজ্ঞান-দূরীকরণ, (১২) রাগ ও দ্বেষ, (১৩) বন্ধন ও মুক্তি, (১৪) কর্ম ও ধ্যান, (১৫) ঈশ্বর-প্রণিধান ও সমাধি (১৬) ওঁকার ও ঈশ্বরভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিশিষ্ট-অধ্যায়ে 'অহংতত্ত্ব ও অহঙ্কারে'র বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না বা যাঁহারা ব্যাসভাষ্য এবং বাচস্পতি মিশ্রের টীকা পড়িতে বা বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি অমূল্য। গ্রন্থকার স্বয়ং পরম যোগী ছিলেন বলিয়া যোগসাধনার সব দিক্ সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানির মৌলিকত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। —মৈথিল্যানন্দ

City of Calcutta (a Socio-economic Survey) by S. N. Sen, Univ. Prof. of Economics, Univ. of Cal. (issued under the auspices of the Dept. of Econ. Cal. Univ.) Published by Bookland Private Ltd. Pp. Royal 271+iv. Price Rs 30/- only.

ভারত-সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের রিসার্চ প্রোগ্রাম কমিটির নির্দেশে ও সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি (Economics) ও পরিসংখ্যান (Statistics) বিভাগের যুক্ত উদ্যোগে চার বৎসর (1954-55 to 1957-58) ধরিয়া কলিকাতা মহানগরীতে সমাজনীতি ও অর্থনীতিমূলক পর্যবেক্ষণ-কার্য পরিচালিত হয়, তাহাতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে, বর্তমান মূল্যবান্ গ্রন্থখানি তাহারই বিশ্লেষণমূলক বিবৃতি।

১৯৫১ খৃঃ জনসংখ্যা গণনা (Census)-র উপর ভিত্তি করিয়া বয়স, নরনারী-সংখ্যা বিভিন্ন ভাষাভাষী-সংখ্যা, বিবাহ, গৃহপরিবেশ, সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা, কর্মসংস্থান, বেকার প্রভৃতি বিবেচিত হইয়াছে। বর্তমান লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, তাহার হার ও তজ্জনিত সমস্যার বিষয়ও পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কলিকাতার নব নব রূপ অনাবৃত হইয়াছে, যাহা আমাদের জানা ছিল না, অথচ জানা উচিত ছিল।

তুলনামূলক বহু তালিকা এবং গ্রাফ পাঠকদিগকে কোন বিশেষ বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝিতে

সহায়তা করিবে। পুস্তকটির বিস্তৃত সমালোচনা বিশেষজ্ঞেরাই করিবেন। সাধারণ পাঠক ও সমাজসেবিগণ ব্যক্তিগতভাবে এই পুস্তক ক্রয় করিতে না পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদেরও অবশ্য পাঠ্য। প্রত্যেক স্কুল কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ইহা একখানি অবশ্য সংযোজনীয় গ্রন্থ। এরূপ একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন ও রচনার জন্য লেখক দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা আরও আশা করি—দেশের উন্নয়ন-ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, তাঁহারা যেন এই গ্রন্থ হইতে লব্ধ তথ্যগুলি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক অনূদিত; ৫২, সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-২৬১, মূল্য টাকা ১·৫০।

আলোচ্য পুস্তকখানি গীতার একটি পকেট সংস্করণ। ইহাতে পূর্বের পৃষ্ঠায় গীতার মূলশ্লোক এবং পরপৃষ্ঠায় বাংলা পয়ার ছন্দে শ্লোকানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ সর্বত্র সুললিত হইয়াছে—বলা চলে না, তবে ভাষা সরল হওয়ায় গীতার কঠিন শ্লোকগুলিরও অর্থ সহজবোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা গীতা কণ্ঠস্থ করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকটি বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৬০)—দশম বার্ষিক সংখ্যা, সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী অভেদ চৈতন্য প্রভৃতি, প্রকাশক স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। রয়াল সাইজ—১৬০ পৃষ্ঠা।

অন্যান্য বৎসরের মতো রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক কলেজের এই সুন্দর সুমুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকাখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়া আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। বাংলায় ২১টি ও ইংরেজীতে ১০টি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত প্রবন্ধ সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টার চিত্রগুলিতে, আমাদের কথায়, কার্যবিবরণীতে ও সর্বশেষ অধ্যক্ষ মহারাজের Annual Report-এ বিদ্যামন্দিরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৬৬): শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬২।

পত্রিকাটিতে প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা—প্রায় সব লেখাই ছাত্রদিগের। বিষয়-নির্বাচন ও মুদ্রণ-পারিপাট্য সুরুচির পরিচায়ক। 'আমাদের কথায়' বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট। 'পরিবর্তন' রসরচনাটি ভাল লাগিল। 'একটি অসমাপ্ত কাহিনী' নামক ছোটগল্পটি হৃদয় স্পর্শ করে। পত্রিকাটির পূর্ব-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

আবেদন

আসাম দুর্গত জনগণের সেবা

আসাম হইতে দুর্গতদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ জলপাইগুড়ি জেলার ফালকাটায় একটি সেবা-শিবির খুলিয়াছেন। নূতন কাপড়, বাসনপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্যান্য দ্রব্যাদি দাঙ্গাপীড়িতদের নিকট যথাসম্ভব পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে। আসামেও সেবাকেন্দ্র খুলিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সহৃদয় দেশবাসীদের নিকট আবেদন জানানো হইতেছে, তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য পাঠান। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সদাশিবানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই জুলাই পূর্বাহ্ণ ১০-১৫ মিঃ সময়ে স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ) ৮২ বৎসর বয়সে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুআরি তিনি হঠাৎ কেদারঘাটে পড়িয়া যান এবং তাঁহার উরুর অস্থি ভাঙিয়া যায়। সেবাশ্রমে ভরতি হইয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু আমাশয়ের পর তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। মণিকর্ণিকায় তাঁহার দেহ সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল হরিনাথ (ওহদেদার)। হরিনাথ লখনউএ ইংরেজী, ফার্সি ও উর্দু শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল এলাহাবাদে বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে চারুবাবু (শুভানন্দ), কেদারনাথ (অচলানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁহাদের সঙ্গে কাশী সেবাশ্রমের আরম্ভ হইতে সেবাকার্যে ব্রতী হন।

স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য হরিনাথ 'ভক্তরাজ মহারাজ' নামেই সুপরিচিত ছিলেন; ১৯২০ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদে ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যাপন করেন। ঐ সকল স্থানের বহু ভক্ত তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে ভাবান্বিত হন। দেহমুক্ত সন্ন্যাসীর আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মিলিত হইয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

স্বামী নরোত্তমানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৩রা আগস্ট রাত্রিশেষে স্বামী নরোত্তমানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া কাশী মণিকর্ণিকা ঘাটের সন্নিকটস্থ কালীবাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১৩ খৃঃ ২৭ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২০ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হন। বারাণসী সেবাশ্রমে থাকাকালে তিনি আশ্রমের সর্ববিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত 'রাজা মহারাজ' স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে একখানি সুখপাঠ্য জীবনী পুস্তক। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কার্যবিবরণী

পাটনাঃ ১৯২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষৎ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে মোট ৩৩১টি আলোচনা হইয়াছিল। পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮৯ ছাত্র অধ্যয়ন করে, ইহাদের অধিকাংশই অনুন্নত শ্রেণীর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে নির্মিত ছাত্রাবাসে নূতন দ্বিতল ভবনে ২৬ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৫ জনের খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাস হইতে ২ জন আই. এস. সি, ১ জন বি. এ এবং ১ জন এম. এ পাস করিয়াছে।

তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরির ৫,৫৩২ পুস্তকের মধ্যে ৪৯০ খানি নূতন সংযোজন। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৭২টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে।

গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান :	দৈনন্দিন পাঠক :	গৃহীত পুস্তক
১৯৫৮	১১,৮৭৬	৫,৭৬১
১৯৫৯	১৬,০৮২	৮,৬০৬

গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে, সাধারণের উপযোগী ধর্ম ও কৃষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এবারে বক্তাদের মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক বিভাগে যথাক্রমে ৭১,৮৮৭ ও ৪৮,৪৬৪ রোগী চিকিৎসিত হয়।

রাঁচি : রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য ভবনে ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বর্তমানে এখানকার শয্যাসংখ্যা ১৮৯, ইহার মধ্যে সাধারণ ওআর্ডে ১৫৪। আলোচ্য বর্ষে আরোগ্যভবনে মোট ৩৮৮ জন রোগী ছিল। ২১৪জন আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায়। ৮৩ জন রোগী ফ্রি এবং ২৫ জন আংশিক ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ২৬ জন রোগীর জন্য একটি নূতন ওআর্ডের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে। যক্ষ্মারোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুস্থ কয়েকজন ব্যক্তিকে স্যানাটোরিয়ামেরই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র। কলোনী নির্মাণ ও আরও ফ্রি বেডের জন্য সরকার ও বদান্য ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহৃদয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২৬) : এই কেন্দ্রের ১৯৫৮-৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ২৭ বৎসর পূর্বে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ খৃঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতায় প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই কয়টি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে : স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, পরিচর্যা ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা কেন্দ্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যান্ট, বৈদ্যুতিক লন্ড্রি, সার্জিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি এখানে আছে। বর্তমানে হাসপাতালের মোট শয্যা-সংখ্যা ২১০ ; আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ৫,৮৫৭ রোগী ভরতি হয়, তাহার মধ্যে ৪৮% ফ্রি চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক ১২৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

উৎসব-সংবাদ

সোনার গাঁ (ঢাকা) : গত ৫ই আষাঢ় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দলে দলে লোক আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। প্রায় তিন হাজার নরনারী আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ এক শোভাযাত্রা রাজপথ পরিভ্রমণ করে এবং অপরাহ্ণে এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। উৎসবের দুই দিন পরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে উৎসবের জের আরও কয়েক দিন চলে। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আশ্রমের আম্রবৃক্ষতলায় তিনি গম্ভীর এবং সুললিত ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা করেন।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ: গত এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ তমলুক, কাঁথি, মেদিনীপুর ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে চণ্ডীপুর, আনন্দপুর, হেঁড়িয়া, কল্যাচক, দশগ্রাম, কাঁথি, কলমিছাবড়ে, খেজুরী, অজানবাড়ী, বনমালীচট্টা, ভদ্রকালী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, লালগড়, বলরামপুর, ঘাটাল, গড়বেতা, হিজলী, সারেঙ্গা, রাইপুর, খাতড়া, কাঁকড়াদাড়া, চন্দ্রকোণা, কেশিয়াড়ী, সুখাডোর, শালবনী, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, জগদ্দল, রামবাগান, এলাচি, গোবরডাঙ্গা, হাটুয়াথুবা, কৃষ্ণনগর, শিকড়াকুলীন-গ্রাম, ধান্যকুড়িয়া, ভাদুরিয়া, চাঁপাপুকুর, বসিরহাট, বারাসত ইত্যাদি অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদাদেবী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে মোট ৬৬টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫৭টি আলোকচিত্র সহযোগে।

স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ: বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দের অনুরোধে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ সম্প্রতি মালয়, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েটনাম ও ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল স্থানে রোটারি ক্লাব, থিওজফিক্যাল সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ২৫টি বক্তৃতা করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্টলুই: বেদান্ত সোসাইটি—১৯৫৯-খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রগণ যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন: প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন এবং উপনিষৎ ও ভাগবতের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবারের ক্লাসের মোট সংখ্যা ৪৩।

(৩) সাময়িক বক্তৃতা ও আলোচনা: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন:

সেণ্টলুই-স্থিত মেথডিস্ট চার্চ; কার্কউড চার্চ, হিব্রু টেম্পল, এতদ্ব্যতীত সেণ্টলুই ও ওয়েবস্টারে আয়োজিত সাধারণ ধর্মসভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সমাগত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৪) অতিরিক্ত সভা: কার্কউড হাইস্কুলের এবং ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও সভ্য-বৃন্দের সমাবেশে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

(৫) উৎসব: শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শংকরাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্‌ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

(৬) নানাস্থানে প্রচার: উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া-স্থিত বেদান্ত কেন্দ্র-সমূহে এবং ক্যান্‌সাস শহরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

(৭) অবকাশ: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের ক্যালিফর্নিয়া পরিভ্রমণকালে বেদান্তানুরাগী

ভক্তবৃন্দ রবিবার সকালের ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন।

(৮) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ : এই বৎসর ৪৫ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৯) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ ১০০ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(১০) সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

স্যানফ্রান্সিস্কো : বেদান্ত সোসাইটি : নূতন মন্দিরে : প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় : (রবিবারের বক্তা : স্বামী অশোকানন্দ; বুধবারের বক্তা পর্যায়ক্রমে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)।

ফেব্রুআরি : অবচেতন মনকে কিরূপে সংযত করিতে হয়; মৃত্যুর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য; 'যোগ' কি? মধ্য ও দক্ষিণ মার্কিনে বেদান্ত প্রচার (স্বামী বিজয়ানন্দ) 'ঈশ্বর-দর্শন' বলিতে কি বুঝায়? ধ্যান—মন ও আত্মার উপর তাহার ক্রিয়া; প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বিচরণ।

মার্চ : মানুষের সার সত্তা ভগবান; নবীনতম অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ; ঈশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা; ভগবানকে কিরূপে ঠিক ঠিক ভালবাসা যায়; পাপী—যিনি পরে সাধু হন; নূতন ধর্ম—আত্মার দ্বারা আত্মার পূজা; বিশ্ব-দৃষ্টি; মন কি অত্যাবশ্যক? শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

এপ্রিল : কর্মবাদ ও ঈশ্বরানুগ্রহ; মায়িক সত্তা ও প্রকৃত সত্তা; আত্মা-রূপে নিজেকে ভাবনা কর; দৈনন্দিন জীবনে 'যোগ'; 'আমিই পুনরুত্থান ও অমর-জীবন'; কোন্ শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করে, আমাদের 'অহং' কি? উপনিষদ্‌সমূহ কি শিক্ষা দেয়?

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং সম্মুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে : প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় শ্রেণীবদ্ধ ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা : স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত সর্বজন-পরিচিত এই সমিতির ১৯৫৯ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার কর্মধারা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত : প্রচার, শিক্ষা ও সেবা।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, চণ্ডী, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি আলোচিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতির জন্মদিনে তাঁহাদের জীবনী আলোচনা হয়। সমিতি-ভবনে সভ্যগণ কর্তৃক শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১০,৯২২ জন রোগীকে ঔষধ এবং

ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ৮ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে ১৭০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৬৮১ বই আছে, পাঠাগারে ২০টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে।

গত ২৫. ৯. ৫৯ তারিখে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী সমিতি রেজিষ্ট্রী করা হয়—ইহাই আলোচ্য বর্ষের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উৎসব-সংবাদ

সিঁথি : (কলিকাতা-২) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৩ই হইতে ১৮ই এপ্রিল ছয়দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব সিঁথি ডি. গুপ্ত লেনে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দ উৎসবটির উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন দিবসে স্বামী সংশুদ্ধানন্দ, স্বামী দেবানন্দ ও স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীবিনয়কুমার সেন, পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এবং শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব-দিবসে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও শ্রীমতী সত্যবতী রায়চৌধুরাণী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের প্রতিকৃতি সহ পল্লীপরিক্রমায় এক হাজার ভক্ত যোগদান করেন। শেষের দিন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন। বিভিন্ন দিনে ভজন কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। তিন হাজার ভক্তকে একদিন বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

দেউলপুর (হাওড়া) : গত ২৯শে, ৩০শে এপ্রিল এবং ১লা মে শক্তিপীঠের উদ্যোগে এক যুব কর্মশিবির বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। শিবিরে বিভিন্ন গ্রাম ও প্রতিষ্ঠান হইতে ৬৫ জন ছাত্র ও যুবক যোগদান করেন। শিবিরবাসীরা ঐ তিন দিনে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ পথের সংস্কার করেন। এই শিবিরে বিভিন্ন দিনে সমাজশিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শেষদিন বিবেকানন্দ-উৎসব-সভায় বলেন বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী অজ্ঞানন্দ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিকী

গত ২রা আগস্ট কলিকাতা, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া বলেন, বাঙালীর আজ প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাবলম্বনের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানতপস্বী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ্‌ ও ছাত্র-দরদী। আচার্যের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ছাত্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও আলোচনায় যোগদান করেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে 'সত্যিকারের মানুষ' বলিয়া বর্ণনা করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পুরাতনের পরিবর্তে নূতন রোগ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'ক্ষুদিরামবসু বক্তৃতা' দিতে গিয়া গত ১৯শে জুলাই বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন :

ভেষজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন উন্নত দেশসমূহে মৃত্যুর সাধারণ কারণ স্বরূপ ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, সেপ্সিস্‌ প্রভৃতি রোগ আয়ত্তাধীন হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ আজকাল হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপ, ক্যান্সার, মোটর-দুর্ঘটনা; শেষেরটি শীঘ্রই প্রথম স্থান অধিকার করিবে।

অনেকের মতে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশী প্রোটিন এবং স্নেহপদার্থ প্রয়োজন, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের এবং রক্তচলাচলের উপর এগুলির প্রভাব মোটেই স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নয়। এই সকল খাদ্যে ধ্বংসক্রিয়া ত্বরান্বিত করিয়া উচ্চ রক্তচাপ ও থ্রম্বোসিস ডাকিয়া আনে।

ভিয়েনার ডাক্তার ব্রুনার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সামান্য প্রোটিন ও স্নেহসংযুক্ত শ্বেতসার (Starch) খাদ্য—ডায়াবিটিস এবং রক্তচাপ দুইই ঠেকাইয়া রাখে।

পরিশেষে ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, এগুলি 'সভ্য' দেশের রোগ, সেখানেও কৃষক শ্রমিকদের এ রোগ বড় একটা হয় না। ভাবাবেগ, মোটর চালানো, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ওঠা বা গাড়ী ধরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে এ রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্ ।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥

—ঋগ্বেদ

শিল্পী : নন্দলাল বসু

কল্যাণশক্তি কল্যাণী

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥
[দেবীসূক্ত—৭ম শ্লোক]

দম্ভদর্প-অভিমানমাত্রসম্বল নির্দয় ও ক্রূরস্বভাব ত্রিপুরাসুর যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল উৎপীড়িত করিতেছিল, ত্রিভুবনের অধিবাসিগণ—দেবতা, মানব ও অন্যান্য প্রাণিগণ যখন অতিষ্ঠ হইয়া পরিত্রাণের জন্য মঙ্গলময় শিবের শরণাপন্ন হয়, শিবও প্রাণিগণের দুঃখদুর্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া অসুর-নিধনে কৃত-সংকল্প, তখন মহামায়া মহাদেবের বাহুতে দিব্য মহাশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যশক্তি নির্জিত করেন।

সেই কথা স্মরণ করিয়া দেবীর সহিত অভিন্নভাবা অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বাক্ বলিতেছেন: জীবদুঃখাসহিষ্ণু রুদ্রের বাহুতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমিই ধনুর জ্যা বিস্তারিত করি, যাহাতে শিব সহজে ও নিশ্চিতভাবে বেদবিদ্বেষী—অর্থাৎ সর্ব-প্রকার সদাচার- ও সদ্ধর্মবিরোধী অসুরকে নিহত করিতে পারেন। সমষ্টি-কল্যাণের জন্য, অকল্যাণকে ধ্বংস করিবার জন্য, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া জনগণের জন্য আমিই যুদ্ধ করিয়া থাকি। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া, ত্রিভুবনে সকল প্রাণীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের অন্তর্যামিনী-রূপে আমিই অধিষ্ঠিত রহিয়াছি।

কথাপ্রসঙ্গে

'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং—'

'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা'……এই শ্লোকার্ধে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যে'র দ্বিতীয় চরিত্র আরম্ভ। দেবাসুরের সংগ্রাম-বর্ণনায় প্রায় সকল পুরাণই মুখরিত! এই দেবাসুর-সংগ্রাম কি প্রাগৈতিহাসিক অর্থে পৌরাণিক? —না গল্পের মতো কাল্পনিক? না কি ইহার মধ্যে কোন গূঢ় আধ্যাত্মিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক রহস্য নিহিত আছে? আধুনিক মনের উপযুক্ত কোন সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত কি ইহার মধ্যে আছে?—যাঁহারা বর্তমান বাস্তববাদী যুগেও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে।

এইগুলির একটি মাত্র উত্তর: দেবাসুর-সংগ্রাম নিত্যই হইতেছে—আজ এখানে, কাল ওখানে—কখন ভিতরে, কখন বাহিরে এই সংগ্রাম সর্বদা চলিতেছে। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন রূপে হইলেও সংগ্রামের প্রকৃতি সর্বত্র প্রায় অপরিবর্তিত। সামাজিক স্তরে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক রণাঙ্গনে,—সংখ্যাধিক্য, অধিকারবোধ, 'আছে ও নেই'-এর সংগ্রাম (haves and have-nots), সত্য ও ন্যায়ের (truth and justice) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা নামে ইহা দেখা দেয়। সর্বত্র দেখা যায় পরস্পর-বিরোধী সংগ্রামশীল দুইটি দল। পুরাণকার ইহাদের বলিয়াছেন দেবতা-শক্তি ও দানব-শক্তি। নীতিশাস্ত্রকার বলিবেন—শুভশক্তি ও অশুভশক্তি। সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিক বলিবেন—ন্যায়ের পক্ষ ও অন্যায়ের পক্ষ। তত্ত্বদর্শিগণ দেখিয়াছেন, বিপরীতমুখী দুই শক্তির মূলে রহিয়াছে একই শক্তি। সেই মহাশক্তিকে ভুলিলেই সত্ত্বরজোগুণাপন্ন দেবতাশক্তি রজস্তমোগুণাপন্ন দানব-শক্তির নিকট পরাজিত হয়।

অসুর বা দানব-শক্তি—দম্ভদর্প, লোভমোহ, কামক্রোধ ও ভোগের প্রতিমূর্তি। অন্যায় উদ্দেশ্যে স্বার্থের আহ্বানে পশুশক্তি সহজেই অন্ধভাবে যূথবদ্ধ হয়; দেবশক্তি জ্ঞানস্বভাব—ন্যায়, নীতি ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত, সহসা অন্যায় করিতে পারে না; সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির বিভিন্নতার জন্য প্রয়োজনকালে সর্বত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতেও পারে না। ফলে অতি সহজেই আসুরিক শক্তি-সংঘাতের নিকট দেবতাশক্তি পরাভূত হয়, এবং সাময়িক ভাবে আসুরিক শক্তিরই বিজয়-পতাকা উড়িতে থাকে।

দেবতাশক্তি কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। উচ্চতর শক্তির সন্ধানে দেবতারা উচ্চতর মনীষা ও পরম জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষে সর্ব শুভশক্তি যখন ঐক্য প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমন্বিত মহা-শক্তির দুর্বার বেগ অসুর-শক্তি সহ্য করিতে পারে না। ঐ মহাশক্তি শুভ ও অশুভ সকল শক্তিরই উৎস, সকল ভাবেরই জননীস্বরূপা; তাই উহা মাতৃপ্রতীকে উপাসিত। মাতৃশক্তির মধ্যেই দুই বিপরীতমুখী শক্তি ও ভাবের সামঞ্জস্য সম্ভব! ঐক্যমুখী শক্তি দ্বারাই সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত হয়। কিছুকাল শান্তি ও সামঞ্জস্য বিরাজ করে, আবার 'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধম্'! এ যুদ্ধ নিত্য নিয়ত চলিতেছে, চলিবে; ইহা পুরাণ বলিয়া পুরাতন নয়, ইহা শাশ্বত সত্য—চিরন্তন।

এই দেবাসুর যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা মহাশক্তিকে স্মরণ করিব, মায়ের পূজায় মিলিত হইব।

মাতৃভাবে উপাসনা

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমষ্টি পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হইয়াছে, একমাত্র কন্‌ফিউসিয়াস চিরন্তন একটি নীতির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মনুদেবতা আহরিমানে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতে পুরাণের গল্প চাপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়া গিয়াছে। ঋগ্‌বেদেই একটি মন্ত্র পাওয়া যায়, 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্—'।

মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি পদক্ষেপে ইহা অনুভূত হয়। অন্তরে অনুভূত শক্তি—আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি—প্রকৃতি। এই দুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যাহা কিছু জানি বা অনুভব করি, তাহা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ—উভয়ের উপর সূর্যের আলো সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা—এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে। এই ভাবেই মাতৃভাব উদ্ভূত হইল।

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম; আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখন সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামনা করে না, সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ্য করে না—সে জন্য বরং তাহাকে আরও বেশী ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদিগের সাধনার প্রধান অঙ্গ।

যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মাতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্তু ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। স্বার্থবোধ না থাকিলে দুঃখও আনন্দের অনুভূতি আনিতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনের সাক্ষী-রূপে পরিণত হই। জগৎ-ব্যাপারের পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের সাধককে বিস্মিত করে। আমাদের ধারণা —ঈশ্বর মানুষের মতো সসীম ও ব্যক্তিত্বযুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আসে। শক্তি বলিতেছেন, 'আমি রুদ্রের জন্য ধনু বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি ব্রহ্মদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে পারেন'। উপনিষদে এই ভাবের চিন্তা নাই, বেদান্ত এই

বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই—ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি: 'সদসচ্চাহমর্জুন'—আমি ব্যক্ত, আমিই অব্যক্ত; ভাল মন্দ সবই আমার সৃষ্টি।

এই ভাব কিছু কাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে আবার দেখা দেয় নূতন দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ—উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহাও আংশিক মাত্র। সহানুভূতির অভাবে এই ধারণা মানুষকে পশুভাবাপন্ন ও হিংস্র করিয়া ফেলে। এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পশুর ধর্ম।

সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাপীর বিদ্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে। এই ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া দুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়—তখন আমরা জাগিয়া উঠি এবং মায়ের সত্তা অনুভব করি।

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাস—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালবাস, কারণ তুমি তাঁহার সন্তান। ভালোয় মন্দে, সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।

[নিউইয়র্ক—১৯০০, জুনে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অনুবাদ—C.W.VIII. pp. 252-3]

চরৈবেতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার চরণপদ্মে লগ্ন থাক মন
অহোরাত্র। অগ্নিকুণ্ডে ইস্পাত যেমন
হারায় মালিন্য তার—রক্তবর্ণ হয়,
তোমার চিন্তায় যেন আমার হৃদয়
তেমনি ডুবিয়া গিয়া নবজন্ম পায়!
জড়তা চলিয়া গিয়া তোমার কৃপায়
আসুক উৎসাহ-বন্যা। বৃক্ষ-সম আর
কোন্ দুঃখে আঁকড়িয়া রবো এ সংসার?

ভাসাও জীবনতরী এবার অকূলে!
দিক্‌চক্রবাল পানে যাবো পাল তুলে
কণ্ঠে নিয়ে তব নাম। অজানার জয়!
বন্দরে নির্জীব শান্তি আর নয়, নয়!
তোমারে না পাই যদি, মৃত্যুর ছায়ায়
কেমনে কাটাবো দিন হাসি ও খেলায়?

'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র পটভূমিকা

শ্রী'জ্ঞান'

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

চণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ। পূজায় মায়ের মঙ্গলঘট স্থাপনের পরই চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। উহা কোথাও কৃষ্ণপক্ষের নবমী হইতে, কোথাও অমাবস্যা হইতে, আবার কোথাও বা শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিতে হয়। বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও বিবিধ অনুষ্ঠান-সহ মায়ের প্রতিমা পূজার চলন নাই। কিন্তু এই চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। ইহাকে নবরাত্রি-পূজা বলে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া অমাবস্যা হইতে শুক্লা নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন যে ৺চণ্ডীর পূজা ও পাঠ হয়, উহাকেই নবরাত্রি-পূজা বলে।

চণ্ডী পাঠ ও পূজার ফল দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। যিনি যেরূপভাবে উহা পাঠ করেন, তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। চণ্ডীর আখ্যায়িকা হইতে আমরা উহা বুঝিতে পারি।

চণ্ডীর পটভূমিকার দুইজন নায়ক—সমাধি বৈশ্য ও নৃপতি সুরথ। উভয়েই সর্বস্ব হারাইয়া গভীর অরণ্যে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত। মন কিছুতেই শান্ত হইতেছে না; থাকিয়া থাকিয়া নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির ও বিষয়াদির কথা মনে উঠিতেছে। উহা হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া কি করিয়া শান্তি লাভ করা যায়, ইহাই তাঁহাদের প্রশ্ন। আবার তাঁহারা নিজদিগকে জ্ঞানী বলিয়াও মনে করেন। বৈশ্য তাঁহার বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত সুরথও বহুদিন পর্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। সংসারে জ্ঞানবান্ বিচক্ষণ পুরুষগণ কি করিয়া মোহগ্রস্ত হন, ইহাও তাঁহাদের অন্যতম প্রশ্ন।

ঋষি ধৈর্যসহকারে তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, তাঁহারা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছেন তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিলে উহা সকল পশু-পক্ষীতেই সমভাবে বিদ্যমান। উহাদের কেহ কেহ রাত্রে দেখিতে পায়, কেহ বা দিনে, আবার উহাদেরই কেহ কেহ দিনে-রাত্রে সমানভাবে দেখিয়া থাকে। বিচার করিতে গেলে শেষোক্ত প্রাণী মনুষ্য অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্। পুত্রাদির জন্য সঞ্চয় করিলে যদি জ্ঞানী আখ্যা পাওয়া যায়, তবে পশুপক্ষী প্রভৃতিও এই বিষয়ে মনুষ্য হইতে অধিকতর জ্ঞানবান্। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার সেবা করিয়া পিতৃমাতৃ-ঋণ শোধ করিবে—এইরূপ সুপ্ত ইচ্ছা মানুষের হৃদয়ে রহিয়াছে। পশুপক্ষী কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, একেবারে স্বার্থরহিত। ভবিষ্যতে তাহাদের শাবকগণ তাহাদিগকে পালন করিবে কি না করিবে, এরূপ কোন চিন্তাই তাহাদের মনে আসে না। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও অতিকষ্টে সংগৃহীত খাদ্য তাহারা শাবককে দিয়া তাহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করে। এ বিষয়েও তাহারা মনুষ্য হইতে অধিক জ্ঞানী।

কিন্তু এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। যথার্থ জ্ঞান মহামায়ার কৃপা ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। মহামায়াই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, আবার প্রয়োজন হইলে সর্বজগৎ নিজের ভিতর সংহরণ করিয়া তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। তিনিই অজ্ঞানীকে সংসার-বন্ধনে ফেলেন; আবার

শরণাগত সাধকের সকল অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া তিনি জ্ঞানের জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত করেন। মানুষের কি কথা, দেবতারাও বহুবার এই অজ্ঞানে পড়িয়াছেন; এবং যখনই কায়মনোবাক্যে একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তখনই তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের সর্ববিধ অভাব দূর করিয়া দিয়াছেন। এই মহামায়ার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই। তিনি শাশ্বত, নিত্য। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি উৎপন্না হইয়াছেন, বলা হয়।

তিনি এইরূপে বহুবার আবির্ভূতা হইয়াছেন—কখন সাত্ত্বিকী মূর্তিতে, কখন বা রাজসী, আবার কখনও তামসী মূর্তিতে। সৃষ্টির প্রাক্কালে মধু-কৈটভ দৈত্য-সংহারের পূর্বে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা-রূপে তামসী মহাকালীরূপে তিনি বিরাজমানা। সৃষ্টির মধ্যমে মহালক্ষ্মী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, দেব-মানব-পীড়ক মদোন্মত্ত মহিষাসুরকে বধ করিয়া তিনিই জগৎপালন করেন। আবার কল্পান্তে যখন শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসংখ্য দৈত্য সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলে, তখন দেবতাদের প্রার্থনায় দৈত্যদিগকে দমন করিয়া দেবতা এবং দৈত্যগণকেও তিনি পরম জ্ঞান প্রদান করেন।

মা তাহাদিগকে দেখাইলেন যে জগতে একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন, আর দ্বিতীয় কেহই নাই। যে সকল শক্তিমূর্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া এতক্ষণ শুম্ভ নিশুম্ভ বা তাহাদের অনুচরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন। মা বলিলেন, তোমাদের রক্ষার জন্য আমি বিভূতি-সমন্বিত হইয়া যে সকল মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, যখন তোমাদেরই জ্ঞানের জন্য সেগুলি আমার ভিতরে সংগ্রহ করিলাম। আমি এক হইয়াও লীলার্থে এইরূপে বহু রূপ গ্রহণ করি—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

এইরূপে তিনি দেবগণের প্রার্থনায় পুনঃ পুনঃ এই সংসারে আবির্ভূতা হইয়া দেবতা ও মর্ত্যগণের সকল বাধা দূর করিয়া তাহাদের অভীষ্ট প্রদান করিয়াছেন।

এইভাবে চণ্ডীর বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিলেন, হে বৈশ্য, হে রাজন্, তোমরাও তাঁহাকে একান্তভাবে আহ্বান কর। তোমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া অচিরে তিনি তোমাদিগকেও তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করিবেন।

ঋষির কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে নির্জন নদীতীরে যাইয়া সংযতচিত্তে দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজার্চনা করিলেন। তিন বৎসরান্তে মা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীপ্সিত বর চাহিতে বলিলেন। রাজা সুরথ তখন তাঁহার ভ্রষ্ট রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু বৈশ্যের তখন পরম নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আর তিনি দ্বেষবুদ্ধিপূর্ণ সংসারে ফিরিতে চান না, যে মমত্ব-বুদ্ধির জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইতেছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যাহাতে তিনি বিমল জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহাই শ্রীশ্রীমহামায়ার নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করিলেন।

সর্বসিদ্ধিদাত্রী মাতা 'তথাস্তু' বলিয়া উভয়কে নিজ নিজ ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

এইরূপে সুরথ ও সমাধি সকাম ও নিষ্কাম ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিলেন। যে কোন মনুষ্য শরৎকালে তাঁহার মহাপূজা করিবেন ও ভক্তি-সমন্বিত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তাঁহারও সকল বাধা তিনি নিজ হস্তে অপসারিত করিয়া নিজ নিজ অভীষ্টানুযায়ী ধন-ধান্যাদি সম্পদ প্রদান করিবেন,—চণ্ডীতে ইহাও তাঁহার মহা আশ্বাস-বাণী।

চলার পথে

'যাত্রী'

মা আসছেন। কে মা? যিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণ-সত্তাকে জাগ্রত ক'রে দিয়েছেন—সেই মা! যাঁর স্নেহে আমরা জগতের এই সৌন্দর্য-মেলায় চোখ মেলতে পেরেছি; যাঁর কল্যাণস্পর্শে আমরা উন্মুখ হ'তে পেরেছি সত্যের সন্ধানে; যিনি তাঁর পীযূষ-ধারায় সঞ্জীবিত করেছেন আমাদের অন্তরাত্মার চৈতন্যসত্তাকে—সেই মা!

কিন্তু তা বুঝি না কেন? সেটুকু বুঝবার আগে এই বিশ্বমাতৃত্ব শুধু নয়, এই জীব-মাতৃত্বের অপূর্বতাটুকুও কি ঠিক ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছি? লক্ষ্য করেছি কি—এই জীব-মাতৃত্ব তাঁর নিজস্ব-সত্তার নিছক অভিব্যক্তি নয়—ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতিভূ? ঈশ্বর বোধ হয় তাঁর করুণাঘন, কল্যাণ- ও কৃপা-শক্তির সবখানিই নিখিল মাতৃহৃদয়ের অমৃত-ভাণ্ডে নিঃশেষে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। তাইতো প্রতিটি মাতৃমূর্তিতে এত করুণা, এত কৃপা, এত কল্যাণ! এই কল্যাণের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা, নিষ্কামতা। তাই নিদ্রার মাঝেও বাহুবেষ্টনীর স্নেহ-পরশ দিয়ে জননী তনয়কে আগলে রাখেন। মায়ের সুষুপ্তিতেও বোধ হয় সন্তানের মঙ্গল-কামনা ব্যাহত হয় না!

ইতর প্রাণীর মধ্যেও ঐশ্বর্যহীন মাতৃত্বের যে মধুর প্রকাশ দেখতে পাই, তারই বা তুলনা কোথায়? ঐ দূরে যে গাভীটি তার বৎসকে পরমস্নেহে কাছে টেনে এনে তার গাত্রলেহন করছে, ঐ যে গাছের ওপরে জীর্ণ বাসায় কাকটা পরম আদরে তার শাবকের মুখে কি সব খাদ্য পুরে দিয়ে গেল, ঐ যে চিল আসছে ব'লে নীলকণ্ঠ পাখিটা তার ছানাটিকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেও চিলের পেছনে আর্তস্বরে তাকে তাড়া করতে ছুটল, ঐ যে বিড়ালটি অতি সন্তর্পণে তার বাচ্চাটিকে নিভৃত ও নিরাপদ কোণে লুকিয়ে রাখতে চলেছে, ঐ যে পিপীলিকার শ্রেণী ডিম মুখে ক'রে চলেছে তাদের ভাবী সন্তানদের কোন নিরুপদ্রব আবাস-সন্ধানে—এ সবের পেছনেও তো নিরাভরণ মাতৃত্বের অকুণ্ঠ স্নেহ সদাই ক্ষরিত হচ্ছে—দেখতে পাই। তাই মা হচ্ছেন আমাদের ভয়ের মাঝারে অভয়, আঁধারের মাঝে আলো, জীবনের কুহেলিময় দিগ্‌বিভ্রমে সঠিক পথের দিশারী।

এই ব্যষ্টি-মাতৃত্বের সমষ্টি রূপ নিয়ে বিশ্বমাতৃরূপী ঐ মা আসছেন। আমাদের সবাকার মাতৃচিন্তার প্রতীক,আমাদের সমগ্র মাতৃত্বানুভূতির প্রকাশময়ী শিখা, আমাদের সকল শক্তি-তত্ত্বের স্পন্দনময় শিল্প-রূপকেই তো আমরা ধরেছি আমাদের গড়া ঐ আপাত-স্থিতিশীল মাটির রূপটিতে। আবার এঁরই মাঝে আমাদের মহাজ্ঞানের একীভূত ভাব-তন্ময়তার তদ্‌গত মাতৃ-মূর্তিও ধরা পড়েছে। এই মাকে অবলম্বন করেই তো আমাদের প্রত্যক্ষোপলব্ধির চিন্ময়রূপ বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে। তাইতো এই মৃন্ময় আধারে সেই চিন্ময়ের অসীম বিশ্বময় ঘনীভূত শক্তিকে আমরা মাতৃরূপে আহ্বান করতে এসেছি। নিখিল বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির মাঝেই তো মায়ের দৃষ্টি অতন্দ্ররূপে জাগ্রত। তাঁর সেই সৃষ্টির একটুখানি মাটি সংগ্রহ করেই তো আমরা আমাদের মাকে গড়েছি।

মাকে ধরেই আমরা সকল ছেলে এক। মাতৃত্বের নামেই আমাদের সমতা। তাইতো মায়ের নামে আমাদের মধ্যে স্বতই আসে উদার মনোভাব। আমরা তাঁর আহ্বানেই নশ্বর জীবনের ভূমি ছেড়ে ভূমার কল্পনায় মাততে পারি। মাকে মর্যাদা-দানের মাধ্যমেই আমাদের মনে

স্বকীয় মর্যাদা ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। ঋগ্‌বেদের সেই "কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্" (বিশ্বমানবকে আর্য-ভাবে ভাবিত কর) মায়ের প্রভাবেই আমাদের মাঝে বাণী রূপ পায়। মাতৃত্বের মধুর সম্বন্ধ ধরেই তো আমরা আমাদের খণ্ডতার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার আনন্দ-ঘন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে মিলিত হ'তে ছুটি। যে মিলনে কোন ভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, বিবাদ নেই, বিসম্বাদ নেই—নেই কোন তামসিক শাসনও। সকল দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এক আশ্চর্য বিশ্ববোধে তখন আমরা একই সঙ্গে মাতৃপ্রেমে অবগাহন করি।

সমন্বয়ের প্রজ্ঞা-চক্ষু তো আমরা মাতৃহৃদয়ের সমতার মধ্য থেকেই পেয়েছি। তাইতো এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্বে আমরা মাকে স্মরণ ক'রে গাইতে পারি—'সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি'—সকলের মন এক হোক্, সমান সমিতি হোক্, সকলেই এক উদ্দেশ্যে সমবেত হোক্। মাতৃমন্ত্রের পরিপূর্ণতার ভাগীরথী-প্রবাহে অভিস্নান করেই তো আমরা একে অন্যকে সুসংহত ঐক্যে আলিঙ্গন ক'রব—মরণহীন জীবনের রস-চেতনার আনন্দ দিয়ে ও আস্বাদন নিয়ে। বিশ্বাত্মবোধের এই সর্ব-সম্ভাষণের মাঝেই তো মাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলতে পারি: এই ত্রিভুবনে তোমার সমানই আর কেউ নেই, মা! তোমার চেয়ে অধিক আর কে থাকবে?

মাতৃরূপ সকল রূপের সেরা। তাইতো সাধক 'মা, মা' ক'রে পাগল। এই মাতৃরূপের সবখানিই পারমার্থিক, সবটুকুই চিন্ময়; জড় প্রকৃতির বিকার এখানে নেই। এখানে যা আছে তা দিব্য, উজ্জ্বল, ভাস্বর। মাতৃত্বে রজস্তমোগুণের কোন আবরণ নেই; আছে শুদ্ধ সত্ত্বময়তার দীপ্তি। তাই এই মাতৃরূপ অনন্ত, অলৌকিক, অপরিচ্ছিন্ন। মায়ের এই আশ্চর্যরূপ আবার 'বিশ্বতোমুখ' অর্থাৎ যে দিক দিয়েই দেখি না কেন, সব সময়েই মায়ের পূর্ণরূপ প্রতিভাসিত, পরমজ্যোতিতে সমুদ্বেলিত দেখতে পাবো।

মা তাঁর মহাজ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে সাধকদের অনেককেই দেখা দিয়েছেন। মাতৃ-অঙ্গের এই কান্তিতেই তো কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত—'যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিঃ' তাঁর আগ্নেয় সত্তার দ্যুতিতেই বিশ্বজগৎ পরিপ্লুত, তাঁর আলোতেই সব কিছু আলোময়—'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। মাতৃমূর্তির এই বিশ্বরূপ ধ্যানগম্য। 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'—একে ব'লে বোঝানো যায় না; নিজস্ব অনুভবের প্রতীক্ষা করে। বিশ্বের আলোক-ধারার এই একীভূত বহ্নি-বীজ—এই মাতৃমূর্তি—সত্যই অমৃত-খনি। এঁকে দর্শন করলে আর কিছু দর্শন করবার থাকে না। সেই শ্রেষ্ঠ দর্শনের উদ্দেশ্যে আজ কোটি কোটি প্রণাম।

চল, পথিক। শরতের এই রৌদ্রোদ্ভাসিত শীতোষ্ণ সমীরণে মনের সকল চাহিদা মেটাতে মায়ের কাছে যাই চল। চল, মায়ের পূজানুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় আমাদের নীচ প্রবৃত্তিগুলোর অগ্নিসংস্কার ক'রে নিই। চল, বৎসরের এই শুভদিনে আমাদের অন্তরের আনন্দঘন হৃৎ-পদ্মটিকে উর্ধ্বান্বিত ভাবধারার মাঙ্গলিক সৌরভে ফুটিয়ে নিই। চল এই পথে, এই মাতৃ-আহ্বানের পথে—যে পথে অস্বাভাবিকতা নেই, কুণ্ঠা নেই, জড়তা নেই—নিয়ম-নিগড়ে নিষ্পেষিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস নেই—যেখানে মানব-মনের চিরন্তন আকূতি ভারমুক্ত হ'য়ে গেছে। তাই বলি, চল পথিক, মায়ের আরাধনায় নিজস্ব জীবন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিতে চল। চল, চল মা যে ডাকছেন। আর দেরী নয়, চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সোমপায়ীর গান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল—১১৯ সোমসূক্ত পাঠের অনুসরণে)

মনে হয় অরিজনে করি আজ ক্ষমা,
ভুলে গিয়ে রাগ-রোষ ক্ষোভ-দ্বেষ জমা।
মনে হয় উঁচু নীচু সবাই সমান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় আজ মোর সকলেই ভাই।
কারো সাথে মোর আর দ্বেষা-দ্বেষি নাই।
মনে হয় মোর সবই ক'রে দিই দান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে পড়ে যত কিছু করিয়াছি পাপ,
সে সবের তরে মোর হয় অনুতাপ।
করিয়াছি আমি যেন অমৃতে সিনান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় মোর ঠাঁই সকলের নীচে,
আমি কবি এ কথাটা আগাগোড়া মিছে।
বড় ভুল করিয়াছি পুষি অভিমান,
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় এ জগতে সুত মিত জায়া
যাহাদের মোহে মজি, সবি তারা মায়া।
মনে হয় কে আমারে করিছে আহ্বান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় আমি যেন এ ধরার নই,
কার অভিশাপে যেন হেথা আমি রই।
হ'ল কি আমার আজ শাপ অবসান?
আমি কি করেছি সোম পান?

অথর্ববেদে পৃথিবী-স্তুতি

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

[পৃথিবীস্তুতি অথর্ববেদের দ্বাদশ খণ্ডের প্রথম সূক্ত। ইহাতে ৬৩টি মন্ত্র আছে। ভাবগৌরবে, এবং অর্থমাধুর্যে ইহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক ইহার সাবলীল অনুবাদ করিয়াছেন। লেখকের রচিত ঋগ্‌বেদ (প্রথম অষ্টক)-এর অনুবাদ সমালোচকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উঃ সঃ]

১। পৃথিবীকে ধারণ করে সত্য, বৃহৎ, ঋত, শক্তি, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ। ভূত কালের তিনি সম্রাজ্ঞী—ভাবী কালেরও তিনি অধীশ্বরী। সেই বরণীয়া জননী আমাদিগের জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রকাশিত করুন।

২। পৃথিবীতে রয়েছে বহু উচ্চাবচ ভূমি, রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল, পৃথিবী বীর্যদ নানা ওষধীকে পোষণ করে—মানুষের মাঝে যে বাধা, সে বাধা তাকে পীড়ন করে না, সেই পৃথিবী প্রশস্ততরা হ'ক, প্রিয়তরা হ'ক।

৩। যেখানে রয়েছে সমুদ্র, নদনদীর জলধারা, যেখানে নানাবিধ অন্ন বিরাজমান, যেখানে নব নব সভ্যতার পত্তন, যেখানে প্রাণের চঞ্চল লীলাবিলাস, সেই ভূমি আমাদিগকে দিন প্রচুর পানীয়।

৪। যে পৃথিবীর চারিটি দিক্, যেখানে অন্ন ও সভ্যতার নব নব বিস্তার, যিনি বহুবিধ প্রাণীকে পালন করেন, সেই পৃথিবী আমাদিগকে দিন গোধন এবং অন্যান্য সম্পদ্।

৫। যে পৃথিবীতে চলেছে পূর্বজদের জীবনলীলা, যেখানে দেবতারা অসুরদের করেছেন পরাজিত, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিধান করুন গো, অশ্ব এবং পক্ষিকুল; দান করুন সৌভাগ্য এবং প্রজ্ঞার জ্যোতি।

৬। যে বসুধা বিশ্বম্ভরা, ধনদাত্রী, সর্বপ্রতিষ্ঠা, যাঁর বক্ষে হিরণ্য, সর্ব জীবজগতের নিবাসভূমি, অগ্নিবৈশ্বানরের ধারিণী—যিনি ঋষভ ইন্দ্রের সঙ্গিনী সেই ভূ-জননী আমাদিগকে দিন সকল ঐশ্বর্য।

৭। যাঁকে অতন্দ্র দেবগণ অ-প্রমাদের সঙ্গে সর্বদা রক্ষা করেন, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য প্রিয় মধু দোহন করুন, আর আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার জ্যোতিতে ভাস্বর করুন।

৮। যে পৃথিবী অগ্রে অর্ণব সলিলে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে মনীষীরা মায়ার সহায়ে আবিষ্কার করেছিলেন, পরম ব্যোমে রয়েছে যাঁর হৃদয়, যা সত্যে আবৃত, অমৃতময়, সেই পৃথিবীভূমি দিন আমাদের লাবণ্য এবং বীর্য, দিন আমাদের উত্তম রাষ্ট্র।

৯। যেখানে অহোরাত্র বিবিধ সলিলধারা নিরন্তর ক্ষরিত হচ্ছে, সেই ভূমি দোহন করুন আমাদের জন্য ভূরি পয়োধারা, অভিষিক্ত করুন মস্তক বিদ্যার বিমল জ্যোতি দ্বারা।

১০। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাঁকে পরিমাপ করেছিলেন, বিষ্ণু যেখানে বিচরণ করেছিলেন, শচীপতি ইন্দ্র যাঁকে পরম আত্মীয় ব'লে মেনেছিলেন, সেই ভূমিমাতা আমার জন্য বর্ষণ করুন ক্ষীরধারা।

১১। তোমার তুষারমৌলি পর্বত-শ্রেণী, তোমার গভীর অরণ্য হ'ক আমাদের বন্ধু, তোমার নানা বর্ণ—কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও ধূসর, কোথাও লোহিত—ইন্দ্ররক্ষিতা সেই ধ্রুবা পৃথিবীতে অজিত, অক্ষত, অহত হ'য়ে আমি অধিষ্ঠান ক'রব।

১২। তোমার যা মধ্য, তোমার যা নাভি, সেখানে আমাদের স্থাপন কর; তোমার শরীরে যে মহৎ বীর্য, তা দিয়ে আমাদের সবল কর;

আমাদের জন্য তুমি পবিত্র হও। হে ভূমি, তুমি আমাদের মাতা, আমরা তোমার পুত্র; পর্জন্য আমাদের পিতা—তিনিও আমাদের রক্ষা করুন।

১৩। যে ভূমিতে পুরোহিত বেদী রচনা করেন, যেখানে বিশ্বকর্মা সাধকেরা যজ্ঞ বিস্তার করেন, যেখানে আহুতির পুরোভাগে উন্নত এবং উজ্জ্বল যজ্ঞকাষ্ঠ বিরাজমান থাকে, সেই ভূমি বর্ধমান হ'য়ে আমাদের বিবর্ধিত করুন।

১৪। যে আমাদের দ্বেষ করে, যে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে, যে মনে মনে আমাদের হিংসা করে, আমাদের মনের প্রার্থনা জেনে হে পৃথিবী, তাকে তুমি আমাদের অধীন কর।

১৫। মর্ত্য জীব তোমাতে জাত হ'য়ে তোমার উপর বাস করে, দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ—উভয়কেই তুমি পালন কর, হে পৃথিবী! মানুষের পঞ্চ জাতি তোমারই সন্তান, যাদের উপর উদীয়মান অরুণ আপন কিরণজালে অমৃত জ্যোতি বর্ষণ করে।

১৬। সমগ্র মানব-জাতি—আমাদের জন্য বর্ষিত হ'ক প্রীতির ক্ষীরধারা, হে পৃথিবী, তুমি আমার বাক্যে দাও গভীর মধুরতা।

১৭। এই বিপুলা পৃথ্বী সকল ওষধীর মাতা, ধ্রুবা এবং ধর্মে ধৃতা—কল্যাণী এবং শান্তিময়ী ধরণীর মাঝে আমরা যেন চিরজীবন আনন্দে বাস করি।

১৮। মহামিলনভূমি, তুমি মহীয়সী, মহান্-বেগে তুমি চঞ্চল, চিরকম্পিত তোমার অঞ্চল, ইন্দ্র তোমার চিরন্তন রক্ষাকারী, হে ধরিত্রী! হিরণ্যের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের দীপ্ত কর, কেউ যেন আমাদের ঘৃণা না করে।

১৯। অগ্নি আছেন ভূমিতে, আছেন ওষধীতে, সলিলে অনল-দ্যুতি, প্রস্তরে অগ্নির বিভূতি, অগ্নি পুরুষের অন্তরে, গো এবং অশ্বের মাঝেও দেখি হুতাশনকে।

২০। অগ্নি আকাশ থেকে দেন উত্তাপ, দিব্যহুতাশনে পরিব্যাপ্ত বিরাট অন্তরীক্ষ, হব্যবাহন ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে মর্ত্য মানুষ প্রতিদিন জ্বালেন ইন্ধনে।

২১। কৃষ্ণজানু অগ্নিবাস ধরাতল আমাকে করুন উজ্জ্বলধী এবং সতর্কচক্ষু।

২২। পৃথিবীর বুকেই চ'লে মানুষের যজ্ঞায়োজন, সেখানেই মানুষ ঢালে তার হব্য, মর্ত্য মানুষ এই ভূমিতেই অন্ন এবং সেবার দ্বারা বেঁচে থাকে।

২৩। তোমার রয়েছে যে সৌরভ—ওষধী এবং জলে যার জন্ম, গন্ধর্ব এবং অপ্সরারা যা উপভোগ করে, সেই গন্ধে আমায় সুরভিত কর, কেউ যেন আমায় হেলা না করে।

২৪। পদ্মে লুকানো তোমার যে সৌরভ, সূর্যার বিবাহে দেবতারা যে সৌরভ সংগ্রহ করেছিলেন, তোমার সেই গন্ধে আমায় সুগন্ধি কর, কেউ যেন আমায় হেলা না করে।

২৫। তোমার যে গন্ধ পুরুষে, তোমার যে রুচি এবং লাবণ্য স্ত্রী-পুরুষে, অশ্বে এবং বীরপুরুষে, মৃগে এবং হস্তীতে, কন্যায় যে সুষমা, সে সব দিয়ে এই পৃথিবীতে আমাদের সমৃদ্ধ কর।

২৬। শিলা, প্রস্তর ও ধূলিতে গড়া ভূমি, তাদের সম্মেলনে ধৃতা ধরিত্রী। হিরণ্যবক্ষা সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার।

২৭। যেখানে বিপুল বনস্পতি ধ্রুব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই বিশ্বপালিকা ধরণীকে জানাই গভীর আহ্বান।

২৮। উঠতে গিয়ে, বসে পড়তে, দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা চলতে গিয়ে আমরা যেন ডান কি বাঁ পায়ে না পাই কোন ব্যথা।

২৯। পবিত্রা পৃথিবীর সাথে বলি কথা, তপস্যায় বর্ধমান ভূমিকে জানাই প্রাণের ব্যথা,

জননী তোমার কোলে বাঁধব অক্ষয় বাসা, তুমি যে দাও উর্জ্জ, পুষ্টি, দাও ঘৃত এবং অন্নের আশা।

৩০। শুদ্ধ সলিলধারা আমাদের তনুকে করুক মালিন্যমুক্ত, অপ্রিয় জনের দেহ আমাদের গাত্রমলে হ'ক লিপ্ত, হে পৃথিবী! পবিত্র সলিলে নিজেকে ক'রব শুচি এবং পবিত্র।

৩১। যখন চলব তোমার বুকে তখন যেন হে জননী! তোমার প্রাচী ও প্রতীচী, তোমার উদীচী ও অবাচী হয় প্রিয় ও রমণীয়, তোমার ভুবনে বেঁধেছি বাসা, না থাকে যেন মা, পতনের আশা।

৩২। পশ্চাৎ হ'তে কিংবা পুরোভাগ হ'তে, উত্তর থেকে কিংবা অধঃ থেকে যেন না হয় নির্বাসন, হে ভূমি, তুমি দাও পরম স্বস্তি, শত্রু যেন না পায় দর্শন—দূরে রাখ তাদের বধাস্ত্রের স্পর্শন।

৩৩। যতদিন দেখি তোমার মধুর মূর্তি, সূর্য যতদিন দেয় স্ফূর্তি, ততদিন যেন থাকে প্রখর দৃষ্টি, বর্ষের পর বর্ষ যত হয় সৃষ্টি।

৩৪। যখন শুয়ে থাকি, যখন ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করি, উত্তান অবস্থায় যখন আমরা আমাদের পঞ্জরে তোমার উপর চাপ দিই, তখন যেন হে পৃথিবী, তুমি আমাদের অতি নিকটে থেকে আমাদের হিংসা না কর।

৩৫। যা খনন করি তা যেন ক্ষিপ্র আহরণ করি, যেন খননে তোমার হৃদয় এবং মর্ম বিদারণ না করি।

৩৬। হে ভূমি জননী, তোমার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত ঋতুসকল তোমার বিহিত বর্ষসকল, তোমার দিনরাত্রি আমাদের জন্য ক্ষীরধারা আনুক।

৩৭। পবিত্র মহী, সর্পভয়ে ভীতা, যাহার সলিলে বাড়বানল, যিনি নিন্দুক দস্যুকে বিনাশের জন্য অর্পণ করেন, যিনি বৃত্রের বিরোধী এবং ইন্দ্রের সহায়, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন।

৩৮। যাঁর উপর হবির্ধান শকট, যাঁর বুকে যূপকাষ্ঠ প্রোথিত, ঋক্ যজুঃ সামে যেখানে দেবতার অর্চনা চলে, ইন্দ্রকে সোম পান করাবার জন্য যেখানে ঋত্বিকেরা আমন্ত্রিত হয়,

৩৯। প্রজাপতি ঋষিরা যেখানে গানে গানে আলোকের উৎসারণ করেন, সপ্ত ঋষি যেখানে সত্র অনুষ্ঠান করেন, যেখানে যজ্ঞ ও তপস্যার সমারোহ,

৪০। সেই পৃথিবী—যে ধন আমরা কামনা করি তাই আমাদের দিন, ভগ আমাদের সৌভাগ্য বর্ধন করুন। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হউন।

৪১। যেখানে মানুষেরা নাচে এবং গায়, যেখানে চলে সংগ্রাম, বাজে দুন্দুভি, সেই পৃথিবী শত্রু নিধন ক'রে আমাদের অসপত্ন করুন।

৪২। যেখানে অন্ন, ব্রীহি এবং যব, যেখানে পঞ্চ জাতির বাস, পর্জন্যপত্নী বৃষ্টিপরিপুষ্টা সেই পৃথিবীকে নমস্কার।

৪৩। দেবতারা যাঁর বুকে বিচিত্র পুর নির্মাণ করেছেন, প্রজাপতি বিশ্বগর্ভা তাঁর প্রত্যেক প্রদেশকে আমাদের প্রিয় ক'রে তুলুন।

৪৪। যাঁর গুহায় রয়েছে বহু নিধি, সেই পৃথিবী আমাদের দিন হিরণ্য, মণি এবং বসু; বসুধা বসুদা, দয়াবতী তিনি সুপ্রসন্ন হ'য়ে দিন আমাদের ধনসম্পদ্।

৪৫। পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষাভাষী মানুষের বাসা, তাদের নানা ধর্ম, নানা আচার, সেই পৃথিবী সহস্রধারায় অফুরন্ত দুগ্ধবতী গাভীর মতো আমাদের জন্য ধন দোহন করুন।

৪৬। সর্প ও বৃশ্চিক তৃষিত দংষ্ট্রায় শীতে অসাড় হ'য়ে গুহায় থাকে ঘুমিয়ে, প্রাবৃট্ কালে ক্রিমি ইত্যাদি যা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, সেই সব সরীসৃপ যেন আমাদের উপর যাতায়াত না

করে—মঙ্গল যাহা, কল্যাণ যাহা, তাই দিয়ে তুমি প্রসন্ন হও।

৪৭। তোমার যে-সব বহুবিচিত্র পন্থা, রথ ও শকটের মার্গ, সেই পথ দিয়ে চলে ভদ্র এবং পাপী, সেই পথ যেন আমরা জয় করতে পারি—শত্রুহীন ও তস্করহীন করতে পারি। যা শিবময় তাই দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ কর।

৪৮। পৃথিবী ভদ্রকে আশ্রয় দেয়, অভদ্রকেও করে পালন, পাপ ও পুণ্যের নিবাসকে মেনে নেয় —পৃথিবী বরাহের সঙ্গিনী হ'য়ে বরাহাবতারকে করে আলিঙ্গন।

৪৯। হে পৃথিবী, আমাদের কাছ থেকে দূর কর তোমার আরণ্য পশু—বনবাসী জন্তু, নরখাদক সিংহ ও ব্যাঘ্র, দূর কর উল এবং বৃক, দূর কর দুর্ঘটনা এবং অনিষ্ট, পরাভূত কর রাক্ষস।

৫০। গন্ধর্ব, অপ্সরা, পিশাচ এবং রাক্ষস—প্রভৃতির উৎপাত থেকে বাঁচাও আমাদের হে পৃথিবী!

৫১। যার উপর দ্বিপদ পক্ষীরা সমবেত হ'য়ে উড়ে পড়ে, হংস সুপর্ণ শকুন এবং বায়স বিচরণ করে, সেখানে মাতরিশ্বা ধূলায় ঝড় উড়ায়, তরু-শির কাঁপায়, বাতাস যেমন এদিক ওদিক চলে, আগুন জলে তেমনই।

৫২। যে পৃথিবীতে শুক্ল দিবস এবং কৃষ্ণ রাত্রি বিহিত হয়েছে, বারিবর্ষণে যে পৃথিবী পরিপ্লাবিত, সে পৃথিবী তার প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদিগকে প্রিয়তম ধামে ধামে রাখুন।

৫৩। দ্যৌ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমাকে দিয়েছেন বিশাল বিস্তার; অগ্নি, সূর্য, অপ্ এবং বিশ্বদেবগণ আমাকে দিয়েছেন বিপুল মেধা।

৫৪। আমি পরাক্রান্ত, এই পৃথিবীতে সর্বোত্তর আমার নাম, বিজয়ী আমি বিশ্বজয়ী, সমস্ত দিক্ বিজয় ক'রে আমি দিগ্বিজয়ী।

৫৫। হে দেবি, দেবতারা যখন প্রথমানা তোমাকে 'পৃথিবী' নাম দিয়েছিলেন, তখন তুমি তোমার মহিমা বিস্তার করেছিলে—তখন ভূতি ঐশ্বর্য তোমায় ঘিরেছিল এবং তুমি চারিদিক্ কম্পিত করেছিলে।

৫৬। গ্রামে এবং অরণ্যে, সভায় এবং সমিতিতে যা রয়েছে, পৃথিবীর বুকে সেখানে যেন আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

৫৭। অশ্ব যেমন ধূলি উড়ায়, পৃথিবী তেমনই অধিবাসী জনগণকে বিপর্যস্ত করে (মাঝে মাঝে)—পৃথিবী সুন্দরী নেত্রী, বনস্পতি এবং ওষধীর ধারিণী।

৫৮। যে কথা বলছি তা মধুময় ক'রে বলছি, যা দেখছি তা আমায় সমাদর করছে, দ্যুতিমান্ আমি, ধীমান্ আমি, যারা আমায় প্রতিহত করে, তাদের আমি বধ করি।

৫৯। শান্ত সুগন্ধি, প্রসন্না, ক্ষীরধারাময়ী পয়স্বতী পৃথিবী আমাকে বীর্যবান্ ও সাহসী করুন।

৬০। বিশ্বকর্মা যাকে হবির্দানে অন্বেষণ করেছিলেন, যখন পৃথিবী অন্তরীক্ষের অর্ণবে প্রবেশ করেছিল, সর্ব ভোগদায়িনী গুহানিহিতা সেই পৃথিবী দেবগণ এবং মাতৃগণের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

৬১। তুমি মানুষকে দিকে দেশান্তরে ছড়িয়ে দাও, তুমিই কামদুঘা অদিতির মতো বিস্তারিত হ'য়ে চলেছ, ঋতের প্রথমজাত পুত্র প্রজাপতি—তোমার যা কিছু অভাব দূর ক'রে দেবেন।

৬২। রোগহীন, ব্যাধিহীন ক'রে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দাও হে জননী! আমাদের দাও দীর্ঘ আয়ু, আমরা যেন প্রতিবোধদীপ্ত হ'য়ে চিরজীবন তোমার বলি আহরণ করি।

৬৩। ভদ্র এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ভূমিতে আমায় স্থাপন কর হে পৃথিবী! পিতা দ্যুলোকের অনুকম্পায়—হে জ্ঞানময়ী মাতা! দাও তুমি আমাকে পরমা শ্রী এবং অবিচলা ভূতি।

ভক্তিপ্রসঙ্গে*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন আমরা হরিকে ভুলে থাকি সেই দিনই আসল দুর্দিন।

উপনিষদে আছে—শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে জানলে সব জানা যায়? গুরু বললেন, আত্মা বা ব্রহ্মকে জানলেই সব জানা যায়। এ একটু একটু ক'রে জানা নয়, পূর্ণ জ্ঞান এবং তার সঙ্গে শান্তি ও আনন্দ।

বেদে দুইটি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র সবই তো অপরা, যদি তাঁকে না জানা যায়। শাস্ত্র পড়ে যাঁরা শুধু পণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরা অপরা বিদ্যাই লাভ করেছেন। পরা বিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়।

ঠাকুর অপরা বিদ্যা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বড় ভাই তাঁকে টোলে নিয়ে গিয়ে শাস্ত্র শেখাতে চাইলেন, কিন্তু ঠাকুর চালকলা-বাঁধা বিদ্যা শিক্ষা করলেন না—অর্থাৎ অপরা বিদ্যা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু তাই ব'লে কি তিনি মূর্খ ছিলেন? তা নয়; তিনি যা লাভ করলেন, সেইটিই আসল জ্ঞান, পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা। ঠাকুর এই পরাবিদ্যা লাভ ক'রে জ্ঞানের খনিতে—আনন্দের খনিতে ডুবে গেলেন, সেই গভীর সমাধি থেকে কত রত্ন উঠিয়ে এনে চারদিকে বিলিয়ে দিলেন।

তাঁর তো লেখাপড়া ছিল না, কিন্তু 'কথামৃত' পড়ে দেখবে, গীতার সার, ভাগবতের সার, সব শাস্ত্রের সার তাতে আছে। ঠাকুর কি ক'রে জানলেন এ-সব? মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার—মা রাশ ঠেলে দিতেন ঠাকুরকে—তাই তাঁর বাণী শুনে পণ্ডিত ধনী বৈজ্ঞানিক সব স্তব্ধ হ'য়ে থাকতেন। কত সহজ ভাষায় ঠাকুর সর্বসাধারণকে বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অনুভূতি-লব্ধ গভীর জ্ঞান। জগৎ তা পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

আসল জিনিস ভেতরে, বাইরে নয়—ভেতর পূর্ণ ক'রে রয়েছেন তিনি, তাই তাঁকে জানলেই সব জানা হ'য়ে যায়—সব পূর্ণ হ'য়ে যায়।

গীতা সর্বশাস্ত্রের সার, স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ থেকে গীতা কথিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ-যুক্ত অবস্থায়, অর্জুনকে এই গীতা বলেছিলেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর অর্জুন আর একবার গীতা শুনতে চাইলে ভগবান বলেছিলেন, 'অর্জুন কুরুক্ষেত্রে আমি যে যোগযুক্ত অবস্থায় ছিলুম—সে অবস্থা তো এখন আমার নেই—এখন কি ক'রে সেভাবে তোমায় গীতা ব'লব?'

বাস্তবিক অবতারপুরুষেরা যেন channel (প্রণালী), ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই তাঁদের মধ্য দিয়েই আসে ব্রহ্মবাণী। ঠাকুর সমাধির গভীর সমুদ্রতল থেকে 'রত্ন' তুলে এনে সকলকে বিলিয়ে দিতেন।

স্বামীজী বলতেন, ঠাকুরকে না জানলে শাস্ত্র বোঝা যায় না—আবার 'কথামৃত' না পড়লে ঠাকুরকে জানা যায় না। এই কথামৃত-লেখক মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

দু-তিন দিন ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পরেই তিনি ঠাকুরকে ঐশ্বরিক পুরুষ ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঠাকুরকে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। গীতা যেমন শুধু অর্জুনের জন্য নয়—মাস্টার মহাশয়ের এই প্রশ্নোত্তরও শুধু তাঁর একার জন্যে নয়; এই প্রশ্ন চিরন্তন, এ প্রশ্ন সকলের।

*করিমগঞ্জে ২৫.৪.৫৭ তারিখে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী সুধা সেন কর্তৃক অনুলিখিত।

১ম প্রশ্ন—ঈশ্বরে কি ক'রে ভক্তি হয় ?

২য় „—সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হয় ?

৩য় „—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

৪র্থ „—মনের কি অবস্থা হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয় ?

কি ক'রে ভক্তি লাভ হয়—এইটি প্রথম প্রশ্ন। ঠাকুর বলতেন ভক্তি আট রকম :

(১) জ্ঞান-ভক্তি—ঈশ্বর আছেন এইটি জেনে বিশ্বাস।

(২) বৈধী ভক্তি—এত জপ করতে হবে, পুরশ্চরণ করতে হবে, তীর্থে গমন করতে হবে—ইত্যাদি।

(৩) রাগ-ভক্তি—এইটি প্রেমাভক্তি, এইটি লাভ করবার জন্যেই বিধি-অনুষ্ঠান সব। পাখার হাওয়া কতক্ষণ দরকার? যতক্ষণ বাতাস না বয়। প্রেমাভক্তি এলে আর কোন বিধির দরকার হয় না। মাঠের ধান কাটা হ'য়ে গেলে যেমন আল ঘুরে যেতে হয় না, সব সোজা পথ; তেমনি এই রাগাত্মিকা ভক্তি এলে সব সোজা হ'য়ে যায়। এ অতি উচ্চ স্তরের ভক্তি, এই ভক্তি দিয়ে তাঁকে বাঁধা যায়।

(৪) বিজ্ঞান-ভক্তি—ভগবানকে জানবার পর এই ভক্তি হয়।

(৫) শুদ্ধা নিষ্কাম ভক্তি—এই ভক্তিতে কোন কামনা নেই—শুদ্ধা অমলা ভক্তি; বৃন্দাবনের গোপীদের এই ভক্তি হয়েছিল।

(৬) অহৈতুকী ভক্তি—ভালো না বেসে থাকতে পারে না ব'লে ভালোবাসে—যেমন প্রহ্লাদের হয়েছিল।

(৭) উর্জিতা ভক্তি—এ ভক্তি অনেক উর্ধ্বস্তরের, যেমন মহাপ্রভুর—বন দেখে বৃন্দাবন-বোধ; সমুদ্র দেখে তাঁর যমুনা-বোধ হ'ত।

(৮) মধুর ভক্তি,—এ ভক্তি শুধু শ্রীমতীর হয়েছিল। দাস্য-সখ্যাদি সর্বভাবের সমন্বয় এই ভাবে। অশ্রু স্তম্ভ পুলক প্রভৃতি এবং সে দিব্যোন্মাদ অবস্থা শ্রীমতীর হয়েছিল—জীবের এই ভাব হয় না। এই ভক্তিই চরম।

ঠাকুর এই আটরকম ভক্তির কথা বলেছেন। কি ক'রে ভক্তি লাভ হয়? কায়মনোবাক্যে উপাসনা করতে হবে—বলতেন ঠাকুর। পায়ে-হেঁটে তাঁর স্থানে যাওয়া, হাতে ফুল তোলা প্রভৃতি সেবার কাজ করা, কানে তাঁর গুণানুকীর্তন শোনা, মুখে তাঁর কীর্তন করা, সর্বদা তাঁর চিন্তা করা—এই সবই কায়মনোবাক্যে উপাসনা।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ—এই তিনটি আসল জিনিস। তবে এর সঙ্গে আর একটি জিনিস চাই—সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ না হ'লে শুধু শ্রবণ-কীর্তনে কিছু হবে না। ঠাকুর বলতেন, সাধুসঙ্গ হ'ল ঘড়ি-মেলানো, সংসারের দিকে কতটা 'ফাস্ট' চলেছে আর ঈশ্বরের দিকে কতটা 'স্লো'; সেইটেই 'রেগুলেট' করা।

সাধুসঙ্গে আর সাধুমুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার পরে হয় নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পরে ভক্তি।

> ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা—
> ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

ক্ষণমাত্র সজ্জনের সঙ্গই তরণী-স্বরূপ হ'য়ে ভবার্ণব পার ক'রে দেয়।

কুলীন-গ্রামবাসী রামানন্দ জানতে চাইলেন, 'বৈষ্ণব কে?' উত্তরে মহাপ্রভু বলেছিলেন :

> যাঁহারে দেখিলে হৃদে স্ফুরে কৃষ্ণনাম,
> তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।

বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধু—যিনি প্রকৃত সাধু তিনি শুধু তাঁর উপস্থিতি দ্বারাই লোকের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি জাগিয়ে দিতে পারেন।

মিনতি

'বনফুল'

হেথায় মোরা থাকব না কেউ
যেতে হবে নূতন দেশে
কিছুক্ষণের জন্যে কেবল
মিলেছি ভাই হেথায় এসে।

পাঠিয়েছিল কে আমারে ভবের হাটে
কিছুক্ষণের স্বপন-ঘোরে জীবন কাটে;

টুটবে স্বপন ভাঙবে মেলা
ফুরিয়ে যাবে মায়ার খেলা
অচিন দেশের বন্ধু যখন
ডাক দেবে রে মরণ-বেশে।

কিছুক্ষণের মোহের দোলায়
দুলছি তবু—
দোলাও, দোলাও, আরও দোলাও
দোলাও প্রভু।

তোমার দোলা, তোমার আমি
এই কথাটি জীবনস্বামি,
ভুলিয়ে যেন দিও না কো
এই মিনতি করি শেষে।

যে রাতে এল ঝড়

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সে রাতে তুমি বাহিরে ছিলে, যে রাতে এলো ঝড়।
অর্থহীন প্রলাপ যেন, শঙ্কাহীন প্রতাপ সম,
অরণ্যের উর্দ্ধ্ববাহু দোলায় নিরন্তর।

কাঁপায় শাখা, ঝরায় পাতা, জাগায় শিহরণ,
নৃত্যময় ছন্দে তার তাণ্ডবের কী ঝঙ্কার!
বর্ষণের বিন্দুপাতে কাঁদায় সারা বন।

আকশ-ভরা মেঘের জটা ছড়ায় থরে থরে,
লক্ষফণা বিদ্যুতের, নিদ্রাহীন অশান্তের
বক্ষোপরে বরুনার চমক তুলে ধরে।

মাঠের 'পরে বনের শিরে জলের ধারাপাত,
কর্ণিকার গুচ্ছতলে একটি দুটি জোনাক জলে,
সহসা শুনি হৃদয়দ্বারে তোমার করাঘাত।

দুয়ার খুলে বাহিরে চেয়ে দেখছি শুধু ছায়া,
মল্লারের কাঁপন লেগে, বৃষ্টিধারা ঝরিছে মেঘে,
স্পন্দমান অন্ধকারে ঘনায় সুর-মায়া।

যে রাতে তুমি বাহিরে ছিলে, সে রাতে এলো ঝড়।
ব্যাকুলপ্রাণ অরণ্যের বাঁধিতে চায় অনন্তের
বিরামহীন সঙ্গীতের নিরন্ত নির্ঝর।
কখন তুমি নীরবে এসে ভরেছ অন্তর।

তুমি বরাভয়া !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী কাব্যশ্রী

অনেক বেদনা আছে এ হৃদয় ছেয়ে,
অনেক নিরাশা জাগে মথিয়া অন্তর,
অনেক অশ্রুর ধারা ঝরে গণ্ড বেয়ে,
তারি লাগি এ জীবন কত না কাতর !

দুর্গতি ও অভাবের নেই পরিশেষ,
চলার পথের মাঝে নামে শ্রান্তি-ভার,
দেহে মনে জাগে কত দুর্বিষহ ক্লেশ,
তাই চিত্ত অশান্তিতে জ্বলে অনিবার !

সকল দুঃখের শান্তি লভিতে জীবনে,
জননি, তোমারে আমি করেছি স্মরণ ;
কেঁদেছি বিরলে বসি অঝোর নয়নে
শুনেছ কি সে আকূতি—সে মোর ক্রন্দন ?

করুণানিলয়া তুমি, তাই গো তোমারে—
ডেকেছি আকুলকণ্ঠে আশ্রয়ের তরে,
তুমি কি এসেছ কভু বুকের দুয়ারে—
প্রাণের পরশ তব জাগাতে অন্তরে ?

কই মা প্রাণের শান্তি তব নাম-গানে ?
কই মা বুকের তৃপ্তি তব স্নেহাঞ্চলে ?
কই মা আনন্দ-স্বাদ তব রূপ-ধ্যানে ?
কই মা জীবন-গতি তব পদ-তলে ?

যেন কোন্ বাধা এসে মোর অভিমুখে—
তোমার আমার মাঝে রচে ব্যবধান !
প্রসন্ন হাসির ছটা তব স্মিত-মুখে
ঝরিছে যা নিত্য দিন—পাই না সন্ধান !

জননি, তোমার কাছে এসেছি আবার,
তোমার দুয়ার-পাশে রয়েছি দাঁড়ায়ে !
একটু পরশ তব চির-করুণার—
দেবে না বুকের 'পরে চরণ বাড়ায়ে ?

দেবে না স্নেহের সুধা বিশুষ্ক অধরে ?
চিন্ময়ী জ্যোতিতে মম মর্মের আঁধার—
দেবে না ঘুচায়ে তুমি ? মোর আঁখি 'পরে
ফুটাবে না স্নেহ-ঘন রূপ অমরার ?

তুমি দুর্গা দুঃখ-হরা, দুর্গতি-নাশিনী,
কল্যাণী জননী তুমি—তুমি বরাভয়া !
তুমি মম ত্রাণ-কর্ত্রী—নিখিল-তারিণী,
তুমি মা পরমা গতি, তুমি সর্বাশ্রয়া !

আমার জীবনখানি দেবে না জাগায়ে ?
শুভ-ক্ষণে করিবে না তোমার বোধন ?
দূর হ'তে কাছে এসে দু-কর বাড়ায়ে—
অঙ্কে ধরি করিবে না ধন্য এ জীবন ?

হৃদয়-দেবতা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বাহির যখন হয়েছে বিমুখ
গৃহ যবে বিদ্রোহী,
গ্রহ-নিগ্রহে সবাকার গালি
মাথা পেতে যবে সহি,
বন্ধু বলিতে সামনে যখন
কাউকে পাইনে খুঁজি,
অন্তরে যবে শান্তি হারায়ে
ধরারে অসহ বুঝি,—

সেই দুর্দিনে—সে আঘাত সয়ে
তোমারে পড়িল মনে,
হৃদয়-দেবতা তুমি যে রয়েছ
হৃদয়ে সংগোপনে !

শ্রীদুর্গা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

নমো নমো দুর্গে সুখকরণী।
নমো নমো অম্বে দুখহরণী॥
—দুর্গাচালীসা

বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। দেবীভাগবতের ৩।৩০ অধ্যায়ে, কালিকা-পুরাণে ৬০তম অধ্যায়ে, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের পূর্বখণ্ডে ২১।২২ অধ্যায়ে এবং মহাভাগবতে ৩৬।৪৮ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা বর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যায় যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি দেবীর কৃপালাভ করিয়া রাবণ-বধ এবং সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। দেবী প্রসন্না হইয়া মহাষ্টমীর নিশীথে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'হে রাঘব! তুমি লঙ্কায় বসন্তকালে পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার আরাধনা করিও, পরে পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া যথাসুখে রাজ্য করিও।' —(দেবীভাগবতম্ ৩।৩০)

বসন্তে সেবনং কার্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া।
হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৬৬তম অধ্যায়ে লিখিত আছে: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে চৈত্র মাসে রাসমণ্ডলে শ্রীদুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। মধু ও কৈটভের ভয়ে ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য দুর্গার স্তুতি করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রাণসঙ্কটে দেবীর আরাধনা করিয়া বৃত্রাসুর বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মর্ত্যে সর্বপ্রথম সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শ্রীদুর্গার পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার আশায় একমাস কাত্যায়নীর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য শ্রীদুর্গার উপাসনা করিয়াছিলেন। গোস্বামী তুলসীদাস-কৃত 'রামচরিতমানসে' আছে যে শ্রীসীতা খুব অনুরাগের সহিত গৌরীপূজা করিয়াছিলেন এবং মনোমত পতিলাভের জন্য তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাভারতে বিরাট-পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য যখন পাণ্ডবেরা বিরাট রাজার পুরীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তখন যুধিষ্ঠির ঋষিদের উপদেশ-মত অজ্ঞাতবাস যাহাতে সফল হয়, তজ্জন্য শ্রীদুর্গার স্তুতি করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আছে, অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-মত দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে রাত্রিসূক্ত-পরিশিষ্টে আছে: দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ॥

—দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ত্রাণকারিণি, সংসারসাগর পার হইবার জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নবম অনুবাকে আছে: কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।

—আমরা দেবী কাত্যায়নীকে জানি, কন্যাকুমারীকে ধ্যান করি, সেই দুর্গাদেবী যেন আমাদের বুদ্ধি তাঁহার দিকে চালিত করেন।

শ্রীদেব্যথর্বশীর্ষে আছে :

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণং প্রপদ্যামহে-
হসুরান্নাশয়িত্রৈ তে নমঃ॥

—হে অসুর-ধ্বংসকারিণি দুর্গে দেবি! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অগ্নিবর্ণা, জ্ঞানের প্রভায় সমুজ্জ্বলা, তুমি দীপ্তিমতী, এবং কর্মফল পাইবার জন্য লোকে তোমার উপাসনা করিয়া থাকে। তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

অথর্ববেদ ইহাও বলেন যে যাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনিই 'দুর্গা' নামে প্রসিদ্ধা। দেবী-উপনিষদে আছে যে তিনি দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন বলিয়া 'দুর্গা' নামে অভিহিতা। দেবীপুরাণে আছে যে স্মরণমাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম 'দুর্গা'। শ্রীচণ্ডীতে আছে যে দেবী শাকম্ভরী অবতারকালে 'দুর্গ'নামক মহাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'দুর্গা' হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে (৭২।৭১) দেবীমুখে বর্ণিত আছে : আজ হইতে আমার নাম 'দুর্গা' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। যেহেতু যুদ্ধে দুর্গ দৈত্যকে অতি সঙ্কটে বধ করিয়াছিলাম। যাহারা আমার অর্থাৎ দুর্গার শরণাগত হইয়া থাকে তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না।

'অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গ দৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ।
যে মাং দুর্গাং শরণাগতা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ॥'

পরমানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যার মা আনন্দময়ী—
　　সে কি নিরানন্দে থাকে?
ঘিরে রয় আনন্দ তারে,
　　সুধার ভোজে সদাই ডাকে।
দুখের উড়ো মেঘ আসে যায়,
নীলাকাশ নীল থাকেই তো তায়,
মন যে তাহার চন্দন-বন,
　　সুরভি বয় ঝাঁকে ঝাঁকে।

আনন্দের গোমুখী-ধারার
　　সঙ্গে তাহার যোগ যে আছে
অফুরন্ত রসের ধারা—
　　দুখ কি ঘেঁষে তাহার কাছে?
মায়ের পদ্মহস্ত শিরে,
পদ্ম ফোটে নয়ন-নীরে,
সুধা-তরঙ্গিণীকে সে
　　বন্দী ক'রে বুকে রাখে।

ব্যথা-বেদন, বিপদ-আপদ
　　ছুটে আসে খুব দাপটে,
আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে
　　তাহার পায়ের সন্নিকটে।
ভয়াল ব্যাঘ্র হয় যে নত,
যেন মেষ-শাবকের মত
সর্প—হ'য়ে দর্পহারা—
　　তার চরণের ধূলা মাখে।

মায়ের কনক-কেশরী যে
　　কেশর বুলায় তাহার গায়ে।
অভয়ার সে কোলের ছেলে
　　ভয় কারুকে করে না হে।
আনন্দের আর নাইকো সীমা
মহামায়ার কি মহিমা!
ত্রিনয়নার তনয় সে যে—
　　আলোর মানুষ বলি তাকে।

জন্মান্তর-রহস্য

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

জন্মান্তর লইয়া অনাদি কাল হইতেই বহু বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলে, জীব মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না; কারণ শরীরটাই আত্মা, যে শরীর মরিয়া যায়, সেই শরীর কোন দিন উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না বলিয়া পুনর্জন্ম অসম্ভব। আবার কেহ কেহ বলে, শরীরটা আত্মা নয়; আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন। সেইহেতু জীব কর্মবশে যেমন বর্তমান শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পাপ-পুণ্য কর্মবশে মৃত্যুর পরও পুনরায় নূতন দেহ পায় বা জন্মগ্রহণ করে। অথচ এই জন্মান্তর আছে কি নাই—এই বিশ্বাসের উপর ধর্মের অনুষ্ঠান, অধর্মের বর্জন এবং ধর্মানুষ্ঠানের অনাবশ্যকতা বা ধর্মাধর্মের সত্যাসত্য নির্ভর করে। যেমন, যদি জন্মান্তর না থাকে, তাহা হইলে এই জন্মে যাহাতে সুখ হয়, সর্বপ্রকারে তাহার চেষ্টা করাই মানুষের ঐকান্তিক কাম্য হইয়া পড়িবে। বর্তমান জন্ম ব্যতিরিক্ত পরজন্ম যখন নাই, তখন এই জন্মেই যে কোন প্রকারে—চৌর্য, মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি দ্বারাও সুখলাভের চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নাই। যদি চৌর্য, মিথ্যা, প্রতারণার দ্বারা সমষ্টিভাবে সমাজের ক্ষতি হওয়ায় নিজেরও ক্ষতি হয় অর্থাৎ জীবনে সুখলাভ ব্যাহত হইয়া দুঃখই উৎপন্ন হয়, অতএব চৌর্যাদি বিধেয় নয়—এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলেও যাগ, হোম, ব্রত, উপবাস, দেবপূজা, ঈশ্বরের উপাসনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্ম-জ্ঞানলাভের চেষ্টা প্রভৃতি করার কোন সার্থকতা থাকে না; পরন্তু ঐগুলি অনর্থক নিজের কষ্টেরই কারণ হইয়া পড়ে বলিয়া উহাদের অনুষ্ঠান কেহই করিবে না। আর যদি জন্মান্তর থাকে, তাহা হইলে এই জন্মে ধর্মের অনুষ্ঠান ও অধর্ম বর্জনের অবশ্য-কর্তব্যতা স্বীকার্য হইয়া পড়ে। যেহেতু ধর্মের দ্বারা পরজন্মে সুখ আর অধর্মের দ্বারা পরজন্মে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধর্মের সম্পাদন ও অধর্ম ত্যাগের অবকাশ থাকে। এইজন্য জন্মান্তর আছে কি নাই, ইহা নিশ্চয় করা সকল লোকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন—এ বিষয়টি তো নিশ্চিত। কারণ বেদের কোথাও জন্মান্তরের কথা বলা হয় নাই। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই যে 'বেদের কোথাও জন্মান্তর উক্ত হয় নাই' ইহার অর্থ কি? 'জন্মান্তরমস্তি, জন্মান্তরমাসীৎ, জন্মান্তরং ভবিষ্যতি' এইরূপ স্পষ্টভাবে কোন বাক্য নাই। অথবা বেদের অর্থ পর্যালোচনা করিলে জন্মান্তর সিদ্ধ হয় না। এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষটি বক্তার অভিপ্রেত?

যদি বলা যায়, প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ 'জন্মান্তর আছে' ইত্যাদিরূপে স্পষ্টভাবে জন্মান্তরের কথা বেদে পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, সত্যই ঐরূপ শব্দপ্রয়োগ নাই। কিন্তু ঐরূপ শব্দ না থাকিলেই যদি জন্মান্তর অসিদ্ধ হইয়া যায়; তাহা হইলে পুরাণে উল্লিখিত কার্তবীর্যার্জুনকে সংক্ষেপে 'অর্জুন' বলিয়া কোথাও কোথাও বর্ণনা করায়, তিনি যে অর্জুনান্তর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ইহা না বলিয়া দিলেও লোকে যেমন বুঝিয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য শুভাশুভ কর্মের ফলে স্বর্গে বা নরকে জন্মগ্রহণ করে বলিলে লোকান্তরে জন্ম যে জন্মান্তর

অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম হইতে ভিন্ন জন্ম তাহা কি বুঝিতে বাকি থাকে?

শ্রুতিতে আছে 'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ [কঃ উঃ ২।২।৭] অর্থাৎ দেহীরা কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কেহ কেহ শরীর-ধারণের জন্য যোনি প্রাপ্ত হয়, অপরে বৃক্ষাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়। 'ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে' [মুঃ উঃ ১।২।৯] 'ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি' [মুঃ উঃ ১।২।১০] অর্থাৎ কর্মফলভোগে কর্মক্ষয় হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। (স্বর্গভোগান্তে) এই লোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হয়। ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্যে স্বর্গে বা নরকে জন্ম যে জন্মান্তর অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম ভিন্ন জন্ম তাহা নিশ্চয় হইবে না কেন? এই ভাবে বক্তাকে দ্বিতীয়-পক্ষ অর্থাৎ বেদ পর্যালোচনা করিলে যে জন্মান্তর সিদ্ধ হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বেদ যাঁহারা মানেন না, যুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষের দ্বারা যাঁহারা সব কিছু বুঝিতে চান বা চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের দ্বারা জন্মান্তরের অস্তিত্ব বুঝানো যাইবে না ; সেই জন্য জন্মান্তর-সিদ্ধির বহু যুক্তি থাকিলেও অতি সংক্ষেপে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা যাইতেছে।

(১)

প্রশ্ন : বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত ; পূর্বজন্ম বা পরজন্ম কেহ কোন দিন প্রত্যক্ষ করে না। সুতরাং কিরূপে জন্মান্তর সিদ্ধ হয়?

উত্তর : বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া যখন সর্ববাদিসম্মত, তখন তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ বিনা কারণে কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বর্তমান জন্মরূপ কার্যের কারণ অনস্বীকার্য। পিতা, মাতা, দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি একমাত্র দৃষ্টকারণগুলিই জন্মের কারণ—ইহা বলা যায় না। যেহেতু একই পিতা ও মাতা হইতে একই কালে যমজ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির মৃত্যু ও অপরটির বাঁচিয়া থাকা বা দুইটি পুত্র বাঁচিয়া থাকিলেও একই দেশে, এক পরিবেশে লালন-পালন করা সত্ত্বেও সমান শক্তি, সমান বুদ্ধি, সমান বিদ্যা প্রভৃতি কখনও দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের শরীর, শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রভেদের জন্য অন্য কোন কারণ অবশ্য স্বীকার্য। তাহা অদৃষ্টরূপ কর্ম। আর ঐ কর্ম বর্তমান জন্মে সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহার জন্য বর্তমান জন্মের পূর্বে অন্য জন্ম অনুমানসিদ্ধ হইয়া যায়। উক্ত দুইটি পুত্রের দৃষ্ট কারণগুলির বৈষম্য না থাকিলেও অদৃষ্ট কারণের বৈষম্যবশতঃ তাহাদের শরীর, শক্তি, মেধা, বিদ্যা, সুখদুঃখ প্রভৃতির বৈষম্য দেখা যায়। সুতরাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় বর্তমান জন্মের কর্ম দেখিয়া পরজন্মও সিদ্ধ হইবে।

(২)

প্রশ্ন : পূর্বজন্ম স্বীকার করিয়া লইলেও পরজন্ম সিদ্ধ হয় না। যেহেতু এই জন্মে যে যেরূপ কর্ম করিতেছে, তাহাদের সেই সমস্ত কর্মের দ্রষ্টা ঈশ্বর সবই জানিয়া রাখিতেছেন। যখন সকলে মরিয়া যাইবে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর একদিন সকল আত্মার বিচার হইবে। প্রত্যেকেই মৃত্যুর পর কবর বা শ্মশান বা অন্য কোন স্থানে জমা হইতেছে। ঈশ্বর শেষ বিচারের দিন সকলকে ডাকাইয়া সকলের পাপ ও পুণ্য হিসাব করিয়া যাহাদের পুণ্যবান্ বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাদের অনন্ত স্বর্গের বিধান করিবেন, আর যাহারা পাপী বলিয়া সাব্যস্ত

হইবে তাহাদিগকে অনন্ত নরকে পাঠাইয়া দিবেন। অথবা পূর্বজন্মও নাই, এই বর্তমান জন্মই একমাত্র জন্ম, এর পর স্বর্গ ও নরকে স্থিতি। আর কোন জন্ম নাই। অতএব জন্মান্তর কোথায়?

উত্তর: পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিতেই বেশ, কিন্তু উহার ভিতর বিশেষ যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম কথা এই যে কতকগুলি লোক পুণ্যকর্ম করে, আবার কতকগুলি লোক পাপ কর্ম করে—ইহার কারণ কি? নানা রকম বাধাবিঘ্ন সত্বেও কতকগুলি লোক সহজেই পুণ্য কর্ম করে। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকের পুণ্যকর্ম করার বা পাপকর্ম ত্যাগ করার ইচ্ছা থাকা সত্বেও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বা পাপকর্ম ত্যাগ করিতে পারে না—ইহারই বা কারণ কি? কোন দৃষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য অগত্যা পূর্বজন্মের সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায়, বর্তমান জন্মের সমস্ত কর্মের ফল ইহজন্মে সকলে ভোগ করে না, ইহা দেখা যায় বলিয়া, কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় পরজন্মও সিদ্ধ হয়। আর ঈশ্বর পরিমিত পাপের অনুষ্ঠানকারীকে অনন্তকালের জন্য নরকে পাঠান—ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে ন্যায়-বিচারহীন শয়তান বলিতে হয়। যেহেতু ঈশ্বর সকলের পিতা, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান কৃপা আছে। পাপীকে তিনি তাহার পাপের জন্য কিছুকাল শাস্তি দিয়া তারপর তাহাকে সংসার হইতে পুণ্যাদি কর্ম করাইয়া যদি উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইবে? আরও কথা এই যে জগতে এমন কোন লোক নাই, যে সারা জীবনে একটিও পুণ্যকর্ম করে না বা একটিও পাপকর্ম করে না। কতকগুলি লোক কেবল পুণ্য করে আর কতকগুলি লোক কেবল পাপ করে, এইরূপ দেখা যায় না। যাহারা পাপী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে তাহারাও কোন না কোন পুণ্যকর্ম করিয়াছে। আর যাহারা পুণ্যবান্, তাহারাও সারা জীবনে অন্ততঃ অজ্ঞাতসারেও দুটা একটা পাপ করিয়া থাকেন। অথচ ঈশ্বর পাপীদের কেবল পাপেরই বিচার করেন, পুণ্যটার কোন বিচার করেন না অর্থাৎ পাপী তাহার পুণ্যের ফল কিছুমাত্র পাইবে না, এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তি তাহার পাপের ফলে কিছুমাত্রও দুঃখ ভোগ করিবে না—এইরূপ উক্তি যুক্তিহীন। আরও কথা এই যে শরীর না থাকিলে সুখ দুঃখ ভোগ হয় না বলিয়া অনন্ত স্বর্গে সুখ ভোগ ও অনন্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিতে হইলে স্বর্গে বা নরকে শরীরধারণ বা জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

(৩)

প্রশ্ন: বর্তমান জন্মের প্রতি পিতা মাতা কারণ, জন্মদানকালীন তাঁহাদের বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা, চিন্তা প্রভৃতি মনের অবস্থাও কারণ বলিয়া একই পিতা ও মাতার সন্তানগণের মধ্যে, স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ভেদ হইতে পারে। তা ছাড়া দেশ, কাল, পরিবেশ, অবস্থা, শিক্ষক প্রভৃতির সঙ্গ, সাহায্য এবং বর্তমান জন্মের কর্মবশতঃ ও এক পিতা ও মাতার সন্তানগণের মধ্যে বৈষম্য থাকা কিছু বিচিত্র নয়। আর জন্মমাত্রেই শিশু-সন্তানের স্তন্যপানে প্রবৃত্তি, শোক, হর্ষ, মৃত্যুভয় প্রভৃতি দেখিয়া পূর্বজন্মের সংস্কার অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। যেহেতু মাতা-পিতার শরীরধারণের প্রবৃত্তি, শোক, হর্ষ, ভয়, প্রভৃতির সংস্কারই সন্তানে সংক্রমিত হওয়ায় ঐ সকল প্রবৃত্তি জাতমাত্র সন্তানে সম্ভব হয়।

বানরের শিশু বানর মাতাপিতা হইতেই সংস্কার লাভ করিয়া জন্মমাত্রে বৃক্ষশাখা ধারণ করে বা মাতার উদর ধরিয়া অবস্থানের কৌশল আয়ত্ত করে ইত্যাদি। এই ভাবেই এই জন্মের কার্যসকল সম্ভব হওয়ায় পূর্বজন্ম ও তজ্জনিত সংস্কার কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি ?

উত্তর: মাতাপিতার সংস্কার যদি সন্তানে সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে মাতাপিতা সন্তানের জন্মের পূর্বে বা অন্ততঃ জন্মকালে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছেন, সন্তান তাহা স্মরণ করুক। মাতাপিতার বাল্যকালীন স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি, ক্রীড়া, কৌতুক, যৌবন ও বার্ধক্যে বিষয়চিন্তাদির প্রবৃত্তি এবং সর্বকালীন শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির সংস্কার সংক্রমিত হইয়া যদি সন্তানে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে মাতাপিতার দেখা, শোনা, বলা ইত্যাদি অনুভবসকলের সংস্কার সন্তানে সংক্রমিত হইবে না—ইহার প্রতি একপক্ষপাতী যুক্তি কি আছে ? আর যদি মাতাপিতার সমস্ত সংস্কার সন্তানে সংক্রমিত হয় না, কিন্তু কতকগুলি হয় একথা বল, তাহা হইলে যে যে সংস্কার, মাতাপিতা হইতে সন্তান পায় না, অথচ তাহার কার্য সন্তানে দেখা যায়, সেই সকল সংস্কারের উপপত্তির জন্য জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য।

(৪)

প্রশ্ন: আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম, জন্মান্তর আছে। কিন্তু তাহার জন্য দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি ? স্থূল দেহের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া স্থূল দেহ আত্মা নয়, ইহা মানিলাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিবার যুক্তি কি ? অন্ততঃ মনকে আত্মা বলিলে সমস্তই উপপন্ন হওয়ায় মন-অতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিবার হেতু কি ?

উত্তর: ইন্দ্রিয়ের পটুতা, অপটুতা, বৈকল্য প্রাণের হ্রাসবৃদ্ধি, বাল্যে প্রাণের স্ফূর্তির প্রাচুর্য, যৌবনে বলবৃদ্ধি, বার্ধক্যে প্রাণের শক্তির হ্রাস, মনের বিকার, সুষুপ্তিতে মনের চেতনার অভাব ইত্যাদি অনুভবের দ্বারা ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির বিকারিত্ববশতঃ সাবয়বত্ব ও বিনাশ প্রভৃতি অনুমিত হয়। মনেরও বিকার থাকায় বিনাশ সিদ্ধ হওয়ায় তাহার বিনাশের কারণরূপে কোন বস্তুর সত্তা অনুমানসিদ্ধ এবং বিকারী পদার্থের উৎপত্তি অবশ্যসিদ্ধ বলিয়া মনের উৎপত্তিরও কারণীভূত কোন পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য। বিকারী পদার্থ জড়, অথচ আত্মা যে চেতন তাহা সকলের অনুভবসিদ্ধ বলিয়া প্রাণ মন হইতে অতিরিক্ত মন প্রভৃতির কারণ চেতন আত্মাই সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর যুক্তি শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে জন্মান্তর-প্রসঙ্গ

পরলোকের কথা বলছ ? গীতার মত—মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ হরিণ' ক'রে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হ'য়ে জন্মাতে হ'ল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাতদিন অভ্যাস করতে হয়;—তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হ'লে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকে বললুম, এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার ? তারপর আবার বললুম, যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়; ছাগল-গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙে দেয়, তাহলে তৈরী লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয়; কাঁচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

ভগ্নী নিবেদিতা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

সরস্বতীর শ্বেত তনুশোভা
অতি মনোলোভা,
তোমাতেই রূপ ধরেছিল,
হে অনন্যা, মহীয়সী
ভগ্নী নিবেদিতা।

পরম সত্যের তরে যে-তপস্যা তব
অতি অভিনব,
চিরদিন ছিল অব্যাহত,—
তাহে তুমি শুচি শোভান্বিতা,
সর্বত্র বন্দিতা;
ভগ্নী নিবেদিতা।

দূরদেশে, কোন্ লগ্নে, কোন্ সে ভূমিতে,
অতি আচম্বিতে—
ঘটেছিল জন্ম তব, কোন্ শুভক্ষণে
নাহি জানি মোরা। নাহি বিবরণ
কোন লেখনীতে।

(মোরা) শুধু দেখিলাম অগ্নিবর্ণ-লিখা,
যেন হোমশিখা,
ভারত-ঋষির বাণী শুনিবার তরে
ভক্তিনম্রা, প্রথম আগতা,
তুমি শুচিস্মিতা।

মোরা শুধু জানিলাম উত্তর জীবনে
অতি সঙ্গোপনে,
সে-বাণীর মর্ম লাগি, সর্বত্যাগ
করিয়া বরণ, সর্ব-রিক্ত তুমি
তপস্যা-নিরতা।

সে-দিন এক দিবসের শেষে
শীতের প্রদোষে,
সন্ধ্যারবি অস্তে গেলা চলি,
ফেলি স্বর্ণ সহস্র কিরণ
সঙ্ঘ চারিভিতে।

তুমি সবিস্ময়, দেখিলে আচার্যে
তব; বসি পদ্মাসনে অপূর্ব মূরতি
সমাহিত চিতে।
ধ্যানশান্ত নেত্র হ'তে ঝরিছে করুণা,
অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

কণ্ঠ হ'তে উঠিতেছে 'হর হর' ধ্বনি,
মর্ত্যভূমে অমৃতের বাণী—
দিব্য উন্মাদনা।
তোমার হৃদয় তাহে ফুটিল চকিতে
প্রদীপ্ত জ্যোতিতে।

শ্বেত বস্ত্র অঙ্গে নিলে তুমি,
ভারতেরে কৈলে নিজ ভূমি
প্রেমের মন্ত্রেতে।
(তাই) তার ভাষা, ধর্ম, অধ্যাত্ম জীবন
স্নিগ্ধ অনুপম,
তোমার ধেয়ানে আসি সঞ্জীবিত হ'ল,
নবযুগে অপরূপ নব অর্থ নিল,
মর্যাদা লভিল।

মোরা তব স্নেহধন্য উত্তর-সাধক
আজ ধরণীতে,
সর্ব-গ্লানি, সর্ব-ভীতি-হরা—
তব শুভ্র আশীষের ধারা,
আকাঙ্ক্ষি লভিতে।

তব নাম সর্ব দেশে তুলনাবিহীন—
অতি অমলিন,
তোমার মহতী কীর্তি অম্লান অক্ষয়,
মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দীপ্ত আভাময়
রবে চিরদিন।
বিবেক-আনন্দ-সুতা, তুমি
দেবী নিবেদিতা;
নিত্য শুচি সর্বত্র-বন্দিতা,
চির অনিন্দিতা।
কবিগুরু 'সতী' নাম দিয়েছিল তোমা,
শিল্পাচার্য অতঃপর কহে 'মহাশ্বেতা',—
দেবের বন্দিতা।
ত্যাগের প্রতিমা তুমি, হে ভগিনী
সান্ধ্য দীপশিখা,
তোমার উন্নত ভালে দিব্য ললাটিকা
স্বস্তিকের রেখা।
আমি দীন সেবক তোমার
অপূর্ণ লিপিতে,
কালান্তর অতিক্রমি আজি,
তব দিব্য আদর্শ জীবন
প্রয়াসী পূজিতে,
অক্ষম ভঙ্গীতে।
তুমি দেবী সুকল্যাণী দানিও আশীষ
অমৃতের ধারা;
তমসার পরপার হ'তে,
আনন্দের সুধা স্নিগ্ধ পথে—
পাঠাইও বাণী তব দিব্য মধুক্ষরা,
প্রসন্ন প্রখরা।

ভারত-সেবায় বিদেশিনী

শ্রীমতী বেলা দে

উদ্যানে প্রতিনিয়ত কত সহস্র ফুল ফুটছে; কিন্তু সব ফুলেরই ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হবার সৌভাগ্য হয় না। মাত্র কয়েকটি ফুলই দেবতার শ্রীচরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হ'য়ে ধন্য হয়। তেমনি আমাদের এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে প্রতিদিন কত সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করছেন, কিন্তু সবারই জীবন কি সার্থকতায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে? না, এই কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মানুষই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পেরেছেন। যাঁরা নিজ চরিত্রগুণে জীবনের এই চরম সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁদের কথা অনন্তকাল ধ'রে মানুষের শ্রদ্ধার সামগ্রীরূপে পরিণত হ'য়ে থাকে—ভারতের সেবায় উৎসর্গীকৃত এমনি কয়েকজন বিদেশিনীর কথা স্মরণ করছি।

ভগিনী নিবেদিতা

ভারতের ইতিহাসে সে এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণ; জাতীয় প্রতিভা তখন ম্লান হ'য়ে পড়েছে! কর্মজীবনে জাতি তখন অবসাদগ্রস্ত, প্রবলতর পাশ্চাত্য সভ্যতার ও জীবনাদর্শের সংঘাতে ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল তখন বার বার কেঁপে উঠছিল। সংশয়-সন্দেহে জাতি তখন আকুল, ঠিক সেই সময়ে আত্মবিশ্বাসহীন অনুকরণ-পরায়ণ জাতিকে আশার বাণী শুনিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এনেছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয় সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারো। সমস্ত মন দিয়ে নিবেদিতা

স্বামীজীর প্রতি কথা, প্রতি আচরণ অনুধাবন করবার চেষ্টা করতেন। নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিষ্যা। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি, ভারতপ্রীতি, ভারতসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শিল্পজ্ঞান—সবকিছুই আমাদের কাছে শ্রদ্ধার জিনিস। তাঁকে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী'। সত্যিই তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। তিনি বলতেন : হায়, শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা। কেমন ক'রে প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্তে ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতিসাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র-স্থাপন।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের প্রথম যুগে যে সব সমস্যা ছিল, সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভগিনী নিবেদিতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতায় বাগবাজার বোসপাড়া লেনে অবস্থিত নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়টি তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রে যান।

নিজেকে শিক্ষয়িত্রী ব'লে পরিচয় দিলেও ভারতবর্ষে নিবেদিতার যথার্থ পরিচয় দেশসেবিকারূপে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে—বিদেশী যাঁরা ভালবেসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে উঁচুতে।

এ দেশের পারিবারিক জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার যে ভালবাসা, তা সাধারণ দেশপ্রীতির উর্ধ্বে। ভারতের মুক্তি-সাধনায় তাঁর আত্মত্যাগ অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নিবেদিতার নবজন্ম। তাঁর জীবন সেবা- ও আত্মদান-মূলক তপস্যার জীবন।

যেটুকু সত্য, তাই তাঁর পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল। তাকে আকারে বড় ক'রে দেখাবার লেশমাত্র প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন না এবং তেমন ক'রে বড় ক'রে দেখাতে হ'লে যে সব মিথ্যা মেশাতে হয়, তা তিনি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করতেন। এইজন্যেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল : যাঁর অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি কলকাতার এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন, যা পৃথিবীতে লোকের চোখে পড়বার মতো নয়।

'নিবেদিতা' নামটি স্বামী বিবেকানন্দের এক অনবদ্য সৃষ্টি, যে ভাবেই হ'ক নামের এমন সার্থকতা দেখা যায় না। নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের সেবায় ; তাই নিজেকে সর্বপ্রকারে ভারতের কল্যাণে নিবেদন ক'রে তিনি গুরুদত্ত নাম সফল ক'রে গেছেন।

মিস কুক্

নিবেদিতার আগে আর একজন বিদেশিনীর দানের কথাও আমাদের মনে পড়ে, তিনিও সেই অন্ধকারময় যুগে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

১৮২৪ খৃঃ লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে। এর মধ্যে মিস্ কুক (Mary Anne Cooke) ১৮২১ খৃঃ নভেম্বর মাসে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন। এক বছরের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঠনঠনিয়া স্কুল খোলা হয় মাত্র বারো জন ছাত্রী নিয়ে, পরে ছাত্রীসংখ্যা

পঁচিশ জন হয়। মির্জাপুর অঞ্চলে স্থানীয় ব্যক্তিরা ২২টি বালিকার নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মিস্ কুকের কাছে আবেদন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এখানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খোলা হয়। এমনি ক'রে শোভাবাজারে, শ্যামবাজারে, মল্লিকবাজারে স্কুল খোলা হয়।

১৮২৪ খৃঃ লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর চার্চ মিশনের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব মিস্ কুক নিজে গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড উইলসনকে বিবাহ ক'রে মিস্ কুক মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হলেন। কুকের স্কুলগুলি শহরের চারদিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল ব'লে একটি কেন্দ্রীয় সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চার্চ মিশন উদ্যোগী হলেন। স্বভাবতই মিসেস উইলসনের উপর লেডিস সোসাইটি ও সেণ্ট্রাল স্কুল গঠনের সমস্ত দায়িত্ব চার্চ মিশন দিয়ে দেন। ১৮২৬ খৃঃ ১৮ই মে কর্নওয়ালিস স্কয়ারের পূর্বদিকে এই কেন্দ্রীয় বালিকা-বিদ্যালয়টির ভিত্তি স্থাপন করা হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮২৮ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয় ৫৮ জন ছাত্রী নিয়ে। মিস্টার ও মিসেস উইলসনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ছাত্রীসংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। এমনি ক'রে মিশনারীদের উদ্যোগে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার শুরু হয়।

লেডিস সোসাইটির পর ১৮২৫ খৃঃ লেডিস অ্যাসোসিয়েশনের নামে আর একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সমিতির সভানেত্রী হলেন শ্রীমতী উইলম্যান। যেখানে এটি স্থাপিত হ'ল, সে অঞ্চলটি প্রধানতঃ মুসলমান প্রধান (এণ্টালী ও জানবাজার) হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানরাই উৎসাহ নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন এবং অনেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। একজন মুসলমান মহিলা এই কাজে শ্রীমতী উইলম্যানকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

শ্রীমতী কুকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমেই তাঁরা সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী কুক বা উইলম্যানের আন্তরিকতা ও খৃষ্টান পাদ্রীদের উৎসাহ সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। তার কারণ, হিন্দুসমাজের উচ্চ ও মধ্য স্তর যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তা নয়। প্রধান কারণ হ'ল মিশনারীদের উৎসাহকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁদের ধারণা ছিল—শিক্ষার প্রসারের চেয়ে খৃষ্টধর্মের প্রচারই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং স্ত্রীশিক্ষার সূত্র ধ'রে খৃষ্টান মহিলারা যদি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন, তাহলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই কারণে সেই যুগে মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজের অবহেলিত অসহায় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তবু একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা যেটুকু সাড়া জাগিয়েছিলেন, তাতে পরবর্তীকালে কিছুটা সুফল ফলেছিল।

শ্রীমতী কার্পেণ্টার

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই সময় স্ত্রীশিক্ষার পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত। সেই যুগে এই পরিবর্তন কি ভাবে হবে, তাই ছিল

প্রশ্ন। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব; সুতরাং ভারতীয় নারীদের জন্য এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশ-সাধন।

তাই দেখি, সুদূর ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহনের সঙ্গে যখন শ্রীমতী কার্পেণ্টারের দেখা হ'ল, সেদিনও তিনি ভারতের হিত-সাধনের কথা তাঁকে শোনালেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টার বলতেন, রামমোহনই তাঁকে একাজে উৎসাহিত করেন। এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্যে শ্রীমতী কার্পেণ্টার বেথুন স্কুলে এক নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে এই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হ'ল। সভায় বিদ্যাসাগর আমন্ত্রিত হলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হ'ল, বিদ্যাসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হলেন। 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্রলেখক লিখলেন, 'মিস্ মেরি কার্পেণ্টার এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনার্থ বৃদ্ধবয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমরা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি।'

শ্রীমতী কার্পেণ্টার বাংলাদেশের বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হননি, তার কারণ—বিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষিকার স্থলে তিনি দেখলেন পুরুষ শিক্ষক। অথচ মেয়েদের মনের গতি পুরুষরা সম্যক্‌রূপে বুঝতে পারেন না এবং স্ত্রী-শিক্ষিকার দ্বারা মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। অথচ দুঃখের বিষয়, সেই অন্ধকারময় যুগে মেয়েরা যে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষকতা করবেন, এমন মেয়ের সংখ্যা খুবই কম ছিল। নারীসমাজে তখন শিক্ষা ও সংস্কারকর্মে অগ্রণী ছিলেন একমাত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতা ও খৃষ্টান মহিলারা। কিন্তু ব্রাহ্মিকারা যে বাইরের মেয়ে-স্কুলে শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণের জন্য দলে দলে যোগদান করবেন, এ-রকম অবস্থা তখনও তাঁদের হয়নি। হিন্দুরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাকেও অনেকটা 'ধর্মান্তর' ব'লে মনে করতেন। আবার খৃষ্টানদের কাছে তাঁরা যেমন ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাইতেন না, তেমনি ব্রাহ্মিকাদের কাছেও একই কারণে মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের আপত্তি ছিল। কাজেই এ এক মহাসমস্যার ব্যাপার হ'য়ে উঠল! শ্রীমতী কার্পেণ্টার কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন না। তিনি নানা উপায় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ হাতে ক'রে তিনি শুধু আলোর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

অ্যানি বেসাণ্ট

আর একজন মহীয়সী বিদেশিনীকে স্মরণ করি, তিনিও বিদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ভারত-বর্ষকে আন্তরিক ভালবেসেছিলেন ও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট। সাধারণ মানুষ শুধু নিজের সুখদুঃখ নিয়েই কাটায়—তাই যখন মাঝে মাঝে এমন মানুষ দেখতে পাই, যিনি নিজের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রেখে, অপরের সেবায় নিজের জীবন ব্যয় করেন, তখন আমাদের মন তাঁর প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় নত হয়।

শ্রীমতী বেসাণ্ট ছিলেন এমনি এক পরহিত-ব্রতী মহিলা। তিনি ভারতবর্ষের নরনারীর কল্যাণ-সাধনে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তাই ভারতবন্ধুরূপে ভারতবাসী চিরদিনই তাঁর নাম মনে রাখবে। তিনি আজীবন ছিলেন অক্লান্তকর্মী মহিলা। সারা জীবন ধরে তিনি যুদ্ধ করেছেন অজ্ঞানতা অন্ধসংস্কার ও সামাজিক দুর্গতির বিরুদ্ধে। ১৮৪৭ খৃঃ ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়; পৈতৃক পদবী উড। তার প্রপিতামহ স্যর ম্যাথ্ উড ছিলেন লণ্ডনের লর্ড মেয়র। শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রথম জীবন ইংলণ্ডেই কাটে, নানা মতবাদ ও কাজের মধ্যে দিয়েই ইংলণ্ডের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। একদিন তিনি সমস্ত ত্যাগ ক'রে থিওসফি-আন্দোলনে যোগদান করলেন। এই থিওসফিই তাঁকে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে ১৮৯৩ খৃঃ। সেইদিন থেকে ১৯৩৩ খৃঃ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই দেশেই বাস করেন। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানে শ্রীমতী বেসাণ্টের একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রাচীন ভারতের সাধনায় আধুনিক ভারতবাসীর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তিনি যথার্থ সাহায্য করেছেন।

শ্রীমতী বেসাণ্ট ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেও যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯১৬ খৃঃ লখনউ কংগ্রেসে তাঁকে প্রথম দেখি—রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেত্রীমূর্তিতে। ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। এজন্য তিনি 'হোমরুল লীগ্' প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশী সরকার বিপদ গণলেন; শ্রীমতী বেসাণ্টকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। সারাদেশে দেখা দিল তুমুল বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত হলেন, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে। সরকার বেসাণ্টকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। ১৯১৭ খৃঃ তিনি কলকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন। কাজে ও কথায় ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁর লেখা বহু পুস্তকের মধ্যে তিনি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে গেছেন।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। বিপদে পড়ে যে কেউ তাঁর কাছে গেছে—পরিচিত হ'ক, অপরিচিত হ'ক, প্রাণপণে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তাতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। শ্রীমতী বেসাণ্ট ভক্তের মতো ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর যেদিন সেই কর্মবহুল জীবনের অবসান হ'ল, সেদিনও তিনি আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। মৃত্যুকালেও তিনি ভারতবাসীর জন্য চিন্তা করেছেন। ভারতবাসী চিরদিনই এঁদের মতো মহীয়সী মেয়েদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে বলবে, 'মরণ-সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।'

বেদান্ত ও সূফীমতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সকল দেশের দর্শন-শাস্ত্রেরই একটি মূলীভূত সমস্যা হ'ল—সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হয় একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত সত্তা, সত্য বা তত্ত্বরূপে। তাহলে তাঁর পক্ষে কোনরূপ কর্ম করা সম্ভব হয় কিরূপে? কারণ, সাধারণ কর্মের মূলে থাকে একটি অভাব-বোধ, একটি অপ্রাপ্ত বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা, একটি অপূর্ণ ইচ্ছা-পূরণের আশা, একটি অসিদ্ধ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণা। কিন্তু পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে কোনরূপ অভাব, অপ্রাপ্ত বস্তু, অপূর্ণ ইচ্ছা বা অসিদ্ধ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব তো অসম্ভব। সেজন্য সৃষ্টিরূপ কর্ম তাঁর ক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে কিরূপে—এই হ'ল দর্শনের একটি দুরূহতম প্রশ্ন।

সূফী ও বেদান্ত দর্শনে কিভাবে এই সুকঠিন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সূফীগণ একটি সুবিখ্যাত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেন। সেটি হ'ল এই :

ডেভিড প্রশ্ন করলেন, 'হে প্রভু! আপনি কি কারণে মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন?' ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'আমি একটি গুপ্ত ধনতুল্য এবং আমি জ্ঞাত হ'তে ইচ্ছা করি।'

সূফীদের মতে, এই সুন্দর বাক্যটি থেকেই সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য কিছু স্পষ্ট হয়। এরূপে, এই মতানুসারে পরমেশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে-ছেন এবং শেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তার কাছে জ্ঞাত হ'তে পারেন। বিশ্বাত্মবাদী সূফীদের মতে, এর অর্থ হ'ল এই যে, মানবের ঈশ্বরকে জানাই ঈশ্বরের নিজেকে জানা। এইভাবে ঈশ্বর নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে জানতে ইচ্ছুক হন, নিজের স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে উদ্গ্রীব হন। সেইজন্যই তিনি তাঁর নির্গুণ, নির্বিশেষ, 'কেবল' অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে, সগুণ, সবিশেষ রূপ ধারণ ক'রে এই বৈচিত্র্যময় জগতে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং স্বীয় স্বরূপের শ্রেষ্ঠ বিকাশরূপে পরিশেষে মানব সৃষ্টি করেন। এই মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পান, মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে জানতে পারেন, এই মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে পূর্ণ করেন। এইভাবে এই সম্প্র-দায়ের সূফীদের মতে, এই বিশ্ব পরমেশ্বরের দর্পণস্বরূপ। কিন্তু আমরা জানি যে, কেবল দর্পণ থাকলেই হয় না, সেই দর্পণটি বস্তু-প্রতি-ফলনের যোগ্য হওয়া চাই। অর্থাৎ তাকে হ'তে হবে পরিষ্কৃত, যেহেতু অপরিষ্কৃত দর্পণের সম্মুখে কোন বস্তু থাকলেও তা তাতে প্রতিফলিত হ'তে পারে না। সেইজন্যই সমগ্র জগৎই পরমেশ্বরের দর্পণ হলেও তাতে তাঁর পূর্ণ রূপটি প্রতিফলিত হ'তে পারে না, যেহেতু তা একটি মলিন-দর্পণ-তুল্য মাত্র। এই কারণে জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ প্রকাশিত হ'তে পারে না, কেবল কয়েকটি মাত্র গুণই প্রকাশিত হয়।

মানবেই পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, মানবের মধ্যেও স্তরভেদ আছে, এবং সেজন্য মানবে ঈশ্বরের প্রকাশও সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। শ্রেষ্ঠ মানব হলেন 'পূর্ণ মানব' বা জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষ, যিনি স্বীয় সাধনবলে এই জগতেই,

এই জীবনেই ঈশ্বরের সঙ্গে স্বীয় অভিন্নতা উপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়েছেন। ইনিই হলেন ঈশ্বরের শুদ্ধতম সুন্দরতম উজ্জ্বলতম দর্পণ, যাতে তাঁর শুদ্ধতম, সুন্দরতম, উজ্জ্বলতম রূপটি শুদ্ধতম সুন্দরতম উজ্জ্বলতম ভাবে প্রতিফলিত হয় এক অপরূপ মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে।

এইভাবে এরূপ 'পূর্ণ মানবের' মধ্যেই পরমেশ্বর নিজেকে পূর্ণভাবে জানেন, এবং সেজন্য নিজেকে জানবার এই ইচ্ছা থেকেই জগতের সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়ে তিনি যেন নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, এবং একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, প্রেমিক ও প্রিয় হন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি ক'রে পরমজ্ঞানঘন, পরমপ্রেমময় পরমেশ্বর নিজেকেই নিজে জানছেন, নিজেকেই নিজে ভালবাসছেন। এই স্ব-জ্ঞান, এই স্ব-প্রেমই হ'ল জগৎসৃষ্টির মূল রহস্য।

এস্থলে কয়েকটি মূলীভূত, দার্শনিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ কার্যটি কি অভাবমূলক? দ্বিতীয়তঃ, জীবের দিক্ থেকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

প্রথম প্রশ্নের কথা ধরা যাক। এস্থলে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর নিজেকে নিজে জানবার জন্য, নিজেকে নিজে ভালবাসবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেন। সেক্ষেত্রে একথাও স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, পূর্বে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমের অভাব ছিল, অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণভাবে জানতেন না বা ভালবাসতেন না। পরে এই জ্ঞানাভাব ও প্রেমাভাবের দ্বারা চালিত হ'য়ে তিনি জগৎসৃষ্টিরূপ-কার্যে প্রবৃত্ত হন, এবং জগৎসৃষ্টি-দ্বারা সেই অভাব দূর ক'রে তৃপ্ত হন। তাহলে তাঁকে 'নিত্যতৃপ্ত' ও 'আপ্তকাম' বলা যায় কি ক'রে?

এর উত্তরে সুফীরা বলেছেন যে, সৃষ্টিরূপ কার্যটি অভাবমূলক নয়, স্বভাবমূলক। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই শাশ্বতকাল সর্বজ্ঞ ও অনন্তপ্রেমস্বরূপ, এবং জগৎ সৃষ্টি ক'রে যে তিনি নূতন কিছু লাভ করেন, নূতন কোন জ্ঞান ও প্রেম প্রাপ্ত হন, তা নয়। সর্বজ্ঞরূপে ও অনন্তপ্রেমস্বরূপে তিনি সর্বদাই পূর্ণভাবে নিজেকে জানেন, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা সত্বেও তিনি পুনরায় নিজেকে জানতে চান অন্যের মাধ্যমে, মানবের মাধ্যমে, 'পূর্ণ মানবে'র মাধ্যমে। কেন জানতে চান? তাঁর স্বভাবের জন্য। কি সেই স্বভাব? এ প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর আমরা পাই না সুফী-দর্শন থেকে। তার জন্য আমাদের যেতে হয় বেদান্ত-দর্শনের নিকট।

বেদান্ত-দর্শনে এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অবতারণা করা হয়েছে সেই সুবিখ্যাত 'লীলা বাদে'র। 'লীলা' কি? 'লীলা' একটি অদ্ভুত অতুলনীয় কর্ম। কারণ পূর্বেই যা বলা হয়েছে, প্রত্যেক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধিজাত কর্মের পশ্চাতেই থাকে একটি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণা। কিন্তু 'লীলা' স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধিজাত কর্ম হলেও তাতে কোনরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বা অভাব পূর্ণ করবার তাগিদ নেই। উপরন্তু সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে, সকল অভাব পূর্ণ হ'লে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, সেই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশমাত্র 'লীলা'। এরূপে 'লীলা' অভাব বা অপূর্ণতার দ্যোতক নয়; উপরন্তু পরিপূর্ণতারই প্রমাণ।

একই ভাবে বেদান্ত মতে, সৃষ্টিরূপ কর্মটিও শ্রীভগবানের 'লীলা' বা খেলা মাত্র। পরিপূর্ণ আনন্দরসঘন পরমেশ্বরের কোনরূপ অভাব নেই, অপ্রাপ্ত লক্ষ্য নেই, অতৃপ্ত কামনা নেই, আছে কেবল অনন্ত অসীম অতুলনীয় আনন্দ, অমৃত, রস ও সুধা। সেজন্যই তিনি লীলাভরে খেলাচ্ছলে সেই আনন্দ, অমৃত, রস ও সুধা প্রকাশ করছেন নিত্য নিয়ত; এবং এই

প্রকাশই জগৎ। এই কারণে উপনিষদ্ অতি সুন্দরভাবে বলছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিবিশন্তীতি। —আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়।

এইভাবে, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর লীলা-স্বরূপ, এবং লীলা স্বভাবতই দ্বৈতমূলক, যেহেতু একাকী খেলা হয় না, খেলার জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ দুজন। এই কারণেই পরম লীলাময় শ্রীভগবানকেও নিজের খেলার সঙ্গী অনুসন্ধান ক'রে নিতে হয় নিজেরই মধ্যে—তিনি তো সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, তাঁর বাহিরে দ্বিতীয় আর কে আছে? এরূপে পরমানন্দময়, পরমলীলাময় স্বভাববশেই এক শাশ্বত খেলায় মত্ত হ'য়ে রয়েছেন নিজের সঙ্গেই নিজে। এই খেলাকেই আমরা বলি 'সৃষ্টি' এবং সেজন্য 'সৃষ্টি' অভাবমূলক নয়, স্বভাবমূলক।

এই হ'ল বৈদান্তিক লীলাবাদের মূল কথা, এবং অদ্বৈতবাদিগণও ব্যাবহারিক দিক্ থেকে মায়াবাদ গ্রহণ করেছেন।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি ধরা যাক। জীবের দিক্ থেকে 'সৃষ্টির' উদ্দেশ্য কি? উপরে যে সূফী-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মতে, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হ'ল—ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত বা প্রতিফলিত করা। কিন্তু তাতে এরূপ অসংখ্য বৈচিত্র্য ও বিভেদ দৃষ্ট হয় কেন? অর্থাৎ এরূপ বিভিন্ন স্বরূপগুণশক্তি-বিশিষ্ট জীব সংসারে সৃষ্টি হয় কেন? এই বিষয়েরও কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূফী-দর্শনে নেই; এবং পূর্বের ন্যায় এস্থলেও আমাদের বেদান্তেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

এই প্রসঙ্গেই আমরা পাই বেদান্তের, তথা ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব 'কর্মবাদ'। কর্ম-বাদানুসারে, সকাম কর্মের যথোপযুক্ত ফল কর্মকর্তাকে ভোগ করতেই হয়—আজ না হয় কাল, এজন্মে না হয় পরজন্মে। সেজন্য পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সকাম-কর্মের ফলানুসারেই হয় পরজন্মে বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি; এবং ঈশ্বরকে সেজন্য কোনক্রমেই 'বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষে' অভি-যুক্ত করা চলে না। অর্থাৎ, জীবের কর্মানু-সারেই সৃষ্টি করেন ব'লে তিনি পক্ষপাতদোষহীন; এবং জীবের কর্মানুসারেই তার সুখদুঃখ হয় ব'লে ঈশ্বর নিষ্ঠুরতা-বর্জিত। এইভাবে বেদান্ত-মতে, কর্মবাদ ন্যায়ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। কারণ ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই কৃত সকামকর্মের ফলভোগ কর্মকর্তাকে করতেই হবে, না হ'লে বিচার ক'রে, স্বেচ্ছায় কর্ম করেও তার যথাযোগ্য ফলভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারলে তাতে ন্যায়ের মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে নিশ্চয়ই, মহিমাও ক্ষুণ্ণ হবে অনিবার্য ভাবেই। সেজন্য বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্বে, 'লীলা' ও 'ন্যায়' চলেছে একই সঙ্গে, একই তানে লয়ে ছন্দে। এইভাবে ঈশ্বরের দিক্ থেকে যা 'লীলা' (Play), জীবের দিক্ থেকে তা 'ন্যায়' (justice)।

কিন্তু 'লীলা' তো স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দোদ্বেল, স্বভাবজ ক্রিয়া; 'ন্যায়ের' বন্ধন তাতে থাকতে পারে কিরূপে? অর্থাৎ সৃষ্টি যদি ভগব-ল্লীলাই হয়, তাহলে তা পুনরায় জীবকর্মানুসারী হবে কিরূপে? সেজন্য লীলাবাদ ও কর্মবাদ কি পরস্পরবিরোধী নয়?

না, তা নয়, যেহেতু দুটিই হ'ল ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব। বস্তুতঃ লীলা বা খেলার একটি প্রধান লক্ষণ যেমন হ'ল স্বতঃস্ফূর্ততা, অন্য দুটি প্রধান লক্ষণও হ'ল তেমনি বিচিত্ররূপতা ও নিয়মানুবর্তিতা। লীলা হয় নানাভাবের, লীলারও আছে নিয়ম ও

শৃঙ্খলা, প্রকৃত লীলা উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল নয়। সেজন্য ঈশ্বরও নানাভাবে লীলা করেন, নিয়মানুসারেই লীলা করেন; এবং এর থেকেই হয় নানা জীবের সৃষ্টি, তাদের স্ব-স্ব কর্মের নিয়মানুসারে।

ভারতীয় লীলাবাদ সম্বন্ধে আরও বহু আলোচনা করা চলে। এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সে সবের স্থান নেই। তবে একটি বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা হচ্ছে। উপরে বলা হয়েছে যে লীলা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, বিচারজাত কর্ম; অথচ স্বভাবজাত। কিন্তু যা স্বভাবজাত, তার ক্ষেত্রে ইচ্ছারই বা অবকাশ কোথায়, আর বিচার-বিবেচনারই বা প্রসঙ্গ কই? তা তো কেবল একটি জ্ঞান- ও ইচ্ছা-বিহীন প্রাকৃতিক কর্ম মাত্র। যেমন—বীজ স্বভাববশে অঙ্কুরে পরিণত হয়—এ তার স্বভাব ব'লে এর অন্যথা হ'তে পারে না, এবং সেক্ষেত্রে ইচ্ছা, বিচার, বিবেচনা প্রভৃতির প্রশ্নই ওঠে না। একই ভাবে—ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিরূপ কর্মটিও জ্ঞান- ও ইচ্ছা-বিহীন, প্রাকৃতিক কর্ম মাত্র।

কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা চলে যে, ঈশ্বরের কর্ম প্রাকৃতিক কর্ম বা পশুজগতের বুদ্ধিবিবেচনাহীন কর্ম কোনক্রমেই নয়। এটি স্বভাবজ এই অর্থে যে, স্বভাবের পূর্ণ বিকাশ এতে। এই স্বভাব কি বা ঈশ্বরের স্বভাব কি? স্বভাব কেবল আনন্দ নয়, সেই সঙ্গে জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি অসংখ্য লক্ষণও সমভাবে স্বভাব। সেজন্য স্বভাবের যখন প্রকাশ হয়, তখন আনন্দের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও প্রকাশ হয়, ইচ্ছারও প্রকাশ হয় বা শক্তিরও প্রকাশ হয়। এই কারণে পরমেশ্বরের এই সৃষ্টিরূপ কার্য একাধারে তাঁর অপরিসীম আনন্দ, অতুলনীয় জ্ঞান, অচিন্তনীয় শক্তি প্রভৃতির একটি সুন্দর, সুষ্ঠু সমাহার মাত্র।

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান জিনিস নিশ্চয়ই বিচার, আলোচনা, যুক্তি, তর্ক। কিন্তু প্রধানতম জিনিস এই সকলের অপেক্ষা আরও অনেক বেশী, আরও অনেক বড়—তা হ'ল স্থির ধীর সাক্ষাৎ উপলব্ধি। সেজন্য সকল বিচারালোচনা অতিক্রম ক'রে সুফী-প্রেমতত্ত্ব ও বেদান্ত-লীলাতত্ত্বের প্রকৃত মহিমা ও মাহাত্ম্য যেন আমরা উপলব্ধি ক'রে ধন্য হ'তে পারি। এই মহিমা, এই মাহাত্ম্য হ'ল এই যে, আপাতদৃষ্টিতে যাই হ'ক না কেন, প্রকৃতপক্ষে জগৎ প্রেম ও আনন্দের মূর্ত প্রতীক; কারণ পরমপ্রেমময়ের প্রেমের প্রকাশ এই জগৎ, পরমানন্দময়ের আনন্দের বিলাস এই জগৎ। তা কি কখনও হিংসা-দ্বেষ-দূষিত হ'তে পারে, ক্লেশ-ক্লেদ-কলুষিত হ'তে পারে? না, কদাপি নয়। সেজন্য ভগবৎ-সুধাপানে ধন্য সুফী মরমিয়া ভক্তগণ ও বৈদান্তিক পথপ্রদর্শক আচার্যগণ একবাক্যে বলেছেন যে, এই ধরণীরই ধূলিতে ধূলিতে, এই মর্ত্যেরই মাটিতে মাটিতে, এই সংসারেরই সংসরণশীল বস্তুতে বস্তুতে লুকিয়ে আছেন সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রীভগবান তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে। তাঁকেই আমাদের খুঁজে নিতে হবে, চিনে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে, টেনে নিতে হবে মোহাবরণ ভেদ ক'রে—দেখতে হবে যে, সংসার মায়া নয়, তাঁরই কায়া; মোহ নয়, তাঁরই স্নেহ; পাপ নয়, তাঁরই ছাপ; শোক নয়, তাঁরই আলোক। এই 'খোঁজাই' তো পরমা সাধনা, এই 'দেখাই' ত পরমা সিদ্ধি। সুফী প্রেমবাদ ও বেদান্ত-লীলাবাদের মধ্যে এই মধুর-মোহন, নিত্য-নূতন মহাসত্যের আভাস পেয়ে আমরা পরম ধন্য।

ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

স্বামী তেজসানন্দ

উচ্ছৃঙ্খলতা আজ কেবল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, উচ্চ পদাধিকারী সরকারী কর্মচারী হইতে নিরক্ষর পথচারী পর্যন্ত সকলের জীবনেই ঘোর অরাজকতা নামিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ সমাজের এমন একটি কর্মকেন্দ্র নাই, যাহা এই দুষ্ট ব্যাধির কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, সত্যাগ্রহ, গুণ্ডামি, ট্রেন-ট্রাম-বাস পোড়ানো, স্কুল-কলেজের চেয়ার-টেবিল ভাঙা, বিধানসভায় পরস্পরের প্রতি পাদুকা-নিক্ষেপ প্রভৃতি নানা কদর্য আকারে এই ব্যাধির লক্ষণগুলি আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দেশব্যাপী এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ যাহাই হউক না কেন, জাতীয় জীবনের দিকচক্রবালে আজ উহা এক ঘন কালো মেঘরূপে দেখা দিয়াছে। ভাবপ্রবণ এবং তরলমতি ছাত্রসমাজ যে এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে, ইহা আশা করা যায় না।

যে সকল বিদ্যায়তনে একদিন ছাত্রসমাজ কল্যাণকর শিক্ষার সাধনায় নিযুক্ত থাকিত, সে সকলই বর্তমানে দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ এমন একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে যে কালক্রমে সমস্ত সমাজসৌধই শিথিলভিত্তি হইয়া তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িবে। দেশের যুবসমাজ এই দুষ্ট বিশৃঙ্খলাব্যাধি হইতে অব্যাহতি না পাইলে বা অদূর ভবিষ্যতে সমাজজীবনে স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে সদ্যোজাগ্রত জাতির অপমৃত্যু যে আসন্ন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

অভিভাবকের দায়িত্ব

নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া আমরা যদি কারণগুলি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যাইবে যে এই দুঃখকর পরিস্থিতির জন্য ছাত্রগণের সহিত অভিভাবকগণও কম দায়ী নহেন। বর্তমান অধিকাংশ স্কুলকলেজের ছাত্রই পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রবাহ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে একান্ত অক্ষম, ইহার কারণ শিক্ষকগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন এবং অভিভাবকগণও তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক বহুতর সমস্যায় সর্বদাই বিব্রত। একটি ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে সমন্বিত করিবার জন্য যে সময় এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা অভিভাবকগণের অধিকাংশেরই আয়ত্তের বাহিরে। বলিতে কি বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে ইহা একটি মারাত্মক ত্রুটি।

ছাত্রের চরিত্রগঠনে পারিবারিক জীবনের প্রভাব

অনেক অভিভাবককে আজকাল সমালোচনা করিতে শোনা যায় যে ইদানীংকালে শিক্ষকগণ ছাত্রের মানসিক উন্নতি-বিধানে ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ছাত্রের মানসিক শিক্ষায় তথা চরিত্রগঠনে তাঁহাদের নিজেদেরও দায়িত্ব কোন অংশে কম নহে। পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে সদাচার, মহত্ত্ব, ধীরত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন দ্বারা কোন অভিভাবকই আজ আর তাঁহার সন্তানসন্ততির নিকট আদর্শ-স্বরূপ নহেন। অধিকন্তু বর্তমানের পারিবারিক জীবনে পুরাতনকালের সেই পবিত্র পরিবেশ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা-

পদ্ধতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা যেন আজকাল মরুভূমির মধ্যে পুষ্পোত্থান রচনা করিবার এক অলস কল্পনায় মাতিয়া আছি। প্রকৃতির মধ্যে যে নিয়ম, মনুষ্যসমাজও সেই একই নিয়মের অধীন। একটি বালকের জীবন ও চরিত্রগঠনের পক্ষে তাই পারিবারিক জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই বিশৃঙ্খলার দিনে শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতি ও কর্তব্যচ্যুতির জন্য অভিভাবকগণ যদি জনমতের বিচারালয়ে উপস্থিত না হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা-রক্ষায় সচেতন হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, বিশৃঙ্খলা-দমনের প্রচেষ্টা বেশী ফলপ্রসূ হইত।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণের সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যকতা

একটি পাখীকে মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে হইলে তাহার পক্ষে একজোড়া ডানাই যথেষ্ট নহে, উহার অগ্রভাগ অর্থাৎ মস্তক এবং পশ্চাদ্‌ভাগ অর্থাৎ পুচ্ছ—এই দুটিও সমভাবে প্রয়োজনীয়। মুক্ত আকাশ-বিহারে পাখীর এই মাথা, পুচ্ছ ও ডানা—এই তিনের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়। একটি বালকের শিক্ষার জন্যও প্রয়োজন অনুরূপ সমন্বয়ের। শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিকতার দ্বারা যদি একটি বালকের জীবনকে বিকশিত করিতে হয় তবে প্রয়োজন হয় অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী—এই তিনজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার। শুধু তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রয়োজন হয় একটি শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ও শান্ত পরিবেশ-বিশিষ্ট শিক্ষায়তনের। এই উপাদানগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটিলে আশানুরূপ ফললাভ অসম্ভব হইয়া উঠে।

অবসর-সময়ের অপব্যবহার

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি এই যে, স্কুল বা কলেজের সময়ের পূর্বে বা পরে শিক্ষার্থীর মনকে সৃষ্টিধর্মী ও গঠনমূলক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখার মতো বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার স্বাভাবিক ফল এই যে শিক্ষার্থী উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার অভাবে এমন সব অবাঞ্ছিত চিন্তায় ও কাজে জড়াইয়া পড়ে যাহা সুশৃঙ্খল জীবনের একান্ত পরিপন্থী। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শতকরা নব্বই জন শিক্ষার্থী স্কুল ও কলেজের শিক্ষালাভের পূর্বে ও পরে দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কোনরূপ ক্ষেত্র বা সুযোগ পায় না। বয়ঃসন্ধিসময়ে শিক্ষার্থীর তরুণমনকে উপযুক্ত গঠনমূলক কার্যে নিযুক্ত না করিয়া কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে বদ্ধ করিয়া রাখা বিশেষ ক্ষতিকর।

ছাত্রসংসদ্‌গুলির উপর রাজনৈতিক প্রভাব

অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রপরিষদগুলি রাজনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময় না হইলেও অধিক সময়েই এই ছাত্রসংস্থা-সমূহ এমনই সব সুচতুর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কবলে পতিত হয়, যাহারা অল্পকালের মধ্যেই ছাত্রদের সহায়তায় ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ফেলে। ইহা বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত ছাত্রসংগঠনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক। শুধু তাহাই নহে, এই ছাত্রসংগঠনগুলির স্থিতি ও স্থায়িত্বের মূল্য বিচারে উহাদের সাংস্কৃতিক অবদান কতখানি উহাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। এই ছাত্রপরিষদগুলি পুনর্গঠিত হইয়া যত শীঘ্র উন্নততর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া উঠিবে, ছাত্র-সমাজের শৃঙ্খলাও তত ত্বরান্বিত হইবে।

শিক্ষকগণের দায়িত্ব

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্পর্কে বলিতে গিয়া ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী মন্তব্য করিয়াছেন:

বর্তমান পরিস্থিতির চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ইহার জন্য একদিকে যথাযথ কর্তব্য সাধনে পিতামাতার যেমন অক্ষমতা রহিয়াছে, অন্যদিকে ছাত্রের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণে শিক্ষকের অক্ষমতাও তেমনি বর্তমান। ইহা সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক যে বহুক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিজেরাই ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া বহু রাজনৈতিক নেতাও আছেন, যাঁহারা এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ছাত্রগণকে স্ব স্ব রাজনৈতিক মতের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমাজবিরোধী কাজে ছাত্রগণকে নিযুক্ত করিতে শিক্ষকের উৎসাহ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনে ছাত্রদের নিয়োগ করিতে নেতাদের আগ্রহ—এই দুইটি ঘটনার মতো ঘৃণ্য অপরাধ আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যথার্থই বলা হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহাই অনুকরণ করিয়া থাকেন। কালাকাল বিবেচনা না করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্লোগান সহকারে বিভ্রান্ত রাজনৈতিকগণের মতো শিক্ষকগণও পথে পথে এই যে ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি পরিচালনা করেন, এইগুলি শিক্ষকের মহৎ জীবনব্রতকে বিদ্রূপ করে। স্কুল-কলেজে শিক্ষকগণকে এই সব কার্যে ইন্ধন যোগাইতে দেখিয়াও ছাত্রগণ নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে, ইহা আশা করা একান্ত অসমীচীন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসমস্যার জরুরী আলোচনার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ত্রিগুণা সেন ১৯৫৯ খৃঃ ৬ই নভেম্বর কলিকাতার শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং কলিকাতার কয়েকটি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ। এই সম্মেলন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে অতঃপর কলেজ-শিক্ষকদের কোন রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা কলেজের ছাত্রদের সমক্ষে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরন্তু শৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং বিশৃঙ্খলা দমনে তাঁহাদের ভূমিকা সক্রিয় হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে ছাত্রেরা লিপ্ত হইয়া পড়িলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে তাঁহাদের ঐ গুলির প্রতিবিধান করা উচিত। কলেজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কেবলমাত্র অধ্যক্ষেরই দায়িত্ব, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। এ-বিষয়ে শিক্ষকগণ অধ্যক্ষের সহিত সমভাবে জড়িত। কেন না, ছাত্রগণকে উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা দিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য

ইহা একটি গুরুতর পরিস্থিতি যে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের দুরূহতার (কল্পিত অথবা প্রকৃত) অজুহাতে পরীক্ষাগ্রহণকালে ছাত্রেরা হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষণিকের মধ্যেই চরম তাণ্ডবলীলার অবতারণা করে। বলা বাহুল্য, পাঠ্যতালিকাগুলির সহিত সুপরিচিত সুযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রশ্নপত্র রচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং অভিজ্ঞ প্রশ্ন-নিয়ন্ত্রণকারীদের (moderator) দ্বারা ঐ প্রশ্নপত্রের মান এমন ভাবে নিয়মিত হওয়া সঙ্গত, যাহাতে এই বিষয়ে ছাত্রদের কোন প্রকার ক্ষোভ বা অভিযোগের

অবকাশ না থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্রদের অভিযোগ যুক্তিযুক্ত হইলে তাহার তদন্ত করা উচিত। কিন্তু ছাত্রগণের আইনশৃঙ্খলাভঙ্গের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের স্বাভাবিক কর্মধারা বিঘ্নিত হইবে—ইহা কোন মতেই বরদাস্ত করা উচিত নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়, কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব, বা প্রশ্নপত্রসমূহ পাঠ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত নহে, বা পরীক্ষাবিধির সহিত উহার কোন সামঞ্জস্য নাই, বা প্রশ্নপত্রের মান নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে বা অন্য কোন কারণে ছাত্রদের প্রতি অবিচার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে সিণ্ডিকেট ঐ সমস্ত বিষয়গুলির সংশোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই নিয়মের ভিত্তিতে পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার ও যথাসময়ে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষার্থীদিগকে জানাইয়া থাকেন: প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহারা পরীক্ষাগ্রহণকালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা দলবদ্ধভাবে পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ না করিয়া পরীক্ষাশেষে লিখিতভাবে ঐ বিষয়ে অভিযোগ পেশ করিবে। বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টির দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থী এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সে উহা নিজ দায়িত্বেই করিবে। এই সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীগণ যদি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ অবশ্যই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই ব্যবস্থা-গ্রহণে সামান্যতম কুণ্ঠা ও দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। যে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্‌গিরণ করিতেছে, তাহার মুখে কয়েক ফোঁটা জল দিলে উহার অগ্ন্যুদ্‌গার নিবৃত্ত হইবে না। তাই চরমতম বিশৃঙ্খলা-দমনে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য।

প্রাইভেট ও নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতাবিচার

পরীক্ষাকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলাকারীদের মধ্যে এমন সব ছাত্র থাকে যাহারা নির্বাচনী (test) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া পরীক্ষাদানের অনুমতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রভৃতি জমা দিয়া এবং কাগজপত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কর্তব্যগুলি শেষ করিয়া অত্যন্ত অযোগ্য পরীক্ষার্থীও পরীক্ষাদানের অনুমতি লাভ করিয়া থাকে। এই সব পরীক্ষার্থীরা যখন পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার পায় তখন পরীক্ষাগ্রহণের গাম্ভীর্য ও তাৎপর্য যে অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ-কথা অনস্বীকার্য যে ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মের শিথিলতা অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু নন-কলেজিয়েট বা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের মতো সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, সেখানে নিয়মের এই আত্যন্তিক শিথিলতার অর্থ কী, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরীক্ষাগ্রহণকালে পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এই নিয়মশৈথিল্য বহুলাংশেই দায়ী।

সহশিক্ষা

সহশিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রসমাজের সাম্প্রতিক শিক্ষাজীবনের ভারসাম্যকে বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। এই বিষয়ে মতভেদ

থাকিলেও স্কুল বা কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা যে তরুণদের নৈতিক স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি ঘটাইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য দেশীয় এই সহশিক্ষা ভারতীয় জীবনের একান্ত প্রতিকূল। এই বিজাতীয় শিক্ষাদর্শকে পরিবর্তিত করিয়া ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্ম পৃথকভাবে নির্দিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষাদানের যে প্রাচীন ঐতিহ্যসম্মত ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার পুনঃপ্রবর্তন একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা জাতির বিশেষ কল্যাণকর হইবে।

ভারতের সনাতন শিক্ষাদর্শ

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনের মোহে পড়িয়া জীবনের যথার্থ মূল্যমান আমরা ত্যাগ করিয়াছি। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক নীটশের (Nietsche) ভাষায়, 'জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তগুলি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সর্বাপেক্ষা নীরব ও শান্ত; কোলাহল ও চাঞ্চল্যের মুহূর্তগুলি নহে। জীবনের মূল্যায়নে ও গতি-নির্ণয়ে যাহাদের নূতনতর দৃষ্টি আছে, জগৎ তাহাদেরই অনুবর্তী হয়; কর্মকোলাহলের পথে যাহাদের গতি, তাহাদের নহে।'

কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে গঠিত আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের অসহিষ্ণুতা ও কোলাহলপ্রিয়তার পোষকতা করিতেছে, যেন শিক্ষায় ও কর্মে নিভৃত ও নীরব অনুশীলনের পরিবর্তে কোলাহল ও অরাজকতা দ্বারাই আমাদের জীবনের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা সম্ভব। ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া ছাত্রসমাজ দিন দিন জাতীয় ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে 'সংস্কৃত সাহিত্য', তাহাই আজ বর্তমান ছাত্রসমাজ কর্তৃক সম্পূর্ণ অবহেলিত। আমরা বিপজ্জনক পথে চলিয়াছি। এই ভ্রান্তির নিরাকরণ যত দ্রুত হয়, ততই মঙ্গল। পাঠ্য ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোটি শোচনীয় ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে আমাদের শাস্ত্রসমূহে তরুণ-শিক্ষার্থীর মনে নীতিশিক্ষাকে স্থায়ী ও গভীর করিবার জন্ম শিশুকাল হইতেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত :

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। 'জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্।' 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।' 'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।' 'যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।'

—শাস্ত্র ও আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।···আমাদের জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক। কর্ণদ্বয়ে যেন বহু (ব্রহ্মকথা) শুনিতে পাই। ···সত্য ও ধর্ম হইতে যেন কখনও বিচ্যুত না হই। মঙ্গলজনক কার্যে যেন ভ্রান্তি (শৈথিল্য) উপস্থিত না হয়। মাতা, পিতা, আচার্য ও অতিথিকে সর্বদা দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে।—আচার্যগণের অনিন্দিত কর্ম সকলই অনুষ্ঠেয়—অপরগুলি নহে। যাহা তাঁহাদের সদাচার, তাহাই অনুকরণীয়,—অপরগুলি নহে।

বস্তুতঃ যদি আমরা ছাত্রসমাজের বিশৃঙ্খলা-দমনে আগ্রহী হই, তবে শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই অনুশাসনগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া রাখিয়া আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব নহে।

বিদ্যায়তনে ছাত্রসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ

কলেজগুলিতে ছাত্রস্ফীতি সাম্প্রতিক কালের অপর একটি বৃহৎ সমস্যা। এই অবস্থার

অবসান ঘটাইতে হইলে বড় কলেজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিকেন্দ্রীকৃত করা বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রগণকে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আনিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য; হয়তো ইহার ফলে কয়েকটি কলেজের পক্ষে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে এবং সরকারকেও একটি বড় রকমের আর্থিক ঝুঁকি লইতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ইহাকে জাতির উন্নতির জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন বলিয়াই বলিব। কেননা, দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার মুখে ছাত্রসমাজকে সংহত করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। জাতির হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই যদি তরুণসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী না হন, তবে জাতির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা-প্রবর্তনের বিষয়ে আজকাল একটি মতবিরোধ বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুরাতন জীর্ণ মতবাদ হিসাবে ইহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। এইরূপ চিন্তাধারা যে সমাজের চরম অকল্যাণকর মনোবিকার মাত্র, এ বিষয়ে স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিমাত্রই একমত হইবেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে ভারতের সুদৃঢ় জাতীয় জীবন ভারতীয় মনীষিগণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যে-ধর্ম আমাদের জীবনকে এত কাল অব্যাহত গতি দিয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিলে আমরা আমাদের ঐতিহ্যময় অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব, ইহা বলাই বাহুল্য। স্বামী বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যথার্থই বলিয়াছেন, 'ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের জীবনের একমাত্র ভিত্তি। রাজনীতি, সমাজনীতিতে উন্নতি—এমন কি কুবেরের ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারত যদি ধর্মকে ত্যাগ করে, তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।' শিক্ষাকে তিনি এমনভাবে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে উহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ—তাহাকেই কেবল গ্রহণ করিবে না, সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ নীতি ও জ্ঞানের আদর্শকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে তিনি সেই শিক্ষাকেই বলিয়াছিলেন যাহা মস্তিষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয়ের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত হইতে সাহায্য করে।

শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের মন্তব্য

১৯৪৮-৪৯ খৃঃ নিযুক্ত 'রাধাকৃষ্ণন শিক্ষা কমিশন'-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় যাহা উল্লিখিত তাহার মর্ম:

ভৌগোলিক বিস্তৃতি, উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা, ধনসম্পদের প্রাচুর্য বা জাতীয় সম্পদের সমবণ্টন-ব্যবস্থা—এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও কোন দেশের মহত্ত্ব বা উন্নতির প্রকৃত মান নহে। আমরা আমাদের সমাজে আজ যদি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া কেবল যন্ত্রশিক্ষাকেই প্রাধান্য দিই, তবে আমরা বর্বর রাক্ষসযুগের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিব। এই পথে আমরা সৃষ্টি করিব কয়েকজন বিবেকবিহীন বৈজ্ঞানিক ও কয়েকজন কুরুচিসম্পন্ন যন্ত্রবিদ্, যাহারা জীবনের শূন্যতাকে দূর করিবার জন্য বেপরোয়া হইয়া উঠিবে। তাই, যদি আমরা সুসভ্য বলিয়া দাবি করিতে চাই, তবে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি, মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, মানবভ্রাতৃত্বে আস্থা, শান্তি ও স্বাধীনতায় আগ্রহ এবং ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ—এই গুণগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। মানুষ যত দিন পৃথিবীতে জ্ঞানের পূজা করিবে, ততদিন এই গুণগুলি সমাজে সমাদৃত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই গুণগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

১৯৫২-৫৩ খৃঃ মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে নিযুক্ত 'মুদালিয়র কমিশন' এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কী, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে সুগঠিত করা, যাহার ফলে শিক্ষার্থী নিজশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া স্বদেশ-কল্যাণে নিযুক্ত হইবে।'

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত ধর্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ক কমিটির রিপোর্টের কিয়দংশ উল্লেখ করা সময়োপযোগী হইবে। কমিটি দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন, 'সাম্প্রতিক শিক্ষাসমস্যা এবং সমাজসমস্যার অন্যতম কারণ হইল মানুষের জীবনে ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত ধর্ম-প্রভাব।' কমিটির মতে এই ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক হইল বাল্যকাল হইতেই আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা। ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার (4. 2. 60) সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হইয়াছে :

ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষাকে কার্যকরী করিতে হইলে উহার একমাত্র উপায় বড় বড় শহরগুলি হইতে দূরে রামকৃষ্ণ মিশন বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত আবাসিক শিক্ষায়তনগুলির মতো বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করা, এইরূপ পরিবেশেই নৈতিক শিক্ষা অধিকতর শক্তিপ্রদ হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাসিক শিক্ষায়তনে যেখানে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, যেখানে প্রার্থনা পাঠ দৈহিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি খেলাধূলা এবং আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে বিশৃঙ্খলা নাই বলিলেই চলে। চারিত্রিক দৃঢ়তা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইলেই প্রতি শিক্ষায়তনে নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কেন না, ছাত্রের জীবনকে প্রভাবিত করিতে প্রাণহীন শুষ্ক নিয়মাবলী অপেক্ষা চারিত্রিক দৃঢ়তা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জীবনই বেশী সক্ষম। এইরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পরস্পরকে প্রীতি ও শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে এবং উহার ফলে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বিরল হইয়া উঠে।

নব্যভারত-গঠনে রাষ্ট্রনায়কগণের দায়িত্ব

উপসংহারে আমরা এই কথাই বলিব যে এই ছাত্রবিশৃঙ্খলাকে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেরই সমস্যা-মাত্র বিবেচনা করিলে আমরা একটি বড় ভুল করিব। দেশের বহুমুখী সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলির অঙ্গ হিসাবেই ইহাকে বিচার করিতে হইবে। দেশব্যাপী গঠনমূলক প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষা শেষ করিয়া যে সমস্ত ছাত্র প্রতিবৎসর বাহিরে আসিতেছে, তাহাদের সকলের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান করিতে শাসন কর্তৃপক্ষ সক্ষম হইয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না। একথা ঠিক যে দীর্ঘকালের পরাধীনতার পর আমরা হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এই স্বাধী-নতাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমাদের উপযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাই। তাই এই উপযুক্ততার অভাবে কিছু কিছু জটিলতা আসা অস্বাভাবিক নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধেও শিক্ষিত যুবক-গণের প্রতিভার যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় সংগঠনকারীদের আরও সচেতন হওয়া কর্তব্য।

হতাশ হইবার হেতু কিছুই নাই। কেন না, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষিত সমাজেরই দায়িত্ব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাঁহাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্গঠিত করা। আমরা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে ছাত্র-গণের অন্তরে দেশপ্রীতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি ও শক্তির সুপরিচালনা ও নিয়োগের সম্যক্ ব্যবস্থা হইলে তাহারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের মর্যাদা লাভ করিবে এবং শিক্ষাশেষে জন্মভূমির পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রেরণা পাইবে।

বিদেশীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ*

অধ্যাপক শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটা বড় কথা হ'ল যে বাংলা দেশ বা ভারতে তাঁর জন্ম হলেও তিনি এসেছিলেন সারা জগতের জন্য। সমস্ত জাতি, সমস্ত দেশ, সব ধর্ম, সারা জগতের মানুষের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ভাব আনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য—ব'লে মনে হয়। 'সর্বধর্মস্বরূপিণে' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ঠিকই বলা হ'য়ে থাকে। এই ভাবটি বিদেশীদের মুগ্ধ না ক'রে পারে না।

আমেরিকার দর্শন-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি জে. বি. প্র্যাট (J. B. Pratt) লিখেছেন রামকৃষ্ণের বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। আমাদের মন সসীম, অসীম নয়। ভগবান সম্বন্ধে ধারণাও তাই সব মনে এক রকম হ'তে পারে না। একই ভগবান সম্বন্ধে বিভিন্ন মনে বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি জাগতে পারে। এ সম্বন্ধে প্র্যাট শ্রীরামকৃষ্ণেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: ভগবান এক, কিন্তু তাঁর প্রকাশ বিভিন্ন। যেমন, বাড়ীর কর্তার বিভিন্ন রূপ আছে। তিনি কারো পিতা, কারো ভাই এবং কারো স্বামী। তেমনি ভগবানও নানা রূপে প্রকাশমান। যিনি যে রূপে তাঁকে দেখেন, ভগবান তাঁর কাছে সেই রূপেই প্রকাশিত।

ম্যাক্‌স্ মূলার (Max Muller) ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলেছেন; এই যে সর্বসময়ে ঈশ্বর-অনুভূতি, এরই উপর অদূর ভবিষ্যতে মহান্ মন্দির নির্মিত হবে, যেখানে হিন্দু ও অহিন্দু হাতে হাত মিলিয়ে একই পরমাত্মার অর্চনা করতে পারবে।

অধ্যাপক রোরিক (Nicholas de Roerich) তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে লিখেছেন: সর্ব ধর্মের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ ভাবটি যেন আমরা মনে রাখতে পারি। এই উদার ভাব পাষাণ হৃদয়কেও নাড়া দেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু বিদেশী মনীষীই উচ্চ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তাঁরই সমসাময়িক বাংলার তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা টনি সাহেব (Charles Tawney) লিখেছেন: এমনই তাঁর বাণীগুলি যে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক না হ'য়ে যায় না। কেসারলিং (Keyserling) লিখেছেন: দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কথা ভাবলে আমার একটু বিশেষ শ্রদ্ধা না হ'য়ে পারে না। তিনি একটি শাশ্বতভাবের প্রতীক। বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ড্‌সে (Lord Ronaldshay) লিখেছেন: রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ —বাংলার মনে এ দুজনের চেয়ে বেশী দাগ দিয়েছেন, এমন লোক খুব কম আছে।

ক্রিষ্টোফার ইসারউড্ (Christopher Isherwood) লিখেছেন: গত দুই শতাব্দীতে মানবজাতির মধ্যে রামকৃষ্ণ হলেন সব চেয়ে বড় আধ্যাত্মিক নেতা। রামকৃষ্ণের উপদেশ আমাদের আধুনিক 'গস্পেল'। তিনি এসেছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরই জন্যে, দু-হাজার বছর আগেকার মানুষের জন্যে নয়। রোরিক আর এক জায়গায় লিখেছেন: আমরা জানি বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তা চলেছে। আমরা জানি সত্যিকারের উৎসুক লোক কি রকম অযাচিতভাবে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা বই-এর সংস্পর্শে এসে পড়ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক ছিলেন, একথা বহু বিদেশী মনীষী স্বীকার

*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ১০.৩.৫৯ তারিখে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত ভাষণ। (আকাশ-বাণীর সৌজন্যে)।

করেছেন। রোমা রলাঁ (Romain Rolland) তাঁর বিখ্যাত বইএর ভূমিকায় লিখেছেন : আমি ইওরোপের জন্যে আত্মার এক নতুন বাণী আনছি, —এ এক নতুন ফসল, ভারতের ঐকতান, যার নাম 'রামকৃষ্ণ'। যার কথা আমি বলতে চলেছি, তিনি তিরিশ কোটি লোকের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ। যদিও বহু বছর হ'ল তিনি দেহত্যাগ ক'রেছেন, তাঁর আত্মা আধুনিক ভারতকে উজ্জীবিত করে।

যে দেশে রামকৃষ্ণের জন্ম, সে দেশ সম্বন্ধে গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন ম্যাক্স্ মূলার। তিনি বলেছেন : যদি আমরা মনে রাখি যে এই কথাগুলি শুধু রামকৃষ্ণের নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস ও আশার বাণী, তাহলে সেই দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সত্যই আশান্বিত হ'তে পারি। সেখানে মানুষের মধ্যে দেবত্বের চেতনা রয়েছে সবার মধ্যে—যারা আপাতদৃষ্টিতে পৌত্তলিক, তাদের মধ্যেও।

লর্ড রোনাল্ডসে বলেছেন : যে সময়ে পাশ্চাত্যের ভাব ও ধরন-ধারণের জন্যে একটা নেশা এসেছিল, সেই সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শ তুলে ধরেছিলেন।… ত্যাগের আদর্শ, যান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে জীবন যখন জটিল হ'য়ে উঠেছিল, সে সময় সহজের আহ্বান। রোরিক লিখেছেন : সদ্ভাব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ এত কথা বলেছেন যে, এগুলি মানুষের হৃদয়ের সুন্দর দিকটা উদ্‌ঘাটিত করবেই। তিনি ছিলেন যা কিছু ভাল, তারই নির্মাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাটা ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম হয়, বিদেশে রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রসার দেখে। বিশেষ ক'রে যাঁরা আমেরিকায় গেছেন, তাঁরা জানেন—আমেরিকার অনেকগুলি প্রধান শহরে বেদান্ত-সমিতি কাজ ক'রে চলেছে। সেখানে প্রতি রবিবার স্বামীজীরা যে ভাষণ দেন, তাতে এবং অন্যান্য ক্লাসগুলিতে অনেক ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হ'য়ে থাকে। হলিউডের মতন জায়গায় রবিবার বেদান্ত-সমিতির ভাষণ শুনতে আধ ঘণ্টা আগেই হল ভর্তি হ'য়ে যায়। দেখেছি বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় ১১টায় গিয়ে পৌঁছলে মন্দিরের রাস্তা আইভার এভেন্যুতে গাড়ী পার্ক করার জায়গা পাওয়া যায় না। ভাষণের আগে এবং পরে অনেক নরনারীকে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে ব'সে থাকতে দেখেছি। মেয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে প্রণাম করছে—শাড়ীর আঁচলের অভাবে স্কার্ফটিকে আমাদের মেয়েদের মতো গলায় দিয়ে নতজানু হ'য়ে। স্বামীজীরা তাঁদের ভাষণে একটি কথা বলেন, যেটি বিশেষ মূল্যবান্ এবং কার্যকরী; তাঁরা কাউকে খৃষ্টানধর্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বলেন না। তাঁরা বলেন : যে হিন্দু আছ, সে আরো ভাল হিন্দু হও। যে খৃষ্টান আছ, সে আরো ভাল খৃষ্টান হও। এই উদার আহ্বান অনেকের মনকে নাড়া দেয়। এক দম্পতি আমায় বলেছিলেন, এই উদার কথাগুলিই তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট করেছে। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে তাঁরা প্রতি রবিবার বেদান্ত-সমিতিতে আসেন।

আমেরিকার ভূমি স্পর্শ করার আগেই এই রামকৃষ্ণ-ভক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম। আমাদের জাহাজ তখন সবে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বন্দরে পৌঁছেছে। জাহাজের ভিতরেই ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র দেখা হবে। এই সময় দেখলাম একজন আমেরিকান মহিলা জাহাজে উঠে এলেন আমাদের—ভারতীয় ছাত্রদের- খোঁজে। বললেন, তিনি একবার ভারতে গিয়েছিলেন, সে সময় একটা দর্শনীয় স্থান হিসাবে বেলুড় মঠ দেখতে গিয়েছিলেন। তার পর উৎসাহভরে বলতে লাগলেন তাঁর সেই আশ্চর্য অনুভূতির কথা। মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর মনে হ'ল, যেন তাঁর বাইরের অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, আর যতই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, ততই যেন মন অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি মনকে ছেয়ে ফেলেছে। সেদিন থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিতা। সেই সুবাদে আজ একদল ভারতীয় ছাত্র আসছে জেনে তিনি ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

পুস্তক-পুস্তিকায় পত্রপত্রিকায় লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে, রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বেদান্ত-সমিতিগুলির ভক্তগণের মধ্যে, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-স্বীকৃতি উত্তরোত্তর প্রকাশ পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কথাটি বলেই শেষ করি :

দেশবিদেশের প্রণাম আনিলে টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

পাষাণ, প্রপাত, পাদপ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

এবার গ্রীষ্মকালে আমেরিকার একটি বড় ন্যাশনাল পার্ক দেখবার সুযোগ হয়েছিল। মধ্য ক্যালিফর্নিয়ার ১১৮৩ বর্গমাইল জুড়ে এই পার্কটি। পার্কের মধ্যে যেমন রয়েছে দশ থেকে বার হাজার ফুট উচ্চতার প্রায় কুড়িটি তুষারশৃঙ্গ এবং মাইলের পর মাইলব্যাপী নানা জাতীয় পাইন ফার ও সিডার গাছের বন—তেমনি আছে সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ (সাব্-অ্যালপাইন মেডোজ) এবং ছোট বড় কয়েক ডজন মনোরম হ্রদ। কিন্তু যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হ'ল 'যোসেমিটি ভ্যালি'—৭ বর্গমাইল আয়তনের একটি উপত্যকা এবং 'ম্যারিপোসা গ্রোভ'—পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বৃক্ষ 'সেকুইয়া' গাছের কুঞ্জ। উপত্যকাটির উচ্চতা হ'ল ৪ হাজার ফুট। মাঝখান দিয়ে বিচিত্র বঙ্কিম গতিতে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছতোয়া মার্সেড নদী। সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে রেখেছে তিন থেকে চার হাজার ফুট উঁচু গ্র্যানিট পাহাড়ের শ্রেণী, আর ছয় জায়গায় এই পাষাণপ্রাচীরের গা বেয়ে নেমে আসছে ৬টি আশ্চর্য সুন্দর জলপ্রপাত। বৃহত্তম প্রপাতটির দৈর্ঘ্য ২৪২৫ ফুট। এর নাম যোসেমিটি জলপ্রপাত। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ৮৪টি জলপ্রপাতের মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। প্রথম হলেন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা রাজ্যের এঞ্জেল প্রপাত; উচ্চতা ৩৩০০ ফুট। আমাদের দেশের মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত জেরসাপ্পা প্রপাতের স্থান সপ্তদশ।

আমেরিকায় বর্তমানে মোট ৩০টি ন্যাশনাল পার্ক আছে, এই 'জাতীয় উদ্যান'গুলির সংরক্ষক কেন্দ্রীয় সরকার। কর্মজীবনের শ্রান্তি এবং একঘেয়েমি থেকে বিযুক্ত হ'য়ে অল্প সময়ের জন্যও যাতে মানুষ প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য, সাম্য ও স্বচ্ছতার সংস্পর্শে আসতে পারে এবং সেই সংস্পর্শ লাভ ক'রে শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছতা ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে বহু বর্গমাইল আয়তনের এই পার্কগুলির সৃষ্টি। আয়তনে ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ বড় একত্রিশ লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট দেশ আমেরিকায় প্রকৃতির বহু বৈচিত্র্য ছেয়ে আছে। যেখানেই প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই গভর্নমেণ্ট সর্বসাধারণের জন্য একটি পার্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ন্যাশনাল পার্ক ছাড়া আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের প্রাদেশিক সরকারও তাঁদের অর্থে ও দায়িত্বে শত শত ঐরূপ পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলিকে বলে স্টেট পার্ক। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ন্যাশনাল পার্কের তুলনায় এগুলির আকার অনেক ছোট। ন্যাশনাল পার্ক এবং স্টেট পার্ক দুইই শহর থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির সহজ পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। শহরের গোলমাল, যান্ত্রিকতা, বাণিজ্য ও কলকব্জার সমারোহ সেই পরিবেষ্টনীতে নেই।

দুই শ্রেণীর পার্কই আমেরিকান চরিত্রের একটা স্বাভাবিক চাহিদার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সে চাহিদা হ'ল প্রাত্যহিক জীবনের তীব্র ব্যস্ততা এবং খাওয়া-পরা-টাকা-রোজগারের তথা সামাজিক লেন-দেনের গতানুগতিকতা থেকে খানিকটা মুক্তির ইচ্ছা। পারিবারিক ও

সামাজিক জীবনের স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকানকে প্রচুর রোজগার করতে হয়, রোজগার করতে গিয়ে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয় এবং অনিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়ায় স্নায়বিক এবং মানসিক অবসাদের সম্মুখীন হ'তে হয়।

নিষ্কৃতির উপায়? ঔষধ-পথ্য সে অনেক ব্যবহার ক'রে দেখেছে, বেশী ফল পাওয়া যায় না। শহরের আমোদ-প্রমোদ নেশার সাময়িক বিস্মৃতিও খুব কার্যকরী নয়। কিন্তু এই একটি জিনিস—যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোসগুলি সব খুলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির কোলে সহজভাবে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা—এর অবশ্যম্ভাবী সুফল আমেরিকান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। তাই সারা বৎসর সে উন্মুখ হ'য়ে থাকে গ্রীষ্মকালে 'ভেকেশন' (ছুটি)-এর সপ্তাহগুলির অপেক্ষায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হ'তে আরম্ভ ক'রে রাস্তার শ্রমিকটি পর্যন্ত—প্রত্যেকেরই এই প্রতীক্ষা অত্যন্ত প্রখর। 'ভেকেশন' কথাটি এরা উচ্চারণই করে একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ হৃদয়াবেগের সঙ্গে। আর 'ভেকেশন' এরা বাড়িতে কাটায় না। (ভারতবর্ষের মতো তীর্থদর্শনের বালাই এদের নেই। ধর্মকর্ম বলতে গীর্জাতে এক বা দু' ঘণ্টা কাটিয়ে আসার বেশী ধারণা নেই।) চলে যায় প্রকৃতির দরবারে। পাঁচ দশ কুড়ি—যে কদিন পারে, কাটিয়ে আসে। ন্যাশনাল এবং স্টেট পার্কগুলিতে গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার লোকের ভিড়।

আমার কর্মকেন্দ্র স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহর হ'তে সকাল ৮৷৷টায় মোটরে বেরিয়ে আমি এবং সঙ্গী জনৈক আমেরিকান যুবক বেলা ১৷৷টায় যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের এক মাইল আগে পূর্বনির্দিষ্ট আমাদের দুদিনের আস্তানা পার্ক-লাইন মোটেলে হাজির হলাম। 'মোটেল' কথাটি মোটর ও হোটেল এই দুটি শব্দের সংযোজনে উৎপন্ন। এটি নিছক আমেরিকান ব্যবহার। যে হোটেলে যাত্রীর মোটর গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে তার নাম 'মোটেল'। আমেরিকায় মোটর গাড়ির সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দিন দিন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে সর্বত্রই পার্কিং একটি মহাসমস্যা। আমরা দুপুরের খাওয়া রাস্তায় একটি রেস্টরাণ্টে সেরে এসেছিলাম। তাই সুটকেস ও ব্যাগ মোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে রেখে সিদা পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালায় ঘেরা ১১৮৩ বর্গমাইলের এই বিরাট পার্কের মাত্র চারটি প্রবেশ-পথ; পূর্ব থেকে একটি, দক্ষিণ থেকে একটি এবং পশ্চিম দিক থেকে দুটি। আমরা পশ্চিমের একটি দরজা দিয়ে ঢুকলাম। পাহাড়ের গা দিয়ে মোটর রাস্তা উপরে উঠছে আর ডানদিকে পাহাড়ের খাদে মার্সেড নদী প্রবাহিতা। কালিম্পংএর রাস্তায় তিস্তা নদীর দৃশ্য মনে পড়লো। ভগবান যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তিনি নিশ্চিতই প্রকৃতির গায়ে দেশ-বিভাগের ছাপ মেরে দেননি—এটা আমেরিকার নদী, ওটা আফ্রিকার বন, এটা ভারতবর্ষের পাহাড়। কি আমেরিকা, কি আফ্রিকা, কি ভারতবর্ষ সর্বত্রই প্রকৃতির মূর্তিতে এক নৈর্ব্যক্তিক মহিমা প্রকট হ'য়ে রয়েছে। ভাষা, বর্ণ, আকার, আচার-ব্যবহারে মানুষ মানুষ থেকে পৃথক—এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মূল প্রকৃতির গিরি-নদী-বন-উপত্যকায় আমরা এরূপ কোনও বিভেদ কল্পনা করতে পারি না। তাই মার্সেড নদী দেখে মনে হ'ল যেন আমার বহু-পরিচিত এক বন্ধুর দেখা পেলাম—আমার বাংলা দেশের পার্বত্য স্রোতস্বতী তিস্তা।

যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের গাইড বুক্-এ লেখা ছিল, 'যাত্রী, পার্কে ঢুকে দৃষ্টি সজাগ

রেখো, দৃশ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য কোরো, তার পরে প্রস্তুত থেকো হঠাৎ এক মুহূর্তে চোখ-জুড়ানো প্রাণ-মাতানো অভিনব বিস্ময়ের জন্যে।' মোটর যত উপরে উঠছে গাইড্-বুকের এই কথাটি ততই মনে পড়ছে আর কৌতূহলও বাড়ছে। দৃশ্যের পরিবর্তন স্পষ্টই লক্ষ্য করছিলাম। মার্সেড নদীর স্রোতের বেগ এবং গর্জন কমে আসছে, পাহাড়ে গাছপালার চেহারাও বদলাচ্ছে, পর্বত-প্রাচীরগুলির আকৃতিতেও নূতনত্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সকল হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা কি সেই অত্যাশ্চর্য অপরূপ দৃশ্য, যা এক মুহূর্তে চোখে প'ড়ে অন্তরকে বিস্ময়-বিমূঢ় ক'রে দেবে? কোথায়, কত দূরে অপেক্ষমাণ সেই যাদুমায়া?

ইতিমধ্যে রাস্তার খাড়াই বেশ কমে এসেছে, প্রায় সমতল ভূমির কাছাকাছি। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি মার্সেড নদী আর নেই, পরিবর্তে একটি লম্বা জলাশয়, অতি স্থির তার জল, আর জলে নানা রকমের লিলি ফুটে রয়েছে। সঙ্গী ফিলিপ ওয়ারেনকে জিজ্ঞাসা করলাম নদী কোথায় লুকিয়ে পড়লো? সে যোসেমিটিতে আগে একবার এসেছে। হেসে বললো, 'ঐ তো নদী—যাকে শান্ত জলাশয় মনে করেছেন। এবার যোসেমিটি উপত্যকা আসছে কিনা, তাই নদীর তর্জন গর্জন নেই, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর পরে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আবার প্রবাহিণীর রূপ নেবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি দুপাশের পাহাড় দূরে সরে যাচ্ছে আর রাস্তা সমতল জমির উপর দিয়ে চলেছে। সামনে প্রায় দু'শ গজ দূরে রাস্তার পাশে একটি প্রশস্ত জায়গায় অনেকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর মোটরের যাত্রীরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে স্তব্ধভাবে কি যেন দেখছে। আমারাও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওখানে এসে গেলাম এবং গাড়ি থামিয়ে বাইরে এলাম। হাঁ, আমরাও স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যোসেমিটি উপত্যকা!

চারিপাশে পাহাড়ের পর পাহাড় ও পাইন বনের পরিবর্তমান দৃশ্য দেখতে দেখতে এবং পর্বতখাদে প্রবহমানা তটিনীর গর্জন শুনতে শুনতে এতক্ষণ এসেছি; ভাল লেগেছে, স্নিগ্ধ আনন্দে প্রাণ ভরে আছে। কিন্তু এখন যে ছবিটি চোখে পড়লো, এ যে একেবারেই অকল্পনীয়। দুর্গম পর্বতমালার অভ্যন্তরে এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য-রাজ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, পাহাড় বেয়ে আসতে আসতে ওর দৃশ্যটি চোখে পড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তা ভাবতে পারা যায়নি। সৌন্দর্য জিনিসটি অনেক সময়ে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড জিনিসের একটি সুসমঞ্জস সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। গ্র্যানিট পাহাড় অনেক জায়গায় অনেক আছে, পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে আসা জলস্রোত কত স্থানে কত রয়েছে, প্রশস্ত প্রান্তর, নানারঙের ফুল, গাছ লতা গুল্ম, মাঠের বুক চিরে ছুটে চলা নদী—এদেরও কি অভাব আছে ভগবানের বিশ্বে? কিন্তু এই সবগুলিকে এক জায়গায় টেনে এনে, যেখানে যেটি মানায় সেখানে সেটিকে বিশিষ্ট সন্নিবেশে বসিয়ে একটা নয়নাভিরাম সৌন্দর্যসৃষ্টি—এটি ভগবান অজস্র করেন-নি। এখানে তিনি কার্পণ্য বজায় রেখেছেন। ভালই করেছেন। নইলে সেই মনোহর সৃষ্টির মর্যাদা মানুষ উপলব্ধি করতে পারতো না। ভারতবর্ষে কাশ্মীর শুধু একটিই, গঙ্গার উৎপত্তিস্থান গোমুখও একটি। যোশেমিটি উপত্যকা—মাত্র সাত বর্গমাইলের এই সৌন্দর্যক্ষেত্র সমগ্র আমেরিকায় একটা স্বকীয় দুর্লভতার দাবি নিয়ে যে প্রতি বৎসর দেশ-বিদেশের দশ লক্ষ মুসাফির নরনারীকে আকর্ষণ

করে, এরও কারণ প্রকৃতির কতকগুলি খণ্ড উপাদানের আশ্চর্য সামঞ্জস্যে এখানে একত্র সন্নিবেশ।

পর পর অবস্থিত কতকগুলি খাড়া গ্র্যানিট পাহাড় সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে রয়েছে। ওদের গগনচুম্বী চূড়া ঠিক মন্দিরশীর্ষের মতো দেখতে। এই পাষাণ-প্রাচীরের গম্ভীর রূপ হৃদয়কে স্তব্ধ করে। একটি চূড়ার নাম 'এল্ ক্যাপিটান'—স্প্যানিস শব্দ, অর্থ—'সেনাপতি মশাই'। এই চূড়ার উচ্চতা উপত্যকার মেঝে থেকে ৩৬০০ ফুট। উপত্যকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে ৪০০০ ফুট পূর্বেই বলেছি। কাজেই 'সেনাপতি মশাই'এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে প্রায় ৮ হাজার ফুট। 'এল্ ক্যাপিটানে'র পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। পাষাণকেও যেন জীবন্ত বোধ হ'ল। হাজার হাজার শতাব্দীর কত অগণিত ঘটনার অভিঘাত ওর বিরাট বুকে যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে। এই সৌন্দর্যক্ষেত্র বিধাতা ওরই চোখের সামনে গড়েছেন। ওরই চোখের সামনে পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে, মানুষের সভ্যতা জন্ম নিয়েছে, সবল মানুষ দুর্বল মানুষকে ধ্বংস করেছে। ও দেখেছে মানুষের জ্ঞানস্পৃহা, উদ্যম, তার সংহতি, তার দয়া, প্রেম—আবার দেখেছে তার বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, কাম, লোভ, দম্ভ। সব দেখে ও এখন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে সকল অভিজ্ঞতার পারে অচঞ্চল অক্ষোভ্য প্রশান্তিতে ও তদ্গত হ'য়ে রয়েছে। ও এখন উদাসীন যোগী।

আর একটি গ্র্যানিট শৃঙ্গের নাম 'হাফ ডোম্'—অর্ধ গম্বুজাকৃতি, তাই ঐ নাম। এর উচ্চতা উপত্যকা থেকে ৪৮০০ ফুট, সমুদ্রবক্ষ হ'তে প্রায় ৯ হাজার ফুট। অপর একটি চূড়ার নাম 'সেন্টিনেল রক'—ইনি যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে উপত্যকাকে পাহারা দিচ্ছেন। 'এল্ ক্যাপিটানে'র অনতিদূরে 'থি ব্রাদার্স'—তিন ভাই—তিনটি পরস্পর-সংলগ্ন পর্বত-শিখর। 'ক্যাথিড্রাল স্পায়ারস্' হ'ল দুটি চূড়া—দেখতে ঠিক গির্জার চূড়ার মতো। এই সব গ্র্যানিট শৃঙ্গ সূর্যালোক ও চন্দ্রালোকের বিভিন্ন সংস্থানে বিভিন্ন চেহারা ধারণ করে। তাই লোকে এক সময়ে দেখে তৃপ্ত হয় না। বিভিন্ন সময়ে এদের দৃশ্য উপভোগ করতে চায়। আমরাও 'এল্ ক্যাপিটান'কে অস্তগামী সূর্যের আলোতে আর একবার দেখে নিয়েছিলাম। পাষাণের সে দীপ্তি কখনও ভুলতে পারবো না। আবার শীতকালে এই সব শৃঙ্গ যখন তুষারাবৃত হ'য়ে যায় তখন আর এক রকমের দৃশ্য। ফটোতে 'এল ক্যাপিটান'এর সে শ্বেত মূর্তি দেখেছি। জানি না ভবিষ্যতে চাক্ষুষ কখনো দেখার সুযোগ হবে কি না।

পাষাণের সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভের পর এবার চললাম প্রপাতের উদ্দেশে। সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতটির উল্লেখ আগেই করেছি—যোসেমিটি জলপ্রপাত, তিন ধাপে উপর থেকে নীচে পড়ছে। প্রথম ধাপের দৈর্ঘ্য ১৪৩০ ফুট; মাঝখানের অংশের নাম 'কাসকেড'—দৈর্ঘ্য ৬৭৫ ফুট, নীচের ধাপের দৈর্ঘ্য ৩২০ ফুট। সমগ্র প্রপাতটির দৈর্ঘ্য ২৪২৫ ফুট। আমরা গিয়েছি জুলাইএর গোড়ায়, জলের পরিমাণ বর্ষার তুলনায় অনেক কম। তবুও দৃশ্য অতি চমৎকার। অন্য কয়েকটি বড় প্রপাত: রিবন ফল্—১৬১২ ফুট; 'ব্রাইডাল ভেল' ফল্—৬২০ ফুট; নেভাডা ফল্—৫৯৪ ফুট; ভার্নাল ফল্—৩১৭ ফুট; ইলিলুয়েট ফল্—৩৭০ ফুট। প্রপাতগুলির মাথায় যাবার জন্যে 'ট্রেল' বা পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। হাইকিং বুট পরে ঐ পথে পাহাড় চড়াই করছে, এমন অনেক-

গুলি দল দেখলাম। ইচ্ছা থাকলেও সময়াভাবে আমরা কোন প্রপাতের মাথায় উঠতে পারিনি। 'ব্রাইডাল ভেল' কথাটির তাৎপর্য এই যে ঐ প্রপাতের জলকণা চারদিকে এমন ভাবে ছিটিয়ে পড়ছে যে জলধারার সমগ্র রূপটি যেন বিবাহকালীন বধূর ঘোমটার মতো দেখতে। যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের ভিতর মোট মোটর-রাস্তার দৈর্ঘ্য ২১৭ মাইল। পার্কের মধ্যে জলপ্রপাত, হ্রদ, 'ক্যানিয়ন' (খাদ) এবং নানা বন উপবনে যাবার ঘোড়া-চলা ও পায়ে-হাঁটার রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হ'ল ৭৫০ মাইল।

যোসেমিটি উপত্যকার সমতল ভূমির শ্যামলশ্রী অবর্ণনীয়। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিতা মার্সেড নদীর বঙ্কিম গতি দেখবার মতো। জায়গায় জায়গায় যাত্রীরা বসে চুপ ক'রে নদীর দৃশ্য দেখছে। তটে নানা রঙের অজস্র বনফুলের সম্ভার। সমস্ত উপত্যকাটিতে বহুজাতীয় গাছ এবং লতা গুল্মের সংস্থান একটা স্বপ্নমায়া বিস্তার করেছে। কত রকমের পাখীই না দেখতে পেলাম! উপত্যকায় পার্কের হেড কোয়ার্টার্স এবং মিউজিয়াম রয়েছে। পার্কের গাছপালা, ফুল, পশু ও পাখীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ রঙীন চিত্র-সম্বলিত ছোট বড় অনেকগুলি পৃথক পৃথক বই বিক্রয়ার্থ দেখতে পেলাম। হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রতি সন্ধ্যায় ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ্ ও পশুপক্ষীদের সম্বন্ধে চলচ্চিত্রে সর্বসাধারণের উপযোগী বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। লোকেরা খুব আগ্রহ ক'রে শোনে। যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কে দুই শত জাতির ভিন্ন ভিন্ন পাখী আছে। আর ৭৮ রকমের স্তন্যপায়ী জন্তুর বসতি এখানে।

যোসেমিটি উপত্যকায় তিনটি বড় হোটেল আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি 'ক্যাম্প'ও রয়েছে। ক্যাম্পে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হোটেলের মতো আরামপ্রদ নয়; তাঁবুতে থাকতে হয়, নিজেরা রেঁধে খেতে হয়। তবুও যাত্রীদের অনেকে ক্যাম্পে থাকাই পছন্দ করে। বাড়ীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই যদি খুঁজবো, তাহলে কিসের 'ভেকেশন' করতে আসা?—এই যেন তাদের মনোভাব, অনেকে আবার তাঁবুর মধ্যে শোওয়া পছন্দ করে না। 'স্লিপিং ব্যাগ'-এ উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটায়। হাজার হাজার লোক বেড়াতে এসেছে, রাত কাটাচ্ছে, কিন্তু শহরের মনোভাব এখানে ওরা বর্জন ক'রে এসেছে। কৃত্রিম জীবনের বিরুদ্ধে ওরা জেহাদ ঘোষণা ক'রে এসেছে। হৈ-হট্টগোল নেই, উত্তেজনা নেই, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, প্রকৃতির গম্ভীর প্রশান্তি ওদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ওরা নিজেরাই আশ্চর্য হ'য়ে গেছে ওদের নিজেদের পরিবর্তনে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আমার চোখে পড়লো, এত লোকের আনাগোনা থাকা-খাওয়া চলা-ফেরা, কিন্তু কোথাও মানুষের অমনোযোগ বা অবহেলা-কৃত নোংরা একটু পড়ে নেই। না, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। কেউ কোন গাছের পাতা বা ডালে হাত দেবে না—সহস্র সহস্র রঙ-বেরঙের বনফুল ফুটে আছে, কিন্তু কারুর ইচ্ছা হবে না, একটা ছিঁড়ে নিই—এই ওদের 'সিভিক্ সেন্স'। আর কিছু না শিখি, পাশ্চাত্য জাতির নিকট এই জিনিসটি ভারতবাসী আমাদের শেখা কর্তব্য।

যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের দ্বিতীয় বড় আকর্ষণ 'ম্যারিপোসা গ্রোভ'টি যোসেমিটি ভ্যালি থেকে ত্রিশ মাইল দূরে—পার্কের দক্ষিণ দ্বারের কাছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গাছ 'সেকুইয়া'র দুটি জাতি এখনও বেঁচে আছে। একটির নাম 'সেকুইয়া সেমপারভিরেন্স্' বা চলতি নাম রেড উড। অপরটির

নাম 'সেকুইয়া জাইগ্যানটিয়া'—চলতি নাম বিগ্‌ট্রীজ্‌ (বৃহৎগাছ)। প্রথম জাতের সেকুইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তটে ক্যালিফর্নিয়া ও ওরিগন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জাতের সেকুইয়ার অনেকগুলি যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের এই ম্যারিপোসা গ্রোভে ছড়ানো। যোসেমিটির দক্ষিণে ক্যালিফর্নিয়ার আর একটি ন্যাশনাল পার্কের নাম সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্ক। এখানেই বহুসংখ্যক বিগ্‌ট্রীজ্‌ আছে। দুই জাতের সেকুইয়ারই বৈশিষ্ট্য হ'ল কীটপতঙ্গ এবং আগুন থেকে এদের অদ্ভুত প্রতিরোধ শক্তি। কেবল দুটি শত্রু এদের অক্ষয় প্রাণশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, প্রথম শত্রু বজ্রপাত, দ্বিতীয়—মানুষ।

ম্যারিপোসা গ্রোভে এই প্রাচীন মহীরুহদের দেখে একটা আশ্চর্য বিস্ময়-স্তব্ধতা অনুভব করলাম। এখানকার সবচেয়ে বড় গাছটির নাম দেওয়া হয়েছে—গ্রিজ্‌লি জায়েণ্ট। 'গ্রিজ্‌লি' পশ্চিম আমেরিকার বাদামী রঙের একজাতীয় হিংস্র ভল্লুকের নাম। এই সেকুইয়া গাছের রঙ গ্রিজ্‌লি ভালুকের গায়ের রঙের মতো বলেই বোধ করি আবিষ্কারক গাছটিকে গ্রিজ্‌লি জায়েণ্ট নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এই নাম শুনে আমার চিত্ত পীড়িত হ'ল। হিংস্র একটি বন্য জন্তুর সঙ্গে এই ৩৮০০ বৎসরের ২০৯ ফুট উঁচু অত্যুন্নত বৃক্ষরাজকে সম্পৃক্ত করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কী বিরাট গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি! গাছটির গুঁড়ির ব্যাস নীচের দিকে ৩৭·৭ ফুট। আমাদের দেশে প্রাচীন বট ও অশ্বত্থের বিরাটত্ব আমরা উপলব্ধি করি। ভগবান গীতাতে বলেছেন—'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্‌' আমি সবগাছের মধ্যে অশ্বত্থ। ভারতবর্ষে বৃক্ষকে একটা অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়ে আমরা পূজা করতে অভ্যস্ত। এই প্রাচীন সেকুইয়া গাছটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে প্রাণে সেই ভারতীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হ'ল। মনে মনে বললাম, 'হাজার হাজার বৎসরের মানব-ইতিহাসের মূক সাক্ষী হে মহান্‌ পাদপ, নমস্কার, তোমায় শত-বার নমস্কার। ভারত হ'লে তোমার নাম দিতাম—'মহেশ্বর'।'

সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্কে একটি বিগ্‌ট্রী আছে যার উচ্চতা ২৭২'৪ ফুট। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'জেনারেল শেরম্যান'। ম্যারিপোসা গ্রোভের 'গ্রিজলি' পৃথিবীর বর্তমান জীবিত সেকুইয়াদের মধ্যে উচ্চতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ম্যারিপোসা গ্রোভে সব শুদ্ধ প্রায় ১০০ সেকুইয়া আছে। একটি গাছের মধ্য দিয়ে মোটর রাস্তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের মোটরটিও ঐ গাছের শূন্য গহ্বর অতিক্রম করলো। সঙ্গী ফিলিপ ওয়ারেন অপর যাত্রীদের দেখাদেখি গাছ থেকে বেরুবার পর অবশিষ্ট যাত্রীসহ মোটরটির একটি ফটো তুলে নিল।

এল্ ক্যাপিটান

যোসেমিটি জলপ্রপাত

গোমুখের যাত্রী

যমুনোত্রীর পথে

গঙ্গা-যমুনার আকর্ষণে

স্বামী জীবানন্দ

বহু দিনের বাসনা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হিমাদ্রি দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'রব।

গত ৮ই মে, রবিবার সকালে শুনলাম, চার-জনের একটি দল আজই রাত্রে হাওড়া-হরিদ্বার জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হচ্ছে। শুনেই গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনের সুপ্ত বাসনা জেগে উঠল।

দুটি কম্বল, সোয়েটার, গরম টুপি, জলের পাত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি যোগাড় হ'য়ে গেল। যাত্রার প্রাক্কালে একজন প্রবীণ সাধু পর্বত-ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিলেন: 'খুব সকাল সকাল বেরুবে, হাঁটা পথ খুব সাবধানে চলবে, কিছু না খেয়ে ভ্রমণ শুরু করবে না, সব সময় সাবধানে থাকবে, সকালের দিকেই বেশী হাঁটবে, রৌদ্র উঠলে হাঁটা বন্ধ করবে, জল থিতিয়ে খাবে।' কথাগুলি মনের মালায় গেঁথে নিলাম। ভগবৎকৃপায় একদিনের মধ্যেই সব যোগাযোগ হ'য়ে গেল ব'লে খুব আনন্দ হ'তে লাগল।

যথাসময়ে ১০ই মে বেলা ১০টায় হরিদ্বারে পৌঁছে কনখল সেবাশ্রমে গিয়ে শুনলাম, আমাদের একজন সাধুও যাচ্ছেন তীর্থদর্শনে।

সন্ধ্যার পূর্বে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড দর্শনে গেলাম। হরিদ্বার মহাতীর্থ। হরি বা হরের দ্বার এই পুণ্য তীর্থই উত্তরাখণ্ডের দ্বার-স্বরূপ। সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাদেবীর সন্ধ্যারতি দর্শনীয় বস্তু। ভক্ত যাত্রীরা ফুলের নৌকা কিনে তাতে কর্পূরের আলো জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়, নৌকাও চঞ্চল স্রোতের তালে তালে আনন্দের লহরী তুলে ভেসে চলে।

পরদিন বুদ্ধপূর্ণিমা। সকালের বাসে হৃষীকেশে পৌঁছে কালী কম্বলীর ছত্রে উঠে সদাব্রতের টিকিট যোগাড় ক'রে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

হরিদ্বার ও হৃষীকেশ সাধুদের তপস্যার স্থান, কত সম্প্রদায়ের সাধু এখানে তপস্যা করেন; কত মঠ, আখড়া, ছত্র, ক্ষেত্র, ধর্মশালা, কুঠিয়া! এখন কিন্তু পূর্বের ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে; দেশবিভাগের পর বহু পাঞ্জাবী এখানে বসবাস করছে, নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন হয়েছে। লোকে লোকারণ্য!

বৈকালে লছমনঝোলার পথে স্বর্গাশ্রমে গেলাম। মোটর-বোটে গঙ্গা পার হ'য়ে গীতা-ভবনে গিয়ে সন্ধ্যাকালটি অতিবাহিত করলাম।

পরদিন ভোরে বেরুতে হবে, কুলি ঠিক হ'য়ে গেছে। রাত তিনটেয় উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে গেলাম।

আমাদের দলে এখন সাতজন, তার মধ্যে দুজন সন্ন্যাসী, নতুন একজন প্রৌঢ় যোগদান করেছেন—অমায়িক দিলখোলা মানুষ, ভদ্রলোক দেশে ও বিদেশে নানাস্থানে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

ভোর ৫টায় বাস ছাড়ল। যাত্রীদল সমস্বরে 'জয় যমুনা মাঈ, জয় গঙ্গা মাঈ, জয় কেদার, জয় বদরীবিশাল' ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত ক'রে তুলল। বাস আঁকা বাঁকা পথে কখন উঁচুতে উঠছে, কখন নীচে নামছে, কখন জঙ্গল, কখন পাহাড়ী-গ্রাম ভেদ ক'রে চলেছে কল-নাদিনী স্রোতস্বতীর পাশ দিয়ে। একটির পর একটি নব নব দৃশ্যপটের আবির্ভাব হচ্ছে।

পথে নরেন্দ্রনগর ও ধরাসু—দুটি জংশন অতিক্রম ক'রে বেলা ৫॥টায় আমাদের বাস ডিণ্ডেলগাঁও উপস্থিত হ'ল। এখান থেকে যমুনোত্রী হাঁটা পথে ২৭ মাইল। সূর্যদেব অস্ত যাবার উদ্যোগ করছেন, পশ্চিম গগন রক্ত-

রাগে রঞ্জিত, পাহাড়ের উপর কে যেন আবির ঢেলে দিয়েছে!

পদব্রজে ২ মাইল অতিক্রম ক'রে গঙ্গানী-চটিতে গিয়ে আমরা আহার ও রাত্রিবাস করলাম। পরদিন ভোরে ঠিক ঠিক যাত্রা শুরু। কলকলনাদিনী যমুনার তীরে তীরে পথ। এই পথে চলতে চলতে কখন উচ্চ পর্বতের প্রায় শিখরে আরোহণ করছি, কখন নীচে যমুনার তীরবর্তী হচ্ছি, এইরূপে কত চড়াই উৎরাই যে অতিক্রম করতে হ'ল, তার সংখ্যা নেই!

একা একা হাঁটছি, সঙ্গীদের কেউ আগে, কেউ বা পিছনে। আকর্ষণ ক'রে কে যেন সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে!

চীর পাইন ও দেবদারু গাছের ঘন বন নিয়ে শৈলশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতি যেন নিপুণহস্তে একটি একটি ক'রে সারিবদ্ধভাবে গাছগুলি রোপণ করেছেন।

যমুনা-চটিতে রাত্রিবাস ক'রে আবার ভোর হ'তে না হ'তে 'ওঠ ওঠ' রব—বিছানা-পত্র বাঁধো, তৈরী হ'য়ে নাও, যত শীঘ্র পারো যাত্রা শুরু কর।

আরও দুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হ'ল। পথে অনেকগুলি চটি পড়েছিল, তার মধ্যে সোনা-চটি, হনুমান-চটি ও ফুল-চটির কথা ভুলব না; এই সব চটিতে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। পাহাড়িয়া লোকদের সারল্য দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়, বিশেষ ক'রে তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সন্তোষের ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিকের চটিতে বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া যায়, বনস্পতি বা ডালডা এখনও ঢোকেনি; দুধও খাঁটি পাওয়া যায়, দাম অপেক্ষাকৃত কম।

পথে এগিয়ে চলেছি, শিশুর দল ছুটে ছুটে সামনে এসেছে এক একটি পয়সা পাবার আশায়, তাদের সঙ্গে কথা ব'লে খুব আনন্দ পেয়েছি; একটি লজেন্স, কি একটি ছোট পয়সা পেয়ে তাদের কী আনন্দ! বয়স্ক পাহাড়ী লোকেরা 'সুই-তাগা' (সূচসুতা) পাবার আশায় ছুটে এসেছে। কোথাও ছেলের দল প্রায় ১ফার্লং দূর পর্যন্ত সঙ্গ নিয়েছে।

যমুনোত্রীর পথে শেষের দিকে কঠিন চড়াই; যাত্রীরা বলে, যমুনোত্রীর চড়াই ওঠা না 'যম-যাতনা' ভোগ করা। চড়াই কঠিন হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব, চারদিকে ফুলে-ভরা গাছপালা; রডোডেনড্রন গাছ—চলেছে তো চলেছেই, যেন শেষ নেই; কোথাও বা আবার অন্য গাছের বন। কত অজানা ফুলের গাছ লতা আর বন্য গোলাপ যেন তাদের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে বিরাটের উপাসনায় রত! ঐ দূরে দেখা যায় তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী! পাহাড়ের পর পাহাড়—যেন শেষ নেই! এই সৌন্দর্য-খনির মাঝখানে এসে কে না মুগ্ধ হয়? সাধকের মন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে যেতে চায়, কবির মনে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, শিল্পী তার মানসপটে ছবি এঁকে নিতে চায়!

কঠিন চড়াই অনায়াসে না হলেও সানন্দে অতিক্রম ক'রে চলেছি। ১৫ই মে রবিবার সকালে ফুল-চটি থেকে যাত্রা ক'রে বেলা ১০॥ টায় যমুনোত্রী পৌঁছই, পথে বৃষ্টি পেয়েছিলাম, অল্প অল্প শিলও পড়েছিল, ভিজতে ভিজতে 'জয় যমুনা মাঈ' বলতে বলতে যমুনাদেবীর পদতলে উপস্থিত হই।

যমুনোত্রী স্থানটি অপ্রশস্ত, কিন্তু অতি সুন্দর, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ-পরিবেষ্টিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফুট। চার-দিকের নয়নলোভন দৃশ্য দেখে যেন মুহূর্ত মধ্যে ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেল!

যমুনোত্রীর উষ্ণ প্রস্রবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার তপ্ত কুণ্ডের জল বেশ গরম, এত গরম যে অল্প সময়ে চাল ডাল সিদ্ধ হ'য়ে যায়। ভক্ত যাত্রীরা চাল সিদ্ধ ক'রে সেই ভাত যমুনা-মায়ের প্রসাদরূপে নিয়ে যান। একটি ব্যাপার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। অনেকে আটা মেখে গুটি তৈরি ক'রে হাতে চাপড়ে চাপড়ে রুটির মতো ক'রে গরম জলে ছেড়ে দিচ্ছে, আর ৭।৮ মিনিটের মধ্যে সেইটি ফুলে জলের ওপরে ভেসে উঠছে, ঠিক যেমন ঘিয়ে লুচি ভাজা হয়।

উষ্ণ কুণ্ডে স্নান ক'রে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। বাইরে এত ঠাণ্ডা যে গায়ের সোয়েটার চাদর খোলা যায় না, কিন্তু খালি গায়ে কুণ্ডে নেবে মনে হ'ল, গা পুড়ে যাচ্ছে, ফোস্কা পড়বে। কিছুক্ষণ পরে বেশ আরাম বোধ হ'তে লাগল্।

স্নানের পর পূজা। যাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় এত কষ্ট ক'রে এত দূরে এসেছি, এইবার তাঁর পূজা, মনে কি আনন্দ! মন্দিরে সালঙ্কারা যমুনা-মাতা বিরাজ করছেন, যমুনার পার্শ্বে ও সামনে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি। পাণ্ডা আমাদের অনেকক্ষণ ধ'রে পূজা করালেন। পূজার পর কর্পূরের আরতি, তারপর পরিক্রমা ও প্রণাম।

পূজাশেষে মন্দিরের বাইরে এসে একটি উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর বসে বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। নীচে যমুনা কলকল ছলছল ক'রে বয়ে চলেছেন; মনে হয়, পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল ভেদ ক'রে যমুনার এই অবিশ্রান্ত গতি যেন প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিলনের আশায়।

উষ্ণ কুণ্ডের কিছুদূরে একটি উষ্ণ গুহায় একজন বৈষ্ণব সাধু থাকেন—নাম 'বাবা ঠন ঠন গোপাল', অতি অমায়িক সাধু। সাধুর গুহায় ২ ঘণ্টা ধ'রে অনেক কথা হ'ল। একটি কথা ভোলবার নয়:

হরিকা নাম মিঠী বোলী, ঔর্ গরীবী বেশ
ইন লেকে জঁহা যাওগে তঁহা তুমারা দেশ।

তাঁর অপূর্ব ভগবন্নির্ভরতা, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন ও কঠোরতা দেখে মুগ্ধ হলাম। যমুনোত্রী ছমাস বরফে ঢাকা থাকে; দেওয়ালীর পর লোকজন পাণ্ডারা সব নীচের গ্রামে চলে যায়। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার সময় যমুনোত্রীর মন্দির খুললে সকলে আসে। যখন কেউ থাকে না, তখনও সাধু এই গুহাতেই থাকেন, তবে তাঁর সুবিধা এই যে গুহাটি গরম ব'লে কষ্ট হয় না; তিনি ছ-মাসের আটা কাঠ ইত্যাদি যোগাড় ক'রে গুহার মধ্যে রেখে দেন।

যে সব যাত্রী যমুনোত্রী-তীর্থ দর্শনে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই স্নান ও পূজা সেরে ঐ দিনই চলে যান, এখানে থাকার তেমন সুবিধা নেই, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা।

আমরা এখানে রাত্রিবাস করলাম কালী কম্বলীর ধর্মশালায়। পরদিন ভোরে উঠে উষ্ণ কুণ্ডে স্নান সেরে নিয়ে যমুনা-মাতাকে প্রণাম ক'রে ফেরবার পালা। যে পথে এসেছি, সেই পথেই ফিরতে হবে। আসার সময় যেটি চড়াই ছিল, ফেরার পথে সেটি উৎরাই। শক্ত চড়াই উঠতে হাঁফ ধরে। উৎরাই অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও হাঁটুতে ব্যথা লাগে। যা হোক উৎরাই-পথে বিশেষ কষ্ট হয়নি।

তিন দিনে ২৭ মাইল অতিক্রম ক'রে ডিণ্ডেলগাঁও-এ বাস ধ'রে ধরাসু হ'য়ে উত্তর-কাশী পৌঁছই সন্ধ্যায়। সেখানে থাকার সমস্যা। বিড়লা ও কালী কম্বলী ধর্মশালায় স্থানাভাব। এদিকে বাসে আসার সময় পথে বৃষ্টি নামায় বিছানাপত্র সব ভিজে গেছে। শঙ্কর-মঠেও স্থান

মিলল না, শেষে গঙ্গাতীরে কেদার-ঘাটের কাছে দণ্ডী ধর্মশালায় ভাল স্থানই পাওয়া গেল।

উত্তরকাশী প্রসিদ্ধ তীর্থ; এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী, বহু সাধুসন্ন্যাসী এখানে তপস্যা করেন। এখন উত্তরকাশী শহরে পরিণত হয়েছে; কলেজ, কোর্ট, পোস্ট-অফিস, বাজার সব কিছুই আছে।

সকালে উঠে গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরে বিশ্বনাথের পূজা সেরে নিয়ে এখানকার দর্শনীয় যা আছে দর্শন করি। এদিন উত্তরকাশীতেই কাটে।

এখান থেকে গঙ্গোত্রী হাঁটা পথে ৫৬ মাইল। ভোরে রওনা হ'য়ে ৯ মাইল দূরে মনোরী-চটিতে দ্বিপ্রহরের আহারের পর আরও ৯ মাইল হেঁটে ভাটোয়ারী চটিতে রাত্রিবাস করি। ভাটোয়ারী পর্যন্ত মোটরের রাস্তা প্রায় তৈরী হ'য়ে গেছে, আগামী বছর এই রাস্তায় মোটর চালু হবে শুনলাম।

স্থানে স্থানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটাচ্ছে রাস্তা করবে ব'লে—ভীষণ শব্দে কানে তালা ধ'রে যায়।

২১শে গঙ্গানানী ধর্মশালায় কাটে। এখান থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের ওপর উষ্ণ জলের ৩টি কুণ্ড আছে—ব্যাস-কুণ্ড, বশিষ্ঠ-কুণ্ড, নারদ-কুণ্ড। কুণ্ডে স্নান ক'রে ও মন্দিরে দেবদর্শন ক'রে দিনটি কেটে যায়।

আরও ৩ দিন লাগে গঙ্গোত্রী পৌছতে। পথে কোথাও বৃষ্টি নেমেছে, কখন আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হয়েছে, কখন মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যদেব প্রখর হ'য়ে উঠেছেন। যেখানে গাছপালা নেই সেখানে কষ্ট হয়েছে। ছায়াঘেরা সুদৃশ্য বনপথে হাঁটতে হাঁটতে যাত্রীদের কেউ আনন্দে গীতা-উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করেছে, কেউ বা ভজন গেয়েছে, কেউ বা শিব বিষ্ণু বা গঙ্গার স্তব করেছে।

পথে হরসিল জায়গাটি বেশ ভাল লেগেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট উচ্চে সমতল ভূমি। এখানে অনেক স্রোতস্বতী এদিক ওদিক বয়ে যাচ্ছে, এই জলধারাসমূহের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানকার আপেলের বাগান দেখবার মতো, গাছে গাছে ছোট ছোট আপেল ধরেছে, এখনও পাকতে অনেক দেরি। হরসিল কৃষি ও পশুচারণ কেন্দ্র। ভাল ফসল হয় এখানে। পার্বত্য প্রদেশে এমন উর্বর ভূমি সাধারণতঃ বিরল। পশুর মধ্যে দেখলাম ঘোড়া, বড় বড় ছাগল ও ভেড়া—সব দলে দলে চরছে। ভেড়ার পালে বড় বড় কুকুর পাহারা দিচ্ছে।

জাহ্নবী-সঙ্গম পার হ'য়ে ভৈরবঘাটীর চড়াই উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল, তার উপর বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। ভৈরবঘাটীর কাছ দিয়ে তিব্বতের সীমান্ত বেশী দূর নয়, পাহাড় কেটে নতুন পথ তৈরী হয়েছে। সৈন্যদল এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে।

ভৈরবঘাটীর মন্দিরে ভৈরবের মূর্তি দর্শনীয়। ঐ খানেই রাত্রিবাস ক'রে ২৭শে মে যাত্রা ক'রে সকাল আটটার মধ্যে গঙ্গোত্রী পৌছই। তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ওপর সূর্যোদয় দেখলে মনে হয় হিমাদ্রি যেন সোনার মুকুট পরে সূর্যবন্দনায় রত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,৩০০ ফুট উচ্চে হিমালয়ের বুকে গঙ্গোত্রী মহাতীর্থ—ভগীরথের তপঃক্ষেত্র। কত বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা ক'রে কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে তিনি ধরাতলে এনেছিলেন—পুরাণের কাহিনী সব মনে পড়ে। যমুনোত্রীর মতো গঙ্গোত্রীও ছমাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে।

সুদৃশ্য বিশাল মন্দিরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্নপূর্ণার মূর্তি, সম্মুখে ভগীরথ

যুক্তকরে দণ্ডায়মান। কিছুদূরে ভাগীরথী বয়ে চলেছেন। তুষারগলা জলে স্নান ক'রে আমরা মন্দিরে পূজা দিলাম। গঙ্গামাতার ধ্যানেই আমাদের এই দিনটি কেটে গেল। রাত্রেই গোমুখ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ল, আকাশ পরিষ্কার ও আবহাওয়া ভাল না থাকলে গোমুখে যাওয়া যায় না। দুর্গম ব'লে খুব কম যাত্রীই এ পথে পা বাড়ায়।

পরদিন সকাল ৮টায় যাত্রা ক'রে প্রায় ৯ মাইল অতি দুর্গম পথ অতিকষ্টে অতিক্রম ক'রে চীরবাসায় পৌছই বেলা ৪টায়। গোমুখ যাবার কোন তৈরী রাস্তা নেই। গঙ্গার ধারে ধারে পাথরের উপর পা দিয়ে দিয়ে যেতে হয়, প্রতি মুহূর্তে পতনের সম্ভাবনা; মনে হয় মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। একস্থানে গঙ্গার উপরিভাগ সব বরফে ঢেকে গেছে, বরফের পুল, তার উপর দিয়ে যেতে খুবই ভয় হয়েছিল।

চীরবাসায় কোন বসতি নেই, জনমানবশূন্য। শুধু একটি ধর্মশালা—চতুর্দিকে তুষারাবৃত পর্বত-শ্রেণী। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, তার উপর ভালুকের ভয়। রাত্রে আমরা আগুন জেলে ধর্মশালায় কাটাই।

২৬শে বৃহস্পতি বার সকাল ৬টায় চীরবাসা থেকে গোমুখী তীর্থে পৌছই বেলা ১১টায়—প্রায় ৮ মাইল বিপদসঙ্কুল পথ হেঁটে। এই ৮ মাইল যে কিভাবে হেঁটেছি, তা এখন চিন্তা করতেও ভয় হয়! এক জায়গায় পাথরের উপর তরল তুষার থাকায় পা পিছলে পড়ে যাই, ভাগ্যক্রমে বিশেষ লাগেনি। অনেক জায়গায় ঝুরঝুরে পাহাড় পার হ'তে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি, মনে হয়েছে এই বুঝি পড়লাম। পরক্ষণেই মনের বল নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

চারদিকে সৌন্দর্যের সম্ভার, কিন্তু প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করবার সময় কই? এদিক ওদিক তাকালে তো পড়ে গিয়ে একেবারে নীচে চলে যেতে হবে! পুরুষকার উদ্যম, সাহস, সব যেন উবে গেল। এখন শুধু শরণাগতি। মা, তুমি রক্ষা করো, হাত ধ'রে নিয়ে চল, বাঁচাও, আমি তোমার শরণাগত। প্রাণের আর্তি বোধহয় মায়ের কানে পৌছল। মনে হ'ল কে যেন আমায় হাত ধ'রে নিয়ে চলেছে। সংসারের কল-কোলাহল যেন কোথায় লুপ্ত হ'য়ে গেছে!

হঠাৎ শুনতে পেলাম গাইড্ বলছে 'এই গোমুখ-তীর্থ, স্নান-পূজাদি সেরে নিন।' গঙ্গার মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসে পড়লাম। দূরে দেখা যাচ্ছে বরফ আর বরফ! ঐ যে বরফের চাঁই ভেদ ক'রে পতিতপাবনী মা আমার উচ্ছল গতিতে ছুটে আসছেন! আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল:

> হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে
> হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
> দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
> কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্॥

সর্বালঙ্কারভূষিতা মা গঙ্গার মূর্তি মানসপটে ভেসে উঠল!

গোমুখে মানুষের নির্মিত কোন মন্দির নেই। ১২,০০০ ফুট উচ্চে এই দুর্গম তীর্থের দৃশ্য অতি মনোরম, চারদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতে কেবল হিমরাশি। প্রকৃতির মন্দিরে এই অকৃপণ সৌন্দর্য দেখলে অভিভূত না হ'য়ে পারা যায় না। গোমুখে স্নান-পূজা, জপ-ধ্যান ক'রে যাত্রীরা অফুরন্ত আনন্দলাভ করে।

শীঘ্র ফিরতে হবে, নইলে বেলা বাড়লে বরফগলা জলও বাড়ে, তখন ফেরা মুস্কিল! তাড়াতাড়ি ফেরার উদ্যোগ করতে হ'ল। পথে কয়েকজন সাধুর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ আনন্দ পাই। চীরবাসায় রাত্রিবাস ক'রে পরদিন গঙ্গোত্রীতে প্রত্যাবর্তন। ফেরার পথে আর কষ্ট হয়নি, পথ পরিচিত। গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী ফিরতে ৪দিন লাগে। এখানে এসে কেদারনাথ ও বদরীনাথের আকর্ষণ অনুভব করি।

গুহ-চরিত্র চিত্রণে বাল্মীকি ও তুলসীদাস

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

নিষাদরাজ গুহকে বাল্মীকি রামের 'আত্মসম' সখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২।৫০।৩২)। গুহও বলেন যে রামের চেয়ে প্রিয়তর তাঁহার আর কেহ নাই (২।৫১।৪) কিন্তু রাম ও গুহের মধ্যে বয়সের তফাৎ অনেক। একজন যুবক, অন্যজন বৃদ্ধ।

যুবকের সহিত বৃদ্ধের বন্ধুত্ব অসম্ভব না হইলেও কিছুটা অস্বাভাবিক। আমার মনে হয়, নিষাদরাজ গুহ অযোধ্যার রাজার মিত্র-নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শৃঙ্গবের-পুর। তুলসীদাস ঐ স্থানকে সিঙ্গরোর নামে অভিহিত করিয়াছেন (অযোধ্যাকাণ্ড—১৫১)। কানিংহাম শৃঙ্গবেরপুরকে আধুনিক সিঙ্গরোরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। ঐ স্থান এলাহাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

গঙ্গার তীরে ঘন ও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাইতেছিলেন, তখন গুহের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তিনি বলেন 'গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ' অর্থাৎ গঙ্গাতীরে দুষ্প্রবেশ্য জলাভূমি, সুতরাং ভরত গঙ্গা অতিক্রম করিবার জন্য গুহের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন (২।৮৫।৪)। বস্তুতঃ গুহ তাঁহার সৈন্যদল-সহ গঙ্গা পার হইবার পথ নিজের অধিকারে রাখিতেন। তিনি বেতনভুক্ সৈন্য রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জ্ঞাতিরাই তাঁহার সৈন্য—কেননা ভরত যখন তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন গুহ তাঁহার জ্ঞাতিজনকে বলিলেন (২।৮৯।৮), 'তোমরা নৌকা আন, ভরতের সৈন্যদিগকে পার করিতে হইবে।' গুহের রাজ্য এমন সুরক্ষিত ছিল যে তিনি লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিলেও তিনি সহজে উহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন।

গুহের রাজ্যকে অর্থশাস্ত্রের ভাষায় 'আটবিক রাজ্য'ও বলা যায়। সেকালে রাজাদের বল বা সৈন্যের মধ্যে আটবিক বল গৌণ বা অধম স্থান অধিকার করিত। 'মানসোল্লাস' নামক গ্রন্থে আছে, আটবিক সৈন্য নিষাদ, ম্লেচ্ছ ও তদনুরূপ জাতিদের দ্বারা গঠিত; তাহারা পাহাড়ের নিকট বাস করে (২।৬।৫৫২)। নিষাদেরা চণ্ডাল নহে, যদিও বাংলা রামায়ণে গুহকে চণ্ডাল বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য (১।৯১) বলেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নিষাদের জন্ম, আর ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডালের জন্ম। শাস্ত্রকারদের মতে নিষাদেরা অনুলোম বিবাহের ফল আর চণ্ডালেরা প্রতিলোম বিবাহের ফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষাদেরা একটি প্রাক্-আর্য জাতি। তাহারা ধনুর্বাণের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত। তুলসীদাস তাহাদিগকে স্বভাবতঃ চৌর্যপ্রবণ জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভরত যখন চিত্রকূট যাইবার পথে তাহাদের রাজ্যে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তখন তাহারা ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল:

যহ হামারি অতি বড়ি সেবকাঈ।
লেহি ন বাসন-বসন চোরাঈ॥ (অযোধ্যা—২৪৯)

—আপনাদের বাসনপত্র ও কাপড়চোপড় আমরা যে চুরি করিয়া লই নাই, এই তো আমাদের বড় সেবা।

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে এই ধরনের কোন ইঙ্গিত নাই। বাল্মীকির রামায়ণ পড়িলে মনে হয় না যে গুহ অস্পৃশ্য ছিলেন। রামের সহিত দেখা হইতেই গুহ তাঁহাকে প্রথমে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, (২।৫০।৩৫) 'যথাহযোধ্যা তথেয়ং তে রাম কিং করবাণি তে'—তুমি আমার রাজধানীকে অযোধ্যার মতন তোমার নিজের বলিয়াই মনে করিও; বল, এখন তোমার কি কাজ করিব? এই বলিয়া গুহ রামকে ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও লেহ্য প্রভৃতি প্রদান করিলেন (২।৫০।৩৯)। গুহের যদি ধারণা থাকিত যে তিনি অস্পৃশ্য, তাহা হইলে নিজেই প্রথমে অগ্রসর হইয়া তিনি রামকে আলিঙ্গন করিতেন না এবং অন্নব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্যও উপহার দিতেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া (২।৫০।৪১) বলিলেন, 'আমি এখন চীর ও চর্ম ধারণ করিয়াছি; ফলমূল খাইয়া তাপস-ব্রত উদ্‌যাপন করিব; সুতরাং তোমার দেওয়া জিনিসের মধ্যে কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্য ঘাস লইতেছি, উহা সুমন্ত্রের রথের অশ্বেরা খাইবে।'

ভরত যখন নিষাদরাজ্যে আসিয়াছিলেন, তখন গুহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি রামের আহারের জন্য অনেক রকম ফলমূল, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুর উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া সে সবই আমাকে ফেরত দিয়াছিলেন, এবং আমাকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন, সখে, সর্বদা দানই আমাদের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ গঙ্গা হইতে জল আনিলে তিনি তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন, লক্ষ্মণও অবশিষ্ট জল পান করিয়া রহিলেন'(২।৮৭।১৫-১৮)।

বাল্মীকি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া গুহের প্রদত্ত ভোজ্যাদি প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ দুই জায়গায় দুই ভাবে দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা মিত্র বা সামন্ত রাজাদের উপহার গ্রহণে কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

তুলসীদাস বলেন যে রামচন্দ্র সুমন্ত্র, সীতা ও লক্ষ্মণসহ গুহ-প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিয়াছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড—৮৯)। বাল্মীকির বর্ণনায় দেখা যায় যে গুহ ভরতকেও বলিয়াছেন, 'নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে; আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্যে পাওয়া যায়—এমন অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সেই জন্য প্রার্থনা করি, তোমার সৈন্যেরা আজ রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কাল প্রভাতে যাত্রা করুক' (২।৮৪।১৭-১৮)। ভরত তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি নিজে কিছু খাইলেন কিনা, সে কথা বাল্মীকি বলেন নাই। কিন্তু নিষাদেরা যদি অস্পৃশ্যই হইত, তাহা হইলে ভরতের সৈন্যেরা—যাঁহারা ক্ষত্রিয়-বংশজাত ছিলেন, তাঁহারাও উহা খাইতেন না। পিতৃবিয়োগের পরই ভরত চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে সময়ে হয়তো অপরের প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল, তাই বাল্মীকি ভরতের খাওয়া সম্বন্ধে নীরব। তুলসীদাস গুহের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, নিষাদেরা এমন অধম ও অস্পৃশ্য যে তাহাদের ছায়া ছুঁইলেও লোক অপবিত্র হয়, স্নান করিতে হয়—

লোক বেদ সব ভাঁতিহি নীচা।
জাসু ছাঁহ ছুই লেইঅ সীঁচা॥ (অযোধ্যা—১৯৫)

বাল্মীকি বলেন, লক্ষ্মণকে রাত্রি জাগিয়া রাম-সীতাকে পাহারা দিতে দেখিয়া গুহ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলেন এবং নিজে নিষাদদের সহিত শরাসন লইয়া তাঁহার প্রিয়সখা

রাম ও তাঁহার পত্নীকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'ইহার প্রসাদে ধর্ম, অর্থ এবং ইহলোকে মহদ্ যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার প্রার্থনা, (২।৫১।৫)। এখানে গুহ পরলোকের কথা কিছুই বলিলেন না; রামের কৃপায় মোক্ষলাভ বা ভক্তিলাভ—এমন কথারও ইঙ্গিত করিলেন না। ধর্মের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে হইতেছে সার্বভৌম রাজা ও বন্ধুর প্রতি কর্তব্যপালনরূপ ধর্ম।

বাল্মীকি বলেন, সেই রাত্রিতে লক্ষ্মণ গুহের নিকট রামসীতার দুঃখ, কৌশল্যা-সুমিত্রার মন্দভাগ্য ও দশরথের কথা বলিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। তুলসীদাস এইস্থানে লক্ষ্মণের মুখ দিয়া গুহের প্রতি মায়া, কর্মবাদ প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাইয়াছেন, এইসব দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবার পর লক্ষ্মণ গুহকে বলিলেন:

রাম ব্রহ্ম পরমারথরূপা।
অবিগত অলখ অনাদি অনুপা॥
সকল বিকার-রহিত গতভেদা।
কহিনিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা॥

—সুতরাং মোহ পরিত্যাগ করিয়া 'সিয় রঘুবীর চরণরত হোউ'।

তুলসীদাস রামচন্দ্রকে পরমব্রহ্ম ভগবান-রূপেই সব সময়ে দেখিয়াছেন ও আঁকিয়াছেন। তাই গুহের অনুচর এক কেবট (নাবিক) রামচন্দ্রকে নৌকায় চড়াইবার পূর্বে জেদ ধরিলেন যে তিনি আগে শ্রীরামের পা ধোয়াইয়া দিবেন, তারপর নৌকায় তাঁহাকে পা ফেলিতে দিবেন। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ পাইয়া এক পাষাণ নারী হইয়া গিয়াছে; সেই জন্য তাঁহার ভয় যে তাঁহার নৌকারও বুঝি বা নারীত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ঐ নৌকাই তাহার পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র উপায়। তাই কেবট রামচন্দ্রের পা ধোয়াইয়া তাহার স্পর্শ-গুণকে নষ্ট করিতে চাহেন। রামচন্দ্র হাসিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন।

বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া তুলসীদাস লিখিয়াছেন: ভরতকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গুহ ভাবিলেন যে বোধ হয় রামলক্ষ্মণকে মারিয়া ফেলিয়া ভরত নিষ্কণ্টক হইতে চাহেন। তিনি রামচন্দ্রের মিত্র, কাজেই ভরতের এই দুষ্ট অভিপ্রায় সংসাধনে বাধা দিবার জন্য তিনি লোকজনকে সব ঘাট সুরক্ষিত রাখিতে আদেশ দিলেন, যাহাতে ভরত গঙ্গা পার হইয়া অগ্রসর হইতে না পারেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অনুচরগণকে ভরতের সহিত মরণপণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল।

এমন সময়ে এক বৃদ্ধ নিষাদ গণিয়া বলিলেন যে ভরতের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে না, কেননা ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিয়াছেন। এই গণকের চরিত্র অবশ্য তুলসীদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। যাহা হউক, দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া গুহ একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, 'ভাল কথা, আমি ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতলব কি আগে বুঝিয়া লই।' ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রামের সখা বলিয়া ভরত গুহকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গুহের সন্দেহ দূরীভূত হইল।

বাল্মীকি ও তুলসীদাস উভয়েই লিখিয়াছেন যে গুহ ভরতের সহিত চিত্রকূট পর্যন্ত পথ দেখা-ইতে দেখাইতে গেলেন। বাল্মীকি বলেন, ভরত গুহকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন রামচন্দ্রের কুটীর খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বনের মধ্যে চারিদিকে ছোট ছোট নিষাদ-দল

প্রেরণ করেন (২।৯৮)। গুহ অবশ্য এ কাজের ভার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন।

বাল্মীকির রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার সময় হনুমানকে আদেশ দেন—যেন তিনি শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া গুহকে তাঁহার ফেরার খবর দেন (৬।১২৮।৩-৪)। তুলসীদাসের রাম গুহের প্রতি আরও স্নেহাসক্ত। তিনি পুষ্পকরথ হইতে নামিয়া গুহের সঙ্গে দেখা করেন, এবং লক্ষ্মণকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি ভালবাসার সহিত গুহকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় গুহ উপস্থিত ছিলেন কিনা, তাহা বাল্মীকির বর্ণনা হইতে জানা যায় না। কিন্তু তুলসীদাস বলেন, গুহ সে সময় সেখানে ছিলেন এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার বসন-ভূষণ উপহার দেন। তাঁহাকে তিনি 'ভরতসম ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং সব সময়ে অযোধ্যায় যাতায়াত রাখিতে অনুরোধ করেন। গুহ শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন।

বাল্মীকির গুহ রামচন্দ্রের মিত্র অথবা করদ রাজা। তাঁহার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। তুলসীদাসের গুহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি গভীর ভক্তিভাব পোষণ করেন। তাঁহার মধ্যে সখ্য অপেক্ষা দাস্য-ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়।

বিশ শতকের ভূমিকা : সংস্কৃতি ও সাহিত্যে

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খৃঃ বিশ শতকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী সংস্পর্শের ফলে বাঙালীর ভাবজীবনে যে প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, শতাব্দী-শেষে কয়েকজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের চিন্তায় ও কর্মে সেই ভাবসংঘাত সমন্বয়াশ্রয়ী উদার সংস্কৃতি-নির্মাণের পথ খুঁজছিল। আচার্য কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত। এই সমন্বয়-সাধকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান একটু স্বতন্ত্র—তাঁর সাধনা মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়েছিল ভাব-জীবনকে আশ্রয় ক'রে, আর মনীষীদের সংস্কৃতি-চর্চা উদার মুক্তির পথ খুঁজছিল জ্ঞান, কর্ম, প্রেম এবং সৌন্দর্যানুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে প্রাচ্য জীবনাদর্শের সমন্বয়ে একটা মহৎ জীবনবোধের স্বপ্ন তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসকে জাগ্রত করেছিল। তাঁদের সকলেরই মানবতা-বোধের প্রেরণা মুখ্যতঃ ধর্মাশ্রয়ী।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর একটি প্রবল ভাবপ্রেরণা শিক্ষিত বাঙালী চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করেছিল; সে হ'ল একটা উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধের প্রেরণা। এই জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে ছিল য়ুরোপীয় পলিটিক্স্। নবজাগ্রত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ফলে শিক্ষিত বাঙালী-মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ'ল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে জীবনের বাস্তব পরিবেশের দিকে। ধর্মচিন্তার স্থান গ্রহণ ক'রল রাষ্ট্রচিন্তা। এই রাষ্ট্রচিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধিকারের চেতনা। কেশব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের মতো মনীষী যেখানে চেয়েছিলেন

জাতির সাংস্কৃতিক মুক্তি, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের মতো চিন্তা- ও কর্ম-বীর সেখানে চাইলেন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি। জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্যে পূর্বযুগের চিন্তানায়কেরা শাসক ইংরেজ-জাতির সাহচর্য অপরিহার্য মনে করেছিলেন। আর নব্যতন্ত্রী নায়কেরা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকেই লক্ষ্যে পৌঁছবার অন্যতম উপায় ব'লে উপলব্ধি করলেন। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে অত্যাচারী বিদেশী শাসকজাতির সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতবাসীর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হ'য়ে উঠল। শক্তিমান্ শাসকজাতিও ন্যায়নীতিবিরোধী আইন প্রয়োগের দ্বারা জাগ্রত জাতির এই বিদ্রোহ-চেতনাকে খর্ব করতে উদ্যত হলেন। আঘাত যতই কঠোর থেকে কঠোরতর হ'ল, বাঙালী জাতীয়তাবোধও ততই গভীর ও অন্তঃস্পর্শী হ'য়ে উঠল।

এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের দুটো দিক খুবই লক্ষণীয়। একদিকে সেই জাতীয়তার প্রেরণা সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতির বাঞ্ছিত মুক্তি খুঁজছিল; আর একদিকে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং সম্প্রসারণই ছিল সেই চিন্তাশ্রয়ী জাতীয়তাবোধের প্রধান লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ্য ক'রে বাঙালীর উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলনের আবেদন এতটা ভাবাবেগপূর্ণ ছিল যে রবীন্দ্রনাথের মতো সূক্ষ্ম ভাব-সচেতন কবি এই সময় স্বদেশী গান লিখে এবং গেয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, সক্রিয় আন্দোলনে অংশও গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস-পাঠক জানেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সে যুগের আরও কোন কোন মনীষীর সক্রিয় সহযোগিতায় এবং জাতীয় অভ্যুত্থানের ফলে কৌশলী ইংরেজরাজের এই অভিসন্ধিপরায়ণ বঙ্গবিভাগ-পরিকল্পনা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়, যার ফলে বাঙালীর আত্মপ্রত্যয় গিয়েছিল পূর্বের থেকে শতগুণ বেড়ে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি- ও সাহিত্য-প্রসারে বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ভাবাত্মক দিকটাই বিশেষ ক'রে স্মরণীয়। এই ভাবধর্মী জাতীয়তাবোধ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে। এই কর্মের ধারা দ্বিবিধ: একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার ক'রে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্য-ভাব-প্রভাবিত বাঙালীর শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় বৃদ্ধির প্রয়াস; দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণার সাহায্যে জীবনের ব্যাবহারিক দিককে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা এবং বাঙালী মনীষার উৎকর্ষ-সাধন। প্রথম পর্যায়ের জাতীয়তা-বাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ এবং দর্শনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বিজ্ঞান-চর্চায় সার্থকতা লাভ ক'রে যাঁরা বাঙালীর মনে আত্মপ্রত্যয় এনেছিলেন এবং বাঙালীর সংস্কৃতিকে দিগন্ত-প্রসারিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম। আচার্য বসু ও আচার্য রায় শুধুমাত্র মনীষী বিজ্ঞানী নন, তাঁদের বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণা ছিল সুগভীর জাতীয়তাবোধ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁদের মূল্যবান্ গবেষণা বাঙালী-মনকে যুক্ত করেছে বিশ্ব-মনের সঙ্গে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে বলা চলে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই যুগের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষা ও প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের

বিদগ্ধ সমাজে। উগ্র জাতীয়তাবোধের ফলে ধর্মচেতনা স্তিমিত হ'য়ে এলেও যে নিঃশেষে তা অবলুপ্ত হ'য়ে যায়নি, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গভীর ভক্তিরসাত্মক কাব্য ও প্রার্থনা-বক্তৃতা-গুলি। বস্তুতঃ এই অধ্যাত্ম-চেতনাগভীর লিরিক কবিতার জন্যই সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশবাসী রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেছিলেন 'নোবেল পুরস্কার' দিয়ে। জগদীশচন্দ্রের মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তিও শুধু যে বাঙালীর মর্যাদা বাড়িয়েছে তা নয়, সে যুগের বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়কে বাড়িয়ে দিয়েছিল সহস্রগুণ। আর একথাও স্মরণযোগ্য, এই আত্মপ্রত্যয়ই সব রকম সৃষ্টির মৌল প্রেরণা। এই কাল-বৃত্তের মধ্যে বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চা লোকাশ্রয়ী রূপ না পেলেও শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিকে বিশ্বমুখী ও তীক্ষ্ণ যুক্তবাদী ক'রে তুলেছিল।

কিন্তু আলোচ্য কালের মধ্যে বাঙালী-সংস্কৃতির একটা অর্থপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পর্শে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রদর্শিত ধারায় উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু বিশ শতকের প্রারম্ভকালেই নতুন উপন্যাস রচনা ক'রে তিনি এ-শতাব্দীর লেখকদের সামনে নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। অতঃপর বাংলা উপন্যাস মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়েছে এই বাস্তবধর্মী ধারায়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধি ও সার্থকতার মূলেও এই বাস্তবতা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ বিভাগ ছোটগল্পেরও আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে এ-কালে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুবর্তীদের হাতে ললিতমাধুর্যময় লিরিক কাব্যের প্রসারও ঘটে এই যুগে। রবীন্দ্রকাব্যের সুরেলা অভিব্যক্তি আধুনিক কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলে। গত শতাব্দীর আদর্শপ্রধান মহাকাব্যগুলি পাঠক-সমাজে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, যেমন পেরেছিল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাবানুসারী কবিদের গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ লিরিক কবিতা। বাংলা প্রবন্ধ এবং নাটকও নতুন রূপ পেল রবীন্দ্রনাথের অভিনব শিল্পদৃষ্টির স্পর্শে। সমালোচনাকে সৃজনধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত ক'রে একটা সম্ভাবনাময় নতুন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন তিনি। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত এবং গভীর চিন্তার সংযোগে প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথ শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভারই বাড়াননি, সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার সাহায্যে সে সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য বৃদ্ধি ক'রে সমকালীন লেখক এবং পাঠকের সাহিত্যরুচিকেও উন্নত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সাহিত্যে যে বিদগ্ধরুচির স্রষ্টা তা নয়, আধুনিক জীবনেরও রুচিবোধকে উন্নত করেছেন তিনি ভাবধর্মী সঙ্গীত এবং জীবনধর্মী নৃত্যের সাহায্যে। যে অর্থে সংস্কৃতির অর্থ শালীনতা (urbanity), রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালী-জীবনে সেই শালীনতার স্রষ্টা। রূপানুরাগ, সূক্ষ্ম রসবোধ, গভীর জীবনপ্রীতি—এই শালীনতাবোধের মর্মমূলে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যের অবসরবিলাস-পুষ্ট সূক্ষ্ম-ভাবধর্ম এবং ললিতমাধুর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-বিদ্রোহীরাও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র-পরিকল্পিত নৃত্যশিল্পের উৎকর্ষ স্বীকার না ক'রে পারেননি। এক কথায় আধুনিক বাঙালী বিদগ্ধমন রবীন্দ্র-শিল্পের অজস্র ধারায় স্নান ক'রে নবজন্ম লাভ করেছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের অমর অবদানও বিশ-শতকীয় বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এর কারণ তাঁর অভিনব শিল্পোদ্যম পূর্বযুগের অনুকরণপ্রিয়তার স্তর অতিক্রম ক'রে বাঙালী শিল্পীর দৃষ্টি ও

মনকে সবলে আকর্ষণ করেছিল ভারতীয় জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও মহত্ত্বের প্রতি। যে সুগভীর সৌন্দর্যবোধ এবং জাতীয়তার প্রেরণা এ-যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যকে মূল্যসমৃদ্ধ করেছে, সেই একই প্রেরণা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথও বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নতুন যুগের স্রষ্টা।

আলোচ্য যুগে রবীন্দ্রনাথের ললিতমাধুর্যময় সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রবল শক্তির অভ্যুদয় বিশ-শতকীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্য ঘটনা। এই শক্তি হলেন 'বীরবল'-ছদ্মনামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের থেকে প্রমথ চৌধুরীর মানসিক জগতের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ অধ্যাত্মজগৎসচেতন, ভাববাদী; আর প্রমথ চৌধুরী প্রচণ্ডভাবে ইহবাদী এবং যুক্তিনির্ভর। রবীন্দ্রনাথের মানস জগৎ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত; আর প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বর্তমানের দিকে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির উৎসে মুখ্যতঃ শিল্পীর আবেগ, আর প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রেরণায় নৈয়ায়িকের যুক্তি। এই যুক্তি-প্রকাশের ভাষা ক্ষুরধার, শাণিত, কখনও বা ব্যঙ্গপরায়ণ। ফরাসী সাহিত্যশিল্পী এবং মনীষীর ভাবানুষঙ্গে এসে একটা নতুন সাহিত্য-রীতির সৃষ্টি করলেন এই প্রতিভাবান্ লেখক। শক্তিমান্ এবং শক্তি-হীন বহু লেখক যুক্তিধর্মী এবং ভঙ্গীপ্রধান রচনায় প্রমথ চৌধুরীর অনুবর্তী হলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রভাবিত হলেন এই নতুন সাহিত্যা-দর্শের দ্বারা। বস্তুতঃপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ শতকের নবীন সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হ'ল উনিশ শতকীয় গতানুগতিক ধারার সাহিত্য থেকে।

এই যুগের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী-লেখক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। প্রবল জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বহু-মুখী জ্ঞানস্পৃহা, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সঙ্গে প্রাচ্য মনের সমন্বয়ের অসাধারণ বৈচিত্র্য লাভ করেছে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ভঙ্গীর প্রাধান্য না থাকায় তাঁর আদর্শ গদ্য-রচনার অনুকারী বেশী জোটেনি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য এ-যুগের সাহিত্যে প্রায় নিঃসঙ্গ, কিন্তু অনন্য। রবীন্দ্র-যুগের উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের চিন্তা- ও ভঙ্গী-স্বাতন্ত্র্যও বাংলা সাহিত্যে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা। তীক্ষ্ণ প্রশ্নমনস্কতা, বাস্তব চেতনা এবং রোমা-ন্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার সমন্বয়ে উপন্যাসে সৃষ্টি করলেন তিনি একটি নতুন যুগ, সেই যুগ এখনও সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়নি। মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ সম্পর্কে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টির পরিচয় দিলেন এই জীবনধর্মী লেখক। জীবনের প্রতি এই বাস্তব দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথে ছিল অনুপস্থিত। এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী ভাষাকে অতিক্রম ক'রে সাহিত্যের ভাষাকেও ক'রে তুললেন তিনি গদ্যধর্মী আধুনিক।

বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথ খুঁজছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে তীব্রভাবে জাগ্রত করেছে। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি রাজনৈতিক মুক্তির জন্য তৎপর হয়েছে। পরাক্রান্ত শাসকজাতি পশু-শক্তির সাহায্যে সে আন্দোলনকে দমন করেছে এবং পরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা বিশেষ ক'রে রাজনীতিতে প্রগতিশীল (বাঙালী) হিন্দুকে শাস্তি দিয়েছে। ফলে চারের দশকের দিকে শিক্ষিত বাঙালী চাকরি-

জীবী মধ্যবিত্ত হিন্দুর রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হওয়ায় জীবনে নেমে এল হতাশার ম্লান ছায়া। সুস্থ জীবনচিন্তা ক্রমশঃ হ'ল অন্তর্হিত। ধর্মবোধ তো আগেই স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল; জাতীয়তাবোধও এল ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে। ফলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবনা-বাসনা, ব্যর্থতা-বেদনা আত্মপ্রকাশ ক'রল এ-যুগের সাহিত্যে। সব চেয়ে জনপ্রিয় হ'ল এ সময়ে উপন্যাস-সাহিত্য। কিন্তু সে উপন্যাস অনুকরণ-তৎপর, আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার বিজৃম্ভণে ভরা। কাব্যেও নৈরাশ্যের সুর। এই নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে উপন্যাসে তারাশঙ্করের মতো শিল্পীর অভ্যুদয় এই সময়কার সাহিত্য-জগতে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নেই। তাঁর শিল্প-ভাবনার মধ্যে বাঙালী পাঠক একটা অভিনব আনন্দবেদনাত্মক জগতের সন্ধান পেল।

তারপর এল বাঙালীর জীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং মহামন্বন্তর, এ সময় এক শ্রেণীর লোকের জীবনে এল আর্থিক সমৃদ্ধি, আর এক শ্রেণীর জীবনে সীমাহীন রিক্ততা। এই ভারসাম্যহীন সামাজিক পরিস্থিতিতে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ হ'ল মানুষের মন থেকে ক্রমশঃ অন্তর্হিত। একটা জান্তব ভোগলোলুপ পিপাসা এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মনকেও কলুষিত ক'রে তুলল। যুদ্ধের সময় আমেরিকার সৈন্যদের সংস্পর্শে আগত বাঙালী জীবনের উপর ইয়াঙ্কি সভ্যতার ছাপ মুদ্রিত হ'ল। এ-অবস্থায় সাংস্কৃতিক জীবনে পরিচ্ছন্নতা অথবা সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎকর্ষ আশা করা যায় না। একটা তামসিক যুগের ছায়া নেমে এল বাঙালীর জাতীয় জীবনে।

এ-যুগে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে এতদিনকার সমাজাদর্শ এবং সমাজচিন্তাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিল, তার ভিত্তিতে ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চোরা-কারবারের সুড়ঙ্গপথে দেশের মধ্যে একদল লোক অবৈধভাবে অপর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় ক'রে শুধু যে ব্যক্তিগত-ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল তা নয়, শহরে শহরে নিত্য নতুন সিনেমা, থিয়েটার, আধুনিক পদ্ধতির ভোজনাগার প্রভৃতি ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে দেশীয় লোকের চিত্তকে ভোগচঞ্চল ক'রে তুলল। এই হঠাৎ-বড়লোকদের ব্যক্তিগত প্ররোচনায় লোকের ভোগস্পৃহা বেড়েছে, অথচ সে স্পৃহা নিবৃত্ত করবার সামর্থ্য বিত্তহীনদের নেই—এ কারণে সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্যবোধ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ ক'রল। শিক্ষিত বিত্তহীন সমাজের এই প্রধূমিত অসন্তোষ-বহ্নিকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলল পাশ্চাত্য সাম্যবাদী-চিন্তানেতা কার্ল মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। এই নব্য-মানবতাবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ শুধু যে একশ্রেণীর বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল তা নয়, বাঙালী লেখকের সাহিত্যচিন্তায়ও ফাটল ধরিয়ে দিল। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো স্বীকৃত সাহিত্যিক প্রতিভা কিছুকাল মাত্র আগে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছে। মার্ক্সবাদী সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনাকে 'পেতি বুর্জোয়া' সমাজের অবসরকালীন বিলাস এবং সেকেলে (demodent) ব'লে উপহাস করতে লাগলেন। পূর্বযুগের আদর্শবাদের স্থানে এল অতি-সচেতন বাস্তববাদ, বিশ্বাসের স্থানে এল নাস্তিক্যবুদ্ধি, প্রশ্নমনস্কতা। সুস্থ সৌন্দর্যবোধ খণ্ডিত ক'রে দিল মানুষের অতিকুৎসিত ও অবাঞ্ছিত বাস্তব পরিবেশ। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ধনসম্পদ বৃদ্ধির ফলে মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পায়ন আরও বৃদ্ধি পেল। পূর্বযুগের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার-সমাজের শিক্ষিত বংশ-

ধরেরাও আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়লেন এই সম্ভোলাভের জীবনযাত্রার প্রতি। ফলে পল্লীর আকর্ষণ ক্ষীণতর হ'য়ে মহানগরীর আকর্ষণ ক্রমশঃ তীব্রতর হ'য়ে উঠল।

এরূপ সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্তন দেখা দিল সমাজে ও সাহিত্যে। সমাজে নতুন অভিজাত-শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল, তাদের অভিজাত্যের মূলে হ'ল কাঞ্চন-কৌলীন্য। এই কৌলীন্যের প্রভাবে তারা যে সামাজিক ন্যায়নীতিকে উপেক্ষা ক'রল তা নয়, রাষ্ট্রীয় আইনের চোখেও ধূলা দিল। ধর্ম ও ন্যায়নীতিহীন এই স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে বিত্তহীন মানুষের ক্রোধও উঠল ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হ'য়ে। সমাজের এই শ্রেণী-সংঘাতের চিত্র সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ না করলেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ছিল পূর্বযুগের সাহিত্যে প্রধানতম প্রেরণা, সে প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য অনেকটা ক্ষণিকতা-ধর্মী হ'য়ে উঠল। চিরন্তন জীবনের আদর্শস্বপ্ন, কিংবা সে জীবনকে অবলম্বন ক'রে অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতি বা রোমান্স-প্রীতি অতীতের সামগ্রীতে পরিণত হ'ল। শুষ্ক ভাবাবেগবর্জিত, জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টিই হ'ল এ সময় থেকে সাহিত্যশিল্পীর প্রধান লক্ষ্য। ফলে সাহিত্যের শুধু বিষয়বস্তু (content)-তেই নয়, প্রকাশভঙ্গী (form)-তেও এল এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ধর্মবোধের প্রেরণা ক্ষীণতর হ'য়ে এলেও জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বন্ধন-অসহিষ্ণু হ'য়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে অধীর হ'য়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাঁচের দশকের আগস্ট বিপ্লব। এই আগস্ট বিপ্লব এবং কিছুকাল পরে বাঙলার সুসন্তান নেতাজীর মুক্তিফৌজ-বাহিনী সৃষ্টি ক'রল বাঙলা তথা ভারতেতিহাসের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়—জাতীয় স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে এল ভারত-বিভাগ ও ভারতে উদ্বাস্তু-সমাগম। মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনার পথে এল জাতীয় মুক্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয় জাতীয় জীবনের এই যুগান্তকারী পরিবর্তন আমাদের এ-যুগের কোন সচেতন সাহিত্য-শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেনি 'আনন্দমঠে'র মতো স্মরণীয় কোন স্বদেশ-সচেতন শিল্পকীর্তি-নির্মাণে। উদ্বাস্তু-সমস্যার মতো এত বড় একটা জলজ্যান্ত জাতীয় সমস্যা আমাদের চিত্তের গভীরে আলোড়নের সৃষ্টি করেও যুগান্তরকারী কোন শিল্প-সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। কাঞ্চন-কৌলীন্যের ফলে যুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাম্যবাদী ধারণার বহু প্রসারের পরেও আমরা সে আবিলতা-মুক্ত হ'তে পেরেছি কি? যে সুস্থ জীবন-স্বপ্ন একদিন বাঙালী শিল্পীকে মহৎ শিল্পচেতনায় অনুপ্রাণিত করেছিল, সে স্বপ্ন আজ শিল্পী-মন থেকে অন্তর্হিত হ'ল কেন, সাহিত্য-শিল্প আজ মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য-নির্ভর কেন, বাঙালী সাহিত্যশিল্পীর মন কি আজ শূন্য-কুম্ভের মতো শব্দায়মান—এ সমস্ত প্রশ্ন আজ আধুনিক সাহিত্য- ও সংস্কৃতি-সমালোচকের মনকে আলোড়িত ক'রে তুলেছে। এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মিলবে বিশ শতকের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রাণবস্তুর সন্ধান।

পদ্মাসীন বুদ্ধের প্রতি*

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে প্রভু বুদ্ধ, আসীন পদ্মাসনে—
ধ্যান-নিমীলিত নয়ন তোমার
যুগল হস্ত হর্ষে সমুত্থিত;
কোন সে নিগূঢ় মহা আনন্দ
লভিয়াছ তুমি বল?
সে বুঝি চরম আনন্দ—তার
পরিবর্তন নাই?
কোন্ সে শান্তি অনুপলব্ধ
বিলুপ্ত যাহা এ মর-জগৎ হ'তে?

আমাদের পথ কোলাহল-মুখরিত
তারই মাঝে বহে অবিরাম গতি
রূপান্তরের হাওয়া,
আগামী কালের না-পাওয়া দুঃখশোক
শেষ ক'রে দেয় বিগত দিনের ব্যথা।
স্বপ্নের শেষে আর এক স্বপ্ন
সংঘাত আনে নব সংঘাত—
মৃত্যু খুলিছে জীবনের জটাজাল।

আমাদের তরে অগ্নির জ্বালা
বেদনা-বিহ্বলতা,
অহঙ্কারের গূঢ় রহস্য নহেক' অপ্রকাশ,
পরাজয় হানে চরম আঘাত
অবিরাম উৎসাহে।
ফুলের বিকাশ স্থগিত জীবনে
যদিও জীবন ফল হ'তে বঞ্চিত;
তবু যে শান্তি পরম লভ্য,
হে প্রভু বুদ্ধ, বিরাজো পদ্মাসনে।
বঞ্চিত নহি সে শান্তি হ'তে মোরা।

তুচ্ছ দু-হাত বাড়ায়ে আমরা খুঁজি
অনধিগম্য বাসনার সফলতা,
পবিত্রতর চূড়ায় উঠিতে চাই—
বিশ্বাস ক্রমে বিলুপ্ত হয়,
চরণে কান্তি নামে;
তবু আত্মার ক্ষুধা যে মোদের
স্বর্গের অভিমুখী,
কিছুতে সে ক্ষুধা মানে না শাসন,
মানে নাক' পরাজয়।

শেষ বহু দূরে—মায়াচ্ছন্ন
দূরে দূরে ছুটে চলে,
ইসারা তাহার তবু—
প্রলুব্ধ করে মন,
আমাদের যত ক্ষণভঙ্গুর এই মুহূর্তগুলি
সেই অনন্ত অসীমে রয়েছে লীন।
তোমার পদ্মাসনে বিরাজিত
যে পরম নির্বাণ—
জ্ঞানাতীত তাহা—
সন্নিধি তার—কেমনে লভিব বল?

*'To a 'Buddha' seated on a lotus'—Sarojini Naidu.—ভাষানুবাদ

কর্ম-যোগ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কর্মহীন হ'য়ে থাকা সাধ্য নাই কারো মরলোকে
মুহূর্তও বিনা কর্মে রহিতে পারে না কোন জীব ;
প্রতিদিন বেঁচে থাকা—এও এক মহা কর্মযোগ।
বিশ্ব-প্রকৃতির রাজ্য নিত্যবহ কর্মের প্রবাহ ;
গতি তার রুদ্ধ করে, হেন বীর জন্মে নাই কেহ ;
জগতের কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিতে হবেই সবারে।
কর্ম যদি বন্ধ হয়, স্তব্ধ হ'য়ে যাবে সৃষ্টি ধারা,
স্বভাব-সঞ্জাত কর্ম—জীব-ধর্ম এই ধরণীতে ;
কিন্তু যদি কর্ম আনে বাধা কারো জীবনের স্রোতে—
সেখানে অটল বীর্যে ফেরাতেই হবে তার গতি।
কর্ম যেন কোন ছলে নাহি হয় বন্ধন তোমার ;
সেই শুধু পুণ্যকর্ম—আত্মা যাহে শুদ্ধ রহে সদা,
লয়ে আসে দিব্য ভাব প্রেমানন্দে যে কর্ম অন্তরে ;
সেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ—করিবে যা নিষ্কাম হৃদয়ে।

কর্মের প্রবৃত্তি হেথা সহজাত মানব-প্রকৃতি,
করিতেই হবে কিছু। নিষ্ক্রিয় কে রহিবারে পারে ?
বিনা কাজে বসে থাকা, শুয়ে থাকা, নিশ্চিন্ত আরামে,
নহে তো সহজসাধ্য, সে সাধনা সুকঠোর অতি !
মন কভু চিন্তা-কর্মে ক্ষণকাল বিশ্রাম কি পায় ?
চিত্ত তব নিত্য রত ভালো-মন্দ নানা ভাবনায়।
আহার বিহার নিদ্রা আত্মরক্ষা মৃগয়া ব্যসন,
হেন কোন কর্ম বিনা এ ধরায় আছে কোন প্রাণী ?
কিন্তু যদি ভাবো মনে—কর্ম করো তুমি কর্তারূপে,
ব্যর্থ হবে সর্ব কর্ম অহমিকা লভিলে প্রশ্রয় ;
প্রকৃতি করান কর্ম প্রকৃতির নিজ প্রয়োজনে,
তুমি আমি ঘুরিতেছি ঘানি-ঘরে বলদের মতো !
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম কর্ম করি প্রভুর আদেশে ;
ফসল ফলায় যেবা—সেই একা ক্ষেত্রের মালিক।

কর্ত্তৃত্বের অভিমান স্থান যেন নাহি পায় মনে,
নিজেরে মজুর জেনে ক'রে যাও হুজুরের কাজ,
তোমার দায়িত্বটুকু মনে রেখো আত্ম স্বার্থ ভুলে,
ফলাকাঙ্ক্ষা রেখ না হে, ফলে কারো নাহি অধিকার,
সর্বকর্মফল করো সমর্পণ প্রভুর চরণে,
তবেই কর্মের ফাঁস পারিবে না তোমারে বাঁধিতে,
অনাসক্তভাবে কোরো সংসারের কর্তব্য তোমার,
লোভে পড়ি মোহবশে যা করিবে ফলের আশায়—
সে কাজ তোমারে দিবে বহু দুঃখ কর্মের বন্ধনে।
সুখে দুঃখে শুভাশুভে স্থির যেবা আপদে সম্পদে—
সমদৃষ্টি সর্বজীবে উচ্চনীচে নাই ভেদাভেদ
আনন্দের পূর্ণ স্বাদ কর্ম মাঝে লভে সে জীবনে।
কর্ম দেয় জ্ঞান ভক্তি—ইষ্টপদে নিবেদিত হ'লে
সেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ, যে যোগে কর্মেরও হয় লয়।

আদিম স্বরূপ

শ্রীমতী বিভা সরকার

আজ দেখিতেছি চেয়ে
হৃদয়ের বিষাক্ত নগ্নতা,
হিংসার তমিস্রা-ভরা
ভয়ঙ্কর আদিম সে জীবে।

মানবের অপমৃত্যু
দুর্দান্ত সে দানবের
ক্রূর পদাঘাতে,
চেয়ে চেয়ে দেখছি নীরবে।

লাভা ফোটে সে আগুনে,
ওড়ে ছাই শুভদৃষ্টি-নাশা
ধূমায়িত মহা অন্ধকার
সৃষ্টি নাশে বিষাক্ত ফুৎকারে।

মিথ্যা আবরণ শুধু;
ব্যর্থ সভ্যতার এই—
চরম নীচতা মাঝে
হে মানব, চেন আপনারে।

উপনিষদের ফারসী ও ল্যাটিন অনুবাদ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উপনিষদ্ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অমূল্য সম্পদ। বিশ্ব-সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে উপনিষদের দান অনন্যসাধারণ। ১৬৫৭ খৃঃ ফারসী ভাষায় উপনিষদের প্রথম অনুবাদ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সেই সুদূর অতীতে অন্য কোন ভারতীয় অথবা বিদেশী ভাষায় এই অনুপম জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনুবাদের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে রচিত আলবেরুনির 'কিতাবুল হিন্দ্' ও অন্যান্য আরবী গ্রন্থে উপনিষদের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ শাহজাহানের পুত্র দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দারা সিকো ফারসী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদের মহৎ কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৬৫৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে কান্দাহার অভিযানে অকৃতকার্য হইয়া দারা সিকো অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই পরাজয়ের গ্লানিজনিত মনোবেদনা দূর করিবার এবং কিছুকাল পিতা শাহজাহানের সান্নিধ্য এড়াইবার জন্য তিনি লাহোরে অনেক দিন অবস্থান করেন। এই বিষাদের সময়ে তাঁহার প্রিয় হিন্দু কেরানি ও তৎকালীন বিখ্যাত ফারসী কবি রায় চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন পাঞ্জাবী অদ্বৈতবাদী ও বৈরাগী বাবা-লালের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য। কবি চন্দ্রভানই সাক্ষাৎ-কারের আয়োজন করিলেন। বৈরাগী বাবা-লালের সহিত দারার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা এক সপ্তাহ চলিল—ফলে যে দারা ইতঃপূর্বে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরাশ হইয়াছিলেন, তিনি আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া জীবনের প্রতি অধিকতর আশা-বাদী হইয়া উঠিলেন। বাবালাল দারাকে হিন্দুধর্মের সার মর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশের প্রভাবে তিনি স্বাধীনভাবে উপনিষদের চর্চা করিতে প্রবৃত্ত হন। বারাণসীর কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আগ্রহের সহিত পাঠ ও আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন : হিন্দু-ধর্মও একেশ্বরবাদমূলক, অধিকারিভেদে ইহাতে বিভিন্ন স্তরের সাধনা আছে, এই ধর্মে ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও তাহার ব্যাপক প্রয়োগ রহিয়াছে।

দারা সিকো হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বের সহিত ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুই ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং উভয়ের ভাবের মধ্যেও একটা ঐক্য আছে। ১৬৫৫ খৃঃ তাঁহার গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিয়া তিনি 'মাজ্মূউল্ বাহ্রিন্' (দুই সমুদ্রের সঙ্গম') নামে একখানা পুস্তক লিখেন। এই পুস্তকে তিনি প্রাচ্যের দুই প্রধান ধর্ম—হিন্দুধর্ম ও ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার হয় এবং দারা স্বয়ং 'সমুদ্রসঙ্গমঃ' নামে ইহার একটি সংস্কৃত অনুবাদও করিয়াছিলেন। *

'সমুদ্রসঙ্গমঃ' গ্রন্থের ভূমিকায় দারা সিকো লিখিয়াছেন : 'সত্যকে জানিবার জন্য হিন্দু ঋষি ও মুসলমান ফকিরগণ যে পথ অনুসরণ করেন, তাহার মধ্যে আমি কোন পার্থক্যই দেখি না। এজন্যই আমি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া উভয় ধর্মের

* সম্প্রতি বহু অনুসন্ধানের পর 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' (৩ নং ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা) মূল সংস্কৃতের একটি সংস্করণ ও ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার আত্মীয়-স্বজনদের উপকারের জন্য এই গ্রন্থ (সমুদ্রসঙ্গমঃ) লিখিতেছি, কিন্তু যে-সকল অজ্ঞ লোক ভিন্ন মত পোষণ করে, তাহাদের জ্ঞানোদয়ের কথা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি না।'

এই গ্রন্থ হইতে পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া উভয় ধর্মের সাদৃশ্য-প্রতিপাদক কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল:

পরমেশ্বরের গুণব্যাখ্যান: হিন্দু ঋষিগণ পরমেশ্বরের তিন গুণের কথা বলিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। একাত্মবাদী সুফীগণের মতে তাঁহার দুই গুণ—জলাল ও জমাল। জগৎব্রহ্মাণ্ড এই দুই গুণ হইতে উদ্ভূত। সুফীগণ জমালের মধ্যে রজোগুণ ধরিয়াছেন। হিন্দুদের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। সুফীদের মতেও জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাইল—সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দেবতা। (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

আত্মা: হিন্দু ঋষিগণ যাঁহাকে 'আত্মা' বলেন, ইসলাম তাঁহাকে 'রুহ' বলেন। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ইসলাম ইহাদের নাম দিয়াছেন—রুহজুলই ও রুহকুল্ল। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা দর্শন: হিন্দু ঋষিগণ বলেন, বহিশ্চক্ষু অথবা অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঈশ্বর-দর্শন হইতে পারে। শুদ্ধ মনেই তাঁহার দর্শন বা অনুভূতি হয়। যে ঈশ্বরকে ইহলোকে উপলব্ধি করিতে পারে না, সে পরলোকেও পারে না। ঈশ্বর দয়া করিয়া যে-কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। কুর্‌আন বলেন—ইহলোকে যে আল্লাহ্‌কে দর্শন (রুয়ত) করিতে পারে না, সে পরলোকেও পারিবে না (১৭.৭৪)। সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডল সুখে পরিপূর্ণ হইবে, কারণ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত তাহারা আল্লাহ্‌কে দর্শন করিবে (৭৫।২২-২৩)। (দশম পরিচ্ছেদ)

পরমেশ্বরের নাম: পরমেশ্বরের অনন্ত নাম। শুদ্ধচৈতন্য ও সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহাকে নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্গুণ, সচ্চিদানন্দ বলেন। ইসলাম তাঁহাকে 'মুৎলুক্ বহৎ' বলেন। মুসলমানের আল্লাহ্ আর হিন্দুর 'ওঁ' একই। হিন্দুগণ যাঁহাকে নিত্য সমর্থ ও স্বতন্ত্র বলেন, মুসলমানগণ তাঁহাকেই হৈয়, কাদর, মুরোদ বলেন। হিন্দুর সিদ্ধপুরুষ আর মুসলমানের 'নবী' এক। হিন্দুগণ যাঁহাকে ঋষি, মুসলমানগণ তাঁহাকে 'বলী' বলেন। (একাদশ পরিচ্ছেদ)

মুক্তি: হিন্দুগণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিলয় বা বিগলনকে 'মুক্তি' বলেন। মুক্তি তিন প্রকার—জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি, এবং নিত্যমুক্তি। কুর্‌আন বলেন, একটি স্থান আছে তাহাকে 'কুজ্জান্' বলে। কুজ্জান্ অকব্বর অথবা 'ফিরদৌসে আলা'তে প্রবেশ করাকেই মহামুক্তি বা পরম মোক্ষ বলে। (বিংশ পরিচ্ছেদ)

'সমুদ্রসঙ্গমঃ'-গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে দারা সিকো বলিয়াছেন—'আরাধনা পরমেশ্বরস্য বিজ্ঞাপনা চ যা কৃতা তয়া সমুদ্রসঙ্গমসমাপ্তৌ সামর্থ্যং প্রাপ্তম্।' অর্থাৎ পরমেশ্বরের আরাধনা ও জ্ঞানের দ্বারা আমি 'সমুদ্রসঙ্গমঃ' গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি।

হিন্দু অধ্যাত্ম-দর্শন প্রথম আস্বাদন করিয়া দারা এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহার বন্ধু ও পরিবারবর্গকে ইহার রসভাগী করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ বারাণসীর পণ্ডিতগণের সহায়তায় তিনি প্রধান বারোখানি সহ বাহান্নখানি উপনিষদের ফারসী অনুবাদ করেন। প্রথম অনুবাদের পর ১৯৫৭ খৃঃ পারস্যে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত ডক্টর তারাচাঁদের প্রচেষ্টায় ইরানে উপনিষদ্‌গুলির ফারসী অনুবাদ পুন-

মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্বে ফারসী অনুবাদ-মুদ্রণের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। একবার লাহোরের জনৈক মুসলমান পুস্তক-প্রকাশক উপনিষদ্‌গুলির ফারসী অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধতার প্রবল চাপে অতিষ্ঠ ও শঙ্কিত হইয়া প্রকাশক তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হন। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উপনিষদ্‌গুলির প্রথম ফারসী অনুবাদক দারা সিকোকেও কাফেরদের ধর্মপ্রচারে সহযোগিতা করিবার অপরাধে দিল্লীর সিংহাসন, এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত হারাইতে হইয়াছিল।

উপনিষদের প্রথম ফারসী অনুবাদের একশত বৎসর পরে ১৭৫৭ খৃঃ আঁকোয়েতিল দ্যুপের্ঁ (Anquetil Duperron) নামক জনৈক ফরাসী ভারতে আসিয়া পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা' অধ্যয়ন করেন এবং তৎসম্বন্ধে কিছু লিখেন। দ্যুপের্ঁ ফারসী ভাষা জানিতেন এবং দারা কর্তৃক ফারসীতে অনূদিত উপনিষদ্‌গুলি ল্যাটিন ও ফরাসী (French) ভাষায় অনুবাদ করিবার কথা চিন্তা করেন। সুজা-উদ্দৌলার রাজসভায় ফরাসী রেসিডেণ্ট মঁসিয়ে জেণ্টাইল—দ্যুপের্ঁকে উপনিষদের ফারসী অনুবাদ মঁসিয়ে বার্নিয়ারের মারফত পাঠাইয়া দেন। দ্যুপের্ঁ দারা সিকোর অনুবাদের পাণ্ডুলিপি অন্য আর একটি প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া প্যারিস হইতে ১৮০১ খৃঃ প্রচুর টীকা-টিপ্পনী সহ দুইখণ্ডে ইহার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ল্যাটিন অনুবাদটির নাম Oupnek'hat id Est Secretum Tegendum অর্থাৎ প্রাচ্যের অপ্রকাশিতব্য রহস্য ও অব্যক্ত শব্দ। দ্যুপের্ঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি সহ প্রতি সংস্কৃত শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। দারা সিকোও এমন ভাবে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন নাই।

দ্যুপের্ঁর 'ঔপনিখৎ' সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশের লোকদিগকে হিন্দুধর্মের সহিত পরিচিত করাইয়া দেয়। উপনিষদের এই ল্যাটিন অনুবাদই প্রখ্যাত জার্মান মনীষী শোপেনহাওয়ারের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জার্মান দার্শনিক এই ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়াই পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিকট সাহসের সহিত ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন : 'ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার অমূল্য রত্নখনি ভারতীয় উপনিষদ্‌গুলি পাঠ করিলে উচ্চ ভাবের উদ্দীপনা হয়। এগুলি আমার জীবৎকালে যেমনি সান্ত্বনাদায়ক হইয়াছে, মরণেও তেমনি আমায় শান্তি দান করিবে।' দ্যুপের্ঁর এই ল্যাটিন অনুবাদ আবার জার্মান ও অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এরূপে হিন্দুদর্শন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচারিত হওয়ার পথ সুগম হইল। দ্যুপের্ঁর 'ঔপনিখৎ' প্রকাশিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষকে ব্রহ্মবিদ্যার পুণ্যভূমি বলিয়া অভিনন্দিত করে।

উপনিষদের ফারসী অনুবাদ-প্রকাশের তিন শত বৎসর পরে ভারতে পারস্যের রাষ্ট্রদূত প্রতিভাবান্ ডক্টর আলি আসগর হেকমত মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক ফারসীতে অনুবাদ করেন।

বিদেশী ভাষাগুলিতে ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য কাব্য নাটক ইতিহাস ললিতকলা প্রভৃতি অনূদিত হইলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের সম্প্রীতি শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হয়। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারই আজ বিশেষ প্রয়োজন।

ধর্মসমন্বয় সম্ভব

অধ্যাপক রেজাউল করীম

মানবসমাজে ধর্মের স্থান অতি উচ্চে। ধর্ম ব্যতীত সমাজ একদিনও টিকতে পারে না। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট মানব-সমাজকে বেঁধে রেখেছে ধর্ম। ধর্ম মানুষকে নানাপ্রকার পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা ক'রে আসছে। এক মানুষকে অপর মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করে ধর্ম। মানুষের ঐহিক পারত্রিক ব্যাপারে ধর্মই তার প্রধান সহায় ও অবলম্বন। সমাজের মেরুদণ্ড, সমাজের আশ্রয়-স্থল ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণের উৎস হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু এই মহামূল্য ধর্মকে নিয়ে পৃথিবীতে কত অপকাণ্ডই না হ'য়ে গেছে। এর কারণ কিন্তু ধর্ম নয়। ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের বিকৃত ধারণার জন্যই ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে পৃথিবীতে বহু অনাচার হয়েছে। মানুষের ধর্মবোধ যখন বিকৃত হ'য়ে যায়, তখন মানুষ ধর্মের নামে এমন বহু কাজ করে, যা ন্যায়নীতি কোন ক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। ধর্মবোধই মানুষকে রক্ষা করে। অপর দিকে দেখি, ধর্মের নামে মানুষ যখন অন্ধ হ'য়ে ওঠে, তখন জঘন্য কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। অবশ্য এ-দোষ ধর্মের নয়। আসল ধর্ম চিরকালই মহান্ ও উদার। ধর্ম তার পবিত্রতা আধ্যাত্মিকতা ও সর্বজনীন আদর্শের দ্বারা ছিন্নভিন্ন মানবসমাজকে এক করতে পারে। আবার এই ধর্মের নামে সমাজে যখন কুসংস্কার, অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন মানুষ নানা ছলছুতা ধ'রে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে বিভেদ সৃষ্টি করে; এবং মনে করে যে সে ধর্মেরই সেবা করছে। ধর্মের নামে মানুষে-মানুষে বিবাদ-সৃষ্টি হয়েছে, এর বহু উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যাবে।

কেন এমন হয়? এর প্রধান উত্তর—ধর্মের মূল নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে মানুষের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। আমাদের এই ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায় বসবাস করে, তাদের বহু লোকের ধারণা যে ধর্মগুলি পরস্পর-বিরোধী। রাজনীতি, অর্থ-নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষে মানুষে মিলন হ'তে পারে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে তাদের কোন মিলন হবে না। কিন্তু প্রশ্ন করি, বাস্তবিকই কি আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম পরস্পর-বিরোধী? প্রত্যেকে দাবি করি, আমার ধর্ম অনাদি ঈশ্বর থেকে আগত। তাই যদি সত্য হয়, তবে বিভিন্ন ধর্ম কেন পরস্পর-বিরোধী হবে? একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, মূলের দিক দিয়ে কোন ধর্মই কারও বিরোধী নয়। যুগের প্রয়োজন অনুসারে এক দেশে ধর্ম যে রূপ গ্রহণ করেছে, অন্য দেশে তার বাহ্য রূপটা হয়তো পৃথক্। এক মহাপুরুষ এ কথা বলেছেন, অন্য পরিবেশে অন্য মহাপুরুষ হয়তো বলেছেন অন্য কথা। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মূলগতভাবে ওঁদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ধর্মের মূলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতে হবে। কেবল বাইরের পার্থক্যটিকে দেখলে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। হাকিম সানাই একজন পারস্য ভাষার কবি। তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন, 'ভাষা আমাদের হিব্রু অথবা সিরীয় অথবা আরবী হ'তে পারে, প্রার্থনার স্থান 'বালকা' অথবা 'বালসা' হ'তে পারে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? যে ভাবে, যে স্থানে ও যে ভাষায় আমরা প্রার্থনা করি না কেন, আমরা প্রার্থনা করি সেই এক মহান্ ঈশ্বরের কাছে।'

ভারতের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-পারসিক-শিখ-য়িহুদী—যে যে-ভাবেই ধর্মাচরণ করুক না কেন, তারা সবাই একই বিধাতাকে স্মরণ করে—তাদের পদ্ধতি বিভিন্ন, কিন্তু প্রার্থনার লক্ষ্য বিভিন্ন নয়।

ধর্মভেদের জন্য ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বে বহু অপকাণ্ড ঘ'টে গেছে। মানুষ যদি ধর্মকে ঠিকভাবে গ্রহণ ক'রত, তবে এ-সব ঘ'টত না। আজ তাদের শুনানো দরকার যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ ক'রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে—ধর্মগত বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নেই। সত্য বটে, হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকাণ্ড মুসলমান সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড থেকে পৃথক্। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু ধীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ক্রিয়াকাণ্ড পৃথক্ হলেও মূলের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, বরং এই দুই ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা ব'লে থাকেন। সেইজন্য তাঁরা সর্বদাই রাজনৈতিক অধিকারের উপর জোর দেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে মানবজীবনের প্রধান জিনিস রাজনীতি নয়, আমাদের প্রধান জিনিস ধর্ম। আমরা যদি রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের ঐক্যের উপর জোর দিতাম, তবে সত্যকার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বহুদিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত। তাই আজ দিন এসেছে, যখন বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখতে হবে যে আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। তা যদি করি তবে, বহু দ্বিধা ও সংশয় কেটে যাবে। তখন ধর্ম আমাদের পৃথক্ ক'রে রাখবে না, বরং এক হ'তে সাহায্য করবে।

যদি বিভিন্ন ধর্মকে আমরা ঐতিহাসিক দিক্ দিয়ে আলোচনা করি, তবে দেখব যে সমস্ত ধর্মের মধ্যেই একটা ঐক্য-ধারা প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। কোন্ অতীতে বেদ-উপনিষদ্ উদ্গীত হয়েছিল! সেই প্রাচীন কালে আর্য ঋষিগণ এক মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেছিলেন। যুগ থেকে যুগান্তরে সেই আর্যধারা বয়ে আসছে। কত জাতি এল, আবার কালগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেল, কিন্তু সেই আর্যধারা আজও অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত। পৃথিবীর অপর প্রান্তে দু-হাজার বছর পূর্বে যিশুখৃষ্ট আবির্ভূত হলেন প্যালেস্টাইনের এক কুটিরে। তিনি সেই এক ঈশ্বরের উপাসনার উপরই জোর দিয়েছিলেন। তার সাড়ে ছশ'-বছর পরে আরবের উষর বুকে হ'ল হজরত মহম্মদের আবির্ভাব। তিনি কি পৃথক্ কোন আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন? তিনি সেই একই বস্তু ভিন্নভাবে প্রচার করেছেন। প্রত্যেক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের উপর দেশ কাল ও পাত্রের প্রভাব পড়ে; তা তো পড়বেই। কিন্তু অন্তরালে বয়ে চলেছে একই ধারা—একই আদর্শের অবিচ্ছিন্ন স্রোত। ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, বিভিন্ন ধর্ম পরস্পর-বিরোধী হ'তে পারে না।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কেবল ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দু-একটি কথা ব'লব। দেশবিভাগের পূর্বে কোন কোন মহল থেকে বলা হ'ত যে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এত পরস্পর-বিরোধী যে তাদের মধ্যে কোন ঐক্য- বা সমন্বয়-সাধন সম্ভব নয়। সে সময় পার্থক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। উভয় ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য যে আছে, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এটাও তো খুঁজে দেখতে হবে, উভয় ধর্মের মধ্যে মূলগত কোন ঐক্যসূত্র আছে কি না? তখনকার দিনে বলা হ'ত যে, হিন্দুর ঈশ্বরের আদর্শ একরূপ, আর মুসলমানের

ঈশ্বরের ধারণা ভিন্নরূপ। উভয়ের নৈতিক বোধও পৃথক্। এইভাবে আমাদের পার্থক্য-গুলিকে বড় ক'রে দেখানো হ'ত। কিন্তু বহু বিষয়ে যে সাদৃশ্য আছে, বহু আদর্শ যে অভিন্ন সেগুলি অবহেলা করবার কোন কারণ নেই। সামান্য সামান্য বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিলে মূল জিনিসটা হারিয়ে ফেলব। মহামতি বার্ক এক জায়গায় বলেছেন, 'It is the nature of greatness not to be exact'—মহত্ত্বের প্রকৃতিই এই যে, তা খুঁটিনাটিতে একরূপ হয় না। ধর্ম-ব্যাপারেও বার্কের এই কথাটা খুবই সত্য। তাই বল-ছিলাম যে, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মে পার্থক্য থাকলেও মিলন- ও সমন্বয়-ক্ষেত্রও প্রচুর আছে। আমরা সেটাকে কোনমতেই অবহেলা ক'রব না, বরং পার্থক্য সত্ত্বেও যেখানে ঐক্য আছে, সেইখানে আমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হবে, সেই ঐক্যসূত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এজন্য চাই উদার হৃদয়, আর পরমতসহিষ্ণু মানসিকতা। আমরা যদি হিন্দু আর ইসলাম ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করি, তবে দেখব যে, কতকগুলি প্রধান বিষয়ে এই দুই ধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। যে-সব পার্থক্য আছে, সেগুলি মৌলিক নয়—দুরতিক্রম্যও নয়।

উভয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ও আধ্যাত্মিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী—এই দুটি বিষয়ে এমন একটা সাদৃশ্য আছে, যা দেখলে চমকিত হ'তে হয়। হাকিম সানাই এক জায়গায় বলেছেন: ইসলাম ও হিন্দুধর্ম একই পথে, সেই একই ঈশ্বরের দিকে ছুটে চলছে এবং একই সঙ্গে তারস্বরে ঘোষণা করেছে যে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

এবার কোর-আন ও উপনিষদ্ থেকে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ক'রে দেখাব, দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পরি-বেশের মধ্যে লালিত হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে একই রূপ সিদ্ধান্ত করেছে। এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে যে ধর্মের মূল বিষয়ে আর্য মন ও সেমিটিক মন অনেকখানি পথ একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে (১) কোর-আনে বলা হয়েছে: 'নিশ্চয় তোমার প্রভু এক। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রভু আর কেউ নেই।' মহাগ্রন্থ উপ-নিষদেও ঠিক এই কথাটিই অন্য ভাবে বলা হয়েছে।

(২) 'তিনি পরম আত্মিক সত্তা। তিনি কারুর উপর নির্ভরশীল নন, আর কেউ তিনি ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। তিনি অজ্ঞাত, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কেউ তাঁর সমান নয়, তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি সদা জাগ্রত। নিদ্রা কখনো তাঁকে স্পর্শ করে না।' (কোর-আন)

'তিনি অমর। তাঁর আকার নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই। তিনি সব সময় সকল স্থানে উপস্থিত। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সকল বস্তুতে তিনি ব্যাপ্ত। তিনি অজ্ঞাত, পবিত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তিনি সেই সত্তা, যিনি নিদ্রার অবস্থায়—যখন সব ইন্দ্রিয় কাজ বন্ধ করে, তখনও কাজ করেন। তিনিই অনন্ত। তাঁর উপর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করে। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।' (উপনিষদ্)

(৩) 'তিনি মহান্, পবিত্র। মানুষ তাঁকে বর্ণনা করেও তাঁর গুণাবলীর শেষ করতে পারে না। চোখ তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু তিনি সব দেখেন। তিনি ধারণা-শক্তির অতীত এবং মহাবিজ্ঞ।' (কোর-আন)

'তিনি মহান্ ও মানুষের ধারণা-শক্তির অতীত। তাঁর প্রকৃতি মানুষ ধারণা করতে পারে না। শূন্য থেকেও তিনি অধিকতর সূক্ষ্ম। তিনি বিচিত্রভাবে আলো বিকীরণ করেন।' (উপনিষদ্)

(৪) 'যা কিছু জগতে আছে তা ধ্বংস হয়। কিন্তু মহান্ ঈশ্বরের ধ্বংস হয় না, তিনি অনন্ত জ্যোতির্ময়। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সুমহান্ ও সুউচ্চ। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেককে তার কাজ নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন—নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য।' (কোর-আন)

'এই নশ্বর বিশ্বের মাঝে তিনিই অবিনশ্বর। তিনি অনন্ত। তিনি সমস্ত অনুভূতির উৎস। তিনি প্রত্যেককে তার নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি মহৎ চিন্তার অধিকারী। তিনি সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু। তিনি সর্বকালের জন্য প্রত্যেক বস্তুর উদ্দেশ্য স্থির ক'রে দিয়েছেন।' (উপনিষদ্)

এই ধরনের আরও বহু শ্লোক কোর-আন ও উপনিষদে আছে,—তা থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত করলাম। এ দ্বারা পাঠকগণ বুঝবেন যে কোর-আন ও উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। স্বীকার করি, এই দুই ধর্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, কিন্তু যেখানে সাদৃশ্য যথেষ্ট, সেখানে কেন আমরা পার্থক্যের উপর এতটা গুরুত্ব দেবো? এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমরা ধর্মের প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোকের মানসিকতার প্রতিবাদ করি না। রামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন: উর্ধ্ব আকাশে শত শত শকুনি উড়ে বেড়ায়। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ভাগাড়ের মৃত জীবের প্রতি। আমরা যদি ধর্মের উচ্চ দার্শনিক স্তরে বসে কেবল পার্থক্যের কথা নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করি, তবে আমরা সেই শকুনির মতোই ব্যবহার ক'রব। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাস করে। তাদের উচিত—নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, আদর্শ ও নীতি পাঠ করা; সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে যত শীঘ্র ধর্মীয় অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হ'য়ে যায়, ততই দেশের ও জাতির মঙ্গল। বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সেই শুভ বুদ্ধি দেন, যার প্রভাবে আমরা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় মিলিত হ'য়ে একটি মহাজাতি গঠন করতে পারি।

By the study of different religions we find that in essence they are one. When I was a boy, this scepticism reached me, and it seemed for a time as if I must give up all hope of religion. But fortunately for me, I studied the Christian religion, the Mohammedan, the Buddhistic and others, and what was my surprise to find that the same foundation principles taught by my religion were also taught by all religions.

—Complete Works Vol. I—p. 315—Swami Vivekananda.

ইংলণ্ডে এক বৎসর

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চার লাফে ছ-হাজার মাইল পার হ'য়ে যখন লণ্ডনে আমাদের প্লেন নামলো তখন ওখানে বেলা ২॥টা। চারিদিক সেপ্টেম্বরের রোদে ঝলমল করছে। আমাদের অভ্যর্থনা করতে ইংলণ্ডের প্রকৃতি যেন উজ্জ্বল সাজে সেজেছে। জুরিখ ছেড়ে প্লেন আর বেশী ওপরে ওঠেনি। ইংলিশ চ্যানেল, টেমস্ নদী, সবুজ মাঠ আর অসংখ্য বাড়ী ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য তার আগে ২৬০০০ ফুট অর্থাৎ মেঘলোকের ওপর দিয়েই আমাদের গতি ছিল। সাদা মেঘ—চোখ ঠিকরে যায় আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির জন্য। বাইরের তাপমাত্রা তখন -১০° সেন্টিগ্রেড। পথে আরও দু-জায়গায় নেমেছিলাম। ভূমধ্য-সাগরের ধারে বীরুট বিমান-বন্দরে (তখন UN-এর আওতায়), আর করাচিতে। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেখানে আমাদের ২৪ ঘণ্টা আটকে থাকতে হ'ল। বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন শহর গড়ে উঠছে। একটা বিরাট আমেরিকান ধাঁচে তৈরী হোটেলে ছিলাম।

পূর্বদিন সন্ধ্যায় দমদমে মাটি ছেড়ে যখন ১৫ মিনিটে প্রায় ৫ মাইল উপরে উঠলাম, তখন যেন দ্যুলোকের অনুভূতি হয়েছিল আর পৃথিবীর বাইরে নিজেকে যতটা নিঃসঙ্গ প্রবাসী ব'লে মনে হয়েছিল, লণ্ডনে পৌঁছে ততটা হয়নি। এ যেন কলকাতারই কোন সাহেব-পাড়ায় এসেছি। তবে বিমান-বন্দর থেকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস প্রায় ১০ মাইল রাস্তায় কোথাও একটু ময়লা বা কাগজের টুকরো দেখলাম না। এখানে আমাকে নিতে একজন এসেছিলেন। তিনি আমার পূর্ব-নির্ধারিত বাসায়—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেল (Bentham Hall)-এ পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ঘরে খাটে গদীর উপর চারখানা গায়ে-দেবার কম্বল-সহ চমৎকার ভাবে পাট-করা বিছানা, দুটি চেয়ার, পড়ার টেবিল, দেরাজ, আর্শি, আলমারি (wardrobe)—এই এদেশের সাধারণ ব্যবস্থা।

হোস্টেল বা হোটেল এদেশে মেয়েরাই চালায়, বেশ দক্ষ। বিকেলেই কলকাতায় 'তার' (Cable-gram) করতে সাহায্য করলেন একটি মেয়ে হোস্টেলে বসেই টেলিফোন ক'রে। সন্ধ্যার পর আমার একটি বাঙালী বন্ধু আসাতে খুবই আনন্দ হ'ল, ভারতীয় খানাও তার সঙ্গে খাওয়া হ'ল।

এ হ'ল 'bed and breakfast' (শয্যা ও প্রাতরাশ)-এর দেশ। প্রথমটি মন্দ পাইনি; প্রাতঃকৃত্যের পর দ্বিতীয়টির খোঁজে নীচে গিয়ে দেখি অন্ততঃ একশ' জন ছেলে-মেয়ে জড় হয়েছে 'কিউ' দিয়ে। পরিজ, কর্নফ্লেক্স্, ডিম, হেরিং (মাছ), চা বা কফি তার পরে 'one or two' অর্থাৎ এক বা দুই চামচ চিনি—এ ছাড়া রুটি তো আছেই। দু-চারটি ভারতীয়, কয়েকটি আফ্রিকান ও ইওরোপীয় ছাত্রের সঙ্গে কথা হ'ল। সব 'holiday' (ছুটি ভোগ) করতে এসেছে দিন-কয়েকের জন্য—গরমের ছুটিতে কেউ বাড়ীতে বসে থাকে না। মেয়েগুলিও একই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে—একলা বা দল বেঁধে। এদের পরনে আঁট-শাঁট প্যান্ট—বলে শ্ল্যাক (slack), প্রথম দেখে খুবই বিসদৃশ লেগেছিল, পরে সয়ে গেল, কেউ এক জায়গায় বেশী দিন থাকে না—খেলাধূলা, হাঁটা, সাঁতার, পাহাড় চড়াই ইত্যাদি ক'রে বেড়ায়।

এর পর বৃটিশ কাউন্সিলে আমার বৃত্তি-সংক্রান্ত অনেকগুলি কাজ মেটালাম। এখানে বেশীর ভাগ কর্মীই মহিলা। সকলেই সহানুভূতি-শীল। কুশল প্রশ্ন, ব্যবস্থা, আশ্বাস ও শেষে অর্থ দিয়ে আমায় বিদায় করলেন। একবার হাজিরা দিতে ভারতীয় 'হাই কমিশন' এর অফিসেও যেতে হ'ল। ভারতের পরাধীনতার প্রতীক India House (ইণ্ডিয়া হাউস) একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রাস্তার ওপর ৮ তলা বাড়ী। বহু ভারতীয় ও ইংরেজ কর্মচারী এখানে কাজ করেন। বিখ্যাত লাইব্রেরীটিও দেখলাম। একটি সাহেব-সঙ্গীর সঙ্গে এখানকারই অন্নভোগ গ্রহণ করলাম। একটু দূরেই টেম্‌স্ নদী—কালো জল, কিন্তু পাড়গুলি সুসজ্জিত। নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। নদীর বুকে ৮।১০টি সেতু।

ফিরে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট অঞ্চলে এলাম কিছু জামা কেনবার জন্য। এইটেই নাকি ফ্যাশন-দুরস্ত জামা-কাপড়ের আড্ডা। দুপাশে বিচিত্র-ভাবে শো-কেস সাজানো। 'চেন স্টোর' এর সংখ্যাই বেশী। এই সব দোকানে যাবতীয় জিনিস পাওয়া যায়। সারা ইংলণ্ডে ৫।৭টা কোম্পানীর শাখাই সব শহরে পাড়ায় পাড়ায়—বিক্রেতা মহিলা। এরাই নিত্য নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি ক'রে জনগণকে প্রভাবিত করে। পাশেই আরও উঁচু-দরের ক্রেতাদের জন্য বণ্ড ষ্ট্রীট, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট।

এই সব রাস্তায় বেশ ভিড়; তবে কেউ ফুটপাথের নীচে নামে না। ট্রাম নেই, কলকাতার মতো দোতলা বাস, নতুনত্ব ট্রলিবাস। বাস্ স্টপে শৃঙ্খলাবদ্ধ 'কিউ', কিন্তু বাসে ভিড় নেই। কেন না বেশীর ভাগ লোক মাটির তলায় ইলেকট্রিক টিউব্ রেলে যায়, তবে অল্প রাস্তার পক্ষে নীচে নামা-ওঠায় সময় বেশী লেগে যায়। নামার জন্য লিফ্‌ট্ অথবা সিঁড়ি আছে, কোথাও বা চলন্ত সিঁড়ি (এস্‌কালেটর) আছে, টিউবে এত সুবন্দোবস্ত ও নির্দেশ দেওয়া আছে যে লণ্ডনে কোন লোক হারিয়ে যেতে পারে না। অবশ্য তেমন দরকার হ'লে রাস্তার মোড়ে পুলিস পোস্টের সাহায্য নিতে পারা যায়।

এবারে লণ্ডনে একদিনের বেশী থাকতে পারিনি, তাই খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও এখানকার 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার' যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কেন না শহরের কেন্দ্র থেকে আশ্রমটি ১০।১২ মাইল দূরে। বড়দিনের ছুটিতে এসে শ্রীশ্রীমায়ের উৎসবে যোগদান করি; সে কথা পূর্বে লিখেছি।*

পরদিন রওনা হলাম আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র লীড্‌স্ শহরের দিকে। হোস্টেলের কর্ত্রীই টেলিফোনের সাহায্যে স্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। King's Cross রেলস্টেশনে পৌছে মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়েও নিষ্পত্তি হ'ল না। উপরি এক শিলিং (tips) দিতে হ'ল। ট্যাক্সি থেকে নামতেই রেল-পোর্টার এগিয়ে এসে আমার ব্যাগটি নিল এবং ঠিক গাড়ীতে বসিয়ে দিল। একবার ঠকেছি ব'লে জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিতে হবে?—জবাব দিলে, যা দেবেন। এক শিলিং-এর কম দিতে পারলাম না। পরে জানলাম, এরা মাল বইবার জন্য কিছু নিতে পারে না—তবে উপরি (tips) আশা করে। এরা খুব ভদ্র, ও ভাল সুট-পরা।

লণ্ডনে দশ-বারোটা রেল-স্টেশন আছে। কতকগুলি উত্তরে, আর বাকীগুলি দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যাবার জন্য। আমাদের দেশের বড় বড় স্টেশনের মতোই। কোন কোন ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা কিছু বেশী। তবে গাড়ীর কামরাগুলি আমাদের দেশের তুলনায় অনেক ভাল, শুধু ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাস। ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক্ কামরা। করিডর গাড়ী—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। তাপ-নিয়-ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সীটের সামনে

* দ্রষ্টব্য : 'লণ্ডনের চিঠি,' 'উদ্বোধন', ৬১তম বর্ষ, পৃঃ ১০১

ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গার ছবি সাজানো, কেউ নষ্ট করে না,—যদিও কেউ ছেঁড়ে না। গাড়ীতে ভিড় নেই; শুনলাম শনি-রবিবার ভিড় হয়; কারণ সকলে বেড়াতে যায়।

ট্রেনে রেস্টুরাণ্ট গাড়ী থাকা সত্ত্বেও অনেকে প্ল্যাটফর্মে ফেরিওলার কাছে স্যাণ্ডউইচ কিনল। যেমন বাসে, তেমন ট্রেনে পাশের লোকের কথা বলা খুবই কম। তবুও আবহাওয়া আর ইংলণ্ডের প্রশংসা দিয়ে আলাপ জমালাম একটি দম্পতির সঙ্গে। নতুন লোক জেনে স্বাগত জানাল আর ইংলণ্ডের আরও প্রশংসা ক'রে আমাকে বিভিন্ন স্থান দর্শন করতে ব'লল। ভারত সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখলাম না। ট্রেনে যেতে যেতে দেখি চারিদিক সবুজ। পৃথিবী-পৃষ্ঠ কোথাও সমতল, কোথাও তরঙ্গায়িত, কোথাও ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী, কোথাও বা ফালির মতো রাস্তা সবুজ মাঠ ভেদ ক'রে চলেছে। শুক্‌নো মাঠ একটাও চোখে পড়ল না। এ-সব দৃশ্য আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, এমন সময় 'ওয়েটার বয়' জানিয়ে গেল লাঞ্চ তৈরী।

লীড্‌স্ পৌছবার পূর্বেই প্রকৃতিদেবী রূপ পরিবর্তন করলেন। রোদ গিয়ে এল কালো মেঘ, ঝিরঝির বৃষ্টি নামল,—এই নাকি এখানে স্বাভাবিক। মনটা দমে গেল। দৃশ্য-পটও গেল পালটে। ঘন ঘন সুড়ঙ্গ পথ পার হ'য়ে চল্‌ল গাড়ী। হঠাৎ ওয়েকফীল্ড স্টেশনে জানলাম, এর পরই গাড়ী থামবে লীড্‌সে। বৃষ্টি তো আছেই—তার ওপর প্ল্যাটফর্মের অবস্থা দেখে কান্না পেল। আমাকে নিতে এসেছিলেন একটি বৃদ্ধা মিস্ (কুমারী), অবশ্য এক বৎসরের মধ্যে এঁকে কোনদিন ভুলেও বৃদ্ধা বলিনি। একদিন নিজেকে বয়স্ক বলেছিলাম, তাও এ রকম বলতে তিনি নিষেধ করলেন, বিশেষতঃ মেয়েদের সামনে।

যতই শহরের মধ্যে ঢুকতে লাগলাম,—যে শহরে এক বছর থাকতে হবে, তার ধূম্র-ধূসর অট্টালিকাগুলি দেখে চিন্তিত হ'য়ে উঠ-ছিলাম। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ লাই-ব্রেরী ভবন ও ততোধিক উচ্চ টাওয়ার ক্লকটি দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম।

এবার বৃটিশ কাউন্সিল-এর লীড্‌স্-কেন্দ্রে আলাপ করিয়ে আমায় একটা অস্থায়ী ডেরায় তোলা হ'ল। 'বেড এণ্ড ব্রেকফাষ্ট' (শয্যা ও প্রাতরাশ) ছাড়া অন্য ব্যবস্থা নেই। আবার জানিয়ে দেওয়া হ'ল শনি-রবিবার অন্য দোকান-পাটের সঙ্গে সাধারণ রেস্টুরাণ্টগুলিও বন্ধ—এ অঞ্চলে নাকি এইটা বড় অসুবিধা—সকলেই এক সঙ্গে বিশ্রাম নেয়। কাজেই একবার বেরিয়ে দুদিনের রেশন সংগ্রহ ক'রে রেখে দিলাম। অবশ্য ছুটির দিনে ক্ষুন্নিবৃত্তির জায়গা পরে আবিষ্কার করেছিলাম।

পরদিন শনিবার একটি মানচিত্রের সাহায্যে শহরটা একটু ঘুরে নিলাম। সূর্যদেবের কৃপায় দিনটা মন্দ লাগল না। বাসার সামনে একটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর জায়গা—উড্‌হাউস মুর—মিউনিসিপাল পার্ক, চমৎকার ঘাসে ঢাকা—কোথাও একটু কাদা-মাটি দেখলাম না। ছেলেদের খেলার ব্যবস্থা, বড়দের টেনিস্-লন, একটা বাঁধানো চত্বর ও একটু উঁচু বেদীর পেছনে কাঠের ছাউনি—গরমের দিনে খোলা মাঠে থিয়েটার হ'তে পারে, তার ব্যবস্থাও আছে। এক দিকে সবজী-বাগান, শনি-রবিবারে চাকুরে বাবুরা এতে খেটে ফসল ফলান। মাঝে একটি কাঁচে-ঢাকা গরম ঘর (hot-house), বিচিত্র ফুলের বাহার শীতকালে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। এক-দিকে নেলসনের ও অপর দিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রঞ্জের প্রতিমূর্তি; ভিক্টোরিয়ার মূর্তির নীচে তিন দিকে—ভারত, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতীক

তিনটি বীরপুরুষের মূর্তি। এ-রকম পার্ক আরও অনেক এখানে আছে, কিন্তু দুবেলা পার হ'তে হ'ত ব'লে এর সঙ্গেই ছিল বেশী পরিচয়—সারা বছরে এর কত রূপই না পরিবর্তন হ'তে দেখেছি!

বিকেলে এক নিমন্ত্রণ পেলাম—রবিবারের মধ্যাহ্ন-ভোজনের; এদের বাড়ীতেই আমার থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। উঁচু জায়গা থেকে খানিকটা নেমে এসে নম্বর খুঁজে পেলাম, এবং কুকুরের সরব সম্বর্ধনার পর গৃহকর্ত্রী ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন—শ্ল্যাক পরা, আমাকে বসিয়ে নানা কথায় আপ্যায়ন করতে লাগলেন—অবশ্য তার অর্ধেকও আমি সেদিন বুঝিনি, কারণ, ইয়র্ক শায়ারের ইংরেজী উচ্চারণ আমাদের নোয়াখালী জেলায় বাংলার মতোই দুর্বোধ্য। খানিক পরে এঁর স্বামী ফিরে এলেন। বাড়ী কর্নওয়াল, উচ্চারণ সুবোধ্য। ছোট ছোট দাড়ীগোঁফ, একটু সৌম্যদর্শন—স্ত্রীর বিপরীত। শুনেছিলাম ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন—ঘরে আলমারিতে বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন, সব রকমের বেশ ভাল ভাল বইও দেখলাম—মনে হ'ল বাসস্থানের ভাগ্যটা ভালই। পরে জেনেছি, ঐ রকম বইএর সেট ফার্নিচারের অঙ্গ বিশেষ। সে জন্য অবশ্য ভদ্রলোকটির ওপর শ্রদ্ধাহীন হইনি। কথাবার্তায় উদারপ্রকৃতি—যুদ্ধের সময় ভারতে দু-বছর কাটিয়েছেন—সেই থেকেই যেন একটা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব পেয়েছেন তিনি। এঁদের তিন-চার বছরের একটি ছেলে। আরও দুজন ছাত্র এঁদের কাছে থাকেন; একজন ভারতীয় ও অন্যজন সিংহলী বৌদ্ধ। সাধারণতঃ ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা করা হয় আলাদা ক'রে—নিজেরা একটু কৃচ্ছ্রসাধন করেন। খাবার টেবিলের আদব-কায়দা বিশেষ কিছুই ছিল না—কয়েক মিনিটেই সঙ্কোচ কেটে গেল। তিন প্রস্থ লাঞ্চ—ঝোল, আলু-কপি মাছ বা মাংস প্রভৃতি মিলিয়ে একটা ডিস ও পরে পায়েস-জাতীয় একটা কিছু।

ফেরবার আগেই সপ্তাহে প্রায় ৬০্ টাকায় থাকা-খাওয়ার (৫ দিনের লাঞ্চ বাদে) ব্যবস্থা হ'ল, এই সব থাকার জায়গাকে বলে 'Diggs'—গৃহকর্ত্রী তখন আমার ঘরের কি রং হবে; কি কাগজ লাগানো হবে, জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। নির্দিষ্ট ঘর সাজাতে দেরি হবে, অগত্যা ছাদের ভেন্টিলেশন-বিহীন ঘরে থাকতে হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই একটু ভাল অঞ্চলে একটি ভাল ঘর খুঁজে নিলাম, কম পয়সাতেও হ'ল। কুকুরের জ্বালাতন থেকেও বাঁচলাম। গৃহকর্ত্রী, স্বামী ও তিনটি স্কুলে-পড়া ছেলে নিয়ে এদের সংসার। আমাকে নিয়ে মোট তিনটি ছাত্র এখানে থাকে। স্বামী পোলিশ—কারখানায় কাজ করে, গাড়ী আছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব ছক-কাটা। গৃহকর্ত্রীকে সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খাটতে দেখতাম। সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা, বাড়ীর ধুলা পরিষ্কার থেকে আরম্ভ ক'রে—ছেলেদের জামা কাচা ও ইস্ত্রী করা—সবই তিনি করতেন। এরই ফাঁকে রেডিও, টেলিভিসন, পিয়ানো, ছেলেদের পড়ানো—সবই চলছে। ছেলে কটিকে মানুষ করবার জন্য আকুল আগ্রহ। যদিও ওদেশে স্কুলের পাঠে পয়সা খরচ হয় না, —তবু সেকেণ্ডারী স্কুলে ইচ্ছামত প্রবেশ করা চলে না। ছেলেদের সুশিক্ষা ও সদ্ব্যবহার শেখাতে বাপ-মা তৎপর, তবে মাঝে মাঝে তাড়নারও কমতি দেখতাম না। আর বাসা বদলাইনি। কেন না, সবই প্রায় একই ধরনের—কেবল মানুষের আচরণের পার্থক্য। কোথাও ২।৩জন কোথাও বা ৮।১০ জন ছাত্রকে গৃহকর্ত্রী রেঁধে খাওয়ায়; আবার কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে

ছাত্রেরাই রেঁধে খায়; অবশ্য গৃহস্থালীর সমস্তই ঘরের সঙ্গে ভাড়া পাওয়া যায়, পরে সারা ইংলণ্ড ঘুরে দেখেছি—এই রকম বাসা চালানো এদেশের মেয়েদের দ্বারা চালিত একটি বড় ব্যবসা—অনেক বড় হোটেলও মেয়েদের চালাতে দেখেছি।

যেমন ঘর ঘর ভাড়াটে, তেমনি প্রত্যেকের কাছে একটি ক'রে চাবি। দুদিনেই চাবির মানুষ হ'য়ে গেলাম। ছোটখাট চুরি এখানে বিরল। দুধের বোতল বাইরে রেখে চলে যাওয়া বা পয়সা রেখে খবরের কাগজ নিয়ে যাওয়া, সত্যই প্রত্যক্ষ করলাম। ঘরের ভেতরে কিন্তু খিল দিয়ে শোবার ব্যবস্থা নেই, আবার টোকা না দিয়ে কেউ ঘরে ঢোকে না। (ক্রমশঃ)

আসবে সেদিন কবে?

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার হৃদয় তোমার বসার যোগ্য আসন হবে—
বল সুন্দর, আসবে সেদিন কবে?
আমি বসে আছি পরমাগ্রহে সেদিনের পথ চেয়ে:
ঘন দুর্যোগে সারাটি আকাশ ছেয়ে
গেছে দেখি: সেই দুর্যোগ-মাঝে দুঃখের দীপ জ্বালি
আমি একান্তে নিভৃতে সাজাই তোমার পূজার ডালি।
নানা ভাবে রচি তোমার আসনখানি—
কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে; সমুখে পিছনে টানি
মনের মতন ক'রে
বারে বারে সেই আসন তোমার আমার হৃদয় 'পরে
সাজাই। কখন তোমার সময় হবে—
আসবে কখন? তোমার চরণ উজ্জ্বল হ'য়ে রবে
আমার হৃদয়ে; সে দুটি চরণ বহু সাধনার ধন।
ওগো সুন্দর, আসবে কবে সে মহাদুর্লভ ক্ষণ?
সাধনা আমার? কই কতটুকু করেছি সাধনা আমি?
তুমি অন্তরযামী,
জান তো সকলি; সাধনা আমার নাই—
শুধু দুঃখের দীপশিখা জেলে অন্তর মাঝে ঠাঁই
করেছি তোমার দিবানিশি জেগে;
ব্যথা-বেদনার ফুলে
ভরেছি আমার পূজার সাজিটি, দেব ওই পদমূলে—
এই আশা নিয়ে বসে আছি আমি—
একে কি সাধনা বলে?

পথ তো তোমার পিছল করিনি
আমার চোখের জলে;
আঁখি দুটি কই অন্ধ হয়নি ওই পথ চেয়ে চেয়ে,
কণ্ঠ রুদ্ধ, ডেকে ডেকে, গান গেয়ে?
তবু কেন আশা মনের গহনে, ও চরণ-ছোঁয়া লেগে
সাধনাবিহীন অন্তরখানি উঠবে আমার জেগে!
তোমার করুণা, ওগো সুন্দর, সে যে নামে অযাচিত
তুমি তো কারেও করনাক' বঞ্চিত।
কে কী দিল আর কেবা কী দিল না,
তুমি তো দেখ না চেয়ে;
তুমি দ্বারে দ্বারে ডাক দিয়ে যাও;
এতটুকু সাড়া পেয়ে
খুশী হ'য়ে ব'স তোমার আসনে,
আপনি আসন পাতি
আপন আলোকে প্রদীপ্ত হ'য়ে—প্রসন্ন দিবারাতি।
সেই করুণার এককণা আমি পাব ওগো সুন্দর,
সাধনা আমার কিছু নাই জানি, তবু খোলা অন্তর
আছে তুমি যবে এসে ডাক দেবে,
তোমাকে বরণ ক'রে
নিতে পারি যেন, পথ-চাওয়া মোর সার্থক হবে,
জীবন উঠবে ভ'রে।

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

ভোগাস্থৈর্যবর্ণনম্

ভোগাদির অস্থিরতা কথিত না হইলে পূর্বোক্ত যাজ্ঞাদৈন্য দূষণীয় বলিয়া ধারণা হইবে না, তাই ভর্তৃহরি ভোগের ক্ষণস্থায়িত্ব বর্ণনা করিতেছেন :

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্‌ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ ৩১॥

মাত্রাধিক বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হইবার ভয়, সদ্বংশে জাত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাচ্যুতির ভয়, ধনাধিক্যে রাজার ভয়, সম্মানিত ব্যক্তির অপমানের ভয়, বলে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর ভয়, রূপসৌন্দর্যে বার্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক পরাভূত হইবার ভয়, সদ্‌গুণ থাকিলে দুর্জনকৃত নিন্দাদির ভয় এবং শরীরে সর্বদা মৃত্যুভয় বিদ্যমান। সংসারে সকল বস্তুই ভয়গ্রস্ত, মানুষ সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত, একমাত্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভয়শূন্য। ৩১

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা চাত্যুজ্জ্বলং যৌবনং
সন্তোষো ধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ।
লোকৈর্মৎসরিভির্গুণা বনভুবো ব্যালৈর্নৃপা দুর্জনৈ-
রস্থৈর্যেণ বিভূতয়োঽপ্যপহতা গ্রস্তং ন কিং কেন বা॥ ৩২॥

সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে—ইহাই এখন কথিত হইতেছে। প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত, সুন্দর উজ্জ্বল যৌবন জরা দ্বারা, সন্তোষ ধনতৃষ্ণা দ্বারা, মনঃসংযমের সুখ প্রগল্‌ভা রমণীগণের বিলাসচেষ্টা দ্বারা, মাৎসর্যপূর্ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা বিদ্যাবিনয়াদি সদ্‌গুণসমূহ, বিষধর সর্প ও হিংস্র জন্তু দ্বারা অরণ্যপ্রদেশসমূহ, কুমন্ত্রণাদাতা দুর্জন দ্বারা নৃপতিগণ এবং ধনাদি সম্পদ নশ্বরতা দ্বারা কবলিত রহিয়াছে। এ সংসারে এমন কি আছে যাহা কোন কিছু দ্বারা কবলিত নয়? অর্থাৎ সর্ববস্তুই কিছু না কিছু দ্বারা গ্রস্ত। ৩২

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে
লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারা ইব ব্যাপদঃ।
জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ
তৎ কিং তেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্মিতং সুস্থিরম্॥ ৩৩॥

অসংখ্য আধিব্যাধি দ্বারা মনুষ্যের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, যেখানে সম্পদ্ বিদ্যমান,—বিপদ্ যেন দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সেখানেই প্রবিষ্ট হয়, প্রারব্ধবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মাধীন বিবশ পুরুষকে অবশ্যই মৃত্যু শীঘ্র কবলিত করিয়া থাকে। সুতরাং সেই স্বেচ্ছাবিহারী বিধি এমন কি পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা চিরস্থির? (অর্থাৎ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে)। ৩৩

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখ-স্ফূর্তিঃ প্রিয়াসু স্থিতা।
তৎসংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধা বুধা বোধকা
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্॥ ৩৪ ॥

তাহা হইলে কি কর্তব্য? এক্ষণে তাহাই নির্ধারণ করিতেছেন: ভোগ্যবিষয়সমূহ উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। প্রাণ ক্ষণবিনাশী, যৌবনের সুখভোগও অল্পকালস্থায়ী; অতএব হে লোকহিতোপদেষ্টা বিদ্বান্‌গণ, এই অখিল সংসারকে অসার জানিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আদর্শ জীবন যাপন দ্বারা সর্বপ্রযত্নে চিত্ত সমাহিত করুন। (চরম পুরুষার্থ লাভের জন্য আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করত অপরকেও সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করুন)। ৩৪

ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলা
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাব্জপটলী-লীনাম্বুবদ্‌ভঙ্গুরম্।
লোলা যৌবনলালসাস্তনুভৃতামিত্যাকলয্য দ্রুতং
যোগে ধৈর্যসমাধিসিদ্ধিসুলভে বুদ্ধিং বিধদ্ধ্বং বুধাঃ ॥ ৩৫ ॥

ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখাদি পরিত্যাগ পূর্বক যোগাভ্যাসে নিরত হওয়া কর্তব্য--ইহাই কথিত হইতেছে: মনুষ্যগণের ভোগ মেঘরাশি মধ্যে প্রকাশমান বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বায়ু-আন্দোলিত পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় আয়ু চঞ্চল, যৌবনের ভোগাভিলাষসমূহও স্থির নয়—এই সকল বিচার করিয়া হে সুধীগণ, ধৈর্য ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সুখলভ্য ব্রহ্মধ্যানে বুদ্ধি নিয়োজিত কর। ৩৫

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রী-
রর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূগাঃ।
কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতম্
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং তরীতুম্॥ ৩৬॥

প্রকারান্তরে পূর্বোক্ত বিষয়ই কথিত হইতেছে: আয়ু জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, যৌবনের শোভা কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী, ধনসম্পত্তি মনের কল্পনার মতো ক্ষণবিনাশী, বিষয়ভোগসমূহ বর্ষাকালের বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির, প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গনও ক্ষণকালের জন্য। অতএব হে মনুষ্যগণ! সংসার-ভয়রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত কর। ৩৬

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যে নিয়মিততনুভিঃ স্থীয়তে গর্ভবাসে
কান্তাবিশ্লেষদুঃখ-ব্যতিকরবিষমো যৌবনে চোপভোগঃ।
বামাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতির্বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ
সংসারে রে মনুষ্যা বদত যদি সুখং স্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ ॥৩৭॥

ইহলোকে প্রায় সকলেই সংসারসুখে তৎপর, তবে উহা নিন্দনীয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈরাগ্যাশ্রয়ী কবি ভর্তৃহরি বলিতেছেন, বিচার-দৃষ্টিতে সংসারে কিঞ্চিন্মাত্র সুখও নাই:

অপবিত্র পদার্থপূর্ণ জঠরবাসে সর্বগাত্র সঙ্কুচিত অবস্থায় জীব কত কষ্টেই না অবস্থান করে। যৌবনের সুখভোগও প্রিয়তমার বিয়োগ-দুঃখে বিষমভাবে ব্যাহত হয়। সুনয়না কামিনীগণের অবজ্ঞা ও উপহাসের আস্পদ বার্ধক্যও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব হে মানবগণ! এই সংসারে কোথাও কোন অবস্থায় যদি কণামাত্র সুখ থাকে তো বল।—অর্থাৎ দুঃখকূপ সংসারে সুখ নাই। ৩৭

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহম্।
আয়ু পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্ ॥৩৮॥

বিনাশের কারণসমূহ সন্নিহিত দেখিয়াও মানুষ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। পরমার্থলাভে যত্নবান্ হয় না,—ইহাই মহা আশ্চর্য! এই কথা কবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতেছেন: বার্ধক্যাবস্থা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীতি প্রদর্শন পূর্বক সদা সম্মুখে দণ্ডায়মান, পরম শত্রুতুল্য রোগাদিও দেহকে পীড়ন করিতে সতত উন্মুখ, ছিদ্র কুম্ভ হইতে জল নির্গমনের ন্যায় আয়ু প্রতিক্ষণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য! তথাপি লোকে অন্যায় আচরণ হইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। ৩৮

ভোগা ভঙ্গুরবৃত্তয়ো বহুবিধাস্তৈরেব চায়ং ভব-
স্তৎকস্যেহ কৃতে পরিভ্রমত রে লোকাঃ কৃতং চেষ্টিতৈঃ।
আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং
কামোৎপত্তিবশাৎ স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ ॥৩৯॥

যদি আমাদের কথা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অস্থির ভোগাদি বিষয়ের আশা পরিত্যাগ করত পরমকল্যাণ-নিদান আত্মচিন্তাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর—ইহাই গ্রন্থকার নিবেদন করিতেছেন: বিবিধ ভোগসমূহ ভঙ্গুর-স্বভাব ও ভোগবাসনায় পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণাদি-রূপ সংসার-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। অতএব হে মানবগণ! এ সংসারে কিসের জন্য ধাবিত হইতেছ? ভোগ-সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টার ফল কি? যদি আমাদের কথায় শ্রদ্ধা থাকে, তবে সকল আশা ও সকল কামনা বশীভূত করিয়া একান্ত অনুরাগের সহিত স্ব-স্বরূপে চিত্ত সমাহিত কর। ৩৯

ব্রহ্মেন্দ্রাদি মরুদ্গণাংস্তৃণকণান্ যত্র স্থিতো মন্যতে
যৎস্বাদাদ্বিরসা ভবন্তি বিভবাস্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ।
ভোগঃ কোঽপি স এক এব পরমো নিত্যোদিতো জৃম্ভতে
ভো সাধো ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ ॥৪০॥

যদি তোমার একান্তভাবে ভোগেই স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে নিত্য ভোগ্যবস্তু এক আত্মাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর, অন্যত্র নহে,—ইহা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন: যাহাতে স্থিত হইলে মানুষ ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও তৃণসদৃশ মনে করিয়া থাকে, যে বস্তুর অনুভব হইলে ত্রিলোকের রাজ্যাদি বিভবও বিরস বলিয়া প্রতীত হয়, এইরূপ নিত্য প্রকাশশীল সর্বোৎকৃষ্ট একমাত্র ব্রহ্মানন্দ সুখই সদা বিদ্যমান। অতএব হে সাধু সাধক! ক্ষণস্থায়ী সংসার-সুখে অনুরক্ত হইও না, ব্রহ্মানন্দ-লাভে তৎপর হও।

কলিকাতায় স্বামীজী ও ক্ষেত্রীর মহারাজা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজী ডাক্তারদের পরামর্শমত দারজিলিংএ স্বাস্থ্য-পরিবর্তনে গিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের ২৩শে পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দের নিকট শুনিলাম স্বামীজী পরদিন প্রাতে দারজিলিং মেলে কলিকাতায় পৌছিবেন। হঠাৎ তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য রাজার সঙ্গে ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিত সিং বিলাতে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা যে তাঁর গুরুদেবকে তাঁর সঙ্গে বিলাতে নিয়ে যান, সমুদ্রবায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারে বলে স্বামীজীরও নাকি তাঁর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা।'

২৫শে এপ্রিল দারজিলিং মেল আসিবার সময় শেয়ালদায় গিয়া দেখি অপূর্ব ব্যাপার। বড় বাজারের প্রায় সমুদয় মারোয়াড়ী-সম্প্রদায় তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষেত্রীর মহারাজার প্রজা। স্বামীজী গাড়ী হইতে প্লাটফর্মে অবতরণ করামাত্রই মহারাজা অজিত সিং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হইল। স্বামীজী অতি সংক্ষেপে দুই-এক কথায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া জবাব দিলেন। পরে ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে তাঁহার বড়বাজারের বাসভবনে চলিয়া গেলেন। ঐখানে শুনিতে পাইলাম, সেদিন বৈকালে স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজার মঠে যাইবেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে আমি বাগবাজারের শেয়ারের গাড়ীতে আলমবাজারে যাইতেছি, সে সময় পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় (শ্রী-ম)-এর সঙ্গে দেখা হইল। গাড়ী বরানগরে পৌছিলে মাষ্টার মহাশয় উক্ত গাড়োয়ানকে আমাদের দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দিতে বলিলেন। আমরা গিয়া যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তখন স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং তাঁহার সেক্রেটারী-সহ কালীমন্দির ও রাধাকান্তের মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের অভিমুখে যাইতেছেন। আমি ও মাষ্টার মহাশয় তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত। যে ছোট খাটে ঠাকুর বসিতেন তাহাও পুষ্পমালায় সুশোভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা প্রভৃতিও তথায় প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী ঐ ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রীর মহারাজা পর্যন্ত দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেহই ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। স্বামীজী এই প্রকার তিনবার গড়াগড়ি দিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে যুক্তকরে ঠাকুরের সম্মুখে একপাশে অনিমেষ-নেত্রে ভাবগম্ভীর নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেত্রীর মহারাজা প্রভৃতি সকলেই স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সকলের প্রণাম হইয়া গেলে স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজাকে পঞ্চবটীর দিকে লইয়া চলিলেন।

পঞ্চবটীর তলায় আসিয়া স্বামীজী অপূর্ব ভাবে বিভোর হইলেন। পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ

করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে বালকের মতো আনন্দে পঞ্চবটীর একটি ডালে বসিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। মহারাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তখন আমরা এই রকম গাছে দোল খেতাম, আনন্দ করতাম। আজ সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। দেখ, এই গঙ্গাতীরে কী অপূর্ব দৃশ্য, কী সুন্দর পরিবেশ!' পরে সকলেই সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী উঠিয়া পড়িলেন। পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই সময় শ্রীযুক্ত রামলাল-দাদা প্রভৃতি পুরোহিতগণ নারিকেলে পৈতা জড়াইয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া মহারাজা শ্রীঅজিত সিংকে পুষ্পমাল্য-সহ নারিকেল অর্পণ করিলেন। তিনিও নতমস্তকে উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। এমন সময় একটি সুন্দর গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। স্বামীজী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে তোর বাবা কোথায়?' বালক উত্তর করিল, 'কুঠীঘরের বৈঠকখানায় ব'সে আছেন।' —'তোর বাবা এল না কেন?' বালক নিরুত্তর রহিল। স্বামীজী ইহা বলিয়া মহারাজাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে আলমবাজার মঠের দিকে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম, বালকটি ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের পুত্র।

আমি এবং মাষ্টার মহাশয় যখন আলমবাজারে পৌঁছিলাম, তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করিতে ছিলেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সমবেত-কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে স্বামীজীর 'জয়গুরু, জয়গুরু' হুঙ্কারে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গে সকলের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আরতি শেষ হইলে স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং এবং সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরঘরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী—মহারাজ অজিত সিং ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠের লম্বা ঘরে উপবেশন করিলেন। আমি ও মাষ্টার মহাশয় তথায় উপবেশন করিলাম। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রীর মহারাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঠাকুরের কথা এবং স্বামীজীর শারীরিক অবস্থার আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামীজী সেই সময়ে প্রকাশ করিলেন, 'আমার তো ইচ্ছা ছিল, মহারাজার সঙ্গে বিলেত চলে যাই। জাহাজে সমুদ্রের বায়ুতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারে। সব বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে পরামর্শ নেওয়া হ'ল, কিন্তু কেউ আমার যাওয়া অনুমোদন করছে না। বরং তারা বলে, শীগ্‌গির আলমোড়া যেতে, কারণ বর্ষাকালে দারজিলিং-এর আবহাওয়া ভাল থাকে না।

অজিত সিং সকলের সম্মুখেই প্রকাশ করিলেন, 'আমার বিশ্বাস স্বামীজীর বর্তমান স্বাস্থ্য সমুদ্র-ভ্রমণে অনেকটা ভাল হবে। কিন্তু ডাক্তারদের কি অভিমত বুঝতে পারি না। যাই হোক আগামীকাল সাহেব-ডাক্তার যা বলবেন, তাই করা হবে।'

তারপর দু-একটি ভজন গান গাহিয়া স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে তাঁহার বাসভবনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রসাদ দেওয়া হইল। আমি ও মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে আলমবাজার মঠ হইতে বরানগর পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম।

পরদিন অপরাহ্ণে (বসুপাড়ায়) শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে পূজ্যপাদ যোগেন মহারাজের নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় বৃদ্ধ সাধু—দীনু মহারাজ আসিয়া যোগেন মহারাজকে বলিলেন, 'স্বামীজী একলা আসছেন।' কথা শেষ হইতে না হইতেই

স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে দেখিয়া আনন্দে বলিলেন, 'তুমি আসতে পেরেছ?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমার বিলেতে যাওয়া হ'ল না—ডাক্তারদের সকলেই অমত করলেন,—এমন কি শশী ও বিপিন ডাক্তার পর্যন্ত। তাঁদের পরামর্শ যে আমি আলমোড়াতে চলে যাই। তাই কাল দারজিলিং চলে যাচ্ছি। রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে ২।৪ দিনের মধ্যে ফিরে আসব। একবার মাকে প্রণাম ক'রে যাই।'

যোগেন মহারাজ গোলাপ-মাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'স্বামীজী এসেছেন, মা ঠাকরুনকে দর্শন করবেন।' এই কথার পর স্বামীজী মাকে দর্শন করিতে চলিলেন। আমরা দুই-একজন তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। তেতলায় শ্রীশ্রীমার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় স্বামীজী দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া খুব আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তোরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবি, মার পাদপদ্ম স্পর্শ করবি না। মা এত করুণাময়ী যে স্পর্শমাত্রই পাপ-তাপ গ্রহণ ক'রে নেন।'

এমন সময় গোলাপ-মা বলিলেন, 'নরেন, মা এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।' স্বামীজী অমনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, দ্বারসম্মুখে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া মাকে বলিলেন, 'মা, কাল আবার দারজিলিং যাচ্ছি।'

শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, 'দারজিলিং-এ কেমন ছিলে বাবা?'

স্বামীজী বলিলেন, 'মা, সেখানে খুব যত্নে ভাল ছিলাম। আমার তো মনে হয় শরীর খুব ভাল আছে। ওখানে মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁর স্ত্রী আমায় খুব যত্ন করছেন। আর এই গরমে দারজিলিং বেশ ঠাণ্ডা এবং বেড়াতে বেশ আনন্দ বোধ হয়। আমি বেশ বেড়াই এখন। ক্ষেত্রীর মহারাজা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে ব'লে আমাকে চিঠি লিখে ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এখানকার ডাক্তারেরা সকলেই বিলেত যেতে নিষেধ করলে। তারা বলেছে আলমোড়া নৈনিতালে যেতে। তাই শিগ্‌গির দারজিলিং থেকে আবার ফিরে আসব। মা, আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঠাকুরের যে কাজ আরম্ভ করেছি, সে কাজ শেষ করতে পারি।'

মা উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বাবা, ঠাকুর তোমায় দেখছেন। ঠাকুরের শক্তি তোমার ভিতর খেলা করছে। তাঁর কাজের জন্য তোমায় এনেছেন।'

স্বামীজী বলিলেন 'মা, ঠাকুর তো দেখছেন, তুমিও আমায় আশীর্বাদ কর, কৃপা কর। ঠাকুর ও তোমার কৃপাই আমার সম্বল।' 'জয় মা, জয় মা' বলিয়া স্বামীজী আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

গোলাপ-মা স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মা প্রসাদ দিলেন।' স্বামী যোগানন্দ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'এই প্রসাদ স্বামীজীর গাড়ীতে দাও।'

স্বামীজী নীচে চলিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ভাই যোগেন, চললাম। আবার তো আসছি। এই বার এসে কাজ শুরু ক'রে তারপর অন্যত্র গমন। কাজ শুরু না ক'রে আমি অন্যত্র যাব না। ডাক্তাররা যাই বলুক।'

আমরা সকলে স্বামীজীকে প্রণাম করিলাম। স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজার গাড়ী করিয়া চলিয়া গেলেন।

নবরাত্র

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

'নির্ণয়-সিন্ধু' গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট বলেছেন যে অপর-পক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণ সমান্তরাল হচ্ছে যে দেবীপক্ষ। সত্যিকার শ্রেষ্ঠ কল্প হচ্ছে সমস্ত পিতৃ-পক্ষ ধ'রে পিতৃপুরুষদের তর্পণাদি দানে প্রীত করা; অগত্যা পাঁচ দিন ক'রে তিনটি ভাগ ক'রে নিয়ে, উত্তরোত্তর তর্পণের সময়াদি বৃদ্ধি করা; বা শেষ পাঁচ দিন সমস্ত বিধান করা—এ সমস্ত সম্ভব না হ'লে, মহালয়ার প্রশস্ততম দিবসে অন্ততঃ প্রাণপণে পিতৃপুরুষের তর্পণ করা। কোন কারণে তাও যদি না সম্ভব হয়, তা হ'লে 'ষোড়শ শ্রাদ্ধ' বাদ দিয়ে দীপাবলী অমাবস্যায় পিতৃশ্রাদ্ধ করতে হয়। সেভাবে দেবীপক্ষের ১৫ দিনই দেবীর অর্চনা বিধেয়; অগত্যা পক্ষে ষষ্ঠীর বোধন থেকে দশম্যন্তে বিসর্জন পর্যন্ত পূজা ক'রে—লক্ষ্মীপূর্ণিমায় দেবীপক্ষের পারণ।

ফলতঃ—নবরাত্রের বিধানসমূহের প্রতি দৃক্‌পাত করলেই দেখা যাবে—'নব' সংখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আছে। এই 'নব' বা 'অষ্টাদশ'—এইগুলি পুণ্য সংখ্যা। যেমন মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব, অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-নাশ, ভগবদ্‌গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়—ইত্যাদি। সমভাবে নবরাত্রের সর্বত্রই 'নব' অর্থাৎ নয়ের উপর বিশেষ জোর আছে। নবরাত্রে নবপত্রিকায় নবমাতৃকার পূজা-সম্পাদন, নবকুমারীর পূজায় অন্তিম আত্ম-নিবেদন—এবং নবদ্বার রোধপূর্বক হংসাবাপ্তি।

'নবপত্রিকা'ই শাকম্ভরী, শতাক্ষী দুর্গা-মাতৃকার প্রতীক। নবপত্রিকায় দুর্গার আবাহন-মন্ত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না, :

ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে।
পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥

মৎস্যসূক্ত-তন্ত্রে নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গার সুন্দর ধ্যানমন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণতোষণী তন্ত্রের পঞ্চম পরিচ্ছেদও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। নবদুর্গার নাম অর্থাৎ রম্ভা, কচ্বী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান্য—এ প্রত্যেক পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গার নব মূর্তির নাম বিদ্যাপতি তাঁর 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে সুন্দরভাবে শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করেছেন :

ব্রহ্মাণী কদলীকাণ্ডে দাড়িমে **রক্তদন্তিকা**।
ধান্যে **লক্ষ্মী** হ'রিদ্রায়াং **দুর্গা** মানকপত্রকে॥
চামুণ্ডা কালিকা কচ্যাং **শিবা** বিল্বে প্রতিষ্ঠিতা।
অশোকে **শোকরহিতা** জয়ন্ত্যাং **কার্তিকী** স্মৃতা॥

অন্যদিকে প্রতিপদ্ তিথি থেকে আরম্ভ ক'রে যাঁরা নব-মাতৃকার পূজা করবেন, তাঁদের জন্যও নবমাতৃকার নাম নির্দিষ্ট রয়েছে, যথা—

কুমারিকা ত্রিমূর্তিশ্চ কল্যাণী রোহিণী তথা।
কালিকা চণ্ডিকা দেবী শাম্ভবী দুর্গিকাষ্টমী॥
সুভদ্রা নবমী পূজ্যা **নবরাত্রব্রতে** হিতা॥

এই নবরাত্র-ব্রত দিনে উদ্‌যাপনীয়, অথবা রাত্রে করণীয়—এই প্রশ্নের উত্তরে স্কন্দপুরাণ বলছেন :

'মাসি চাশ্বযুগে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ।
সংপূজ্য নবদুর্গাং চ নক্তং কুর্যাৎ সমাহিতঃ।
নবরাত্রাভিধং কর্ম নক্তব্রতম্ ইদং স্মৃতম্॥

এই পূজা রাত্রের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল—কারণ, সব পুরাণে তন্ত্রে যখন যখন ভক্ত বা ভগবদবতারদের নিকট জননী দেখা দিয়েছেন, রাত্রি-কালেই দেখা দিয়েছেন—এই দেখা যায়। তার ইতিহাস অতি-প্রপঞ্চিত। সংক্ষেপে এই টুকু বলা যায় যে, সংক্ষেপীকরণের মুখে 'ত্রি-রাত্রে' অহোরাত্রে—এই বিধান পরবর্তীকালে স্থান পেয়েছে। প্রয়োজন হ'লে কেবল জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে—একদিনেই দুর্গা-জননীর আরাধনা ক'রে ফলপ্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে—এই শাস্ত্রের বিধান।

নবরাত্রের এই সকল—প্রত্যেক রাত্রের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক, দেশ-বিদেশে নবরাত্রের উদ্-

যাপনের প্রণালী, একই দিবসত্রয়ে মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীর পূজার বিধান ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—এই গূঢ় তত্ত্বগুলি মায়ের পূজার অবসরে অবশ্য চিন্তনীয়। আজ শারদীয় পূজার প্রাক্কালে ভাববিহ্বল চিত্তে জননীকে এই বলেই স্তুতি নিবেদন করি :

যস্যেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
নানাবতার-কলনং কুরুতে হরিশ্চ।
নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শম্ভু-
স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ॥

অকিঞ্চন জীব মুক্তি তরে করে আকিঞ্চন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আজো আশা-নিরাশার জোয়ার-ভাঁটাতে চলে জীবনের নদী,
ধরণীর উৎস হ'তে উৎসারিত হ'য়ে।
ভেসে যায় সীমাহীন সিন্ধুপানে তীব্র গতি ল'য়ে
দুঃখসুখ লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু আলোছায়া স্রোতে নিরবধি।
আজো হায় নিরুদ্দেশে মানস বিহগশ্রেণী। প্রাণের আকাশে
ওঠে পক্ষ-বিধূনন; কোথা তারা বাঁধে নীড়—সেই প্রশ্ন আসে
যুগ হ'তে যুগান্তরে অন্তরের নিভৃত প্রদেশে:
করে শূন্যে প্রদক্ষিণ গ্রহ-তারা, শঙ্কা হয় কক্ষচ্যুত হ'তে পারে,
অসংখ্য নক্ষত্র মৃত। কি রহস্য কেবা জানে বিশ্ব-পারাবারে?
রহস্যের অধিনেতা! নয়ন নেপথ্যে রহি আনন্দে বিভোর,
রূপ হ'তে অরূপের রচিতেছ ঘর।
'কালের অদৃশ্য চক্রে' কেন্দ্র-স্রোত বহে নিরন্তর;
অকিঞ্চন জীব মুক্তি তরে করে আকিঞ্চন—আঁখিলোর
ঝরে নীল নভ-তলে। দৈবী করুণার তরে নিয়ত ব্যাকুল;
তাহারি মুছাতে অশ্রু এলে প্রভু কতবার, তবু সেই ভুল;
চিনিতে পারে না কেহ পরিপূর্ণভাবে। এখনো বিরলে বসি,
কেহ কেহ করে অনুতাপ।
দয়া দিয়ে ধৌত করি যত কিছু পাপ
তুমি এসে চলে যাও ভগবান্!
তুমি তো সে দিন এলে দীন ব্রাহ্মণের বেশে করিবারে ত্রাণ
কোটি কোটি অভাজনে,
তোমারে চিনিনি মোরা, করি নাই আত্ম-সমর্পণ
প্রতিদিন অর্চনার শুভ-সন্ধিক্ষণে,
তাই এবে বিশ্ব ব্যাপি মানুষের ধ্বনিল কি অশান্ত ক্রন্দন?

আবেদন

আসামের দুর্গত-সেবাকার্য : জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ক্যাম্প হইতে দুর্গতদের অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়ায় মিশনের সেবাকার্য সেখানে ১৭ই আগস্ট বন্ধ হইয়াছে। তার পর ২৮শে আগস্ট হইতে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে আসাম হইতে আগত নরনারীদের ভাত ডাল তরকারী খাওয়ানো হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে; ১লা সেপ্টেম্বর ১২১০ জনকে খাওয়াইতে হইয়াছে। শিলং-এর গভর্ণমেণ্ট ক্যাম্পে দুধ, কাপড়, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে।

উড়িষ্যায় বন্যাসেবাকার্য : বালেশ্বর জেলায় বাসুদেবপুরে ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে মিশন বন্যাসেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। আপাততঃ কাপড় এবং গবাদির খাদ্য বিতরণ করা হইতেছে।

আমরা এই সেবাকার্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট অর্থ-সাহায্যের আবেদন করিতেছি। সাহায্য—সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)—এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

৫. ৯. ৬০. স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ, সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য-বিবরণী

ফালাকাটায় ৩৫৪ পরিবারের ১৩৭৮ জনের মধ্যে ৪০০ ধুতি, ৪০০ শাড়ী, ৮৫৮ ছোটদের জামাকাপড়, ৩০ সতরঞ্চি, ২৬৫ হারিকেন লণ্ঠন, ২৩৮ বালতী, ২৫০ কড়াই, ২৪৪ হাতা, ২৪৪ খুন্তি, ২৫০ মগ, ২৫০ থালা, ২৪৬ বাটি, ২৫০ গ্লাস, চিঁড়া ৩৬ মণ, গুড় ৮ মণ বিতরণ করা হইয়াছে।

পরে আবার ৭৫ জোড়া ধুতি, ৭৫ জোড়া শাড়ী, ১০০ হারিকেন লণ্ঠন, ১০০ থালা, ১০০ বাটি পাঠানো হইয়াছে।

আলিপুর দুয়ারে স্টেশনে নিম্নলিখিত হারে লোক খাওয়ানো হইয়াছে।

২৮শে আগস্ট	৬০২	১লা সেপ্টেম্বর	১২১০
২৯শে	৬১২	২রা	১২৫৯
৩০শে	৭০৩		
৩১শে	৮২৫		

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী : রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সময়োপযোগী বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করা হয়। সাপ্তাহিক সভাগুলিতে বহুসংখ্যক ছাত্রও যোগদান করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-সমিতির উদ্যোগে বিবেকানন্দ-হলে প্রতি রবিবার সকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগসূত্রের পর বর্তমানে 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের আলোচনা চলিতেছে। তুলসী রামায়ণের হিন্দী আলোচনায় সারা বৎসরে ৩৩টি সভায় শ্রোতৃসংখ্যা ২৮,২৫০।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও জন্মোৎসবগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্বামীজীর উৎসবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১১,৫৯১ ; পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১১,৩৯১। পাঠাগারের পাঠক-সংখ্যা গড়ে দৈনিক ৬৮১। ১৪টি দৈনিক ও ১৩২টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আশ্রমের ফ্রি চিকিৎসালয়ে ৫২,০১১ (নূতন ১৩,৫২৭) রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা লাভ করে। আশ্রম-পরিচালিত কারোলবাগ যক্ষ্মা-ক্লিনিকে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১১৪,৬৫০ ; অন্তর্বিভাগে ৪৫৯ জন (স্ত্রীলোক ২২৩) রোগী পর্যবেক্ষণ করা হয়।

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় বেদান্ত

হলিউড : বেদান্ত-সোসাইটি : প্রধান কেন্দ্র ; কেন্দ্রাধ্যক্ষ : স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী : স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ।

রবিবাসরীয় বক্তৃতা : এপ্রিল : আশা, বিশ্বাস ও দান ; পুনরবতরণ ও অমরত্ব, যীশুর পুনরভ্যুত্থানের তাৎপর্য, সুখ ও মনোনিবেশ।

মে : ঈশ্বরের প্রয়োজন, বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন, মৌনাভ্যাস, মন ও অন্তঃকরণ।

জুন : আধ্যাত্মিক স্বরোদ্ঘাটন, কিরূপে ভক্ত হওয়া যায়, বিচার ও ন্যায়পরতা।

জুলাই : চরম আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে ? মানুষই দেবতা, মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, বিনয় ও অহঙ্কার, ধর্ম ও জনসেবা।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে মঙ্গলবারে ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে গীতার ক্লাস হয়।

সাণ্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে রবিবারের বক্তৃতা

এপ্রিল : কর্মজীবনে বেদান্ত, যুক্তি ও শ্রদ্ধা, অবতার ও অমরত্ব, প্রার্থনার ধারা।

মে : সুখ ও মনোনিবেশ, অন্তর্জীবন, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম, সরলতা ও আধ্যাত্মিকতা, নীরবতাই তোমার নাম।

জুন : প্রেমই ভয় জয় করে, আধ্যাত্মিক স্বরোদ্ঘাটন, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন।

জুলাই : কর্মযোগ, আধ্যাত্মিক অনুভূতির লক্ষণ, ভক্তিযোগ, অজ্ঞাত ও অধ্যাত্ম, ধ্যানযোগ।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

গ্রীস ও হল্যাণ্ডে বেদান্ত-প্রচার

গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দ বেদান্ত-বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়া বিমান-যোগে গ্রীসে গমন করেন ; এথেন্সে ২৫শে, ২৯শে ৩০শে এপ্রিল এবং ৬ই মে এই চারদিন নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দেন :

পাশ্চাত্যের নিকট ভারতীয় মনস্তত্ত্বের ও দর্শনের মূল্য, ধ্যানযোগ, চৈতন্য ও জীবাত্মা, বর্তমান মানব-মনে বেদান্তের আবেদন। প্রথম দুইটি বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা ৬০০ এবং ১০০০ এর উপর, শেষ দুটিতে প্রায় ৪০০ এবং ৬৫০ ; ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ গ্রীক ভাষায় মুদ্রিত করিয়া শ্রোতৃমধ্যে বিতরিত হয়।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বামী ঘনানন্দ জুরিখ হইয়া হল্যাণ্ডে যান। আর্নহেম শহরে তিনি ১৬ই মে 'ধ্যানের অভ্যাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, এবং ১৭ই মে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

শ্রীশ্রীমা সারদা (৩য় সংস্করণ) : স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯০, মূল্য ১৲। পুস্তকখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের বিশেষ আবশ্যকতা থাকায় বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দশটি ছোট ছোট অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি আলোচিত হইয়াছে। শেষ চার পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীমায়ের বাছা বাছা কয়েকটি কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান

১৯৫৯ খৃঃ সংবাদ প্রেস রেজিষ্ট্রারের বাৎসরিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভারতে সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং সেগুলির প্রচার-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৯ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকা-সহ মোট সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৭,৬৫১। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ খৃঃ এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৯৩২ এবং ৬,৯১৮।

পরিসংখ্যানে আরও জানা যায় যে, ১৯৫৯ খৃঃ সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১১·২ শতাংশ। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ খৃঃ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ·৯৯ এবং ৮·৮ শতাংশ। আলোচ্য বর্ষে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা ১৩·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৮ খৃঃ তুলনায় ১৯৫৯ খৃঃ নূতন কাগজের সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ১,৩০২টি নূতন কাগজ চালু হয়।

ভাষা-ভিত্তিক প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধির হার :

বাংলা	১০·৩	শতাংশ	মালয়ালাম	৯·৩	শতাংশ
ইংরেজী	৯·০	,,	গুজরাটী	৭·৭	,,
তামিল	১৮·৩	,,	ওড়িয়া	৭·৪	,,
মারাঠী	১৬·৩	,,	উর্দু	৬ ৯	,,
পাঞ্জাবী	১৫·৪	,,			
হিন্দী	১১·৮	,,	কানাড়া	৫·২	,,
তেলেগু	১০·৬	,,	অসমীয়া	২৬·৮	,,

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার হার বৃদ্ধি :

দৈনিক সংবাদপত্র	১৩·৭	শতাংশ
বাজার দর, আবহাওয়া প্রভৃতি	১০৫·৯	,,
সাপ্তাহিক পত্রিকা	১৩ ৮	,,
পাক্ষিক ,,	৯·৬	,,
মাসিক ,,	৭ ৭	,,
ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক	৬·৫	,,
বার্ষিক	৫·৩	,,

আলোচ্য বর্ষে দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ৫০,০০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া ৯টি ইংরেজী দৈনিক, দুইটি করিয়া হিন্দী তামিল ও মালয়ালাম এবং একটি মারাঠী দৈনিকের প্রচার-সংখ্যাও ৫০,০০০ এর অধিক হইয়াছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইংরেজী পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তাহার পরে ছিল হিন্দী ও তামিল পত্রিকার স্থান।

ভারতের জনসংখ্যা

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংস্থার হিবাবে জানা যায় ১৯৫১-৫৬ খৃঃ ভারতে হাজার-করা মৃত্যুর হার ছিল ২৫·৯। আশা করা যায়, ১৯৫৬-৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া হাজার-করা ২১·৬ দাঁড়াইবে এবং ১৯৭১-৭৬ খৃঃ হইবে ১২·৬। ভারতে জন্মের হার হাজার করা ৪০ হইতে ৪২ এর মধ্যে উঠা নামা করে।

গত দশ বৎসরের জনসংখ্যা-গণনায় দেখা যায় যে, ভারতে মৃত্যুর হার বেশ কমের দিকে, এবং জন্মের হার অত্যন্ত মন্থরগতিতে হ্রাস পাইতেছে।

১৯৫১ খৃঃ হইতে ভারতের লোকসংখ্যা বৎসরে ৫০ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইবে ধরা হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বৎসরে ৮০ লক্ষ। বর্তমান হারে হিসাব করিলে ১৯৭৬ খৃঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা ২০ কোটি ৬০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়।

ভ্রম-সংশোধন : ভাদ্র মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত (৪০০ পৃষ্ঠায়) 'কৃষ্ণাষ্টমী' কবিতার লেখকের নাম পড়িবেন : শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

সর্বরূপা মা

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহো গন্ধবাহস্ত্বমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্বিকাহংকৃতিশ্চ।
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥

[শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত অপরাধভঞ্জনস্তোত্র—১৪।১৫]

হে মাতঃ! তুমিই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—পঞ্চভূতাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ; আবার তুমিই মন, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অন্তর্জগৎ; চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তুমি, তুমিই জগতের মূল উপাদান প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি; আবার তুমিই আত্মা, পুরুষ বা চৈতন্য, তুমিই পরম তত্ত্ব; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সর্বদা আত্মস্বরূপে প্রকাশিতা বিকশিতদশনা অভীষ্ট-রূপধারিণী করালিনী হে মাতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

তুমিই কালী, তারা, পার্বতী, ষোড়শী, ভৈরবী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, লক্ষ্মী, শিবানী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, মঙ্গলা ও হিঙ্গুলা। সুন্দর মধুর, আবার ভয়ঙ্কর ও রুদ্র দশমহাবিদ্যা মহামায়ার মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ; সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী বিকশিতদশনা তুমি অনাবৃত সত্তা; সর্বজীবের সর্বকামনাপূরণকারিণী করালিনী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

শান্তির জন্যই শক্তির সাধনা

'শান্তি' কথাটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত মন শান্ত হইয়া আসে। কথাটির মধ্যে অফুরন্ত শক্তি রহিয়াছে! পূজার শেষে শান্তি-জল প্রদানের বিধি, শান্তি-মন্ত্র সাধকের প্রাণে আরাধ্য দেবতার অদর্শন-জনিত বিয়োগ-ব্যথা দূর করিয়া এক দিব্য সান্নিধ্যের অনুভূতি আনিয়া দেয়। উপনিষদ-পাঠের আদিতে শান্তি পাঠের বিধি,—সাধকের দেহেন্দ্রিয় সংযত করিয়া উহা তাহাকে রহস্য-বিদ্যা শ্রবণের অধিকারী করে, অন্তে উহাই আবার মননের সহায়ক।

শান্তি-মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে আমরা বুঝি—বাহিরের শান্তি নির্ভর করিতেছে অন্তরের শান্তির উপর। যুদ্ধের শেষে, সংগ্রামের শেষে শান্তি বিজয়োৎসব। দিব্য শুভশক্তি সহায়েই অশুভ শক্তি নির্জিত হয়। অন্যায় দূরীভূত হইলে যখন ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরাজিতা অপরাজেয়া মহাশক্তির বিজয়োৎসব এই বিজয়া! অসুর-নিধনের পর ত্রিভুবনে শান্তি ফিরিয়া আসিলে বিশ্বমাতৃরূপা বিজয়িনী মহাশক্তিকে ঘিরিয়া দেবতাগণ এই বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। রাবণ-নিধনের পর লঙ্কাকাণ্ড শান্ত হইলে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সীতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিতা হইলে যে উৎসব হয়, তাহাই এখনও 'বিজয়া' নামে প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘ সংগ্রাম-শেষে সাফল্য-মণ্ডিত বিজয়ী দলের আনন্দ-উৎসব নূতন এক শান্তি-যুগের সূচনা করে। বিজয়া ও শান্তি তাই প্রায় সমার্থক। বিরুদ্ধ-শক্তি বিজিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি অসম্ভব। শক্তিমান্ বিপক্ষকে পরাজিত করিতে হইলে অবশ্যই অধিকতর শক্তি প্রয়োজন—সে শক্তি শরীরের হউক বা মনের হউক, অস্ত্রশস্ত্রের হউক বা বুদ্ধিকৌশলের হউক! সাধনা ব্যতীত কোন শক্তিই আয়ত্ত হয় না। শান্তির জন্যই তাই শক্তির সাধনা!

সমাজ-সংসার এমনই নিয়মে সৃষ্ট যে এখানে সর্বদা দুই বিপরীত শক্তি খেলা করিতেছে, তাহাদেরই আঘাতে ও সংঘাতে সমাজ-সংসার ভাঙিতেছে, গড়িতেছে। তাই যদি কেহ মনে করেন, একদিন এই সংগ্রাম দূরীভূত হইয়া সর্বত্র এক অনন্ত শান্তি বিরাজ করিবে, সকল বৈষম্য দূরীভূত হইয়া অপূর্ব সাম্যে সব একাকার হইয়া যাইবে, তবে তাহা ভ্রান্ত ধারণা; সে শান্তি শ্মশানেও নাই, সে সাম্য কবরেও নাই। সৃষ্টিস্থিতিলয় পর্যায়ক্রমে আসিয়া থাকে দিবারাত্রির মতো, ঋতু-পরিবর্তনের মতো। কালবৈশাখীর পূর্বে বাতাস স্তম্ভিত, পরে প্রকৃতি শান্ত। সর্বত্রই এই নিয়ম, বাহ্য প্রকৃতিতে—অন্তঃপ্রকৃতিতে, ব্যষ্টিগত ব্যক্তি-জীবনে—সমষ্টিগত সমাজ-জীবনে।

বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় ঝড়ের মতো; পূর্বে স্তব্ধভাব, পরে শান্তভাব। কিছু দিন পরে আবার চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি। তাই বলিতে হয়, শান্তি—সংগ্রামের শেষে নয়, সংগ্রামের মাঝে মাঝে। শান্তি জীবনেও নয়, মরণেও নয়, উভয়-ভাবের মাঝে। শান্তির স্বরূপ অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া, বলিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া স্বামীজী কত ভাবে ইহাকে

ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার ঔপনিষদ বেদনাময় 'Peace' কবিতায়:

It is lull between two storms,
Between two fits of passion
It is the calm of heart.

তাই বলিতেছিলাম—শান্তি সংগ্রামের শেষে নয়, সংগ্রাম-মুখর জীবনেই মাঝে মাঝে মানুষ শান্তির অস্পষ্ট আভাস পায়। এই আভাসই তাহাকে উন্নততর স্তরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; সেখানে আবার অপ্রাপ্তির অশান্তি, আবার শুরু হয় বাধা জয় করিবার সাধনা, নূতনতর সংগ্রাম; উন্নততর শক্তির সহায়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির পর আবার কিছু দিনের শান্তি। এই ভাবেই আগাইয়া চলে মানুষের জীবন—মানুষের এই সংগ্রাম ও সাধনা প্রতিফলিত তাহার জীবনের আন্তর ও বাহ্য সকল প্রচেষ্টায়—ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সমাজে, রাষ্ট্রে!

*　　*　　*

বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র অশান্তি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে শান্তি স্থাপনের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা নিষ্ফল হইলেও ইহা স্পষ্ট যে বিবদমান কোন পক্ষই ব্যাপক যুদ্ধ চাহিতেছে না। উভয় পক্ষই স্থায়ী শান্তির জন্য ব্যাকুল। ইহার প্রধান কারণ উন্নততর মারণাস্ত্র উভয় পক্ষেরই হাতে রহিয়াছে, যুদ্ধ বাধিলে কে উহা কিভাবে ব্যবহার করিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই! যে কোন এক পক্ষ উহা ব্যবহার করিলে উভয় পক্ষই নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধ মানুষকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়াছে। উভয় শিবিরের মানুষই বুঝিয়াছে, উলু-খাগড়ার বন বিনষ্ট করিবার জন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ করিবার দিন অতীত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে পৃথিবী-ব্যাপী সকল মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার কোন উপায় রাজনীতিক নেতাদের চোখে পড়িতেছে না। তাঁহারা জাতীয় জীবনের কক্ষ হইতে আন্তর্জাতিক আঙিনায় মিলিত হইতেছেন বটে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের সহিত বিশ্বস্বার্থের সামঞ্জস্য কিভাবে রক্ষিত হইতে পারে, তাহার কোন উপায় তাঁহাদের কাহারও চোখে ধরা পড়িতেছে না! বঙ্গ-সমস্যার সমাধান করিতে পারি না, কঙ্গো-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আমরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ইহা এক প্রহেলিকা! যে দৃঢ় ভাবে নিজের ভূমির উপর দাঁড়াইতে পারে, সেই অপরকে পথচলায় সাহায্য করিতে পারে।

কোন সমস্যার সমাধান যখন এক স্তরে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে তখন দেখা যায় —তাহার সমাধান সম্ভব অন্য স্তরে। গণিতের একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তিনটি বিন্দুকে সমদূরে স্থাপন করা সহজ, কিন্তু যখন চারিটি বিন্দুকে সমদূরে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হয়, তখন প্রথমত প্রায় সকলেই বলিয়া উঠে—ইহা অসম্ভব। আমরা যে ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, সে-ভাবে অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্রে উহা সম্ভব নয়। তখন সূক্ষ্ম দৃষ্টি তিনটি বিন্দু সমতলে সমদূরে স্থাপন করিয়া ঊর্ধ্বস্তরে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে (পিরামিডের শীর্ষে) চতুর্থ বিন্দুটি স্থাপন করিয়া সমস্যার সমাধান করে।

বর্তমান বিশ্ব-সমস্যার সমাধান মনে হয়, জাতীয়তার স্তরে তো নয়ই, আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও সম্ভব হইবে না; অথচ মনে হয় ঊর্ধ্বতর এবং গভীরতর মানবিকতার স্তরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় সমস্যারই সমাধান সম্ভব। জনৈক সাধক বলিয়াছেন, 'দেশ-বিদেশ থাকিলে দ্বেষ-বিদ্বেষও থাকিবে।' এই

উভয়ের ঊর্ধ্বে উঠিতে হইলে গভীর একত্ববোধের প্রয়োজন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে আদর্শগত পার্থক্যের অন্তরালে—সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তা প্রভৃতি বাহ্য বিভিন্নতার অলক্ষ্যে মানুষের মূলগত যে একত্ব রহিয়াছে, তাহাকেই আজ সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

আজ আমরা জানি না, মনের কতখানি উৎকর্ষের ফলে মানুষ এই উদার সত্য ধরিতে পারিয়া গাহিয়া উঠিয়াছিল :

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

—মহেশ্বর আমাদের পিতা, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারিণী মহাশক্তি আমাদের সকলের জননী, ত্রিভুবন আমাদের স্বদেশ—এই বোধ হইলে তবেই আমরা বুঝিব কল্যাণকামী সকল মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু; এবং এই বোধের উপরই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কারণ এই বোধ-লব্ধ শক্তির দ্বারাই অকল্যাণকর অশুভ শক্তি পরাভূত হইবে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই শান্তি সামরিক বা রাজনীতিক উপায়ে লব্ধ হইবার নহে। ইহার আবেদন মানসিক স্তরে! যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য, অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিবার জন্য মানসিক শক্তিরই অন্যতম বিকাশ, নিম্নতর বিকাশ বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন; উহা ব্যবহার করিবার জন্য শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন। দেখা যায়, ঐ শক্তির অনুশীলন করিবার জন্য ও রাজনীতিক কূটকৌশল সফল করিবার জন্য যথেষ্ট মানসিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু দুই বিপরীত শক্তির অনুশীলন শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ সংগ্রামে পর্যবসিত হয়; একজনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সাময়িক ভাবে পরাজিত করাই তাহার লক্ষ্য। শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরাজিত পক্ষ বিজেতাকে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সাম্য বা শান্তির জন্য প্রয়োজন আর একটি তৃতীয় শক্তি; এই তৃতীয় শক্তি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য, অল্প মনে হইলেও প্রভূত, প্রয়োজন-মত বর্ধিত হইয়া এই শক্তি দুই সংগ্রামশীল বিপরীত শক্তির মধ্যে সাম্য স্থাপন করে, শান্তি স্থাপন করে। সাম্যের জন্য, স্থায়ী শান্তির জন্য মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ অধ্যাত্ম শক্তির সাধনা আজ একান্ত প্রয়োজন। ইহারই সহায়ে মানুষ তাহার পাশবিক ও আসুরিক প্রবৃত্তি দ্বেষহিংসা প্রভৃতি জয় করিয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকশিত করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যান্য শক্তির সাধনা মানুষের ভোগপ্রবণ স্বার্থবুদ্ধি বর্ধিত করিতে সাহায্য করে মাত্র!

মনকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, মনকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার প্রকৃত জীবন, মনকে সুপরিচালিত করিয়া, মনের গতিকে নদীর গতির মতো সুবাহিত করিয়াই আমরা তাহার দুর্বার গতি-জনিত বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; নদীকে সুশিক্ষিত করিয়া ফসল ফলানোর মতো মনের ক্ষেত্রেও কৃষ্টির ফসল তুলিতে পারি। অন্তরে বাহিরে যে প্রচণ্ড শক্তি রহিয়াছে, যাহার হাতে মানুষ ক্রীড়নক-মাত্র, তাহাকে বশীভূত করিয়াই মানুষ জগৎ ও জীবন ঠিক ঠিক ভোগ করিতে পারে, নতুবা জীবন দুর্ভোগ, জগৎ অশান্তির নরককুণ্ড!

জড়বিজ্ঞান-সহায়ে জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বাহিরের বহুতর শক্তিকে নানাভাবে সংযত শৃঙ্খলিত করিয়া মানুষ পৃথিবীকে একভাবে ভোগ করিতেছে সত্য, কিন্তু স্বার্থের দ্বন্দ্বে তাহা অশান্তিপূর্ণ দুর্ভোগেই পরিণত হইতেছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান সহায়ে যখন মানুষ মনের সূক্ষ্ম শক্তিকে সংযত করিয়া ভোগ করিতে শিখিবে, তখনই ব্যাপক শান্তি দেখা দিবে ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে। এই শান্তি আনিতে গেলে প্রয়োজন দেহ-মনের অতীত, অথচ দেহ-মনের অভ্যন্তরে অধ্যাত্ম শক্তির সাধনা।

জগজ্জননী

স্বামী বিবেকানন্দ

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা ব'লে পূজা ক'রে থাকেন—কারণ, মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়,—এর দ্বারা কখন ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের—রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে বামাচার বা বামমার্গ বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হ'য়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি হয়; আর যে জাতি এই সাধন করে, সেই জাতি একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ, আর পিতৃভাব থেকে মাতৃভাব ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হ'য়ে থাকে। মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে। শিশু আপনার মাকে সর্বশক্তিমতী মনে ক'রে থাকে: মা সব করতে পারে! সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না ক'রে আমরা কখনও নিজেদের জানতে পারি না।

সর্বশক্তিমত্তা সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার মষ্টিস্বরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই জগন্মাতা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতরে রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমরা যা ইচ্ছা করি, তাই করতে পারি। তিনি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম ও রূপ দুই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধ সত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীর বিশেষের সমুদয় কোষগুলি (cells) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর; আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা 'মা' বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্তস্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই 'ঈশ্বর, জীব ও জগৎ' এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা —যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক; এইটিই বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খৃষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি শুদ্ধ ভালবাসা চাও, পরম জ্ঞান চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

[১৮৯৫ খৃঃ, ২রা জুলাই Thousand Island Park-এ প্রদত্ত Inspired Talks (দেব-বাণী) হইতে সংকলিত]

চলার পথে

'যাত্রী'

বছর দু'এক আগেকার কথা। আমরা চারজন যাত্রী পথপ্রদর্শক দলীপকে নিয়ে 'গোমুখ' গিয়েছিলাম। 'গঙ্গোত্রী' থেকে 'গোমুখ'—দূরত্ব এমন কিছু নয়। তবে ঐ দুর্গম গিরিবর্ত্মে, পথের রেখাহীন বরফ ও উপলখণ্ডের উপর, শিশুর প্রথম চলতে শেখার ভঙ্গীতে টলতে টলতে, যাতায়াতের চৌত্রিশ মাইল পথটুকুকেই দীর্ঘতর ব'লে মনে হয়। এই জনপদহীন নির্জন পথে বিপত্তিও আছে অনেক। তবুও মন বাধা মানে না—মনের মায়াবী ঘোড়াটা আমাদের ক্লান্ত দেহটাকে কি এক যাদুকরী শক্তিতে ভুলিয়ে ঐ দুর্লঙ্ঘ্যকে একদিন সত্যসত্যই পার ক'রে নিয়ে গেল।

আমরা গোমুখের দিকে চলেছি। দু-পাশে বরফঢাকা পাহাড়—এমন কিছু উঁচু নয়। পায়ের নীচেও অনেক জায়গায় বরফ জমেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে কোথাও রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ নেই; নেই কোন বিশাল বন্যপাদপের অনিচ্ছুক আলোড়ন। কেবল একপাশে, অনাদিকালের রসনির্ঝরিণী পূতসলিলা গঙ্গা সাগরাভিমুখে বয়ে চলেছেন। কবে যে মহাদেবের জটা থেকে বেরিয়েছিলেন এই জাহ্নবী—কে জানে? কিন্তু আজও তাঁর সেই চলার গতির দুর্বার আবেগ প্রশমিত হ'ল না। আজও তাঁর তেমনি চপল, চটুল, উতলা ভঙ্গী—তেমনি শব্দায়িত উচ্ছল বেগ। মনে হয় 'চরৈবেতি'-মন্ত্র-সাধনার তন্ময়তা আজও তাঁর জীবনে সেই প্রথম নেবে-আসা-দিনটির মতই অটুট প্রতিজ্ঞায় একই রকম থেকে গেল।

বেলা দুটোর সময় গঙ্গোত্রী থেকে বেরিয়েছিলাম। আষাঢ়ের সূর্য তখনও মাথার উপর উজ্জ্বল। খানিক এগিয়েই এক জনকোলাহলশূন্যস্থানে এসে পড়লাম। নিস্তব্ধতার সে কি মহান্ রূপ! এত বড় জনহীন শূন্যতা জীবনে আর কোথাও দেখিনি। চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। একটু পরেই অস্তগামী সূর্যের বিলম্বিত রঙ তুহিনমণ্ডিত পর্বত-তরঙ্গের গায়ে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি ক'রল। আমরা তখন পথের মাঝে 'চীর-বাসা'য় পৌঁছে গেছি। 'চীর-বাসা' একটা বসতি নয়, কেবল একটি পাথরের বাড়ি। উপরটা কাঠের মোটা তক্তা দিয়ে ঢাকা। একজন পাঞ্জাবী 'নাগা' সাধু তখন ছিলেন ওখানে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেশ 'তেজী' চা খাওয়া'লেন। আগুনের পাশে বসে শুনলাম তাঁর কাছে গোমুখের অনেক কথা। বললেন—দলীপ সঙ্গে আছে, তাই ভয় নেই। এ-ধারের উঁচু পাহাড় পেরিয়ে বিখ্যাত তেনজিং-এর সঙ্গে ও এ-সব দিকে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে—তাই এ-দিকের সবটাই ওর নখদর্পণে। দলীপ না থাকলে অন্য কেউ হয়তো কিছু দূরে, উত্তরের বরফ থেকে বেরিয়ে-আসা একটা বড় স্রোতস্বিনীর ধারাকেই 'গোমুখ' ব'লে দেখিয়ে দিত; এই ভাবে 'নকল' গোমুখও অনেকেই দেখে ফিরেছেন। আপনারা ঐ নকল গোমুখকে ডাইনে রেখে, আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলেই 'আসল' গোমুখ দেখতে পাবেন।

'চীর-বাসা'য় রাত্রি কাটাচ্ছি। বেশ জ্যোৎস্না-রাত। কেমন বাধাহীন আলোকময় আকাশ। চাঁদের আলোর দ্যুতি বরফের গায়ে লেগে জায়গাটাকে আরো রহস্যময় ক'রে তুলেছে।

মধ্যাহ্নের স্পষ্ট আলোকে যার ছিল এক রূপ, এই বিজন রাতে তারই হয়েছে রূপান্তর। ওধারে শীতের হাওয়া আর একটু তীব্র হ'য়ে উঠল। হৃদয়ের মধ্যে তখন নতুন মাধুর্য কেমন এক শান্ত পরিপূর্ণতায় ভরা। হিমালয় যে কি অপূর্ব সুন্দর, তা আর কখনও এমন গভীর ভাবে বুঝিনি!

ভোর হবার অনেক আগেই উঠে পড়েছি আমরা। সেই জ্যোৎস্না-হসিত রাতের শেষে ওখান থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখে পা চালিয়ে দেওয়া গেল। দূরের আবছায়া পাথরের বড় বড় টুকরোগুলো নিঃশব্দে আমাদের চারপাশে এসে ভিড় জমায়। গঙ্গার কল-কলোচ্ছ্বাস দূর থেকে ভেসে আসে। আমরা এগিয়ে চলি। মনের মাঝে এক অজানা উল্লাস থেকে থেকে উথলে ওঠে—একটা অস্পষ্ট আকুলতাও মনটাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

তখনও সম্পূর্ণ আলোক জাগেনি। কেবল পূর্বদিকটা গাঢ় অন্ধকার থেকে একটু মুক্তি পেয়েছে মাত্র। পথে হঠাৎ দলীপ থমকে দাঁড়ায়; তার ঠিক পেছনে আমি, আমার পেছনে অন্যেরা। দলীপের আঙুলের নির্দেশাভিমুখী হয়ে ওকি দেখলাম! আমাদের হাত দশেক দূরেই হিমালয়ের বিরাট লাল ভালুক! ঐ নিষ্ঠুর আগন্তুকের মরণঘাতী প্রতীক্ষায় আমরা সকলেই তখন নীরব। তার পর, কি জানি কেন, ভালুকটা আমাদের ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠে গিয়ে আবার একবার ঘুরে কিছুক্ষণ আমাদের দেখে নিল। মনে হয়, তার গায়ের গৈরিক রঙ আমাদের পরণের গেরুয়ার সঙ্গে মিলে যাওয়াতেই এ-যাত্রা সে আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল। তা না হ'লে ঐ ভীষণ হিংস্র ভালুক এ-ভাবে তার শিকার ছেড়ে যেত না—অন্ততঃ দলীপের মত তাই। সেদিনের ঐ রোমাঞ্চকর উষাটিকে জীবনে ভুলতে পারব না। আমাদের জীবনে গতানুগতিকতার মধ্যে ঐ বৈচিত্র্যের পরশে চোখ দুটি আজও স্বপ্ন দেখছে। দূরে ঐ তুষার-ঢাকা প্রান্তরের কয়েকটি পত্রহীন ভূর্জপত্রের গাছ—আজও বোধ হয় আমাদের সে অভিজ্ঞতা ভোলেনি।

আরো এগিয়ে চললাম। নির্জন তুষারময় সুখসুপ্ত প্রান্তরে সূর্য উঠল। এই ঠাণ্ডার রাজত্বে সূর্যালোকে কেমন এক মমতা জড়ানো। রবিস্পর্শে কুয়াশার শেষ রেখাটির কোন চিহ্নও আর দিক্-প্রান্তে রইল না। মাথার উপর ঘন নীল আনন্দের আকাশ তখন অবারিত। দূরে তুহিন-শৃঙ্গে রঙের সমারোহ তখনও কিন্তু শেষ হয়নি। আমরা তখন 'নকল' গোমুখকে ডাইনে ফেলে এগিয়ে চলেছি 'আসল' গোমুখের দর্শনাশায়।

আবার খরস্রোতা গঙ্গার সুমুখে এসে পড়লাম। নদীর ফেনিল জল রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করছে। সুন্দর শুভ্র ফেনময় দুগ্ধস্রোতের কেমন এক দুর্বার গতি। নদীর এই প্রসন্ন প্রাণধারার স্পন্দন একমাত্র আপন অন্তরেই অনুভব করা চলে। এমন সময়ে সুমুখে গোমুখ চোখে পড়ল। সমস্ত অন্তরটা তখন এক আবেগময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরপুর। দেখলাম—উত্তরে—আমাদের ১০।১৫ হাত সুমুখেই, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী, সত্তর-আশি ফুট উচ্চ হিমবাহের ভীষণ চাপে ঐ বিরাট তুষার প্রাচীরের নীচেকার বরফ কিছুটা গলে গিয়ে একটি ১৫।১৬ ফুট উঁচু খিলানের মত গহ্বর সৃষ্টি করেছে। আর সেই গহ্বর থেকেই সূর্যহসিত 'খড়ি' গোলা জলোচ্ছ্বাস দুর্জয় গতিতে বেরিয়ে আসছে;—প্রমত্তা গঙ্গার সে কি ভয়াবহ গর্জন ও মাতন! মনে পড়ল—'ভয়ানাং ভয়ং; ভীষণং ভীষণানাং; গতিঃ প্রাণিনাং, পাবনং পাবনানাম্'। এই অপূর্ব দৃশ্য সেদিন আমাদের মনে কেমন এক নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। মন ও ইন্দ্রিয়গুলি তখন অন্তর্মুখী—বহির্জগৎ তখন অস্পষ্ট

ছায়াময়। মনের এ অবস্থায় সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা শক্ত; শুধু এক গভীর প্রশান্তিতে তখন আমরা এক অমৃতাস্বাদনে ব্যাপৃত। মনে হয়, ঐ স্তব্ধ মহান্ মুহূর্তে কথা বললেও ঐ দৃশ্যের ধ্যান ভেঙে যেতে পারত। দৈনন্দিন পৃথিবীর বাস্তবতা ছাড়িয়ে, এমন কি নিজেদের জৈব সত্তা ভুলেও তখন এক অথৈ অজানায় আমরা সকলেই হৃদয় মেলেছি।

কিছুক্ষণ সেই মাধুর্যের পরিবেশের মধ্যে কাটিয়ে আমরা ফিরলাম। ফিরলাম জীবনের এক মধুরতম আনন্দের পরিবেশ থেকে। ফিরবার পথে ঘণ্টাখানেক 'চীর-বাসা'য় কাটিয়ে আমরা সেই দিনই সন্ধ্যায় গঙ্গোত্রীতে চলে এলাম। মনে তখনও ভাসছে গোমুখের ছবি। সব ছেড়ে চললাম। পেছনে রইল পর্বত-তরঙ্গের সুবিস্তীর্ণ উচ্চ প্রান্তর, আর সুরভিত স্মৃতির স্বপ্নালু সম্বল। শুনেছি—স্মৃতি কথক নয়, সে চিত্রশিল্পী; তাই সে চির-প্রবহমান জীবনের একটি অপূর্ব অমৃতময় দৃশ্যকে মনের মণি-কোঠায় আঁকড়ে রেখেছে—দেহ-মনকে এক অপূর্ব সুধারসে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে।

চল পথিক, গোমুখে চল। গঙ্গার উৎসমুখের চিরন্তন 'হর হর বোম্' শুনবে চল। দেখবে চল, সেই আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যকে—যেখানে পৃথিবীর লৌহ-কারাগার নেই, নেই হৃদয়ের ক্লেদ-কালিমাও। অপূর্ব আনন্দালোকে যেখানকার সব কিছুই উদ্ভাসিত; চল, চল সেই আলোক-জীবনে। আর দেরী নয়, শীঘ্র চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বিজয়া-প্রণতি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

মা তো আমার যায় নি চ'লে,
ভরা সকল ঠাঁই!
জীবন-মাঝে জীবন সে যে—
মা মোর কোথা নাই!

আসা-যাওয়া এ শুধু ছল,
এ যে অভিনয়,
দিশি দিশি দিবা নিশি
ঝরে বরাভয়!

শরণ দিতে অশরণে
মায়ের চরণ-তল
রাঙিয়ে দেছে বুকে বুকে
প্রাণের শতদল!

সবার কাছে আজ বিজয়া—
মাকে আমার পাই,
সবার পায়ে তাই পাঠানু
প্রাণের প্রণাম তাই!

স্বামীজীর স্মৃতি

[শ্রাবণ সংখ্যার পর]

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়া

স্বামীজী আমাকে বলিলেন, 'আমার কাছে যা জানতে ইচ্ছে করিস্, আমাকে জিগ্যেস্ কর।' আমি বলিলাম, 'ইংলণ্ডে আপনি 'মায়া' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা অনেক বার পড়েছি; কিন্তু মায়া কি বুঝতে পারিনি।' 'কিসে পড়লি?' 'Indian Mirror এ।'

'দেখ্! মায়া কি তা বোঝা এক, আর মায়া অনুভব করা আর এক রকম।' আমি বলিলাম, 'আপনার কাছে মায়ার রহস্যের কথা বুঝতে চাই।' কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ও থাক! অন্য কিছু জানতে চাস্ তো বল্।' আমি বলিলাম, 'আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বোঝালেও যদি মায়া কি, না বুঝতে পারি, তাহলে জানব এ জন্মে ও রহস্য আর বোঝা হবে না।'

অতঃপর স্বামীজী মায়ার তাৎপর্য বুঝাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ তিনি অনর্গল যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা লিখিতে পারিলে একটি বহুমূল্য প্রবন্ধ হইত। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয়-রাজ্য ছাড়াইয়া এক অতি সূক্ষ্ম সত্তা অনুভব করিল। আমার চোখের সামনে ঘরবাড়ী সবই প্রবলবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত দৃশ্য জগৎ এক মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। পুনরায় এই জগতে মন ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু একটা স্বপ্নের ঘোর যেন লাগিয়া রহিল।

এই অনুভূতির পরক্ষণেই আমার ব্যক্তিত্বেরও যেন পরিবর্তন অনুভব করিলাম। স্বামীজীর প্রতি আমার যে ভয় ও সঙ্কোচ ছিল, তাহাও যেন কাটিয়া গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হইতেছিল—এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা সর্বত্র বর্তমান। স্বামীজী, এই মঠ প্রভৃতি এবং আমি—সব যেন তাহার মধ্যে এক অংশ।

তখন আমি বলিলাম, 'স্বামীজী! আপনিও তো মায়ার মধ্যেই রয়েছেন। আপনার মঠ, স্কুল, দরিদ্রসেবা—এ সবও তো মায়া। আপনার এ সব করবার কি দরকার?'

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ! তুই ঠিক বলেছিস্। আমি মায়ার মধ্যেই রয়েছি। তবে আমি মায়ার সঙ্গে খেলা করছি। যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে—এই খেলা ছেড়ে দেব। তোর মায়ার সঙ্গে খেলা ভাল না লাগে, তুই পাহাড়ে চলে যা। সেখানে কোন গুহায় বসে তপস্যা করগে।'

কর্ম করবার মূলসূত্রটি সেদিন বুঝিতে পারিলাম। 'ভগবানকে জেনে কর্ম করলে সেটা হয় লীলা—সেটা হয় আনন্দের জীবন। যতক্ষণ সত্য বস্তু জানা নেই, ততক্ষণ মানুষের তপস্যা ও ত্যাগ সহায়ে বিচার ও ধ্যান প্রয়োজন।'

স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম এবং তিনিও স্থির অবিচল শিবস্বরূপ হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

প্রসাদ

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হইয়া গিয়াছিল। আসন ও পাতা করা হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজীর আসার অপেক্ষায় সকলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার সকলে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজী ভাণ্ডার-ঘরের দিকে যাইয়া একটি আপেল ও একটি ছুরি চাহিয়া লইলেন। আপেলটি নিজেই ছাড়াইতে লাগিলেন এবং বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে এক টুকরা কাটিয়া আমাকে দিলেন। পরে এক টুকরা নিজের মুখে দিলেন। এইরূপে আমি তাঁহার হাতে প্রথম প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ যে মনের প্রসন্নতার প্রকাশ তাহা সেদিন বুঝিলাম। যে তত্ত্ববস্তু অতি গূঢ় রহস্যাবৃত, তাহা আধিকারিক পুরুষেরা ইচ্ছামাত্র এই ফলের মতই বিলাইতে সক্ষম, আবার তাঁহাদের প্রেম ও আশীর্বাদ এই স্থূল অন্ন হইয়া আমাদের চিত্তপ্রসাদ আনিতে পারে, তাহাও পরম সত্য বলিয়া বুঝিলাম।

ফলপ্রসাদ পাইলাম, ইচ্ছাময় যেন মনের ইচ্ছাটাই পূর্ণ করিলেন। তখন লোভ আরও বাড়িয়া গেল; মনে হইল যদি স্বামীজী অন্নপ্রসাদ দিতেন, তাহা হইলে জীবন সার্থক হইত।

পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সময় স্বামীজী যেখানে বসিয়া ছিলেন, তাহারই অন্য আর এক দিকে— কিছু দূরে আমি ছিলাম। ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ স্বামীজীর পাতে দেওয়া হইল এবং পরে অন্য সকলের পাতায় একজন ব্রহ্মচারী তাহা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অন্য আর এক জন ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া স্বামীজী তাহার হাতে তাঁহার পাত হইতে কিছু অন্ন তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'এটা মন্মথকে দিয়ে আয়।' ঠাকুরের লীলাসহচরগণ অন্তর্যামী, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইলাম।

বিচারপ্রবণ মনের স্বভাব হইল সংশয়। ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবৎ-আশীর্বাদ সহজেই পাইয়া থাকেন। আমার মন ভাবপ্রবণ ছিল না, এইজন্য সংশয় তোলাই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু সেই প্রসাদের গুণে আমার সংশয়ধর্মী মন নিরস্ত হইল এবং আমি অকপটে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

মঠের নিয়মাবলী

দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজনের পর সকলের কিছুক্ষণ বিশ্রামের সময়। স্বামীজী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিশ্রাম করিবার সময় তাঁহার ছিল না; মঠের নিয়মাবলী লিখাইতে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার শরীর বেশী দিন থাকিবে না। তাঁহার অবর্তমানে মঠের পরিচালনা যেভাবে হইবে, তাহার একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম করিয়া যাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। মঠ ও মিশন যে সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ছড়াইবে, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই ভাব সমাজে পরিবেশনের জন্য যে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রয়োজন, সেইরূপ কতকগুলি জীবনও তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাবীকালে তাহা কিভাবে অনুরূপ গতিশীল থাকিবে, তাহারও একটা আভাস তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী তিনি মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন।

দীক্ষা

সেই দিন আমি মঠে থাকিয়া গেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সকলে যখন স্বামীজীকে প্রণাম করিতে গেলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরে আমিও উপস্থিত হইলাম। স্বামীজী নিজ কক্ষের বাহিরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। চোখ দুটি ঈষৎ ফোলা, যেন ভাবের নেশায় ভরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, মনে হইল ঠাকুরই যেন দাঁড়াইয়া আছেন। কথা বলিলেন (ঈষৎ জড়াইয়া, যেন মাতাল হইয়াছেন), 'যা তুই গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আয়। শীগ্‌গির আয়।'

কৃপা যে করিবেন, ইহা তাহারই সূচনা। দৌড়াইয়াই চলিয়া গেলাম। সত্য সত্যই একটি ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুরের ভাব না হইলে তিনি দীক্ষা দিতেন না। মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেনও মাত্র কয়েকজনকে। আমার সেই সৌভাগ্য উপস্থিত, ইহা যেন অকল্পনীয়।

তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি সোফায় চিৎভাবে শুইয়া আছেন। একটি হাত এলাইয়া দিয়াছেন; বলিলেন, 'আমায় ধর্। আমার হাতটা ধ'রে থাক্।' আমার দক্ষিণ হস্তে তাঁহার ডান হাতের কব্জির কাছে চাপিয়া ধরিলাম। সেইখানেই মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—তাঁহার কব্জি বেশ চওড়া। মাথায় তিনি প্রায় আমারই মতন ছিলেন এবং আমার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল—একটু পালোয়ানী ধরনের, খাইতেও পারিতাম প্রচুর—কিন্তু দেখিলাম, আমার আঙুলে তাঁহার হাতের বেড় পাইলাম না। রোগা হইয়াছিলেন, তথাপি হাতের কব্জি বেশ চওড়া ছিল। তাই তাঁহাকে ধরিলাম বটে—কিন্তু তবু ফাঁক রহিয়াই গেল।

স্বামীজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, কতক্ষণ যে চলিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কারণ ক্রমে আমার মনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল, কালের ও স্থানের মাপ করিতে ভুলিয়া গেলাম। তাহার পর স্বামীজী সোফা হইতে উঠিয়া গালিচার উপর বসিলেন। আমাকেও সামনের অন্য একটি গালিচায় বসিতে বলিয়া বলিলেন, 'স্বপ্নে তুই মায়ের কুমারী-মূর্তি দেখেছিস্, এর পর তুই মায়ের—এই ষোড়শী মূর্তি ধ্যান করিস্।'

আমার এই স্বপ্নের কথা আমি কাহাকেও বলি নাই। সাতটি কুমারী-মূর্তি দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেকের মাথায় স্বর্ণ মুকুট, হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ী সব মূর্তি—সালঙ্কারা এবং পরমাসুন্দরী। ইহারা একের পর একজন করিয়া সম্মুখে আসিলেন এবং পাশ দিয়া দূরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী বলিয়া চলিলেন, 'এর কিছু পরে তুই স্বপ্নে মহাদেবকে দেখিস্, ত্রিশূল হাতে। তিনি তোকে এই—মন্ত্র দেন। সেই অবধি তুই ওটাই জপ করিস্।'

প্রথম স্বপ্নের কয়েক বৎসর পর আমি স্বপ্নে ঐরূপ মন্ত্র পাইয়াছিলাম, এবং জপও করিতাম। কিন্তু একমাত্র আমি ছাড়া আর কেহই সে কথা জানিত না। স্বামীজীর কথা শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইলাম। আমরা যেমন আরসিতে মুখ দেখিতে পাই, স্বামীজী সেইরূপ মনগুলিকে দেখিতে পাইতেন। এইরূপ অন্তর্যামিত্ব যাঁহার, তাঁহাকে ভগবান ছাড়া আর কি বলিব?

ইহার পর তিনি আমাকে বলিলেন, 'এখন তোর মন্ত্র এই—।' ঐ বীজমন্ত্র উচ্চকণ্ঠে তিন বার আমাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'এবার থেকে এই—তোর ইষ্ট মূর্তি।' মানস চক্ষে দেখিতে পাইলাম সেই মূর্তি। দীক্ষা ও সাধনার ক্রম সম্পর্কে তখন কিছু উপদেশ দিলেন, তাহা একান্ত ব্যক্তিগত। গুরুপূজার মন্ত্র ও ন্যাস-স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'মানস প্রণামের পর গুরুর স্পষ্ট মূর্তি ধ্যান করতে হয়। সহস্রারই প্রকৃষ্ট স্থান। পরে ইষ্টের মন্ত্র জপ করতে করতে হৃদয়ে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। প্রথমে পা থেকে মানসপূজা আরম্ভ করতে হয়। ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে মুখ পর্যন্ত ধ্যান করতে হয়। তবে ধ্যানের গভীরতায় হাত বা পা কিছুই থাকে না। মূর্তির চিন্তা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নির্বিকল্প সমাধি হয় না। কিন্তু একটির পর একটি ধ'রে চলতে হয়। নইলে সুদীর্ঘ সময় লাগতে পারে।'

দীক্ষান্তে আমায় বলিলেন, 'আমার কাছে বসে জপ ও ধ্যান কর্। যত কাজেই ব্যস্ত থাকিস্ না কেন, প্রত্যহ সামান্য ক্ষণের জন্যও ওটা করিস্।'

মহিমবাবু

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময় মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন। স্বামীজী যেমন গুরুভ্রাতাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতেন, মহিমবাবুকেও কতকটা সেইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তিনি সাদা কাপড়ে থাকিতেন, সাধারণতঃ ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিতেন। তাঁহার গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। স্বামীজীর রঙ আর কোন ভ্রাতা পান নাই। তবে শরীরের গঠন সব ভ্রাতারই এক ধরনের ছিল। স্বামীজীর সহিত মহেন্দ্রবাবুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ মিল ছিল; তাঁহারও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। চোখদুটি তাঁহার ছোট ছিল, তাঁহার নেত্র বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্রদীপ্ত ছিল। স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের সহিত তিনি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, আবার স্বামীজীর শিষ্যদিগের সহিতও আলাপ করিতে ছাড়িতেন না।

'দু নৌকায় পা দিস্ না'

একদিন স্বামীজী আমাকে বলিলেন, 'দ্যাখ্! দু নৌকায় পা দিস্ নি। যা হয় একটা কর।' হয় বিবাহ ক'রে সংসার করা, নইলে সন্ন্যাস লওয়া—এই দুইটির একটি বাছিয়া লইতে বলিলেন।

আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 'তাড়া নেই! তবে মন স্থির করে নে।'

ইহার এক বৎসর পর আমার বিবাহ হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী

'এই শরীর আর কর্ম করবার উপযুক্ত হবে না। এটা ছেড়ে আবার নতুন শরীর নিয়ে আসতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী রয়ে গেল।'

আর একদিন ভাবের মুখে তিনি বলিলেন, 'আমি মুক্তি চাই নে। যতদিন না সব জীবের মুক্তি হবে, ততদিন আমাকে বার বার আসতে হবে।'

চীনের ভবিষ্যৎ

এই সময় চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শক্তিমান্ দেশগুলি চীনকে ভাগাভাগি করিয়া শোষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। জাপানও তাহাদের দলে ভিড়িল। সেই সময় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত পুরাতন সভ্য একটা দেশ—এই বার কি শেষ হ'য়ে যাবে?' স্বামীজী অল্পকাল চুপ করিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, 'আমি দেখেছি—একটা প্রকাণ্ড হাতীর পেটে একটা বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হ'ল—কিন্তু সেটা একটা সিংহশাবক। এই বাচ্চাটা বড় হবে। তখন নতুন চীন তৈয়ের হবে।'

'ভারত স্বাধীন হবে'

ভারত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণতঃ দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়।'

'কুড়ি বৎসরের মধ্যেই একটা মহাযুদ্ধ হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলি যদি materialism (জড়বাদ) না ছাড়ে, তাহলে আবার যুদ্ধ অনিবার্য।'

'স্বাধীন ভারতবর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্যের materia-lism (জড়বাদ) নেবে। প্রাচীন ঐহিক গৌরবকে নতুন ভারত ম্লান ক'রে দেবে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ উত্তরোত্তর অধ্যাত্মবাদী হবে। তারা জড়বাদের শিখরে পৌঁছে বুঝেছে—জড়ে শান্তি দিতে পারে না।' [ক্রমশঃ]

মানুষের অমরত্ব

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সম্প্রতি-পরলোকগত রাশিয়ান লেখক বোরিস প্যাস্টারন্যাকের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো'র একটি অধ্যায়ে (১৩।৩) মানুষের আত্মা সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে। জনৈক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাকে উপন্যাসের নায়ক য়ুরা (ডক্টর জিভাগোর যৌবন-কালের নাম) সান্ত্বনা দিতেছেন। বৃদ্ধা মরিতে ভয় পাইতেছেন, বলিতেছেন, 'একটি দাঁত তুলে ফেলতেই কত ভয় হয়। কিন্তু এ তো আর শুধু দাঁতটি নয়, এ যে আমার যা কিছু সব লয় পেতে বসেছে, আমার জীবনটাকেই উপড়ে ফেলবার উপক্রম।'

য়ুরা। তা বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে এই বিশ্বজগতে অসংখ্য মূর্তি ও আকারের অনবরত পরিবর্তন ও আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটলেও এক মহান বিরাট প্রাণ-শক্তি সর্বদাই জগৎকে ছেয়ে রয়েছে। এই প্রাণশক্তির কখনো বিলয় হয় না। ক্রমাগত নতুন নতুন দেহের মধ্য দিয়ে সে জন্ম পরিগ্রহ করছে।

বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুর পর আবার কি আমি জন্মাব?

য়ুরা। মৃত্যু থেকেই তো আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, শুধু লক্ষ্য করেননি, এই যা। আবার মৃত্যু থেকে উঠবেন। সেই এক মহাপ্রাণ যা নব নব আকৃতি পরিগ্রহ করছে, আপনার প্রাণ তো তাতেই এক হ'য়ে রয়েছে। সেই মহাপ্রাণের তো বিনাশ নেই।

বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুকালে আমি যন্ত্রণা অনুভব ক'রব না কি?

য়ুরা। শরীরের পেশীসমূহের ক্ষয় ঘটলে তারা যন্ত্রণা অনুভব করে কি? অর্থাৎ প্রশ্ন এই, আপনার চেতনার কি দশা হবে? কিন্তু চেতনা-বস্তুটি কি দেখা যাক। দেখুন—কেউ যদি সজ্ঞানে ঘুমুতে চায়, তাহলে তার অনিদ্রা ঘটে। কেউ যদি পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হ'তে চায়, তাহলে তার হজমের নিশ্চিতই ব্যাঘাত হয়। এক কথায় আমাদের 'জ্ঞান' বা চেতনাকে যদি নিজের অভি-মুখে প্রয়োগ করি, তাহলে তা বিষের তুল্য। জ্ঞান বা চেতনা তখনই সার্থক, যখন তা নিজের বাইরে নিয়োজিত হয়। চেতনা যেন একটি আলো, যা সমুখের পথ দেখায়, যাতে আমরা হোঁচট না খাই। এ ঠিক এঞ্জিনের হেড্-লাইটের মতো। হেড্-লাইটকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দিলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। ওর কাজ হ'ল এঞ্জিনের সমুখের লাইনকে আলোকিত করা। আমাদের চেতনাও সেইরূপ আমাদের বাইরের জগৎকে আলোকিত ক'রে রাখে।

বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার সেই চেতনার কি অবস্থা ঘটবে?

য়ুরা। ঠিক কথা। আপনার চেতনা। কিন্তু 'আপনি' কে? ভেবে দেখুন তো এ পর্যন্ত বরাবর আপনি নিজেকে কোন্ বস্তুটির সঙ্গে 'আমি' ব'লে তাদাত্ম্য অনুভব ক'রে এসেছেন। আপনার পরি-পাক যন্ত্র? লিভার? রক্ত-শিরা-উপশিরাসমূহ? না। যতই পিছনে

তাকিয়ে দেখুন, আপনার স্মৃতিতে দেখতে পাবেন বরাবর আপনার নিজের কোন বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে আপনার নিজের তাদাত্ম্যবোধ জড়িয়ে রয়েছে—আপনার নিজের তৈরী কোন জিনিস, আপনার পরিবার বা অপর লোকজন। অতএব আপনার চেতনা বা 'আপনি' হলেন আপনার দেহকেন্দ্রিক কোন সত্তা নয়—অপরের মধ্যে আপনার সত্তা। আপনার চেতনা বরাবর এই সত্তাই বিধৃত হ'য়ে এসেছে—এই সত্তাই আনন্দলাভ ক'রে এসেছে। অপরের মধ্যে আপনি—এই আপনার আত্মা, আপনার অমরত্ব। 'আপনি' বরাবরই অপরের মধ্যে ছিলেন, এখনও রয়েছেন এবং পরেও থাকবেন। অতএব ভয় পাবার তো কিছু নেই।

লেখক বলিতেছেন—এই কথোপকথনের পর রোগিণী অনেক শান্ত বোধ করিয়াছিলেন। যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, শরীর ও মনে একটি স্থিরতা লক্ষিত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ রোগিণীর মনে য়ুরা-কথিত আত্ম-দৃষ্টি একটি গভীর ছাপ দিয়াছিল। জীবন-প্রান্তে মানুষের দেহকেন্দ্রিক আমিত্ব নিজের ব্যর্থ আস্ফালন ও ক্ষুদ্রতায় কখন কখন বিরক্ত হইয়া উঠে এবং সেই অনাসক্তির মুহূর্তে যদি কোন বৃহত্তর সত্যের পরিচয় সামনে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মানুষের 'আমি' উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে অবলম্বন করিতে চায়। বৃদ্ধা তাহাই করিয়াছিলেন। এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার চেতনা—আমি-বোধ দেহ-মনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জীবন অর্থে তাঁহার দেহের জীবন, দেহের মৃত্যু অর্থে তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলয়, তাই তাঁহার ভয় হইতে-ছিল। য়ুরা তাঁহাকে বুঝাইলেন—মানুষের চেতনা দেহকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বকেন্দ্রিক। মানুষের চেতনা অখিল জগতের সব কিছুতে ছড়াইয়া আছে। একটি দেহ ধ্বংস হইলে বিশ্ব-চেতনা হইতে সেই দেহটুকুই বাদ যায়, কিন্তু বাকী বৃহৎ জগৎ তো পড়িয়া থাকে। মানুষের প্রকৃত আমিত্ব অর্থাৎ বিশ্বচেতনা সেই অবশিষ্ট জগৎকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সে পূর্বেও যেমন সারা জগতে ছড়াইয়া ছিল, দেহের মৃত্যুর পরও সেইরূপ থাকিবে। অতএব মৃত্যুর পর আমি অন্ধকারে ডুবিয়া যাইব—এই ধারণা মিথ্যা। আমি কোন কালেই একটি দেহে আবদ্ধ ছিলাম না, সারা বিশ্বেই ছড়াইয়া ছিলাম, দেহের মৃত্যুর পরেও সেইরূপ থাকিব—ইহাই সত্যদৃষ্টি। যে কোন ভাবে হউক, বৃদ্ধার মন আমিত্বের এই বিশ্ব-ব্যাপ্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল এবং সেইজন্য কথঞ্চিৎ শান্তিও লাভ করিয়াছিল।

ইহা গেল আমি-বোধ বা আত্মার বৃহত্ত্বের পর্যালোচনা দ্বারা সান্ত্বনা। য়ুরা জীবন বা প্রাণশক্তির অসীমতার কথাও বৃদ্ধাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতক্ষণ আমরা বাঁচিয়া আছি, ততক্ষণ আমরা দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির ক্রিয়া অনুভব করি। কিন্তু এই প্রাণশক্তি তো শুধু আমার দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। অসংখ্য প্রাণি-দেহে সেই একই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হইতেছে। যদি আমি সেই মহাপ্রাণের সহিত ঐক্য অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নিজের দেহে প্রাণস্পন্দন থামিয়া গেলেও ভীত হইব না। জানিব যে অসংখ্য অপরপ্রাণিদেহে মহাপ্রাণরূপে আমার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়ার কখনও অবসান নাই।

প্রাণের অসীমতা এবং চেতনা বা জ্ঞানের বিশ্বব্যাপ্তি—এই দুইটি সত্যের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্যাস্টারন্যাক তাঁহার উপন্যাসের নায়ককে দিয়া মানুষের অমরত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন

এবং ঐ অমরত্বের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া মৃত্যুভয় জয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বার্গসঁ এবং আরও কতিপয় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মহাপ্রাণের কথা বলিয়াছেন। প্রাণ সম্বন্ধে প্যাস্টারন্যাকের আলোচনা তাঁহাদের মতের অনুরূপ। তবে মানুষের চেতনা বা আমি-বোধ সম্পর্কে প্যাস্টারন্যাকের অভিমত পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় অনেকটা নূতন। মন লইয়া পাশ্চাত্ত্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু উপনিষদের ভাষায় 'মনেরও মন'—অর্থাৎ মানুষের চেতনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য একেবারেই উদাসীন। ইহার কারণ এই যে, পাশ্চাত্ত্য-মনীষা প্রধানতঃ বহির্মুখ। রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় বিশ্বজগৎ এত বিপুলভাবে তাহার হৃদয়মনবুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে যে, উহাকে সর্বদা পুরোভাগে রাখিয়া তবে অন্য যাহা কিছু করিবার করিতে সে অগ্রসর হয়। সমাজ, শিক্ষা, কলা, সাহিত্য, নীতি, ধর্ম, দর্শন—সব কিছুরই সুর পাশ্চাত্ত্যে ইন্দ্রিয়বেদ্যজগৎ-কেন্দ্রিক। ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে স্বয়ংপ্রমাণ। ইহাকে যে অস্বীকার করে সে বাতুল। তাই দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে পৃথক মানুষের চৈতন্যস্বরূপের কথা পাশ্চাত্ত্য-মনীষার নিকট অবাস্তর, অলীক, অপ্রয়োজনীয়। যে জাতি বা সংস্কৃতি অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা বলে, অতীন্দ্রিয় সত্যকে ইন্দ্রিয়বেদ্য সত্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দেয় পাশ্চাত্ত্য-মনীষা তাহাকে নির্মমভাবে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

তাই প্যাস্টারন্যাকের লেখায় মানুষের চেতনা বা আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া কিছু বিস্ময় জাগে। অবশ্য এই আলোচনা 'ডক্টর জিভাগো'র ৫৬০ পৃষ্ঠার মাত্র দুই পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। উহা মূল উপন্যাসের সহিত অতি সামান্যই সংশ্লিষ্ট। উপন্যাসের নায়ক য়ুরার চরিত্রের একটি দিক দেখাইবার জন্যই বোধ করি লেখক উহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক চায়ের আসরের কথোপকথনের চেয়ে উহাতে বেশী মনোযোগ দিবেন না—মনে হয়।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকুতে মানুষের চেতনা সম্বন্ধে প্যাস্টারন্যাক একটি বৈপ্লবিক অভিনবত্বের (পাশ্চাত্ত্য-দৃষ্টিভঙ্গীর নিকট) পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করা উচিত। অবশ্য ইহাও সত্য যে তাঁহার 'আত্মবাদ' বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। মানুষের চেতনা সর্বদাই বহির্বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ চেতনাকে অন্তর্মুখ করিলে মানুষের সর্বনাশ হয় (এঞ্জিনের হেড্-লাইটের উপমায়), ইহা বালসুলভ কবিকল্পনা। চেতনা দেহে সীমাবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে ; ইহা উপনিষদ্‌ও বলেন, কিন্তু ইহাই চেতনার সমগ্র পরিচয় নয়। বেদের 'পুরুষসূক্ত' বলেন, 'ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ—'চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার যদি চারিটি অংশ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ চারি অংশের তিনটিই সৃষ্টির উর্ধ্বে বর্তমান, শুধু এক অংশ অখিল বিশ্বচরাচরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আত্ম-চৈতন্য জগৎ ছাড়াও থাকিতে পারেন। বিশ্বজগতে চৈতন্য ওতপ্রোত, কিন্তু বিশ্বজগতের বাহিরেও চৈতন্য বর্তমান। মানবাত্মা তাহার ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড়।

জগদতীত চৈতন্যের পরিচয় লাভ করিতে হইলে চেতনাকে অন্তর্মুখ করিতে হইবে, ইহাই উপনিষদের শিক্ষা। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন, 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ॥' —অণু হইতে অণু, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা মানুষের হৃদয়-গুহায় বিরাজ

করিতেছেন। বাসনা জয় করিয়া, ইন্দ্রিয়-নিচয়কে প্রশমিত করিয়া সেই আত্মাকে দর্শন করা যায়, দর্শন করিলে সমস্ত দুঃখশোক হইতে নিষ্কৃতি মিলে। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, একনিষ্ঠ ধ্যান দ্বারা অন্তরের অন্তরে আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। বার বার এইরূপ সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মপ্রতীতি স্থায়ী হয়। তখন যোগী দেখিতে পান—আত্মা শুধু অন্তরে নন্, তিনি বাহিরেও সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত।

সারা জীবনে মানুষ অসংখ্য আকর্ষণ ও কাজে দিশাহারা হইয়া থাকে। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে—নিজের গভীরতম সত্য সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার অবসর নাই, সুযোগও নাই। তাহারই মধ্যে হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া হাজির হয়। তখন মানুষের একটু হুঁশ আসে—তাই তো মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? মরিবার সঙ্গে সঙ্গে কি আমি শেষ হইয়া যাইব—না মরিবার পরও কোথাও কোনরূপে থাকিব? এই প্রশ্নের একটি নিঃসন্দিগ্ধ উত্তরের জন্য সে ব্যাকুল হয়। 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের বৃদ্ধাটি এইরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। উপন্যাসের নায়ক য়ুরার মুখে মানুষের আত্মার অমরত্বের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

সান্ত্বনা দিতে পরিশ্রম করিতে হয় না, পয়সাও লাগে না। তাই মানুষের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি সান্ত্বনাবাক্য রাশীকৃত পুস্তকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের নায়ক য়ুরার সান্ত্বনা-বাক্য উহার একটি নিদর্শন মাত্র। কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে কি? উপনিষদ্ বলেন—ভিজে না। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ—পুঁথি পড়িয়া, বচন ঝাড়িয়া আত্মাকে লাভ করা যায় না। আত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঘাম ফেলিতে হয়, রক্ত দিতে হয়। কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত কয়জন?

উপনিষদ্ বলেন—অমৃতত্ব মানুষের চিরন্তন সম্পত্তি। অপেক্ষা শুধু ঐ সম্পত্তি লাভের জন্য চেষ্টা করা—ঐ সম্পত্তিকে করতলগত করা। মানুষ নিজেকে চিনিতে পারিলে এক মুহূর্তে সেই সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। তখনই সে অমর হয়। সে অমরত্ব শুধু একটা বিশ্বাস নয়, পরিকল্পনা নয়, দার্শনিক মতবাদ নয়। উহা নিঃসন্দিগ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষ ভাস্বর সত্য।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ কঠোপনিষৎ ১।২।২৩

কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, ধারণাশক্তি কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। ঐকান্তিকতার সহিত আত্মজ্ঞানলাভে প্রয়াসী সাধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণে স্ব-স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অন্তর্যামিরূপে বা আচার্যরূপে আত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহারই নিকট আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

অগ্নিগর্ভ বাণী

[নবপর্যায়]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

'...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে।'—**স্বামী বিবেকানন্দ**

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হ'তে আসবে, তার আভাস দিতে গিয়ে স্বামীজী উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর কোন উল্লেখ তাতে নেই। তিনি ঘুণাক্ষরেও এমন কথা বলেননি যে বেরুক নূতন ভারত স্কুল-কলেজ থেকে, 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। এই অনুল্লেখ কি ইচ্ছাকৃত? আর যদি তাই হয়, তবে নিশ্চয়ই এর কোন তাৎপর্য আছে। তিনি ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারে জন্মেছিলেন, নিজে স্কুল-কলেজে পড়েছিলেন, ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকেরাই তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিল এবং এখনও তারাই তাঁর বাণী বহন করছে, তাঁর আদর্শকে রূপায়ণের চেষ্টা করছে; তবুও কেন ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর উপর এত অনাস্থা? আর চাষাভূষো, জেলে-মালা, মুচি-মেথরের উপর এত ভরসা, এত নির্ভরশীলতা—তাদেরই এত জয়গান? ভবিষ্যৎ ভারতের তারাই কেন স্রষ্টা বলে অভিহিত, অথচ শিক্ষিত শ্রেণীর নামগন্ধ নেই কেন? এটা ভাববার কথা।

ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে কি মনোভাব তিনি পোষণ করতেন, তার পরিচয় স্বামীজীর অনেক বক্তৃতায় এবং উক্তিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে উন্নত চরিত্রের অনেক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু স্বামীজীর মতে ইংরেজী শিক্ষার সাধারণ ফল চরিত্রগঠনের এবং জাতিগঠনের দিক দিয়ে খুব ইষ্টজনক হয়নি। রামনাদ-অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

ভোগচেষ্টায় কিরূপ সফলতা লাভ করা যায়,—আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকে অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আজ[illegible] আমরা যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপরদিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা। যদি আমায় কেহ এই দুটির মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, আমি প্রাচীন হিন্দুসমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন; সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে; তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই; সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে না, তাহার মাথা দিনরাত্র বোঁ বোঁ করিয়া

এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে?—আমাদের হর্তা কর্তা বিধাতা ইংরেজলোকে কিসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুটি বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সর্বকার্যের অভিসন্ধির মূলে।* সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? কারণ সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে। এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। এই প্রাচীন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ সকলেই মানুষ ছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই একটা দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু এই পাশ্চাত্য ভাবমোহে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এখনও কোন নির্দিষ্ট জীব-পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাদিগকে পুরুষ বলিব, না স্ত্রী বলিব, না পশুবিশেষ বলিব! তবে পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি আদর্শ পুরুষও আছেন।

তৎপরে মাদ্রাজ নগরীতে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে স্বামীজী যে বক্তৃতা করেন, তাতে আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

* ইংরেজ আর এখন আমাদের হর্তাকর্তাবিধাতা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতা-লাভের পর বিদেশীয়দের প্রশংসা কুড়ানো আমাদের বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যাঁদের হাতে এখন দেশের শাসনভার, বিদেশীয়দের নিন্দাপ্রশংসাই তাঁদের অধিকাংশের মতিগতির ও কার্যাবলীর নিয়ামক, যদিও অনেকক্ষেত্রেই সেই সমস্ত নিন্দাপ্রশংসা কপট এবং স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত।—লেখক

'তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না,—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তি-ভাব পূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা নাস্তিভাব-ভিত্তিক অন্য যে কোন শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক।'

স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতায় এরূপ উক্তি আরও অনেক পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়দিগকে শ্রেণী-হিসাবে স্বামীজী দুর্বলচরিত্র পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণ-সর্বস্ব, চিন্তাশক্তিবিহীন, মেরুদণ্ডহীন ব'লে গণ্য করতেন। স্কুল-কলেজে তৈরী হচ্ছে এক নকল ইওরোপ; সত্যিকারের ভারতবর্ষ ওখানে অবহেলিত, অপমানিত। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে ওখান থেকে নূতন ভারতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা অল্প।

স্বামীজীর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তবে তার নিজস্ব জীবন-ধারা ও আদর্শ সে কখনও ছাড়তে পারে না। নিজ প্রকৃতিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থেকেই পাশ্চাত্য জাতিদের নিকট যা কিছু শিক্ষণীয় সমস্তই সে শিখুক, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান হজম ক'রে সম্পূর্ণ নিজের জিনিস ক'রে নিক। তিনি বারংবার বলেছেন—ইওরোপ অন্নবস্ত্র-সংস্থানের, রোগ-নিরাকরণের, পার্থিব অভাব-মোচনের বহু উপায় আবিষ্কার করেছে—অপরা বিদ্যার চর্চায় পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আমাদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলে গিয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে এ সকল বিদ্যা আমাদিগকে নতমস্তকে শিখতে হবে। এতে কোনই লজ্জা নেই:

'অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া, অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রত্ব হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে অন্যরূপ হইয়া যাইও না, এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।'

অন্যত্র আরও জোর দিয়ে বলেছেন:

'মনে কর তোমরা পাশ্চাত্য জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণে সমর্থ হইলে; কিন্তু যে মুহূর্তে উহাতে সমর্থ হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে, তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না।'

স্বামীজী যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর সমূলে উচ্ছেদ কামনা করেছিলেন, তা নিশ্চয় নয়। কঠোর ভাষায় এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ এই ছিল যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণী যেন নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে সেগুলি শোধরাবার চেষ্টা করে, এবং বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সমগ্র সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত নিজেকে উৎসর্গ করে। বিশেষতঃ তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ-তৈরি-করা শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবনে ও প্রবর্তনে তারা যেন ষোলআনা মন প্রাণ ঢেলে দেয়। ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগকে উদ্দেশ করেই তিনি বলেছিলেন:

'আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এটি কি বুঝিতেছ? তোমাদিগকে উহার কল্পনা করিতে হইবে, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, যতদিন উহা না করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই।'

ইংরেজ যখন আমাদের স্কন্ধে আসীন ছিল, তখন ইংরেজের ব্যবস্থাকে উপেক্ষা ক'রে, সরকারী সাহায্য ও অনুগ্রহ-বিগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে,—শুধু আত্মশক্তির দ্বারা মানুষ-তৈরি-করা শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য তিনি 'শিক্ষিত' সমাজের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদন যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল, তা নয়। স্বামীজী যেভাবে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে না হলেও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা বাংলা দেশে অন্ততঃ হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ঐ চেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিদেশী রাজশক্তির প্রতিকূলতাই ছিল ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বাধীনতা লাভের পর এই কারণ দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু ফল কি দাঁড়িয়েছে?

স্বাধীন হবার পর পরানুকরণ ও পরানুচিকীর্ষার জন্য দিন দিন আমরা যেন আরও উঠে পড়ে লেগেছি। যে শিক্ষাদীক্ষা ও চালচলনকে পাশ্চাত্যের চোকবোজা নকল এবং আমাদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ব'লে এতকাল উঁচু গলায় নিন্দা ক'রে এসেছি, সেগুলোকেই এখন আমরা শুধু যে প্রশংসা করছি তা নয়,—অনুকরণের মাত্রা আরও চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়ে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নিষ্ফল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চারিদিকে আরও ছড়িয়ে দেবার, আরও ফাঁপিয়ে তোলবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি। চারদিকেই রব উঠেছে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা কিছুই হয় না, ছাত্রেরা পাঠে অমনোযোগী, শিক্ষকেরা কাজে উদাসীন। যাঁদের উপর বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার ভার, তাঁরাই বলছেন যে যোগ্যতাসম্পন্ন ও উৎসাহী শিক্ষকের একান্ত অভাব; উপযুক্ত মাইনে দিলেও মনোমত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তবুও নিত্য নূতন স্কুল-কলেজ খোলা হচ্ছে। এই অদ্ভুত অযৌক্তিক কার্যকলাপের

কারণ কি?—একমাত্র কারণ ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের শ্রেণীস্বার্থ।

কথাটা খোলাখুলিই বলবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে আমরা—ইংরেজী-শিক্ষিতের দল—বরাবর জোর গলায় ব'লে এসেছি যে ইংরেজের শাসন-প্রণালী অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং হৃদয়হীন,—ইংরেজ রাজপুরুষেরা গরীব দেশের রক্ত শোষণ ক'রে মাইনে নেয় অত্যন্ত মোটা এবং তার বদলে কাজ দেয় নামমাত্র, ভারতবাসী জনসাধারণের সুখদুঃখ তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে এই স্পর্ধাবাক্যও শোনাতে ত্রুটি করিনি যে একবার শাসনতন্ত্র আমাদের হাতে আসুক, আমরা দেখিয়ে দেবো—কত সস্তায় কাজকর্ম কত উত্তমরূপে চালানো যেতে পারে, অধিকন্তু জনসাধারণের প্রতি আমাদের সেবার প্রবৃত্তি আর তো হৃদয়ে ধরে রাখতে পারছিনে,—একবার যদি সে প্রবৃত্তি আপন চরিতার্থতার পথ খোলা পায়, তবে দেশে দুঃখদারিদ্র্যের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

তেরো বৎসর পূর্ণ হ'য়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে। বলতে গেলে স্বাধীনতার এই প্রথম পর্ব ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর এক মহাপরীক্ষার কাল। ইংরেজের পরিত্যক্ত রাজশক্তি এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই শ্রেণীরই করায়ত্ত হয়েছে। রাজনৈতিক দল গুলি বলুন, সংবাদপত্র বলুন, শিক্ষাদীক্ষা বলুন শাসনযন্ত্র বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় বলুন, মিউনিসিপ্যালিটি বলুন—সব কিছু এঁদেরই করায়ত্ত, এঁদেরই দ্বারা পরিচালিত। দেশের লোকের চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করবার—এমন কি সর্বাঙ্গীণভাবে দেশের জীবনকে কোন বিশেষ খাতে পরিচালিত করবার অপরিসীম ক্ষমতা ও সব রকম উপায় এঁদের হাতের মুঠোর ভিতরে। এ যাবৎ এই ক্ষমতা ও সুযোগের কী ব্যবহার এই শ্রেণী করেছেন, তা আজ খতিয়ে দেখবার সময় হয়েছে। যদি এই ক্ষমতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা ক'রে থাকি, তবে আজ কেন চারিদিকেই ব্যর্থতা, অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার, দুর্নীতির প্রাবল্য, অকর্মণ্যতা, আলস্য, জড়তা এবং এই গরীব দেশের জনসাধারণের অর্থের এমন নিদারুণ অপব্যয়?

একটুখানি সততা, একটুখানি দূরদৃষ্টি, একটুখানি দায়িত্ববোধের সহিত যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা ৫০ জন, কিংবা ২৫ জন ব্যক্তিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতেন, অন্ততঃ সত্য কথা বলবার মতো সৎ সাহস দেখাতেন, তাহলে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের পর ভারতের ভাগ্যাকাশ এরূপ ঘনঘটার অন্ধকারে আবৃত হ'ত না এবং দেশ এরূপ অভাব ও দুর্নীতির মহাপঙ্কে নিমগ্ন হ'ত না। এ কথার বিশদ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন অনাবশ্যক, যেহেতু প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাবেন। বিশদ বর্ণনা কিংবা প্রমাণ দিতে গেলে এ কাহিনীর শেষ নেই—যে দিকে যাওয়া যাবে, সেদিকেই অফুরন্ত।

শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন এবং মুখেও বলেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া বৃথা, কারণ বর্তমান যুগের গণতন্ত্রে যুক্তিবিচার, নীতিধর্ম, জনমত প্রভৃতির বাস্তবিক কোন স্থান নেই, দৃঢ়সংবদ্ধ রাজনৈতিক দলই সর্বেসর্বা, আর দলের যাঁরা পরিচালক সেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই ক্ষমতার চাবিকাঠি; অন্যেরা তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না! নাৎসী জার্মানীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা বলেন যে জার্মানদের ন্যায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সাহসী এবং

কর্মঠ জাতিও হিটলার ও তাঁর দলের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তও তাঁরা উল্লেখ করেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রথমতঃ নাৎসী জার্মানীর দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার ঠিক মেলে না। যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (Intellectuals) নাৎসী নেতাদের হাতে ক্রীড়নক হয়েছিল, তারা কখনও ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের জন্যে আত্ম-বিক্রয় করেনি। তারা সত্যই বিশ্বাস ক'রত যে হিটলারের নীতির অনুসরণের দ্বারা তারা জার্মানীকে বড় করছে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা জীবন পর্যন্ত পণ করেছিল। তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে থাকলেও, কিংবা তাদের উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্টিতে দূষণীয় হ'লেও একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে তাদের ভাবটা ছিল ত্যাগের ভাব, স্বার্থসিদ্ধির ভাব নয়। আমাদের ভাব হচ্ছে আত্মপ্রতারণা। দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তি যদি ঠিক হয়, তবে অনিবার্যরূপে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে বর্তমান অবস্থার কোনই প্রতিকার নেই। এরূপ সিদ্ধান্ত মনুষ্যত্বের অবমাননাকর এবং কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটজনক—এ কথা জেনে-বুঝেও শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যদি নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকেন অথবা কপটাচারের আশ্রয় নেন, তবে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষায় ধিক্, তাঁদের অপরাধ অমার্জনীয়। এই প্রশ্নই আজ বিশেষ ক'রে তাঁদের সম্মুখে। কী উত্তর তাঁরা দেন, কী আচরণ তাঁরা করেন, তা দিয়েই ইতিহাসে তাঁদের বিচার হবে।

সাধারণভাবে সমগ্র ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বামীজী কেন যে মেরুদণ্ডহীন ও অন্তঃসারশূন্য মনে করতেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। দেশকে সেবা করবার, দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যাবার যে স্বর্ণ সুযোগ এই সম্প্রদায় পেয়েছিলেন, তার অসদ্ব্যবহারই তাঁরা করেছেন, সদ্ব্যবহার করেননি। জনসাধারণ এই সমাজের উপর যেটুকু আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করেছিল, তার মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। যে সমস্ত আশ্বাসবাক্য ও প্রতিশ্রুতি এঁরা জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন, তা অলীক ব'লে পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং ধর্মে মহান্, কর্মে মহান্ যে ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি, সেই নূতন ভারত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য হ'তে বেরুবে না—একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন :

> আসল কথা এই যে এক্ষণে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ, দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।

এখন আর শুধু 'সহৃদয়তার অভাব' নয়, একটা যেন পারস্পরিক রেষারেষির ভাব দেশের সর্বত্র দেখা দিয়েছে, এবং এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী 'শিক্ষিত' শ্রেণী। এই শ্রেণীর মতিগতি পরিবর্তিত করবার জন্য স্বামীজী এঁদের সম্বোধন ক'রে ব্যাকুলকণ্ঠে বলেছিলেন :

> প্রথম পূজা বিরাটের পূজা, তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের পূজা—ইহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ—এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশীগণের পূজা করিতে হইবে। তোমাদের নিজেদের ঘোর কুকর্ম-ফলে কষ্ট পাইতেছ, তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

হায়! এই বজ্রনির্ঘোষ বাণী, এই কাতরতাপূর্ণ ব্যাকুল আহ্বানও আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙাতে পারেনি। একদা যেটুকু বা কর্ণপাত করেছিলাম,

স্বার্থসিদ্ধির ও ভোগবিলাসের সুযোগ পেয়ে তাও আজ স্বেচ্ছায় ভুলে রয়েছি। এক হিসাবে বলতে গেলে 'শিক্ষিত' সমাজের শ্রেণীস্বার্থ আজ দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর অল্প কয়েক বৎসরে যে প্রভূত তিক্তকষায় অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, তার ফলে স্বামীজীর সতর্ক বাণীর গভীর সার্থকতা আমাদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা উচিত। তাতে সমর্থ হবো কিনা, কায়মনোবাক্যে তাঁর উপদেশ পালনে যত্নবান্ হবো কি না,—আজকের দিনে সেইটেই আমাদের সম্মুখে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। ভারত বলতে শুধু উচ্চবর্ণ কিংবা শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়; এঁরা সংখ্যায় আর ক'জন? সুতরাং জনসাধারণের মধ্য থেকেই যে নূতন ভারত বেরুবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে আবির্ভাব কি ধরনের হবে,—শিক্ষিত শ্রেণী তাতে কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন,—নূতন ভারতের জনসাধারণ কোন্ আদর্শে পরিচালিত হবে—এ-সব কথাই আজ বিশেষভাবে চিন্তনীয়। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে; ইতিমধ্যে অনেক কিছু ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন দেশের বাইরে ও ভিতরে ঘটে গিয়েছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণেরও দৃষ্টিভঙ্গী, মতিগতি এবং ধর্মভাব আগেকার মতো আর নেই। নিজেদের দুরবস্থার জন্যে পরের ঘাড়ে দোষ না চাপাবার জন্যে এবং কোন বিষয়েই পরনির্ভরশীল না হবার জন্যে স্বামীজী অনুন্নত শ্রেণীকেও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরাও সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেননি। বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণ কোন্ পথ অবলম্বন করবে তা বলা কঠিন, কারণ বহু বিচিত্র এবং বিভ্রান্তিকর চিন্তাস্রোত চারদিকেই প্রবহমান। যাই হ'ক, সে বিচারে প্রয়োজন নেই। আমাদের অর্থাৎ 'শিক্ষিত' এবং 'ভদ্র' শ্রেণীর—সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে নিজের দিকে তাকানো; আত্মানুসন্ধান ও আত্মকর্তব্য-বিনির্ণয়। এ সম্পর্কে স্বামীজীর একটি অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা শেষ করা যাক্। এটি এমন একটি উপদেশ, যা যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা থাকলেই পালন করতে পারেন, কারও জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না, কারও উপর নির্ভর করতে হয় না, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে হয় না।

'সমগ্র জগৎ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে ততটুকু দেওয়া উচিত। এই আদর্শ জগতের কখনও আবির্ভাব হইবে কি না—তাহা আমি জানি না; এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখনও আসিবে কি না, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখনও আসুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে; আর আমার—কেবল আমার কার্যের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অপর সকলে নিজ নিজ কার্য শেষ করিয়া বসিয়া আছে,—একমাত্র আমারই কেবল কাজ করিবার বাকি আছে; আর যদি আমি নিজ কার্য সাধন করি, তবেই জগৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নিজেদের উপর এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।'—আদর্শ জগতের রূপায়ণের সম্পর্কে স্বামীজী এই যে উপদেশ দিয়েছেন, আদর্শ ভারতের রূপায়ণ সম্পর্কেও তা হুবহু প্রযোজ্য। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা যদি সম্ভবপর নাও হয় তথাপি ব্যক্তির পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে থাকা সমর্থনযোগ্য নয়।

চণ্ডীতে দেবী-মাহাত্ম্য

[মেধস-কথিত উপদেশ ও উপাখ্যানমালা]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অপর নাম 'দেবীমাহাত্ম্য'। এই শাস্ত্রে দেবী মহামায়ার অপার মহিমা-কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। মেধস ঋষির উপদেশাবলী, ঋষিবর-কথিত উপাখ্যানমালা, দেবগণ-কৃত স্তব-স্তুতিসমূহ, ভগবতী-বাক্যনিচয়, মার্কণ্ডেয় মুনির কথোপকথন—সর্বত্রই দেবীর অতুল মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রায় প্রতিটি শ্লোকই দেবীর অনন্ত মহিমাসূচক। 'দেবী-মাহাত্ম্য' পাঠ-শ্রবণ বা স্মরণ-মননে দেবীর সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ হয়। স্বয়ং দেবীমুখে চণ্ডীতে অভিব্যক্ত হয়েছে—'সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।' এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে আরও বহু ফলপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ভগবতী-বাক্যে রয়েছে।

দেবী মহামায়ার অনবদ্য মাহাত্ম্য-কথা কেবল চণ্ডীতেই নয়, অন্যান্য শাস্ত্র-পুরাণাদিতেও বহুল বর্ণিত রয়েছে। স্বল্প পরিসরে ঐগুলির অবতারণা সম্ভব নয়। আমরা এখানে চণ্ডী থেকে মেধস ঋষি-কথিত দেবীমাহাত্ম্য সংক্ষেপে অনুধ্যান ক'রব।

উপদেশাবলী

ঋষিবর মেধসের তত্ত্বপূর্ণ উপদেশসমূহের পটভূমিতে রয়েছে জিজ্ঞাসু সুরথ ও সমাধির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। মহারাজ সুরথ রাজ্যহারা হ'য়ে বনবাসী হয়েছেন। আর সমাধি বৈশ্য বিপুল ধনসম্পত্তি হারিয়ে বনে এসেছেন। তাঁদের উভয়েরই ভাগ্য-বিড়ম্বনা ও হৃদয়-বেদনা একই প্রকার। শত্রুরা এবং অমাত্যগণ রাজ্যলোভে সুরথের সমস্ত রাজ্য অধিকার ক'রে নিয়েছে। আর সমাধির স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ধনলোভে তাঁর যাবতীয় ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। তাঁরা উভয়েই বিষয়ের বিষম বিষক্রিয়ায় জর্জরিত। তথাপি বিষয়ের প্রতি তাঁরা কেন মায়ায় আসক্ত? হীন চক্রান্তকারী আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতিও তাঁরা কেন মমতায় আবদ্ধ? তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কেন ঐরূপ স্নেহ-মমতায়, মায়া-মোহে অকারণ বিমুগ্ধ। অন্তরের এই তীব্র জিজ্ঞাসার সদুত্তর লাভের আকাঙ্ক্ষায় সুরথ ও সমাধি ঋষিবর মেধসের শরণাপন্ন হন।

ঋষিবর তাঁদের বলেন: সমস্ত জগৎ ভগবতী মহামায়ার অপার মায়ায় সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানিগণের চিত্তকেও তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহগর্তে ও মায়ার আবর্তে নিক্ষেপ করেন। জগৎপতি ভগবান বিষ্ণুও তাঁর অমোঘ প্রভাবে বিমুগ্ধ এবং যোগনিদ্রায় অভিভূত হন। সেই মহামায়াই এই নিখিল বিশ্বচরাচরের সৃজনকারিণী, পরমা আদ্যাশক্তি। তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য অতি বিচিত্র ও অতুলনীয়। তিনি একাধারে জীব-জগতের বন্ধনকারিণী, আবার মুক্তিদাত্রী। অবিদ্যারূপে বন্ধনের কারণ, বিদ্যারূপে মুক্তির হেতু তিনি সর্বেশ্বরেশ্বরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ মহান্ দেবগণেরও নিয়ন্ত্রী তিনি। তিনি নিত্যা, জন্ম-মৃত্যুরহিতা। তিনি সর্বব্যাপিনী, সর্বগতা। তাঁর সত্তা ব্যতিরেকে চরাচরে কোন বস্তুরই পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। তিনি বিশ্বরূপা, জগন্মূর্তি। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপ তিনি ধারণ

করেছেন। যদিও তিনি সনাতনী, শাশ্বতী, নিত্যা; তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধি ও জগৎ-পরিপালনের নিমিত্ত তাঁর আবির্ভাব হয়। যুগে যুগে মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে সমুৎপন্না হন, অবতীর্ণা হন।

তাঁকে আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে আরাধনা করলে তিনি শরণাগতের সকল অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তিনি সর্বার্থসাধিকা। সন্তানকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তাঁর চরণে কাতর প্রার্থনা করলে তিনি ইহলোকে ভোগ-ঐশ্বর্য এবং পরলোকে স্বর্গসুখ, নির্বাণমুক্তি—সবই অকাতরে দান করেন। তিনি প্রলয়কালে মহাকালী মহামারী রূপে সমস্ত জগৎ গ্রাস করেন। তিনি একাধারে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী। তিনি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে সৃজন, স্থিতিকালে স্থিতিশক্তি-রূপে পালন এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপে বিনাশ সাধন করেন।

তিনি সুসময়ে অভ্যুদয়কারিণী লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি দেন। আবার দুঃসময়ে দারিদ্র্য-দায়িনী অলক্ষ্মীরূপে দুঃখ-দৈন্য-অশান্তি দেন। গন্ধ-পুষ্প, ধূপ দীপ প্রভৃতি উপচারে ভক্তিভরে সেই পরমেশ্বরীর অর্চনা করলে তুষ্টা হ'য়ে তিনি ধনপুত্রাদি এবং ধর্মে মতি ও শুভগতি প্রদান করেন। আরাধনায় পরিতুষ্টা হ'লে তিনি অযাচিত ভাবে শরণাগতের সকল মনোরথ পূর্ণ করেন। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ-দাত্রী; তিনি সুখদা বরদা মোক্ষদা। ঐহিক সুখ-অভ্যুদয় এবং স্বর্গীয় আনন্দ-মুক্তি তিনিই। তাঁর অভয় পাদপদ্মে শরণ নিলে কোন অভাব থাকে না, কোন ভয় থাকে না।

ঋষিবর মেধস-কথিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক উপাখ্যানরাজির পশ্চাতে রয়েছে মহারাজ সুরথের আর এক আগ্রহাকুল জিজ্ঞাসা,—কিভাবে সেই মহামায়ার আবির্ভাব হয়? মেধস তার উত্তরে অসুরদের নিধন ও দেবগণের রক্ষাকল্পে দেবীর আবির্ভাবের কয়েকটি বৃত্তান্ত তাঁদের একে একে শোনান।

মধু-কৈটভ বধ

কল্পান্তে প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলমগ্ন হ'লে ভগবান বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন। চারিদিক জলময় দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির বীজ-সম্ভার নিয়ে বিষ্ণুর নাভিকমলে আশ্রয় নেন। প্রলয়-শেষে প্রজাপতি নবসৃষ্টির নূতন কল্পারম্ভ করবেন, এই উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণ হ'তে মধু ও কৈটভ নামে দুটি অতি ভীষণাকার ও মহাবলবান্ দৈত্য উৎপন্ন হয়। তারা ব্রহ্মাকে দেখামাত্রই তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণ নিলেন, কিন্তু দেখলেন—তিনি যোগনিদ্রায় অভিভূত। তখন তিনি বিষ্ণুর জাগরণের জন্য কাতরকণ্ঠে ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করলেন। মহামায়া যোগনিদ্রা তাঁর স্তবে পরিতুষ্টা হ'য়ে বিষ্ণুর নেত্রাসন ছেড়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হ'য়ে বিষ্ণুকে জাগ্রত করেন এবং মধু-কৈটভ-নিধনে প্রেরণা দেন। বিষ্ণু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহু বছর কেবল বাহুযুদ্ধই হ'ল, তবুও দৈত্যেরা পরাজিত হ'ল না। মহামায়া তখন তাদের তাঁর মায়াপ্রভাবে সম্মোহিত করলেন। ফলে তারা ভয়ানক গর্বিত হ'ল এবং দম্ভভরে বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বললেঃ 'তোমার রণনৈপুণ্যে আমরা পরিতুষ্ট। আমরা তোমাকে তোমার ইচ্ছানুরূপ বর দিতে চাই।'

বিষ্ণু ভাবলেন, এখন আর অন্য বরের প্রয়োজন কি? তাই তিনি তাঁর হাতে তাদের মৃত্যু কামনা করলেন। তারা তখন ব'লল, 'তথাস্তু। তোমার ন্যায় বীরের হাতে মৃত্যু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তবে

যে স্থান জলপ্লাবিত হয়নি সেই স্থানে আমাদের বধ করতে হবে।' বিষ্ণু দেখলেন সর্বত্রই কেবল জল। তখন তিনি নিজের জঙ্ঘার উপর দৈত্যদের রেখে সুদর্শন চক্রদ্বারা তাদের বধ করলেন। এইভাবে মহামায়ার প্রেরণায় ও শক্তিপ্রভাবে বিষ্ণু মধুকৈটভকে বধ করলেন। দেবীর কৃপায় ব্রহ্মা দুরাত্মা মধুকৈটভের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

মহিষাসুর-বধ

পুরাকালে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একশত বৎসর ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অসুরাধিপতি মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। তখন দেবতাদের দুঃখ-দুর্গতির অবধি থাকে না। মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রে নিয়ে ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়। দেবতারা তখন নিজেদের অধিকার হারিয়ে স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হলেন। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে মহিষাসুরের অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য ব্রহ্মাকে অগ্রণী ক'রে দেবগণ শিব ও বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তাঁদের মুখে দেবতাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং মহিষাসুরের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনে শিব ও বিষ্ণু ভয়ানক কুপিত হলেন। প্রচণ্ড কোপে তাঁদের বদনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তাঁদের মুখ হ'তে মহাতেজ নির্গত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত অন্যান্য দেবতারও দেহ হ'তে অদ্ভুত তেজ বিচ্ছুরিত হয়। দেবগণের দেহ-সঞ্জাত সেই অনুপম তেজোরাশি দেখতে দেখতে দিগন্তব্যাপী এক বিরাট জলন্ত পর্বতের আকার ধারণ করে। সেই পুঞ্জীভূত তেজোরাশি হ'তে এক অপূর্বশ্রী নারী-মূর্তির আবির্ভাব হ'ল। বিভিন্ন দেবতার তেজ হ'তে তাঁর শ্রীঅঙ্গের বিভিন্ন অবয়ব গঠিত হয়। ইনিই মহামায়ার মহাবতার মহালক্ষ্মী।

দেবগণ সেই মহালক্ষ্মীকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রণসাজে সজ্জিতা করলেন, নিজেদের বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা করলেন। তিনি দেবগণ কর্তৃক সম্মানিতা ও রণসাজে সজ্জিতা হ'য়ে মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করতে লাগলেন। দেবীর ঐ অট্টহাস্য, ধনুকের টঙ্কার ও ঘণ্টাধ্বনিতে ত্রিলোক প্রকম্পিত হ'ল। ঐ দুঃসহ শব্দ শুনে মহিষাসুর ভয়ানক বিচলিত হ'য়ে উঠল। তার আজ্ঞায় অসুর-সেনাপতিগণ ও সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। মহিষাসুর নিজেও বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে দেবীর দিকে ধেয়ে এল। রণাঙ্গনে উপস্থিত হ'য়ে সে দেখল—দেবীর মাথার মুকুট গগন স্পর্শ করেছে, পদভারে পৃথিবী অবনত, অঙ্গ-জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, ধনুকের টঙ্কারে পাতাল পর্যন্ত আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ, এবং তাঁর সহস্রভুজে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত।

অসুরদের সঙ্গে দেবীর তুমুল যুদ্ধ হ'ল। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে অবশেষে দৈত্যপতি মহিষাসুর অগণন সৈন্য-সেনাপতিসহ দেবীহস্তে নিহত হ'ল। দেবতারা তখন নিজ নিজ অধিকার ফিরে পেলেন। তার ফলে ত্রিভুবন সুস্থ হ'ল। দেবতারা মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি নন্দনপুষ্প দ্বারা ভক্তিভরে দুর্গতিনাশিনী মহামায়াকে অর্চনা করলেন। ত্রিলোকে দেবীর বিজয়োৎসব হ'ল।

শুম্ভ-নিশুম্ভাদি বধ

আবার কত দিন পরে অসুরপতি শুম্ভ এবং তার পরাক্রমশালী ভ্রাতা নিশুম্ভ শচীপতি ইন্দ্রকে পরাজিত ক'রে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দুর্গত দেবগণ তখন দুর্গতিনাশিনী মহামায়াকে স্মরণ করলেন। তিনি তাঁদের রক্ষাকল্পে তাঁদের

সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। দেবীর অপরূপ রূপের প্রভায় চারিদিক আলোকিত হ'ল। তাঁর আশ্চর্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে শুম্ভ তাঁকে বিবাহ করবার প্রস্তাব পাঠাল দূতের মাধ্যমে। শুম্ভের অভিপ্রায় শুনে দেবী গম্ভীর ভাব ধারণ ক'রে বললেন, 'যিনি সংগ্রামে আমায় পরাজিত করবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করবেন, যিনি আমার তুল্য বলশালী—তাঁকেই আমি পতিরূপে বরণ ক'রব।'

দূত সুগ্রীবের মুখে দেবীর ঐরূপ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অসুরপতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল। সে তখন মহাসুর ধূম্রলোচন নামক সেনাপতিকে সৈন্য-সামন্ত সহ পাঠাল, দেবীকে বলপূর্বক নিয়ে আসার জন্য। ধূম্রলোচন ও তার সৈন্যসামন্তেরা দেবীর সম্মুখীন হওয়া মাত্রই তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। শুম্ভ তখন চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই দুর্ধর্ষ অসুরকে পাঠাল অগণন সৈন্য-সহ। চণ্ড-মুণ্ডও সসৈন্যে নিহত হ'ল। তখন অসুরপতির আজ্ঞায় রক্তবীজ নামক দুর্দান্ত অসুর ধেয়ে আসে যুদ্ধ করার জন্য। সেও হতবীর্য হ'য়ে প্রাণ হারাল দেবীর দিব্য-শক্তির কাছে।

এইরূপে সমস্ত সৈন্য-সেনাপতি দেবী-হস্তে নিহত হ'লে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'ল। অদ্ভুত যুদ্ধ ক'রে তারাও দেবীর পদমূলে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হ'ল। শুম্ভ-নিশুম্ভাদি অসুরেরা দেবী-হস্তে নিহত হ'লে দেবতারা স্বর্গরাজ্য পুনরায় লাভ করলেন। তখন ত্রিলোক প্রকৃতিস্থ হ'ল, সর্বত্রই শান্তি স্থাপিত হ'ল।

মায়ের পূজা

সেখ সদরউদ্দীন

মায়ের কৃপা কেমন ক'রে
তুই, মাগিস কাঙালী?
ভায়ের তাজা রক্তে যে মা'র
চরণ রাঙালি!

ভাইকে ভাল বাসলি নাক'
মা, ফেলছে আঁখি-জল,
কেমন ক'রে পূজা রে তোর
সফল হবে বল?

মায়ের পূজা করিস পরে
শ্রদ্ধা-অনুরাগে,
ভাইকে ভাল বাসিস রে তুই
অর্ঘ্য দেবার আগে।

ভেদ না ক'রে মুচি-মেথর
হিন্দু-মুসলমান,
সবার মাঝে বিলিয়ে দে তোর
প্রীতি অফুরান!

ফুটবে রে তোর ঘরের গাছে
ফুল যে রাশি রাশি,
তার মাঝেতেই হরষ-মনে
দেখিস মায়ের হাসি।

ফুলের রাশি ঝরবে যবে
মায়ের পদতলে,
দেখবি সুখে মায়ের পূজা
ভাসি' নয়ন-জলে॥

শক্তিরহস্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

পরাশক্তি অনাদি ও অনন্ত। শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে কেহ কখন সক্ষম হন নাই এবং হইবেনও না। জলের হিমশক্তির বা অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় শক্তি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। পরিদৃশ্যমান জগৎ শক্তিরই বিকাশ, শক্তি ভিন্ন কোন কিছুরই উদ্ভব সম্ভব নহে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—সেই এক মহাশক্তির লীলামাত্র। যখন এই লীলার কার্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন শক্তির ব্যক্তাবস্থা; এবং যখন মহাপ্রলয়ে লীলা অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন শক্তির অব্যক্ত অবস্থা। অব্যক্ত অবস্থায় শক্তি ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকেন। কুণ্ডলীকৃত সর্পে যেমন সর্পের গতিশক্তি লীন অবস্থায় থাকে, উহাও সেইরূপ। সর্পটি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে যেমন তাহার গতিশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেইরূপ পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলে মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। যাহা কারণ তাহাও শক্তি এবং যাহা কার্য তাহাও শক্তি; তবে কারণরূপে শক্তি অব্যক্ত ও কার্যরূপে ব্যক্ত। মহাপ্রলয়ের অবসানে যখন জীবের সুপ্ত কর্মবীজ ফলপ্রসূ হইয়া উঠে, তখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিগুণময়ী শক্তি—যিনি সৃষ্টির বীজ কুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি জাগিয়া ওঠেন। ব্রহ্ম যেন স্থির সমুদ্র ও শক্তি সেই সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের ন্যায়। নিম্নে স্থির ও গভীর সমুদ্র না থাকিলে যেরূপ তদুপরি ঊর্মিমালার আবির্ভাব সম্ভব হয় না, সেইরূপ পদতলে শিবরূপী নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম না থাকিলে সগুণা লীলাময়ী মহাশক্তি কালীর নৃত্যও সম্ভব হয় না। কিন্তু ঐ সিন্ধু ও তাহার বীচিমালা যেরূপ স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি স্বরূপতঃ এক।

এই মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপা। বিদ্যা মায়া জীবকে শ্রেয়-পথে চালিত করেন ও অবিদ্যা মায়া তাহাকে প্রেয়-পথে লইয়া যান। জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিদ্যার বিভূতি; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি অবিদ্যার বিস্তার। অতএব অবিদ্যা ভোগবন্ধনদায়িনী ও বিদ্যা জ্ঞানশক্তি-প্রদায়িনী। মহামায়া ব্রহ্মস্বরূপিণী। ব্রহ্ম নিত্যচৈতন্যময়, মহামায়া মহাশক্তিও নিত্য-চৈতন্যময়ী। চৈতন্যময় ব্রহ্মের সহিত শক্তির কোনকালে বিচ্ছেদ নাই, এইজন্য শক্তিকেও চৈতন্যময়ী বলিতে হয়, অতএব শক্তিকে কখন জড় বলা যায় না। ব্রহ্ম ও শক্তি মিলিত হইয়াই চরম তত্ত্ব। দুইটি দানা মিলিত হইয়া যেমন একটি বীজ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তিরূপ দুইটি দানার মিলনই পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ মিলিয়া সমুদ্র, তরঙ্গকে বাদ দিলে সমুদ্রকে আর চেনা যায় না। এই দুইটির একটিকে বাদ দিলে সৃষ্টি হইতে পারে না।

মহামায়া যিনি পরব্রহ্মের শক্তি, তাঁহাকে মায়া ও অবিদ্যা এই দুই ভাবেও ভাগ করা হইয়া থাকে। মায়ায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয় ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলা হয়। উক্ত মায়া সহযোগেই ব্রহ্ম জগৎকারণ ঈশ্বর। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে যখন শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখন তাঁহাকে মায়া বলা হয় এবং মলিনসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে

বলা হয় অবিদ্যা। জীবের অন্তরে যে শক্তির অনুভব হয়, তাহা জীবাত্মা; গীতাকার তাঁহাকেই পরা-প্রকৃতি বলিয়াছেন। বাহিরে উপলব্ধ যে প্রকৃতি, তাহাই অপরা প্রকৃতি। এই জগৎ সেই মহা-শক্তির খেলা মাত্র। ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি প্রকাশ পাইতেছেন। সেই মহাশক্তি জগজ্জননী সগুণা, আবার নির্গুণা। তিনি ত্রিগুণময়ী আবার গুণাতীতা।

আমাদের এই দেহের মধ্যেই শিব ও শক্তি আছেন। শিব হইতেছেন পরমাত্মা ও শক্তি জীবাত্মা; এইজন্য যোগশিখ-উপনিষদে এই দেহকে 'শিবালয়' বলা হইয়াছে। ইহা উপ-নিষদুক্ত একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষীর কথার অনুরূপ। শিব শক্তিরূপী ও শক্তি শিবরূপিণী, চিন্ময়ী। অন্তরে ও বাহিরে যেদিকে দেখা যায়, সেখানেই শিব ও শক্তি। মানুষের বুদ্ধি-শক্তি, বাক্‌শক্তি, কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনু-ভবশক্তি, চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং দৈহিক শক্তি, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তি প্রভৃতি সমুদয় শক্তিই একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। এক কথায় যাহা অব্যক্ত, তাহা গুণাতীত; ও যাহা ব্যক্ত তাহাই গুণের লীলা। জগতে পুং-বাচক সকল পদার্থই শিব ও স্ত্রী-বাচক সকল পদার্থই শক্তি। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হই-য়াছে, 'মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।' এই ব্রহ্ম ও শক্তির একত্ব যিনি অব-গত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কখন ভেদ থাকিতে পারে না, তাই শক্তিবিহীন হইয়া শিব ও শিব-বিহীন হইয়া শক্তি কখন থাকিতে পারেন না। শক্তি পরমাত্মার সহিত নিত্যসংযুক্ত।

এক শ্রেণীর বেদান্তবাদী তাঁহাদের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিকে মিথ্যা বলেন। কিন্তু মানুষের যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তিনি শক্তির এলাকার মধ্যে। বস্তুতঃপক্ষে শক্তি মিথ্যা হইতে পারেন না, এমন কি মহা-প্রলয়েও শক্তির নাশ হয় না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে পুনরায় সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব? সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহাকারে নিত্য। সৃষ্টিকে অনিত্য বলিবার কারণ উহা আদিমান্ ও অন্তযুক্ত।

সৃষ্টি ব্রহ্মের সত্তার ন্যায় শাশ্বত নহে, এইজন্য উহাকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। উক্ত বৈদান্তিকগণের যুক্তি এই যে যেহেতু সৃষ্টি মিথ্যা, সেই হেতু যে শক্তির দ্বারা এই সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাহাও মিথ্যা। তাঁহাদের মতে এক-মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই কেবল সত্তা আছে, শক্তির কোন পৃথক্ সত্তা নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, এইবার তাহা আলোচনা করা যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শক্তিকে কখন মিথ্যা বলেন নাই। শক্তির রহস্য সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিস্তৃত প্রসঙ্গাদি করিয়াছেন, অন্য কোন অবতার পুরুষ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার মতে যতদিন মানুষের দেহজ্ঞান আছে, যতদিন মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়বদ্ধ ও যতদিন সে বাহ্যজগৎ দেখিতেছে, ততদিন তাহাকে শক্তি স্বীকার করি-তেই হইবে। বেদান্তবিচারে ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য হইলেও মানুষ যতক্ষণ নিজের দেহমন সত্য বলিয়া স্বীকার করে, ততক্ষণ জগৎও সত্য এবং জগৎ সত্য হইলে জগৎকারণ যে মহাশক্তি তিনিও সত্য। 'যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তখন তাঁকে বাক্যমনের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম বলি।' 'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটি বোধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দুটি থাকে না, অভেদ, এক,—যে একের দুই

নেই—অদ্বৈতম্।' 'বেদান্তবাদী বলেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীবজগৎ—এ-সব শক্তির খেলা, বিচার করতে গেলে এ-সব স্বপ্নবৎ। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু, ব্রহ্মই বস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। যতক্ষণ একটু 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা, তাঁর আণ্ডারে (under), তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার জো নেই।' 'মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন। দুটি জিনিস বইতো আর কিছু নেই—ব্রহ্ম আর শক্তি। জ্ঞান হ'লে ও দুটি এক বোধ হয়। তিনি যতক্ষণ লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ দুটা ব'লে বোধ হয়, কিন্তু আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। মায়া ভগবানেরই শক্তি। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তখন সকল শক্তির সংহরণ ক'রে নিষ্ক্রিয় হ'তে পারেন। যখন নিষ্ক্রিয়, তখনও সকল শক্তি তাঁতেই পর্যবসিত থাকে। ব্রহ্মই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। তিনি যদি 'আমি' একবারে মুছে দেন, তখন যে কি হয়, মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ ঘট, ততক্ষণ দু-ভাগ জল—ঘটের ভেতরে এক ভাগ, বাইরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে এক জল; তাও বলবার জো নেই, কে বলবে? ঘটটি কি? 'আমিই' ঘট। ঐ 'আমি' যদি যায়, তাহলে যা আছে তাই আছে, মুখে বলবার কিছু নেই। যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না।' অতএব যতক্ষণ জীবের 'আমি' বোধ আছে, ততক্ষণ শক্তিকে মিথ্যা বলা যায় না।

সাধনকালে সাধক ঐ মহাশক্তিরই উপাসনা করেন। কেহ কেহ চেতনাযুক্ত শক্তিকে অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী শক্তিকে 'মা' বলিয়া উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ শক্তিযুক্ত চেতনের বা ব্রহ্মের উপাসনা করেন। শক্তিহীন ব্রহ্মের উপাসনা কেহই করেন না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে শক্তি-উপাসনারই নামান্তর বলা যাইতে পারে। যদি অনন্তকে মানুষ চিন্তা করে, তবে হয় তাঁহাকে অনন্ত সত্তাস্বরূপ, অথবা অনন্ত শক্তিরূপিণী বলিয়াই চিন্তা করিতে হইবে; এবং শক্তি ভিন্ন কোন চিন্তাই আমাদের সম্ভব নহে। সাধনের চরম পরিণামে হয় মহাশক্তি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন, না হয় ব্রহ্মই শক্তির সহিত এক হইয়া যাইবেন। ব্রহ্ম ও শক্তি এই দুইটির মধ্যে একটি অপরটিতে বিলীন হইয়া যাইবেন। তখন একমাত্র সত্তা থাকিবেন, যাঁহাকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, তাই সাধকগণ শক্তিরূপিণী মাকেই বলেন অনন্ত আনন্দময়ী। তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণই আমাদের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন; তিনি তন্ত্রসাধনার সময় আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ত্রিপুরাসুন্দরীজ্ঞানে পূজা করিয়া সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন; তিনি প্রতি নারীতে জগন্মাতাকে উপলব্ধি করিতেন। শাক্ত ধর্মমতে সাধককে পরাশক্তির অনাদিত্ব, অনন্তত্ব এবং সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিতে হয় ও জগতের যাবতীয় নারীতে জগন্মাতার বিকাশ দেখিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উক্ত বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শাক্ত হইলেও বিশুদ্ধ মাতৃভাব ব্যতীত তন্ত্রোক্ত বামাচারের সাধনা তিনি করেন নাই। ঐ পথকে তিনি বিপদ্‌সঙ্কুল বলিয়াছেন। তন্ত্রকর্তা হয়তো এক শ্রেণীর অত্যন্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তিকে সাধনপথে আকৃষ্ট করিবার জন্য তন্ত্রমধ্যে উহাকে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু ঐ পথ সকলের জন্য নহে। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ এই ধারণা পোষণ করেন যে শক্তি (স্ত্রী) গ্রহণ ব্যতীত তন্ত্র-

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না; এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা শক্তি গ্রহণ করেন ও মনের দুর্বলতার জন্য ঐ উপায়ে সিদ্ধিলাভের পরিবর্তে অধঃপতিত হন। তাই যুগাবতার ভগবান তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার পবিত্রতম দিকটি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া তাহার আদর্শ জগদ্বাসী নরনারীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে শক্তিসাধকগণ যদি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধনার ক্ষেত্রে পতনের কোন কারণ ঘটিবে না। তিনি বলিতেছেন, 'আমার মাতৃভাব, সন্তানভাব। এ ভাব দেখলে মায়া-দেবী পথ ছেড়ে দেন লজ্জায়। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথা আছে, কিন্তু সে ভাব ভাল নয়। বীরভাবে প্রায়ই পতন হয়, ভোগ রাখলেই ভয়। মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী, কোন ভোগের গন্ধ নেই, এতে কোন বিপদ নেই। স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি। এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে—এই শেষ কথা।'

এই যে পবিত্রতম ভাব, ইহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। কারণ যতদিন নারীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি না হয়, ততদিন পর্যন্ত কোন সাধকই পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না। এই অবস্থা লাভের পর সাধকের সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মায় ও তখন তাঁহার নিকট আর স্ত্রী-পুরুষ ভেদবোধ থাকে না। সাধনার পরিসমাপ্তির পর সাধক সদা দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ও সমাধির মহানন্দ ভোগ করেন।

এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে: শক্তিসাধক অর্থাৎ মাতৃভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী? সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণই সাধনের চরম অবস্থায় স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতে স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ অবস্থার কথা—I and my Father are one. এই হিসাবে বলা যায় দ্বৈতবাদ সাধনের প্রথম সোপান এবং শাক্তগণ যখন জগন্মাতাকে উপাসনা করেন, তখন তাঁহারা দ্বৈতস্তরেই থাকেন, কারণ তখন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে ও তখন পর্যন্ত তাঁহারা জগন্মাতার সহিত একীভূত হইয়া যান না। ভক্তির আতিশয্যে তাঁহারা হয়তো বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' ইহা বলিলেও জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত থাকেন। তবে এই একত্ব জ্ঞান থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত 'তিনি ও আমি'—এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'মা' বলিয়া প্রার্থনা চলে। সাধনের চরম অবস্থায় বিশ্বজননী তাঁহার ভক্ত সন্তানকে সংসারের আবিলতা হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে অভয় অঙ্কে চিরন্তরে গ্রহণ করেন ও তাঁহারই নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত সত্তার সহিত তাহাকে এক করিয়া লন।

শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মের জীবভাব। জীবরূপে যখন তিনি পুত্রত্ব স্বীকার করেন, তখন শিব তাঁহার পিতা ও শক্তি মাতা। ঐ জীব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন আত্মস্মরণ বা পিতৃস্মরণ করেন, তখন মাতাই তাঁহাকে পিতার সহিত এক করিয়া দেন। সাধক তখন নির্বাণ মুক্তি না চাহিলেও এবং মাতৃসেবাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেও পরিশেষে মা তাঁহাকে চিন্ময় সত্তায় বিলীন করিয়া দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে অদ্বৈত ভাব শেষ কথা, উহা বাক্যমনের অতীত, উপলব্ধির বিষয়। অতএব ভাষার দ্বারা উহার পরিচয় দেওয়া বা বাক্য দ্বারা উহা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্ম ও শক্তির একত্বসূচক আর একটি বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি: 'বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে, তাঁকেই আমি মা ব'লে ডাকি।'

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

কালমহিমানুবর্ণনম্

সংসারে সর্বপদার্থ কালের বশীভূত। বর্তমান প্রসঙ্গে দশটি শ্লোকে সেই কালের মহিমা বর্ণিত হইতেছে। প্রথমেই গ্রন্থকার কালের সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রকাশ করত তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন :

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রং চ তৎ
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষৎ তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উদ্বৃত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ
সর্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ ॥৪১॥

সেই সুরম্য রাজধানী, সেই বলবিক্রমশালী সর্বজনপূজ্য রাজা ও তাঁহার পার্শ্বস্থ সামন্তমণ্ডল, সেই রাজসভার বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও চতুষ্পার্শ্বে শোভা-বিস্তারকারিণী চন্দ্রবদনী রমণীগণ, সেই বলদৃপ্ত উন্মার্গগামী রাজকুমারবৃন্দ, স্তুতিপাঠক সেই বন্দিবর্গ ও তাহাদের স্তুতিকথন—এই সমস্তই যাঁহার দ্বারা কবলিত হইয়া স্মৃতিরূপে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই সর্বশক্তিমান্ কালস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥৪১

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো
যত্রাপ্যেকস্তদনু বহবস্তত্র নৈকোঽপি চান্তে।
ইত্থং নেয়ৌ রজনিদিবসৌ লোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ
কালঃ কল্যো ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিশারৈঃ ॥৪২॥

বর্তমান শ্লোকে কালকে অক্ষক্রীড়ানিপুণ পুরুষের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সর্বপ্রাণি-নিয়ন্তৃত্ব কথিত হইতেছে : যে গৃহে (বা অক্ষক্রীড়া-পাত্রে) এক সময় বহু (প্রাণী বা ঘুঁটি) বিদ্যমান ছিল, সেখানে ক্রমে একটিমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, পুনঃ যেখানে একটিমাত্র বিদ্যমান সেখানে ক্রমশঃ বহু একত্র হয় ও ক্রীড়াবসানে আবার একটিও অবশিষ্ট থাকে না।—এইরূপে সর্বগ্রাসী সুচতুর, অক্ষক্রীড়ানিপুণ কালস্বরূপ ভগবান দিবারাত্রিরূপী অক্ষদ্বয় পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ ও গ্রহণ করত এই সংসাররূপ অক্ষক্রীড়া-ফলকে (পাত্রে) প্রাণিদিগকে ঘুঁটিস্বরূপ করিয়া বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছেন ॥৪২

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভিঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥৪৩॥

মোহমদিরাপানে প্রমত্ত মানব কালের এই বিচিত্রলীলা, এই অদ্ভুত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না, ইহাই বর্ণিত হইতেছে :

আদিত্যের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা অহরহঃ আয়ুক্ষয় হইতেছে; দেহযাত্রার্থ বহুবিধ প্রভূত আয়াসসাধ্যকার্যে চিত্ত নিবিষ্ট থাকাতে কাল সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ব্যতীত হইয়া যাইতেছে; জন্ম, বার্ধক্য, নানাবিধ বিপদ, মৃত্যু প্রভৃতি সম্মুখে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়াও প্রাণে ত্রাস উৎপন্ন হইতেছে না। বুদ্ধিভ্রংশকারিণী মোহময়ী প্রমাদরূপিণী মদিরা পান করত সমস্ত জগৎ বিবেক-জ্ঞানরহিত উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ।৪৩

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতপ্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈরিত্থংবিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহান্ন লজ্জামহে ॥৪৪॥

অহো! প্রমাদগ্রস্ত হইয়া লোকে কালের মহিমা অবগত হইতে পারিতেছে না ইহাও কালেরই প্রভাব। পুনঃপুনঃ চক্রবৎ একই দিনরাত্রি-প্রবাহ চলিতেছে, বিষয়-সম্পাদনে উদ্যোগী মনুষ্যগণ সুগুপ্ত প্রারব্ধ-তাড়িত হইয়া, জানিয়া শুনিয়া বারবার উক্ত ও অনুভূত বিষয়সকল ভোগ করিতে করিতে বৃথাই সংসারমার্গে ধাবিত হইতেছে। অহো! এই চর্বিত চর্বণ, এই একই বিষয়ভোগ করাইয়া সংসার আমাদিগকে কি হীনদশাগ্রস্তই না করিয়াছে! তথাপি আমরা মোহবশতঃ লজ্জিত হই না ।৪৪

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে
স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুর্ধর্মোঽপি নোপার্জিতঃ।
নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্ ॥৪৫॥

সাংসারিক ব্যাপারে খিন্নচিত্ত ব্যক্তিদিগের খেদোক্তি বর্ণিত হইতেছে:

ভববন্ধন-ছেদনরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরমেশ্বর শ্রীশিবশম্ভুর চরণকমলযুগল শাস্ত্রবিধি অনুসারে (মনঃসমাধান পূর্বক) চিন্তন করি নাই, সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত জ্যোতিষ্টোমাদি যাগানুষ্ঠানও করি নাই, কামও জীবনে কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় নাই—অহো! গর্ভধারিণী জননীকে জরাজীর্ণ করিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে! ৪৫

নাভ্যস্তা প্রতিবাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা
খড়্গাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদলনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ।
কান্তাকোমলপল্লবাধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে
তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ ॥৪৬॥

যে অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহা যথাবিধি সম্পন্ন না হইলে বৃথাই আয়ু ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা সূচনা-পূর্বক বলিতেছেন: প্রতিবাদিগণের পাণ্ডিত্য-গর্ববিনাশকারিণী ও বিনীতগণের হৃদয়াহ্লাদিনী বেদ-শাস্ত্রাদি বিদ্যা অধ্যয়ন ও পরিশীলন করি নাই; তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা হস্তিমস্তকের পৃষ্ঠদেশ

বিদারণ করত, শক্রকুল নির্মূল করত আস্বর্গপ্রসারী কীর্ত্তিও অর্জিত হয় নাই; বিমল চন্দ্রোদয়ে কামবিলাসাদি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছি;—অহো নির্জন গৃহমধ্যস্থ দীপালোকের ন্যায় বৃথাই যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। ৪৬

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তং চ নোপার্জিতং
শুশ্রূষাঽপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিতা।
আলোলায়তলোচনাঃ প্রিয়তমাঃ স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোঽয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রের্যতে ॥৪৭॥

বিদ্যাদি উপার্জন না করিয়া পরপ্রদত্ত অন্নদ্বারা জীবন নির্বাহ করাতে আয়ু বৃথাই ব্যতীত হইয়াছে। এইরূপে পশ্চাত্তাপ পূর্বক বিদ্যাদি লাভের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিতেছেন:

জীবনে পরমার্থসাধক বিদ্যালাভেও সমর্থ হইলাম না, ইচ্ছাকৃত পর্যাপ্ত ধনও উপার্জন করা হইল না, একাগ্রচিত্তে পিতামাতার পরিচর্যাও করি নাই, 'সাংসারিক' সুখও কিছুমাত্র ভোগ করা হয় নাই; অহো! কাকের ন্যায় পরান্ন ভোগলালসায় বৃথাই জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল। ৪৭

বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চিরপরিচিতা এব খলু তে
সমং যৈঃ সংবৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিষয়তাং তেঽপি গমিতাঃ।
ইদানীমেতে স্মঃ প্রতিদিবসমাসন্নপতনা
গতাস্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ ॥৪৮॥

যে স্বদেহ-পোষণার্থ লোকে নীচ জনের সেবা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কালবশে সেই দেহও বিনষ্ট হয়, অতএব তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদারাধনেই মনোনিবেশ করা কর্তব্য, এই অভিপ্রায়ে কালের বিচিত্র পরিণাম বিবৃত হইতেছে:

যে মাতাপিতা হইতে আমরা জাত হইয়াছি, তাঁহারা বহুদিন পূর্বেই কাল-কবলিত হইয়াছেন; যাঁহাদের সঙ্গে একত্র পালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারাও এখন স্মৃতির বিষয় হইয়াছেন অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছেন। আর আমরা এখন এই বার্দ্ধক্য-দশায় প্রতিদিন বালুকাময় নদীতীরস্থ আসন্ন-পতনোন্মুখ বৃক্ষতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৮

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্ধং গতং
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্ ॥৪৯॥

মানুষের আয়ু বিধাতা কর্তৃক শতবর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহার অর্দ্ধভাগ রাত্রিকালীন নিদ্রাবস্থাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। বাকী জাগ্রৎকালীন অর্দ্ধভাগ বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থার জড়তা ও শক্তিহীনতাতেই অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট পঞ্চবিংশতি বৎসর নানা ব্যাধি ও পুত্রকলত্রাদি বিয়োগজনিত দুঃখসহ (জীবিকা উপার্জনের নিমিত্ত) ধনাঢ্যগণের কষ্টকর পরিচর্য্যাদিতে বিগত হয়। জলতরঙ্গতুল্য চঞ্চল ও ক্ষণিক এই জীবনে প্রাণিগণের সুখ কোথায়? ৪৯

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সংপূর্ণবিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততনু-
র্নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্ ॥৫০॥

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখ উপলব্ধ হয় না, মৃত্যুই সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইহা বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন:

মনুষ্য ক্ষণমধ্যে বাল্যাবস্থা ও স্বল্পকাল মধ্যেই ভোগোন্মুখ যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্ষণমধ্যে বিত্তহীন দরিদ্র আবার ক্ষণকাল মধ্যেই বিত্তশালী হইয়া থাকে। এইরূপে অচিরেই কুঞ্চিত লোলচর্ম ও জরাজীর্ণাঙ্গ হইয়া মনুষ্য এই কপট সংসার-নাটকাবসানে বিভিন্ন কৃত্রিম বেশ পরিবর্তন-কারী নটের ন্যায় যমরাজপুরী-রূপ যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়। ৫০

যতিনৃপতিসংবাদবর্ণনম্

অতীত অনন্ত পুণ্য পরিপাক বশতঃ শুভভাগ্যোদয়ে পূর্বকথিত কাল-পরিণাম সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তীব্রবৈরাগ্যসহায়ে কেহ কেহ বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করত পবিত্র যতিধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। সংসারভোগে বিতৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ত্রৈলোক্যরাজ্যভোগও তৃণবৎ তুচ্ছ প্রতীত হয়। কোন রাজার প্রতি বৈরাগ্যবান্ যতিপ্রবরের উক্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে 'নিরঙ্কুশ ও নিঃস্পৃহ যতিভাবই মুমুক্ষুগণের অবশ্য সাধনীয়' ইহাই জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে 'যতিনৃপতি-সংবাদ' আরব্ধ হইতেছে:

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ।
ইত্থং মানধনাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং
যদ্যস্মাসু পরাঙ্‌মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ ॥৫১॥

হে রাজন্! তুমি যদি রাজা বলিয়া উন্নতমস্তক, তাহা হইলে আমরাও গুরুসেবালব্ধ বিবেকবুদ্ধির গর্বে সমুন্নতশির; তুমি যদি বিত্তবৈভবে প্রসিদ্ধ, তবে বলি, আমাদেরও বিদ্যার যশোগান কবিগণ দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিয়া থাকেন। এইরূপে ধনমানাদি দ্বারা আমাদের উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান; এই জন্য তুমি যদি আমাদের প্রতি অনাদরপরায়ণ হও, তাহা হইলে আমরাও তোমার প্রতি একান্তই নিঃস্পৃহ জানিও। ৫১

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরামীশ্মহে যাবদর্থং
শূরস্ত্বং বাদিদর্পব্যুপশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং নঃ।
সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামা
ময্যপ্যাস্থা ন তে চেৎ ত্বয়ি মম নিতরামেব রাজন্ননাস্থা ॥৫২॥

পূর্বোক্ত বিষয়টিই প্রকারান্তরে বর্ণিত হইতেছে: হে রাজন্! তুমি প্রভূত ধনরাশির অধিপতি, আমরাও অশেষ শাস্ত্রমর্মার্থ-পারদর্শী; তুমি যুদ্ধে রিপুদলনে কুশল, আমরাও শাস্ত্রার্থ-

করণে প্রতিবাদিগণের পাণ্ডিত্য-গর্ববিনাশে সুচতুর ; তোমাকে ধনীরা বা ধনাকাঙ্ক্ষিগণ ধনলোভে সেবা করিয়া থাকে, রাগদ্বেষাদিবুদ্ধিগত মলিনতা প্রক্ষালনার্থ অধ্যাত্মতত্ত্বশুশ্রূষু মুমুক্ষুগণ আমাদেরও সশ্রদ্ধ সেবা করিয়া থাকেন। যদি আমাদের উপর, হে রাজন্! তোমার শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তোমার উপরও আমাদের কোন আস্থা নাই, অর্থাৎ আমরাও তোমার কোন অপেক্ষা রাখি না।৫২

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ　　সম ইব পরিতোষো নির্বিশেষো বিশেষঃ।
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা　মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥৫৩॥

চিত্তে সন্তোষ বিদ্যমান থাকিলে কোন কৃচ্ছ্রতাই কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয় না—রাজার প্রতি যতির এইরূপ উক্তি বিবৃত হইতেছে : হে রাজন্! বল্কলাদি পরিধানেই আমরা পরিতুষ্ট আর তুমি বিচিত্র বহুমূল্য বস্ত্রাদিতে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক ; সন্তোষ কিন্তু আমাদের উভয়েরই তুল্য, তোমার ও আমার পরিতোষের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ নাই। যাহার তৃষ্ণা বলবতী, সংসারে সেই দরিদ্র। যে কোন উপায়ে মনে সন্তোষ থাকিলে ধনবান্ই বা কে, আর দরিদ্রই বা কে? ৫৩

ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং ক্ষিতিরপি শয়নার্থং বাসসে বল্কলং চ।
নবধনমধুপানভ্রান্তসর্বেন্দ্রিয়াণামবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জনানাম্॥৫৪॥

শরীরযাত্রা যে কোন উপায়ে নির্বাহ হইয়া যায়, অতএব দুর্জনগণের উদ্ধত ব্যবহার আমরা কেন সহ্য করিব? ইহাই বর্তমান শ্লোকে বলা হইতেছে : ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত ফল ও তৃষ্ণা শান্তির জন্য সুমিষ্ট সুপেয় জল সুলভ, শয়নার্থ ভূশয্যাও বিদ্যমান এবং আচ্ছাদনের নিমিত্ত বল্কল-চীরাদিও দুষ্প্রাপ্য নহে। সুতরাং সদ্যোলব্ধধনমদমত্ত ও বিভ্রান্তচিত্ত কুপথগামী দুর্জনদিগের অনাদর ও উপেক্ষাপূর্ণ ব্যবহার আমরা সহ্য করিতে পারি না। ৫৪

অশীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥৫৫॥

দুর্বৃত্ত রাজন্যাদির সেবাদ্বারা জীবন ধারণাপেক্ষা ভিক্ষাশনে কালযাপনও শ্রেয়ঃ। পূর্বোক্ত এই সকল কথাই অন্য ভঙ্গিতে বর্ণিত হইতেছে : আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন, দিগম্বর পরিধান ও পৃথিবীপৃষ্ঠেই শয়ন করিব,—(এই রূপেই যখন আমাদের জীবন উত্তমরূপে ব্যতীত হইতে পারে তখন) ঐশ্বর্যমদান্ধ রাজাদিগের নিকট আমাদের কি প্রয়োজন? ৫৫

[আশাবাসো বসীমহি—দিগ্‌বস্ত্র পরিধান করিব। ঈশ্বরৈঃ—ঐশ্বর্যশালী রাজাদিগের দ্বারা।]

ন নটা ন বিটা ন গায়কা ন চ সভ্যেতরবাদচুঞ্চবঃ।
নৃপমীক্ষিতুমত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ॥৫৬॥

আমরা তো নাট্যনিপুণ নট নহি, ধূর্ত বিটও নহি, আমরা সঙ্গীতবিদ্যাকুশল গায়ক নহি, জন-মন-বিনোদকারী পরিহাসকুশল অশিষ্টালাপী সভাসদও নহি, আর আমরা সুন্দরী স্ত্রীও নহি, সুতরাং রাজদর্শনে আমাদের কি প্রয়োজন? রাজসভায় নট প্রভৃতিরাই সম্মান লাভ করিয়া থাকে, বিদ্বান্‌গণ নহেন। অতএব রাজদর্শন বা রাজসেবা করা আমাদের একান্তই অনুচিত। ৫৬

বিপুলহৃদয়ৈরীশৈরেতজ্জগজ্জনিতং পুরা বিধৃতমপরৈর্দত্তং চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা।
ইহ হি ভুবনান্যন্যে ধীরাশ্চতুর্দশ ভুঞ্জতে কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ॥৫৭॥

জগতের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের আধিপত্য লাভ করিয়া অভিমানবশতঃ পুরুষের বিষয়মদে উন্মাদবৎ আচরণ নিতান্তই অনুচিত, ইহাই কথিত হইতেছে :

পূর্বে (হরিশ্চন্দ্রাদি) এমন উদারবুদ্ধি সার্বভৌম নৃপতিগণ ছিলেন, যাঁহারা (স্বকীয় জ্ঞান কর্ম দ্বারা) জগৎকে সংস্থাপিত করিয়াছেন ; আর (মহারাজ যযাতি প্রভৃতি) এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা জগৎকে সম্যক্‌রূপে পরিপালন করিয়াছেন ; (বলি প্রভৃতি) এরূপ রাজাও ছিলেন, যাঁহারা শত্রুকুল নির্মূল করত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া তৃণসম তুচ্ছজ্ঞানে উহা অপরকে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালেও এমন অনেক ধৈর্যশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন পালন করিতে সমর্থ। ইহা জানিয়াও মাত্র কতিপয় গ্রাম বা নগরের আধিপত্য লাভ করিয়া মানুষ এত মদান্ধ হয় কেন ? ৫৭

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি ন জাতং নৃপশতৈ-
র্ভুবস্তস্যা লাভে ক ইব বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাম্।
তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়বলেশেঽপি পতয়ো
বিষাদে কর্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্॥৫৮॥

সংসারে ভূস্বামিত্ব-অভিমান অতি তুচ্ছ, ইহাই বর্ণিত হইতেছে :

এই পৃথিবীকে শত শত নৃপতি ভোগ করিতেছে, অভুক্তাবস্থায় ইহা একক্ষণও কোন কালে থাকে নাই, তাহার (সেই পৃথিবীর) আধিপত্য-লাভে নরপতিগণের এমন কি উৎকর্ষ হইয়া থাকে ? এই ভূমিখণ্ডের (পৃথিবীর) এক অংশের এবং তাহারও অতি ক্ষুদ্র একদেশমাত্রের আধিপত্য লাভ করিয়া বস্তুতঃ যেখানে (অল্পলাভ নিমিত্ত) বিষাদগ্রস্ত হওয়া কর্তব্য, সেখানে মূর্খ ভূস্বামিগণ বিপরীতক্রমে আনন্দানুভবই করিয়া থাকে, ইহাই আশ্চর্য ! ৫৮

মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ সর্বোঽপ্যয়ং নন্বণুঃ
স্বাংশীকৃত্য তমেব সংগরশতৈ রাজ্ঞাং গণা ভুঞ্জতে।
তে দদ্যুর্দদতোঽথবা কিমপরং ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং
ধিগ্‌, ধিক্ তান্ পুরুষাধমান্ ধনকণান্‌ বাঞ্ছন্তি তেভ্যোঽপি যে॥৫৯॥

সামান্য ঐশ্বর্যশালী রাজাদিগের নিকট যাহারা ধন প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহারা অধিকতর ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিতেছেন :

সমুদ্রবেলার জলরেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সমগ্র পৃথিবী-রূপ মৃৎপিণ্ড (বস্তুতঃ বিচারদৃষ্টিতে) একটি ক্ষুদ্র অণু ব্যতীত আর কিছুই নহে। শত শত যুদ্ধ দ্বারা এই মৃৎপিণ্ডই স্বায়ত্ত করিয়া রাজারা ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল দরিদ্র রাজবৃন্দ কিছু দান করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু সেই পুরুষাধমগণের প্রতি শত ধিক্কার—যাহারা সেই ক্ষুদ্র রাজাদিগের নিকট

হইতেও ধনকণা প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব নীচ ব্যক্তিগণের নিকট যাজ্ঞা করা অপেক্ষা পরমানন্দময় যতিজীবন যাপন করা সর্বতোভাবে বিধেয়—ইহাই তাৎপর্য। ৫৯

স জাতঃ কোঽপ্যাসীন্ মদনরিপুণা মূর্ধ্নি ধবলং
কপালং যস্যোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে।
নৃভিঃ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা
নমস্তিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ ॥৬০॥

জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের প্রিয় এরূপ ভক্তগণের জীবনই সফল, অপরের নহে—ভর্তৃহরি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতেছেন:

তিনিই সফলজন্মা পুরুষ, দেহান্তে যাঁহার শ্বেত কপাল (শিরঃ-অস্থি) মদনরিপু শ্রীসদাশিব অলংকাররূপে আপন মস্তকে সর্বোপরি ধারণ করিয়া থাকেন। আপন তুচ্ছ প্রাণপোষণে ব্যগ্রচিত্ত কতিপয় ইতরজন কর্তৃক পূজিত হয় বলিয়া অভিমানী রাজাদিগের এমন অসীম গর্বরূপ তাপের উদ্রেক হয় কেন? বস্তুতঃ ভগবদারাধনা- ও ভগবদনুগ্রহ-বর্জিত জীবন নিষ্ফল। ৬০	[ক্রমশঃ]

শ্যামাসঙ্গীত

[ঝাঁপতাল]

কথা ও সুর—শ্রীশিশিরকুমার ভট্টাচার্য (বি. মিউজিক)

স্বরলিপি : কুমারী দীপ্তি সরকার

হৃদয়েরি রাঙা জবায়, পুজবো দুটি রাঙা চরণ
রাঙা পায়ে লুটিয়ে মাগো, ধন্য হবে বিফল জীবন ॥

ভবের হাটে বেচা কেনা
এবার মা তুই চুকিয়ে দেনা,
চোখের জলে দিবানিশি তোর ধ্যানেতেই আছি মগন ॥

রামপ্রসাদের বেটী হ'লি, মা, গদাধরে কোলে নিলি,
বিবেকানন্দের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিলি।

আমায় মা তুই দিসনে ফাঁকি
জনম বিফল হবে নাকি?
পাষাণ হ'য়ে পাষাণী তুই, আর কত কাল দিবি যাতন ॥

+ ২ ০ ।

II মা গা | রসা -া সা | সা সা | রা সন্ -া I
হৃ দ | য়ে ০ রি | রা ঙা | জ বা০ য়

I পা ধা | সা -রা রা | গা গা | জ্ঞা গা -া I
পুষ্ বো | তু ০ টি | রা ঙা | চ র ণ

গ

I সা সা | গা -া পা | ম্ধা ধা | পমা -া মা I
রা ঙা | পা ০ য়ে | লুটি য়ে | মা০ ০ গো

ম

I সা মা | মা -া পা | গা রা | গা -া গা I
ধ ন্য | হ ০ বে | বি ফল্ | জী ০ বন্

I গা পা | গপা ধন্ র্সা | র্সা র্সা | র্রা না -া I
ভ বের | হা০ ০০ টের | বে চা | কে না ০
আ মায় | মা০ ০০ তুই | দিস্ নে | ফাঁ কি ০

II না না | না -া র্সা | ধর্সা র্সা | না ধা পা I
এ বার | মা ০ তুই | চুকি য়ে | দে ০ না
জ নম্ | বি ০ ফল্ | হ০ বে | না ০ কি

I ম্মা ম্মা | ম্মা -পা পা | ম্মা ধা | পা -মা গা I
চো খের | জ ০ লে | দি বা | নি ০ শি
পা ষাণ | হ ০ য়ে | পা ষা | ণী ০ তুই

ম

I রা গা | মা -পা পা | রা রা | সা -া সা II IIII
তোর ধ্যা | নে ০ তেই | আ ছি | ম ০ গন
আর ক | ত ০ কাল্ | দি বি | যা ০ তন্

II প্ ধ্ | সা -া রা | গা গা | মা রা গা I
রাম্ প্র | সা ০ দের্ | বে টী | হ লি মা

I রা রা | গা -া মা | রা রা | গা -া গা I
গ দা | ধ ০ রে | কো লে | নি ০ লি

I সা গা | পা -া পা | ম্মা -পা | ম্মা -া পা I
বি বে | কা ০ নন্ | দে র্ | ম ০ নে

I পা ধা | পমা -া গা | রা গা | মা -া গা I
জ্ঞা নের্ | আ০ ০ লো | জ্বে লে | দি ০ লি

ইংলণ্ডে এক বৎসর

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লীড্‌স্ পৌঁছবার তিন দিন পরে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করলাম। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্বে গিয়েছিলাম ব'লে ঐ সময়টুকু অপেক্ষা করতে বললেন। আলাপ-আলোচনার পর কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা পদ্ধতি মোটামুটি ঠিক হ'ল। এরপর এঁরা আমার বাসস্থান, শীতের থেকে আত্মরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি ব'লে দিলেন। বিদেশে যাতে আমি একলা বোধ না করি, সে বিষয়েও অনেক কথা হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে লীড্‌স্ ইউনিভারসিটির বয়স ৫০।৬০ বছরের বেশী নয়। তবে যুদ্ধোত্তর কালে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও অনেকগুলি নতুন বাড়ী হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে গেছে, এখন ৩০০০। এর মধ্যে আবার ভারতীয় ৯০ জন। এখানেও বেশীর ভাগ ইংরেজ ছাত্র বৃত্তিভোগী; হয় বিশ্ববিদ্যালয়, নয় কোন শিল্প-সমিতি দিচ্ছে, না হয় যে যার কাউন্টি থেকে বৃত্তি পাচ্ছে।

আর্টস্-ছাত্রদের খুব কম ক্লাস, সায়েন্স-ছাত্রদের কিন্তু ৯টা থেকে ৫টা, বুধবার ও শনিবার বিকেলে ছুটি। রিসার্চের ছাত্রদের রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে দেখতাম, অবশ্য সবাইকে নয়। এদের সকলকে একটা ক'রে চাবি (master key) দেওয়া হয়—যখন খুশি ল্যাবরেটরীতে ঢুকবে ব'লে। ছাত্রেরা বাড়ীতে কেউ পড়ে না—লাইব্রেরীতে ১০০০ ছেলে বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সবাই পড়ে। অবশ্য টার্মিনাল পরীক্ষার পূর্বে পড়ার চাড় বেশী হয়। পরীক্ষার পরই ক্রিসম্যাস, ঈস্টার বা গরমের ছুটি। সে-সব সময়—বিশেষতঃ গরমের দু-মাস ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়।

রাজনীতি-আলোচনা ছেলেদের মধ্যে কম। তবে প্রায় ইউনিয়ন-হলে (Union Hall) তর্ক-যুদ্ধের ব্যবস্থা আছে; সে'টা যেন একটা ছোটখাট পার্লামেণ্ট—কায়দা-কানুনের কোন ত্রুটি নেই। এই হ'ল ভবিষ্যৎ পার্লামেণ্টারিয়ানদের হাতে খড়ি।

'That this house would rather pursue other things than knowledge', 'That this house will not respect the Sabbath', 'That this house is tired of politics', 'That this house has no confidence in Her Majesty's Government', 'That this house would make divorce easier'. —এই-সব তর্কের বিষয়।

ক্লাস বা লাইব্রেরীর তুলনায় এই ইউনিয়নের কার্যকলাপ বা মাতামাতি কোন অংশে কম নয়। প্রত্যেক ছেলেকেই এর সদস্য হ'তে হয়—বাৎসরিক চাঁদা পড়ার খরচের প্রায় সপ্তমাংশ। এখানেই খেলার, রেডিও-টেলিভিসনের, সপ্তাহান্তে নাচের, সিনেমার, নাপিতের, স্নানের, লাইব্রেরী প্রভৃতি—সব কিছুর বন্দোবস্ত আছে। পুরানো বই কেনা-বেচার কেন্দ্র, খাতা-পেনসিল খবরের কাগজ—তাও এখানে। এমন কি ছুটির মধ্যে ছোটখাটো কাজের সন্ধানও এখানে পাওয়া যায়; কেউ ফেরী ক'রে, কেউ পোস্ট পিওনের কেউ বা দোকানে কাজ ক'রে ছুটির সময় কিছু উপার্জন ক'রে নেয়। দুপুরের খাওয়ার জন্য

এই খানেই সস্তা ক্যানটিন। মাছ, মাংস, তরকারী থেকে ফলমূল দুধ, কেক, কফি সবই পাওয়া যায়। লাইসেন্স প্রাপ্ত 'Bar'ও এর মধ্যে আছে।

ইউনিভারসিটি ছাড়া এখানকার সব বড় শহরে আর একটা শিক্ষাকেন্দ্র থাকে। এ-সব জায়গায় নানা রকম টেকনলজি, কমার্স, আর্টস্ শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এরা সাধারণতঃ ডিগ্রি দেয় না; ব্যাবহারিক দিকের ওপর জোর। ছেলেদের ফুরসৎ কম। অনেক ছেলেই কিছুদিন কারখানায় কাজ করবার পর এখানে পড়ছে। অনেকে আবার সকালে দুপুরে অন্য কাজ ক'রে বিকেলের ক্লাসে পড়ে। অনেক ভারতীয় ছাত্র এই রকম কোর্স পড়ে। এখানে অবশ্য ইউ-নিয়নের বন্দোবস্ত কম।

লাইব্রেরী-আন্দোলন যে কতবড়—তা এদেশের যে কোন শহরে গেলেই বোঝা যায়। প্রত্যেক পাড়ায় মিউনিসিপাল লাইব্রেরী, চাঁদা নেই; সব বাসিন্দাই মেম্বার। আর বইএর তাকের কাছে গিয়ে বই পছন্দ করাই এখানকার ব্যবস্থা। চুরির ভয় কম; অবশ্য প্রবেশ-পথে পাহারা থাকে।

ইংলণ্ডের লোক রাস্তায় ঘাটে বিশেষ কথা বলে না; কিন্তু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে মেলা মেশা করবার জন্য বিভিন্ন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বন্দোবস্ত করে। এর প্রথমটা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়েই (University Overseas Warden-এর দ্বারা)। কয়েকটি রোটারি ক্লাবও নিমন্ত্রণ করেন বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য; সকলের কথা টেপ রেকর্ডিং (tape recording) করা হয়, নানা ভাবে ছাত্রদের নিঃসঙ্গতা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য দূর করবার চেষ্টা করে; তবে তার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ হয় না। এই সব আলোচনায় দেখেছি ভারত সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অতি অল্প, এমন কি ভূগোলের জ্ঞানও বড় কম। মনে হয় যুদ্ধের পূর্বে বেশীর ভাগ লোকেরই বিনা কাজে দেশ দেখার অভ্যাস ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই বাঘ, মশা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, সতীদাহ ঘিরেই তাদের প্রশ্ন; অতএব এ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে হয়েছে। আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্বন্ধে এত প্রচার সত্ত্বেও এরা বলে, ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারতীয়েরা ভুল করেছে।

ইতিমধ্যে একদিন প্রফেসারের বাড়ীতে রিসার্চের ছাত্র ও অন্যান্য লেকচারারদের সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ হ'ল। আমি যাওয়া মাত্র আমাকে টয়লেট (Toilot)-এর ঘর দেখিয়ে দেওয়া হ'ল—পরে বুঝেছি অনেকক্ষণ থাকার ব্যবস্থা হ'লে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা এইরূপ। স্ত্রী-কন্যার সঙ্গেও গৃহস্বামী আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা আমাকে আপন ক'রে নিলেন। এক এক ক'রে সকলেই আসতে লাগলেন—সস্ত্রীক অথবা স-বান্ধবী। বান্ধবীদের এ রকম সামাজিক মর্যাদা দেখে এ-সম্বন্ধে আমার ধারণা পালটে গেল। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের বান্ধবীরা সাধারণতঃ নির্বাচিতা ভাবী স্ত্রী। কবে পরীক্ষা শেষ হবে, আর ২১ বছর বয়স পেরুবে—তার অপেক্ষায় থাকে, চাকরির তো অভাব নেই। এখানে একটি নতুন দৃশ্য দেখলাম, শিক্ষক ছাত্রদের গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছেন বিয়ার, শ্যাম্পি, শেরী বা স্যাম্পেন। আমি অবশ্য লেবুর রসের বেশী এগোতে পারলাম না, এটা কেউ অভদ্রোচিত ব'লে মনে করেননি। পুরানো ধাঁচের চুল্লির বুনেদি চাল সকলেই পছন্দ করে। আগুনের পাশে বসে ২০।২৫ জনের গল্প চলতে লাগল। মধ্যে একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোজ (Buffet dinner) সারা হ'ল—অবশ্য নানা রকমের

খাবার জিনিস ছিল। ৫।৬ ঘণ্টায় নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন ফিরলাম তখন রাত ২টা। অবশ্য আমাকে একজন পৌঁছে দিয়ে গেল।

এক অস্টেলিয়ান লেকচারার, প্রায়ই আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন ও সারাদিন গল্প করবার জন্য আটকে রাখতেন। এ এক রকমের সপ্তাহ-শেষ যাপন করা। এঁদের দুটি শিশুকন্যা—যেন গলার হার। এদের মা কোন সময়েই এদের কাছ-ছাড়া করেন না। আয়া রাখার ব্যবস্থা এ-দেশে নজরে পড়েনি। এই স্তরের লোকদেরও ঝি-চাকরের পাট নেই। গৃহস্থালীর কাজে পুরুষেরা মেয়েদের যথাসম্ভব সাহায্য করে। অধ্যাপকের স্ত্রী St. Alban গির্জার পাদরীর কন্যা। পাদরী-পত্নী বড়দিনের বন্ধে আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যান। বৃদ্ধার জন্ম ভারতে—তাই ভারতীয়দের ভালবাসেন। বলেন, 'কৃষ্ণের প্রেম-ধর্ম ভাল লাগে, কিন্তু তোমাদের কালীকে বুঝি না।' আমি তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Women Saints of East and West বইখানি উপহার দিলাম। ঠাকুর ও মা সম্বন্ধে এঁর আবছা ধারণা। দেশে ফেরবার আগে আর একবার যাবার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

অন্য একদিন আর একজন লেকচারারের বাড়ীতেও প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ধরে ভারতীয় দর্শন ও নানা দেবদেবী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল। অবশ্য খাবার দেরী হচ্ছে ব'লে কয়েকবারই ক্ষমা চাইলেন। এঁর স্ত্রীরই সব বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য। এ রকম সাধারণতঃ আমার নজরে পড়েনি। শুনলাম তিনি স্কুলে পড়ান। লেকচারার ওয়েল্‌সের লোক, যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভারতে এক বৎসর কাটিয়ে এসেছেন। সেই সময় একখানি গীতাও কিনেছিলেন—মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের প্রকাশিত। রাজনীতির কথা আসতে—বিশেষ ক'রে ভারত-বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখে ঐ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ রাখা হ'ল।

এক পোলিশ লেকচারার একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। এঁর আইরিশ ভার্যা। নিবেদিতার কথা ও আইরিশ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা তাঁকে জানালে খুব খুশী—তবে নিবেদিতার কথা ইনি কিছু জানতেন না। এই লেকচারারটি ইংরেজের মতো নয়,—কথা বলেন প্রচুর, সঙ্গে সঙ্গে কাজও ক'রে চলেছেন প্রচুর। এঁদের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সব সংসার একই ছাঁচের; ছোট জমাট গণ্ডি। কিসে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারেন—তার চেষ্টা। আর ছেলেদের চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, স্কুলে শিক্ষা কি ক'রে ভাল হয়—তার চিন্তা; রাজনীতি বা অন্য তত্ত্ব আমল পায় কম। কথায় কথায় ইংরেজের দোষ দেখা, আর আমেরিকার সুখ-সমৃদ্ধির দিকে নজর। এ দিন অবশ্য একটি আমেরিকান ছাত্রীও নিমন্ত্রিত হয়েছিল।

ডিসেম্বর এসে পড়ল। শীত একটু একটু ক'রে বাড়ছে। অমনি উলের মোজা, শাওয়ার-প্রুফ ওভার কোট, টুপি, দস্তানা সব চাপানো হচ্ছে। আস্তে আস্তে—ভোরে তো দূরের কথা, কোন মতে বিছানা ছাড়াই শক্ত হ'য়ে উঠল। কেন না সূর্যদেবও উঠতে লাগলেন ৮।৮। টায়। গাছের পাতাগুলি প্রায় সবই ঝরে গিয়ে শুধু ডালগুলো বেরিয়ে থেকে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রল। মাটির ঘাস কিন্তু সতেজ। সব বাড়ীতেই হয় স্টীম পাইপ দিয়ে, নয় চুল্লি জেলে ঘর গরম রাখা হয়। শনি ও রবিবার খুব বেড়াতে হয়, ঘরে টেকা যায় না।

ডিসেম্বরেই একদিন হঠাৎ সন্ধ্যায় সাদা পুষ্পবৃষ্টি দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। অবশ্য যাঁরা কাশ্মীর বা হিমালয়ে গেছেন, তাদের এ

রকম বরফ-পড়ার (snow fall) অভিজ্ঞতা আছে। দু-দিন ক্রমান্বয়ে বরফ পড়ল, সাত দিন বাদে যখন বরফ গলতে আরম্ভ ক'রল, তখন রাস্তায় কাদা হ'ল। অবশ্য বালি দিয়ে রাস্তা চলার সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়।

বড়দিন এসে পড়ল। অনেক আগে থেকেই উদ্যোগ-আয়োজন—আমাদের দুর্গোৎসবের মতো। খাওয়া-দাওয়া, বেশ-ভূষা আমোদ-প্রমোদ, কার্ড-বিনিময় এই সবই বিশেষ অঙ্গ। বাইরের লোক দু-চার জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বাকী ছুটিটা কাটাতে গেলাম লণ্ডনে।

এখানকার মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী-গুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক। এরা যে পুরাতনের কত বড় পূজারী, এখানে তা বেশ বোঝা যায়। বর্তমানে যে জিনিসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাকে গুদামে ফেলে দেওয়া হয় না; তার স্থান মিউজিয়ামে—যাতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ দর্শকের চোখে আপনি ধরা পড়ে। শিল্প, বিজ্ঞান, জীবজন্তু, চিত্রকলা—সব বিষয়েই এইরূপ।

পার্লামেণ্ট বা ওয়েষ্টমিনস্টার প্যালেস দেখার সুযোগ হ'ল। গত যুদ্ধে যা ভেঙেছিল তা এমনভাবে মেরামত হয়েছে, যে বোঝা যায় না—কোথাও ভেঙেছিল। গাইড্ সব দেখাল—এরা যে নূতন আইন অপেক্ষা পুরাতন রীতি বেশী পছন্দ করে, তা এদের প্রত্যেক কথাতেই বোঝা যায়। প্রথম চার্লস্ (Charles I) ১৬শ শতাব্দীতে কবে 'হাউস অব কমন্সে' ঢুকেছিলেন, তারপর তাঁকে প্রজাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল; সেজন্য এখনও নিয়ম: কোন রাজা না ব'লে এখানে ঢুকবেন না। এ রকম নানা কথা প্রচলিত আছে।

লণ্ডনের আর সব দ্রষ্টব্যের কথা ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের বিবরণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন-প্রসঙ্গ 'উদ্বোধনে'র পাতায় পূর্বে (৬১তম বর্ষ, পৃঃ ১০১) প্রকাশিত হয়েছে।

ফিরে এসে আবার পূর্ণ উদ্যমে পড়াশুনা ও কাজকর্ম চলল। এর ফাঁকে একটি দলের সঙ্গে এক শনিবার ২৫ মাইল পূর্বে ছোট্ট আউস্ (Ouse) নদীর দুধারে ইয়র্ক (York) শহরে ঘুরে এলাম। সেদিন খুব কুয়াশা। এক সময়ে ইয়র্কই ছিল ইংলণ্ডের রাজধানী। রোম্যান, স্যাক্সন, ডেনদের আমল থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরটি বাণিজ্য, সংস্কৃতি এমন কি ধর্মপ্রচারেরও কেন্দ্র ছিল। তখন চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা ছিল। অনেক জায়গায় চওড়া দেওয়াল এখনও বর্তমান। ইংলণ্ডের সব থেকে পুরানো ক্যাথিড্রাল—অর্থাৎ উপাসনা-মন্দির—ইয়র্কমিনস্টার (York Minster) এই শহরেই। ৭ম শতাব্দীতে এর গোড়া পত্তন—পরে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত একটু একটু ক'রে এটি নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন মূর্তি-খচিত কাঁচ (Stained glass) বিশেষ দর্শনীয়—তার মধ্যে পাঁচ ভগিনীর জানালা (Five sisters' window) খুবই সুন্দর। যুদ্ধের সময় এগুলি খুলে রাখা হয়েছিল; আবার লাগানো হচ্ছে। পাদ্রী মহাশয় সব দেখালেন—ইঞ্চিফুটের হিসাবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় এটি পৃথিবীতে কোন্ স্থান অধিকার করে—তাও জানালেন। প্রার্থনা-স্থানটি এত বড়, যে একটি টেনিস-লন হ'তে পারে। রেলের ও সাংস্কৃতিক দুটি মিউজিয়াম দেখলাম। শহরের মধ্যে উঁচু ঢিপির ওপর সেকালকার পাহারা-মঞ্চ (Clifford's Tower) এখনও রয়েছে।

ইয়র্ক শহরটি রেলের কেন্দ্র, কিন্তু বাণিজ্য বা শিল্প-কেন্দ্র নয়। তাই ধোঁয়ার উপদ্রব নেই—বেশ পরিষ্কার। সরু ছ-ফুটি গলির (Shambles) প্রাধান্য। এগুলি আবার পুরাতনের স্মৃতি, তাই গলির ধারে পুরাতন কাঠের বারান্দা বার-

করা বাড়ীগুলিও ঠিক রাখবার চেষ্টা,—গভর্নমেণ্ট টাকা দেয়; ভাল ভাল কাপড় গহনার দোকান এরই মধ্যে। আর একটা মজার কথা—এখানে রাস্তায় মোটর অপেক্ষা সাইকেলই বেশী দেখা যায়—সম্ভবতঃ সরু গলির জন্য। সকলে মিলে হোটেলেই উঠলাম—নিচু নিচু ঘর, বিশেষ খাদ্য ইয়র্কশায়ার পুডিং (ময়দার বড়া)। সন্ধ্যার পর ফিরে এলাম।

শীতের ছোট দিন, বাইরে যাওয়া অসুবিধা ব'লে এক রবিবার আমরা একদল লীড্‌স্ টাউন-হলে কনসার্ট শুনতে গেলাম। হলে ঢুকেই একটু আশ্চর্য হলাম। বিরাট হল, ঝাড় দিয়ে সাজানো, চমৎকার কারুকার্য। চারতলা সমান গ্যালারী; অন্ততঃ তিন-চার হাজার লোক। লিভারপুল রয়েল ফিল্‌হারমনিক অরকেস্ট্রা—দলে প্রায় একশ' জন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। কন্‌ডাকটর আসতেই হাততালির রোল দু-মিনিট ধরে চলল—একটু আওয়াজ বেরুতেই সব নিস্তব্ধ। কন্‌ডাকটরের ছড়ির তালে তালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রী তার যন্ত্র বাজিয়ে চলল। মধ্যে ১৫ মিনিট ক'রে দুবার বিরাম দিয়ে তিন ঘণ্টাকাল এরা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। বিশেষ ক'রে Beethoven (বিঠোফেন: ১৭৭০-১৮২৭)-এর Violin concerto আমার ভাল লেগেছিল। আস্তে আস্তে স্তরে স্তরে উন্নত ঝঙ্কার, নানা পর্দায় সুর সৃষ্টি ক'রে তালে তালে মনকে মুগ্ধ করে।

বিজয়ার পর এখানে কিছু অনুষ্ঠান হয়নি ব'লে দুঃখ হয়েছিল; ২০শে থেকে ২৬শে জানুআরি প্রজাতন্ত্র-সপ্তাহে ভারতীয় ছাত্রসমিতি তা পুষিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিন অক্স-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আয়েঙ্গার (Visiting Professor) ২৬শে জানুআরির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। পরদিন ছাত্রদের মধ্যে থেকে কয়েকজন রাজা রামমোহন, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, বিনোবা সম্বন্ধে ছোটোখাটো বক্তৃতা দিলেন। খেলাধুলা এবং একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল। অবশেষে ২৬শে Republic Day Dinner—লুচি পোলাও মাংস। ১০০ জন ইংরেজও যোগ দিয়েছিলেন। পরদিন 'রামায়ণ' ছায়াছবি (Shadow-play) দেখানো হ'ল।

এদেশে আবার নতুন ক'রে ক্যাথলিক মিশন (Catholic Mission) নিজেদের দেশের দিকে নজর দিয়েছে। খৃষ্টানদের যাতে ধর্মে একটু মতি হয়। ইউনিভারসিটিতে ৭ দিন ধরে দুটি বড় বড় ধর্মযাজক (Missioner) Rev. Father Huddleston ও Rev. Dr Routley একবেলা ছাত্রদের জন্য ও একবেলা অন্য লোকেদের জন্য বক্তৃতা ক'রে গেলেন। বিষয় (১) Christ and the World's Problems, (২) Christ and the Enquirer's Difficulties, (৩) Creation, (৪) Incarnations, (৫) Atonement, (৬) The Holy Spirit, (৭) The Sacrament.

দু-একটি শুনেছিলাম। যদিও সব ধর্মের ছাত্রদের উদ্দেশ ক'রে বলা, তবু খৃষ্টানী গোঁড়ামি—যথা, যিশু ছাড়া অন্য কোন ত্রাতা নেই—এই ভাবই বক্তৃতার মধ্যে বেশী। গির্জাতেই খৃষ্টের জমাট ভাব বর্তমান—এইটাই বোঝালেন। ঐ দেশীয় ছেলেদের মধ্যে ধর্মভাব আমাদের দেশের ছেলেদের অপেক্ষা বেশী বলেই মনে হয়েছে। দু-চার জনকে গির্জায় অবৈতনিক ছেলে পড়ানোর কাজ করতেও দেখেছি। তবে প্রোটেস্টাণ্ট গির্জা ক্রমশঃ আরও হীনবল হচ্ছে। এর প্রমাণ আয়ার্লণ্ডে গিয়েও পেয়েছি—এক পাদ্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে। আরও ১০।১৫টি সম্প্রদায়ের অবস্থাও এই রকম।

শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে জানুআরির শেষে ও ফেব্রুআরিতে সত্যই অসহ্য হয়েছিল। কিছুদিন গরম প্যাণ্টের নীচে গেঞ্জিও পরতে হয়েছিল। রাত্রে বিছানায় দুটি গরম জলের ব্যাগ, চারটি কম্বল। বাইরে বেরুলে আঙুলের ডগাগুলি অসাড় হ'য়ে পড়ত। মধ্যে দু-তিন বার তুষারপাতও দেখলাম। ঝির ঝির ক'রে সাদা পুষ্পবৃষ্টির মতো, প্রথমটা বেশ লাগে। একবার টানা দিন দশেক চারিদিক সাদা বরফে ঢাকা থাকার পরে হঠাৎ একটা আতলান্তিক মহাসাগরীয় হাওয়া জলীয় বাষ্প বয়ে নিয়ে এসে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি বাড়িয়ে দিল। তখন বরফ গলে আবার একটু একটু ক'রে সবুজ ঘাসের মুখ দেখে সকলেরই আনন্দ। তবে এর পরই রাস্তায় কাদা ও আকাশে বৃষ্টি—পথ চলতে কাঁদিয়ে দেয়।

বরফের সময় পাখীদের বড় মুস্কিল। লোকে মাঠে বরফের উপর খাবার রেখে যায়। অনেক পাখী মরেও বটে—তবে বেশীর ভাগ পাখীই দেশছাড়া হয়।

ক্রমে একটু একটু ক'রে শীত কমতে আর বেলা বাড়তে লাগল। কুয়াসাও আর তেমন হয় না। মার্চের শেষে লীড্‌স্ পরিবহন সংস্থা চার পাশের ৪০।৫০ মাইল অঞ্চল বাসে ক'রে বেড়াবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন Wharf-dale (হোয়ার্ফ নদীর উপত্যকা) ঘুরে এলাম চার পাঁচ জন বাঙালী ছেলে। পথের দৃশ্যগুলি সত্যই খুব ভাল লাগল। ওট্‌লি, ইল্‌কলি, বোল্টন এবি (Abbey) হ'য়ে গ্রাসিংটন এলাম। নামগুলি বেশ। সরু নদীর পাশে পাশে রাস্তা আর দুধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠ ক্রমেই উঠে গেছে পাহাড়ের ওপরে। মাঠগুলি বরাবর পাথরের বেড়া দিয়ে প্লটে ভাগ করা—গরু ভেড়া মুরগী চরাবার জন্য। এরাই এখানকার পণ্য। অনেকে নদীর ধারে অথবা পাহাড়ের গায়ে পিক্‌নিক্ করতে এসেছে। পথে ছোট ছোট গ্রাম পড়ল। দরিদ্রের কুটির—পাথর আর টালি দিয়ে তৈরী। ভেড়া মুরগী পালনই এদের কাজ; দুধের ব্যবসাও আছে। পথের শেষ প্রান্তে একটা পাথরের খাদ। খাদে কাজ ক'রে আর যাত্রীদের অর্থে এদের বেশ চলে। হঠাৎ মেঘ ক'রে ঝির ঝির বৃষ্টি এল—অনেকেরই দিনটি নষ্ট হ'ল। আমি ভিজে ভিজেই বেড়ালাম, তার জন্যে পরে একটু সর্দি জ্বর হ'ল।

গুড্ ফ্রাইডে এসে পড়ল। ঐ দিন লণ্ডন থেকে স্বামী মুখ্যানন্দ লীড্‌সে এলেন উইটন্ (Weeton) যাবার পথে। স্টেশনে দেখা হ'ল, সঙ্গে তাঁর host (আমন্ত্রণকারী)।

পরদিন আমারও সেখানে নিমন্ত্রণ হ'ল। ভদ্রলোকটি যুদ্ধের সময় তিন বৎসর ভারতে ছিলেন—করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাতায়াত করতেন। এখানে স্কুল মাষ্টার। মা ও ছেলের ছোট্ট সংসার। বাড়ীটি ভারতীয় কায়দায়। ঘরের ভেতর সব ছবিই প্রায় ভারতের। গ্রীষ্মাবকাশে ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকায় পর্বতারোহণে গেছলেন তার রঙীন চলচ্চিত্র দেখালেন; সেখানকার পাহাড়ীরা ঠিক তিব্বতীদের মতো। বৃদ্ধা মা ভারতীয় খানা অর্থাৎ খিচুড়ি, পাঁপর, পাস্তয়া স্বহস্তে তৈরী ক'রে খাওয়ালেন। লীড্‌স্ থেকে যদিও ১২।১৪ মাইল দূর—ইলেকট্রিক লাইট নেই রাস্তায়—কারণ এরা গ্রাম্য ভাবে থাকাই পছন্দ করে। রেল স্টেশনটিও তেমনি, —লোকজন নেই, বিনা টিকিটে উঠতে হ'ল। নামবার সময় চেকারকে ভাড়া বাবদ এক শিলিং দিয়ে নেমে পড়লাম। (ক্রমশঃ)

বেদবিধি ও ভক্তিধর্ম

অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার

হিন্দুধর্ম বেদবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। দশবিধ সংস্কার বেদবিধির অনুগামী। গৃহসূত্রাদি বৈদিক অনুষ্ঠান-বিধি ও মন্বাদি স্মৃতি-অনুমোদিত এই সকল সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতি শুদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক পরম শ্রেয় লাভ করিবেন, ইহাই বৈদিক ধর্ম। মনু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন:

বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্যঃ শরীর-সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহা-যজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥

বেদবিধি অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং একমাত্র এই ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে:

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥

বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণকারী পুরুষ কর্তৃক সেই পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হইবেন। তাঁহার সন্তোষ বিধানের অন্য পন্থা নাই।

ভক্তিধর্ম কিন্তু এই বেদবিধি-সম্মত মার্গ অনুসরণ করিয়া চলে নাই। দক্ষিণ ভারতে তীর্থযাত্রা-কালে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রায় রামানন্দের সহিত যখন সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তখন রামানন্দ সর্বপ্রথমে বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু বলিয়াছিলেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

জাতি, কুল, মান, এই সকল ভক্তিধর্মে অকিঞ্চিৎকর। 'চরিতামৃতে' কথিত হইয়াছে:

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত কুলীন মানীর বড়ই অভিমান॥

বাইবেলে আমরা ভগবান্ ঈশার বাণী শুনিতে পাই—দীনাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন হইবে।

নীলাচলে রথস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তব করিতে করিতে মহাপ্রভু আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন:

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি। আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থী নহি, সন্ন্যাসীও নহি। আমার পরিচয় হইতেছে এই: যিনি পূর্ণরূপে পরম আনন্দময় অমৃতের সমুদ্রতুল্য, সেই গোপীনাথের পদকমলের দাসের আমি দাসানুদাস।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ লাভের জন্য জাতি বা বর্ণ অকিঞ্চিৎকর। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং যিনি ভক্তিমান্ তিনি চণ্ডাল হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হইলেও পূজ্য। যিনি তোমার নাম

কীর্তন করেন তিনি তপস্যা, যাগযজ্ঞ, তীর্থস্নান, বেদপাঠ, সমস্তই অনুষ্ঠান করেন।

পুনশ্চ ঐ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎ প্রহ্বণাদ্ সংস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

কোন এক সময়ে যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্তন করিলে বা যাঁহাকে নমস্কার বা স্মরণ করিলে কুক্কুরমাংস-ভোজীও সদ্য সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে, হে ভগবন্, সেই তোমাকে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

'হরিভক্তি-বিলাসে' উক্ত হইয়াছে :

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

অভক্ত চতুর্বেদে নিষ্ণাত ব্যক্তি আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু ভক্ত চণ্ডাল আমার প্রিয়। তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য।

আচার্য শঙ্কর বিচার করিয়াছেন, ব্রহ্ম-বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কিনা; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এই বিচার একেবারেই অবান্তর। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভের জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন : হে অর্জুন, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা পাপযোনি (চণ্ডালাদি)—স্ত্রী, বৈশ্য তথা শূদ্র—তাহারা সকলেই পরমা গতি লাভ করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেও এই কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যহ প্রাতে সমুদ্রস্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং তাহার পরে ঠাকুর হরিদাসের বাসস্থানে গিয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন। হরিদাস মুসলমান-গৃহে প্রতিপালিত বলিয়া মন্দির-দর্শনে যাইতেন না, তাঁহার আবাস হইতে মন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস কুণ্ঠিত হইতেন।

হরিদাস কহে, প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন :

প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়াও ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য এইরূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের আলবারগণের মধ্যেও আমরা ভক্তিধর্মের এই মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। শ্রীভগবানে প্রেম লাভই পরম পুরুষার্থ—এই কথা তাঁহারাও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয়ও ছিলেন, তবুও তাঁহারা শ্রীশ্রীবরদরাজের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অপূর্ব চরিতকথা শ্রবণ করিয়া এই প্রতীতি জন্মে যে ভক্তিধর্মে জাতিকুলের কোন গুরুত্ব নাই। দাক্ষিণাত্যের আলবারগণ রচিত স্তোত্রাদি 'তামিলবেদ' নামে পরিচিত এবং ভক্তিধর্মের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্যও কাঞ্চীপূর্ণ নামক এক শূদ্রবংশীয় মহাত্মার সাহচর্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার প্রার্থনাও জানাইয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ অবশ্য তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন নাই,—শ্রীনারায়ণ তাঁহার জন্য শীঘ্রই গুরু প্রেরণ

করিবেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। রামানুজ এই শূদ্র মহাত্মার প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভক্তিধর্মের পরাকাষ্ঠা যাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় সেই ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া গৃহধর্ম ছাড়িয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাদের নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন :

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥

একান্তচিত্তে পতির শুশ্রূষাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম। পতির আত্মীয় স্বজনের এবং সন্তানগণের সেবাই নারীজাতির কর্তব্য। ইহার উত্তরে গোপীগণ শ্রীভগবানের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন :

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশ পদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠ ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

পতির, অপত্যের এবং পতির সুহৃদ্‌গণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীগণের পরম ধর্ম—আপনি বলিলেন, ইহা ঠিক বটে। তবে আপনি সকলের প্রিয়তম, সমস্ত জীবের বন্ধু এবং আত্মা, সুতরাং আপনাকে কামনা করাই জীবের কর্তব্য।

তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহাদের পরম প্রিয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর্তিদায়ক পতি ও সুতাদির সেবা করিয়া কি লাভ হইবে? তাঁহাদের উক্তির মর্ম এই—ভক্তিধর্মে পাতিব্রত্যাদি বিধিরও স্থান নাই। শ্রীভগবানের জন্য সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন করা যাইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন : ঈশ্বরের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, কর্তব্য-ধর্মের তাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং লোকধর্ম অপালনের জন্য তাঁহার কোন প্রত্যবায়ও নাই। ভক্ত বর্ণধর্মাদির অতীত, ভক্তের জাতি নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদবিধি লৌকিক ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও ভক্তিধর্ম উহার অতীত। ভক্তের জাতি-বর্ণের প্রশ্ন অবান্তর, তিনি কি পরিমাণে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই প্রশ্নই বড়। বিদুর শূদ্রাণীপুত্র হইয়াও পরমপূজ্য ছিলেন। ব্রজের গোপ-গোপীগণ তাঁদের প্রেমের রজ্জু দিয়াই শ্রীভগবান্‌কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ভক্তি দেখিয়াই ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব প্রার্থনা করিয়াছিলেন :

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

যে ব্রজগোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্যপথ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, উদ্ধব সেই গোপীগণের চরণরেণুধন্য শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তের এই মাহাত্ম্য অকারণে কীর্তিত হয় নাই। প্রকৃত ভক্ত ভগবান্‌কেই চাহেন, মোক্ষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট তুচ্ছ। শ্রীভগবান্ কর্তৃক বর প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব বলিয়াছেন :

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

আমি উত্তম পদ পাইবার আশায় তপস্যায় রত হইয়া দেবতা এবং মুনীন্দ্রগণেরও অপ্রাপ্য

তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। কাচ খুঁজিতে গিয়া আমি দিব্যরত্ন পাইয়াছি। হে প্রভু, আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অন্য বর চাহি না।

'চরিতামৃত'কার মোক্ষবাঞ্ছাকে 'কৈতব-প্রধান' বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। নিজের উপরে ভক্তভাব আরোপ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শিক্ষাষ্টকে' প্রার্থনা করিয়াছেন:

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

ইহাই ভক্তের প্রার্থনা।

ভক্ত চাহেন শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হউক, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হউক, শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হউক।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

বাংলার ভক্তকবি নীলকণ্ঠের সঙ্গীতেও এই প্রার্থনা মুখরিত হইয়াছে:

আর কতদিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার।
কবে বলতে হরিনাম, শুনতে গুণগ্রাম
অবিরাম নেত্রে বইবে জলধার।

একটি আখ্যানের ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের ভাবটি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একবার প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য দ্বারকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসুখের ভান করিয়া নারদকে বলিলেন, ভক্তের পদরজ পাইলে তাঁহার ব্যাধি প্রশমিত হইবে। নারদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণের নিকট যাইয়া পদরজ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই পদরজ দিতে সাহসী হইলেন না। সকলেই বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বজন হইলেও গুরুজন, তিনি স্বয়ং নররূপী নারায়ণ, তাঁহাকে পদধূলি দিয়া কি আমরা নরকে যাইব? নারদ তখন শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নন্দ যশোদা এবং ব্রজের অন্যান্য গোপ-গোপীগণ সকলেই কৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিলেন। নারদ তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত ব্যাধির ও তাঁহার অদ্ভুত ঔষধের কথা তাঁহাদিগকে জানাইতেই সকলে তৎক্ষণাৎ পদরজ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ নিরাময় হইলেই তাঁহারা সুখী হইবেন, সে জন্য তাঁহারা চিরকাল নরক বাস করিতেও প্রস্তুত। নারদ তাঁহাদের এই অপূর্ব ভক্তিভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে প্রকৃত ভক্তের মর্ম তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই জন্যই কৃষ্ণপ্রেমকে অপ্রাকৃত বলা হইয়াছে। এই জন্যই ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় এবং ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের এত মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ভাষায় ভক্তকে প্রণতি জানাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি:

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

অন্বেষণ

শ্রীমতী বিভা সরকার

কোন দিন শ্রান্ত মনে
অন্য কিছু অন্বেষণে
জীবনের ছোট অবকাশে--
যখন জাগিছে শুধু
নিঃসঙ্গ একটি তারা
সীমাহারা সাঁঝের আকাশে,
খুঁজেছ কি বসিয়া একেলা
সাঙ্গ করি বেচা-কেনা পালা
বিক্ষুব্ধ এ নগরীর ভিড়ে ?
আশ্রয়-ভিক্ষুক সম
আপনার হৃদয়ের
নিরালায়—নিভৃতির নীড়ে ?
পথশ্রান্ত হে উদ্‌ভ্রান্ত মন,
খুঁজে পাবে জীবন-দর্শন—
চিত্তমাঝে অন্য কিছু নয়,
আকাশে একটি তারা
কোন্ মৌন-রূপে হারা
নির্নিমেষ শুধু চেয়ে রয় !
ক্ষণকাল হারাইয়া যেও
সকল সান্ত্বনা হ'তে শ্রেয়
দু-দণ্ড সে আশ্রয় শান্তির।
দিনান্তের স্তব্ধ সন্ধিক্ষণে
ছায়াপথ সুনীল গগনে
চোখবোঝা দিনান্ত পৃথ্বীর।

প্রার্থনা

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

বহু পথ ঘুরে তোমারি দুয়ারে
এসেছি ক্লান্ত চরণে,
লহ কোলে তুলে করুণাময়ী গো
চাহগো করুণা-নয়নে।

পথেরি চলায় শ্রান্ত এ দেহ
ক্লান্তি এসেছে পরানে
জীবন ঘিরিয়া অবসাদ ঘোর
নামিয়া আসিছে নয়ানে।

তব স্নেহ-কোলে ঘুমাক এ প্রাণ
মৃত্যুর অবগাহনে ;
আমি, ডুবিয়া রহিব যুগ যুগ ধরি,
স্বরগ-সুষমা-স্বপনে।

সমালোচনা

Letters of Swami Vivekananda (New Edition)—Advaita Ashrama, 4 Wellington Lane, Calcutta 13. Pp. 552, Price Rs. 6·00

স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী তাঁহার প্রতিটি পত্রে মূর্ত হইয়া আছে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের তথা বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কি রূপ হইবে এবং তাহার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন, পত্রগুলিতে তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে স্বামীজীর বাণী বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, স্বাধীন ভারতেও তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে নাই।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—একদল ত্যাগী দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক। সেই যুবকদল ভারতকে তাঁহার পরিকল্পিত ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং বিশ্বসভ্যতার দরবারে ভারতের জন্য যে মহিমময় আসন নির্দিষ্ট আছে—সেইখানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহাই জগতে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনের উপায়।

আলোচ্য নূতন সংস্করণে স্বামীজীর পত্রসমূহ হইতে ২২৯টি পত্র নির্বাচিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, এই পত্রগুলিতে স্বামীজীর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত। পূর্ব পূর্ব সংস্করণে কোন্ পত্র কাহাকে লিখিত—জানা থাকা সত্ত্বেও—তাহা সর্বত্র উল্লিখিত ছিল না, এই সংস্করণে সেই নামগুলি সংযোজিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বামীজীর সমস্ত পত্রের সহিত পরিচিত হইতে চান, তাঁহারা 'The Complete Works of Swami Vivekananda' অনুশীলন করিবেন।

স্বামীজীর উদ্দীপনাময় পত্রগুলি নর-নারীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বদেশের এবং বিশ্বজগতের সেবায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৯৮; মূল্য পাঁচ টাকা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-রচয়িতা 'মাস্টার মহাশয়ের' পূত সঙ্গে লেখক দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভাব পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দিনলিপিতে সযত্নে রক্ষিত ছিল, তাহাই আজ গ্রন্থাকারে 'শ্রীম-দর্শন'-রূপে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের কিছু নূতন কথা এবং স্বামীজী-প্রমুখ তাঁহাদের লীলাসহচরগণের কথা রহিয়াছে, 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃতের' ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষৎ গীতা ভাগবত প্রভৃতির আলোচনাও ইহাতে আছে। পুস্তকের প্রারম্ভে একটি সুলিখিত ভূমিকার (২২ পৃষ্ঠা) পর মাস্টার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৩ পৃঃ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভূমিকায় সাধু ও চলিত ভাষা মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় পাঠে অসুবিধা হয়।

দেব-গীতি—মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, ৩৯ দেব লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৪; মূল্য টাকা ১·৫০।

সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গান সাধকের অন্তরের ভাব-নির্ঝর। তাঁহার

গুরু-স্তব 'ভবসাগরতারণকারণ হে' প্রতিদিন সহস্র কণ্ঠে গীত হয়।

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, মায়ের গান, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন, আগমনী, বিজয়া, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত, হরিসঙ্কীর্তন প্রভৃতি অধ্যায়-ক্রমে সন্নিবেশিত। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। গ্রন্থশেষে শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনের অনুরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তন (আদি মধ্য ও অন্তলীলা) ভক্তগণের বিশেষ ভাল লাগিবে।

শ্রীশ্রীকালীপূজাপদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, পোঃ লাক্‌সা, বারাণসী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৫+পরিশিষ্ট ৩২। দক্ষিণা টাকা ১.২৫।

বহু দিন হইতে শ্রীশ্রীকালীপূজার একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকের অভাব ছিল, শ্রীশ্রীকালী-পূজাপদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ায় সে অভাব দূরীভূত হইল।

আলোচ্য পুস্তকে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজার প্রয়োগ-সমেত দক্ষিণাকালী, বামাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালীর পূজাদি বিধিবদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রটন্তী ও ফলহারিণী কালীপূজা, দেবীর ষোড়শ যাত্রা, শতোপচার, পঞ্চতত্ত্ব-সংস্কার, পঞ্চবলি, শান্তিস্তোত্র, বীরহোম প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সীমান্তের সপ্তলোক: শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রণীত; প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২; ১৫৩ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

শিক্ষাবিদ্ লেখক শুধু দেশভ্রমণের জন্যই যে সীমান্তের সপ্তলোক ঘুরেছেন, তা নয়; তিনি গেছেন সাহিত্যিকের মন নিয়ে—তার সঙ্গে সমাজসেবীর চোখ! তিনি দেখেছেন দেশ, তার থেকে বেশী দেখেছেন দেশের মানুষ। বিশাল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে বিশেষত সীমান্তে আমাদের যে সব প্রতিবেশীরা আছেন, তাদের কথাই তিনি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে বলেছেন—দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রপারে সিংহল থেকে উত্তরে হিমালয়ের সিকিম ভূটান মুশৌরির কথা তিনি বলেছেন, অবিস্মরণীয় আসামের কথা বইখানির অনেকখানি জুড়ে আছে—নীলাচলবাসিনীর কামাখ্যার বর্ণনা, চা-বাগানের কুলিদের জীবন-কথা, বনজঙ্গলে দুঃসাহসের যাত্রা নিখুঁত ভাবে চিত্রিত। স্থানে স্থানে ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাস বেশ সাবলীল ভাবে মিশে গেছে।

দুটি বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম: একটি সূচীপত্রের অভাব। দ্বিতীয়: অমর কণ্টক মধ্যভারতে। দশখানি চিত্র পুস্তকের বিষয়-বস্তু পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরে।

অপরূপা: (শিশুদের বার্ষিক), প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা ৯, ৫১২ পৃষ্ঠা মূল্য পাঁচ টাকা।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও 'দেবসাহিত্য কুটীর' বাংলা দেশের শিশুজগৎকে উপহার দিয়েছেন পূজাবার্ষিকী 'অপরূপা'। বহু গল্প কবিতা ছবির সম্ভারে ভরে উঠেছে বিরাট গ্রন্থখানি। শিশুদের সঙ্গে 'বড়'-রাও বইখানি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১০, মূল্য চার টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের ঘটনাবহুল বিস্তৃত জীবনী সহজ সরস ভাষায় লিখিত। ১৮।১৯ খানি ছবি ও একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, জামনগরে, রাজপুতানায়, মুর্শিদাবাদের পথে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, অনাথ আশ্রম স্থাপন, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, স্বামীজী-প্রসঙ্গে প্রভৃতি ২২টি অধ্যায়ে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজের জীবন-বর্ণনাক্রমে মঠ ও মিশনের পুরাতন অনেক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচরগণের বহু প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ সেবাধর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিকটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সাধক, ভক্ত, কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, সমাজসেবী সকলকেই স্ব স্ব জীবনপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে: প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা গম্ভীর পরিবেশে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজার কয়দিনই আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, কয়েক সহস্র ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কাঁথি, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, মালদহ, মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ. রহড়া, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম,) বালিয়াটি, বোম্বাই, শিলং, শিলচর এবং সোনার-গাঁ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোম—বেলঘরিয়া (২৪ পরগনা) —এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে ৮৮ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৫৭ জন ফ্রি, ৯ জন আংশিক খরচ দিয়া ছিল।

পরীক্ষা-ফল: এম-এ পরীক্ষার্থী এক জন ছিল, সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৩ জন বি-এ পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ উত্তীর্ণ ২ জন। ৩ জন বি. এস-সি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জনই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ। আই-এ ১০০% উত্তীর্ণ; আই. এস-সি-তে ২৩ জনের মধ্যে ২০ জন উত্তীর্ণ, ১৫ জন প্রথম বিভাগে (১টি সরকারী বৃত্তি সহ)।

কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের ৪৭টি দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফি বাবদ ৬৭৫ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

আশ্রম-লাইব্রেরি: ৩০৫০ সুনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রেরা ৭৫১টি পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে ৬৪৭ খানি গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়। ৬টি দৈনিক ও ১৩টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হইয়াছে।

পুরী ভুবনেশ্বর ব্যতীত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য-সম্পন্ন আরও কয়েকটি স্থানে বিদ্যার্থীরা এই বৎসর ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। নববর্ষ উপলক্ষে ও বিজয়া-সম্মিলনে আশ্রমের বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে।

শিল্পপীঠ: এই লাইসেন্‌সিয়েট এঞ্জিনিয়রিং বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ খৃঃ জুলাই মাসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহার উদ্বোধন করেন ১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বরে। শিল্পপীঠের দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে, ছাত্রসংখ্যা ৩৬০।

শ্যামলাতাল: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ (৪৩ তম বর্ষের) কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে সেবাশ্রমটি অবস্থিত। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বতীয়দের একমাত্র চিকিৎসার স্থান।

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ: বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা (bed) আছে; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই অল্পসংখ্যক শয্যা কিছুই নয়, আমরা এ বিষয়ে বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ পর্যন্ত সেবাশ্রমে উভয় বিভাগে মোট ১,৯৩,৩৬৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

পশুচিকিৎসালয়: গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য এই বিভাগটি খোলা হয়। এ পর্যন্ত ৫০,৮৭১ পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। এখানে অশ্বচিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার): প্রতি-শনিবার নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
১৯৬০, মার্চ:	
শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
গীতা	„ সাধনানন্দ
শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, ও স্বামীজী	শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ভাগবত	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
এপ্রিল:	
মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী,
ভক্তিতত্ত্ব	স্বামী জীবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দের বাল্যলীলা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল,
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
ও ছায়াচিত্রে 'মা'	শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়
মে:	
ভাগবত	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
গীতা	„ সাধনানন্দ
মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী,
ভাগবত	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
জুন:	
সনাতন ধর্ম ও যুগধর্ম	„ নিরাময়ানন্দ
যুগধর্মে আচার্য বিবেকানন্দ	„ সদ্বুদ্ধানন্দ
ধর্ম ও ইহার প্রয়োজনীয়তা	„ ভূতেশানন্দ
মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী,

বক্তৃতা-সফর

এ বৎসরের প্রথম হইতে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বোম্বাইএর বাহিরে যে সকল স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার একটি নির্বাচিত সূচী প্রকাশিত হইল; অধিকাংশ বক্তৃতাই ইংরেজীতে, কতকগুলি হিন্দীতে, কয়েকটি বাংলায়।

মাস	স্থান	বিষয়
জানু.	সুরাট	সেবা—জাতির আদর্শ
	,,	শক্তিমান্ পুরুষ বিবেকানন্দ
	পুনা	স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা
ফেব্রু.	,,	সনাতন ধর্ম
	শোলাপুর	বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরু
	,,	ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান
		ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম
	,,	তরুণ ভারতের কাছে স্বামীজীর বাণী
		শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি
মার্চ	মাউণ্ট আবু	বিশ্বের কাছে ভারতের বাণী
	,,	বিশ্বজনীন ধর্ম
জুন	বারাণসী	শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য
	কলিকাতা	বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ
	কটক	শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন?
	ঢাকা	মহাপুরুষ-সঙ্গ
	মাদ্রাজ	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
		ভারতের মহীয়সী নারীগণ
	নাত্তারামপল্লী	ভারতের মহাপুরুষগণ
	ত্রিরুপাতুর	আজ যে শিক্ষা প্রয়োজন
		কর্মযোগের বিজ্ঞান ও দর্শন

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টারে প্রতি রবিবার বেলা ১১ টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে ভাষণ প্রদত্ত হয় :

জুন :	ব্যক্তিত্বমান্ ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সামঞ্জস্য, আধুনিক মানবের নিকট ধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান, ধ্যানের বাধা জয় করা, প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত।
জুলাই	আধ্যাত্মিক ভাবশূন্য জীবন বিফল

[অতঃপর গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়]

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷টায় স্বামী বুধানন্দ রাজযোগ ও প্রতি শুক্রবার ঐ সময় স্বামী নিখিলানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন।

সেবাকার্য

আসাম-দুর্গত-সেবা : জলপাইগুড়ি জেলায় ফালাকাটা ক্যাম্পে স্থিত আসাম-দুর্গতদের মধ্যে মিশন ২৮শে জুলাই হইতে ১৭ই আগস্ট (দুর্গতদের অন্যত্র সরাইয়া লওয়ার পূর্ব) পর্যন্ত সেবাকার্য করিয়াছে। তাহার পর আলিপুর ডুয়ার্স জংসন স্টেশনে ২৮শে আগস্ট হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আসাম হইতে আগত নরনারীদের ভাত ডাল তরকারী খাওয়ানো হইয়াছে। আগতদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল যে কয়েকদিন ২৭০০ জনকে খাওয়াইতে হইয়াছিল। ইহাদের জন্য চাউল ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনামূল্যে দিয়াছেন। ফালাকাটায় এবং আলিপুর ডুয়ার্স ক্যাম্পে ৫০টি পরিবারের মধ্যে ১১০০ ধুতি শাড়ী, ১২৬০ ছোট ছেলেদের জামা, ৩০ সতরঞ্চি, ২০৮ বাল্‌তি, ৩৫০ করিয়া কড়াই, হাতাখুন্তি, মগ, এনামেলের ৫০০ থালা, ৪০০ গ্লাস, ৪০০ বাটী, এবং ৩৬৫টি হারিকেন ল্যাণ্টার্ন বিতরণ করা হইয়াছে। ফালাকাটায় ৪৭ মণ চিঁড়া ও ১১ মণ গুড় বিতরিত হইয়াছে।

শিলংএ গভর্নমেণ্ট ক্যাম্পস্থিত শরণার্থীদের মধ্যে রোগী ও শিশুদের জন্য গড়ে দৈনিক ২১ সের করিয়া গোদুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে। এছাড়া

১০০ খানি পশমী কম্বল, ৩৫ খানি ধুতিশাড়ী ও আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে।

উড়িয্যায় বন্যাসেবা : বালেশ্বর জেলায় বাসুদেবপুর অঞ্চলে ৪২টি গ্রামে ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত মিশন সেবাকার্য করিয়াছেন। ওখানে ১৬৯০ ধুতি, ১৭৩৮ ছোটদের সার্ট প্যাণ্ট, শিশুখাদ্য হিসাবে ৪৫০ পাউণ্ড বার্লি, ৪৫০ পাউণ্ড বিস্কুট, ২॥০ মণ চিনি, গবাদির খাদ্য ১৫৩৩ মণ কুঁড়া বিতরণ করা হইয়াছে। এছাড়া ৪৭০ টাকা সাহায্যও দেওয়া হয়।

কটক জেলায় জেনাপুর অঞ্চলে এখনও সেবাকার্য চলিতেছে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে গুঁড়াদুগ্ধ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। ৮০০ ধুতি বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞান-সংবাদ

মহাকাশ হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ : মিশিগান জ্যোতির্বিদ্‌গণ শনিগ্রহ ও নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ ধরিতে পারিয়াছেন। ৩ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত নীহারিকাপুঞ্জের একটি নক্ষত্র হইতে এই তরঙ্গ ভাসিয়া আসিয়াছে।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ফ্রেড হাডক লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল সায়েণ্টিফিক রেডিও ইউনিয়নের ত্রয়োদশ অধিবেশনে বলেন, ৮৫ ফুট ব্যাসের একটি নূতন ধরনের রেডিও টেলিস্কোপে ইহা ধরা পড়িয়াছে।

নক্ষত্রের আয়ু সম্পর্কে এই তথ্য নূতন আলোক সম্পাত করিবে। শনিগ্রহ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বর্তমান গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

পরমাণুশক্তি-চালিত সাবমেরিন : ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ পর্যটক ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেল্যান জাহাজে ৩ বৎসরে পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই একই পথে পরমাণুশক্তি-চালিত মার্কিন সাবমেরিন ট্রিটন ৬১ দিনে সমুদ্রের নীচে থাকিয়া ৩১,০০০ মাইল অতিক্রম করে। ট্রিটন ইহার পরেও ১০,৯৭২ মাইল অতিক্রম করিয়া ৮৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসে।

নিদ্রার আবশ্যকতা : সাধারণ লোকের ধারণা শরীরকে বিশ্রাম দিবার জন্য ঘুমের প্রয়োজন, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষ শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘুমায় না। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের যে অংশের জন্য মানুষ স্মরণ যুক্তি-বিচার ও কল্পনা করিতে পারে তাহাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যই নিদ্রার আবশ্যকতা।

খাদ্য ও জনসংখ্যা

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (F.A.O.) বিবরণীতে প্রকাশ গত ১৯৫২-৫৩ হইতে ১৯৫৭-৫৮ (এই ৫ বৎসরে) ভারতের খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়িতেছে।

সংস্থার বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ: ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১'৩ হারে, সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ১'৯ হারে। পৃথিবীর আরও তেরটি দেশে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত সমতালে চলিয়াছে, অথবা উহাকে সামান্য মাত্রায় অতিক্রম করিয়াছে। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে—যথা ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও পাকিস্থানে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই।

খাদ্যসমস্যার সমাধান

কৃষিবিষয়ে পূর্ব ভারত রাজ্যসরকারগুলির উপদেষ্টা আমেরিকার অভিজ্ঞ কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ ডক্টর আর্নল্ড ক্লেম (Dr. Arnold W. Klemme) এদেশে তাঁহার গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া ১১ই অক্টোবর রোটারি ক্লাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে ভারতের প্রধান সমস্যা খাদ্যসমস্যা। তাহা সমাধান করিবার উপায় ভারতেই আছে, যদি চাষীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, প্রকৃতির দানরূপে পশ্চিমবঙ্গে সেগুলি বিশেষভাবে রহিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি তিনি উল্লেখ করেন:

(১) সার: পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান করা যায়, যে ১ কোটি একর জমিতে ধানচাষ হয়—তাহার তিন-চতুর্থাংশ জমি সার দিয়া চাষ করিলে খাদ্যঘাটতি দূরীভূত হইবে। ইস্পাত-কারখানার পরিত্যক্ত শ্ল্যাগ এবং স্থানীয় অন্যান্য পদার্থ সহজপ্রাপ্য সার।

(২) জলসেচ: বাংলাদেশে কর্ষিত ভূমির তিন-চতুর্থাংশ পলি-পড়া জমি, অল্প খরচেই নদীর বা নলকূপের জল দ্বারা ঐগুলিতে জলসেচ সম্ভব।

(৩) জমি-উদ্ধার: পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ একর জমি লবণাক্ত, ঠিকভাবে উদ্ধার করিতে পারিলে উহা খুবই উর্বর হইবে।

(৪) নূতন ফসল: সারের ব্যবহার এবং ভালভাবে জলনিকাশ ও জলসেচ হইলে পশ্চিমবঙ্গের চাষী বছরে দুই তিনটি ফসল তুলিতে পারে। ভুট্টা, সিম ও বিবিধ শাকসব্জী মানুষের এবং গৃহপালিত পশুর পরিপূরক খাদ্যরূপে উৎপন্ন হইতে পারে।

ভ্রমসংশোধন

আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধনে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর পটভূমিকা' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে 'অমাবস্যা' স্থলে 'প্রতিপদ' পড়িবেন। উঃ সঃ

শ্রীসারদামণি-মাতৃভাবস্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

শ্রীসারদাম্বা মাতৃসারাৎসারা।

অগ্নিবায্বিন্দ্রদেবা যদি স্যুঃ মতিবিক্লবা

উমাকারা সা হি সন্তানোদ্ধারা।

সুত-'কিমেতদ্ যক্ষমি'তি যুগযুগান্ত-প্রশ্নততি-

সুসমাধান-সুখদান-সদাতৎপরা ॥১

ত্রেতাদ্বাপরভরণী সীতারাধারূপিণী

কলৌ যশোধরা চ গৌরমনোহরা।

যুগে যুগে মে জননী প্রভুধ্যানসারধ্বনিঃ

সারদা তু মণিমণিঃ সর্বযুগোত্তরা ॥২

শ্রীসারদা মাতৃসারাৎসারা ॥

'মাতৃভাবো হি গরিষ্ঠঃ সখ্যমধুরয়োঃ শ্রেষ্ঠঃ'

রামকৃষ্ণ-মত-নিত্য-সুখপ্রচারিণী।

সারদাম্বিকামণিঃ মাতৃভাবশিরোমণিঃ

কাশ্যাং বিমোচিতা যয়া পথচারিণী ॥৩

মাতৃমহানামামৃত- পান-ধন্য-খগ-চেতঃ

চন্দনাপি কৃতার্থা পিঞ্জরবাসিনী।

ধেনুকালীশ্যামলী যুগপচ্চ বৎসাবলী

হাম্বা শব্দায়তে করতলার্থিনী ॥৪

জননী-প্রসাদধন্যঃ নরেন্দ্রঃ সুতবরেণ্যঃ

ভুবনবিজয়ী প্রাহ 'মাতা গরীয়সী',

তথা নাগমহাশয়ঃ গৃহস্থসন্ন্যাসাশ্রয়

উচে'মাতৃদয়া জ্যায়সী শ্রেয়সী' ॥৫

প্রাপ্তনিত্যমাত্রাশিষ- ভক্তভৈরবগিরীশো

সততমকথয়ন্ 'মাতা দয়ালুতরা'।

জননীপাদসংবলো ভণতি যতীন্দ্রবিমলোঽ-

স্বা সারদাতুলা নিত্যা পরাৎপরা ॥৬

বঙ্গানুবাদ : জননী শ্রীসারদামণির মাতৃভাবের স্তুতি

জননী সারদামণি মাতৃমণ্ডলীর সারেরও সার। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার যখন বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে, তখন সন্তানদের উদ্ধার জন্য সাধনের জননী উমা হৈমবতী হ'য়ে দেখা দেন। পুত্রগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'এই সম্মুখের বিরাট জ্যোতিঃপুঞ্জ, এ কি?' যুগযুগান্তরে সন্তানদের এই প্রশ্ন-সমূহের সুন্দর মীমাংসা ক'রে দিয়ে জননী তাঁদের সুখদানের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব থাকেন।১

ত্রেতাযুগে সীতা, দ্বাপরে রাধা, কলিযুগে যশোধরা ও বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে তিনি সকলের ভরণ করেছেন। যুগে যুগে আমার জননী প্রভুর অর্থাৎ যুগাবতারের ধ্যানের শ্রেষ্ঠ আকর—অর্থাৎ পরমেশ আমার জননীকেই করেছেন নিরন্তর ধ্যান। এমন জননীদের মধ্যেও জননী সারদা সত্যি মণিরও মণি—সর্বযুগের বিশ্বধাত্রী জননীদের তিনি সর্বতোভাবে অতিক্রম ক'রে গেছেন (কারণ দ্বাদশবর্ষের জপের মালা, সাধনায় সিদ্ধি ঠাকুর ফলহারিণী কালীপূজার দিনে মায়ের চরণেই সমর্পণ করেছিলেন)।২

জননী শ্রীসারদা জননীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। তিনি ঠাকুরের সেই বিশিষ্ট মত নিত্য আনন্দ সহকারে প্রচার করেছেন: 'মাতৃভাবই শ্রেষ্ঠ; সখ্য ও মধুর ভাব থেকেও শ্রেষ্ঠ'। কাশীতে পথের ভিখারিনীকে যিনি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে মুক্তিদান করেছিলেন, সেই দেবী সারদামণির কৃপার অন্ত নেই—বিশ্বমাতাদের শিরোমণি তিনিই।৩

জননীর চন্দনা পাখী—তার প্রাণও মায়ের মহানাম-রূপ অমৃত পান ক'রে ধন্য। পিঞ্জরে বাস করেও তার জীবন কৃতার্থ। ধবলী ও শ্যামলী গাভী এবং সঙ্গে সঙ্গে বাছুরেরাও মায়ের করতলের স্পর্শলোভে নিরন্তর হাম্বা রব ক'রত। ৪

জননীর স্নেহধন্য সুতশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ বিশ্ব বিজয় ক'রে এসে বলেছেন, 'পিতা অপেক্ষা মাতা বড়।' সমভাবে গৃহস্থসন্ন্যাসী নাগমহাশয়ও উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, 'বাবার থেকে মা দয়াল।৫

ভক্তভৈরব গিরীশ চিরকাল মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এবং পেতেন-ও। তিনি সর্বদাই বলতেন মায়ের দয়াই সমধিক। জননীর পাদযুগলই যতীন্দ্রবিমলের একমাত্র সম্বল। সেই সম্বলে ভর ক'রে সে বলছে—জননী শ্রীসারদা অতুলা, তিনিই সনাতনী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা।৬

কথাপ্রসঙ্গে

পুতুল, প্রতীক ও প্রতিমা

দিনে দিনে প্রতিমাপূজার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, দেশে ধর্মভাব বাড়িতেছে। কাহারও কাহারও মত: ধর্মভাব লোপ পাইতেছে, ঠাকুর-দেবতায় না আছে ভক্তি, না আছে ভয়। পাড়ার কতগুলি বেকার যুবক চাঁদার খাতা বগলে লইয়া জোর করিয়া চাঁদা আদায় করে; প্যাণ্ডাল-মাইক, চা-জলখাবার, জলসা ও ট্যাক্সিতে শতকরা ৯০ টাকা খরচ হয়, বাকী টাকায় প্রতিমা, পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ। এই তো সর্বজনীন পূজার আয়-ব্যয়।

একই পাড়ায় একাধিক সর্বজনীন পূজা দরিদ্র গৃহস্থের উপর নূতনতর করভার! এরূপ পূজা বাড়িয়া লাভ কি? না ভজন, না পূজন—সারা দিন এবং রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মাইক-সম্প্রসারিত আধুনিক গান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার বিলাতী সুরের বিকৃত অনুকরণে হিন্দী সিনেমার গান, শুনিলেই মনে হয় ঢাকের বাদ্যির মতো—থামিলেই মিষ্টি।

যাহারা বহু ব্যয়- ও শ্রম-সাপেক্ষ দুর্গাপূজা করিতে পারিল না, তাহারা একদিনের কালী-পূজার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। পূজা

একটা পাইলে হয়, পাড়ার একদল যুবকের ইহাতে মহা উৎসাহ। পূর্বে ছিল ছাত্রেরা সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা করিত। সরস্বতী ছাত্রদের দেবতা, বিদ্যাদায়িনী; তাঁহাকে লইয়া ছেলেদের মাতামাতি শোভা পাইত; কিন্তু মা কালীকে লইয়া মাতামাতি দেখিলে ভাবনা হয়, গোটা দেশ কি সত্যই কৈবল্যমুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছে? আজকাল আবার কারখানায়, ছোট বড় কারিগরী দোকানে বিশ্বকর্মা পূজা, তাও প্রতিমূর্তি করিয়া। মনসা-শীতলার পূজার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ঐ পূজা একবার লাগিলে পাড়ায় পনের দিন উৎসবের মত্ততা চলিতে থাকিবে! কিন্তু কেন যে পূজা, উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞাসা করিলে কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দিনের পর দিন যাত্রা, জলসায় পাড়া সরগরম। দেবতা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

আর একটি জিনিস লক্ষণীয়, উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্তি অপেক্ষা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ, অনুষঙ্গ, উপসঙ্গ মূর্তিগুলির পারিপাট্য বাড়িতেছে, তাহাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এবার এক পূজামণ্ডপে দলে দলে লোক ছুটিয়াছিল, মা কালীর প্রতিমা দেখিতে নয়—ঢাকীর মূর্তি দেখিতে! মন্দিরে রহিয়াছেন মা কালী, মাটীর পুরোহিত পূজা করিতেছেন, মণ্ডপের মধ্যস্থলে মন্দির চত্বরে খাকী সার্ট গায়ে ঢাকী ঢাক বাজাইতেছে, অবশ্য শব্দহীন; পরবর্তী কোন বৎসর হয়তো শব্দও শোনা যাইবে, টেপ-রেকর্ডিংএর যুগে ইহা এমন কিছু শক্ত নয়। দেখিলাম—মা কালীর প্রতিমা নয়, ঢাকীই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে—এ পূজামণ্ডপ না শিল্প-প্রদর্শনী! আরও মনে হইল—এ প্রতিমাপূজা না পুতুলপূজা?

যাহারা পূজার রহস্য বোঝে না—তাহাদের চোখে এ সবই পুতুল ছাড়া আর কি? যাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার আছে, তাহারা প্রতিমা দেখিয়াই প্রণাম করিবে; যাহাদের সে সংস্কার নাই, তাহারা ঐরূপ পূজাকে পৌত্তলিকতার কুসংস্কার বলিবে, ইহাতে আমাদের বলিবার কি আছে? আমরা যদি ভাব ও ভক্তির গম্ভীর পরিবেশের পরিবর্তে একটা হৈ-হল্লার হালকা পরিবেশ সৃষ্টি করি, তবে নিশ্চয় অন্যধর্মী লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেহ প্রতিমাপূজার রহস্য ভুলিয়া পুতুল-প্রদর্শনী লইয়াই মাতিয়াছে। প্রতিমাপূজার গভীর তাৎপর্য না জানিয়া কেহ ইহাকে পৌত্তলিকতা বলিতেছে।

* * *

প্রিয়জনের প্রতিকৃতি মানুষ চিরদিন কাছে রাখিতে চায়। যে যাহাকে ভালবাসিয়াছে—সে তাহার ছবি চোখে আঁকিয়াছে, মনে আঁকিয়াছে, ঘটে আঁকিয়াছে, পটে আঁকিয়াছে। নিকটতম সান্নিধ্য লাভের আশায় তাহার ছবি সে অঙ্গেও আঁকিয়াছে। চোখের আড়াল হইলে সেই ছবি সে দেখিয়াছে, ছবি দেখিয়া যখন আশা মিটে নাই, তখন সে তাহার মূর্তি গড়িয়াছে। সাবয়ব মূর্তি (statue) দেখিয়া সে ঈপ্সিত জনের সান্নিধ্য লাভ করিতেছে—এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছে।

এই ঈপ্সিত ব্যক্তি মানবিক সম্পর্ক হইতে কখন যে ইন্দ্রিয়াতীত দেবতার আসনে গিয়া উঠিয়াছে, আর কখন যে দেবতা স্বর্গের সিংহাসন হইতে নামিয়া মর্ত্যধূলার সম্পর্কে ধরা দিয়াছেন, তাহার সন্ধান সাধক-কবিদের মানসলোকেই ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা গাহিয়াছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা'। মানুষ যদি দেবতাকে ভাল-

বাসিতে চায়, তবে তাহারা একটা ভালবাসার সম্পর্কের মাধ্যমে প্রিয়রূপে—মানবরূপেই তাঁহাকে ভালবাসিবে, ইহা ছাড়া অন্যরূপে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের মানবিক রূপ চিন্তা করা অন্যায় তো মোটেই নয়, বরং ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক, ব্যাপক ও চিরন্তন।

অনন্ত ঈশ্বর, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাঁহাকে চিন্তা করা অন্যায়—এই জাতীয় চিন্তা কোন ধর্মবিশেষের নিজস্ব নহে। সকল ধর্মের মধ্যেই বিভিন্ন স্তরের সাধক আছেন। প্রথম স্তরে মনে হয়, ঈশ্বর বাহিরে; কিন্তু কিভাবে, তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। তখনই মানুষ বাহ্য প্রতীক (symbol) অবলম্বনে ঈশ্বরভাবের সান্নিধ্য কল্পনা করিয়া ঐ ভাব অনুভব করিতে চায়; পরবর্তী মধ্যস্তরের সাধক বুঝেন, ঈশ্বর অন্তর্যামী, আমার অন্তরে, প্রত্যেকের অন্তরে। সর্বশেষে তিনি উপলব্ধি করেন, ঈশ্বর সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান।

এই শুদ্ধ সত্তাচৈতন্যকেই পরব্রহ্ম বলা হয়, ইনি নিশ্চয়ই নির্গুণ ও নিরাকার। ইনি যেমন দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, তেমনি ইনি কোন গুণের দ্বারাও বর্ণনীয় নন। 'তিনি দয়ালু' একথাও বলা চলিবে না। 'দয়ালু' বলিতে গেলেই ঐ গুণের আধার একটি ব্যক্তিরূপ মনে আসিবে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, তাঁহার স্তব-স্তুতি ধ্যান-পূজা অসম্ভব। তিনি প্রার্থনারও ঊর্ধ্বে! তবে ধর্মভাবাপন্ন মানুষের এত পূজা, এত প্রার্থনা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? অবশ্যই এক ধাপ নামিয়া আসিতে হইবে! সগুণ ব্রহ্মই মানুষের উপাস্য। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্! 'তিনি সাকার, নিরাকার আরও কত কি!' শ্রীরামকৃষ্ণের কি অনুপম দৃষ্টান্ত: অসীম জলরাশি, স্থানে স্থানে হিমে বরফ হইয়া গিয়াছে! ঈশ্বর নিরাকার বলিয়া তিনি সাকার হইতে পারেন না—একথা কি করিয়া বলা যায়? যিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার হইয়াও ইচ্ছা করিলে ভক্তকে তাহার মনের মতো রূপে দেখা দিবার জন্য, তাহাকে ধরা দিবার জন্য তিনি নিশ্চয় সাকার হইতে পারেন। যদি বল পারেন না, তবে বলিতে হয়, তিনি সর্ব-শক্তিমান্ নন! এ কথা স্ব-বিরোধী।

ঈশ্বরতত্ত্ব সকল ধর্মে মোটামুটি এক প্রকার, সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু জীবতত্ত্ব লইয়া শুধু বিভিন্ন ধর্মে নয়, একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। এই জীবভাবকে কেন্দ্র করিয়াই তো ধর্ম-সাধনা, দর্শন-উপাসনা—সব কিছু! জীব সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা, তাহার সাধনা, উপাসনা এবং জীবনযাপন-পদ্ধতি সেইরূপ হইবে।

যাঁহাদের ধারণা বিশ্বাতিরিক্ত (extra-cosmic) ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন না, কি দিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন। শেষ পর্যন্ত বলিতে হয়—তাঁহার ইচ্ছামাত্র এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জীব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা সামঞ্জস্যহীন। জীবের দেহ এই জগতের পদার্থজাত হইলেও জীবের জীবন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস এবং জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি (image)-অনুযায়ী সৃষ্ট, অতএব প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইল—ঈশ্বরের আকার আছে, এবং মানুষ সেই আকৃতিরই প্রতিকৃতি। এই নরাকৃতি ঈশ্বর-ধারণার (anthropomorphic view of God) জন্য লজ্জিত হইবার কিছু নাই, ইহা স্বাভাবিক।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মভাব ধরিতে না পারা পর্যন্ত সগুণ সাকার ভাব অবশ্য স্বীকার্য। দেহবান্ ব্যক্তির পক্ষে নিরাকার-ভাব ধারণা করা অতি কষ্টকর (অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'—গীতা ১২।৫)।

যাঁহাদের ধারণা ঈশ্বরই মায়াশক্তি দ্বারা জীব-জগৎ হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন: ঈশ্বরই নিমিত্ত-কারণ, তিনিই উপাদান-কারণ; তিনি এক হইয়াও লীলায় বহুরূপে প্রতিভাত হন। আত্মা যতক্ষণ সীমাবদ্ধ দেহ-মনে অভিমান করে, ততক্ষণই সে জীব, অসীম বিশ্বে যাঁহার আত্মবোধ, তিনি ঈশ্বর। বেদান্তের তত্ত্ব তন্ত্রের সাধনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাই এই ভাবের উপাসকগণ বলিতে পারিয়াছেন, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' দেবতাই দেবতার পূজা করিতে পারেন। দেবতা হইবার জন্যই দেবতার উপাসনা, দেবতার সান্নিধ্য-কল্পনা। প্রথমে দেহভাব, মধ্যে জীবভাব, শেষে আত্মভাবে উপনীত হইয়া সাধক বুঝিতে পারে, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।

এই ভাবে উপনীত হইতে মানুষের জন্ম-জন্মান্তর লাগিতে পারে; মনোজগতে বহুযুগ-ব্যাপী যাত্রার শেষে এই ভাব মানুষের মনশ্চক্ষে বিদ্যুতের আলোকের মতো প্রতিভাত হইয়া রহস্যাবৃত মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, অন্তর্জগতে মানুষের নিঃশব্দ অভিযান কি ভাবে শুরু হইল, তাহা লইয়া বহুতর মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। মৃত্যুই কি মানুষের মনকে প্রথম অন্তর্মুখী করিয়াছিল? এই মাত্র যে ছিল, সে কোথায় চলিয়া গেল? কোন্ শূন্যে মিলাইয়া গেল? স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা—নিশ্চয়ই তাঁহারা আছেন, চোখের আড়ালে কোথাও থাকিয়া এখনও আমাদের কল্যাণ-চিন্তা করিতেছেন,—আদিম মানবের এই বিশ্বাসই তাহাকে পরলোকের চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে। মরিয়া আমিও যাইব পিতৃলোকে পরলোকে, যদি আমি পিতৃপিতা-মহের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। পূর্বপুরুষ-উপাসনাই ধর্মভাবের প্রথম স্তর, সর্বত্র না হইলেও মানবজাতির এক বৃহৎ অংশে ইহাই লক্ষিত হয়।

মানবজাতির আর এক শাখায় আরও একটি ভাবের খেলা দেখা যায়; সেখানে বহিঃপ্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তিরাজি অসহায় মানুষকে দেবতা-চিন্তায় মগ্ন করিয়াছে; জ্ঞানলাভের জন্য, শক্তিলাভের জন্য তাহাকে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা-পরায়ণ করিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার-নাশকারী সূর্য কোথা হইতে আসিল? হে সূর্য, আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত কর! সূর্যের আলোয়, মেঘের বৃষ্টিতে, আকাশের ঝঞ্ঝায় তাহারা দেবতা-শক্তির খেলা দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া সেই সেই দেবতাকেই অর্ঘ্য দিয়াছে।

পরিশেষে বোঝা যায়, সকল ধর্ম-ভাবের মূলে একটি ভাবই খেলা করিতেছে, সেই ভাবটি আয়ত্ত করিবার জন্যই সকল সাধনা, সকল উপাসনা; সেটি সীমার বন্ধন হইতে মুক্তি! মৃত পিতৃপুরুষ উপাস্য, কেন না তাঁহারা দেহবন্ধন হইতে মুক্ত, তাহারা শক্তিশালী, কল্যাণক্ষম; সূর্যাদি দেবতা অসীম শক্তিশালী—কল্যাণকারী, অতএব উপাসনীয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করিয়াছে। বিভিন্ন উপায়ে মহা-সত্যের সম্মুখীন হইয়া একজন মনে করে, আমি যেভাবে সত্যে উপনীত হইয়াছি, ইহাই পথ—একমাত্র পথ; এবং কল্যাণবোধ-প্রণোদিত হইয়াই সে অপরকে সেই পথে আনিতে চায়। এইখানেই শুরু হয় যত মত-

বিরোধ! দেহের বেলা যেমন নিজের রুচি-অনুযায়ী খাদ্য নিজেকেই গ্রহণ করিতে হয়—পরিপাক করিতে হয়, মনের বেলাও তেমনি মনোমত ভাব ধারণা করিতে হয়, নতুবা 'পর ধর্মো ভয়াবহঃ'।

একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি হইতেই এক একটি ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে ; প্রত্যেকটি সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। এক ধর্মের লোক যদি বলে, আমার ধর্মপদ্ধতিই সত্য, আর সব ভুল, তবে বুঝিতে হইবে তাহারটিও ভুল।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উপাসনা বিভিন্ন। একটি মূর্তিমাত্রে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা যেমন পৌত্তলিকতা, একটি কোন রীতি নীতি মত বা পদ্ধতির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া বা একটি মাত্র পুস্তককে অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহার উপাসনা করাও এক প্রকার সূক্ষ্ম পৌত্ত-লিকতা! ইহা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নহে।

প্রাথমিক অবস্থায় ঐ রূপ নিষ্ঠা গাছের বেড়ার মতো কিছুটা উপকার করে, কিন্তু বেড়া যেন গাছের বৃদ্ধিকে রুদ্ধ না করে, তাই স্বামীজী বার বার বলিয়াছেন: It is good to be born in a church but not to die there. কোন একটা পদ্ধতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু উহার মধ্যে মরা ভাল নয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি লাভের জন্য পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করিতে হইবে। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ মুক্ত মন। মুক্ত মন কোন ধর্মের বা পদ্ধতির ক্রীতদাস নহে। এই মুক্ত ভাব লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য, ইহাই ব্রহ্মভাব বা আত্মভাব।

* * *

কিন্তু কি উপায়ে ইহা লাভ করা যাইবে! মনের যে অবস্থায় আমরা আছি, এই অবস্থা হইতেই আমাদের ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। দেহমন-বিশিষ্ট এবং দেহমনে অভিমানী মানুষ আমরা। বনের মধ্যে পথ হারাইয়া যে বনের বাহিরে যাইতে চায়, তাহাকে অবশ্যই বনের মধ্য দিয়াই চলিতে হইবে! দেহমনের বাঁধনে আবদ্ধ মানুষ এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার দেবতাকেও এই দেহমন-বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করে, তাঁহার প্রতীক অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিন্তা করে—তাঁহার দিকে আগাইয়া যায়। তাঁহারই প্রতিমা গড়িয়া, নিজ প্রাণ হইতে তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া দেবতার ভাবে ভরিয়া যায়। আবার পূজান্তে দেবতার চৈতন্যশক্তি নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া প্রতিমা কারণ-সলিলে বিসর্জন দেয়, ব্যক্ত আবার অব্যক্ত হইয়া যান;—ইহাই প্রতিমাপূজার রহস্য। ইষ্টদেবতার বিগ্রহ হৃদয়মন্দির হইতে আনিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গৃহ-মন্দিরে স্থাপন করিয়া সাধক দিনের পর দিন পরম প্রিয়তমকে মানুষের মতো সেবা করে। দেবতাভাবের সান্নিধ্যে বাস করবার এ এক অপূর্ব কৌশল, স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন ঘটাইবার এ এক অনুপম উপায়। ইহাই বিগ্রহসেবার অন্ত-র্নিহিত রহস্য।

যাহারা এ রহস্য জানে না বা বোঝে না, তাহাদের চক্ষে প্রতিমাপূজা অবশ্যই পুতুল-পূজা। যাঁহারা প্রতিমা-পূজার আয়োজন করেন, তাঁহারা যদি এ রহস্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে জানিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে পূজামণ্ডপ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে, পূজা সার্থক হইবে। সর্বজনীন পূজা সত্যই সকলের সর্বকল্যাণ সাধন করিবে।

যাহারা এ রহস্য বুঝিবে না, তাহাদের কর্তব্য এরূপ পূজার সংস্পর্শ ছাড়াই বিচিত্রা-নুষ্ঠানের আয়োজন করা।

আর যাঁহারা প্রতিমাপূজা মানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বৃথা প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধ সমালোচনা না করিয়া মানব-জাতির—বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করুন এবং নিজের মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাহা হইলেই বুঝিবেন, প্রতীক বা প্রতিমা ব্যতীত ধ্যান-চিন্তা-উপাসনা অসম্ভব! ব্রহ্মভাবে স্থিতি উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; সেখানে নামরূপ প্রতিমা-প্রতীক কিছুরই প্রয়োজন নাই; কিন্তু সাধনার স্তরে ধ্যানের জন্য 'রূপ', জপের জন্য 'নাম' এবং পূজার জন্য 'প্রতিমা' একান্ত প্রয়োজন।

ঈশ্বর : ব্যক্ত ও অব্যক্ত

স্বামী বিবেকানন্দ

যাকে তোমরা ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বল, আমার ধারণা তিনি এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তা একই, একই কালে তিনি সাকার ও নিরাকার। আমরাও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'অব্যক্ত', আর আপেক্ষিক-ভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'ব্যক্তি'। তোমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-সত্তা, সকলেই সর্বব্যাপী। শুনলেপ্রথমটা মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এ কথা যতখানি সত্য, ঐ কথাও ততখানি সত্য, আত্মা সর্বব্যাপী না হ'য়ে পারে কি ক'রে? আত্মার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই, জড়ের কোন ধর্মই আত্মায় নেই। আমরা সবাই যদি আত্মা হই, তাহলে দেশ (space) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারিনা, দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে; আমরা যদি শরীরে আবদ্ধ থাক-তাম, তাহলে আমাদের জড়বস্তুই হ'তে হ'ত। শরীর, আত্মা—সব কিছুই জড় হ'ত। 'শরীরে বাস করা', 'আত্মাকে শরীরে আটকে রাখা' প্রভৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হ'ত, এর অতিরিক্ত এদের কোন অর্থ থাকত না।

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে—আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি : প্রত্যেকটি আত্মা হচ্ছে এক একটি বৃত্ত, একটি বিন্দুতে যার কেন্দ্র এবং যার পরিধি কোথাও নেই। কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, সেখানেই সব কর্মশক্তি প্রকাশিত। তোমরা সর্বব্যাপী, তবে সত্তাচেতনা একটি বিন্দুতে ঘনীভূত। সেই বিন্দুটি কিছু জড় কণা সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে প্রকাশ ক'রে তাকে বলে 'শরীর'।

তাহলে তুমি সর্বত্র আছ। যখন একটি শরীর বা যন্ত্র আর কাজ করতে পারে না, তখন শরীরের কেন্দ্র—তুমি সরে যাও, আবার নতুন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়কণা সংগ্রহ ক'রে তাদের মাধ্যমে আবার কাজ করতে থাকো। এই হ'ল মানুষ। তা হ'লে ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি কোথাও নেই, এবং যার কেন্দ্র সর্বত্র। এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও সক্রিয়। সীমাবদ্ধ আত্মা আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ ক'রে চলেছে। আমাদের শুধু একটি বিন্দু চেতন, সেই বিন্দু একবার আগিয়ে চলেছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি নগণ্য। আমরা যখন বলি, ঈশ্বর কথা বলছেন, তখন তার অর্থ—তিনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যমে বলছেন। আমরা যখন বলি—তিনি দেশ-কালের সীমার অতীত, তার অর্থ তিনি ব্যক্তিত্বশূন্য সত্তা। এই উভয়ই একই সত্তা।

একটি দৃষ্টান্ত দিই ; আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখছি। মনে কর, তুমি সূর্যের দিকে আগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে দেখবে আর এক সূর্য—অনেক বড়। সব শেষে দেখবে প্রকৃত সূর্য লক্ষ মাইল জুড়ে। এখন এই যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাক, প্রত্যেক স্তর থেকে ছবি তোলা হ'ল। প্রকৃত সূর্যেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সবগুলি তুলনা কর, মনে হবে প্রত্যেকটি পৃথক্। প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখা গেল লক্ষমাইল-ব্যাপী বিরাট প্রকৃত সূর্য। উভয়ই একই সূর্য।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অসীম সত্তাকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, মনের বিভিন্ন স্তর থেকে। নিম্নতম মানুষ দেখছে তাঁকে পূর্বপুরুষ-রূপে ; দৃষ্টি যখন আরও বড় হ'ল, তখন তাঁকে দেখছে একটি গ্রহের নিয়ন্তা-রূপে ; দৃষ্টি আরও ব্যাপক হ'লে মানুষ বুঝতে পারে তিনি বিশ্বের নিয়ামক। সর্বোচ্চ মানব অনুভব করেন, 'তিনি আমারই স্বরূপ'। ঈশ্বর সর্বদা একই, তাঁকে যে বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তার কারণ দৃষ্টির প্রভেদ ও তারতম্য।

[অনুবাদ : God, Personal and Impersonal--C.W. VIII. Pp. 188-9.]

মন-মাঝে

'বৈভব'

আজি, আমার অন্তর-মন্দির
অতীব গহন গম্ভীর।
বন মাঝে—
মম মন মাঝে
এ কি অপরূপ মন্দির রাজে!
মন্দির মাঝে
কেন জানি না যে
নিশিদিন রিনিরিন মন্দিরা বাজে!

মন্দির মাঝে
কে যেন বিরাজে—
কত দিন ভয়হীন—যেতে পারি না যে!
মন্দির-দ্বারে
জ্যোতির আকারে
প্রদীপ-শিখারেখা পড়ে পথমাঝে ;
তাই ধরে যাই,
এই গানই গাই,
দেখি মম প্রিয়তম মূরতি রাজে!

চলার পথে

'যাত্রী'

ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষ চিরকালই তার বিরাটের পূজা—মন্দিরাদির অঞ্জলি দিয়েই সার্থক ক'রে রেখেছে। ধর্মের প্রতি ভারতবাসীর এই অনুরাগের নিদর্শন ও তার পূজা-আরাধনার অনিমেষ স্বাক্ষর আজও তাই বহুদিকে মাথা তুলে আছে। আমরা আজ উত্তরাধিকার সূত্রে সে সবের অমৃতাস্বাদন করছি মাত্র। এই রকম এক শাশ্বত মন্দিরাঞ্জলি রয়েছে মধ্যপ্রদেশের 'খজুরাহ'তে। এবার ৺পূজায় সময় সেই খজুরাহতেই গিয়েছিলাম।

কলকাতা থেকে পাটনা হ'য়ে ৺কাশী। তারপর সেখানকার চিরজাগ্রত ৺বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পায়ে মাথা লুটিয়ে, সেখান থেকে আর এক যাত্রীকে নিয়ে, এলাহাবাদ হ'য়ে মধ্যপ্রদেশের 'সাত্‌নায়' চলে এলাম রেলে চড়ে। সেখান থেকে আবার 'বাস'-এ প্রায় বাহাত্তর মাইল গিয়ে আমরা দুই যাত্রী একদিন বিকেলে খজুরাহ পৌঁছে গেলাম।

কৌতূহলটা বোধ হয় মানুষের রক্তগত। সেই রক্তের টানেই খজুরাহতে এসে তার মন্দির-সম্পদকে সেদিন বিকেলে মাত্র এক ঝলক দেখলাম। কিন্তু দু-চোখ তাতেই অপলক হ'য়ে গেল, মনে হ'ল—বিংশ শতাব্দীর এই প্রখর মধ্যাহ্নেও আমরা বাস্তব ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছি রহস্যময় অতীন্দ্রিয় এক স্বপ্ন-লোকে, যেখানে সহজাত এমন কিছু আছে, যা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে, চেতনায় ঝড় বইয়ে দেয়।

তিন দিকের ছোট্ট 'পান্না'-পর্বতশ্রেণীর নীলদেহ জুড়ে গভীর বন। তারই বুক চিরে আধুনিক কালের পিচের রাস্তা দিয়ে একেঁ-বেঁকে এখানকার ছোট্ট গ্রাম এই খজুরাহতে এসে পৌঁছেছিলাম। পথকষ্ট ছিল, কিন্তু শরতের সোনাঝরানো আকাশ, চোখের সামনের এই রাঙা-মাটির দেশটিকে আরব্য-উপন্যাসের বিচিত্র রেখায় আমাদের মন যাদুর এক মধুর প্রলেপে ভুলিয়ে কখন যে তাকে মনোরম ক'রে দিয়েছিল, তা বুঝতে পারিনি। আর বুঝতে পারিনি ব'লেই, তখন আমাদের মন বর্তমানকে ছাড়িয়ে অতীতের এক মনোহর বঙ্কিম রেখাপথ ধরেই—এক অস্পষ্ট সময়-বেলায় এসে দৃষ্টি মেলল। দেখলাম—চণ্ডেলা (-চন্দ্রিলা —চন্দ্র থেকে উপজাত) রাজবংশের আরম্ভের সেই প্রথম মহীয়সী নারী—হেমবতীকে। বিখ্যাত পুস্তক 'মহোবা-খণ্ডে' যাঁর বর্ণনা রয়েছে।

'গহির্‌ওয়ার'-জমিদারের কুল-পুরোহিত হেমরাজের কন্যা, বালবিধবা হেমবতী বাপীতটে স্নান করতে নেমেছেন। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হ'য়ে আকাশের চাঁদ এলেন নেমে। দেবতার সঙ্গে মানবীর মিলন হ'ল। তারই ফলে বৈশাখ শুক্লা একাদশী তিথিতে, সোমবারে জন্মালেন সুবিখ্যাত চন্দ্রবর্মন (চন্দ্রব্রহ্ম)। ছোট বয়সেই চন্দ্রবর্মনের সে কি সাহস ও তেজ! ষোল বছর বয়সেই প্রস্তরাঘাতে ব্যাঘ্র এবং লগুড়াঘাতে এক সিংহ মেরে ফেললেন! তারপর বড় হ'য়ে, গ্রাম থেকে জনপদ, জনপদ থেকে প্রদেশ, এমনি ক'রে অনেক ভূখণ্ড জয় ক'রে

তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত 'চণ্ডেলা' রাজবংশের। সেদিনকার দুর্ধর্ষ 'গুর্জর-প্রতিহার,' প্রবল-প্রতাপ 'রাষ্ট্রকূট' এবং বাংলার শক্তিশালী 'পাল' রাজাদের কাছ থেকেও দেশ জয় ক'রে এই ভাবে রাজ্য গড়ে তোলা যে সত্যই শক্তির পরিচায়ক, এ কথা পুরাণ নয়, ভারতবর্ষের যে কোন প্রামাণ্য ইতিহাসের দশম শতাব্দীর ঘটনা-বর্ণিত পাতা কিছু ওল্টালেই বোঝা যাবে।

এই সুদৃঢ় রাজ্যস্থাপন করলে কি হবে, চন্দ্রবর্মনের মায়ের মনে কিন্তু শান্তি নেই। তিনি তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য 'ভাণ্ড্য'-ব্রত উদ্‌যাপন করতে চান। এজন্য চাই পঁচাশীটি মন্দির, সরোবর, উদ্যান প্রভৃতি রচনা। মাতৃগতপ্রাণ চন্দ্রবর্মন তাই তাঁর 'জজাহুতি' (জেজাক-ভুক্তি) রাজ্য-খণ্ডের রাজধানী খজুরাহতে (খর্জুরবাহক) মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করলেন। এখানকার মন্দিরশ্রেণীর স্থাপত্য-শিল্পী 'চিচ্ছা', তাঁর উপাধি যে 'বিজ্ঞান-বিশ্বকর্তা' ছিল, তা এখানকার শিলালিপিতেই পাওয়া গেছে।

খজুরাহ পৌছে সেদিন আমরা ওখানকার পশ্চিমের মন্দির-গোষ্ঠি দেখে নিলাম। তার পরের দিন পায়ে হেঁটে, দেড় মাইল দূরে জৈন মন্দিরাদি ও সাড়ে তিন মাইল দূরে দক্ষিণের মন্দির-গোষ্ঠি দেখা শেস করি। এখানকার মন্দির-গোষ্ঠিতে ভারতের সর্বধর্ম-সমন্বয় হয়েছে। বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মন্দিরাদি তাই একই সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যায়। ভাঙা ও অভাঙা মন্দিরাদি মিলিয়ে খজুরাহ ও তার নিকটবর্তী 'জট্‌করী' গ্রামে আজও ত্রিশটি মন্দির রয়েছে, প্রায় সবগুলিই লাল বেলে পাথরে তৈরী। মন্দির গড়ার কাল ৯৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দ ব'লেই পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন।

মন্দিরগুলির মধ্যে মাতঙ্গেশ্বর ও জৈন মন্দিরেই এখনও কিছুটা পূজাদির ব্যবস্থা রয়েছে। আর বাকীগুলিতে বহিরাগত অত্যাচার ও কালের প্রভাবে পূজাদি মুছে গেছে। মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরের বিরাট গৌরীপট্টের ব্যাস হবে প্রায় একুশ ফুট এবং তদুপরি সু-মসৃণ বিরাট শিবলিঙ্গের ব্যাস হবে প্রায় চার ফুট এবং উচ্চতা প্রায় সাড়ে আট ফুট। 'দুলাদেও' (স্বর্গীয় বধূ) মন্দিরটিও শিবের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত ; কিন্তু প্রাচীন মূর্তির বদলে এখানে পরে অন্য একটি শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছে। শিবের অবয়ব-মূর্তিও এই মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ। এই মন্দিরটির শিল্পকীর্তি অতুলনীয়। 'চৌষট্‌ যোগিনী' মন্দিরে আগে পঁয়ষট্টিটি খোপ ছিল, এখন সব ভেঙে গিয়ে পঁয়ত্রিশটিতে দাঁড়িয়েছে। অধুনালুপ্ত মধ্যের বড় খোপটি ছাড়া বাকী চৌষট্টিটিতে যোগিনী-মূর্তি ছিল। এই মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী। 'দুদাহি' মন্দিরটি ব্রহ্মার। এর গর্ভমন্দিরের ওপরের দিকে শ্মশ্রু-সম্বলিত ব্রহ্মার মূর্তি রয়েছে, বাহন হংসও আছে এবং এ সব ঘিরে আবার নবগ্রহ মূর্তি। চতুর্ভুজ বা লক্ষ্মণজীর মন্দিরের গায়ে লক্ষ্মীমূর্তির দুই দিকে ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি বৈষ্ণবভাবের জয় ঘোষণা করে। বরাহ-মন্দিরে বিরাট বরাহমূর্তির দেহে ব্রহ্মার পট উৎকীর্ণ। ভরতজী বা চিত্রগুপ্তের মন্দিরের বেদীতে একটি পাঁচফুট উচুঁ সূর্যের উঁচু-জুতা-পরা মূর্তি, সপ্তাশ্ব রথ চালাচ্ছেন। এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের ওপরেও একটি সুন্দর সূর্যমূর্তি রয়েছে। আবার একটি বিষ্ণুমূর্তিও মাঝের কুলুঙ্গিতে বসানো। 'ঘণ্টাই' মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায়। জৈন মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরের মূর্তিটি ১৮৬০ খৃঃ তৈরী ক'রে বসানো হয়েছে। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের

চৌদ্দ ফুট উঁচু মূর্তিটি সত্যই মনোরম। দেবী জগদম্বা বা জগদম্বী-মন্দিরের ভেতরের মকরবাহন গঙ্গার মূর্তিটি দেখে মনে হয়, পূর্বেকার বিষ্ণুমূর্তিকে সরিয়ে তা বসানো হয়েছে। কারণ মন্দিরটির গর্ভমন্দিরের দ্বারের উপরেই বিষ্ণুমূর্তি খোদাই করা। এখানে একটি তিন মাথা ও আট হাত বিশিষ্ট শিবের মূর্তি রয়েছে পশ্চিমের নকসার নীচেকার কুলুঙ্গিতে। যাওয়ারী-মন্দিরে এক চার হাত উঁচু বিষ্ণুর মূর্তি বসানো। খজুরাহর বিশ্বনাথ-মন্দিরে ১০০২-৩ খৃঃ একটি পান্নার তৈরী শিবলিঙ্গ বসান রাজা ধঙ্গ্। পরে তা সরিয়ে সাধারণ পাথরের লিঙ্গ বসানো হয়েছে, শিলালিপি-পাঠে তাই মনে হয়। এর সুমুখেই বিরাট নন্দীর সু-মসৃণ বৃষমূর্তিটি সত্যই দেখবার জিনিস। জট্করী গ্রামের চতুর্ভুজ মন্দিরের নয় ফুট উঁচু মনোরম বিষ্ণুমূর্তি সকলকেই আকর্ষণ করে। এ ছাড়া, দৈহিক শক্তিসাধনার প্রতীক বিরাট হনুমান্ বা মহাবীরের মূর্তি দু-জায়গায় দুটি রয়েছে। খজুরাহর সুবিখ্যাত কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির শুধু ভাবের নয়, বোধ হয় ঐ রীতির ভাস্কর্যেরও চরম নিদর্শন। মন্দিরের গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ, অধিষ্ঠান প্রভৃতি মিলিয়ে 'সপ্তরথ' কারুকীর্তির প্রথায় তৈরী। স্তরে স্তরে পাথর গেঁথে 'সপ্তাঙ্গ'-প্রথায় এই মন্দির ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠে গেছে। মন্দিরের 'শিখর'-এর নয়নসুপকর গতিকে 'অঙ্গশিখর' সজ্জায় সাজিয়ে তুলে শীর্ষের 'অমলক'-এ এসে সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে দেখতে পাই।

বাইরে ও ভেতরে মন্দির-গাত্রে খোদিত নানা মনুষ্য-মূর্তি জীবনের বিভিন্ন কর্মধারায় মেতে আছে। এ ছাড়া নানা অপ্সরা, দেবদেবী, গন্ধর্ব, যক্ষ, জীবজন্তু, মানব-মিথুন প্রভৃতির অসংখ্য মূর্তিতে মন্দিরগাত্র বিচিত্রভাবে সজ্জিত। এরা সবাই শিল্পীর ভূয়োদর্শনের বিচিত্র রেখায় জীবন্ত। এই সব মূর্তির কোনটির হয়ত দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা অথচ মুখে-চোখে অপরূপ কমনীয় ভাব ফুটে রয়েছে। কোন মূর্তির আবার উজ্জ্বল চোখে দুর্বার মিনতি। কোন পৌরুষব্যঞ্জক মূর্তির ঠোঁটের ভাঁজে শিশুর সারল্য। কারো আবার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ ঋজুতা। কারো মুখে রূপালি হাসির বান ডেকেছে। কেউ বা স্বচ্ছ প্রখর চাউনি মেলে কি যেন বোঝাতে চায়। কারো বা পদ্মপলাশ চক্ষুদুটি নির্লিপ্ত ঔদাস্যে চিরদিনই সুদূর-নিবদ্ধ। কেউ আবার তার কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়েছে স্পষ্টভাবে। কারো বা কি এক অদ্ভুত কৌতূহলে ঝিকিমিকি ক'রে উঠেছে দুটি চোখই। কেউ হয়ত একটা সুস্থির স্নিগ্ধতা টেনে এনেছে নিজের দেহের সব কিছুর ওপরেই। কোথাও বা অভ্যস্ত জীবনের পরিমণ্ডলে গড়া এক দীপ্ত-মূর্তি আমাদের বর্তমান বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে আছে। কোন কোন মূর্তি আবার কি এক প্রত্যাশিত সম্ভাবনার খুশিতে ভরপুর। ঈর্ষার স্পর্শে কারো কারো ভুরু হয়েছে সর্পিল। এমনি কত কি!

আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি, অতীতের এই মূর্তিগুলিকে যে সব শিল্পী এমন জীবন্তভাবে আমাদের দিকে মুখোমুখি ক'রে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাদের মনে সৃষ্টির কি অপূর্বতাই না একদিন শিহরিত হয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠ শিল্পিবৃন্দ কি আধুনিক কালের অবিশ্বাসের সংসারে চিরতরে হারিয়ে গেছে?—এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়, এই কথা বিশ্বাস করতেও দ্বিধা জাগে। তবুও ওপরে ঐ পরিব্যাপ্ত অগাধ আকাশের প্রসারিত বক্ষের তলে আজও যেন ঐ শিল্পীদের বিদায়ের

বিধুর সুরটি ধরা পড়ে আছে। এখান থেকে তাই দৃষ্টি সরিয়ে দূরে তাকাই। চোখে পড়ে—ধূলার কুয়াসা তুলে গরুর গাড়ি চলেছে মহুয়ার বনকে বামে রেখে, দূরের ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, নদীর তীরের নিচু ধানের জমির দিকে। চারিদিকের শস্যহীন প্রান্তরে ঐ দিকটাতেই যা কিছু চাষ-আবাদ হ'য়ে গ্রামের ছোপ লেগেছে; তারপরেই সব ঝাপসা। আর একটু গিয়ে একেবারেই অন্ধকার। কিন্তু এই ভাবে প্রকৃতির কোলে দৃষ্টি মেলেও কোন আশ্বাস পাই না। মনের মধ্যে শুধু এক বিচিত্র অস্থিরতা জট পাকিয়ে ওঠে। রুদ্ধ যন্ত্রণায় এক সময়ে স্বপ্ন-ভ্রমণের প্রহর শেষ হ'য়ে যায়। ভাবি: উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টি—এই নিয়েই তো জীবন। তাই অতীতের স্বপ্ন-রোমন্থন ছেড়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভারতের কথা চিন্তা করতে থাকি। যে ভারতবর্ষে আবার আসবে ধর্মের জোয়ার, জ্ঞানের বন্যা, শিল্পের প্লাবন। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—স্বামীজীর একথা কি সত্য না হ'য়ে পারে?

চল পথিক, ঐ মন্দির-প্রাণ খজুরাহর দিকে চল। সেখানকার অশরীরী শিল্পীদের প্রস্তর-স্বাক্ষরের গভীর অর্থ উপলব্ধি ক'রে নিজের দেহ-মন্দিরটিকে সুন্দর ক'রে গড়ে তোল। বসাও সেখানে তোমার অন্তর-দেবতাকে—তাঁকে প্রাণের টানে জাগাও। তাহলেই তো তোমার নিজস্ব শিল্প-কীর্তি সার্থক হ'য়ে উঠবে। সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার জীবন, তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার সব কিছু। চল চল, নিভৃত হৃদয়ের মাঝে সেই শিল্পসৃষ্টির পথে। আর দেরী নয়, চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

জয়তু সারদা

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

এলে মাগো ধরাপরে গৌরী অপর্ণা;
স্বরূপ লুকায়ে এলে অরূপা অবর্ণ্যা।
দাও সবে বরাভয়, শক্তি অনন্ত;
করি তম অপগত করো প্রাণবন্ত।
বিশ্বের সারভূতা সারদা শ্রীদুর্গে!
মনের অসুর-ভাব নাশো জ্ঞান-খড়্গে।

হে অধরা! দিলে ধরা স্বেচ্ছায় মর্ত্যে,
এ ধরার পাপতাপ বুঝি দূর করতে।
বিশ্বের ইতিহাসে তুমি মা অনন্যা,
তোমারে মা ধরি বুকে, এ ধরণী ধন্যা।
প্রণমি চরণে মাগো হে জগত-ধাত্রী!
কন্যা ও মাতা রূপে এলে শুভ-দাত্রী।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

পূজনীয় কেদারবাবার প্রেরণায় আমরা ১৯১৭ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা রওনা হই। মঠে ঠাকুরের বিরাট উৎসব দর্শন করিয়া তাহার কয়েক দিন পরেই শ্রীশ্রীমায়ের দেশ জয়রামবাটী রওনা হইলাম সকাল ৮-৩০মিঃ ট্রেনে। বেলা ২-৩০মিঃ সময় বিষ্ণুপুর স্টেশনে পৌছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আহারাদি করিয়া রাত্রি ৭টার সময় গরুর গাড়ীতে রওনা হইলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল; মনে প্রবল ব্যাকুলতা, যাহাতে মায়ের পুণ্য দর্শন ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিলাম সমস্ত রাস্তা; পথও তখনকার দিনে বিপদ্‌সংকুল ছিল। বেলা ৯টার সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছিয়া মহারাজদের প্রণাম করিয়া শুনিলাম, শ্রীশ্রীমা অসুস্থা, রক্ত আমাশয়ে ভুগিতেছেন প্রায় ১০।১২ দিন যাবৎ। এই সংবাদ শুনিয়া হতাশ হইলাম। মায়ের দর্শন বোধ হয় আর ভাগ্যে হইল না। পূজনীয় কেশব মহারাজ বলিলেন, 'হতাশ হয়োনা, জয়রামবাটী থেকে আজ বিকেলে লোক আসবে। তার কাছে মায়ের সংবাদ পাবে।' তখনকার দিনে কোয়ালপাড়া আশ্রমের অনুমতি ভিন্ন জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ীতে কেহ যাইতে পারিত না, কারণ মায়ের শরীর সুস্থ না থাকিলে মহারাজগণ কাহাকেও যাইতে দিতেন না। ভগবানের কৃপায় বৈকালে লোক আসিল; তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম, মা অদ্যই অন্নপথ্য করিয়াছেন। পূজনীয় কেশব মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি এখনই জয়রামবাটী রওনা হও।' আমি অমনই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। বৈকাল ৬টার সময় জয়রামবাটী পৌছিলাম। পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ আমাকে লইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট পৌছাইয়া দিলেন। জীবনে এই প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইলাম। মনে আনন্দ আর ধরে না! মা তাঁহার ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার দেশ কোথায়?' বলিলাম, 'ঢাকা-বিক্রমপুর।' মা বলিলেন, 'বাঙাল।' এই কথাটি মা আমাদের আদর করিয়া বলিতেন। পাঠক যেন ভুল না বোঝেন। মা নিজ হাতে আমাকে একটি পানতুয়া প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইয়া জ্ঞান মহারাজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি ৯টার সময় খাইবার ডাক আসিল। আরও দুই জন ভক্ত সহ খাইতে বসিলাম। আমাদের খাওয়া শেষ হইলে অপর দুই জন ভক্ত শালপাতা তুলিতে গেলে মা বলিলেন, 'পাতা নিতে হবে না, লোক আছে।' আমি পাতা তুলিলে অপর ভক্তগণ বলিলেন, 'মা নিষেধ করছেন, তুমি কেন পাতা তুলছ?' আমি তাঁদের বলিলাম, 'আমরা তো মায়ের সব কথাই শুনছি, কেবল এই কথাটাই অমান্য ক'রব?' এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ একটুখানি ছেলের বুদ্ধি, বাঙাল কিনা।' অপর ভক্তগণ মায়ের এই কথায় লজ্জিত হইলেন। আমি পাতা তুলিলে মা আমাকে আর বারণ করিলেন না।

এবার মা প্রসাদ পাইবেন। রাঁধুনীকে বলিলেন, 'খেতে এস মা।' রাঁধুনী অভিমান করিয়াছে, খাইবে না। মা বলিলেন, 'কেন তুমি

খাবে না? এই বয়স! আমার ভক্তের সংসার, তুমি না খেলে কি আমি খেতে পারি? এস মা, লক্ষ্মী মেয়ে। শীগ্‌গির খেতে বোসো, আমার উপর অভিমান করোনা মা।'

রাত্রিতে পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের ঘরেই শুইলাম। তাঁহাকে আমার দীক্ষার কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কাল সকালে মাকে এই বিষয় ব'লব। তুমি ব্যস্ত হয়োনা।' আশায় আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে পূঃ জ্ঞান মহারাজ কার্য উপলক্ষে বাহিরে গেলেন। বেলা ৯টা বাজে, আমি বিশেষ ভাবিত হইলাম। কারণ ঐ দিনই আমায় এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তখনকার দিনে পুলিসের বড় জ্বালাতন ছিল; কে মায়ের বাড়ীতে এল গেল, সব সংবাদ নিত; এক রাত্রির বেশী থাকিতে দিত না। সেটা ছিল স্বদেশী যুগ। শ্রীশ্রীমাও সকালে পূজার সময় ভিন্ন দীক্ষা প্রায়ই দিতেন না। বিষণ্নমনে পূঃ জ্ঞান মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় রাধুদিদির স্বামী মন্মথবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি গাইতে পার?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, গান তো সকলেই গাইতে পারে, প্রশ্ন হচ্ছে ভাল মন্দের।' মন্মথ বাবু বলিলেন, 'একটা গাওনা।' আমি বলিলাম, 'না, মশায়, আমার মনটা এখন ভাল নয়।' তিনি বলিলেন, 'কেন?' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে কথা ছিল, আজ প্রাতে তিনি আমার দীক্ষার কথা শ্রীশ্রীমাকে বলবেন। দেখুন বেলা ৯টা বেজে গেছে। এখন পর্যন্ত তিনি ফিরলেন না।' মন্মথ বাবু বলিলেন, 'চল, আমি তোমার দীক্ষার কথা মাকে ব'লছি।' আমি যেন অকূলে কূল পাইলাম। আমাকে লইয়া মন্মথবাবু মাতাঠাকুরাণীর নিকট গেলেন। মা তখন উঠানে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। মন্মথবাবু বলিলেন, 'মা, এই ছেলেটি দীক্ষার জন্য আপনার কাছে এসেছে।' শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি শরতের চিঠি এনেছ?' তখনকার দিনে শরৎ মহারাজের সুপারিশ ব্যতীত অপরিচিত লোকদের মা প্রায়ই দীক্ষা দিতেন না, কারণ পুলিসের হাঙ্গামা ছিল। আমি 'না' বলায় শ্রীশ্রীমা আবার প্রশ্ন করিলেন, 'মঠে কোন সাধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মা! পূজনীয় রাখাল মহারাজের সঙ্গে পরিচয় আছে।' শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'রাখালের সাথে! বেশ, তুমি স্নান ক'রে এসে অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।'

আমি তো আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্নান করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। মন্মথবাবুর জন্যই আমার দীক্ষা হইল। তিনি কিন্তু আমাকে আর গান গাহিতে বলিলেন না। আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন—১৩২৩ সালের ২৯শে ফাল্গুন, সংক্রান্তি। বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের ডাক আসিলে আমি মায়ের ঘরে যাইয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কে আছে?' আমি যথাযথ উত্তর দিলে তিনি হঠাৎ গম্ভীর অথচ করুণাময়ী মূর্তিতে আমাকে গায়ত্রী জপ করিতে বলিলেন। গায়ত্রী জপ করা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?' আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে মা বলিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর—ঠাকুর, তুমি আমার ইহকালের ও পরকালের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।' আমি তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। এবার তিনি আমাকে একটি মন্ত্র বলিয়া ১২ বার জপ করিতে বলিলেন। আমি উহা করিলে তিনি আর একটি মহামন্ত্র আমার কানে বলিলেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে জপপ্রণালী দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ১০৮ বার জপ করবে।' আরও বলিলেন, 'যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু।'

আমি একখানা সরু লালপেড়ে কাপড় ও কিছু ফল মিষ্টি দিলাম, গুরুদক্ষিণা বাবদ। তিনি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। বলিলেন, 'তোমার আবার আমাকে কাপড় দেবার কি দরকার ছিল?' আমি আনন্দের সহিত তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। মা বলিলেন, 'দেখ বাবা, আমার শরীর ভাল নেই, গতকাল মাত্র ভাত খেয়েছি।' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ মা, সব শুনেছি, আমার উপর আপনার অহেতুকী কৃপা।'

দীক্ষা হইয়া গেল। তিনি আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী হালুয়া ও মুড়ি খাইতে দিলেন। আমি প্রসাদ পাইয়া বাহির-বাড়ীতে যাইয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, মা কি করিয়া জানিলেন আমার ব্রাহ্মণ-শরীরের কথা, আমার পৈতা তো ঢাকা ছিল, গায়ত্রী জপ করিতে বলিলেন। প্রথম মন্ত্রটি যাহা আমি পূর্বেই স্বপ্নে পাইয়াছিলাম, তাহাই বা কি করিয়া জানিলেন? তাঁহার অন্তর্যামিত্ব অনুভব করিয়া অবাক্ হইলাম। দীক্ষার পর মনে বড়ই আনন্দ হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—জন্ম সার্থক।

দ্বিপ্রহরে ভাত খাইবার ডাক আসিল, আমি মাকে বলিলাম, 'আপনার প্রসাদ পাব।' মা বলিলেন, 'তা প্রসাদ পরে পাবে, এখন খেতে বসে যাও।' তিনি আমাদের খাওয়া দেখিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, 'পেট ভরে খাও বাবা।' আমরা খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে মায়ের ডাক আসিল, আমরা ভিতরে গেলাম। মা আমাদের হাতে তাঁহার প্রসাদী অন্ন দিলেন, আমরা তাঁহার প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলাম। বেলা ২টার সময় মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম, কারণ ঐ দিনই আমাকে কামারপুকুর যাইতে হইবে। মা বলিলেন, 'ওখানে শিবু আছে, রঘুবীরকে কিছু ভোগ দিও, রাত্রিতে গুরুগৃহে বাস ক'রে সকালে কলকাতায় রওনা হবে, খুব সাবধানে যাবে, তুমি ছেলেমানুষ। মঠে গিয়ে বাবুরামকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দেবে।' এবার আমি তাঁহার পাদোদক ও মিছরি-প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়াতে যেন মুগ্ধ না হই, আর তোমার পাদপদ্মে যেন ভক্তি থাকে।' তিনি এই প্রার্থনা বুঝিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। পূজনীয় মাস্টার মহাশয় বলিতেন, 'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।'

এবার কামারপুকুর রওনা হইলাম। বেলা ৫টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি পুণ্যতীর্থে পৌঁছিলাম। সেখানে পূজনীয় শিবুদাদাকে পাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দয়া করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাকে সমস্ত দেখাইলেন। গুরুগৃহে রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন সকালে আনন্দিত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পদব্রজে আরামবাগ হইয়া রাত্রি ৬টার সময় চাঁপাডাঙ্গা পৌঁছিলাম। পথে ভীষণ রৌদ্রে কষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যখনই মায়ের অহেতুকী কৃপার কথা স্মরণ হইয়াছে, তখনই এই কষ্ট আর কষ্ট বলিয়া মনে হয় নাই। ঐ দিন রাত্রে কলিকাতা যাইবার ট্রেন না থাকায় স্টেশনেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন সকাল ৭টায় ট্রেনে উঠিয়া বেলা ১১টার সময়

হাওড়া-ময়দানে পৌঁছিলাম। কয়েক দিন পরে মঠে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহাশীর্বাদের কথা তাঁহাকে বলিলাম। মা অসুস্থ অবস্থাতেও কিভাবে আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। তিনি মায়ের অহেতুকী কৃপার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'কি আর ব'লব, কৃপা, কৃপা, কৃপা!' এই বলিয়া তিনি হাতে জপ করিতে লাগিলেন, কিছু পরে আবার বলিলেন, 'মায়ের কৃপার কথা যেন তোর মনে থাকে, বেইমান হ'সনি। মা যে কি বস্তু—পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারও বোঝবার শক্তি নেই। তিনিই কালে তোদের কৃপা ক'রে বোঝাবেন। এখন কেবল তাঁর কথা স্মরণ ক'রে যা, আহা লোক-কল্যাণের জন্য তিনি কি না করছেন! দেহের একটু বিশ্রাম পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছেন।' শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি একেবারে যেন মাতিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন মায়ের মাহাত্ম্য তিনি বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে মায়ের মাহাত্ম্য শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল শ্রীশ্রীমাই যেন তাঁহার মাহাত্ম্য শুনাইবার জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের নিকট আমাকে পাঠাইয়া-দিয়াছেন।

পাঠককে আর একটি গল্প, যাহা পূজনীয় কেশব মহারাজের নিকট কোয়ালপাড়া আশ্রমে শুনিয়াছিলাম, তাহা উপহার দিতেছি। আমি পূজনীয় কেশব মহারাজকে বলিলাম, 'মায়ের কথা আমাদের কিছু বলুন।' তিনি বলিলেন, 'মায়ের কথা তোমাকে কি আর বলব! তিনি যে কে, তা আমরা এখনও কিছু বুঝতে পারিনি। তপস্যা না থাকলে মাকে বোঝা বড় শক্ত। যদিও আমরা তাঁর এত কাছে আছি, তাঁকে বুঝতে পারলাম কই? একটি ঘটনা তোমাকে বলছি, শোন:

একদিন আমি মাকে বললাম—'মা! আপনার শরীর সুস্থ নয়, প্রায়ই ভুগছেন, আপনাকে যে রান্না ক'রে দেয়, তার সম্বন্ধে আপনি তো সবই জানেন, আপনি যদি দয়া ক'রে বলেন তবে অন্য একজন লোক দেখি।' মা তো আমার এই কথা শুনেই ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, বললেন,—'তোমরা ছাড়লে ছাড়তে পার, আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায়?' আমি তো এই কথা শুনেই মায়ের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম, 'মা আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি কৃপা ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।' এবার বোঝ শ্রীশ্রীমা কে? কে এই অভয়বাণী দিতে পারে—'আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায়?' আমরা যেমনই হই না কেন, মায়ের নিকট আমরা তাঁর ছেলে ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি নিজেই বলেছেন,—'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তাদের ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে। আমি যে তাদের সত্যিকারের মা, পাতানো মা নয়।'

ধন্য মা, ধন্য মা, ধন্য তোমার অহেতুকী কৃপা! কলিকালে তোমার মতো মা-ই জীবের একমাত্র আশ্রয়-স্থল। সাধে কি পূজনীয় নাগমহাশয় বলতেন, 'বাবার চেয়ে মা দয়াল।'

মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে একটু অবসর পেয়ে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম বেলা প্রায় ১১টায়। মন্দিরে সাধারণ যেরূপ ভিড় হয়, সে তুলনায় নির্জন বোধ হ'ল। অঙ্গনের একদিকে দ্বাদশ শিবের মন্দির; অন্যদিকে বাম পার্শ্বে প্রথমে বিষ্ণু-মন্দির, পরে মা ভবতারিণীর মন্দির। আজ ১০৭ বৎসর পরে সেই সব আছে, নেই কেবল সেই মহামানব—দেশবাসী যাঁকে দেবতারূপে আরাধনা করে। কোথায় সেই কোমলাঙ্গ আচার্যদেব, জাতির মহাসঙ্কটে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন? যাঁর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি উপদেশ ভবিষ্যতের আশার বাণী শুনিয়েছিল, যাঁর পরিকরগণ জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ মানুষ হ'য়ে জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করতে শিখিয়েছিলেন, ভারতীয় কৃষ্টিকে উজ্জীবিত ক'রে পরের জন্য জীবন-ধারণের ব্রতকে রূপ দিয়েছিলেন।

এই তো সেই মন্দির। মন্দির মধ্যে মাতা ভবতারিণী সেই বরাভয়দাত্রী মূর্তিতে বিরাজমানা। আজ কি আর মা জেগে নেই? আজ এই মন্দির ও মূর্তি কি অতীতের কেবলমাত্র স্মৃতিটুকু নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কি ক'রে তা বলি। কত ভক্ত নরনারীকে আকুল হ'য়ে মার নিকট প্রণতি জানাতে দেখলাম। ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব দেখলাম না, তবে কি বিশ্বাসের অভাব? সে কথাও কি জোর ক'রে বলা যায়! ঐ তো ভদ্রলোক, শুনলাম বহু কষ্টে দূর থেকে এসেছেন। না, না—কিছুর জন্য প্রার্থী হ'য়ে নয়, উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একবার দেখা এবং দেখে সার্থক হওয়া।

মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি নিছক অর্থের অপচয়, না সময়ের অপব্যয়? এ কি অবসর কালে চিত্ত-বিনোদন অথবা কোলাহল থেকে দূরে এসে নির্জনতা-উপভোগ? কি জন্য অনেকে এখানে আসে? ফেরবার সময় চিত্তে কেন একটা তৃপ্তির উদয় হয়; কেন মনে হয়—সময়টি বেশ কাটল, আবার শীঘ্র আসতে হবে; আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আরও আনন্দ হ'ত। এ কি শুধু এই সুন্দর মন্দিরের পরিবেশ?—ভাগীরথীর মনোরম সান্নিধ্য? মনে হয়—তা বোধ হয় নয় শুধু। এখানে রয়েছে যেন চিত্তের বিশ্রাম। জগতে ধন, মান, ঐশ্বর্য ও অপরাপর অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু এরূপ বিশ্রামের স্থান তো কোথাও নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কত সময় বলেছেন, সংসারে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করা একরূপ অসম্ভব। কত উদাহরণ দিয়েছেন: আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়—কত লোক সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও বহু কষ্টে তাদের জীবন যাপন করতে হচ্ছে। নিরলস কর্ম ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু জাগতিক সুখ ও শান্তি হ'তে তারা বঞ্চিত। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—জগতে আমরা যাকে সুখ ও দুঃখ ব'লে জানি, সুখ ও দুঃখের সংজ্ঞা বোধ হয় তা নয়। অর্থে ও বৈভবে যে সুখ, সে সুখে মন তৃপ্ত হয় না। অতুল বৈভব ও ঐশ্বর্য পেয়েও আরও বেশীর আকাঙ্ক্ষায় অনেকে অসুখী। জাগতিক সুখের সব কিছু পেয়েও অনেকে অসুখী। কেউ বা সব কিছু ত্যাগ ক'রে প্রকৃত সুখ ও শান্তির জন্য শাকান্ন খেয়েও জীবন কাটাতে রাজী। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী

হয়েও বহু লোক দেখা যায় ভোগে বঞ্চিত। হয় কৃপণ, নয় চিররুগ্ন। বহুবার বহুলোকের জীবনে প্রমাণিত হ'য়েছে যে প্রকৃত সুখ ও শান্তি শুধু ঐশ্বর্য ও বৈভবের দ্বারা পাওয়া যায় না। কোন কিছু পাবার বা করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েও আমরা তা পেতে বা সম্পন্ন করতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি সব সময় আমাদের চালিত করছে। তা হ'লে দেখা যায় একমাত্র পথ সেই অদৃশ্য শক্তির শরণাগত হওয়া।

আমাদের স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই। নেই শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিশ্বাস। তাই কি আমরা এত অসুখী ও বিব্রত? মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা—তাও তো আমাদের স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। তা হ'লে আমরা কি ক'রব? আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত কি ঐহিক শিক্ষায় আমাদের জীবনে নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা আসবে? মনুষ্য-শরীরকে দেবমন্দির না ভাবলে বোধ হয় আমরা মানুষের মর্যাদা রক্ষা করতে পারব না।

* * *

বিষ্ণুমন্দিরের চত্বরের উপর চোখ পড়ল। ঐ সোপানশ্রেণীর চত্বরেই তো ঠাকুর মাঝে মাঝে বসতেন। মনে হ'ল কে যেন বলছেন: ভয় নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। জগৎটা শিক্ষাকেন্দ্র—এখানে শুধু দেখতে ও শিখতে আসা। মন্দ দেখলে মন্দই দেখতে পাবে এবং ভাল দেখলে আরও ভাল তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে।

মানুষের অবচেতন মন কি চায়? সেই মন চায় সকলে সুখী হ'ক। আমি যেন সকলের ভাল করি, সকলে ভাল থাকলেই আমি সুখে থাকব। হিংসা, অহেতুক জিদ ও অকারণ ক্ষোভ আমাদের মনের স্বাভাবিক হিতবুদ্ধি আবৃত ক'রে রাখে। যা করা উচিত, তা না করতে পেরে আমরা উত্তেজিত হই, সাধারণ মানুষের স্বভাব হ'তে বিচ্যুত হই। সেই বিচ্যুতির জন্যই অসুখী হই, নিজের উপর ক্রোধান্বিত হই, এবং সব কিছু বিস্মরণ হওয়ার জন্য নানা ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে জীবন যাপন করি। শরীর যদি দেবতার মন্দির জ্ঞান করি, তবে সেই শরীর অশুচি হ'লে আমাদের দুঃখ পাওয়া স্বাভাবিক।

আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়ল। তিনি বলতেন, 'দু-পাতা পড়েই লেকচার, কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নেই, ভজন নেই, বিবেক-বৈরাগ্য নেই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।'

দ্বাদশ শিবের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গেলাম। সেই বড় ঘরটির এক পাশে ছোট খাট। পুরানো দিনের ছবি চারি-দিকে টাঙানো রয়েছে। কতকগুলি পুরানো ছবি উদ্দীপনা জাগাল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ছবিগুলির সামনে হাততালি দিতে দিতে নাম করতেন; বলতেন, 'হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ।' আবার বলতেন, 'প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।'

কত মহামানব এখানে পদার্পণ করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত পান করেছেন। মনে হ'ল—ঠাকুর যেন ছোট খাটটির উপর বসে আছেন; ভক্তবৃন্দ একমনে একপ্রাণে ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। নরেন্দ্র বোধ হয় সুমধুর স্বরে গান গাইছেন। মাষ্টার মহাশয় একনিষ্ঠভাবে 'কথামৃত' সংগ্রহে ব্যস্ত। আহা, যাঁরা সে সময় বর্তমান ছিলেন, তাঁরা কত ভাগ্যবান্! আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। ধর্মকথা ভিন্ন আর কোন কথা নেই। কত

সরস উদাহরণ, কত সহজ ব্যাখ্যা—কত হৃদয়-গ্রাহী উপদেশ। উঠে যেতে ইচ্ছা হয় না। মনের মধ্যে সেই সব দিনের কথা ও গুঞ্জন শুনতে পেলাম। অবিরাম গতিশীল জগতে এইরূপ স্থান ভিন্ন চিত্তবিশ্রামের উপযুক্ত পরিবেশ আর কোথায়?

দুটি ভদ্রলোক ঘরে বসে আলোচনা করছেন। আধুনিক সমাজে ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব,—সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়ল। মাষ্টার মহাশয়ের অমর কীর্তি 'কথামৃত' খুলে পড়তে লাগলাম; ১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ কথা:

ঘরের পূর্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র—আজকাল ছোকরারা কি রকম দেখছেন?

মাষ্টার—মন্দ নয়। তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না।

নরেন্দ্র—আমি নিজে যা দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো—এ সব সর্বদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও যায়।

মাষ্টার—যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র—আপনি বোধ হয় তত মিশতেন না। এখন দেখেছি যে খারাপ লোকে নাম ধরে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে?

মাষ্টার—কি আশ্চর্য!

নরেন্দ্র—আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হ'য়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন তো ভাল হয়।

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 'কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

নরেন্দ্র বলিলেন, 'এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।' ঠাকুর একটু ঐ সকল কথা শুনিয়া মাষ্টারকে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, 'এ সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়; বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ-সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।' (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯।২০, মাষ্টারের ২৭।২৮)

* * *

ঘর থেকে বেরিয়ে গোল বারান্দায় গেলাম। গঙ্গা বোধ হয় একই ভাবে বয়ে যাচ্ছে। ভক্তেরা এখান থেকে গঙ্গাকে প্রণাম জানাতেন; ঠাকুরও প্রণাম করতেন। মা-গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে নহবত ঘরে গেলাম। আজ আর সেই দরমার বেড়া নেই। মা ঠাকরুন দরমার বেড়ায় ফুটো ক'রে ঠাকুর ও ভক্তদের দেখতেন। ঠাকুরের সেই সরস সাবধান-বাণী মনে পড়ল। তিনি রামলালকে বলছেন, 'কি রে, তোর খুড়ির দরমার ফুটো যে বেড়েই যাচ্ছে।'

মা ঠাকরুন আমাদের কত কষ্ট করেছেন! ঐটুকু নহবত ঘরে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের মধ্যে ও ভক্তমেয়েদের সঙ্গে কত কষ্টে দিন যাপন করতেন! কত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম! লোক-শিক্ষার জন্য জগদ্ধাত্রী মা আমাদের কত কষ্ট সহ্য করেছেন। মায়ের একটি ছবি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আলেখ্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চক্ষু জলপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

ভগবানও তেমনি মানুষী লীলায় রাম সেজে এসেছিলেন। (রামচরিত-মানস : উত্তরকাণ্ড)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার-স্বরূপের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হ'ল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোন এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মতো হ'ল।' (আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী)

'জানকীমঙ্গল' বা 'পার্বতীমঙ্গল' কোনটিই বাংলা সাহিত্যের অর্থে মঙ্গলকাব্য নয়। তবে মঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্মরণমনন যদি মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 'জানকীমঙ্গল'ও মঙ্গলকাব্য। রামসীতার বিবাহ-মঙ্গলই 'জানকীমঙ্গল' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু; কিন্তু বিষয়বস্তু 'জানকীমঙ্গলে'র অবলম্বনমাত্র। এই সমগ্র কাব্যটির ব্যঞ্জনা রয়েছে ভক্তহৃদয়ের তন্ময় অনুধ্যানে। তাই রাম, সীতা, জনক, বিশ্বামিত্র, প্রতিবেশী পুরজন, মিথিলা-নগরীর আনন্দোৎসব সব কিছুর মধ্য দিয়ে এক পবিত্র শান্তরসের বিমল আনন্দানুভূতি পাঠক ও শ্রোতার প্রাণে সঞ্চারিত হয়। কাব্যের সূচনাতেই কবি বলেছেন : সিয় রঘুবীর বিবাহু যথামতি গাবৌ ॥

সুভ দিন রচ্যৌ স্বয়ংবর মঙ্গলদায়ক।
সুনত শ্রবণ হিয় বসহিঁ সীয় রঘুনায়ক ॥
(জানকীমঙ্গল)

অদ্বিতীয় জ্ঞানী রাজা জনকের সুখসাগর জনকপুরীতে জাত হয়েছেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স হ'লে হরধনুর্যোজনার শর্ত ক'রে জনক কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করলেন। আয়োজিত স্বয়ংবর-সভায় যোগদান করতে যাত্রা করলেন নানা দেশের রাজন্যবৃন্দ। ঠিক ঐ সময়ে বিশ্বামিত্র এসেছিলেন অযোধ্যায় রাজা দশরথের কাছে। মুনির আগমন-সংবাদ পেয়ে রাজার সঙ্গে সপুত্রক রাণীরাও মুনিকে প্রণাম করতে এলেন। রামচন্দ্রকে দেখে বিশ্বামিত্রের মনোভাব :

রামহিঁ ভাইন্‌হ সহিত জবহিঁ মুনি জোহেউ।
নৈন নীর, তন পুলক, রূপ মন মোহেউ ॥
পরসি কমলকর সীস হরসি হিয় লাবহিঁ।
প্রেমপয়োধি-মগন মুনি পার ন পাবহিঁ ॥
(জানকীমঙ্গল)

—ভাইদের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনে বিশ্বামিত্রের নয়নে প্রেমাশ্রু ও দেহে পুলক সঞ্চারিত হ'ল। ঋষি তাঁর কমলপাণি দিয়ে রামচন্দ্রের শিরস্পর্শ করলেন, হৃদয়ে তাঁকে অনুভব ক'রে অন্তহীন প্রেমসমুদ্রে মগ্ন হলেন।

দশরথের কাছ থেকে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেয়ে নিলেন যজ্ঞনষ্টকারী রাক্ষসদের নিধনের জন্য। তাড়কা-বধ, অহল্যা-উদ্ধার প্রভৃতি কাজ শেষ ক'রে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র এলেন জনকের স্বয়ংবর-সভায়। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রের চরণ বন্দনা করতে এসে রামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন : অবলোকি রামহি অনুভব মনু ব্রহ্মসুখ সৌগুণ দিয়ে ॥ (জানকীমঙ্গল) —রামচন্দ্রের দর্শনে জনকের হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দের শতগুণ আনন্দ অনুভূত হ'ল।

দেখি মনোহর মূরতি মন অনুরাগেউ।
বন্ধেউ সনেহ বিদেহ, বিরাগ বিরাগেউ ॥
(জানকীমঙ্গল)

—রামচন্দ্রের মনোহর মূর্তি দেখে জনক মুগ্ধ হলেন, বাঁধা পড়লেন স্নেহবন্ধনে, তাঁর অন্তরের বৈরাগ্য পরিণত হ'ল রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগে। বিশ্বামিত্রের কাছে তিনি জানতে চাইলেন রামচন্দ্রের পরিচয়। ঋষি বললেন :

যে পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মময় বালক। (জানকীমঙ্গল)

তাই বুঝি ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষির বিষয়বিমুখ মন এই দেহধারী ব্রহ্মসত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য জ্ঞানী ভক্ত-ভক্তি নিয়ে থাকে। ......নিত্যে পৌছে আবার লীলায় থাকা। যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা।' 'ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বার-বাড়ী পর্যন্ত যায়।'

রাজর্ষি জনকের হৃদয়াকাশে তুলসীদাস জ্ঞান-সূর্য ও ভক্তিচন্দ্রের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রামচন্দ্র 'ব্রহ্মময় বালক'—অবতারপুরুষ। তাই ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি রামচন্দ্র-দর্শনেই ভক্তিপ্লুতহৃদয়।

স্বয়ংবর-সভায় সমবেত রাজন্যবর্গের দৃষ্টি পড়ল রামচন্দ্রের উপর। রূপে, গুণে, ব্যক্তিত্ব-মহিমায় রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় আর কেউ সেখানে ছিলেন না। জনক ও জনকগৃহিণী রামচন্দ্রকেই জামাতারূপে লাভ করতে চেয়ে হরধনুযোজনার প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে মনে মনে শঙ্কিত হলেন। ওদিকে মাল্যাভরণধারিণী সীতাও শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে মনে বরণ করলেন। রামচন্দ্র সেই বরণীয় প্রেম অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন:

প্রেম পরখি রঘুবীর সরাসন ভংগেউ।
জনু মৃগরাজ-কিসোর মহাগজ গঞ্জেউ॥

—কিশোর সিংহ যেমন ক'রে মহাগজকে হত্যা করে, সীতার প্রেম অনুভব ক'রে রঘুবীর তেমনি ক'রে হরধনু ভঙ্গ করলেন। এর পর জনকের পক্ষ থেকে শতানন্দ গেলেন অযোধ্যায় দশরথ প্রভৃতিকে নিয়ে আসবার জন্যে। দশরথাদির আগমনের পর সমগ্র মিথিলাবাসীর উদ্বেগ প্রশমিত ক'রে জানকী-রামচন্দ্রের বিবাহের আয়োজন হ'ল। বরবেশে সজ্জিত শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব শোভন মূর্তি:

ব্যাহ-বিভূষণ-ভূষিত ভূষণ-ভূষণ।
বিশ্ববিলোচন বনজবিকাসক পূষণ॥ (জানকীমঙ্গল)

—সব অলঙ্কারের যিনি অলঙ্কারস্বরূপ সেই রামচন্দ্র ভূষিত হয়েছেন বিবাহ-সজ্জায়। তিনি সারা বিশ্বের কমলনেত্র-উন্মীলনকারী সূর্যস্বরূপ।

কিন্তু সীতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তুলসীদাস স্তব্ধ হ'য়ে গেছেন। সেই দিব্য পবিত্রতার চলমান বিগ্রহটি ভাষায় বর্ণনা করতে তাঁর দ্বিধা হ'য়ে থাকবে:

জুবতি-জুথ মহঁ সীয় সুভাই বিরাজই।
উপমা কহত লজাই ভারতী ভাজই॥

—সখীদের সঙ্গে সীতা এলেন বিবাহমণ্ডপে, শুদ্ধস্বভাবই তাঁর সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যের উপমা দিতে না পেরে সরস্বতীও নিবৃত্ত হয়েছেন। তখন জনক:

সংকল্পি সিয় রামহি সমর্পী সীল সুখ সোভামঈ।
জিমি সংকরহি গিরিরাজ গিরিজা,
হরিহি শ্রী সাগর দঈ॥ (জানকীমঙ্গল)

—সঙ্কল্প ক'রে শোভা- ও শীলমণ্ডিতা সীতাকে সমর্পণ করলেন রামচন্দ্রের হাতে—যেমন ক'রে হিমালয় পার্বতীকে সমর্পণ করেছিলেন শঙ্করের হাতে, সাগর লক্ষ্মীকে সমর্পণ করেছিলেন নারায়ণের কর-কমলে।

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অন্য তিন ভাইয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল। মিথিলায় কিছুদিন ধ'রে আনন্দোৎসব চলল। তারপর এক সময় দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে ফিরে চললেন। রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কালে জনকের নিবেদন লক্ষণীয়:

তাত তজিয়ঁ জনি থোহ ময়া রাখবি মন।

—বাবা রাম! আমার প্রতি তোমার প্রীতি যেন থাকে। আমার উপর অনুগ্রহ রেখো।

জনকের মধ্যে ছুটি সত্তা এখানে দেখতে পাই—একটিতে তিনি রামচন্দ্রের গুরুজন, অন্যটিতে তিনি রামচন্দ্রের ভক্ত।

'রামচরিতমানসে' জনক তো পূর্ণ ভক্ত। সেখানে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে জনক বলছেন:

বারবার মাগউঁ কর জোরে।
মন্থ পরিহরই চরণ জনি ভোরে॥
সুনি বরবচন প্রেম জনু পোষে।
পূরণকামু রামু পরিতোষে॥ (বালকাণ্ড)

—হে নাথ, করজোড়ে বারবার এই ভিক্ষা চাই, ভুল করেও যেন আমার মন তোমার চরণ ত্যাগ না করে, প্রেমের অশ্রুতে ভরা একথা শুনে পূর্ণকাম রামচন্দ্র পরিতুষ্টি লাভ করলেন।

অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর রাজপ্রাসাদে ও নগরে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে জানকীমঙ্গলের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পরিশেষে তুলসীদাস মনে করিয়ে দিয়েছেন:

উপবীত ব্যাহ উছাহ জে সিয় রাম মঙ্গল গাবহীঁ।
তুলসী সকল কল্যাণ তে নরনারী অনুদিন গাবহীঁ।

—উপনয়ন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সীতারাম-মঙ্গল গাইলে সব নরনারীর কল্যাণ হবে। অর্থাৎ এই পুণ্য বিবাহকাহিনীর স্মরণ-মননের মধ্য দিয়ে বিবাহের মঙ্গলময় সত্যটি বরবধূর অন্তরে উদ্ভাসিত হবে।

বস্তুতঃ রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শের যে উত্তুঙ্গ বিকাশ ঘটেছে, সেই হিমালয়-সদৃশ মহাকাব্যের জগতে 'রামচরিতমানস' মানসসরোবরেরই মতো বিশাল, আর 'জানকীমঙ্গল' যেন একটি ছোট্ট নির্ঝরিণী। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে রামায়ণ-কাহিনী কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তার নিশ্চিত নিদর্শন।*

* কলিকাতা আকাশবাণীর সৌজন্যে।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দয়াল, বিশ্বাস দাও, অনন্ত বিশ্বাস!
বিচারবুদ্ধিতে, প্রভু, বজ্রাঘাত করো।
অন্ধকূপে বন্ধ হ'য়ে আসিছে নিঃশ্বাস,
উন্মুক্ত আকাশতলে তুলে মোরে ধরো!
বজ্রাহত তরু আমি! বিলুপ্ত উৎসাহ!
সত্যভ্রষ্ট, জড়তায় আছি মৃতপ্রায়!
করুণ নয়নে, দেব, মোর পানে চাহো,
আলস্য নিশ্চিহ্ন করো প্রাণের বন্যায়।

উচ্চারিলে কুরুক্ষেত্রে, 'করিও না ভয়।
অন্তরে বাহিরে ঊর্ধ্বে রয়েছি জাগিয়া
পরম দেবতা আমি—তোমার আশ্রয়!
উদ্ধারিব, এসো সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া।'
সর্বাঙ্গে কর্দম বহি এসেছি দুয়ারে;
চরণ-ধূলিতে করো নির্মল আমারে!

চার্বাক দর্শন ও জন্মান্তর নিরাস

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

মানুষের জ্ঞানপিপাসা চিরকালই বর্তমান। মানুষ ইতর জীবের ন্যায় আহার-নিদ্রাদিতেই পরিতৃপ্ত হয় না। মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়া সে তাহার প্রয়োজনীয় বিষয়ের তত্ত্ব-নির্ধারণ করিতে চায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপের পর্যালোচনায়ও সন্তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর স্বরূপ-নিশ্চয়ে বদ্ধপরিকর হয়। এই চেষ্টার ফলে নানা প্রকার দর্শনের উদ্ভব। পাশ্চাত্য দেশে যেমন নানা দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতেও বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা প্রকার দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনের বিষয় চিন্তা করিলে আপাততঃ মনে হয়—মানুষের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে দর্শনগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে; কিন্তু শ্রুতি, পুরাণ, মহাভারত, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে বুঝা যায়, প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত দর্শনের যুক্তি ও চিন্তাধারা কোথাও পূর্বপক্ষরূপে কোথাও বা সিদ্ধান্ত-রূপে বর্তমান। যদিও ভারতীয় দর্শনের ক্রম নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তথাপি সর্বত্র চার্বাক দর্শন খণ্ডিত হওয়ায় এবং শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ কর্তৃক অদ্বৈত বেদান্ত আদৃত ও গৃহীত হওয়ায় মনে হয়—চার্বাকদর্শন সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে ও অদ্বৈতবেদান্ত সর্বোচ্চস্তরে। এই ভাবে সাজাইয়া নিম্নে একটি ক্রম দেওয়া হইল: (১) চার্বাক (২) জৈন (৩) বৌদ্ধ (৪) শৈব (৫) বৈষ্ণব (৬) বৈশেষিক (৭) নৈয়ায়িক (৮) বৈয়াকরণ (৯) মীমাংসা (১০) শক্তি (১১) সাংখ্য (১২) যোগ (১৩) বেদান্ত (অদ্বৈত)।[১] অবশ্য এই সকল দর্শনের ক্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে চার্বাক দর্শন সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

কেহ কেহ বলেন—চার্বাক একজন ব্যক্তির নাম। কাহারও মতে—চারু (মনোহর) বাক (বাক্য) যাহার, তিনি চার্বাক। আবার কেহ কেহ বলেন, চারুর (বৃহস্পতির) বাক্যই চার্বাক। অনেকের মতে বৃহস্পতি চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক।[২] কেহ বলেন বৃহস্পতি এই দর্শন সৃষ্টি করিয়া প্রথমে চার্বাক নামক এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন। চার্বাক শিষ্যপ্রশিষ্য-ক্রমে উহা প্রচার করে।[২]

অবশ্য এই বৃহস্পতি কোন লোকবিশেষের নাম নয়, উহা একটি উপাধিবিশেষ। এই বৃহস্পতি দেবগুরু, অথবা কোন শাস্ত্রজ্ঞ, মহা-বুদ্ধিমান্ বাগ্মী মনুষ্য, কি অন্য কেহ—তদ্বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই চার্বাকদর্শনই লোকায়ত, পাষণ্ড, হেতুবাদী, ভূতচৈতন্যবাদী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।[৩]

ইঁহারা বলেন প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।[৪] পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি প্রমেয় (তত্ত্ব বা পদার্থ)।[৫] কাম ও কাঞ্চনই পরম

১ মধ্যবর্তী ক্রমগুলি পরিবর্তন-সহিষ্ণু।

২ 'ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতম্।' বিজ্ঞান ভিক্ষু ইদ্ধৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যভূমিকা।

৩, ৪ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রিকৃত।

৫ প্রমাণমেকং প্রত্যক্ষং তত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ম্। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি-উদ্ধৃত শ্লোক।

পুরুষার্থ।[৬] চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা।[৭] কাম-কাঞ্চন-জনিত সুখই স্বর্গ।[৮] কণ্টকাদি-জনিত দুঃখই নরক।[৯] মৃত্যুই মুক্তি।[১০] ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, ধর্ম, অধর্ম, কর্মফল প্রভৃতি অলীক পদার্থ।[১১]

জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে যখন সূর্যকিরণ পড়ে, তখন লক্ষ্য করিলে সেই সূর্য-কিরণের মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় পদার্থ দেখা যায়—তাহাই ত্রসরেণু; তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অদৃশ্য কোন পদার্থ নাই; যেহেতু প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। এই রূপ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় চতুর্বিধ ত্রসরেণু হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল পৃথিবী, জল তেজ ও বায়ু সৃষ্টি হয়। স্বভাববশতই ঐ ত্রসরেণুগুলি সংযুক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। অচেতনের প্রবর্তক ঈশ্বর প্রভৃতি কোন কর্তা নাই। এই চতুর্বিধ ভূতই সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া চেতন ও অচেতন জগৎ উৎপন্ন করে।[১২]

উপাদান-দ্রব্যে মাদকতা শক্তি না থাকি-লেও দ্রব্যগুলি সম্মিলিত হইলে তাহা হইতেই মদ উৎপন্ন হয়। ঘটাবয়ব মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা জলাহরণ-ক্রিয়া সম্ভব না হইলেও ঘটরূপে সংঘাতপ্রাপ্ত মৃত্তিকা দ্বারা জলাহরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে চৈতন্য অনুভূত না হইলেও ঐ সকল ভূত যখন দেহাকারে সংহত হয়, তখন উহা হইতেই চৈতন্য (দেহে) উৎপন্ন হয়।[১৩] সুতরাং দেহই আত্মা, চৈতন্য দেহের ধর্ম। দেহাতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ ইত্যাদি অনুভবে আমি পদ ও স্থূলাদি পদের সামানাধিকরণ্য বশতঃ স্থূল দেহই আত্মা।[১৪]

প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অসিদ্ধ বলিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ না হওয়ায় এই স্থূল শরীরই আত্মা। এই কারণে জন্মান্তরও অসিদ্ধ।[১৫]

কিন্তু যেমন প্রত্যেক দর্শনের নানা মত আছে, সেইরূপ এই চার্বাক দর্শনেরও নানা একদেশী আছে। কেহ কেহ অনুমান-প্রমাণের আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার করেন।[১৬] কোন চার্বাক ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলেন; কেহ প্রাণকে, কেহ মনকে আত্মা বলেন। কেহ কেহ আকাশকে পঞ্চম ভূত বলিয়া স্বীকার করিতেন।[১৭]

চার্বাকের কথা এই যে জীবমাত্রই স্বাভাবিক-ভাবে নিজেকে বড় করিতে চায়। যে প্রকারে

৬ নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ। সর্বদর্শনসংগ্রহ—মাধবাচার্য।

৭ দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ।—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১

৮, ৯ সর্বদর্শনসংগ্রহ।

১০ মরণমেবাপবর্গঃ। —অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি উদ্ধৃত বৃহস্পতিসূত্র

১১ ধর্মাধর্মৌ ন বিদ্যেতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ। —ষড়্দর্শন সমুচ্চয়—হরিভদ্রসূরি।

১২ ক্ষণিকভূতচতুষ্টয়ত্রুটিপুঞ্জরূপো দেহ এবাত্মা স্যাৎ। —অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

১৩ ননু যথা মাদকতাশক্তিঃ প্রত্যেকদ্রব্যাবৃত্তিরপি মিলিতদ্রব্যে বর্ততে এবং চৈতন্যমপি স্যাৎ। ননু যথাবয়বেষু-বর্তমানমপি পরিমাণজলাহরণাদি কার্যং ঘটাদৌ দৃশ্যত এবমেব শরীরে চৈতন্যং স্যাদিতি। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—৩।২২

১৪ দেহাত্মবাদে চ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদি সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহ

১৫ প্রত্যক্ষাতিরিক্তং প্রমাণমেব ন ভবতি ব্যাপ্ত্যাদ্যসিদ্ধেরিতি চার্বাকাঃ। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—৫।২৮

১৬ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

১৭ ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে। মন ইত্যন্যে —ব্রঃ সূঃ শাঙ্করভাষ্য ১।১।১ 'প্রাণ এবাত্মা' ইত্যন্যে। —অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

হউক সকলকে পিষিয়া, সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সে বড় হইবে, সে সুখী হইবে। নিজের ইহ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই সকলের স্বভাব। বনে সিংহ অন্য পশুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সকলকে দাবাইয়া বড় হয়, সুখী হয়। কুকুরটা তাহার চতুস্পার্শ্বের অন্যান্য কুকুরকে মারিয়া, ভয় দেখাইয়া নিজে ভোগ করে। সভ্য জাতির মানুষও অসভ্যদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অনার্যগণও সুবিধা পাইলে আর্যজাতিকে পরাজিত করে। নিজেকে বড় করিবার জন্য জীবের এই সংঘর্ষ চিরকাল চলিতেছে। এক জাতি অপর জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতেছে। এখনও এই দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে সকলে অনুভব করিতেছে। সবল দুর্বলকে চিরদিন পীড়ন করিয়াছে ও করিতেছে। সকলেই পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চায়। স্বাধীন হইয়া অধিকতর কামকাঞ্চন ভোগ করিবে, ইহাই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্য। জীবের এইরূপ প্রবৃত্তির মূল হইতেছে স্বভাব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পূর্বপক্ষরূপে এই স্বভাবের কথা আছে।[১৮] কেহ কেহ স্বভাবের অর্থ করেন 'যদৃচ্ছা', কেহ বলেন পদার্থের যথাব্যবস্থিত শক্তি।[১৯] প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অসিদ্ধ বলিয়া স্বর্গ, দেবতা, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি ইত্যাদি বেদবাদিগণের স্বীকৃত পদার্থ অলীক। বেদেরও প্রামাণ্য নাই। কারণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র পরস্পরবিরোধী। কতকগুলি ধূর্তব্যক্তি ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়া মানুষের উন্নতির মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকায় জাতিভেদ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ও যাগাদিক্রিয়ার ফল অসিদ্ধ। দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সুখ ছাড়িয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপবাস, সংযম, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইবে?

যদি বল কামকাঞ্চনজনিত কিছু সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা বহুতর দুঃখের সহিত মিশ্রিত বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহাতে কখনও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। নিদাঘতপ্ত কোন্ অমূঢ় ব্যক্তি কুপিত সর্পের ফণার ছায়ায় বিশ্রাম করে? ইহার উত্তরে বলিব—এইরূপ আপত্তি মূর্খেরই আপত্তি। উত্তম শ্বেততণ্ডুলের অন্নভোজন করিতে হইলে ধান্য হইতে তুষ বিমোচন, পাকাদি দুঃখ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কোন্ ব্যক্তি অনশনে অবস্থান করে? মৎস্য হইতে কণ্টক নিষ্কাশন করিতে হইবে বলিয়া কি মৎস্যভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে? গৃহনির্মাণে দুঃখ আছে বলিয়া কি কেহ গৃহনির্মাণ-কার্য হইতে বিরত হইয়া মুক্ত অম্বরতলে বাস করে? যে পরিমাণ দুঃখ স্বীকার না করিলে সুখভোগ করা যায় না, মানুষ সেইটুকু দুঃখ স্বীকার করিয়া সুখভোগ করে। তদতিরিক্ত দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করে। অতএব এই কামকাঞ্চনজনিত সুখ ত্যাজ্য নহে। দুঃখসংযুক্ত বলিয়া কামকাঞ্চনজনিত সুখ হেয়, এই কথা মূর্খেরই প্রলাপ।[২০]

কণ্টকাদিজনিত দুঃখই নরক। কামকাঞ্চনজনিত সুখই স্বর্গ।[২১] লোকপ্রসিদ্ধ রাজা প্রভৃতিই ঈশ্বর।[২২]

১৮ 'কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ' ইত্যাদি—শ্বেতাঃ উঃ ১।২

১৯ স্বভাব হইল 'পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ' চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

২০, ২১ সর্বদর্শনসংগ্রহ।

২২ লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্বাকাঃ। [ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ১ম স্তবক] লোকব্যবহারসিদ্ধঃ—রাজাদিদৃশ্যমানঃ [বোধনী টীকা]

যে প্রকারেই হউক নিজের দেহেন্দ্রিয়ের সুখ সাধন করিতে হইবে। ধর্ম ও অধর্ম কিছু নাই। চৌর্যাদি অধর্ম নহে। যাগাদিও ধর্ম নয়। স্বভাবের পথে চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, রাজাদির তোষামোদ করিয়া নিজের ভোগ সাধন করিতে হইবে.—ইহা অতি স্থূলবুদ্ধি চার্বাকের কথা।

পূর্বোক্ত চার্বাক ভিন্ন তাহাদের পর আর একদল চার্বাক আসিল। ইহারা উন্নততর; স্থূলতম শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখকে পরম পুরুষার্থ মনে করিত। অবশ্য ঐ মানসিক সুখ ঈশ্বর, দেহাদি অতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, পরলোকাদি সম্বন্ধজনিত নয়। শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি জনিত সুখকে ইহারা শারীরিক সুখ হইতে উৎকৃষ্ট স্বীকার করিত। ইহারা কেবলমাত্র নিজের সুখে তৃপ্ত থাকিত না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গ্রাম এমন কি নিজদেশের সকলের সম্মিলিত সুখের প্রাধান্য দিত। কিন্তু স্বর্গ, দেবতা, পরলোক, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর বা দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। যদিও ইহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিত, তথাপি ইহলোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যতটুকু অনুমান স্বীকার করা প্রয়োজন, ততটুকু অনুমানের প্রামাণ্য মানিত। ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম প্রভৃতির সাধক অনুমানে বিশ্বাস করিত না।[২৩] ইহাদেরই কেহ কেহ ইন্দ্রিয়কে, কেহ বা প্রাণকে, কেহ বা মনকে আত্মা বলিত। এই সকল চার্বাক কামকাঞ্চন ভোগের সহায়ক এবং শিল্প, কলা, সঙ্গীতাদির পরিপোষক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিত। সেই জন্য ইহারা আয়ুর্বেদ ও অথর্ববেদের প্রামাণ্য দিত।[২৪] ইহাদের কথা এই যে, স্বভাবই সমস্ত জগতের কারণ। সুতরাং স্বভাবের পথে নিজের এবং নিজ দেশের উন্নতি সাধন কর। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতদূর এই জগৎ দেখা যায়, তাহার বাহিরেও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক জীবনের সাধক পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই মতে আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকৃত নয়। ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমানকে ইহারা মানিত। এই প্রকার অনুমান স্বীকার না করিলে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে। অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে কিরূপে দেশের উন্নতি সাধিত হইবে? বিজ্ঞান-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—এইসব শাস্ত্র মানুষের উন্নতি বিধায়ক; কিন্তু, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র ঐহিক সুখের প্রাধান্য না দিয়া পরলোকাদি লইয়া ব্যস্ত—সেগুলি বর্জনীয়, অপ্রমাণ। ঐ সকল শাস্ত্র মানুষের অগ্রগতিকে বাধা দেয়; দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের উন্নতির পরিপন্থী। ঈশ্বরাদির প্রতিপাদক অনুমানের প্রামাণ্য নাই। সুতরাং ইহজীবনের, দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের যাহা কিছু সহায়ক, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা কিছু পরিপন্থী তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। চৌর্যাদি সমাজের ক্ষতিকারক—অতএব উহা বর্জনীয়। রাজা প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দের সম্মান দিতে হইবে; তাঁহারাই ঈশ্বর। ইহাই উন্নততর চার্বাকের মত।[২৫]

অধিকাংশ চার্বাকের মত এই যে কতকগুলি ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর নিজেদের মনঃকল্পিত বেদ নামক গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়াছে।[২৬] একে তো ঐগুলি পরস্পরবিরোধী। আবার বেদে 'জর্ভরী তুর্ফরী' ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্র আছে যাহার কোন অর্থ হয় না। যজ্ঞে মাংসভক্ষণ এবং নানাপ্রকার লজ্জাজনক অশ্লীল ব্যাপারের কথাও বেদে আছে। সুতরাং ঐ বেদকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রামাণিক বলিবে? পৌরুষহীন ব্যক্তিরা নিজেদের জীবিকার জন্য সাধারণ

২৩, ২৪ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

২৫ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

২৬, ২৭ সর্বদর্শন সংগ্রহে—চার্বাকদর্শন।

লোককে ভুলাইয়া এইভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিপূর্বক অপরের সর্বনাশ করিয়া দেশের দুর্দশা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

যদি বল ঐহিক সুখ ছাড়াও স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখ আছে, জন্মান্তর আছে; নতুবা বহুলোক-পূজিত জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরা প্রচুর অর্থব্যয়, নিদারুণ শারীরিক কষ্ট, শীত, আতপ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি সহ্য করিয়া পরলোকের জন্য যাগ, দান, হোম, তত্ত্ববিচার প্রভৃতি করিতেন না; তাহা হইলে বলিব, ইহা অতি অযৌক্তিক কথা। জ্ঞানবৃদ্ধদের নিজেদেরই পরস্পর মতভেদ দেখা যায়। তাহাদের প্রবর্তিত বেদের তো কথাই নাই। ঐ সকল বেদ মিথ্যা, ব্যাঘাত, পুনরুক্তি প্রভৃতি বহু দোষদুষ্ট বলিয়া অপ্রমাণ।[২৭]

অতএব দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা দুশ্চর তপস্যা, জপ, ধ্যান, হোম প্রভৃতির দ্বারা জন্মান্তরীয় সুখের জন্য লোককে প্রবৃত্ত করায়, তাহারা মহা প্রতারক। আর যাহারা তাহাদের কথায় প্রবৃত্ত হয় তাহারা অতি মূঢ়।[২৮] জীব মরিয়া গেলে তাহার দেহরূপ আত্মা নষ্ট হইয়া যায়। অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলে কোন মানুষকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না; দেহের ধ্বংস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র প্রমাণ, তখন প্রত্যক্ষের দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে কেহ কোন দিন জানিতে পারে না। অতএব দেহাতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। যদি জন্মান্তর, পরলোক থাকিত, তাহা হইলে মানুষের আত্মা মৃত্যুর সময় দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গিয়া কখন না কখন আত্মীয় স্বজনের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিত;[২৯] কিন্তু তাহা কোন দিন কেহ দেখে না। সুতরাং পরলোক, জন্মান্তর অলীক পদার্থ।* (ক্রমশঃ)

২৮ তস্মাদদৃষ্ট পরিত্যাগদৃষ্টে চ প্রবর্তনম্।
লোকস্য তদ্‌বিমূঢ়ত্বং চার্বাকাঃ প্রতিপেদিরে।
ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়—হরিভদ্রসূরি

২৯ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
সর্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত শ্লোক

* লক্ষণীয়: গত আশ্বিন সংখ্যায় লেখক প্রশ্নোত্তরে জন্মান্তরের পক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধে জন্মান্তরের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। (উঃ সঃ)

ত্রিকাল

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

কালকে আমি ছিলাম বেঁচে
সে তো শুধুই সান্ত্বনা,
মরণ ছিল দাঁড়িয়ে পাশে
ছিল না সে চেতনা।

আজকে আমি আছি বেঁচে
সে তো শুধুই গঞ্জনা,
কালের বোঝা আনছি টেনে
যাচ্ছি কোথায় নাই জানা।

কালকে আমি থাকবো বেঁচে
সে তো শুধুই কল্পনা,
কাল আর আজ বেঁচে থাকার
নয় কি সেটা জের টানা?

ইংলণ্ডে এক বৎসর

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

এপ্রিলের মাঝামাঝি শনি-রবি দুদিনে বৃটিশ কাউন্সিল ৩০।৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিমের বিখ্যাত Lake District (হ্রদ অঞ্চল) ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। আমি এই দলে ছিলাম। ১৪০ মাইল কোচে ভ্রমণ এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, সারাদিনের পরেও শ্রান্তিবোধ ছিল না। আমাদের গাড়ী সবুজ পাহাড়ের গা দিয়ে, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর পাশ দিয়ে চলল; মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনপদ, প্রত্যেকটিই নিখুঁতভাবে পরিষ্কার—দোকান-পাট সুসজ্জিত। কোন কোন শহরে রাস্তা এত সরু যে, বড় বাস চলা শক্ত। পথে এক জায়গায় যে, যার লাঞ্চ-প্যাকেটের সদ্ব্যবহার ক'রে নিল। Settle Kendal পেরিয়ে যখন আমাদের গাড়ী উইণ্ডার হ্রদ (Winder Lake)-এর ধারে বাউন্স (Bounes)-এ এসে হাজির হ'ল, আমরা সকলেই ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাড়ী দেখার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। হ্রদটি প্রায় ২০ মাইল লম্বা; ধারে ধারে গাড়ী চলল—দুপাশে পপ্‌লার, পাইন, ফার প্রভৃতি নানা বৃক্ষের সারি। হ্রদে নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা আছে। শেষ প্রান্তে Ambleside শহর। এর খানিক পরেই গ্র্যাসমিয়ার হ্রদ (Lake Grasmere)-এর ধারেই কবির ২০০ বৎসরের পুরানো বাড়ী ডাভ কটেজ (Dove Cottage)। কবির জীবনের বিশেষ আট বছর (১৭৯৯—১৮০৮) এইখানেই কেটেছে বাড়ীটার মেঝে পাথরের—এবড়োখেবড়ো। জানলাগুলিও ছোট নিচু নিচু, সেকালে জানলা পিছু নাকি ট্যাক্স দিতে হ'ত। পুরানো কাঠের আসবাব ও চুল্লির সরঞ্জামগুলি এখনও রয়েছে। কবির আত্মীয়া একটি বৃদ্ধা সব দেখালেন। ছোট্ট বাগানে কিছু ড্যাফোডিল ফুটে আছে বটে, কিন্তু কবি যে 'a host of golden daffodils' দেখেছিলেন, সে আরও উত্তরে আলস্‌ওয়াটার হ্রদ (Ullswater Lake)-এ; আর বেশী দেরী করা গেল না। গাড়ী ছুটল Rydal হ্রদের পাশ দিয়ে। Darwent water হ্রদের ধারে Keswick শহরে এসে আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল। অনেক লোক বেড়াতে এসেছে; অনেক হোটেল, অনেক দোকান পৃথিবীর নানা দেশের দ্রব্য সামগ্রী কেনাবেচা হয়, এই এখানকার জীবিকা। আমরা তিনটা হোটেলে ছড়িয়ে রইলাম। খাওয়ার পর ভারতীয়, পাকিস্থানী, নাইজেরীয়, উগাণ্ডী, সুডানী, কিউবান, গ্রীক ইটালীয়, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ—সকলে মিলে জটলা, সবাইকে কিছু বলতে হবে। সকালে একটু হ্রদে স্টীমারে ভ্রমণ হ'ল। স্থির জল, চার ধারে পাহাড়—শীতে সেজন্য এখানে বেশী বরফ পড়ে না। চার ধারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মনে হয়, এটা সত্যই কবি-প্রতিভা বিকাশের অনুকূল স্থান। দুপুরে ফেরার পালা শুরু হ'ল। এবার কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেরই চোখ বুজে এল, পথেই সন্ধ্যা পার হ'ল। রাত্রি দশটায় লীডস্‌ পৌছলাম।

গরমের সময়ই এখানে যত রকম সম্মেলন আহূত হয় ভাল ভাল জায়গায়। তত্ত্ববিজ্ঞানীদের সম্মেলন এবারে ছিল লীডস্‌ থেকে ৬০মাইল

পূর্বে সমুদ্রের ধারে। তিন চার দিনের জন্ম আমাকে ওখানে যেতে হয়েছিল মে মাসের মাঝামাঝি। তখন সূর্য ডোবে সন্ধ্যা ৯াটায়। বাসেই রওনা হলাম। সারা পথটাই সমতল—সবুজ ট্রাক্টর (Tractor)-এর সাহায্যে যব ও গম চাষ চলেছে। সমুদ্রের ধারটা বোম্বাই বা ওয়ালটেয়ারের মতো। একটা পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গেছে, তার ওপর একটা পুরানো দুর্গ-প্রাকার—Cromwellএর তোপ এককালে এর ওপর পড়েছিল। পাহাড়ে দুপাশে দুটি বিস্তৃত বালুচর—পুরীর মতো, তার ধারে ধারে সমুদ্র-স্নান ও রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা, প্রমোদ-কানন, থিয়েটার। এই Spa Theatreই ছিল আমাদের সম্মেলনের কেন্দ্র। সম্মেলনে ইওরোপের সকল দেশ থেকেই লোক এসেছিল—পূর্বে ছাপানো প্রবন্ধের ওপর আলোচনাই এইসব সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য, তা ছাড়া—পরস্পরের সঙ্গে আলাপ।

সেদিন প্রতিপদ, জোয়ারের উত্তাল তরঙ্গ, তাই জলে নামা বারণ ছিল। Rescue boat সব সময়ে সতর্ক আছে। এখানকার স্থায়ী জনসাধারণ হ'ল মৎস্যজীবী। বিকেলে তাদের দু এক জনের সঙ্গে আলাপ করলাম; বেশ মন-খোলা লোক—শহরের লোকের বিপরীত। একজন Marine Drive (সমুদ্রধারের রাস্তা) এ রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে নাইলনের সুতার ছিপে একটা দু-সেরা কড মাছ ধ'রল। ছোট পোতা-শ্রয়, সকালে মোটর বোটগুলি বেরিয়ে যায়—বিকালে মাছ নিয়ে ফিরে আসে। এখানে টাটকা মাছ খাবার সুযোগ হ'ল। একদিন সেই পুরানো দুর্গে বেড়াতে গেলাম। প্রায় চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র, তার মধ্যে বসে কোথা দিয়ে যে দু-ঘণ্টা সময় চলে গেল, খেয়াল নেই—ফিরতে গিয়ে দেখি, আমি প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। অনেক কষ্টে বেরুবার ব্যবস্থা করি।

গরমের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা পত্রপুষ্পে ভরে উঠেছে—ছেলেরা মাঠে খালি পায়ে ফুটবল খেলছে—আর মেয়েরা সব রঙবেরঙএর স্থতি ঘাঘরা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্র-সৈকতে। রোদে ও সমুদ্রের হাওয়ায় গাত্র-চর্ম যথাসম্ভব উন্মুক্ত রাখবার চেষ্টা সকলের। এ দেশে এ এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা হ'ল। আবার বাসেই ফিরলাম।

Whit Mondayর দিন এখানকার বিমান-কেন্দ্রে বিমান-প্রদর্শনী হ'ল। Javelin, Vampire, Spitfire, Voodoo, Supersonic plane দেখলাম; আবার ১৯১২ খৃঃ তৈরী প্লেনের ওড়াও দেখতে পেলাম।

মে মাসের শেষের দিকে শনি-রবিবারে আবার বৃটিশ কাউন্সিলের একটি দলের সঙ্গে কোচে ক'রে স্ট্রাটফোর্ড-আপঅন-এভন (Stratford-upon-Avon) গেলাম। এটা শেক্‌স্‌পীয়রের (Shakespeare) এর জন্মস্থান। ১৩০ মাইল পথ, ৬ ঘণ্টা লাগল। অনেকটা পথ ট্রেণ্ট (Trent) নদীর উপত্যকা দিয়ে, চারিদিক কচি ঘাসে ভরা। তার উপর রদ্দুর পড়ে অতি মনোরম দৃশ্য হয়েছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেউ আর ঘরে বসে নেই। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ী, অনেক গাড়ীই পেছনে একটা ক'রে ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে যাচ্ছে; এতেই রাত্রে শোয়া, রান্না খাওয়া, প্রাতরাশ—সব হয়।

শেক্‌স্‌পীয়রের বাড়ী পুরানো মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ী,—তাঁর স্ত্রী অ্যান্‌ হ্যাথওয়ের বাড়ীর এখনও খড়ের চাল। এ অঞ্চলে অনেকগুলি খড়ের বাড়ী দেখলাম। ১৫৬৪ খৃঃ শেক্‌স্‌পীয়রের জন্ম। অনেক গবেষণার পর এখন জন্মস্থান

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। এই শহরে এভন নদীর তীরে শেক্‌স্‌পীয়রের মর্মর মূর্তি ও তাঁর নামে এক বিরাট রঙ্গমঞ্চ হয়েছে। এখানে সন্ধ্যায় ওথেলো (Othello) নাটক দেখলাম। পল্ রবসন নাম-ভূমিকায় ছিলেন। সাজ-সজ্জা, পট, পট-পরিবর্তনের পদ্ধতি সব কিছুই নিখুঁত ও অভিনব। আর দর্শকবৃন্দের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশের লোকই ছিলেন।

পরদিন ছোট্ট সুন্দর শহরটিকে প্রদক্ষিণ ক'রে, আর এভন নদীতে একটু নৌকা চালনা ক'রে ফেরা হ'ল অন্য পথে,—নতুন দৃশ্য। বিস্তীর্ণ মোটর রাস্তা তৈরী হচ্ছে। ওয়ারউইক (Warwick) দুর্গ, গতযুদ্ধে বোমা-বিধ্বস্ত বিরাট কভেন্ট্রি (Coventry) ক্যাথিড্রাল, মাইলের পর মাইল তৃণহীন প্রান্তর, আবার খানিক পরে শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত গোচারণ ভূমি ও ম্যাটলকের (Matlock) প্রস্রবণ-ঘেরা পাহাড়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র দেখে লীডস্ ফিরতে রাত্রি হ'ল।

এদিকে ইউনিভারসিটির বছর শেষ হ'য়ে এল; সব ছেলে এবার পড়ায় মেতেছে। সকলে ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত লাইব্রেরীতে; এক হাজার সীটের মধ্যে একটিও খালি পাওয়া যায় না। ইউনিয়নের সব উৎসব-আড্ডা বন্ধ। সর্বত্র গরমঘরে—ছেলেরা পরীক্ষার পাঠ তৈরী করতে ব্যস্ত। পরীক্ষার পরেই লম্বা ছুটি—তিন মাস সকলেই বেড়িয়ে বেড়ায় আজকাল। ছাত্রদের সস্তায় থাকা খাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা আছে। অনেকেই এই সময়ে কিছু কাজ ক'রে অর্থ রোজগার ক'রে নেয়। গবেষণারত ছাত্র এবং শিক্ষকেরা অবশ্য তিন চার সপ্তাহের বেশী ছুটি নেয় না। তাও একের পর এক।—কোন সময়েই লেবরেটরী বন্ধ হয় না।

আমাকেও এবার লীডস্ ইউনিভারসিটির কাজ গুটিয়ে নিতে হ'ল। এর পর ইংলণ্ডের তন্তু (textile) গবেষণা- ও শিল্প-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে বেরুতে হবে।

তার পূর্বে তিন সপ্তাহের ছুটিতে ইওরোপের ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইটজার-ল্যাণ্ড ও ইতালী ঘুরে আসবার সুযোগ হয়েছিল। সে কথা এখন থাক।

ফিরে এসে লীডসে অবস্থিত পশম গবেষণা-কেন্দ্রটি দেখলাম। একটি বাগানবাড়ীতে ৪০ বৎসর পূর্বে এর গোড়া পত্তন। কৃত্রিম ফাইবারের (artificial fibre) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই কেন্দ্র এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। তারপর ম্যাঞ্চেষ্টারে তুলা ও রেয়ন গবেষণা-কেন্দ্রগুলি দেখলাম। যে কয়দিন ছিলাম, কাজেই কেটেছে। শহরটি বিস্তীর্ণ সমতলের ওপর বলেই বোধ হয় ভাল লেগেছিল, আর মনে হয় রাস্তায় একটু আধটু কাগজ পড়ে থাকতে দেখে এখানকার লোকেদের প্রাণ-স্পন্দনে আত্মীয়তা অনুভব করেছিলাম। আধুনিক শিল্প-প্রধান শহরের সব কিছুই এখানে আছে। চারিদিকেই কারখানা। বিরাট বন্দর, অবশ্য সমুদ্র এখান থেকে ৩৫ মাইল। জু, মিউ-জিয়াম চিত্রশিল্প-প্রদর্শনী বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। ইউনিভারসিটির শিক্ষকেরা অনেকেই ভারতের সঙ্গে সুপরিচিত। এখান থেকে একদিন শেফিল্ড কলেজ (অব্ টেকনলজি) গেলাম। পাহাড়ে জায়গা। পরিচ্ছন্নতার চেয়ে কর্মমুখরতাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। জুলাইএর মাঝামাঝি ডাণ্ডী (Dundee) যেতে হ'ল। লীড্‌স্ থেকে নিউ কাস্‌ল্-আপঅন-টাইন (New Castle upon-Tyne), বারউইক-আপঅন-টুইড (Berwick upon Tweed) হ'য়ে বরাবর ইংলণ্ডের পূর্ব-

উপকূল দিয়ে প্রায় সমুদ্রের ধারে ধারে এসে এডিনবার্গে পৌঁছলাম। এখানে ট্রেন পাল্‌টে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ বিখ্যাত ফার্থ সেতু ও টে সেতু পার হ'য়ে ডাণ্ডীতে প্রবেশ করলাম। প্রায় ৭০।৮০ বছর পূর্বে টে সেতু ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। টে নদীর মোহানা প্রায় সমুদ্রের মতো। তারই পাড়ে উঁচু জায়গায় শহরটি। পাটশিল্পের এত বড় কেন্দ্র যে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে, নৈহাটি-কামারহাটির লোক তা ভাবতে পারে না। অসংখ্য কয়লার চিমনি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারই এর কারণ। চটকলগুলির ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য। তারও কারণ নতুন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়—কুলি-ব্যারাক নেই, এখানে তারা জনসাধারণের থেকে আলাদা কোন প্রাণী নয়।

এখানে আমার একটি পুরাতন স্কচ্‌ সহ-কর্মীর ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাহচর্যে অনেক কিছু দেখার ও অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। স্থানীয় দৈনিক পত্রে আমার আগমন-বার্তাও ঘোষিত হয়েছে, দেখলাম। এদের পাট গবেষণা-কেন্দ্র দেখে নিজেদের ছোট মনে হয়নি—মনে হয়েছে আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভাবের কথা। সাধারণতঃ স্কচ্‌ লোকেরা ইংলিশম্যানদের অপেক্ষা বেশী মিশুক—এবং এরা ওদের প্রশংসা শুনতে পারে না। স্কট্‌ল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত জন-বিরল, কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক রূপ আরও সুন্দর। কয়দিন নিরবচ্ছিন্ন কার্য-সূচীর পর একদিন ৫০ মাইল দূরে বৈচিত্র্যময় তরু-গুল্ম-সুশোভিত উচ্চ প্রান্তরময় পথ দিয়ে কিলেক্র্যাঙ্কি (Killecrankie) গিরিপথ ও পিট্‌লোক্রী (Pitlochry) বাঁধ দেখে এলাম। এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ১৫।২০ মাইল দূরে সমুদ্রের তীরে পুরাতন সেণ্ট এনড্রুজ (St. Andrews) শহর; ৪০০ বছরের পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা গ্রানাইটের বাড়ীগুলি যেন তাদের শুভ্র মনের পরিচয় দিচ্ছিল। এই রকম শুভ্র সমুজ্জ্বল বাড়ী ২৫ মাইল উত্তরে আরব্রোথ (Arbroath) শহরেও দেখেছি ও এবার্ডিন (Aberdeen) শহরেও প্রচুর আছে শুনেছি। একদিন চ্যারিটি থিয়েটার দেখলাম—একশ বছরের পুরানো নাটক, পুরানো ঢঙেই হ'ল। মাঠে গ্রাম্য নৃত্য দেখার সুযোগও হয়েছিল।

ফেরার পথে এডিনবার্গে আর গ্লাস্‌গোতে দুদিন ক'রে ছিলাম। এডিনবার্গে দুর্গ ও হলিরুড (Holyrood) প্যালেস্‌ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাণী মেরীর স্মৃতি-বিজড়িত। খুঁটিনাটি ইতিহাস শুনে অবশ্য মনে আঘাতই পেলাম। ইউনি-ভারসিটি ও চিকিৎসা-বিদ্যালয়টি অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। মিউজিয়ামে আলো ঢোকাবার জন্য কাঁচের ছাদ। সর্বোপরি মনে পড়ে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত (অবশ্য তখনও দিনের আলো শেষ হয়নি) সুদীর্ঘ স্ট্র্যাণ্ডে (রাস্তায়) ভ্রমণকালে একটি স্কচ্‌ সরকারী অফিসারের সঙ্গে অমায়িক আলাপন। পরদিন বাসেই রওনা হলাম পশ্চিম দিকে।

গ্লাসগোতে পৌঁছেই বৃষ্টি নামলো। এটা যে স্কট্‌ল্যাণ্ডের বৃহত্তম শহর ও শিল্পকেন্দ্র, তা বিরাট অট্টালিকাগুলি আর তাদের কালো রং দেখলেই বোঝা যায়। এখানকার রয়েল ইন্‌সটিটিউট্‌ অফ টেকনলজি (Royal Institute of Technology) ম্যানচেস্টারের মতোই। শহরে একটু ঘুরে জাহাজের কারখানাগুলি দেখবার জন্য ক্লাইড্‌ নদীর মোহনায় ছোট ছোট দ্বীপগুলি কাইল অব্‌ বিউট (Kyles of Bute) পর্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল স্টীমার ভ্রমণ করলাম। ছুটির সময়, বেশ ভিড়; বসবার স্থানাভাব।

খাওয়া, গল্প ও মাঝে মাঝে গানবাজনায় সকলে সময় কাটাচ্ছে। যেতে নদীর দুধারে অন্ততঃ ৪০।৫০টি জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র নজরে পড়ল। এ কাজটা এদের স্বভাবজ হ'য়ে গেছে।

YMCA হোস্টেলে ছিলাম। খুব ভাল ব্যবস্থা। এক ছাত্র-বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গল্প করতে করতে খাওয়া হয়নি; রাত ১২টায় রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে মাছ ও আলু ভাজা (Fish chips) কিনে এনে খাওয়া হ'ল।

পরদিন আরও দুজন জুটল। আমরা চার-জন বাঙালী স্কটিশ হ্রদ-মালার সৌন্দর্য দেখতে বেরুলাম। সারাদিনে প্রায় দেড়শ মাইল কোচ ভ্রমণ হ'ল। এরা লেককে বলে লখ্ (Loch), লোমণ্ড (Loch Lomond) ক্যাট্রিন (Loch Katrine) প্রভৃতি পাহাড়-ঘেরা বৃক্ষ-পুষ্প-পরিশোভিত হ্রদগুলি সত্যই তৃপ্তিদায়ক। অবশ্য আমাদের নৈনিতাল বা কাশ্মীর কম যায় না। লোমণ্ডে স্টীমার সার্ভিস দেখলাম। আরও উত্তরে যে বড় হ্রদ লখ্নেস্ (Loch Ness) সেখানে যাওয়া হয়নি। তার ভেতরে নাকি মারমেড (Mermaid) অর্ধমৎস্যাকৃতি মানবী আছে—কেউ কেউ দেখেছে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এ নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রাজী নয়। অবশ্য যাত্রীর মন ঐদিকে আকর্ষণ করবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। রাত্রে লীড্স্ ফিরলাম।

এবার আয়ার্লণ্ডে বেলফাস্ট (Belfast) শহরে এক কারখানায় আমার প্রথম কর্ম-কেন্দ্র। লীড্স্ থেকে হেশ্যাম (Heysham) হ'য়ে এক রাত্রে প্রায় ২০০ মাইল আইরিশ সাগর পার হ'য়ে বেলফাস্ট পৌঁছলাম। জাহাজে ১৫ দিন আগে থেকেই সব কেবিন ভাড়া হ'য়ে যায়। অগত্যা ডেকেই যেতে হ'ল। বেশ ভিড়—বসবার সীট ভর্তি, প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও পরে ডেক-চেয়ারে রাত কাটালাম। অনেকেই অবশ্য মাটিতে ওভারকোটের ওপর শুয়ে পড়ল। ফেরবার সময় শোবার বার্থ (berth) পেয়েও গরমে কষ্ট হয়েছিল।

লীড্সের চেয়ে বেলফাস্ট শহর আমার ভাল লেগেছিল। এখানে চুনকাম-করা বাড়ী দেখলাম—সাদা বা এলা রং, আর লীড্সে সব কালো, ধোঁয়ার জন্য। সমুদ্রপারে অবস্থিত। তাই এখানে ধোঁয়া নেই। আগস্ট মাসটা এখানেই কেটেছে। কারখানার জীবন মন্দ লাগল না। এখানে তখন ভারতীয় (বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী), পাকিস্থানী, জাপানী, ফিনিস্, পোর্তুগীজ, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নানা জাতের ১২।১৪টি শিক্ষানবিশ ছিল। খাবার টেবিলে সকলে জড় হতাম। খাবার ব্যবস্থা বিনা খরচেই। বেশীর ভাগ ছাত্রই ক্রেতার তরফ থেকে এসেছে। তা না হ'লে এ সব কারখানায় ভারতীয়দের ঢোকা শক্ত। চোখ চেয়ে থাকলে শেখবার অনেক কিছু আছে—প্রশ্নের উত্তর—মালিক থেকে আরম্ভ ক'রে মজুর-সর্দার পর্যন্ত বেশ আগ্রহ-সহকারে দেয়। তবে নতুন যন্ত্র বা পদ্ধতিগুলি বাজারে ছাড়বার আগে পর্যন্ত একটু লুকিয়ে রাখে। এই রকম একটি যন্ত্র দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল, কেন না মালিকের ছেলের সঙ্গে আলাপ হতেই সে বললে, 'তোমার প্রবন্ধ মারফৎ আমি তোমায় চিনি এবং তোমার গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই আমরা একটি যন্ত্র তৈরী করতে প্রবৃত্ত হই—এটি সেই যন্ত্র।'

কারখানাটি খুব পরিষ্কার, ফাঁকি নজরে পড়ল না, অযথা ব্যস্ততাও নেই। কর্মীদের মুখে সর্বদাই হাসি, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ

করলে আর ছাড়তে চায় না। সকলের গায়ে ওভার-অল (over-all) কিন্তু বেরুবার সময় সকলেই যে যার পোষাকে ফিট্‌ফাট্‌ হ'য়ে পাঁচটা বাজলেই দৌড়ে গিয়ে গেটে লাইন দেয়। এই সময়ে কয়েকটি বিশেষ পাবলিক বাসও ওদের জন্য থাকে। সুতাকল নির্মাণ ছাড়া এখানে কয়েকটি বড় বড় জাহাজ এবং উড়ো-জাহাজের কারখানাও আছে।

কিছু দূরে লাম্‌বেগ (Linen Research Institute)-এ তিসি গাছের আঁশ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে দেখি—ছোট একটি বাগান-বাড়ীতে গত ৪০ বছরে বেশ কাজ করেছে।

একদিন কুড়ি মাইল দূরে পূর্ব দিকে সমতল সমুদ্র-সৈকতে অবসর কাটাবার আনন্দ-মুখর ব্যবস্থা দেখে এলাম। অন্য এক শনিবার পঞ্চাশ মাইল দূরে উত্তরসীমানায় প্রস্তরসঙ্কুল সমুদ্র-তীরে ব্যালিণ্টয় (Ballintoy) নামে একটি ছোট গ্রামে আমাদের কলিকাতার জুট-লেবরেটরীর ভূতপূর্ব ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম। এঁর বৃদ্ধা স্ত্রী আমাকে সিদ্ধ ভাত আর দুধে মাছসিদ্ধ—যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। একেবারে সমুদ্রের ওপর ছোট বাড়ী—একটু লাইব্রেরী ও পাথরের ওপর একটু বাগান করেছেন, আর একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র জোগাড় করেছেন, তা দিয়ে দূরে জাহাজের নাম দেখে টুকে রাখেন। বললেন, শেষ জীবন এর বেশী কিছু চাইনি। পথে—আলু, ওট, তিসি প্রভৃতির চাষ আর পশুপালন দেখলাম, চতুর্দিকেই শ্যামল শোভা। তরঙ্গায়িত ভূপৃষ্ঠে আবার নতুন ক'রে মোচাকৃতি (Coniferous) গাছ লাগাচ্ছেন এখানকার সরকার বাহাদুর। কাছেই এক পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে যেতাম, সে যায়গাটা চারণ-ভূমি। মেষপালকের জীর্ণবাস ও পর্ণ-কুটীর দুঃস্থ অবস্থার পরিচায়ক; কিন্তু আলাপে তাদের মনের দৃঢ়তা ও উদ্যম লক্ষ্য করলাম। অবশ্য ইংলণ্ডের তুলনায় এদেশ গরীব।

দুদিনের ছুটিতে ডি-ভ্যালেরার দেশও দেখে এলাম। সেটা বৃটিশ এলাকার বাইরে—তাই কাস্টম-চেকিং (Custom's checking) হ'ল। ডিজেলের রেলগাড়ী বেলফাস্ট ছেড়ে দুঘণ্টায় ১২০ মাইল পেরিয়ে একেবারে ডাবলিনে এসে থামল। আয়ার যে সমতল কৃষি-প্রধান দেশ, পথে তার প্রমাণ পেলাম; ডাবলিনের কাছেই কিছু কলকারখানা। সে জন্য এদেশ উত্তর আয়ার্লণ্ডের তুলনায় গরীবও বটে। বেশ-ভূষা, আহার-বিহার ও বাসস্থানের নমুনায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ডাবলিন বড় শহর—নেলসন্‌ স্তম্ভ এর প্রধান কেন্দ্র। কতকগুলি বিরাট বিরাট বাড়ী এখনও অতীত বৃটিশ রাজত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্তমান পার্লামেণ্ট কিন্তু সেই সব বাড়ী ছেড়ে একটি ছোট বাড়ীতে বসে। উচ্চ-সভা (Upper house) ও নিম্ন-সভা (Lower house) সব মিলে দেড়শ সদস্য। তথাপি এটা সত্যকারের বিধান-সভা। কিন্তু বেলফাস্টে দেখেছি—অতি চমৎকার পরিবেশে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত এক পার্লামেণ্ট-গৃহ আছে, তাতে কেবল লণ্ডন পার্লামেণ্টের উচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণ করা হয়।

যদিও কেম্ব্রিজের ধরনের পুরানো কলেজ ডাবলিনে আছে এবং আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সেখানে বর্তমান, তবু স্বাধীনতার পর এখানে নতুন ক'রে এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। উগ্র স্বাধীনতা বোধের দরুন গভর্ণমেণ্ট জোর ক'রে এ দেশের আদিম ভাষা (গেলিক্‌), চালাবার চেষ্টা করছে—প্রাইমারি স্কুল থেকে; কিন্তু বেশীর ভাগ লোক নাকি তা পছন্দ করে না। রাস্তার নাম সব ঐ ভাষায়, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীও আছে। ডাবলিনের

বিখ্যাত Horse Show (ঘোড়দৌড়) দেখাও হ'ল, কারণ ঐ সময়ে আগা খাঁ ট্রফি খেলা হচ্ছিল। অশ্বচালনার দক্ষতা নিয়ে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে প্রসারিত হাউথ (Howth) নামে একটি ছোট পাহাড়, একদিন সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথে সেখানে একা চলেছি, দু-পাশেই দৃষ্টি দিগন্ত-প্রসারিত, হঠাৎ ভীষণ কিচির-কিচির শব্দে চমক ভাঙতে দেখি অসংখ্য পাখী (sea-gull) ও তাদের ছানাপোনা আমাকে দেখে চিৎকার ক'রে আপত্তি জানাচ্ছে। একটু বসে ফেরবার পথে দুটি রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা, তাঁদের সঙ্গে আলাপে জানলাম—এটাকে বলে 'Sanctuary of birds'—পাখীদের স্থান। পরদিন বেলফাস্ট ফিরলাম।

কয়েকদিন বেলফাস্টে থেকে আয়ার্লণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মানবদ্বীপ (Isle of Man) এর পাশ দিয়েই জাহাজ যায়। ও দেশের লোকেরা বলে এক দৈত্য আয়ার্লণ্ডের খানিকটা মাটি তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাই থেকেই এই দ্বীপের এবং আয়ার্লণ্ডের ভিতরে নীঘ (Neagh) হ্রদের উৎপত্তি।

এ-রকম দৈত্যের কাহিনী আয়ার্লণ্ডে আরও অনেক শুনেছি। যখন ব্যালিণ্টয় গেছলাম, উত্তর সমুদ্রতীরে জ্যামিতিক আকার-বিশিষ্ট কতকগুলি লাভা-স্তম্ভ (pillars of lava) দেখেছিলাম। তার নাম দেওয়া হয়েছে Giant's causeway (দৈত্যের সেতু)।

এবার কেবিন রিজার্ভ থাকায় রাত্রে শুয়ে এলাম, কিন্তু আগস্ট মাস ব'লে গরমে কষ্ট হয়েছিল। সকালে ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ ক'রে কাছেই এখানকার পশ্চিম উপকূলের নামকরা অবসর কাটাবার স্থান 'মোর কাম্বে' দেখে নিলাম। অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপকূলে এক জায়গায় সমুদ্রের এক মাইল ভিতর পর্যন্ত যাবতীয় আমোদের ব্যবস্থা। রাত্রের আলোকসজ্জা অবশ্য আমার দেখা হয়নি—তা নাকি অবর্ণনীয়। বিকালের দিকে লীড্‌সে আমার বাসায় ফিরলাম।

(ক্রমশঃ)

পথিক

শ্রীমতী গীতা হাজরা

জীবন-পথের পথিক আমি
নেই যে পথের শেষ,
আমার ব'লে নেইকো কিছুই
নেই যে আমার দেশ।

সবার মাঝে পাইগো আমি
তোমার দেখা জগৎস্বামী
পথ চলতেই পাই যে আমি
তোমারি নির্দেশ।

কভু যদি চলার পথে
আঁধার আসে ঘিরে,
না পাই আমি পথের দিশা
ভাসি আঁখি-নীরে,

জানি আমি জানি মনে
দেখা হবে তোমার সনে,
প্রাণের বীণা উঠবে বেজে
সেদিন প্রাণেশ!

তুমি আমার প্রাণের মাঝে
ঘুমিয়ে আছো ব্যথায় লাজে
জীবন-পথে সাথে সাথে
চলেছ অশেষ!

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

মনঃসংবোধননিয়মনম্

মনোনিয়মনে দক্ষ পুরুষেরই যতিত্ব সহজলভ্য; সুতরাং মনকে সম্বোধন করিয়া তাহাকে সংযত করিবার উপায় কথিত হইতেছে :

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহুধা
প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি হৃদয় ক্লেশকলিতম্ ।
প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তামণিগণো
বিবিক্তঃ সঙ্কল্পঃ কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে ॥৬১॥

হে চিত্ত! প্রতিদিন অনুবর্তনাদি বিবিধ উপায়ে অপরের চিত্ত তোষণ করিয়া বহু আয়াস-লভ্য তাহার প্রসন্নতার জন্য তুমি কেন প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি সর্বসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া অন্তরে সমাহিত হইলে বিনা প্রযত্নেই সর্বাভীষ্টদায়ী সাত্ত্বিক চিন্তারত্নসমূহ আবির্ভূত হইবে—অর্থাৎ তোমাতে দৈবী সম্পদ্ প্রকটিত হইবে। সর্বসঙ্কল্পরহিতাবস্থা তোমার কোন্ বাঞ্ছা পূরণ করিবে না? অর্থাৎ সবই পূরণ করিবে। অতএব অপরের প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা পরিত্যাগ করত আত্মচিন্তনে সমাহিত হওয়াই কল্যাণার্থীর একমাত্র কর্তব্য।৬১

পরিভ্রমসি কিং মুধা ক্বচন চিত্ত বিশ্রাম্যতাং
স্বয়ং ভবতি যদ্ যথা ভবতি তত্তথা নান্যথা।
অতীতমননুস্মরন্নপি চ ভাব্যসঙ্কল্পয়-
ন্নতর্কিত-সমাগমাননুভবামি ভোগানহম্ ॥৬২॥

প্রারব্ধই যাবতীয় সুখদুঃখের নিয়ন্তা। অতএব অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করত পরমেশ্বরে মন সমাহিত করাই কর্তব্য, তাই কথিত হইতেছে :

হে চিত্ত, কেন তুমি বৃথা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছ? কোথাও (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) বিশ্রাম লও। যাহা যেরূপে হইবার তাহা বিনা প্রযত্নেই সেরূপ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা কখনও হয় না। (তুমি শান্ত হইলে) অতীতের অনুচিন্তন ও ভবিষ্যতের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আমি দৈববশে প্রাপ্ত বিষয়সমূহই ভোগ করিব। অর্থাৎ প্রারব্ধপ্রেরিত বিষয়সমূহই আমরা ভোগ করিয়া থাকি; অতএব হে চিত্ত, তুমি শান্ত হও, আমার জন্য তোমার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।৬২

এতস্মাদ্বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকাদাশ্রয়
শ্রেয়োমার্গমশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ।
স্বাত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং গতিং
মা ভূয়ো ভজ ভঙ্গুরাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাধুনা ॥৬৩॥

হে চিত্ত! সর্বদুঃখের মূল এই রূপরসাদি বিষয়ের ঘোর অরণ্য হইতে উপরত হও, অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখপ্রদ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ কর; নিখিল সন্তাপনাশে সমর্থ শ্রেয়োমার্গ (জ্ঞানমার্গ) অনুসরণ কর; জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল স্বীয় ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ করত আত্মভাব-লাভে তৎপর হও; ক্ষণস্থায়ী সংসারভোগে আর চঞ্চল হইও না; এখন শান্ত হও, চিত্তের প্রশান্তি বিনা শত পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারাও শ্রেয়ঃ বা পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না।৬৩

মোহং মার্জয় তামুপার্জয় রতিং চন্দ্রার্ধচূড়ামণৌ
চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবামাসঙ্গমঙ্গীকুরু।
কো বা বীচিষু বুদ্বুদেষু চ তড়িল্লেখাসু চ শ্রীষু চ
জ্বালাগ্রেষু চ পন্নগেষু চ সুহৃদ্‌বর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥৬৪॥

বিষয়সুখ-ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করত শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইবার জন্য স্বচিত্তকে সম্বোধন করিয়া সাধক কবি বলিতেছেন: হে চিত্ত! পুত্রমিত্রাদিতে আসক্তিজনক মোহ পরিত্যাগ কর; যাঁহার শিরে চন্দ্রার্ধ শোভা পাইতেছে তাঁহার প্রতি অনুরাগ-পরায়ণ হও; সুরনদী মন্দাকিনী বা ভাগীরথীর পবিত্রতীরে বাস করিবার জন্য একান্তভাবে ইচ্ছুক হও; ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। অন্য কোন বস্তুতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। জলের তরঙ্গে বা বুদ্বুদে, চঞ্চল বিদ্যুতে বা সম্পদে, অগ্নিশিখায়, বিষধর সর্পে বা কপট বন্ধুবর্গে বিশ্বাস কি?৬৪

চেতশ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া
ভূপালভ্রূকুটীকুটীবিহরণ-ব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্।
কন্থাকঞ্চুকিনঃ প্রবিশ্য ভবন-দ্বারাণি বারাণসী-
রথ্যাপঙ্‌ক্তিষু পাণিপাত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে ॥৬৫॥

কবি প্রকারান্তরে চিত্তকে সম্বোধন করিতেছেন: হে চিত্ত! রাজন্যবর্গের ভ্রূকুটীরূপ কুটীর-বিহারিণী চঞ্চল বারবিলাসিনী তুল্যা অস্থিরপ্রকৃতি এই লক্ষ্মীকে তুমি কখন সাদরে আকাঙ্ক্ষা করিও না। বরং আমরা কন্থাবৃতগাত্রে পবিত্র বারাণসী-ক্ষেত্রে পথিপার্শ্বস্থ গৃহদ্বারে ভিক্ষালাভার্থ প্রবেশ করিয়া পাণিপাত্রে যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষামাত্রেই পরিতৃপ্ত থাকিব।৬৫

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাল্লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্।
যদ্যস্ত্যেবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নো চেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্বিকল্পে সমাধৌ ॥৬৬॥

সংসার হইতে বিরত হইবার জন্য স্বচিত্তকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন: সম্মুখে প্রবীণ গায়কবৃন্দের সুমধুর সঙ্গীত, উভয় পার্শ্বে দক্ষিণদেশীয় সরস কবিগণের স্তুতি এবং পশ্চাতে চামরধারিণী রমণীগণের বীজন-জনিত হস্তস্থিত মণিকঙ্কণের ঝঙ্কার—যদি এই সমস্ত ভোগ-সামগ্রী তোমার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে হে চিত্ত! সংসার-ভোগাস্বাদনে লোলুপ হও; নতুবা অবিলম্বে বিকল্পরহিত গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হও।৬৬

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥৬৭॥

বিচারদৃষ্টিতে ঐশ্বর্যলাভ বা শক্রজয়াদি—এ সমস্তই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহা হৃদয়ঙ্গম করত শ্রদ্ধা সহকারে বৈরাগ্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাই বলা হইতেছে: হে চিত্ত! নিখিলকামনা-পূরণকারক ঐশ্বর্যাদি লাভ হইলেই বা মনুষ্যের কি সার্থকতা? শক্রমস্তকোপরি পদস্থাপনে, অর্থাৎ অশেষ শক্র বশীকরণেই বা প্রয়োজন কি? অর্থাদি দ্বারা সুহৃদ্বর্গের মনস্তুষ্টি সাধিত হইলেই বা কি ফল? এবং যোগাভ্যাসদ্বারা এককল্পস্থায়ী শরীর-লাভেই বা কি সার্থকতা?৬৭

ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তা
বৈরাগ্যমস্তি কিমিতঃ পরমর্থনীয়ম্ ॥৬৮॥

তাহা হইলে শ্রেয় সাধন কি, তাহাই বলা হইতেছে: হে চিত্ত! শ্রীসদাশিবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হও, জন্ম ও মৃত্যুভীতি সদা স্মরণ কর, স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিতে মমতা পরিত্যাগ কর, কামপ্রযুক্ত হইয়া স্ত্রী-পারবশ্যাদি বিকারসমূহ অন্তরে স্থান দিও না, সঙ্গদোষরহিত নির্জন বন-প্রদেশে বাস কর—ইহাই বৈরাগ্য; এই বৈরাগ্য ভিন্ন প্রার্থনার যোগ্য আর কি থাকিতে পারে? অর্থাৎ বৈরাগ্যই একমাত্র পরম শ্রেয়ের সাধন।৬৮

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাসি
তদ্‌ব্রহ্ম চিন্তয় কিমেভিরসদ্বিকল্পৈঃ।
যস্যানুষঙ্গিণ ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতা ভবন্তি ॥৬৯॥

যেহেতু বৈরাগ্যই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু, অতএব হে চিত্ত! অনিত্য বিকল্প অর্থাৎ বিষয়-ভোগপ্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বিষয়ক ব্যর্থ বিচারে কি প্রয়োজন? ব্রহ্মবিচারপরায়ণ হইলে ত্রিভুবনের আধিপত্যরূপ ভোগাদি দাসের ন্যায় অনুসরণ করে; কিন্তু ঐগুলি মূর্খ অজ্ঞানী জনগণেরই পরম আদরণীয়, বিদ্বান্‌গণের ঘৃণার বস্তু; অতএব সেই অনন্ত, জরামরণরহিত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বব্যাপী, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হও।৬৯

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্‌মণ্ডলং ভ্রমসি মানস চাপলেন।
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি যেন ॥৭০॥

বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়া কবি বলিতেছেন: হে চিত্ত! তুমি বিষয়াসক্তিজনিত চপলতা বশতঃ কখন রসাতলে অতি নিম্নে প্রবেশ করিতেছ, কখন আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অতি উর্ধ্বে যাইতেছ, কখন বা দিক্‌চক্রবালে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু যাঁহার স্মরণে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, হৃদয়স্থিত বিমল সেই ব্রহ্মের চিন্তা কখন ভুলিয়াও করিতেছ না।৭০

নিত্যানিত্য-বস্তুবিচার:

বেদাধ্যয়ন, স্মৃতিশাস্ত্র পর্যালোচনা, শাস্ত্রপঠন ও পুরাণশ্রবণাদির দ্বারা স্থায়ী লাভ কিছুই হয় না; কিন্তু বিচার অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সহায়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারাই সেই নিত্য মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে—কবি মুমুক্ষুগণকে ইহাই উপদেশ দিতেছেন:

কিং বেদৈঃ স্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈর্মহাবিস্তরৈঃ
স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ।
মুক্ত্বৈকং ভবদুঃখভাররচনাবিধ্বংসকালানলং
স্বাত্মানন্দপদপ্রবেশকলনং শেষৈর্বণিগ্‌বৃত্তিভিঃ॥৭১॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও অপরাপর অতি বিস্তৃত শাস্ত্রসমূহের পঠন দ্বারা কি লাভ? স্বর্গরূপ গ্রামস্থ কুটীরে নিবাসই যাহার ফল—এইরূপ স্বর্গফলদায়ী স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, যাগাদি কর্মানুষ্ঠান-বিভ্রমেরই বা কি প্রয়োজন? এই মহাসংসারদুঃখ-রচনাসমূহের বিনাশকারী প্রলয়াগ্নিসদৃশ একমাত্র ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি সম্পাদন বিনা আর সব কিছুই জীবিকাসাধনরূপ বণিগ্‌বৃত্তিমাত্র।৭১

যতো মেরুঃ শ্রীমান্নিপততি যুগান্তাগ্নিবলিতঃ
সমুদ্রাঃ শুষ্যন্তি প্রচুরতরমকরগ্রাহনিলয়াঃ।
ধরা গচ্ছত্যন্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃতা
শরীরে কা বার্তা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে॥৭২॥

যখন প্রলয়াগ্নিকবলিত হইয়া অতুল সমৃদ্ধিমান্ সুমেরু পর্বতও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অগণিত গ্রাহ-মকরাদির আবাসস্থান অগাধ সমুদ্রসকলও শুষ্ক হইয়া যায়, ভীমকায় পর্বতপ্রান্তদেশ দ্বারা ধৃত ও সুরক্ষিত এই পৃথিবীও যখন কালবশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন হস্তিশাবকের কর্ণাগ্র-ভাগের ন্যায় চঞ্চল এই মানবদেহের অবশ্যম্ভাবী ভঙ্গুরত্বের আর কি কথা।৭২

গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলি-
র্দৃষ্টির্নশ্যতি বর্ধতে বধিরতা বক্ত্রং চ লালায়তে।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্যা ন শুশ্রূষতে
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোঽপ্যমিত্রায়তে॥৭৩॥

জরাকবলিত মানুষের দুর্দশা বর্ণিত হইতেছে: হায়! জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মানবের কি দুরবস্থাই না হইয়া থাকে! তাহার শরীর সঙ্কুচিত, চলচ্ছক্তি নষ্ট, দন্তপঙ্‌ক্তি পতিত ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। কর্ণের বধিরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মুখগহ্বর হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, বন্ধু

জনেরাও তাহার কথার কোন সমাদর করে না, আপন স্ত্রী পর্যন্ত তাহার সেবা করিতে অনিচ্ছুক হয় এবং প্রিয় পুত্রও অনাত্মীয়বৎ প্রতিকূল আচরণে তৎপর হইয়া থাকে।৭৩

বর্ণং সিতং ঝটিতি বীক্ষ্য শিরোরুহাণাং
স্থানং জরাপরিভবস্য তদা পুমাংসম্।
আরোপিতাস্থিশতকং পরিহৃত্য যান্তি
চণ্ডালকূপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ ॥৭৪॥

বৃদ্ধের ধবলকেশরাশি দর্শন করত জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে শত অস্থিখণ্ড-বেষ্টিত ঘৃণ্য চণ্ডাল-কূপ-সদৃশ হেয়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া যুবতীগণ অতি শীঘ্রই দূরদেশে গমন করিয়া থাকে।৭৪

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্যঃ প্রযত্নো মহান্
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥৭৫॥

শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকিতে থাকিতে, জরাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, ইন্দ্রিয়সমূহ সবল সমর্থ থাকাকালে এবং আয়ু নাশ না হইতেই বিবেকিগণের আপন কল্যাণের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদি উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য। নতুবা গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কূপ খনন করিবার উদ্যম বৃথা। গৃহদাহকালে কূপ-খনন যেরূপ নিষ্ফল, বৃদ্ধাবস্থায় রোগজীর্ণ শরীরে সাধন-ভজন সেইরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শরীর সুস্থ থাকিতেই জ্ঞানলাভের জন্য তৎপর হইবেন।৭৫

তপস্যন্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং
গুণোদারান্ দারানুত পরিচরামঃ সবিনয়ম্।
পিবামঃ শাস্ত্রৌঘানুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্
ন বিদ্মঃ কিং কুর্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে ॥৭৬॥

মানবজীবন কতিপয় নিমেষমাত্রস্থায়ী। এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কোন্‌টি যে করিব তাহা বুঝিতে পারি না। তপশ্চর্যায় নিরত হইয়া ভাগীরথী-তটে নিবাস করিব? অথবা গুণবতী রম্যা পত্নীগণের সপ্রেম পরিচর্যা করিব? কীর্তি প্রতিষ্ঠাদি লাভের নিমিত্ত সাংখ্য-বেদান্তাদি শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইব? অথবা বিবিধ কাব্যালঙ্কারাদির রসপানেই তৎপর হইব? ৭৬

দুরারাধ্যাশ্চামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভুজো
বয়ং চ স্থূলেচ্ছাঃ সুমহতি ফলে বদ্ধমনসঃ।
জরা দেহং মৃত্যুর্হরতি দয়িতং জীবিতমিদং
সখে নান্যচ্ছ্রেয়ো জগতি বিদুষোঽন্যত্র তপসঃ ॥৭৭॥

তুরগ সদৃশ চঞ্চলচিত্ত ভূপতিগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করা বড়ই কঠিন, আর বহুধনাকাঙ্ক্ষী আমাদের আশাও বিরাট; এদিকে জরাবস্থা ধীরে ধীরে দেহকে ও কাল পরম প্রিয় জীবনকে কবলিত করিতে সমুদ্যত। হে সখে! বিবেকিগণের নিকট এ সংসারে একমাত্র তপশ্চর্যা ব্যতীত আর কিছুই কল্যাণপ্রদ নাই।৭৭

মানে ম্লায়িনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যর্থে প্রযাতেঽর্থিনি
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈর্যৌবনে।
যুক্তং কেবলমেতদেব সুধিয়াং যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ-
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরতটীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্বচিৎ ॥৭৮॥

যখন প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, ধনসম্পত্তি বিগত হয়, যাচকবৃন্দ গৃহদ্বারে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, পুত্রমিত্রাদি বন্ধুজন অন্নভাবে কৃশতা প্রাপ্ত হয়, বেতনাদি না পাইয়া ভৃত্য-পরিজনবর্গ প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ও যৌবন ধীরে ধীরে নাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন গঙ্গাবারিপূত পাষাণময় হিমগিরিগুহা-সমীপস্থ লতামণ্ডপাদিতে কোথাও নিবাস করাই বুদ্ধিমান্ পুরুষের একমাত্র কর্তব্য।৭৮

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসমাগমাগতসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
সর্বং রম্যমনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ॥৭৯॥

বিমল চন্দ্রকিরণ বড়ই মনোহর—সন্দেহ নাই, তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল বনমধ্য ভূমিও নয়নানন্দদায়ক, বিদ্বজ্জনসমাগমজনিত আনন্দও কাম্য ও চিত্তের শান্তিবিধায়ক বটে, কাব্যনাটকাদির বিচিত্র উপাখ্যানাদিও তৃপ্তিদায়ক, প্রণয়কলহজনিত ক্রোধবশতঃ উৎপন্ন অশ্রুবিন্দু দ্বারা শোভমান প্রেয়সীর মুখপঙ্কজও বড়ই মনোরম, সন্দেহ নাই—কিন্তু নিত্যানিত্যবস্তুবিচার জাগ্রত হইলে এ সকল রম্য পদার্থই নিতান্ত তুচ্ছ ও অসার বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।৭৯

রম্যং হর্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রব্যং ন গেয়াদিকং
কিং বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে।
কিংতু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ ॥৮০॥

প্রাসাদোপরি সুরম্য প্রদেশ কি নিবাসার্থ সুখপ্রদ নহে? সুমধুর গীতবাদ্যাদিও কি শ্রবণসুখ সম্পাদন করে না? প্রাণসমা প্রিয়তমার সমাগমও কি অতি সুখাবহ নহে? সাংসারিক দৃষ্টিতে এ সমস্তই সুখদায়ক বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি বস্তুবিচার-কুশল বিবেকী পুরুষগণ এ সকলই—অগ্নির রূপে মুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষকম্পনোদ্ভূত বায়ু দ্বারা আন্দোলিত দীপশিখার চঞ্চল ছায়ার ন্যায় নশ্বর জানিয়া (শাশ্বত ব্রহ্মানন্দের সাধন তপশ্চর্যা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত) বনেই গমন করিয়া থাকেন।৮০

রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র নহে, একথা শুধু যাহা ঘটিয়াছে তাহারই পুনরুক্তি মাত্র, সুতরাং নিতান্ত মামুলি মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ-প্রমাণের প্রয়াসের মতো। কিন্তু এই মহাদেশের বিরাট আত্মার, অসীম মহিমার, অতুল বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি তাঁহার মনের মুকুরে কিরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল—তাহা সমগ্রভাবে জানা অনাবশ্যক বা বাহুল্য নহে। বিশেষতঃ বর্তমানে, যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিবার বা মুছিয়া ফেলার দিকে নানা শক্তি, নানা মতবাদ ভিতরে ও বাহিরে চেষ্টা করিতেছে।

ভারতীয় ভাবসম্পদের সন্ধান

রবীন্দ্র-মনীষা ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তব্যাপী মানস-সরোবরের পূর্ণ-প্রস্ফুট শতদল। তাঁহার লেখমালার সহিত নিবিড় পরিচয়ের সাথে ইহা সুস্পষ্ট বোধ হয়। তাঁহার আসন্ন জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সেই ঘনিষ্ঠতার সূচনা ও সুযোগ। রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যান্য দিক্—তাঁহার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, কাব্যকলা, রসতত্ত্ব, নৃত্য-গীত নাট্যে অবদান, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও জীবনদর্শন সাধারণতঃ সংক্ষেপে বা সবিস্তারে আলোচিত হইলেও ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁহার অন্তরের প্রকাশ এখনও লোকলোচনের অনেকখানি অন্তরালে রহিয়াছে। অথচ ইহাই ছিল যুগে যুগে ভারতের প্রাণের কথা—পরম আগ্রহের বস্তু। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনন-সম্পদও বিপুল ও বহুমুখী। বিষয়ানুসারে বিন্যাস করিয়া এই সমগ্র ভাবধারার অনুশীলন এখনও সমর্থ আলোচকের অপেক্ষা করিতেছে। উপস্থিত আলোচনা তাহারই একটি প্রস্থ। শাশ্বত ভারতের কোন্ চিত্র তাঁহার মানস-পটে অঙ্কিত হইয়াছে? তাঁহার বিশাল গ্রন্থরাজি নানাজাতীয় সুরভি কুসুমের কানন-প্রায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে তাঁহার অনুভব ও চিন্তা এখানে স্বাভাবিক শোভায় বিকশিত। ভাবের ঐক্য, বিষয়ের মিল অনুসারে সেগুলিকে এই প্রবন্ধে চয়ন ও একত্র করিয়া স্তবকের মত সাজানো হইয়াছে—অনেক স্থলে বিনা মন্তব্যে। রবির প্রভা স্ব-প্রকাশ ও বর্ণচ্ছটায় অনুপম। সেই আলোকে উক্তিগুলির যোগসূত্রও স্বতঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর মুখবন্ধে আছে—'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত।'

কবি বলিতেছেন, 'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা।'

অন্যত্র তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন, 'আমরা ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব, একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না।'

ভারতের অসামান্যতা

সকল জাতি সমান—এই মতবাদের প্রতিবাদে তাঁহার অভিমত, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই—এ কুসংস্কার বর্জন না করিলেই নয়।' 'আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে, তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে

পারে।' ভারতের একটা আন্তর জীবন, মানস ইতিবৃত্ত আছে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। 'রাজনৈতিক ঘটনার দুঃস্বপ্নের অন্তরালে প্রকৃত দেশ।' 'পাঠ্য গ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ—বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে।'

অমর অতীত

শান্তিনিকেতনে নববর্ষের ভাষণে কবির উক্তি —'আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চির-নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার।' 'নূতনত্বের মধ্যে চির-পুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমিয় যৌবন-সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়।' 'জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা যাচু করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রকৃতি আপনার কাজ আপনি করিতে থাকিবে।' 'কথা'র উপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন:

'হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও কথা কও,
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী
অচেতন তুমি নও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া,
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।'

ব্যাপক বিষয়বস্তু

সাময়িক, পরিবর্তনশীল ঘটনার অন্তরালে চিরন্তন ভারতের তিনি দ্রষ্টা। 'আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন'—তাহাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে রবীন্দ্রনাথের লেখনী কতখানি ও কতভাবে নিরত ছিল, তাহার শুধু উল্লেখেই একটা বৃহৎ তালিকা হইয়া যায়। 'ভারততীর্থ' সঙ্গীতে উদাত্ত ছন্দে যে অখণ্ড শাশ্বত দেশ-জননীর স্তুতি-মন্ত্র উদীরিত, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম, সঞ্চয়, পরিচয়, কালান্তরের সংযোজন, 'পথের সঞ্চয়' নামে গ্রথিত প্রবন্ধরাজিতে তাহার অনুধ্যান ও আলোচনা। কথা ও কাহিনীতে, বাল্মীকি-প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, অচলায়তন, নটীর পূজা, প্রভৃতি কাব্য-নাটকে তাহার রূপারোপ। শান্তিনিকেতন-ভাষণ-পরম্পরায় নানাস্থলে তাহারই মর্মকথা ধর্মতত্ত্ব-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

এ সকল হইতে আহরণ করিলে চিরন্তন ভারতের অধ্যাত্ম মূর্তি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অনুভূতিতে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহার একটি সমগ্র বিবরণ সঙ্কলিত হইতে পারে; এবং ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁহার চিন্তার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে পরিস্ফুট হইতে পারে।

আরণ্য সভ্যতা

শান্তিনিকেতনের মূলে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দিব্য প্রেরণা। কিন্তু শাখা-স্কন্ধ পুষ্পপল্লবে ইহার প্রসার রবীন্দ্রনাথের সাধনা। ইহার ভাববীজ তপোবন ও আশ্রম। ভারতের আরণ্যক সংস্কৃতির মর্ম-প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টি অপূর্ব ও অনুপম। বিশ্বভারতীর আদর্শের সূচনায় তাঁহার কথা: 'শান্তিনিকেতনের বীজ আশ্রম-বনস্পতিতে অমর।'

কবি লিখিয়াছেন—'এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করিয়াছে।' 'প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবন-দৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করেনি। বিরলবসন তপস্বীদেরই

আপনাদের আদিপুরুষ ব'লে জেনে রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন।' 'তপোবনের বিশেষ রস শান্তরস—পরিপূর্ণতার রস। সাতটা রঙ মিলে যেমন সাদা চিত্রের নানা বিভক্ত প্রবাহ নিখিলের সহিত সামঞ্জস্যে কানায় কানায় ভরে শান্ত রসের উদ্ভব।'

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পুণ্যতীর্থ

প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য ও মহিমার আবির্ভাবে ভারতের তীর্থস্থান। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ পবিত্র, বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গঙ্গা যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। 'জগৎকে ভারত পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, উপভোগের দ্বারা খর্ব করেনি।' চৈতালির 'বন' 'তপোবন', 'সভ্যতার প্রতি' প্রভৃতি চূর্ণক কবিতায় এই সকল ভাব ছন্দিত, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র নানা স্থলে উহা প্রতিধ্বনিত। 'অন্য দেশ (যথা আমেরিকা) অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, ভোগের বস্তু করেছে, যোগের আশ্রম করেনি।' ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্য স্থান হ'য়ে ওঠেনি। তপোবনই ছিল ভারত-সভ্যতার চরম নিদর্শন, 'নিখিল প্রকৃতির সাথে আত্মার মিলনকে শান্ত সমাহিত উপলব্ধি ভারতের একমাত্র সাধনা।' 'জবরদস্তি দ্বারা য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণ করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—'আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে। মনের তপস্যা—জ্ঞানের তপস্যায় নয়, কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষায় নয়, বোধের তপস্যায়।'

সর্বময়ী প্রকৃতি

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতির সাথে যোগ একটি মূল সূত্র, বিরাট আলোচ্য বস্তু। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের মত, 'সা প্রাসাদে দিশি দিশি চ সা, পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা।' তাঁহার কথায় 'রাম-বনবাসে আরণ্য প্রকৃতি সজীব ও সরস হইয়াছে মানুষের প্রেমের স্পর্শে।' ভারত-সভ্যতার যেরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির প্রভাবে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু 'প্রকৃতির সহিত ইহার সংযোগ পূর্ণতার জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।'

প্রকৃতির সাধনায় স্পর্ধা না বিনম্রতা ?

শান্তিনিকেতন (৩৬ পর্যায়)এ আছে—'প্রকৃতির সাধনায় অন্নপূর্ণার বরলাভ। কিন্তু মঙ্গলের নিয়ম ধর্মনীতি। ধর্মনীতি মানুষের শেষ সম্বল। নিয়ম-শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল।' 'সর্বশক্তিমানের আসন দখল করা আজ সভ্যতার অভিমান।' কবি বলেন, 'শক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে প্রতি-যোগিতা—অর্জুনের কিরাত-বেশী মহাদেবকে বাণ মারা—তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর সঙ্গে স্পর্ধা ক'রে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে; ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।' 'শক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দুই মূর্তি। এক অন্নপূর্ণা—ঐশ্বর্যের শক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। আর এক করালী কালী—আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ ক'রে নেয়। পাওয়ার মূর্তি খুব উজ্জ্বল সুন্দর, কিন্তু খাওয়ার মূর্তি বিষাদে পরিপূর্ণ, ভয়ঙ্কর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান। এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়।' 'পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগ, এই যোগে অহংকারকে দূর ক'রে বিনম্র হয়। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি।' 'যেমন বায়ুর নিত্য প্রবাহ। শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশী। ঝড় সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্য-কাল বেষ্টন ক'রে থাকে।'

বাস্তবে পরিণত আদর্শ

এই মহাদেশের প্রকৃতি-নির্ণয়ে তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ কোন বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসংগত বোধে কোন দিন ভীরুতাবশতঃ কথায় কথা করিয়া রাখে নাই!' 'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী, কর্মে যোগ-সাধনা।' নিখিলের সাথে যোগ, ভূমার উপলব্ধি, সর্বজীবের ঐক্য, একান্ত অহিংসা, সর্বত্যাগ—শুধু চিন্তার বস্তু হয় নাই, সাধনার সামগ্রী—বাস্তব আদর্শ এদেশেই হইয়াছিল। 'প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য ক'রে তোলবার জন্য অনুশাসন ছিল।' জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা ছিল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ লক্ষ্য এবং ধর্মাচরণের ভিত্তি। তিনিই উদাহরণ দিয়াছেন: 'এক সময়ে যে ভারত মাংসাশী ছিল—সেই ভারত আজ প্রায় সর্বত্র নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।' 'এই হিংসা ত্যাগ না করিলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগ-সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত ক'রে দিতে থাকে।' ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত: 'অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে ও সমস্ত মনে গ্রহণ করিতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র ব'লে মনে করি। এই নদীর ভিতর দিয়া পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন।' 'স্নানের জল, আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা, সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়। অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন—এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভব।'

উপনিষদের প্রেরণা

শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায় উপনিষদের মন্ত্রগুলির নানা ব্যঞ্জনা সর্বত্র অনুস্যূত। উপনিষদের ভিতর দিয়া প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ-দেশের সকল অধ্যাত্মদর্শনের ইহা উপজীব্য—শ্রুতি-প্রস্থানরূপে শিরোধার্য। উপনিষৎ—কবির ভাষায়—ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। ইহার মধ্যে 'ঈশা বাস্যমিদং' সর্বাধিক সমাদৃত—এই একটি মন্ত্র ভারতীয় জীবনদর্শনের বীজস্বরূপ। ইহা নানাস্থলে তিনি দেখাইয়াছেন। উপনিষদের অপর মন্ত্র: 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্'—ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার উৎসস্বরূপ—ইহার তাৎপর্য নানাস্থলে তিনি বিস্তারিত করিয়াছেন। উপনিষদের সূক্তিগুলি কনক-কিঙ্কিণীর মতো শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায় ঝঙ্কৃত। ভুবনেশ্বর-মন্দির দর্শনে কবিচিত্ত উদ্‌বুদ্ধ হয় বুদ্ধোত্তর নব হিন্দুধর্মের মর্মকথায়: 'উহা ছিল সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা—আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার—দেবতাত্মায় অখিলের একাত্মতা।' রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর সর্বত্র, ইহা অতি পুরাতন কথা—মহাপুরুষগণের কার্য পৃথিবীর প্রাচীনতম কথা নূতন করিয়া তোলা।'

গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বিশ্বের আলোক

ভগবদ্‌গীতাকে কবি 'ভারত-ইতিহাসের চরম তত্ত্ব—মহাভারতের সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি' বলিয়াছেন। 'জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে ইহা সকল পথের চৌমাথায় চরম লক্ষ্যের আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।' 'ভারত-চিত্তের সকল প্রয়াস এক মূল সত্য—পরিপূর্ণ মানব-জীবনের যিনি পরমা গতি—সকল তত্ত্বের কেন্দ্র-স্থল—তাহাতে মিলিত হইয়াছে।' 'ব্রহ্মসূত্রে

কেবল আর্যধর্ম কেন, সমস্ত মানবের ধর্মের এক আলোক।'

পুরাণ-মহাকাব্যে জাতির প্রাণ

ভারতের পুরাণেতিহাস ও বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্যের আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথ মনে হয়, যেন উদ্ভিদ্-মানযন্ত্র বা crescographএর মত হৃৎস্পন্দনের আলোকচিত্র তুলিয়া ধরিতেছেন। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন: 'নিশীথে দেবর্ষি নারদের বীণায় ভক্তির সুর আজও কম্পিত। তাঁহার সূক্ষ্ম ও সরস অনুভূতি এদেশের প্রাণ-গুহায় যুগযুগ-নিহিত রহস্য যেন ভাস্বর করিয়াছে।' 'রামায়ণে পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।' 'রামায়ণ ও মহাভারতের সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।' এগুলির শিক্ষা 'পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি।' 'উহাদের এই উপদেশ বিস্মৃত হইলে, পরিচয় বিলুপ্ত হইলে মানব-সভ্যতা কারখানা ঘরের জনতা মধ্যে নিশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে।'

মহাভারতে সূক্ষ্ম নির্মম অপক্ষপাত বিচার কাহাকেও রেহাই দেয় নাই। প্রত্যেক চরিত্রকে নিক্তির ওজনে যাচাই করিয়াছে—যথোচিত নিন্দা-প্রশংসা, মূল্যনিরূপণ করিয়াছে, কর্মফলের অধীন দেখাইয়াছে। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্যবীর্য মহত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া অনাসক্ত, সেখানে কবিও নির্মম। কৃষ্ণসখা পার্থের বীর্য ও কীর্তির জয়স্তম্ভ সমগ্র মহাভারত, কুরুক্ষেত্রে তাহার গৌরব-চূড়া। কিন্তু শেষে 'শ্রীকৃষ্ণের রমণীগণ দস্যুদলে আক্রান্ত হইলে গাণ্ডীব তুলিতে তাঁহার হস্ত অবশ।' এই ভাবে মনুষ্যেতিহাসের নিয়তি ও জীবনের পরিণতিকে মহাভারতকার বাস্তব চিত্রমালায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

শুচি ও উদাত্ত দৃষ্টি

'প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মহান্ ভাবের আনন্দে আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন' রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সরস লেখনীমুখে রূপ দিয়াছেন অশ্রান্ত সৃষ্টিতে। সাহিত্য-শাস্ত্রের নবরস-নির্ঝরের মধ্যে মুখ্যতঃ শান্ত, করুণ ও মধুরে তাঁহার স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। কিন্তু এগুলিতেই হউক বা বীর, হাস্য ও অদ্ভুতেই হউক, সর্বত্র একটি উদাত্ত, গম্ভীর সুর, শোভন অঙ্গীকার, সুকুমার স্পর্শ তাঁহার রচনার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। ইহা তাঁহার প্রতিভার স্বধর্ম, চিন্তার রীতি, রচনার পরিবেশ।

রবীন্দ্র-রচনার বৈশিষ্ট্য শুচিতা, সংযম ও শোভনতা। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে শালীনতার মর্যাদা সর্বত্র নিপুণ কুশলতার সহিত রক্ষিত। ইহা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ মনে হয়। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা তাঁহার বাণী—হীন ও পতিত, ক্রূর ও কুটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ তাঁহার লেখায় মনোরম হইয়া উঠে নাই। রমণীর আকর্ষণ সত্ত্বেও সন্ন্যাসীর অটল স্থৈর্য ও ব্রহ্মচারীর অনন্য দৃঢ়তা তাঁহার কল্পনায় মহনীয় হইয়াছে নানা স্থলে। বৈরাগ্য ও অবিচলিত নিষ্ঠার মধ্যে যে মানব-মহত্ত্ব তাহা নিপুণ রেখাপাতে সর্বত্র উজ্জ্বল। ত্যাগের তেজোদীপ্ত বল, ঐকান্তিক ভক্তি ও গভীর ধর্মবিশ্বাসের সর্বসহিষ্ণুতা, সতীর অনায়াসে মৃত্যু-বরণ—এ সকলের উদাত্ত কাহিনীতে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন—'সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ বলিষ্ঠ-ভীষণ, দারুণ-

সহিষ্ণু, উপবাসব্রতী কৌপীনধারী, নদীতীরে রৌদ্ররুদ্র ধূসর প্রান্তরে তৃণাসনে আসীন, সঙ্গহীন নিভৃতবাসী। যদি কখনো ঝড় আসে, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর পিঙ্গল জটাজুটের মধ্যে দীপ্ত চক্ষু জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার লৌহবলয় ও লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইবে।'—ইহা রবীন্দ্র প্রতিভায় ভারতীয় প্রেরণারই অভিব্যক্তি।

সভ্যতার বিভিন্ন ধারণা

তিনি বলিতেছেন—'প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্রের গ্রন্থে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এমনই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়।' ভারতের সভ্যতা ও প্রাণধারার রহস্য উন্মোচিত করিতে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠ ও অশ্রান্ত। মনীষা ও কল্পনা এই প্রকাশ-ভঙ্গিমার নিপুণ কিঙ্করী অন্তরের শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস নিত্য সহচর। 'পরিষ্কৃত বুদ্ধি, পক্ষপাত-শূন্য বিচার, নিঃস্বার্থ ও নির্মল উৎসাহ'—এই মর্মোদ্ভেদের বিপুল প্রয়াসের সহায়ক। তিনি বলিতেছেন—'বস্তু-প্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্মপ্রধান, মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' 'ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্মের নানা পাশ শিথিল করিয়া একদিকে সংসার-ব্রত-পরায়ণ, অন্যদিকে মুক্তির অধিকারী করা উন্নততম ও ভারতবর্ষের আদর্শ।' 'ভারত-বর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তুর দ্বারা স্ফীত করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে নিজের কাছে প্রত্যক্ষ গোচর করিতে পারি না বলিয়া, উহা আমরা ঠিক বুঝিতেছি না, উহা আমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতেছে না। অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব, একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না।' এই অক্ষমতার নিদান আধুনিক সদাব্যস্ত বিরামহীন উত্তেজনা-ময় জীবন-প্রণালী—যাহার ঘূর্ণিপাকে চিন্তার অবসর মিলে না। 'ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে ও জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যাহারা ভোগী তাহারা ভোগের নব নব উত্তে-জনায় ক্লান্ত। কারখানাগুলার ভিতরে বাহিরে চারিদিকে মানুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে শ্রমজীবীদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আবরু থাকে না।'

কর্মময়তা ও ধ্যানের অবকাশ

জীবনের ছন্দকে এই অতিদ্রুত সদাব্যগ্র বিক্ষিপ্ত গতিবেগ হইতে মুক্ত রাখা ভারতীয় পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য ছিল। 'ভারত-বর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে। লাগামপরা অবস্থায় মরা য়ুরোপের আদর্শ, জিন-লাগামপরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ—আমরাও একথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি। আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই জন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়। করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শ খুব বড়ো জিনিষ।' 'সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল, তাহার পর আত্মার অবাধ, অনন্ত গতি, তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে।'—ইহা এদেশের শেষ আশ্রম-ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব। 'বানপ্রস্থ ধনহীন উপকরণহীন জীবন-যাত্রার, প্রশস্ত পথে বাহির হওয়া।' 'কর্মের উত্তেজনাই পাছে কর্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের এই আশঙ্কা ছিল।' 'সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চায় নাই, সেই জন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ়, তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ।' (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথম ষট্ক—শ্রীধর-টীকাসহ) : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়। পৃঃ ৩৩৪ +৫৬+।৵০; মূল্য পাঁচ টাকা।

'উদ্বোধন' হইতে প্রকাশিত স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত গীতার অনুবাদক হিসাবে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের নাম পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। পূর্বরচিত গ্রন্থখানি প্রধানতঃ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে মূল অন্বয় এবং অনুবাদের পর শ্রীধরের সুবোধিনী-টীকা ও তাহার অনুবাদ রহিয়াছে। শ্রীধরী টীকাও 'ভাষ্যকারমতং সম্যক্' 'যথামতি সমালোচ্য' জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া সহজ সুবোধ্য ভাষায় লিখিত; শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামীর টীকার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। যাঁহাদের নিকট শঙ্করভাষ্য দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা যাহাতে শ্রীধরী টীকার রসাস্বাদন করিয়া গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, অনুবাদক সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই খণ্ডে আচার্য শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গীতামাহাত্ম্য সহ প্রথম ছয় অধ্যায়ের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি শীঘ্রই ইহার বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থের আদিতে 'অলৌকিক গীতাপাঠ' ও পরিশিষ্টে 'শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী' এবং 'শিবপূজা ও শিবরাত্রি' প্রভৃতি সংযোজনগুলি নিষ্প্রয়োজন, যুক্তিবাদী পাঠকের নিকট এগুলি আদৃত হইবে না। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এরূপ প্রচারমূলক নিবন্ধ থাকিবে না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীচিন্তন—শ্রীমদনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ১৭।১, বিন্দুবাসিনী রোড, ভাটপাড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯০; মূল্য টাকা ১'৫০।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শক্তিবাদ বিষয়ে যে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত শত শ্লোকের সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। চণ্ডীতে উক্ত 'রাজোবাচ', 'ঋষিরুবাচ', 'দেব্যুবাচ' বা 'নমস্তস্যৈ' প্রভৃতিকে এক একটি মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিলে তবে চণ্ডীর 'সপ্তসতী' নাম সার্থক হয়, কিন্তু এইগুলি ছন্দ হিসাবে কিভাবে এক একটি শ্লোক হইতে পারে—লেখকের ইহাই সংশয়। লেখকের মন্তব্য : চণ্ডীর কোন শ্লোকই গায়ত্রী বা উষ্ণিক ছন্দে রচিত নয়, অধিকাংশই অনুষ্টুপ ছন্দে বিরচিত, কয়েকটি উপজাতি বা বসন্ততিলক ছন্দে; অথচ পাঠকালে ঋষিছন্দে পূর্বোক্ত ছন্দগুলির নাম করা হয়। এরূপ আরও সংশয় তিনি পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দেবীভাগবত ও মহাভাগবতে শক্তিই যে পরব্রহ্মরূপিণী, লেখক ইহা প্রমাণসহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্গা জগদীশ্বরী, জগতের সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারিণী—শক্তিতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পর আর কোন 'পরিচিতি'র প্রয়োজন ছিল না।

এরূপ গ্রন্থে অত্যধিক বানান ভুল বা মুদ্রণ-প্রমাদ চক্ষুর পীড়াদায়ক।

তুহিন মেরু অন্তরালে—বসুধারা গুপ্ত। প্রকাশক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র-বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। পৃষ্ঠা—১২৭; দাম তিন টাকা।

ধর্মপিপাসু হিন্দুমাত্রেরই মনপ্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে হিমালয়ের পবিত্র তীর্থগুলি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। আলোচ্য পুস্তকে লেখিকা তাঁর বদ্রীনাথ ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ছ-মাস তুষার-শয্যায় শয়ান থাকেন বদ্রীনাথ—তাই বোধ হয় বইখানির এই নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু 'মেরু' বলতে কি ঐ অঞ্চলকে বোঝায়?

ট্রেনে বাসে ও হাঁটা পথে লেখিকা যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা সহজ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তীর্থে তীর্থে অব-স্থানের সময় যে সব সাধুসন্ত সাধকসাধিকা ও পর্যটকের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের কথাও তিনি বিবৃত করেছেন। পথের দুঃখ কষ্ট আনন্দ ও মাধুর্যের বর্ণনায় ভাষার স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে; তবে তীর্থস্থানগুলির বিবরণ ও মাহাত্ম্যের দিকটা কম ক'রে সঙ্গীদের বর্ণনাই করেছেন বেশী। স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক, গান ও কবিতার উদ্ধৃতি থাকায় বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৬৬) সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৬।

মহাপুরুষ-বাণী, কবিতা, প্রবন্ধাবলী সমন্বিত হ'য়ে পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পত্রিকাটি আত্ম-প্রকাশ করেছে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা: মধু-পরি-ক্রমার একদিক, নূতন-ভারত গঠনে ছাত্রসমাজ, স-এর সাম্রাজ্য (রস-রচনা)। —জীবানন্দ

সুরে কথামৃত—ছন্দরূপ: অজাতশত্রু, সুরসৃষ্টি: শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত যাদুকর, কল্পতরু প্রকাশনী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের ছায়া অব-লম্বনে এগারোটি সঙ্গীতের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে মূল উপদেশগুলি 'কথামৃত' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। লেখকের প্রচেষ্টা অভিনব ও প্রশংসনীয়। সুরগুলি সুন্দর। উচ্চভাব সুরসংযুক্ত হইলে সহজেই মর্মস্পর্শী হয়। গানগুলির মধ্যে মূল উপদেশের তাৎপর্য রক্ষিত হইলেও কোন কোন স্থলে ভাষার আবরণে ভাব অস্পষ্ট হইয়াছে।

চিরকালের গল্প (প্রথম ভাগ)—লেখক: প্রণবরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশক: লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

ইহাতে বুদ্ধ, যীশু ও রামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি উপদেশপূর্ণ গল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। মহৎ ভাব উদ্দীপনের জন্য এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপার অক্ষর সুস্পষ্ট 'গ্রেট' টাইপ হইলে নবস্বাক্ষরদের পড়িবার সুবিধা হইত।

—ষ. কা. রা.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২৩শে অক্টোবর বেলুড় মঠে স্বামী ওঁকারানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৯ খৃঃ বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে।

নূতন নির্মাণ-কার্য

রহড়া আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি আশ্রমের ছাত্র ও কর্মীদিগের জন্য একটি আরোগ্য-নিকেতন খোলা হইয়াছে। মেদিনীপুর আশ্রমে বহুমুখী বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হওয়ায় গত ২১শে ফেব্রুআরি সাধারণভাবে উহার উদ্বোধন হয়। এপ্রিল মাসে পাথুরিয়া-ঘাটা আশ্রম নরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হয়। গত ২৩শে এপ্রিল নরেন্দ্রপুরে বিদ্যালয়-ছাত্রদের জন্য নূতন ছাত্রাবাসের এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর সাধুকর্মীদের বাসভবন উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। নরেন্দ্রপুরে স্কুল ও কলেজ ভবনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর।

পাটনা আশ্রমে ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন ভারত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৬ই অক্টোবর; ঐদিন তিরুচিরাপল্লী জেলায় তপোবন আশ্রমে সম্প্রসারিত বিদ্যার্থী-ভবনের উদ্বোধন হয়। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে নার্সেস্ কোয়ার্টার্স সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৪ই অক্টোবর, ইহাতে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, ভারত সরকার একলক্ষ টাকা দিয়াছেন।

রহড়া আশ্রমে প্রার্থনালয় সহ নির্মিত মর্মরমূর্তি-সমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ১৬ই অক্টোবর; ঐ দিন রহড়া আশ্রমে অতিথি-ভবনেরও উদ্বোধন হয়।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের কর্মী-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন স্বামী প্রভবানন্দ গত ৮ই নভেম্বর। বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস্ হোমে 'শিল্প-পীঠে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৩ই ডিসেম্বর। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ২০শে ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাসে ইনস্টিটিউট অব্ কালচার গোলপার্কে স্থানান্তরিত হয়। ভবন-নির্মাণকার্য এখনও চলিতেছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর নাদিতে বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৬ই ফেব্রুআরি। সিঙ্গাপুরে ছাত্রাবাসের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ৬ই জুন। কলম্বো আশ্রমে আন্ত-র্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় ভারতের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক ১৭ই জুন।

নূতন কেন্দ্র

ক্ষেত্রীর যে ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ রাজ-অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি

এবং অন্ত একটি গৃহ গত ডিসেম্বরে রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত শাখাকেন্দ্রটির কার্যভার একটি ম্যানেজিং কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে।

সদস্য-সংখ্যা

১৯৫৯ খৃঃ মিশন গভর্নিং বডির দুইজন সদস্য হারাইয়াছে, তাঁহাদের নাম: স্বামী প্রবোধানন্দ ও স্বামী আত্মবোধানন্দ। বর্ষশেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৩৬ (সাধু ৩২৫, ভক্ত ৩১১)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া ডিসেম্বর মাসে মিশনের মোট কেন্দ্র-সংখ্যা ছিল ৭৪; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া; বাকী ৬০টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে ৯, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া। [মঠ-কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।]

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ: (১) রিলিফ (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা (৪) সাহায্য ৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: ১৯৫৯ খৃঃ অসময়ে প্রচুর বারি-বর্ষণের ফলে কয়েকটি প্রদেশ বন্যাপ্লাবিত হইয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই-এ মিশন হইতে ব্যাপক-ভাবে রিলিফ করা হয়।

আসামে শিলং-কেন্দ্র কামরূপে এবং করিম-গঞ্জ ও শিলচর-কেন্দ্র স্ব স্ব অঞ্চলে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বন্যার্তদিগকে প্রদান করেন। আসাম-রিলিফে মোট খরচ হয় ৩২,১০৩ টাকা, তন্মধ্যে বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতে ১৫,০০০ টাকা প্রেরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্য পরিচালিত হয় বেলুড় সারদাপীঠ, নরেন্দ্রপুর, রহড়া, বেল-ঘরিয়া ও আসানসোল কেন্দ্র দ্বারা। এই সেবাকার্যে ৫১০ মণ চাল, ২৭৩ মণ আটা, ২০০ মণ ডাল, ১৪,৯৪৪ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ১,০৬৫ পাউণ্ড রুটি, ৩০০ মণ আলুর বীজ, ৬,১৪০ ধুতি ও শাড়ী, ৬,৬৯৩ কম্বল, ৪১৩ চাদর ও লেপ, ৫,০৭৭ জামা এবং অগণিত পুরাতন কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদত্ত হয়।

রহড়ায় ২১১ জনকে ৬দিন ধরিয়া এবং বেলঘরিয়ায় ১৩১ জনকে এক সপ্তাহ যাবৎ ভাত খাওয়ানো হয়। এই রিলিফে ৯১,০০০ টাকা ব্যয় হয়; বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতে ৫৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া কেন্দ্র হইতে একটি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা হয়।

বোম্বাই ও রাজকোট কেন্দ্র একযোগে কচ্ছে চারটি তালুকে রিলিফ করেন। বন্যায় ক্ষতি-গ্রস্ত বাড়ীগুলি মেরামত করিয়া দেওয়া হয়। ভুজ-নগরে ১০০ পরিবারের বাসোপযোগী তিন-লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কলোনী নির্মিত হয়।

গত সেপ্টেম্বরে সুরাটে শত শত গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোম্বাই আশ্রম ব্যাপকভাবে রিলিফ পরিচালনা করেন। ৬৫৫টি গৃহ পুনর্নির্মিত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ৫,৮৬০ গৃহ সারাইয়া দেওয়া হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩,৮০,০০০ টাকা। হরিজন ও ভাঙ্গীদিগের জন্য কলোনী-নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

(২) চিকিৎসা : ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতি-ধর্মনির্বিশেষে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল, রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং দক্ষিণ কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে।

১৯৫৯ খৃঃ মিশনের তত্ত্বাবধানে ৮টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ৮৫৯; ১৯,৩৯২ রোগী ভরতি হয়। ৫০টি বহির্বিভাগীয় হাসপাতালে ২৩,৬২,৬৫২ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(৩) শিক্ষা : মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ ও	১,৭৭৪	
„ (আবাসিক)	বেলুড়		
বি.টি. কলেজ	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	১৫৫	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ	৩	৭৩	২৩৪
জুনিয়র „ „ „	২	২০০	
শারীর শিক্ষা „	কোয়েম্বাতুর	৬৯	
গ্রামীণ „ „	„	১৭৪	
কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয়	„	২৯	
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	১৩৭	
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৪	১,২৯৬	
জুনিয়র শিল্পবিদ্যালয়	৭	২৮৬	১২৭
ছাত্রনিবাস (অনাথাশ্রম সহ)	৭২	৪,৯৩১	৪৯০
চতুষ্পাঠী	২	২৮	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১২	৩,২২৫	৭১৭
মাধ্যমিক „	২৪	৯,১৪২	৪,২৮৯
সিনিয়র বেসিক„	৭	৬৯৬	৯৬৯
জুনিয়র „ „	১৯	২,২০২	৭৪১
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়	১০১	১২,২৮৩	৮,৬৮৭

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য বর্ষে ১২১ শিক্ষার্থিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে মোট ৩৬,৬৭৫ ছাত্র ও ১৬,৩২৬ ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, বেলুড়, সরিষা, রহড়া, মেদিনীপুর, চেরাপুঞ্জি, কলিকাতা, জামসেদপুর, আসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কানপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্পারাইতুরাই, কালিকট এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাস, স্কুল বা কলেজ মিশনের শিক্ষা বিভাগীয় কার্যের নিদর্শন।

(৪) সাহায্য : প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য :

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	৯১	২০৮	১
সাময়িক :	২৬০	৩১	

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৭,১৯১ টাকা। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ ৭,৫৫৬ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি : পূর্বের মতো মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়; গ্রন্থাগার পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Insti-

tute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ বলেন :

পূজা, উপাসনা, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মজীবন গঠনের অঙ্গ হিসাবে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সকল কর্মই উপাসনা—ইহাই এ যুগের ভাবাদর্শের মূলে। রামকৃষ্ণ মিশনের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে এই আদর্শ যথাযথ রূপায়িত হয় এবং জীব-নের সর্বস্তরে ও সকল ক্ষেত্রে যাহাতে ইহা সার্থক হইয়া উঠে—তদ্বিষয়ে সকলকে সর্বদা অবহিত থাকিতে হইবে।

স্বামী নির্বিকারানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ১৪ই অক্টোবর স্বামী নির্বিকারানন্দ ৬৬ বৎসর বয়সে সকাল ৬-১০ মিনিটে থ্রম্বোসিস রোগে ত্রিবান্দ্রম্ আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর রাত্রে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হইতে থাকে।

স্বামী নির্বিকারানন্দ ১৯২০ খৃঃ তিরুভল্লা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রত্যেক কার্যে তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত। সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

আমেরিকায় বেদান্ত

সিএট্‌ল্ ঃ রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের বার্ষিক (অক্টোবর '৫৯—অক্টো '৬০) কার্যবিবরণী আমরা সানন্দে প্রকাশ করিতেছি :

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দ প্রতি রবিবার সকালে বেদান্তের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা দেন এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মূল বেদান্ত গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই বৎসর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা শুরু হইয়াছে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ধ্যান ও ভজনে যাপিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও খৃষ্টকে কেন্দ্র করিয়া প্রচলিত উৎসবগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের সময় স্বামী অশেষানন্দ এই কেন্দ্রে আসেন, রবিবারের সভায় বক্তৃতা দেন এবং একটি বিশেষ আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন, আলোচ্য বিষয় ছিল : সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ আলোচনায় যোগ দেন।

আলোচ্য বর্ষে স্বামী বিবিদিষানন্দকে বহু শিক্ষা ও ধর্মের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হয়। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে এবং লেক-সাইড বালক বিদ্যালয়ে 'ভারতীয় চিন্তা ও বর্তমান পৃথিবী' সম্বন্ধে বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী বিবিদিষানন্দ হাওয়াই দ্বীপে হনলুলু যান, সেখানে বেদান্তানুরাগী ছাত্রগণের জন্য তাঁহাকে বক্তৃতা ও আলোচনায় সারাটি মাস ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

আশ্রমের প্রার্থনা-কক্ষটি সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যায়, স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময় প্রার্থনা-গৃহটি পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিবে।

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

নরেন্দ্রপুর : কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না গত ১৩ই নভেম্বর নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পাঠাগার-ভবনের উদ্বোধন করেন। নবনির্মিত দ্বিতল পাঠাগার-ভবনে দুই শতাধিক ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা আছে।

পাঠাগার-উদ্বোধনের পরে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীখান্না সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী খান্না পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর ইংরেজীতে 'রন্তিদেব' নাটক অভিনীত হয় ও ছায়াচিত্রে 'পথের পাঁচালী' দেখানো হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা

সারদাপীঠ (বেলুড়) : গত ২৮শে অক্টোবর প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সারা দিবসব্যাপী পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়; পূজান্তে হোম হয়; কীর্তন ও ভজন সারাদিন ধরিয়া চলে। পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পর 'সতী-লীলা কীর্তন' (কথকতা) করেন ভারতী-সংসদ; শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই কথকতা শ্রবণ করেন। উৎসব-দিনে প্রায় ৬,০০০ নরনারী প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। শনিবার সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের ঘাটে প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। শত শত ভক্ত নরনারী ইহা দেখিবার জন্য সমবেত হন। রবিবার সন্ধ্যায় 'ভিখারী শঙ্কর' যাত্রাভিনয় দর্শন করিতেও কয়েক সহস্র দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল।

নিবেদিতা-জন্মবার্ষিকী

গত ২৮শে অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে নিবেদিতা-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যাপিত ভগিনী নিবেদিতার সেবাময় জীবন আলোচিত হয়। এই উপলক্ষে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন বক্তা ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগপূত জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া বলেন : পাশ্চাত্যের এই মহীয়সী মহিলা ভারতের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে তিনি এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন—ভারতের দুর্গতির জন্য ধর্ম দায়ী নয়, ধর্ম হইতে বিচ্যুতিই সর্ববিধ অবনতির মূল কারণ। সর্বস্তরে ধর্মভাব সঞ্চারিত হইলেই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজীর আদেশে নিবেদিতা মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নিবেদিতার প্রভা ছিল সূর্যের মতো উজ্জ্বল, অথচ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ। ভারতমাতার সেবায় নিবেদিতা নিজেকে তিল তিল করিয়া উৎসর্গ করিয়া গুরুদত্ত নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১০৮তম শুভ জন্মতিথি আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

সংবাদ-পরিবেষণ-যন্ত্র

বিভিন্ন দেশের সরকারী ও অভিজ্ঞ মহল হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া UNESCO কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, যে-দেশে শতজন প্রতি ১০ খানি সংবাদপত্র, ৫টি রেডিও রিসিভার, ২টি সিনেমা-সীট নাই—সে দেশে সাধারণ জ্ঞান পরিবেষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই ভিত্তিতে (দেড়শ কোটি অর্থাৎ পৃথিবী লোকসংখ্যার ৬০% অধ্যুষিত) এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ১০০টি রাষ্ট্রে উক্ত ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়।

পৃথিবীতে প্রতিবৎসর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেছে, তথাপি দারিদ্র্য ও তাহার সহচরী নিরক্ষরতা পৃথিবীর অর্ধাংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে। অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলি বুঝিয়াছে, শিক্ষার মান উন্নত না করিয়া জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিতরণের সব যন্ত্রগুলি একযোগে কাজে লাগাইবার প্রয়াস সর্বত্র লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ আফ্রিকা-এশিয়ায় নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে জ্ঞান-স্পৃহা যে বাড়িতেছে, তাহার প্রমাণ সংবাদপত্র, সস্তা বই, রেডিও প্রভৃতির চাহিদা-বৃদ্ধি। যাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদের রেডিও শুনিবার আগ্রহ খুব।

৪০টি রাষ্ট্রের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহ-সংস্থা নাই। তাহারা নিজ দেশের সংবাদের জন্যও বিদেশীদের উপর নির্ভর করে। নিম্নে সংবাদ-পরিবেষণ-যন্ত্রের একটি তুলনামূলক তালিকা প্রদত্ত হইল :

	সারা পৃথিবীতে	ইওরোপে	উঃ আমেরিকায়	আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতিতে
সংবাদ পত্র	২৫,৬০,০০,০০০	৩৫%	২৭%	...
রেডিও রিসিভার	৩৭,০০,০০,০০০	২৫%	৫০%	১৩%
টেলিভিসন	৮,৪০,০০,০০০	২৩%	৬৬%	৪%
সিনেমা গৃহ	১,৩০ ০০০	৮০%		২০%

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনের' নূতন (৬৩ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা সহ বার্ষিক ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

হিন্দু ও খৃষ্টান

স্বামী বিবেকানন্দ

বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দুদর্শনের প্রবণতা ধ্বংস করা নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে সমন্বয় করা। যদি ভারতে নতুন কোন ভাব আসে, আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ ক'রে নিই, অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ, ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। শ্রীভগবান এই অবতারেই প্রথম প্রচার ক'রে গেছেন, 'আমি ঈশ্বরের অবতার, আমিই বেদাদি গ্রন্থের প্রেরয়িতা, আমিই সকল ধর্মের উৎস।' তাই আমরা কোন ধর্ম বা ধর্ম-গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে বড়ই পার্থক্য, এটি আমাদের কেউ কোন দিন শেখায়নি। সেটি হচ্ছে যীশুর রক্ত দিয়ে মুক্তি, অথবা একজনের রক্তদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ হ'তে হবে। ইহুদীদের মতো বলিদান-প্রথা আমাদেরও আছে। আমাদের এই বলি বা উৎসর্গ-প্রথার সহজ অর্থ: আমি কিছু খেতে যাচ্ছি, কিছু অংশ ঈশ্বরকে নিবেদন না করাটা ভাল নয়। তাই আমি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি; সহজে সংক্ষেপে এই হ'ল ভাবটি। তবে ইহুদীর ধারণা উৎসর্গীকৃত মেষটির উপর তার পাপরাশি চলে যাবে, আর সে পাপমুক্ত হবে। এই 'সুন্দর' ভাবটি আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করেনি, তার জন্যে আমি আনন্দিত। অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে আমি কখনও এই ধরনের বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ চাই না। যদি কেউ এসে আমাকে বলে, 'আমার রক্তের বিনিময়ে মুক্ত হও', তাকে আমি ব'লব, 'ভাই, চলে যাও, আমি নরকে যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে স্বর্গে যাব। আমি নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত।' ঐ ধরনের বিশ্বাস আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়নি। আমাদের দেশের অবতার বলেছেন, যখনই পৃথিবীতে অসদ্‌ভাব ও দুর্নীতি প্রবল হবে, তখনই তিনি আসবেন তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে এই কাজ ক'রে আসছেন। পৃথিবীর যেখানেই দেখবে অসাধারণ কোন পবিত্র মানব মানুষের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, জেনো তাঁর মধ্যে ভগবানই রয়েছেন।

অতএব বুঝতে পারছ, কেন আমরা কোন ধর্মের সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা কখনও বলি না, আমাদের ধর্মই মুক্তির একমাত্র রাস্তা। যে কোন মানুষ সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে; তার প্রমাণ? প্রত্যেক দেশেই দেখি পবিত্র সাধু পুরুষ রয়েছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন বা না করুন—সর্বত্র সদ্‌ভাবাপন্ন নরনারী দেখা যায়। অতএব বলা যায় না, আমার ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। 'অসংখ্য নদী যেমন

বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হ'য়ে তোমারই কাছে আসে'—এটি ভারতে ছোট ছেলেদের প্রতিদিনের একটি প্রার্থনার অংশ। যারা প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনা করে, তাদের পক্ষে ধর্মের বিভিন্নতা নিয়ে মারামারি করা একেবারেই অসম্ভব। এ তো গেল দার্শনিকদের কথা, এঁদের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা, বিশেষ ক'রে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তার কারণ, তাঁর অপূর্ব উদারতা দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।

ঐ যে মানুষটি মূর্তির সামনে প্রণাম করছে, ও কিন্তু তোমরা যে ব্যাবিলন বা রোমের পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ, তার মতো নয়। এ হিন্দুর এক বিশেষত্ব। মূর্তির সামনে মানুষটি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে, 'সোঽহম্, তিনিই আমার স্বরূপ; আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার পিতা নেই, মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সোঽহম্, সোঽহম্; আমি কোন পুস্তকের বাঁধনে বাঁধা পড়িনি! কোন তীর্থের বা কোন কিছুর বন্ধন আমার নেই! আমি সৎস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, সোঽহম্, সোঽহম্।' বার বার এই কথা উচ্চারণ ক'রে সে বলে, 'হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, বড় হতভাগ্য আমি।'

ধর্ম বই-পড়া জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। ধর্ম আত্মাই, ধর্ম ঈশ্বর, শুধু বই-পড়া জ্ঞান বা বক্তৃতা-শক্তির দ্বারা ধর্ম লাভ হয় না। সব চেয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বলো, আত্মাকে আত্মা-রূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না। আত্মার সম্বন্ধে তুমি একটা কল্পনা করতে পারো, তিনিও পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আত্মস্বরূপে চিন্তা অসম্ভব। ঈশ্বরতত্ত্ব যতই শেখ না কেন—তুমি একজন বড় দার্শনিক, আরো বড় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ হ'তে পারো—তবু একটি হিন্দু বালক বলবে 'ওর সঙ্গে ধর্মের কিছু সম্বন্ধ নেই। আত্মাকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে পারো?' তাহলে সকল সংশয়ের শেষ, তাহলেই মনের সব বাঁকা-চোরা সোজা হ'য়ে যাবে। জীবাত্মা (মানুষ) যখন পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সম্মুখীন হয়, তখনই সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দিগ্ধ চিন্তা চিরতরে স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

পাশ্চাত্ত্যের বিচারে একজন অদ্ভুত বিদ্বান্ হ'তে পারেন, তবু তিনি হয় তো ধর্ম বিষয়ে অ, আ, ক, খ না জানতে পারেন। আমি তাঁকে তাই ব'লব। জিজ্ঞেস ক'রব, 'আপনি কি আত্মাকে আত্মা ব'লে ভাবতে পারেন? আপনি কি আত্ম বিষয়ক বিজ্ঞানে পারদর্শী? আপনি জড়ের ঊর্ধ্বে নিজ আত্মাকে বিকশিত করেছেন? যদি তা না ক'রে থাকেন তাহলে তাঁকে ব'লব, 'ধর্ম আপনার লাভ হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু বই, শুধু বৃথা গর্ব!'

আর ঐ 'হতভাগ্য' হিন্দুটি মূর্তির সামনে বসে দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য চিন্তা করবার চেষ্টা ক'রে শেষে বলে, 'হে ঈশ্বর, পারলাম না তোমায় আত্মস্বরূপে ধারণা করতে, অতএব এই সাকার মূর্তিতেই তোমায় চিন্তা করি।' তখন সে চোখ খোলে, ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে, প্রণাম ক'রে বার বার প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে আবার বলে, 'হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা করো, তোমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্যে।'

তোমরা কেবলই শুনে আসছ, হিন্দুরা পাথর পূজো করে। তাদের অন্তরের প্রকৃতি

সম্বন্ধে তোমরা কি ভাবো! এই দেখ, আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী যে সমুদ্র পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে এসেছে। এসে অবধি শুনছি, তোমাদের সমালোচনা, তোমাদের ঐ সব কথা। তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 'ওরা শিশু; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওরা বড় হ'তে পারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিস ওরা তৈরী করতে পারে, কিন্তু ধর্মব্যাপারে ওরা একেবারে শিশু!' এই হ'ল তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা।

একটি কথা তোমাদের ব'লব, কোন নিষ্ঠুর সমালোচনা করছি না। তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কি কাজের জন্যে? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বলে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি!' তারা কিন্তু মুসলমানদের একটি কথা বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে! হিন্দু বড় নিরীহ, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় ব'লে যায়, 'মূর্খেরা যা বলবার বলুক।' এই হ'ল তাদের ভাব। তোমরা, যারা গালাগাল দেবার জন্যে মানুষকে শিক্ষিত করো, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চীৎকার করো, 'সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত আমাদের ছুঁয়োনা, আমরা আমেরিকান। আমরা, দুনিয়া শুদ্ধ লোকের সমালোচনা ক'রব, গাল দেব, শাপ দেব, যা খুশি ব'লব, কিন্তু আমাদের ছুঁয়োনা, আমরা বড় স্পর্শকাতর—লজ্জাবতী লতা।'

তোমরা যা খুশি করতে পার; আমরাও যে ভাবে আছি, সে ভাবেই সন্তুষ্ট আছি। একটা বিষয়ে আমরা তোমাদের থেকে ভাল আছি, আমরা আমাদের ছেলেদের এই অদ্ভুত তথ্য গেলাই না যে পৃথিবীতে সব পবিত্র, শুধু মানুষই খারাপ। তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা যখনই আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন মনে রাখে—সমস্ত ভারতবাসী যদি দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভারত সমুদ্রের তলায় যত মাটি আছে সব যদি পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি ছুঁড়তে থাকে, তা হলেও তোমরা আমাদের প্রতি যা করে থাকো, তার কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্য? আমরা কি কোন দিন কোথাও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছি—কাউকে ধর্মান্তরিত করবার জন্যে? আমরা তোমাদের বলি, 'তোমার ধর্মকে স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।' তোমরা ব'লে থাকো তোমাদের ধর্ম-প্রসারশীল, তোমরা আক্রমণ-ধর্মী। কিন্তু কতজনকে নিতে পেরেছ তোমার মতে? পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ চীনা, তারা বৌদ্ধ; তার পর আছে জাপান, তিব্বত, রাশিয়া, সাইবেরিয়া, বর্মা, শ্যাম। শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখো—এই যে খৃষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ, সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কি ভাবে এটা হয়েছিল? এক ফোঁটা রক্তপাত না ক'রে। এত ডম্ফাই তোমাদের, কিন্তু বল তো—তলোয়ার ছাড়া খৃষ্টান ধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো! খৃষ্টধর্মের ইতিহাস মন্থন ক'রে আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দাও, আমি দুটি চাই না। আমি জানি—তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি ক'রে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু—এই তো! যতই গর্ব কর, মুসলমানদের থেকে তোমরা কি ভাল করতে পার? 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ!'

কেন? 'কারণ আমরা অপরকে হত্যা করতে পারি!' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেদুইন! রোমানরাও ঐ কথা ব'লত, কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।' আর ঐ সব অহঙ্কারের নীতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। ওগুলি বালির ওপর নির্মিত। বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, তা আজ নয় কাল ধ্বংস হবেই। এ জিনিস মরবেই।

ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি বাঁচতে চাও, যদি চাও তোমাদের জাতি বেঁচে থাকুক, তবে বলি শোন—খৃষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা খৃষ্টান নও; জাতি হিসাবে তোমরা খৃষ্টান নও। ফিরে চল খৃষ্টের কাছে। ফিরে চল তাঁর কাছে—যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না, 'পাখীদেরও বাসা আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানব-পুত্রের (যীশুর) এমন একটি জায়গা ছিল না—যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন।' তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি দুর্দৈব! উলটে ফেলো এ নীতি, যদি বাঁচতে চাও! (ধর্ম-ব্যাপারে) এ দেশে যা কিছু শুনেছি সব কপটতা। যদি এই জাতি বাঁচতে চায়, তবে একে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বর এবং ধন-দেবতা (ম্যামন)-কে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না। এই সব সম্পদ—সব খৃষ্ট থেকে? খৃষ্ট এ-সব অশাস্ত্রীয় কথা অস্বীকার করতেন। ধন-দৌলত থেকে যে সম্পদ-উন্নতি আসে, তা অনিত্য—ক্ষণস্থায়ী! প্রকৃত নিত্যত্ব রয়েছে ঈশ্বরে! যদি পার এই দুটি—এই সম্পদের সঙ্গে খৃষ্টের আদর্শ—মেলাতে, তবে খুবই ভাল। যদি না পার, তবে বরং সম্পদ ছেড়ে দাও, খৃষ্টের কাছেই ফিরে চল। খৃষ্টশূন্য প্রাসাদে বাস করা অপেক্ষা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খৃষ্টের সঙ্গে বাস করার জন্য প্রস্তুত হও।

[১৮৯৪ খৃঃ ২১শে ফেব্রুআরি ডেট্রয়েটে প্রদত্ত 'Hindus and Christians' বক্তৃতার অনুবাদ।
দ্রষ্টব্য: C. W. VIII, Pp. 209—213]

অভিলাষ

'অনিরুদ্ধ'

অভিলাষ শুধু এক অভিলাষে জাগিয়া থাকি
সকল মর্ম একটি আশায় মুখর রাখি।
বারিধারা ছুটে মহাসাগরের লক্ষ্য পানে
অখিল কর্ম পরম-শান্তে যেন রে মানে।

একটি পাওয়ায় অশেষ পাওয়ার সার্থকতা
একটি মিলনে বহুল সজ্জ হউক গাঁথা।
এক ভালবাসা ছেয়ে রয় যেন সকল প্রীতি
একটি সুরেতে ধ্বনিয়া উঠুক নিখিল গীতি।

জীবন-মরণ যেথায় মিলেছে স্তব্ধ পারা
সকল বিচার সহজে যেথায় বাক্যহারা—
গহন সত্যে মিটি যায় যথা প্রশ্ন সব
অভিলাষ সেথা একক বিরাজি স্বয়ংপ্রভ।

ধর্মাধর্ম স্বর্গ-নরক স্বচ্ছ কালো
যতেক দ্বন্দ্ব ঘুচাক আজিকে একটি আলো।
বহু পরিচয় বহু জানাজানি কিছুই নহে
অভিলাষ যদি আত্মসত্যে অচল রহে।

কথাপ্রসঙ্গে

সন্ন্যাসের আদর্শ : পুরাতন ও নূতন

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, 'আমি ভাঙিতে আসি নাই, পরিপূর্ণ করিতে আসিয়াছি।' প্রত্যেক দেশে যুগপ্রবর্তকগণের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। একটি জাতির যা নিজস্ব আদর্শ, তাহাকে ভুলিয়া নয়—তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া আচরণ করার মধ্যেই সেই জাতির উন্নতি নির্ভর করে। 'ভারতের জাতীয় আদর্শ' স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'ত্যাগ ও সেবা'; ভারতবাসীকে ঐ যুগ্ম-আদর্শে উদ্বোধিত করিতে পারিলে ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী! এই ত্যাগের আদর্শ সন্ন্যাস-জীবনেই সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হইয়াছে,—তাই চরম অবনতির পূতিগন্ধ পঙ্ক হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—এ যুগের সন্ন্যাসি-সংঘে ত্যাগের আদর্শের সহিত সেবার আদর্শের সমন্বয় ঘটাইতে। এই চেষ্টা যে বহুলাংশে ফলবতী হইয়াছে, বর্তমান ভারতে ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

তথাপি দেখা যায়, সেবার আদর্শ না হউক, ত্যাগের আদর্শ, বিশেষত সংসার-ত্যাগের আদর্শ—বহু সাহিত্যিক, কবি, বক্তা ও প্রবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধ সমালোচনার বস্তু। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়—তাঁহারা হয়তো কোন সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহার অনুসৃত জীবন-নীতিকে শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, স্বকপোল-কল্পিত যুক্তি সহায়ে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার আলোচ্য মহাপুরুষের ঐ জীবননীতি ছিল না। ইহার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত : ঐ মহৎ ব্যক্তির মন মুখ এক ছিল না। 'এরূপ কপটাচার ব্যক্তিকে কেন আপনি শ্রদ্ধা করেন? কেন তাঁহার সম্বন্ধে এমন সুন্দর নিবন্ধ লিখিতে বসিলেন?'—শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নই করিতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের 'শতবার্ষিকী' আসিতেছে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু আলোচনা বক্তৃতা অবশ্যই হইবে, প্রবন্ধ লেখা এখন হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছে। স্বামীজীর সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু বলিবেন বা লিখিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য, তাঁহারা যেন প্রধানত স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতাবলী হইতেই স্বামীজীকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন। 'শালগ্রাম লইয়া ফুটবল খেলিলেই তোমরা স্বর্গে যাইবে'—স্বামীজীর মুখে তাঁহারা যেন এরূপ কথা না বসাইয়া দেন। 'স্বামীজী গৈরিক বস্ত্র পরিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসব্রতে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না'—এই জাতীয় অজ্ঞতার পরিচায়ক বাক্য যেন তাঁহারা না লিখিয়া বসেন। ঐ বাক্য বিশ্লেষণ করিলে এই অর্থই পাওয়া যায় যে, লেখক স্বামীজীকে ভালবাসেন, কিন্তু সন্ন্যাস (সংসারত্যাগ) তাঁহার পছন্দ নয়। অতএব তাঁহার প্রবন্ধে স্বামীজীকে গৈরিক ধারণ করিয়াও সন্ন্যাসে অবিশ্বাসী হইতে হইবে, অর্থাৎ লেখকের খাতিরে তাঁহাকে 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতে হইবে।

যাক প্রকৃত কথা এই যে বহু লেখক ও বক্তা আজকাল পড়িবার বা চিন্তা করিবার সময় পান না; কিন্তু সভায় তাঁহাদের কিছু বলিতেই হইবে, পত্রিকাতেও কিছু লিখিতে হইবে। স্বামীজীর গ্রন্থরাজি মন্থন করিয়া আমরা কিন্তু দেখি, যুগযুগব্যাপী সন্ন্যাস-সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক চেতনা যথেষ্ট ছিল, ধর্মের নূতন পুরাতন ও চিরন্তন রূপ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁহার অতি স্পষ্ট। নিজেকে তিনি একজন সন্ন্যাসীই মনে করিতেন।

এটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, এ সংসারে সন্ন্যাসীরা চিরদিনই সংখ্যাল্প, রাজনীতির ভাষায় 'সংখ্যালঘু'! যে কোন কারণেই হউক, তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারে আছে, তাঁহাদের জীবনে মাঝে মাঝে রোগ শোক দুঃখ বিফলতা আসে বটে, কিন্তু সুখে দুঃখেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা এই মিশ্রিত ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি লাভের আশায় সংসার-চক্র হইতে বাহিরে চলিয়া যান, তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে সংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান ব্যক্তিদের ঈর্ষার পাত্র, তাই বোধ হয় তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'ওরা ভীরু, পলাতক, কাপুরুষ।' ব্যাপারটা যে ঠিক তাহার বিপরীত, এ কথা বলিলেই বা বুঝিবে কে?

সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা আজ নূতন নয়। ইসলাম বলিয়াছেন, 'ইহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত', প্রটেস্টাণ্টরা বলেন, 'সন্ন্যাসীদের জীবন অসম্পূর্ণ', তাঁহাদের প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সংস্কারকগণ অনুরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। কবি ও সাহিত্যিকেরা বলেন, 'সন্ন্যাস আত্মপ্রবঞ্চনা,' মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'সন্ন্যাস পলায়নী মনোবৃত্তি', ক্ষীণদৃষ্টি রাজনীতিকরা বলেন, 'সাধুরা অলস ভবঘুরে', সমাজবিজ্ঞানীরা বলিবেন, 'প্যারাসাইট'।

সব শুনিয়া বা না শুনিয়া যথার্থ সন্ন্যাসী উদাসীনভাবেই থাকেন, এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া তিনি নিজ ব্রতে অচল অটল থাকিয়া শান্তভাবে জ্ঞানের সাধনায় জীবন যাপন করিয়া যান। রোগ-শোকে কাতর মানুষের মনে যথাসাধ্য শান্তির বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে সাধনার পথ ধরাইয়া দেন, যাহাতে তাহারা দেহ-কেন্দ্রিক জীবন হইতে ধীরে ধীরে উর্ধ্বস্তরে অভিযান শুরু করিতে পারে।

এ জীবনে যদি কোন চরম অনিবার্য সত্য থাকে তো তাহা মৃত্যু! এক হিসাবে বলা যায়, জীবনের সকল সাধনা সেই মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুতি! মৃত্যুকে ভয় করিয়া নয়, ভালবাসিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। বৈদিক যুগে আর্যদের জীবন-পরিকল্পনায় চতুর্থ আশ্রম ছিল এই 'সন্ন্যাস'! কেন? মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য। মৃত্যু আসিবেই, অনিচ্ছুকভাবে তাহার অনুগমন করিব—না, শান্ত ভাবে যথাসময়ে তাহাকে গ্রহণ করিব? ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস —পূর্বেরটি পরেরটির প্রস্তুতি! চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস সজ্ঞানে সপ্রেমে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা! দেহভাবশূন্য হইয়া 'আমি অমর আত্মা, আমি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম,' এই ভাবনায় বিভোর হইয়া দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি!

প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস—উভয়বিধ জীবন-ধারাই ছিল আদর্শ; পরে হয়তো কালক্রমে উপনিষদের জ্ঞানের সাধনায় ভাঁটা পড়ে, এবং যাগযজ্ঞাদির প্রাবল্য দেখা দেয়। তখন কঠোর সাধনার জীবনাদর্শ সহায়ে বুদ্ধ যে বাণী প্রচার করিলেন, তাহাতে বৈদিক জীবন-ধারার অভ্যুদয়ের (ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির) শাখাটি মজিয়া গেল, নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ বা মুক্তি)-আদর্শের উপর এত জোর পড়িল যে সকলের ধারণা হইল—সন্ন্যাসী না হইলে জীবন বৃথা! বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতে ইহুদীধর্ম হইতে যে খৃষ্টধর্ম উদ্ভূত হইল, সেখানেও দেখা যায় সন্ন্যাস-ভাবের উপর অত্যধিক ঝোঁক! কিন্তু ইওরোপে গ্রীকো-রোমান ধাতে এত ত্যাগ-তপস্যা সহ্য হইল না! শুরু হইল প্রতিক্রিয়া।

মোটের উপর দেখা যায়, সকল ধর্মই ঈশ্বরার্থে সংসারত্যাগে বিশ্বাসী, সকল ধর্মেই ত্যাগী সাধক আছে, ইসলামেও আছে। সন্ন্যাসী-শূন্য ধর্ম সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত, সন্ন্যাস উদার জ্ঞানের সাধনা, সর্বদা ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করাই ত্যাগী সাধকের একমাত্র কাম্য। ধর্ম তাহার নিকট কথার কথা নয়—তিথি-নক্ষত্রের ব্যাপার নয়।

যুগে যুগে, দেশে দেশে, যখন যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সেখানে একজন শক্তিশালী সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়া দেশের ইতিহাস পরিবর্তিত করিয়া গিয়াছেন! এক কথায় বলা যায়—উচ্চতম কৃষ্টির ইতিহাস বুদ্ধ খৃষ্ট শঙ্কর চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকজন ত্যাগী সন্ন্যাসীরই জীবনকাহিনী! সন্ন্যাসীরাই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সামান্য অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে ভারত চীন জাপান মালয় ব্রহ্ম সিংহলে উচ্চতর জীবন-নীতি প্রচার করিয়াছেন; এই সন্ন্যাসীরাই ইওরোপের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বন্য বর্বর যুদ্ধ-বিলাসী হিংস্র জাতিগুলিকে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়াছেন, বাইবেল পড়াইবার জন্য প্রাণপণে তাহাদের অক্ষর পরিচয় করাইয়াছেন।

সন্ন্যাসের পুরাতন আদর্শ একমুখী উর্ধ্বমুখী —নির্বাণমুখী সমাধিমুখী ভগবন্মুখী ছিল; নিশ্চয়ই উহা ভাল ছিল, কিন্তু একদিক দিয়া উহাতে সংসারের ক্ষতিও হইয়াছে।

বৈদিক যুগের জীবনাদর্শে সংসারের সহিত সন্ন্যাসের যে সামঞ্জস্য ছিল, বৌদ্ধ ও খৃষ্ট যুগে তাহা ছিল না। বৈদিক বা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সংসারকে ঘৃণা করেন না; তিনি জানেন, প্রত্যেকটির আপেক্ষিক মূল্য আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে সন্ন্যাস শেষ আশ্রম এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রম। সন্ন্যাসের উপর অত্যধিক জোর দিয়া কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য একদিন ঐহিক উন্নতিকে অবহেলা করিয়াছে, আজ তাহারই প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে, ঐহিক উন্নতির জন্য আজ আধ্যাত্মিক জীবনই অস্বীকৃত। প্রকৃত উন্নতি কিন্তু উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধানে।

তাই তো দেখা যায় বর্তমান যুগে নবতম সন্ন্যাসের উদ্বোধক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী মানুষের নবজাগরণের জন্য তাঁহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সংঘের সম্মুখে যুগ্ম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন: 'আত্মনো মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায় চ'। বলিয়াছেন, 'শুধু নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করা, সেও স্বার্থপরতা'; সকল মানুষের যথার্থ হিতসাধন সম্ভব একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা। অজ্ঞতার জন্যই মানুষ দুঃখ ভোগ করে। জ্ঞানই মানুষকে সর্ববিধ অজ্ঞতার বন্ধন হইতে, ভোগবাসনার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করে। জ্ঞানের অভাবেই মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করে। বর্তমান যুগে তাই স্বামীজীর নির্দেশ: সন্ন্যাসীকে 'আত্মনো মোক্ষার্থং' সত্ত্বগুণের সাধনায় শুধু ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিলে চলিবে না, 'জগদ্ধিতায়' তাহাকে রজোগুণের মধ্যেও আসিতে হইবে। তবেই সম্ভব বিশ্বব্যাপী মানুষের মহাজাগরণ! শুধু মায়িক সংসার ত্যাগ করিলেই চলিবে না, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নির্জন-বাসের সুখ-শান্তিও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন, 'ত্যাগ মৃত্যুকে ভালবাসা।' 'সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে। সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে।' তবে কি আত্মহত্যা করিতে হইবে? —না। মৃত্যুকে ভালবাসার প্রকৃত অর্থ তিনি বলিয়াছেন, পরার্থে আত্মনিয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে মরিতে হইবে।

নবযুগের সন্ন্যাসের আদর্শ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছেন:

'আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব ছিল কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে আমি অমুকের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিব—এ ভাবটিও ভুল। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাব-পরায়ণতার সহিত প্রবল কার্যকরিতা সংযুক্ত থাকে তাহাই করিতে হইবে।'

প্রকৃত সন্ন্যাসীর কোন শত্রু নাই, বন্ধুও নাই; তাঁহার দেশ নাই, জাতি নাই; সন্ন্যাসী সত্যই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন মানব। সন্ন্যাসীর কাহারও প্রতি তাঁহার রাগ (অনুরাগ) নাই, কাহারও প্রতি দ্বেষ (বিরাগ) নাই; তাঁহার নিজস্ব কোন বাসনা কামনা নাই, ভেদদৃষ্টি নাই। তাঁহার কোন কর্তব্য নাই, তথাপি তিনি অনলসভাবে কাজ করিয়া যান, ঈশ্বরে সমর্পিত কর্ম তাঁহার নূতন বন্ধনের কারণ হয় না, কারণ তাঁহার কর্তৃত্ববুদ্ধি নাই, মমত্ববুদ্ধি নাই; তিনি ঈশ্বরের দাস, সমাজের সেবক।

ঈশ্বরের আকর্ষণে সাধক একদিন সংসার ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছিল, অনন্ত অসীম সত্তার অনুভবে পূর্ণ হইয়া সাধক আবার সমাজের বুকে ফিরিয়া আসে নূতন ভাবে, নূতন রূপে। এ যেন সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র হইতে জলবিন্দুর অদৃশ্য বাষ্পাকারে উত্থান, পরে অসীম আকাশে বায়ু-সঞ্চালিত সঞ্চরণের পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন! সেই বৃষ্টিধারা দাবদগ্ধ পৃথিবীকে শীতল করে, শান্ত করে, উর্বর করে। সমাজের দিক দিয়া ইহাই সন্ন্যাস-জীবনের সার্থকতা।

অন্তর্নিহিত রহস্য না বুঝিয়া বৃথা সমালোচনা নিরর্থক। সংসার-চক্রের প্রকৃত তথ্য জানিলে তবেই সন্ন্যাস-জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে। উভয় দিক লইয়া বৃত্তটি সম্পূর্ণ; সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ—উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধাই সমাজের উন্নতির উপাদান, অগ্রগতির উপায়। অশ্রদ্ধা আত্মবিধ্বংসী।

সকলকেই যে সন্ন্যাসী হইতে হইবে, হিন্দু জীবন-বিজ্ঞান একথা বলে না। সন্ন্যাস মানব-মনের ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি। সন্ন্যাসী ব্যক্ত যোগী, গৃহস্থকে গুপ্ত যোগী হইতে হইবে। প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি কঠিনতর।

যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো অনাসক্ত গৃহস্থও সংসারের ও সমাজের উন্নতির জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হইয়া শক্তি সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে মানুষ জীবনের পথ বাছিয়া লইবে। নির্বাচিত পথে—এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে যে যথাসময়ে নিশ্চয় আমি লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইব।

ভগবান যীশু

শ্রীঅমলকুমার দত্ত

প্রেম-করুণার দীপ জেলে নিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
তুমি এসেছিলে কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্টের অবতারে।
চরণে তোমার পাপী পায় স্থান,
তুমি করুণার সিন্ধু মহান্!
সবার হৃদয় জিনিয়া তুমি যে জগৎ করিলে জয়,
তুমি জীবনের শাশ্বত জ্যোতি, তুমি চিরপ্রেমময়।

চলার পথে

'যাত্রী'

স্পন্দন বা গতিময়তাই জীবন। কথাটার একটা ব্যাবহারিক সত্তা আছে ঠিকই। কিন্তু এই গতি যেমন আমাদের জীবনকে প্রাণশক্তি দিয়ে জাগিয়ে রেখেছে—তেমনি তাকে যথার্থ জ্ঞানশক্তি থেকে করেছে বঞ্চিত। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—এক তরুণ তার পূর্ণ উদ্যম নিয়ে ভূমির ওপরে উঁচুদিকে লাফালো। সে ঐ জন্য যতখানি শক্তি প্রয়োগ ক'রল, তাতে তার বহু দূরে উঠে যাবার কথা। কিন্তু পারল না। বড় জোর সাত ফুট উঠেই পড়ে গেল। কেন? আর একটা বিরুদ্ধ শক্তি বাধা দিল, তরুণকে পৃথিবী ত্যাগ করতে দিল না। আমরা দেখলাম, সে সাত ফুট উঁচুতে উঠেছিল মাত্র; কিন্তু তার শক্তি প্রয়োগের যে পূর্ণ ফল, তা হয়েছে ব্যাহত। সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হয়েছে সঙ্কুচিত।

আবার কেহ হয়তো, সকালের আকাশে নবারুণকে হাসতে হাসতে উঠতে দেখে, কাছের ছোট ছেলেটিকে আদর ক'রে তা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেখ সূর্য উঠছে।' ছেলেটিও তাই দেখে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। 'সূর্য উঠছে' বলাটা কি ঠিক হ'ল? তা তো নয়। বরং পৃথিবী তার নিজের গতির রথে আমাদের সকলকে চড়িয়ে, সূর্যকে একটা বিপরীত আপেক্ষিক গতি দিয়ে, ঐ সূর্য-ওঠা-রূপ ভুল অনুভূতি আমাদের করিয়ে দিচ্ছে! পৃথিবীর তুলনায় সূর্য স্থির আছে, আর পৃথিবী লাটিমের মতো তার নিজের চারিদিকে ঘুরছে। আমরা সেই গতিশীল পৃথিবীতে চড়ে, পৃথিবীর গতির কথা ভুলে, সূর্য ওঠার মতো ভুল অনুভূতি নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। এই ভাবের সব ভুল খবর দেওয়াই তো 'মায়া'র খেলা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে তাই বিশ্বপ্রকৃতিকেই 'মায়া' বলেছে।

আর একটি উদাহরণ দিই—আপনি হয় তো 'সিনেমা' দেখতে গেছেন। ছবিতে প্রাণীকে সব সময়েই চলমান বা গতিময় ব'লে মনে করছেন। আসলে কিন্তু 'ফিল্ম'-এর ছবিগুলি স্থির। আর ঐ স্থির ছবিগুলিকে আপনার চোখের সুমুখ দিয়ে একটা গতিতে চালিয়ে আপনার চোখে ঐ গতির ধাঁধাঁ লাগানো হচ্ছে মাত্র। শুধু তাই নয়, সিনেমার সাদা পর্দায় এতক্ষণ ধরে যে প্রাণের খেলা, হাসি-কান্নার লীলা দেখলেন, সেও তো এক প্রতীয়মান সত্য আলোছায়ার চঞ্চল লীলা সাদা পর্দায় ফেলে ঐ রকম দেখানো হ'ল। ওধারে কিন্তু সাদা পর্দা সাদাই আছে। এই রকমের উদাহরণ আর বেশী টেনে লাভ নেই। তবে গতির মধ্যে থাকার দরুন যে আমাদের ভুল জ্ঞান হয়, তার নমুনা আমরা এই দুটিতেই পেলাম।

এই ভাবে বুঝতে গিয়ে দেখব যে এই গতিময় বা স্পন্দিত জগতের সব কিছুর মধ্যে স্থির বস্তুকে—তথা ধ্রুবকে আমরা ধরতে পারছি না। আর এই যে পারছি না, তার কারণই হ'ল—চারিদিকের অবিচ্ছিন্ন গতিময়তা! এই সর্বব্যাপী প্রতীয়মান গতিকেই বেদান্তে 'মায়া' বলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লণ্ডনে প্রদত্ত 'মায়া' বক্তৃতায় বলেছেন: 'বেদান্তের মায়া আদর্শবাদ বা বাস্তববাদ নয়, এটা একটা তথ্যও নয়, এ কেবল ঘটনার যথাযথ বিবৃতি—' যে চিরন্তন ঘটনার মধ্যে আমরা ও আমাদের দৃষ্ট এবং অনুভূত সকল বস্তু ধৃত হ'য়ে রয়েছে।

এইবার এই জাগতিক ব্যাপারকে একটু অন্যভাবে বিচার করা যাক্। আমরা জানি, আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়, আমাদের দেহ নড়ে, সেই সঙ্গে আমাদের দেহের কোটি কোটি কোষ, আমাদের চিরচঞ্চল মনও গতিময়তায় অস্থির হ'য়ে থাকে। এই অস্থির মন ও চিন্তার গতিময়তার মধ্যে আমরা স্থির বস্তুকে আর কি ক'রে যথার্থরূপে দেখতে পাব? পাব না। আর পাব না বলেই তো আমাদের জগৎ সম্বন্ধে সর্বদা ভুল ধারণা হচ্ছে। রেলগাড়ী চড়ে যাবার সময় মনে হয়—ঐ স্থির বাড়ী-ঘর, গাছপালা যেন ছুটে চলেছে; তেমনি আমাদের প্রাণের, আমাদের মনের গতি আরোপিত হয়েই তো এই জগৎকে প্রাণবন্ত ও স্পন্দনশীল ক'রে তুলেছে। যদি কোন এক সময় আমাদের ভেতরে সকল চিত্তবৃত্তির স্পন্দন থেমে যায়, অথচ আমাদের অনুভবের শক্তি থাকে, তখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে আমাদের-দেওয়া গতি বা স্পন্দনও থেমে যাবে। তখন দেখব জগৎ ব'লে কিছুই নেই—আমাদের মনের স্পন্দনে, আমাদের চিত্তের আলোড়নে, এক কথায় আমাদের কল্পনায় —জগৎটা ঐ রকম একটা প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ছায়া বা ভোজবাজির মতো, আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র। আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয়—আমার চিত্তবৃত্তি স্থির হ'লে আমার সুমুখের এই মায়ার লীলাতরঙ্গও যাবে থেমে। আর তখনই আমি বিশ্বের যথার্থ রূপ (অরূপ?) দেখতে পাব। এই অরূপকে দেখবার জন্যই সাধক তাঁর অন্তরের গতিকে থামিয়ে ফেলতে চান; বাইরের ভ্রমময় দৃশ্য থেকে নিজেকে 'আবৃতচক্ষু' ক'রে নিজের ভেতরকার গতি থামিয়ে যথার্থ জ্ঞানের সন্ধানে ছোটেন। এই সন্ধানের প্রচেষ্টাই তো সাধনা।

তাই বলি, চল পথিক, তোমার চিত্তবৃত্তিকে নিস্পন্দিত করার তপস্যায় ডুবে যাবে চল। চল তোমার যথার্থ জ্ঞানান্বেষণের সাধনায়। যে সাধনার সিদ্ধিতে তুমিও ঋগ্বেদের (৫।৬২।১) ঋষির মতো বলতে পারবে—'দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যাম্ (দেবতাদের সকল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু দেখলাম আমি)।' চল, চল সেই শ্রেষ্ঠ বপুর দর্শনের পথে—যেখানে তোমার জীবনের স্পন্দিত তালকে নিজেরই লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাধতে পারবে অপূর্ব এক সঙ্গীত-মূর্ছনা। চল, চল আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

'মা আমায় ঘুরাবি কত ?'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

'মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত—
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।'

ভক্ত রামপ্রসাদ প্রাণের বেদনা সকরুণ-ভাবে মাকে জানাচ্ছেন। এর মূলে রয়েছে বিষাদ। ভোগবাসনা না গেলে এরূপ ব্যাকুলতা আসে না। এই গানের ভেতর দিয়েই সব পাই। শাস্ত্রপাঠের আর দরকার হয় না। সংসার ঘানি, মায়া ঠুলি, মন-রূপ বলদকে মা বেঁধে রেখেছেন, আর ঘোরাচ্ছেন। বলদটার দিকে তাকিয়ে দেখ—কেবলই ঘুরে চলেছে। গীতায়ও ভগবান বলেছেন :

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮।৬১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে একটি প্রাণের কথা শোনাচ্ছেন। ভগবান অযাচিতভাবে বলছেন : উপদেশ তোমায় যা দেবার দিয়েছি, এখন তোমায় একটি গুহ্যতম কথা বলছি, কারণ তোমায় বড় ভালবাসি। জিজ্ঞাসা করোনি, তবু তোমায় বলছি—তোমার হিতের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন প্রথমে সারথিরূপে, তারপর হলেন গুরু। অর্জুনের মনের অবস্থা চিন্তা করো ; শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'এই দুই দলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করো। যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছেন দেখব।' তখন অর্জুনের মনের অবস্থা কি! অর্জুন বললেন, 'এ কি দেখছি! সব আত্মীয় স্বজন। এদেরই রক্ত-মাখানো যে বিষয়—সেই বিষয় ভোগ ক'রব ?' শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'এ মোহ কোথা থেকে এল ? দাঁড়াও, নিজেকে সামলাও।' অর্জুন বললেন, 'এদের বধ ক'রে রাজ্য চাই না। আমায় ক্ষমা করো।' তখন কোথায় তাঁর সে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য, বীর্য! মনের এ একটা অবস্থা হয়। সকলেরই হয়। এ অবস্থায় অর্জুন বলছেন, 'কার্পণ্যদোষে আমার ক্ষত্রিয়-ভাবটি নষ্ট হয়েছে।' কার্পণ্যদোষ কেন বলছেন ? কৃপণের সব আছে, অথচ কিছুই ভোগে আসে না। ছেঁড়া কাপড় পরছে। অর্জুনের ঠিক তাই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'তুমি ঠিক ক'রে ব'লে দাও, কিসে আমার মঙ্গল হবে।' এ থেকে একটা বড় জিনিস শিক্ষা করি। আমরা কেবল বই পড়ে রেখেছি। এই অবস্থা হ'লে সকলেই একজনকে খোঁজে, যে ব'লে দেবে কিসে তার ভাল হবে। সেই গুরু। অর্জুন ভগবানকেই গুরুরূপে বরণ করলেন, তাঁর হলেন শিষ্য। পূর্বের সম্বন্ধ ভুলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগে ছিলেন সারথি। যখন গুরু হলেন তখন অর্জুনের মনের রাশ ধরলেন। দু হাতই বাঁধা পড়ল—এক হাতে মনের রাশ আর এক হাতে ঘোড়ার রাশ। বিষাদই হ'ল আসল জিনিস—সত্যবস্তুকে লাভ করার, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তোমায় কত কথা বলেছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয়নি। এখন তোমায় যা ব'লব, তা অতি গুহ্যতম। গুহ্য, গুহ্যতর আবার গুহ্যতম আছে। কর্মের বিষয়, জ্ঞানের বিষয়, যোগের বিষয় শিক্ষা দিয়েছি।'

* লখনৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ২০.৯.৫৩ তারিখে প্রদত্ত একটি ধর্মপ্রসঙ্গ। জনৈক ভক্ত কর্তৃক শ্রুত-লিখিত।

ভগবান অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দিলেন, তারপর বিশ্বরূপ ধরে বললেন, দেখ ভবিষ্যতে কি হবে। আমরা জানি না, এক সেকেণ্ড পরে কি হবে। ভগবানের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সব জানা। বললেন, দেখ কত বৎসরের সাধন, কত জন্মের সংস্কার নিয়ে এসেছ এদের বধ করবার জন্য। তারপর বলছেন, 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' নিজের পুরুষকারের ওপর নির্ভর করতে হবে। তার পর চাই কৃপা। এই দুটি এক সঙ্গে মিলিত হলেই সব হ'ল। অর্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। ভগবান বললেন, 'তুমি বধ করবে? দেখ, আমি সব বধ ক'রে রেখেছি। তুমি আমার যন্ত্র হ'য়ে কাজ করো।'

ঠাকুরের মুখে এ বিষয়ে কত কথাই না বেরিয়েছে। মাকে বলছেন, 'মা, আমি রথ, তুমি রথী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।' ঠাকুর যন্ত্র হ'য়ে মায়ের কাজ করেছেন। এই যন্ত্র হওয়াই আসল কথা।

ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে গেছেন। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। ঠাকুর যেখানে যা বলতেন, তা কি আগে থেকে মাথায় পুঁজি ক'রে নিয়ে যেতেন! তিনি তো কিছু পড়েননি। তাঁর ছিল মায়ের জ্ঞানেই অফুরন্ত ভাণ্ডার। অর্থাৎ মা-ই তাঁর ভেতর দিয়ে বলতেন। কত বড় বড় পণ্ডিত দেখেছি, বসে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনছেন, কথামৃতের দু-একটি কথা শুনে—যাবার সময় বলছেন, মহারাজ আর উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঠাকুরের বাণীর এমনি শক্তি!

বেণীপালের বাগানে ঠাকুর বেড়াতে গেছেন। বেণীপাল ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলছেন, আজ আমাদের কত আনন্দ দিলেন! ঠাকুর বললেন, 'ওগো, ও কি বলছো, আমি কি জানি! মা-ই সব বলেছেন।' স্বামী বিবেকানন্দের কত বড় মস্তিষ্ক ছিল, তিনি তো ঠাকুরের যন্ত্রস্বরূপ হয়েই কাজ করলেন। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, 'অর্জুন আমি সব মেরে রেখেছি।'

গুরু কে? স্বয়ং ভগবান। আমার আমিত্বের কোন মূল্য নেই। তাঁকে নিয়েই সব কাজ করতে হবে। ভগবান বলছেন, আমাকে আশ্রয় ক'রে সব করো। তাঁকে ছেড়ে কিছু নয়। ঠাকুর আর এক ভাবে বলেন, খোঁটা ধরে ঘুরতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সমস্ত জগৎকে বলছেন, যন্ত্রারূঢ় ক'রে সকলকে ঘোরাচ্ছি। রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। ঈশ্বর সকলকে ধরে আছেন, ভবের গাছে বেঁধে পাক দিয়ে ঘোরাচ্ছেন। সকলের পিছনে তিনি রয়েছেন। আমরা অজ্ঞান, আমাদের অহঙ্কারের মূল্য কি? আসল জিনিস—ভগবানের কাছে মাথা নোয়ানো। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'বড় হবি তো ছোট হ'। তিনি যাকে বড় করেন, সেই বড় হয়।

এখন কি ক'রে ঘানি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? 'খুলে দে মা চোখের ঠুলি'—রামপ্রসাদ মাকে কি ভাবে বলছেন দেখ, জোর করছেন; বলছেন, 'তুই যে আপন মা। তুই তো পর নয়। কত লোক দুর্গা দুর্গা ব'লে তরে গেল, আর আমি পড়ে থাকবো?'—

আর কারে ডাকিব শ্যামা?
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
মারিলে ছাওয়ালে ডাকে মা মা ব'লে,
আর কারে ডাকিব শ্যামা?
মা যদি সন্তানে মারে তবুও সে মা মা করে।
আর কারে ডাকিব শ্যামা?

মা ছেলেকে ফেলে দিচ্ছেন, মারছেন, তবুও সে মাকে ছাড়ছে না। আমরা যেই দুঃখ পেলাম, অমনি ভগবানকে ভুলে গেলাম। ওই একটা গান চিন্তা করলেই কত কথা মনে আসে। গীতায় ভগবান ঠিক তাই বলেছেন, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। তিনি যদি সংসারে রেখে ঘোরাচ্ছেন, তা আমরা ক'রব কি? আমরা অসহায়, আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? গীতাতেই ভগবান উপায় বলেছেন:

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাংশান্তিং স্থানংপ্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

তাঁর পায়ে একেবারে জড়িয়ে পড়—কায়-মনোবাক্যে, ভাবের ঘরে চুরি না ক'রে। তোমার দিক দিয়ে চাই পুরুষকার। আর তিনি কি করবেন? তিনি পরা শান্তি দেবেন। তুমি তো চারিদিকে ছড়িয়ে আছ। ছটা রিপু টেনে রেখেছে, যেতেই দেবে না। ভেতরে যেতে হবে। বিষয়গুলো যেতে দেয় না। দেখ না—মন কেমন তেজী ঘোড়ার (ইন্দ্রিয়ের) পেছনে ছুটছে। সেই জন্ম অর্জুনকে বলছেন, 'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।' (গীতা ২।৬১) ঘোড়াগুলোকে সংযত করো, ঘোড়াগুলোর বশীভূত হ'য়ো না। ইন্দ্রিয়ের দাস হ'য়ো না। ঠাকুরও দেখ মনকে কেমন গড়ছেন, ভাঙছেন। স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি করালেন।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' তুমি আর এই সব ক্রিয়াকলাপের ভেতর থেকো না; ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য—এ সবেরও পারে যাও। আমার শরণাগত হও। আর ভগবান কি করবেন? 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' সকল ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্য রূপ বন্ধন হ'তে আমি তোমায় মুক্ত ক'রব। ধর্মাধর্মের পারে গেলে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা হয়। একদিন ঠাকুর মাকে বলছেন, 'এই নে মা তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম। এই নে মা তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য। এই নে মা তোর শুচি, এই নে তোর অশুচি।' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাছে বসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, কি রইল তাহলে?' ঠাকুর বললেন, 'কেন—শুদ্ধা ভক্তি'। এই ভক্তি লাভ হ'লে রাস্তা সোজা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কেমন বোঝাতেন—জলের আর স্থলের। বন্যা হ'লে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল, তখন আর নদীতে এঁকে বেঁকে যেতে হবে না। ধান কাটা হ'য়ে গেলে সোজা চলে যাও, আর আল দিয়ে যেতে হবে না। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হ'লে একেবারে সোজা চলে যাবে।

কৃপা লাভ করতে গেলেও আগে পুরুষকার চাই। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।' ভগবান বলছেন, এই চারটি গুহ্যতম কথা। এখানে উপবাস নেই, নাক-টেপা নেই। সরল চারটি কথা। তারপর প্রতিজ্ঞা করছেন, 'মামে-বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।' —তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি আমাকে এইরূপে পাবে। অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে জগদ্বাসীকে তিনি বলছেন, 'আমার ভক্ত হও, আমাতে মন দাও, আমার ভজন কর, আমায় নমস্কার করো।' এই চারটি করা চাই-ই।

উপায় তো জেনে নিলে, এখন সাধন কর। এ তাঁর বাণী; কিন্তু বিশ্বাস কোথায়। বিশ্বাসই দুর্লভ জিনিস।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য কথা মনে হ'লে আনন্দে প্রাণ ভরে যায়। বস্তুতঃ সেই সব পুণ্য দিনের কথা মনে হ'লে মন যেন একটা স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হ'য়ে যায়। সেই অপার করুণার মূর্ত প্রতীক মহাপুরুষকে দর্শন করবার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে, তিনিই ধন্য। ১৯২৮ খৃঃ আমি প্রথম মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন লাভ করি, তখন আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর মাত্র।

মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে আসবার পূর্বে—আমার বাল্যের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩।৪ বৎসর বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধি কি অসহায় অবস্থায় যে আমাদের দিনগুলি কাটত, তা স্মরণ করলে এখনও ভয়ে শিউরে উঠি। অনাহারে, অর্ধাহারে, মাথায় তেল নেই, পায়ে জুতা নেই, পরনে কাপড় নেই, এই ভাবে শৈশবকাল অতিবাহিত হ'তে লাগল। ভাবতাম এমন কি কেউ নেই, যিনি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। শুনেছিলাম, উপেন মুখোপাধ্যায় নিদারুণ দুঃখকষ্টে এই রকম অসহায় অবস্থায় ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর অপার করুণার ফলে পরবর্তী কালে তাঁর আর কোন অভাব ছিল না। এই ঘটনাটি শিশুকালে আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে অনেক সময় ভাবতাম, আমিও যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে পারি, তাহলে তিনি আমারও একটা সুরাহা ক'রে দেবেন। এক দিন না খেয়ে স্কুলে যাচ্ছি—রাস্তায় ক্ষুধার জ্বালায় ও দুঃখে কান্না এসে গেল। নিজেকে যেন আর সামলাতে পারি না। রাস্তার ধারে মাঠের ভেতরে চলে গেলাম এবং ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলাম, 'হে ঠাকুর, তুমি কত দুঃখী দরিদ্র অনাথ অসহায়ের জন্য কত কি কর, আমার এই দুঃখের কি কিছু লাঘব তুমি করতে পারো না?'

আমার এখন মনে হয়—শ্রীশ্রীঠাকুর আমার সেই আবেদন শুনেছিলেন, এবং সেই কারণেই অভাবনীয় ভাবে আমার তাঁর শ্রীশ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য হয়। এত শৈশবে পিতৃহীন হয়েছিলাম যে আমার পিতার কথা কিংবা তাঁর চেহারার কথা কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু অপার করুণায় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে এমন পিতার কাছে এনে দিলেন, যাঁকে পেয়ে আমার ইহকাল পরকাল চিরকালের পিতা লাভ হ'ল।

বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য সান্নিধ্যে আসা আমার জীবনে একটা অভাবনীয় ঘটনা। তখন আমি বেলগেছিয়া পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ রায় সাহেব দিবাকর দে মহাশয় মঠের একনিষ্ঠ ভক্ত, মঠের গোশালার গরু-বাছুরের চিকিৎসা করতেন। একবার অসুস্থ থাকায় প্রয়োজনমত তিনি মঠে যেতে পারলেন না, আমাকে পাঠালেন। আমি দেখে এসে সব কথা বললে তিনি সেই মত ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা করলেন। এইরূপ চলতে লাগল। যখনই মঠে যেতাম, তখনই পূজনীয় 'প্রিয়' মহারাজ আমাকে আসা-যাওয়ার পাথেয় দিতেন। আমি লজ্জা পেতাম। বলতাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য পয়সা দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। প্রিয় মহারাজ

আমার অবস্থা বুঝতেন, বলতেন, 'এখন তোমার এই অবস্থা, তাই তোমাকে দিচ্ছি; শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তোমাকে দেবেন, তখন আবার তুমি ঠাকুরকে দিও।'

এই ভাবে মঠে প্রায়ই যাতায়াতের ফলে সাধুদের স্নেহভাজন হ'য়ে পড়লাম। মঠে তখন মহাপুরুষ মহারাজ রয়েছেন; দূর থেকে তাঁকে দর্শন করেছি, কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের ধ্যানময় গম্ভীর ভাবাবস্থায় তাঁর কাছে যেতে আমার ভয় ক'রত। এক দিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর ঘরের দরজায় প্রণাম করতে গেছি, দেখি মহাপুরুষ মহারাজ আত্মভোলা ভাবে হাত জোড় ক'রে তাঁর ঘরের পূর্ব দিকের বারাণ্ডায় পাদচারণ করছেন। সে দিকে আর বেশিক্ষণ না তাকিয়ে আমি স্বামীজীর উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের দরজায় মস্তক নত ক'রে প্রণাম করছি, এমন সময় দেখি মহাপুরুষ মহারাজ সেবকদের ডাকাডাকি করছেন। সেবকেরা তখন আরতির জন্য মন্দিরে ছিলেন। আমি তখনও প্রণাম করছি—আমার ভয় হ'ল, মনে হ'ল—আমার এই সময়ে এখানে প্রণাম করা দেখে মহাপুরুষ মহারাজ বোধ হয় আমাকেই বকাবকি করছেন। ভীত মনে উঠে দেখি, মহাপুরুষ মহারাজ যখন ভাবে বিভোর, সেই সময় একটি মহিলা তাঁকে প্রণাম করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেবকেরা আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় এই মহিলাটিকে কেন এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে। এইভাব দেখে মহিলাটি নিচে চলে গেলেন, আমিও ভয়ে ভয়ে চুপি-চুপি চলে এলাম।

এই ঘটনাটির মাত্র কয়েক দিন পরে সকাল বেলা আবার গরু দেখবার জন্যে মঠে আমার ডাক পড়েছে। আমি স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি, পাশের ঘরে তিন জন সাধু বসে আছেন। বলা বাহুল্য পূর্ব হতেই আমি এঁদের বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাঁরা আমাকে দেখে বললেন, 'আজ এসেছ, ভালই করেছ। মহাপুরুষ মহারাজ ঘরে বসে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাও, যাতে তিনি কৃপা ক'রে তোমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দেন।' আমি বললাম, 'দীক্ষা কি, আমি জানি না, তার পর তাঁর কাছে যেতে আমার ভয় করে। উপরন্তু সে দিন যে দৃশ্য দেখেছি, এর পর তাঁর কাছে যেতে আমার মোটেই সাহস হয় না।' কিন্তু তাঁরা এত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে আমি বললাম, 'আপনাদের যখন আমার দীক্ষার সম্বন্ধে এত আগ্রহ, তখন আপনারাই আমার দীক্ষার সম্বন্ধে তাঁর কাছে প্রস্তাব করুন, তিনি যদি সম্মত হন, তখন আমি তাঁর কাছে যাব।' তখন তাঁরা বললেন, 'নিজের দীক্ষার জন্য নিজেকেই প্রার্থনা জানাতে হয়।' তখন আমি নিরুপায় হ'য়ে মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে যাবার জন্য অগ্রসর হলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, দেবাদিদেব মহাদেব যেন প্রসন্ন ও প্রশান্ত মনে বসে আছেন। মনে হ'ল—তিনি যেন সব কথা শুনতে পেয়েছেন, এবং আমাকে তাঁর অভয় পদে আশ্রয় দেবার জন্য যেন অপেক্ষা করছেন। আমি যখন নতজানু হ'য়ে করজোড়ে প্রার্থনা জানালাম, তখন তিনি হো হো ক'রে হেসে বললেন, 'বেশ বাবা বেশ, ২।৩ দিন পরে স্নানযাত্রা, পুণ্য দিন, ঐ দিন রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ঐ দিন সকালে এসো, তোমাকে দীক্ষা দেবো।'

তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার পর আমার সেই শৈশবের প্রার্থনার কথা মনে পড়ল। তাঁর কাছে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সাধু লম্পট, কোন কিছুর পার্থক্য ছিল না, সবাইকে তিনি একই করুণার দৃষ্টিতে দেখতেন, এমন কি

গরুবাছুর পশুপক্ষীকেও সেই একই দৃষ্টিতে দেখতেন। এক দিনের ঘটনা—বেলুড় মঠে একটি গরুর বাছুর হয়েছে; গাভীটি অসুস্থ, এ খবর মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেছে। গরুটি অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, এই খবর শুনে তিনি যেন গরুটির যন্ত্রণা নিজেই অনুভব ক'রে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'গৌরী-শঙ্করকে এখনই ডেকে পাঠাও।' আমি গিয়ে যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করলে গরুটির যেন সমস্ত কষ্ট নিমেষে দূর হ'য়ে গেল। পূঃ অনঙ্গ মহারাজ তখন গোশালার তত্ত্বাবধান করতেন, তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে গিয়ে খবরটি দিতে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে সমস্ত বিষয় জানালাম। গরুটি সুস্থ হয়েছে জেনে তিনিও যেন সুস্থ হলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ গৌরীশঙ্কর, তুমি মঠের গরুর সেবা কর, এতে তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবাই করা হচ্ছে, মঠের যা কিছু দেখ, সবই ঠাকুরের।' তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যবহৃত ধুতি গেঞ্জি চাদর প্রভৃতি আমাকে দেবার জন্য তাঁর সেবককে বললেন। তাঁর সেই স্নেহ-জড়িত স্মৃতিটুকু আজ আমার পূজার সামগ্রী।

প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম না ক'রে যদি কেউ আগে তাঁকে দর্শন করতে যেত, তাতে তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি আন্তরিক ভাবে অহর্নিশি অনুভব করতেন যে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মঠে বিরাজ করছেন; আর বলতেন, আশ্রিতেরা যদি কোন রকমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে একটি প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, তাহলে তাদের আর কল্যাণের অবধি থাকবে না। নিজেও তিনি অহর্নিশি ঠাকুরের ভাবে ঠাকুরময় হ'য়ে থাকতেন।

তাঁর তিনটি প্রিয় কুকুর ছিল: কেলো, ভুলো ও লালু। তারা তাঁর এত শরণাগত ছিল যে তাঁকে দেখতে পেলেই তারা তাঁর শ্রীচরণে লুটোপুটি খেত। মহাপুরুষ মহারাজ তাদের কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে মনে হ'ত, কেলো ভুলো লালুর কি সৌভাগ্য! আমাকেও তিনি কত দিন খাইয়েছেন, কত স্নেহ করেছেন। আমাকে তিনি কেবল একটি কথা ব'লে গেছেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে থেকো, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালোবেসো, তিনিই তোমার সর্বস্ব, এইটুকু জেনে তাঁর পাদপদ্মে শরণাগত হ'য়ে পড়ে থেকো।' আজ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহা-রাজের পাদপদ্মে সর্বক্ষণ জানাতে ইচ্ছা করে, 'তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর: যেন তোমার ঐ আদেশ, ঐ উপদেশ সার্থক হয়। আমার জীবনে তোমার ঐ উপদেশ যেন আশীর্বাদ রূপে বর্ণে বর্ণে সত্য হ'য়ে ফুটে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু-লীলা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার শ্রীগুরু-বন্দনামুখে পরম ভক্তিভরে গেয়েছেন :

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছা-কল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥

বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবন-লীলাই অহেতুক প্রেম ও অযাচিত কৃপার মূর্ত প্রকাশ। অপার করুণায় আত্মহারা হ'য়ে কত ভক্ত-অভক্তকে যে তিনি দিব্য শক্তির পূত স্পর্শ দ্বারা অভয় আশ্রয় দানে কৃতার্থ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই লোকোত্তর বিরাট পুরুষের আদি ও মধ্যলীলায় ঐরূপ কৃপা বিতরণ বিশেষ বিশেষ পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও অন্ত্যলীলায় তা সকল সীমারেখাকে অতিক্রম করে। ফলে তা ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান্-মূর্খ, ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে সকলের প্রতি স্বতই অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়।

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন।—পুঁথি

১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিনব লীলায় এক মহা স্মরণীয় দিবস। এই দিনটি নির্বিচারে সর্বসাধারণকে তাঁর আত্মপ্রকাশে অভয় আশ্রয় দানের অতুল মহিমায় চির-সমুজ্জ্বল। তাঁর ঐ অভিনব আত্মপ্রকাশ সমগ্র জীব-জগতের প্রতি অহেতুক প্রেম ও অযাচিত কৃপা-প্রকাশেরই পরম লীলা। এই জন্যই এই পুণ্য দিনটি আপামর সাধারণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' বা অভয় আশ্রয় দানের দিবসরূপে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর ঐ অপূর্ব লীলার বিবরণী 'লীলা-প্রসঙ্গ' (দিব্যভাব) ও পুঁথিতে সবিস্তার বর্ণিত রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন চিকিৎসার্থ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রয়েছেন। ঐ লীলাপ্রকাশের প্রায় সপ্তাহ তিনেক পূর্বে (১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) তিনি শ্যামপুকুর হ'তে তথায় শুভাগমন করেছেন। স্থান পরিবর্তনের ফলে তিনি তখন অনেকটা সুস্থ। ভক্ত সেবকগণ এই কারণে পরম আশান্বিত ও মহা আহ্লাদিত।

১লা জানুআরি ইংরেজী নববর্ষ উৎসব। এই উপলক্ষে সাধারণ অবকাশ থাকায় ভক্তগণ অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য দর্শন ও কুশল শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় সেদিন উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ নিম্নের হল ঘরে, কেহ কেহ বা উদ্যানস্থ বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়াতলে বিশ্রামে ও সদালাপে রত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে কতিপয় ভক্তসেবকসহ বিরাজমান।

নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরু বেশ॥ —পুঁথি

ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মামা শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তফী শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অহেতুক করুণাভরে ঠাকুর ঐ দিবস সর্বপ্রথম তাঁকেই অপার কৃপাদানে পরম কৃতার্থ করলেন। প্রভুর ঐ দিব্য করুণাস্পর্শ লাভের সঙ্গেই এক আশ্চর্য পুলকভরে হরিশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তাঁর হৃদয়ের প্রেম বিগলিত হ'য়ে অশ্রুধারায় নেত্রদ্বয় প্লাবিত হ'ল। অদ্ভুত আনন্দের উদ্দাম বেগে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠল, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হ'ল। তিনি একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে চিত্রার্পিতের ন্যায়

দণ্ডায়মান রইলেন এবং অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

হরিষে হরিশচন্দ্র মুখে মাত্র স্ফুরে।
কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে॥—পুঁথি

হরিশকে ঐ ভাবে অভয় আশ্রয় দানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের করুণাসিন্ধু যেন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নিম্নের হল-ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের আহ্বানে দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তথায় করযোড়ে উপস্থিত হলেন। হরিশের ঐরূপ অভূতপূর্ব দিব্য ভাবাবস্থা দর্শনে তিনি অতিশয় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রেমগদ্‌গদ-স্বরে সহাস্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: রাম, গিরিশ প্রভৃতি আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে কেন?

স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে॥—পুঁথি

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ নিগূঢ় কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করলেও কেন তিনি হঠাৎ তা জিজ্ঞাসা করছেন, তার রহস্য দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন না, তাই নির্বাক হ'য়ে তিনি প্রভুর শয্যাপার্শ্বে যুক্তকরে দণ্ডায়মান রইলেন, তার ফলে ঠাকুরের হৃদয়স্থ করুণা-পারাবার আরও অধিকতর উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। উদ্যান-মধ্যে দীন-হীন কাঙাল-আতুর, ভক্ত-অভক্ত—যে যেখানে ছিল সকলের জন্যই দীনবন্ধু করুণাসাগর প্রভু অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। নির্বিচারে সকলকে অভয় আশ্রয় দানের জন্য হৃদয়ের সুতীব্র ব্যাকুলতায় তিনি অধীর হ'য়ে পড়লেন।

তখন বেলা প্রায় তিন ঘটিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর আর উপরে থাকতে পারলেন না। দেবেন্দ্র-প্রমুখ কয়েকজন ভক্তসহ ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন। তাঁর পরিধানে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বনাতের সবুজ রঙের জামা, মাথায় কর্ণমূল-ঢাকা বনাতের সবুজ টুপি এবং পায়ে মোজা ও লতাপাতা-আঁকা সবুজ চটিজুতা।

শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥—পুঁথি

শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ অতি অপরূপ দক্ষিণা-মূর্তি। নির্বিশেষে সকলকে অভয় দানের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও আত্মহারা।

নিম্নতলে নেমে আসতেই প্রথমে হল-ঘরের ভক্তগণের উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পতিত হ'ল। ভক্তগণ তাঁকে সহসা অবতরণ করতে দেখে যেরূপ আহ্লাদিত, সেইরূপ বিস্মিত হলেন। কারণ এই বাটীতে এসে মাত্র একদিন তিনি উদ্যানে ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে ক্লান্তি বোধের ফলে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে তিনি আর উদ্যানে ভ্রমণ করেননি। প্রয়োজনবোধে দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণের ছাদে তিনি কখন কখন পাদচারণ করতেন। যা হোক, হল-ঘরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনমাত্রই ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে তাঁর শ্রীচরণ উদ্দেশে সভক্তি প্রণিপাত জানালেন।

ভবন হইতে পরে উদ্যানের পথে।
সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু সাথে॥
বাগানে ভ্রমেন প্রভু শুনিয়া বারতা।
নিকটে জুটিল সবে যেবা ছিল যেথা॥—পুঁথি

ঐ হল-ঘরের পশ্চিম দ্বার দিয়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে বহির্গত হলেন। উদ্যান-পথে নেমেই চারিদিকে সকলের উপর সপ্রেম দৃষ্টিপাত করলেন। ছায়াতলে যাঁরা বিশ্রাম করছিলেন, আলাপাদিতে রত ছিলেন, তাঁরাও ঠাকুরকে হঠাৎ দর্শন ক'রে পরম পুলকিত ও বিস্মিত হলেন। যিনি যেখানে ছিলেন তিনি সেই স্থান হতেই তৎক্ষণাৎ শ্রীপ্রভুর চরণকমল

উদ্দেশে আনত শিরে প্রণতি নিবেদন করলেন। ক্রমে সকলে একে একে তাঁর কাছে সমবেত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণমুখে ক্রমশঃ ফটকের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। ভক্তগণ সসম্ভ্রমে তাঁর পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থেকে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চললেন। বসতবাটী ও দক্ষিণের ফটকের ঠিক মধ্যপথে উপনীত হ'য়ে তিনি শ্রীযুক্ত গিরিশ, রাম, অতুল প্রমুখ ভক্তগণকে পশ্চিমের এক বৃক্ষতলায় দেখতে পেলেন। তাঁরাও সহসা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্যানে ঠাকুরকে ভ্রমণ করতে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁরা তখন ভক্তিনম্র হ'য়ে তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে লাগলেন। ঐ অবসরে ঠাকুর তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত ক'রে তাঁদের আহ্বান করলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ পরম উল্লাসে তাঁর সমীপে উপস্থিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণাঘন মূর্তিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান হলেন। প্রায় ত্রিশ জনেরও অধিক ভক্ত তথায় সমবেত। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নাই, সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। ঠাকুর তখন প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'গিরিশ! তুমি যে সকলকে আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে এত কথা ব'লে বেড়াও, তুমি আমার মধ্যে কি দেখেছ এবং আমার সম্বন্ধে কি বুঝেছ?'

হঠাৎ দাঁড়াইয়া পথে শ্রীগিরিশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে কিবা লয় মন॥—পুঁথি

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মমূলে নতজানু হলেন এবং করযোড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর শ্রীমুখকমল পানে চেয়ে ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে বললেন—'প্রভু! শুক-ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর মহিমা সম্বন্ধে কি আর অধিক বলতে পারি!' গিরিশের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'। তাঁর ঐ উক্তি শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ এক অপূর্ব দিব্য ভাবে শিউরে উঠল এবং পথের উপরেই তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর॥—পুঁথি

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অপলক নেত্রে শ্রীপ্রভুর ঐ দিব্য অবস্থা দর্শন করছেন। তাঁর হাস্যোৎফুল্ল মুখশ্রী, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল নিস্পন্দ নিথর দেহ, সুমনোহর পরিচ্ছদ—সমস্ত মিলে এক অপূর্ব নয়নাভিরাম রূপ। ভাগ্যবান্ ভক্ত-সেবকগণ শ্রীপ্রভুর অভিনব কল্পতরু-মহাভাবের অপরূপ প্রিয়দর্শন মূর্তি অবলোকন ক'রে বিমোহিত ও আত্মহারা।

ভক্ত অক্ষয় (পুঁথিকার) শ্রীশ্রীঠাকুরের ও-রূপ সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁর শ্রীচরণযুগলে দুটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণচাঁপা অঞ্জলি দিলেন! কয়েকজন বন্ধুসহ ঐ উদ্যানে তিনি একটি চাঁপাফুলের গাছে বানর-বানর খেলছিলেন। সেই সময়ই তিনি ঐ চাঁপা দুটি সংগ্রহ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিম্নতলে সহসা অবতীর্ণ দেখেই তাঁরা খেলা-ধূলা বন্ধ ক'রে আনন্দে ছুটে আসেন এবং তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ঐ দিব্যলীলা দর্শনে মগ্ন হন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ভাব কতকটা প্রশমিত হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হলেন। ঐরূপ অবস্থায় তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক সকলকে শুভাশীর্বাদ ক'রে গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমাদের কি আর ব'লব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক!'

কিছু পরে বাহ্য চৈঠা* উদিলে শ্রীগায়।
ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায়॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি॥—পুঁথি

* চেষ্টা বা চৈতন্য।

অতঃপর ঠাকুর অহেতুক প্রেম ও অযাচিত করুণায় আত্মহারা হ'য়ে ঐরূপ অর্ধবাহ্যদশায় সকলকেই কৃপাদানে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কে 'কি গো' ব'লে সস্নেহে সম্ভাষণ ক'রে তাঁর বক্ষঃস্থলে তিনি অভয় হস্ত বুলিয়ে দিলেন। এইরূপে তাঁর মধ্যে দিব্যশক্তি সঞ্চারপূর্বক তিনি তাঁর কর্ণমূলে 'মহামন্ত্র' প্রদান করলেন। শ্রীযুক্ত নবগোপাল, উপেন্দ্র মজুমদার, রামলাল, অতুল, হরমোহন, গিরিশ, রাম, দেবেন্দ্র, হারান, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী প্রভৃতিকেও তিনি অতঃপর একে একে অভয় আশ্রয় দানে কৃতার্থ করলেন। অভিনব হেমকল্পতরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অযাচিত করুণা ও অভয় আশ্রয় লাভে তাঁদের হৃদয় মহানন্দে পরিপূর্ণ হ'ল। তাঁরা পরম পুলকে আত্মহারা হলেন, আনন্দের আতিশয্যে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

পরম পুলকে খালি ঝুরে দু'নয়ন।
প্রভুর কৃপার এই বাহ্যিক লক্ষণ॥
কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর।
আপনি বিরাজমান কৃপার ভিতর॥

* * *

কৃপা নহে কড়ি-পাতি নহে রাজ্যধন।
কিংবা নহে মনোহর কামিনী-কাঞ্চন॥
সুস্বাদু ভোজন নয়, নয় গাঁজা সুরা।
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধারা॥
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে॥—পুঁথি

নানাজনের স্পর্শে শ্রীপ্রভুর ব্যাধির উপশম হচ্ছে না, মনে ক'রে ভক্তগণ স্থির করেছিলেন, তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে তাঁকে কেহ প্রণাম করবেন না। কিন্তু আজ কল্পতরুর পূত স্পর্শলাভে তাঁদের দেহ, হৃদয় ও মন এক অতুল আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। তাঁরা নিজেদের সঙ্কল্পের কথা ভুলে গিয়ে ভক্তি ও ভাবের আতিশয্যে আত্মহারা হ'য়ে শ্রীপ্রভুর অভয় পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হলেন। রামচন্দ্র-প্রমুখ ভক্তগণ উদ্যান হ'তে তাড়াতাড়ি পুষ্প চয়ন ক'রে মন্ত্রপাঠপূর্বক তাঁর শ্রীচরণে মুঠা মুঠা অঞ্জলি দিতে লাগলেন। কেহ কেহ ভক্তি গদ্‌গদস্বরে স্তব-বন্দনা আরম্ভ ক'রে দিলেন। আবার কেহ কেহ বা উদ্যান মুখর ক'রে মুহুর্মুহুঃ প্রভুর জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

এখানে গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক।
কে কোথা খুঁজিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক॥—পুঁথি

মহাবিশ্বাসী গিরিশ ও রাম অপার প্রেমানন্দভরে উন্মত্তপ্রায় হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা এখানে সেখানে যাকেই দেখেন, তাকেই ধরে এনে শ্রীপ্রভুর অভয় চরণে উপস্থিত করলেন। অবশেষে তাঁরা দীন-দুঃখী, আর্ত-অধম কে কোথায় আছে, তাদের খুঁজে খুঁজে ধরে আনতে লাগলেন। রান্নাঘরে পাচক ব্রাহ্মণ (গাঙ্গুলী) রুটি বেলতে বসেছিল। গিরিশ তাকেও টানাটানি ক'রে ধরে এনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করলেন। সকলেই অযাচিতভাবে তাঁর অপার কৃপালাভে ধন্য হ'ল।

প্রবাদ আছে—'কল্পতরু'র নিকট যা কামনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণকমলে ভক্তগণের আজ কামনার কোন অপেক্ষা নাই, প্রার্থনার কোন দীনতা নাই। সুতরাং তিনি কি আজ 'কল্পতরু'? বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলাই সমীচীন: তিনি 'অভিনব হেমকল্পতরু'।

শ্রীযুক্ত রামলাল স্বীয় ইষ্টমূর্তির পরিপূর্ণ অবয়ব কিছুতেই ধ্যান করতে পারতেন না। তিনি ধ্যানকালে হৃদয়ে ঐ মূর্তির খানিকটা অংশমাত্র চিন্তা করতে পারতেন। কখন মুখশ্রী হ'তে কটিদেশ, কখন বা পাদপদ্ম হ'তে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত তাঁর ধ্যানে উদিত হ'ত। ইষ্টের সমগ্র

অবয়বটি কোনক্রমেই একসঙ্গে তাঁর ধ্যানে আসত না। এইজন্য তাঁর হৃদয়ে এক নিদারুণ অস্বস্তির ভাব বিরাজ ক'রত। কিন্তু আজ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যশক্তির পূত স্পর্শমাত্রই তাঁর হৃদয়পদ্মে সম্পূর্ণ ইষ্টমূর্তি জলজ্বল্ করতে লাগল। ঐ মূর্তি যেন জীবন্তরূপে তাঁর হৃদয়-কন্দর সমুদ্ভাসিত ক'রে তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠের বক্ষঃস্থল স্পর্শমাত্রই তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আকাশ-বাড়ী, গাছ-পালা—যেদিকে যা কিছু দেখেন, সমস্ত কিছুর মধ্যেই শ্রীপ্রভুর সুপ্রসন্ন হাস্যদীপ্ত করুণাঘন মূর্তি দেখতে থাকেন। ঐরূপ দিব্যদর্শনজনিত অপার আনন্দ উল্লাসের প্রচণ্ড বেগ হৃদয়ে ধারণে সক্ষম না হওয়ায় তিনি ভাবে অধীর হ'য়ে উঠেন এবং 'কে কোথায় আছিস্, এই বেলা চলে আয়' ব'লে সকলকে শ্রীপ্রভুর চরণে বারংবার আহ্বান করতে থাকেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'কার শ্রীযুক্ত অক্ষয়ের অনুভূতির বিবরণী তাঁরই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় উদ্ধৃত হ'ল :

দূর থেকে সম্ভাষিয়া 'কি গো' বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিল বক্ষের উপরে॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥—পুঁথি

যা হোক, দিব্য কল্পতরু-মহাভাবের আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ টলমল করতে লাগল। ঐরূপে তিনি নির্বিচারে সকলের উপর অযাচিতে অজস্র কৃপারাশি বর্ষণ ক'রে দ্বিতলে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হলেন। ভক্ত সেবকগণ তখন সযত্নে তাঁকে ধরাধরি ক'রে ধীরে ধীরে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন। নিম্নতলে ভক্তদের মধ্যে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত। এদিকে দ্বিতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত হ'ল। ঠাকুরের আজ্ঞায় রামলাল তাঁর সর্বাঙ্গ গঙ্গাজলে মুছিয়ে দিলেন; তবে তাঁর ঐ অসহ্য গাত্রজ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হ'ল।

শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপীদের আজি করিলা মোচন॥
তে সবার জীবনের যত পাপ-ভার।
সকল লইলা প্রভু অঙ্গে আপনার॥

*　　*　　*

গলার দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়।
জীবের মোচন-কর্মে পাপের সঞ্চয়॥
জগতের পাপরাশি লইয়া গোঁসাই।
আপনার শ্রীঅঙ্গের মধ্যে দিলা ঠাঁই॥
করুণানিদান হেন কোথা কেবা আর।
জপ-তপ রামকৃষ্ণপদ কর সার॥—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র হাজরা উদ্যান-বাটীতে দিবারাত্র থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে শ্রীপ্রভুর 'কল্পতরু-লীলা'-কালে অন্যত্র গিয়েছিলেন। ঐ লীলা সাঙ্গ হওয়ামাত্রই তিনি উদ্যানে ফিরে আসেন। ঠাকুরের অযাচিত কৃপাদানের বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে তিনি 'হায় হায়' করতে থাকেন। কারণ ঐ সময়ে উপস্থিত থাকলে তিনিও শ্রীপ্রভুর অপার কৃপা ও অভয় আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হতেন। যা হোক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের সঙ্গে হাজরার খুবই প্রীতির সম্পর্ক ছিল। হাজরাকে 'হায় হায়' করতে দেখে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে তাড়াতাড়ি দ্বিতলে শ্রীপ্রভুর নিকটে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে কৃপাদানের জন্য ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করলেন। উত্তরে ঠাকুর বললেন—'এখন হবে না। সময়সাপেক্ষ। শেষেতে ও পাবে।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), তারক (শিবানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), লাটু

(অদ্ভুতানন্দ) এবং আরও কেহ কেহ কল্পতরু-লীলার সময় উদ্যানবাটীতে ছিলেন, কিন্তু ঐ সকল ত্যাগী শিষ্যগণের কেহই লীলাস্থলে উপস্থিত হন নাই। নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি পূর্বরাত্রে শ্রীপ্রভুর সেবা এবং সাধন-ভজন ক'রে ক্লান্ত ছিলেন। তাই তাঁরা ঐ সময়ে নিম্নে হল-ঘরের পার্শ্বে ছোট ঘরটিতে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎ ও লাটু দূর হ'তে শ্রীপ্রভুর ঐ অভিনব লীলা প্রত্যক্ষ করছিলেন। গিরিশপ্রমুখ ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও তাঁরা তথায় উপস্থিত হননি। দ্বিতলে ঠাকুরের কক্ষসংলগ্ন দক্ষিণের ছাদে তাঁরা ঐ অবসরে ঠাকুরের শয্যাদি রোদে দিচ্ছিলেন এবং তাঁর কক্ষখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছ-গাছ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কর্তব্য কর্ম অর্ধনিষ্পন্ন রেখে ঐ লীলাস্থলে গমন করবার ইচ্ছা তাঁদের হয়নি। কারণ শ্রীপ্রভুর সেবা ও সন্তুষ্টি বিধানই ছিল তাঁদের জপ-তপ ও সাধন-ভজন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ত্যাগী ভক্তগণের জন্য নয়, গৃহস্থ ভক্তগণের নিকটই তাঁর এই অভিনব লীলা প্রকাশ।

বিষয়-মদিরা পানে অচৈতন্য জীবের প্রতি এদিন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পরম আশীর্বাদ: 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' শ্রীপ্রভুর অভয় আশ্রয় ও পরম করুণাপূর্ণ আশীর্বাদই আমাদের ভরসা, সমগ্র বিশ্ব-মানবের মুক্তির পরম পাথেয়।

প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায়।
'রামকৃষ্ণ' নাম গেয়ে দিন যেন যায়॥—পুঁথি

চরৈবেতি

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভয় ভাবনা করিস্ মিছে
হবি সদাই অগ্রগামী,
ভুলিস্ কেন নিয়ন্তা তোর
সাথে আছেন দিবস-যামী!

চোখ আছে তাঁর সবার 'পরে
সবই যে তাঁর ইচ্ছাধীন,
সৃষ্টি করেন সবই তিনি
তাঁতেই সকল হয় যে লীন।

নিজের মালিক তুই কি নিজে
কতটুকু সাধ্য তোর?
মরীচিকার পিছে পিছে
ছুটিস্ মিছে জীবন ভোর।

আঘাত যখন আসে নেমে
ঝরে যখন চোখের জল,
জানবি তখন এলেন তিনি
কান্না সে তোর নয় বিফল।

আপন হাতে চোখ মুছিয়ে
বসিয়ে তিনি দেন আবার—
লুটিয়ে পড়ে কাঁদে যে জন
প্রার্থী হ'য়ে তাঁর কৃপার।

তিনিই আছেন সবার মাঝে
আসন যে তাঁর বিশ্বময়,
কে-ই বা মারে, কে-ই বা রাখে
কার কাছে তোর কিসের ভয়?

সাগর-কূলে বসে তবে
ভাববি কেন নিরন্তর?
ঢেউয়ের দোলায় দুলবি যদি
সাগর-বুকে ঝাঁপিয়ে পড়।

জপ-যোগ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

'কেমন আছেন মশাই?' এই প্রশ্ন করিলে 'সুখে দুঃখে এক রকম কেটে যাচ্ছে' বলিয়া আমরা উত্তর দিয়া থাকি; কিন্তু মায়ার মোহে উপলব্ধি করি না যে এ উত্তর ঠিক হইল না। এ সংসারে একটুও সুখ নাই। এখানে যদি একটুও সুখ থাকিত, তাহা হইলে শ্রীভগবান গীতায় শ্রীঅর্জুনকে 'অনিত্যমসুখং লোকং' 'দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌' ইত্যাদি বাক্য কখনও বলিতেন না। এখানে সুখের লেশ নাই এবং দুঃখেরও অন্ত নাই।

এই কারণে পরম কারুণিক শ্রীভগবান সন্তপ্ত জীবের দুঃখ-নিবারণের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। উপায় হইতেছে—'ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌।' শ্রীভগবানকে ভজনা করিবার নানা পথ আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগই প্রধান। এই সকল পথের মধ্যে জ্ঞানমার্গ অত্যন্ত কঠিন। 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তা-সক্তচেতসাম্‌।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে ভক্তিমার্গই ভগবান-লাভের সহজ উপায়—'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' নাম-জপ নিষ্কাম কর্মযোগের অন্তর্গত, নাম-জপ হইতে শুদ্ধাভক্তি হয়; শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান একই বস্তু। দ্বৈত-বাদী ইষ্টমন্ত্র ও অদ্বৈতবাদী 'সোঽহং' মন্ত্র জপিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

ভগবান-লাভ অর্থে বুঝিতে হইবে সর্বদুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি। শ্রীভগবানের নামজপ করিতে করিতে তাঁহাতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইলেই এই সন্তাপজনক সংসারে বার বার আসা-যাওয়ার শেষ হয়।

জপের সাধারণ নিয়মগুলি প্রথমে অর্থাৎ দীক্ষার পরই সাধকগণ প্রায় ধরিতে পারেন না। সিদ্ধ গুরু দুর্লভ ও দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গলাভ অধিকতর দুর্লভ। সেজন্য সহজভাবে সাধারণের অবগতির জন্য গুরুমুখে শ্রুত ও শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত জপ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম এখানে আলোচিত হইল।

(১) মন্ত্রজপের প্রারম্ভে—প্রথমে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে। যতই সাধন-ভজন করা যাক, তাঁহার কৃপা না হইলে কিছুই সম্ভব নহে। শ্রীভগবানই কৃপা করিয়া তাঁহার নাম করাইয়া লইতেছেন ও ইহার ফল তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদিত হইতেছে, এই ভাব লইতে হইবে। অহংভাব বা নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহার দাস—এই ভাব আশ্রয় করিয়া জপ করিলে জপ নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, তখন শ্রীভগবানের কৃপা লাভ হইবে। 'নাম নামী অভেদ'—নাম করিতে করিতে নামী আকৃষ্ট হন ও কৃপা করেন।

(২) শ্রীগুরু—ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্যতিরেকে সাধন-ভজনে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর বিশেষ প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যদি কেহ আন্তরিকভাবে শ্রীভগবানে বিশ্বাস করিয়া গুরুলাভের জন্য প্রার্থনা করে, শ্রীভগবানই তখন মনুষ্যমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কৃপা করেন, দীক্ষার্থীর সংস্কার, প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া জপের জন্য উপযুক্ত মন্ত্র দেন। পুস্তকে অনেক মন্ত্রই লেখা আছে, কিন্তু সেগুলি পড়িয়া কোন কাজ হয় না। এই মন্ত্রগুলি শ্রীগুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি সহ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে

নির্গত হইয়া শিষ্যের কর্ণে প্রবেশ করিলে তবে ঐ শক্তিসাহায্যে জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায়।

(৩) **জপমালা**—প্রবর্তকের পক্ষে জপ-মালার সাহায্য লইয়া জপ করিবার সুবিধা। জপ করিবার পূর্বে মালা শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক অর্থাৎ গুরু মালা স্পর্শ করিয়া ও পরমাত্মাকে নিবেদন করিয়া উহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবেন। অতঃপর তাঁহার উপদেশমত মালা জপিতে হইবে। মালা অনেক প্রকার দানার হইয়া থাকে, যেমন রুদ্রাক্ষের, তুলসীর, পদ্ম-বীজের। কাহার কোন্ মালা উপযুক্ত হইবে গুরুই শিষ্যের প্রকৃতি, ইষ্ট ইত্যাদি বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিবেন। যে সকল দ্রব্যের মালার বিষয় লিখিত হইল, সেইগুলি শরীরকে স্পর্শ করিলে মন ভগবন্মুখী হয়। এই কারণে এগুলি ব্যবহৃত হয়। যেমন ডাক্তার দেখিলে রোগের কথা, উকিল দেখিলে মকদ্দমার কথা মনে পড়ে, সেইরূপ বিশেষ মালা দেখিলেই ভগবানের বিশেষ রূপের কথা মনে পড়িবে। মালা পবিত্র স্থানে রাখা একান্ত কর্তব্য।

(৪) **জপের আসন**—স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া কুশ, কম্বল বা মৃগচর্মের আসনে সোজা (শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে) হইয়া বসিয়া জপ করিতে হয়। আসনের উপর উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া বসিতে হয়। হিমালয় উত্তর দিকে, সেখানে সিদ্ধ পুরুষগণ ধ্যান জপ ও সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইবার উদ্দেশ্যেই উত্তরদিকে বসিবার প্রথা হইয়াছে। পূর্বদিকে জ্ঞানের প্রতীক জ্যোতির্ময় সূর্যদেব উদিত হন, জ্ঞানপ্রার্থী অন্তরে ঐরূপ জ্ঞানজ্যোতি উদিত হইবে বলিয়া পূর্বমুখ করিয়া বসিয়া জপ করেন।

(৫) **জপের সময়**—সন্ধিক্ষণই জপের প্রকৃত সময়। রাত্রি বিদায় লইতেছে, দিবা আসিতেছে বা দিবার অবসান হইতেছে ও রাত্রি আসিতেছে—এই সময় প্রকৃতি শান্ত হন, এই শান্তি ও নিস্তব্ধতার পরিবেশে মন সহজেই সমতা লাভ করে। ব্রাহ্মমুহূর্ত (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ২॥ দণ্ড বা ১ ঘণ্টা পূর্বে) ঈশ্বর-চিন্তার বিশেষ অনুকূল সময়।

জপ যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ করা উচিত। আধ ঘণ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত নিয়মিত করিতে পারিলে শীঘ্রই সুফল পাওয়া যায়।

(৬) **জপে বসিবার স্থান**—মনের উপর পরিবেশেরও বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। ঠাকুরপূজার নির্দিষ্ট ঘরে, দেবতার মন্দিরে, পুণ্য-সলিলা নদীতীরে, সুদৃশ্য পুষ্পশোভিত পর্বতের নিকটে বা তীর্থে বসিয়া মালা জপ করিলে মন শীঘ্র ভগবন্মুখী হয়। গীতায় আছে, পবিত্র নিরাপদ শব্দ- ও বাত্যা-শূন্য স্থানে বসিয়া জপ-ধ্যান করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছবিতে যেভাবে বসিয়া আছেন, সেই ভাবে বা যে আসনে অনেকক্ষণ বসিবার সুবিধা হয়, সেই আসনে বসিয়া জপ করাই প্রশস্ত।

(৭) **জপ**—অপরে শুনিতে পায় এরূপ করিয়া জপ করাকে বাচিক, শব্দ না করিয়া ধীরে ধীরে নিজে শুনিতে পাওয়া যায় এরূপ জপকে উপাংশু ও নিঃশব্দে মনে মনে জপ করাকে মানস জপ কহে। মানস জপই শ্রেষ্ঠ জপ।

মালা ছাড়া 'করে'ও জপ করা চলে। করে জপকালে কর বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখাই বিধি।

আর একপ্রকার জপ আছে: অজপা জপ; শ্বাসে শ্বাসে এই জপ করিতে হয়,—'হংসঃ সোঽহং' জপ, নিশ্বাস লইবার সময় 'হং', ত্যাগ

করিবার সময় 'সঃ'। পতঞ্জলির মতে মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাই জপ; দেবতার চিন্তাও জপ।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন যে সব সময়ই জপ করিতে পারা যায়—'চলতে, ফিরতে, খেতে শুতে জপ করতে পারলেই ভাল হয়।' তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, ধ্যান-জপের পরই আসন ছাড়িয়া উঠিতে নাই, কিছুক্ষণ আসনে বসিয়া চিন্তা করিলে ভাব গাঢ় হয়, এবং উঠিয়াও কিছুক্ষণ মৌন থাকিলে ভাব গাঢ়তর হইবে।

জপে ডুবিয়া যাইলে সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময় সংখ্যা রাখিতে গেলে concentration-এর (তন্ময়তার) ব্যাঘাত জন্মে, স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, 'প্রেমের সহিত একবার জপ ভাসা ভাসা লক্ষবার জপের চেয়েও ভাল, একি বাজারের জিনিস গা, এত দিলুম আর এত পেলুম!' সর্বদা প্রেমের সহিত জপ করাই বিধেয়। তবে প্রবর্তকের পক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে মন বসুক আর না বসুক, ধ্যানজপে বসা এবং মনকে টানিয়া আনিয়া জপে লাগানো বিশেষ আবশ্যক।

প্রথমে সাধককে এরূপ সংগ্রাম করিতেই হইবে। ধীরে ধীরে জপ করা বিধি হইলেও কোন কোন মহাত্মা বলেন, যখন মন বসিতেছে না, তখন নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ বা দ্রুত জপ করিলে মন বসিয়া যায়। শরীর যেমন খাদ্য-বৈচিত্র্য চায়, মনও চায়। কাজেই মানসিক জপ খানিকক্ষণ করিয়া ভাল না লাগিলে উপাংশু জপে মন বসে। 'জপশ্রান্তো ইষ্টং ধ্যায়েৎ ধ্যানশ্রান্তে পুনর্জপেৎ'। জপ করিতে করিতে নানারূপ অনুভূতি হইতে থাকে। জপ করিতে করিতে ইষ্টদেবতার দর্শন হইয়া থাকে।

(৮) ইষ্ট—ইষ্ট অর্থে ঈপ্সিত, প্রিয়। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, কালী বা দুর্গা ইত্যাদি ভজনার ফলে ইহজন্মে ঐ অর্চিত মূর্তিই প্রিয় বা ইষ্ট হয়। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, দুঃখ-কষ্টের সময় যে দেবতার কথা অধিক মনে পড়ে সেইটিই ইষ্ট,—ঐ ইষ্টমূর্তি হৃদয়ে অর্থাৎ নাভি হইতে ১০ আঙুল উপরে হৃদয়ে কল্পনা করিয়া জপ করিতে হয়। জপের সময় বাহ্য বস্তু হইতে চক্ষুকে সরাইয়া অর্থাৎ চোখ বুজিয়া জপ করিলে মনঃসংযোগে সাহায্য করে।

স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন, 'ইষ্ট নাম শুনিতেছেন ও কৃপা করিবার জন্য তোমার দিকে চাহিয়া আছেন ও তুমিও তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছ—এই ভাব লইয়া জপ করিতে হয়।' প্রথমে তাহা না পারিলে ইষ্টদেবতার প্রতিকৃতির সামনে বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া জপ করিলেও অগ্রসর হওয়া যায়। ক্রমশঃ মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্ট এক বোধ হয় এবং জপ করিতে করিতে ইষ্টদর্শন হয়।

(৯) জপ-সমর্পণ—জপ করিয়া তাহার ফল ইষ্টকে সমর্পণ করিতে হয়। তাহা হইলে আর শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। কোন উত্তম জিনিস পাইলে শিশুপুত্র যেমন পিতার নিকট সংরক্ষণের জন্য রাখিয়া দেয়, এ যেন সেইরূপ।

(১০) উপসংহার—শাস্ত্রে আছে 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। নাম জপ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ হয়। জপ ও ধ্যানের অতি নিকট সম্বন্ধ। স্বামী শিবানন্দ বলিতেন—'জপ করতে করতে আপনি ধ্যান হ'য়ে যায়।' জপধ্যানে মন একাগ্র হইলেই উদ্দিষ্ট বস্তু আপনি প্রকাশিত হয়। তখন সাধক সিদ্ধ হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা ও মুক্তি

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও জীবনের চৌদিকে প্রশস্ত অবকাশ রক্ষা—ভারতীয় সমাজ-সংস্কার এই দুইটি কল্পসূত্রস্বরূপ। জনবহুল আধুনিক পৃথিবীতে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার চাপে দুইটিই সঙ্কুচিত ও খর্ব হইতেছে। চীনাম্যানের পত্র-উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—'যে জাতি গবর্মেণ্টকে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, তাহার অবস্থা তোমরা কল্পনাই করিতে পার না।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—'ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, সুখশান্তি সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে।' 'ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর, বিশালতর যে মুক্তি তাহা ভারতবর্ষের তপস্যার ধন।' 'গৃহকর্মের কল্যাণ-বন্ধন, নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী।' 'ভারতের অসামান্যতা অরণ্য হ'তে সভ্যতা সৃষ্টি—বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আচারে শাস্ত্রানুগত।'

ভারতের স্বতন্ত্র আদর্শ

ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে নিপুণ রেখাপাতে ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি সর্বত্র উন্মুখ।

'আত্মশক্তি'-প্রবন্ধরাজি জাতির অন্তরে অধ্যাত্ম বল ও প্রত্যয় সন্দীপিত করার প্রয়াস। তাহাতে কবি বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি [সে] উদ্ভাবন করিতেছে, ইহার সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে'।

বাণিজ্য ও সমর-বাহিনীর নিরন্তর অভিযানই ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু 'ভারতবর্ষ সৈন্য ও পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই, সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে।'

'রাজ্যেশ্বরত্ব কোন কালেই আমাদের দেশে চরম সম্পদ রূপে ছিল না।' 'ব্রাহ্মণত্বের অধিকার অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের প্রাণের আধার ছিল।' 'ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন—ইহাদের এই মুক্তি সমাজেরই মুক্তি। যথার্থ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে।'

'শান্তিনিকেতনে' আছে, 'ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। পশুপ্রকৃতির গর্তে আবৃত মানুষ এখনো প্রবৃত্তির নাড়ী দিয়ে প্রকৃতি থেকে রস শুষে জড়ভাবে পুষ্ট হয়।' কবি বলিয়াছেন, 'স্বার্থবদ্ধ দুর্বলতা মানবাত্মা হ'তে সত্য নয়।'

বিবর্ত নয়, সীমার মাঝে আত্মলাভ

বর্তমান জগৎ এই প্রশ্নেই আজ উচ্চকিত—মানব-প্রকৃতির বিবর্তে যে রূপ গত অযুত বর্ষের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাই শেষ পর্যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের ভিত্তিতে, অতীতের সাক্ষ্যে, ইতিহাসের দৃষ্টান্তে ভারতের পক্ষে ইহার উত্তর দিয়াছেন মানবমহত্ত্বের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, অনিশ্চিত ভাবী সম্ভাবনার মুখাপেক্ষা না করিয়া।

এ ক্ষেত্রে কল্পনা তাঁহার নির্ভর নহে—ইতিবৃত্ত তাঁহার সম্পদ্।

'পথের সঞ্চয়ে' কবির অভিমত এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 'আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব—এই আমাদের সাধনা। অসীম যিনি, তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর।' এই জন্যই 'আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি, তবে সেই অসীমের প্রকাশে বাধা দিব।' 'শরীরের মধ্যে শরীরকে অতিক্রম ক'রে আত্মার মহত্ত্ব'। বিবর্তের ভাবী পর্যায়ের সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে।' আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনের মতেও দেহের দিকে মানুষের উৎকর্ষ নয়, মনের দিকে উন্নতিই তাহার বিবর্তের আগামী পর্যায়।

আত্মস্ফীতি নয়, আত্মসমাহৃতি

'আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়-ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।' এই অন্তর্জগতে ভারতের সাধনা যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী—'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'ভারতবর্ষ' পরিপূর্ণ, উচ্ছল। 'এদেশে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চরম [সন্ন্যাস] আশ্রমে, আত্মবোধের ক্ষেত্রে—সমাজ ও সংসারের প্রতি দায়িত্বের শেষে।' উহা আত্মস্ফীতির বা আত্মম্ভরিতার জন্য নয়, আত্মলাভের ও আত্ম-সমাহৃতির জন্য। 'ভিতরে বাহিরে নানা বিচ্ছেদ, বিক্ষিপ্ততা মিটাতে অন্তঃসামঞ্জস্যের সাধনা।' আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ—শাস্ত্রে আছে; ইহার অর্থ—ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন আত্মাতে ভূমার উপলব্ধির জন্য।

'চিত্রা'র ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, 'জীবনের দুই ভিন্ন মহলে ভিন্ন কথা—জগতে বিচিত্ররূপিণী, অন্তরে একাকিনী।'

'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে। সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন'। 'স্রষ্টার এই আত্মোৎসর্গই মানবের তপস্যার আদর্শ। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয়, তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য। আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ, তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।' 'সত্যের সঙ্গে অনন্তের বিরোধ ঘটিয়েছে আমাদের অহং।' 'য়ুরোপের ধারণা—জিগীষার অভাবই মৃত্যু। ইহা অত্যাকাঙ্ক্ষার বিকৃতি। সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'উৎকট স্বাতন্ত্র্য হ'তে বিপ্লব—অহংস্ফীতি।' 'রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই প্যোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতর যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, (উহা) তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এই জন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।'

বিভেদের মাঝে ঐক্য

'ভারতবর্ষ বিসদৃশকে সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—পৃথক্ অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি

ধর্মই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।' 'এই কথাটিকেই খুব জোর ক'রে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে: 'অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।' 'প্রভেদকে মুছিয়া ফেলিয়া এক করা নহে, প্রভেদকে রাখিয়া একতা—ইহাই আজিকার সমস্যা—শুধু এদেশের নহে, সারা বিশ্বের।' 'এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা নহে যে কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবে—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে।'

'ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। 'অন্যকে আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল—প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের চিরদিন একই চেষ্টা—প্রভেদের মধ্যে ঐক্য, নানা পথকে এক লক্ষ্যের অভিমুখীন করা, বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি—নিগূঢ় যোগকে অধিকার।' 'বৃহৎ সমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য থাকে না।' এই সত্যের মর্মান্তিক নিদর্শন—পৃথিবী আজ দুই শিবিরে বিভক্ত এবং দুয়েরই অটুট বিশ্বাস, বিশ্বকল্যাণ স্বমতের প্রসারে সম্ভব—অন্যমতে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। বিশ্বরাষ্ট্রে যে অস্ত্রের আস্ফালন ও বিবেকবর্জিত প্রচার-কৌশল আজ সর্বব্যাপী, ইহা তাহারই পরিণাম। 'শান্তিনিকেতনে' 'বিশ্ববোধ'-শীর্ষক ভাষণে কবির উক্তি, 'আমিত্বের ক্রমিক প্রসার সাম্রাজ্যিকতা-বোধে পৌঁছয় য়ুরোপে। ভারতের বিশ্ববোধ—অনন্তকে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট করা। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাইরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি, সে পর্যন্ত যে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার'। 'বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধন ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্যদেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস ক'রে ততদূরে যেতে পারেন না।'

ভূমার সাধনা

'মন্ত্র' জিনিষটি একটি বাঁধবার উপায়। একটা কোনো বিশেষ সুরে বাজাতে হবে।' গায়ত্রী-মন্ত্রকে কবি 'ব্রহ্মবোধের সরল উদ্বোধন মন্ত্র'রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ব্যাহৃতি অংশ দ্বারা বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া বিশ্বলোকেশ্বরের যে সৃজনী শক্তি প্রত্যক্ষ—ইহা তাহার ধ্যান। তাঁহারই দান ধীশক্তির দ্বারা তাঁহার অনুভব।' অন্যত্র আছে— 'গায়ত্রী জীবনের মন্ত্র—ভক্তের হৃদয়ানন্দ।'

নিষ্ঠাকে তিনি মরুপথে উটের মত বলিয়াছেন। ইহার কাজ নিত্য সতর্কতা। নিষ্ঠা সাধনার প্রতি অচল ভক্তি। 'অগণ্য ঘটনার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হ'য়ে শুদ্ধ হ'য়ে দেখার ধ্যান-মন্ত্র গায়ত্রী। ওঁ অর্থ স্বীকার, পরিপূর্ণতার স্বীকার ওঁকার।'

ইতিহাসের ব্যতিক্রম

'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের মূর্তি কি ও তাহার গতির ছন্দ কিরূপ ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন; তিনি বলেন:

'সজীব হৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো (উহা) একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে, একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে। একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে, একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতেছে, আবার সে

দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বকেই হারানো হয়, সর্বত্বকে পাওয়া যায় না।'

'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে বাহ্য সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য-গরিমান্বিত প্রাচীন ভারতের স্বরূপও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন: 'পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায়, আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, এবং ব্রত-উপবাসে কৃশ হইয়া জগতে সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে ও নিয়াছে। সেই বৃহৎ, বিচিত্র জীবনের বেগে চঞ্চল সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল, পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল।'

'হিন্দু সমাজের ধর্ম প্রাণের ধর্ম, বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, নিয়ত গ্রহণ-বর্জনের ধর্ম।'

শাশ্বত ধর্মনীতি

'ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে। যেটা সাময়িক, সেটা অন্য সময়ে শোভা পায় না। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।'

'প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে।'

'ইণ্ডিভিজুয়ালকে যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে, সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়।'

ব্যক্তি ও সমাজ

ভারতবর্ষের আর একটি ভাব তাহার একাকিত্ব। 'ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত, সে নিজের চারিদিকে একটা চিরস্থায়ী নির্জনতা বহন করিয়া চলে। বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোনো কথা বলে না।'

'ধন-জন-মানের দ্বারা আমি সত্য নই। ধন-মান জমিয়ে যোগ নষ্ট করি। ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ঋষিরা, ধনী ভোগী নন। মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে।'

'আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা বেতনের'। 'ভৃতিনিরপেক্ষ স্বার্থত্যাগপর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-নিরত নিষ্ঠাবান্ গুরু'—ভারতের শিক্ষারীতির অঙ্গ ও গৌরব। 'এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে—একথা আমাদের কাছে চলিবে না'। 'দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড়ো বলি না। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশী, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি, যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে, সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তু-কুয়াসার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের সভ্যতার যে চিত্র রবীন্দ্রলেখনীতে পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, তাহা তাঁহার বহুবিস্তৃত রচনাবলীর নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত জীব

নের পূর্ণতা ও সার্থকতা। হিন্দু জাতির গতি-প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ-সংস্থানের নীতি ও ইতিহাসের ধারা—এ তিন দিকই আলোকিত, উদ্দীপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতি ও সমাজবন্ধন

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।' 'আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে'। 'মানুষ যে সকল সম্বন্ধের মধ্যে জন্মলাভ করে, চিরজীবন তাহার মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিবে।'

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবি আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। পরস্পরের দাবিতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি।'

'আমরা ভাগ করিয়া ভোগ করি, কর্ম করি একাকী, স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল।'

'য়ুরোপীয় সভ্যতার এক দিকে স্বাতন্ত্র্যের দুরন্ত তৃষ্ণা, অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতা-শক্তি। স্বাতন্ত্র্যের অর্থ—সমস্ত শৃঙ্খল মোচনপূর্বক বিশ্বের আর কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাকী নিজের স্বেচ্ছামত চলিবার উদ্ধত বাসনা।'

'নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

'নেশন ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ য়ুরোপীয় সভ্যতার সংহতির সূত্র ও লক্ষ্য। যে ধর্মনীতি ব্যক্তি-বিশেষের নিকট বরণীয়, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়—একথা এক প্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। এ হিসাবে য়ুরোপীয় সভ্যতাই আজ বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব।'

ভারত আবিষ্কার

'শেষ সপ্তকে' কবি প্রশ্ন করিয়াছেন: 'বহু বিচিত্র কারুকলায় চিত্রিত এই আমার সমগ্র সত্তা তার সমস্ত সঞ্চয়, সমস্ত পরিচয় নিয়ে কোনো যুগে কি কোনো দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?

—তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে গোচরতাকে, বলেছে—যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা, বলেছে—যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস, এস প্রকাশ এস।' 'আমি আলোর প্রেমিক' এই তাঁহার নিজ-পরিচয়। সেই প্রেমের আলোকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ তাঁহার দৃষ্টিতে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে—তাহা নিপুণ মর্মোদ্ভেদে অতীতনিষ্ঠ সম্প্রদায়েও সুদুর্লভ। তাহা নিখিল ভারতের প্রাণের কথা, গৌরবের বস্তু। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার যে বিবরণ তাঁহার বিরাট রচনাবলীর মধ্যে, তাহা কি সমগ্র ও সমঞ্জসভাবে উন্মোচিত হইতে পারে? হইলেও তাহা কি ইহার পরিপূর্ণ পরিচয় হইবে ? ভারতের আবিষ্কার একটি 'অসমাপিকা ক্রিয়া' মনে হয়। এখনও সন্ধানীর ও মনীষীর বীক্ষণ ও সমীক্ষায় ইহা অনিঃশেষিত বস্তু। 'বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষের এই বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা নিবারণ হইবে।'

ভারত-আত্মার যে মর্যাদা ও সম্ভ্রম বুদ্ধি সর্বত্র তাঁহার লেখনীমুখে প্রস্ফুট, বর্তমান যুগের শ্রদ্ধা-সঙ্কটে এবং স্বার্থসজ্ঘাতে তাহা এই মহাদেশের ও ইহার জাতিসঙ্ঘের অবিস্মরণীয়

রক্ষাকবচ হইবে কি? 'দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য' ভারতের মূলমন্ত্র, তাহা উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার বস্তু হইয়াছে তাঁহার অবদান-কল্পলতায়।

শাশ্বত ভারত কি কল্পনা?

সম্প্রতি ফরাসী মনীষী M. Pierre Amado (—Director, French Cultural Centre of Calcutta), ভারত সম্পর্কে প্রতীচীর ধারণা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন: এখনও পাশ্চাত্ত্য জগতে বহুজন ভারতের সেই কল্পলোকের দিকে সাগ্রহে তাকায়, যেখানে মূঢ়তা এবং এমন কি যুক্তি-বিচার অপেক্ষাও প্রজ্ঞা অধিক সম্মানিত এবং জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গণ্য। যে ভারত—মাতার মত নিরন্তর বিগ্রহরত প্রতীচী হইতে নিষ্কৃতি ও শান্তি দেন এবং যে সত্যে শান্তি লাভ হয়, সেই একতার সত্যকে ধরিয়া আছেন। Metaphysics বা তত্ত্বজ্ঞানের নিকট—জগৎ ও মানবের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যাই প্রশ্ন। সে প্রশ্নের সমাধানে গুরুপদে ভারতকে না দেখিলে ইস্পাত, কয়লা, আণবিক কারখানা এবং কৃত্রিম উপগ্রহের প্রাচুর্যে অতিতৃপ্ত ও ক্লান্ত প্রতীচী আশাহত বোধ করে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জানো।

ভাবাদর্শে ভারতের ঐক্য

স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে, শক্তির সংগ্রামে গত ত্রয়োদশ বৎসরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও সম্প্রতি ঘটিতেছে, তাহাতে শাশ্বত ভারতের দিব্য রূপের, মানস বিগ্রহের পরিচয় academic বা বিদ্বৎসভোচিত আলোচনা, বা চিত্তবিনোদনের একটা প্রসঙ্গমাত্র নহে। কর্ম-জগতের, লোকচরিত্রের, সমাজব্যবহারের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজেই ধরা পড়ে। অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ের একান্ত প্রয়োজন—ইহা দেশের নেতৃগণের লেখায় ও ভাষণে প্রায়ই স্বীকৃত ও উদ্‌ঘোষিত হইয়া থাকে। নিজ নিজ প্রয়োজনমত ইঁহাদের কল্পনায় ভারতাত্মার প্রতিকৃতিও আবিষ্কৃত বা রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিরাট ও যুগযুগ-পরিব্যাপ্ত সংস্কৃতির মর্মগ্রহ ব্যাস-বাল্মীকি-বুদ্ধ-কুমারিল-শঙ্কর-মাধবাচার্যের মত মনীষার অধিকারী, ভারত-প্রতিভার যোগ্য সন্তানেই সম্ভব। আকাশের প্রতিবিম্ব স্থির সাগর-সলিলেই পাওয়া সম্ভব—পুষ্করিণী বা পল্বলে নহে; 'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাংচয়ঃ'। ইহার দ্বিতীয় প্রয়োজন—দেশের অন্তর-পরীক্ষা, অন্তঃশুদ্ধি ও আত্মলাভের জন্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'একদিকে প্রত্যক্ষ য়ুরোপ, আর একদিকে শাস্ত্রের কথা, পুঁথির প্রমাণ। একদিকে প্রবল শক্তি আর একদিকে আমাদের দোদুল্যমান বিশ্বাস মাত্র—এ অবস্থায় অসহায় ভক্তিকে ভারতবর্ষের অভিমুখে স্থির করিয়া রাখাই কঠিন। সকলের মূলে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। আজ নানা প্রয়োজনে দেশের সেবক বহু হইলেও শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন বিরল। যাঁহারা মনুষ্যজাতিকে মনে করেন এক ও নির্বিশেষ, যাঁহারা বিদেশের সভ্যতা ও মতবাদ হইতে সকল প্রেরণা পান

ও চান—তাঁহারা ভারত-সভ্যতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন—ইহা প্রত্যাশার বিকৃতি, এককালে মহর্ষি মনুর পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছিল—'এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ'। ইহা হয়তো আত্মগরিমার প্রকাশ। কিন্তু ভারতীয় মানবতার একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যতদিন হইতে বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণ পাওয়া যায়, সেই দীর্ঘ সময়ে লক্ষ্যের বস্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আমাদের সমাজতন্ত্র সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে—লোক-ব্যবহার শিথিল হয় নাই, আদান-প্রদানে সততা রক্ষিত হইত, ঋণী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিত না এবং সাধারণ ধর্মের বিধানগুলিকে সকলে সরল বিশ্বাসে সম্মান করিত।'

সঙ্কটে আত্মবোধ

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের আত্মা ও সংহতি বলিয়া কিছু ছিল বলিয়া কেহ কেহ এমন কি কোন কোন ইতিহাস-পারদর্শীও স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে ভারতীয়তা ইংরেজী শিক্ষা ও ব্রিটিশ সম্পর্কের পর জন্মলাভ করিয়াছে। মহাভারত ও দ্বীপময় ভারত বা বৃহত্তর ভারত এককালে না থাকিলে—পাশ্চাত্য শিক্ষার সৃষ্টি বলিয়া যাহা ধরা হয়—সেই অখণ্ড বা অধুনা-খণ্ডিত ভারত কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ বীজে, কোন্ ধাত্রীবক্ষে উদ্ভূত বা পুষ্ট হইত, তাহা চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। 'শান্তিনিকেতনে' 'বর্তমান যুগ'-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন, 'সবাই আজ জাগ্রত। Politics বাইরের জিনিস, আত্মাকে প্রকৃত জাগ্রত করে ধর্ম। ধর্মের নাড়ী—বিংশ শতাব্দীর বার্তা, তাপসের সাধনার অনুকূল'।

সে যাহা হউক, ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—যে চরিত্রে বিশ্বকবির ভাষায় কোন বড় কথাই কথা মাত্র হয় নাই, এবং সত্য সংযম মৈত্রী অহিংসা করুণা—সর্বজনের পালনীয় ছিল, এবং সভ্যতার উচ্চতম ধারণা ছিল ধর্ম—সামাজিক ও বিশ্বজাগতিক; সেই চরিত্র আজ ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে যদি বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হয়, এবং এ দেশের নিজস্ব অধিবাসিগণের পরম্পরের প্রতি আচরণে দলিত ও উৎখাত হয়—তাহা হইলে অন্য কোন সভ্যতার আদর্শ ও অনুশাসন যে এদেশে গৃহশান্তি ও লোককল্যাণ রক্ষা করিতে পারিবে না—ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়। 'রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত' তাই শুধু সংস্কৃতির দিঙ্‌নির্দেশ নয়, যুগযুগ-আলোচিত ধর্মের প্রসঙ্গ মাত্র নহে, আধুনিক ভারতের বিভ্রান্ত জনতার পক্ষে 'পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ'।

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

শিবার্চনম্

তপশ্চর্যার অত্যাবশ্যকতা পূর্বে কথিত হইয়াছে; 'শিবার্চন'ই প্রকৃষ্ট তপস্যা। 'শিবার্চন' দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তর; তন্মধ্যে 'বাহ্য শিবার্চন' বহু উপকরণসাধ্য ও গৌণ, অতএব তাহা উপেক্ষা করত কবি আন্তর পূজন-রূপ 'মুখ্য শিবার্চন' বর্ণন করিতেছেন। মনোনিয়মনে সমর্থ সাধকই এই পূজার অধিকারী, এরূপ পুরুষ সংসারে একান্ত দুর্লভ, তাই পাঠককে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন :

আসংসারাৎ ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাত তাদৃঙ্
নৈবাস্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতো বা।
যোঽয়ং ধত্তে বিষয়করিণী-গাঢ়গূঢ়াভিমান-
ক্ষীবস্যান্তঃকরণকরিণঃ সংযমানায়লীলাম্ ॥৮১॥

হে প্রিয়! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ত্রিভুবন অন্বেষণ করিয়াও এমন একজন পুরুষও আমাদের চোখে পড়ে নাই বা তাঁহার কথা আমরা শুনি নাই, যিনি বিষয়-লিপ্সারূপ হস্তিনীর মোহময় আকর্ষণে উন্মত্ত চিত্ত-হস্তীকে সংযমরূপ রজ্জু-নির্মিত জালে অতি সহজে ধরিতে পারিয়াছেন,—অর্থাৎ বিষয়াভিমুখী মনকে সহজে সংযত করা যায় না।৮১

যদেতৎস্বচ্ছন্দং বিহরণমকার্পণ্যমশনং
সহার্যৈঃ সংবাসঃ শ্রুতমুপশমৈকব্রতফলম্।
মনো মন্দস্পন্দং বহিরপি চিরস্যাপি বিমৃশন্
ন জানে কস্যৈষা পরিণতিরুদারস্য তপসঃ ॥৮২॥

যথেচ্ছ বিহরণ, দীনতা-রহিত ভিক্ষাশন, সজ্জন-সঙ্গ, বেদান্ত-শ্রবণে শান্ত চিত্ত এবং বাহ্য বিষয় হইতে উপরত অন্তর্মুখ মন—কোন্ মহৎ তপশ্চরণের ফলে মানুষ এই পরিণতি লাভ করে, সুদীর্ঘকাল বিচার করিয়াও আমি তাহা জানিতে পারি নাই।—শিবার্চনরূপ মহাতপস্যার ফলে সাধক এই শান্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থায় উপনীত হন, ইহাই কবির ইঙ্গিত।৮২

জীর্ণা এব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতং তদ্‌যৌবনং
হন্তাঙ্গেষু গুণাশ্চ বন্ধ্যফলতাং যাতা গুণজ্ঞৈর্বিনা।
কিং যুক্তং সহসাভ্যুপৈতি বলবান্ কালঃ কৃতান্তোঽক্ষমী
হা জ্ঞাতং মদনান্তকাঙ্ঘ্রিযুগলং মুক্ত্বাস্তি নান্যা গতিঃ ॥৮৩॥

অতএব বাহ্যবিষয় সম্বন্ধীয় মনোরথাদি পরিত্যাগপূর্বক মুক্তির সাধন শ্রীসদাশিবের চরণকমল ধ্যান করাই সর্বদা কর্তব্য—তাই কবি বলিতেছেন :

অনন্ত বিষয়-বাসনা আমার হৃদয়েই অঙ্কুরিত হইয়া বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে, আমার ভোগবাসনা চরিতার্থ হয় নাই। বিষয়-ভোগক্ষম অঙ্গসমূহ হইতে যৌবন তিরোহিত হইয়াছে, গুণগ্রাহকের অভাবে সদ্‌গুণসমূহ নিষ্ফল হইয়াছে, দুর্জয় সর্ববিনাশক ও ক্ষমাহীন কাল প্রাণহরণার্থ ত্বরিতপদে অগ্রসর, অহো কি কষ্ট! এখন কি করা কর্তব্য? জানিয়াছি, মদনান্তক শিবের চরণযুগলে আশ্রয় বিনা এখন আর অন্য কোন গতি নাই।৮৩

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥৮৪॥

জগতের অধিপতি মহেশ্বর অর্থাৎ শিব ও জগদন্তর্যামী জনার্দন অর্থাৎ বিষ্ণু—এই উভয়ে বস্তুগত কোন ভেদবুদ্ধি আমার নাই, তথাপি আমার ভালবাসা ও ভক্তি তাঁহারই প্রতি, যাঁহার ললাটে তরুণ শশিকলা শোভা পাইতেছে। [ভগবান্ বিষ্ণুই মুমুক্ষুর একমাত্র আশ্রয়, ইহা প্রসিদ্ধ, বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব মহাদেব হইয়াছেন, তবে মুক্তির জন্য শিবার্চনার কথা বলা হইল কেন? এই শংকার উত্তরে কবির বক্তব্য: সাধকগণের রুচিবৈচিত্র্যবশতঃ দেবতাবিশেষে ভক্তি হইলেও তত্ত্বতঃ উপাস্য দেবতাগণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তথাপি সাধনাবস্থায় ইষ্টনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।]৮৪

স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে ক্বাপি পুলিনে
সুখাসীনাঃ শান্তধ্বনিষু রজনীষু দ্যু-সরিতঃ।
ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ শিব শিব শিবেত্যুচ্চবচসঃ
কদা যাস্যামোঽন্তর্গতবহুলবাষ্পাকুলদশাম্ ॥৮৫॥

এখন পাঁচটি শ্লোকে শান্তরসের বাক্যসমূহ কথিত হইতেছে: চিত্ত-বিক্ষেপকর সকল কোলাহল শান্ত হইয়া গিয়াছে, স্তব্ধ নিশীথে, জ্যোৎস্নাধবলিত বিস্তৃত ভাগীরথী-তটে সুখাসনে উপবেশনপূর্বক জন্মমরণরূপ সংসার-দুঃখে উদ্বিগ্ন হইয়া—কবে 'হে শিব! হে শিব! হে শিব!' আর্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ আবৃত্তি করিতে থাকিব? অন্তর্নিরুদ্ধ অশ্রুজনিত এই ব্যাকুল অবস্থা কবে প্রাপ্ত হইব?৮৫

বিতীর্ণে সর্বস্বে তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়াঃ
স্মরন্তঃ সংসারে বিগুণপরিণামাং বিধিগতিম্।
বয়ং পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণা-
স্ত্রিযামা নেষ্যামো হরচরণচিন্তৈকশরণাঃ ॥৮৬॥

অতিশয় দুঃখপ্রদ সংসার পরিত্যাগ করত অরণ্যে নিবাসপূর্বক কিভাবে কালাতিপাত করা কর্তব্য, সেই কথাই কবি বলিতেছেন: হায়! অর্থীদিগকে সর্বস্ব দান করত, কোমল করুণাপূর্ণহৃদয়ে সংসারের বিষম পরিণাম নিয়তির কথা স্মরণ করিতে করিতে পবিত্র তপোবন-প্রদেশে চতুর্দিকে শোভার পরাকাষ্ঠা বিমল শরচ্চন্দ্র-কিরণপ্লাবিত রাত্রিগুলি একমাত্র শম্ভুর চরণচিন্তা করিয়া কবে আমরা অতিবাহিত করিব? ৮৬

কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥৮৭॥

অহো! পুণ্য বারাণসীধামে ভাগীরথীতটে নিবাস করত কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া শিরোপরি অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় স্থাপনপূর্বক কবে আমি 'হে পার্বতীপতে! হে ত্রিপুরান্তক! হে শম্ভো! হে ত্র্যম্বক! প্রসন্ন হও' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে নিমেষের মতো দিনগুলি অতিবাহিত করিব! ৮৭

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃ পয়োভিঃ শুচিকুসুমফলৈরর্চয়িত্বা বিভো ত্বাং
ধ্যেয়ে ধ্যানং নিবেশ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবপর্যঙ্কমূলে।
আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে
দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুত্থম্ ॥৮৮॥

হে শম্ভো! হে কামান্তক! নির্মল গঙ্গাজলে স্নান করিয়া শুদ্ধ পুষ্প-ফলাদি সহায়ে তোমার অর্চনা করত গিরিগুহাস্থিত পাষাণ-শয্যামূলে উপবেশনপূর্বক একমাত্র ধ্যানযোগ্য তোমার চরণযুগলে সমাহিতচিত্ত হইয়া আচার্যোপদিষ্ট কর্মানুষ্ঠান-তৎপর এবং শরীর-ধারণার্থ কেবল ফলাশন-মাত্রপ্রার্থী আত্মতৃপ্ত আমি তোমার অনুগ্রহে কবে মকর-চিহ্নিত পাদযুক্ত অসামান্য ধনী পুরুষের পরিচর্যা-সমুৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্ত হইব? ৮৮

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্মনির্মূলনক্ষমঃ ॥৮৯॥

সংসার-হেতুভূত নানাবিধ কর্ম আচরণ করত তাহাতে খেদযুক্ত বৈরাগ্যবান্ পুরুষের ভাষায় কবি প্রার্থনা করিতেছেন:

নিঃসঙ্গ বিষয়াভিলাষশূন্য শমাদিসম্পন্ন ও দিগম্বর হইয়া এবং হস্তকেই একমাত্র ভিক্ষাপাত্র-রূপে ধারণ করত হে শম্ভো! কবে আমি প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে সঞ্চিত ও আগামী সকল কর্ম সমূলে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইব? ৮৯

পাণিং পাত্রয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষেণ সন্তুষ্যতাম্
যত্র ক্বাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্।
অত্যাগেঽপি তনোরখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃশাম্
অধ্বা কোঽপি শিবপ্রসাদসুলভঃ সম্পৎস্যতে যোগিনাম্ ॥৯০॥

পূর্বশ্লোকোক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের পরমেশ্বর-কৃপায় অবিলম্বেই মোক্ষমার্গ সুলভ হইয়া থাকে, এই কথা বলিয়া শিবার্চন-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন:

করতলই যাঁহাদের একমাত্র ভোজনপাত্র, স্বভাবশুদ্ধ ভিক্ষান্নলাভেই যাঁহারা সন্তুষ্ট, যাঁহারা শ্মশানে বনে বা যত্র তত্র বাস করিয়া থাকেন, বিশ্বপ্রপঞ্চকে যাঁহারা তৃণতুল্য তুচ্ছ বিবেচনা করেন এবং দেহত্যাগের পূর্বেই যাঁহারা অখণ্ড পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন—এইরূপ যোগিগণই মহাদেবের কৃপায় সুলভ সেই অনির্বাচ্য মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ৯০

অবধূত-চর্যা

নিরন্তর ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ যোগী পুরুষ অবধূতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সদা ব্রহ্মা-ত্মৈক্যানুসন্ধান-তৎপর এবং বিস্মৃত-বহিঃপ্রপঞ্চ জীবন্মুক্ত পুরুষকেই 'অবধূত' বলা হয়। তাহার চর্যা অর্থাৎ আচার এখন দশটি শ্লোকে কথিত হইতেছে :

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণঃ স্বান্তং সদা
স্থৈর্যং যোগমহোৎসবেঽপি চ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্ ॥৯১॥

শতছিন্ন কৌপীন ও তদ্রূপ জীর্ণ কন্থাতেই যদি সন্তোষ থাকে, চিত্ত যদি বিষয়-চিন্তাবিমুখ হয়, নিরপেক্ষ স্বচ্ছন্দপ্রাপ্ত ভিক্ষান্ন-ভোজনেই যদি তৃপ্তিলাভ হয়, নিদ্রার জন্য পর্যঙ্ক-শয্যাদি-বিহীন প্রেতভূমি শ্মশান ও অরণ্যই যদি পর্যাপ্ত হয়, সদা শান্তচিত্তে স্বচ্ছন্দ নিরঙ্কুশ বিচরণেই যদি রুচি থাকে এবং সমাধি-সুখে যদি চিত্ত মগ্ন থাকে, তাহা হইলে ত্রৈলোক্য-রাজ্যভোগও তুচ্ছ। ৯১

ব্রহ্মাণ্ডং মণ্ডলীমাত্রং কিং লোভায় মনস্বিনঃ।
শফরীস্ফুরিতেনাব্ধিঃ ক্ষুব্ধো ন খলু জায়তে ॥৯২॥

বিচারবান্ পুরুষ কখনও লোভপরবশ হন না, প্রতিবিম্বতুল্য তুচ্ছ এই ব্রহ্মাণ্ড-প্রপঞ্চ কি কখনও ধীর বিবেকী পুরুষের চিত্তে লোভ উৎপাদন করিতে পারে? অতি ক্ষুদ্র শফরী মৎস্যের সঞ্চালনে অপার অগাধ বারিধি কখনও ক্ষুব্ধ হয় না; সমুদ্রবৎ গম্ভীরাত্মা জ্ঞানীর চিত্ত কোন কামনা দ্বারা বিচলিত হয় না। ৯২

মাতর্লক্ষ্মি ভজস্ব কঞ্চিদপরং মৎকাঙ্ক্ষিণী মাস্ম ভূ-
র্ভোগেষু স্পৃহয়ালবস্তব বশে কা নিঃস্পৃহাণামসি।
সদ্যঃ স্যূতপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতৈ
র্ভিক্ষাবস্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে ॥৯৩॥

হে মাতঃ লক্ষ্মি! এখন তুমি অন্য কোন পুরুষের পরিচর্যা কর, আমায় আর আকাঙ্ক্ষা করিও না। বিষয়-ভোগব্যাকুল পুরুষেরাই তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, নিঃস্পৃহ ব্যক্তিগণের নিকট তুমি অতি তুচ্ছ। নিঃস্পৃহ আমাদিগকে তুমি পরিত্যাগ কর, কারণ এখন আমরা পবিত্র পলাশপত্র সহায়ে সদ্যগ্রথিত ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত পবিত্র ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে অভিলাষী। অন্য ঐশ্বর্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ৯৩

মহাশয্যা পৃথ্বী বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানং চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
শরচ্চন্দ্রো দীপো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখী শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব ॥৯৪॥

বৈরাগ্যবান্ পুরুষের সার্বভৌম নৃপতিতুল্যত্ব বর্ণিত হইতেছে : পৃথ্বীতলই যাঁহার বিস্তীর্ণ শয্যা, বাহুযুগলই শিরোধান, আকাশই চন্দ্রাতপ, অনুকূল বায়ুই ব্যজন (পাখা), শারদীয় চন্দ্রমাই গৃহ-দীপ, বিরতি-রূপা ভার্যার সহিত যিনি আনন্দমগ্ন, সেই শান্তচিত্ত যোগীশ্বর পুরুষ—অতুল ঐশ্বর্যবান্ নৃপতির ন্যায় সুখে শয়ন করেন।৯৪

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিৎ তপস্বী স্থিতঃ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সংপ্রাপ্তকন্থাসনো
নির্মানো নিরহংকৃতিঃ শমসুখাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ ॥৯৫॥

ভিক্ষালব্ধ অন্নে শরীর-ধারণকারী, জনসঙ্গে আসক্তিরহিত, স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী, ত্যাজ্যগ্রাহ্য-বুদ্ধি-রহিত পথিপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন পুরাতন-বস্ত্রপরিহিত, দৈবপ্রাপ্ত কন্থার উপর উপবিষ্ট, নিরভিমান, দেহাধ্যাস-রহিত, বৈরাগ্যজনিত নিরতিশয় আনন্দাভিলাষী ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ও তপস্বী।৯৫

চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽথ কিং তাপসঃ
কিং বা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈরাভাষ্যমাণা জনৈ-
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥৯৬॥

যোগীশ্বর মান অপমান সর্বাবস্থাতেই নির্বিকার থাকেন ও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভাবে ও বলে : এ ব্যক্তি কে? ইনি অস্পৃশ্য চণ্ডাল অথবা দ্বিজ? শূদ্র অথবা তপস্বী? হয়তো ইনি বিচারনিষ্ঠ মহাযোগী :—এই প্রকার বহু বিকল্পকারী বাচাল জনতা কর্তৃক পথমধ্যে সম্ভাষিত হইয়াও যোগিজন ক্রুদ্ধ বা সন্তুষ্ট হন না, স্বচ্ছন্দে আপন পথে চলিয়া যান।৯৬

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং ধাত্রা মরুৎকল্পিতং
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজস্তুষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং
তামন্বেষয়তাং প্রযান্তি সততং সর্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥৯৭॥

অহিংসাবৃত্তিরই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইতেছে : হিংস্র সর্পকুলের জন্যও বিধাতা হিংসা-রহিত অযত্নলভ্য বায়ুকে আহাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; পশুগণও তৃণ ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ভূমিতে শয়ন করে, ইতর প্রাণীরা কেহই অযথা হিংসা করে না। সংসার-সাগর পার হইতে সমর্থ উৎকৃষ্টবুদ্ধি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণের জন্যও নিশ্চয় তিনি হিংসাশূন্য জীবিকার উপায় করিয়াছেন; যাহারা

ইহার অনুগমন করে, তাহাদের পক্ষে জন্মমরণাদি বন্ধনের কারণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণের কার্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯৭

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য
ব্রহ্মধ্যানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিং তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে নির্বিশঙ্কাঃ
কণ্ডূয়ন্তে জরঠহরিণাঃ স্বাঙ্গমঙ্গে মদীয়ে ॥৯৮॥

ব্রহ্মচিন্তনই মুমুক্ষুর একমাত্র করণীয় ইহাই বলিতেছেন: অহো! এমন সুদিন কি আমার জীবনে আসিবে, যেদিন গঙ্গাতীরে হিমালয়-শিলার উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আমার পাষাণবৎ স্থির অঙ্গে বৃদ্ধ মৃগকুল নির্ভয়ে তাহাদের অঙ্গ কণ্ডূয়ন করত ঘর্ষণ-সুখ অনুভব করিবে?—অর্থাৎ মৃগকৃত কণ্ডূয়নও আমি জানিতে পারিব না, এমন দৃঢ় গভীর সমাধি আমার কবে হইবে? ৯৮

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষমক্ষয্যমন্নং
বিস্তীর্ণং বস্ত্রমাশাদশকমচপলং তল্পমস্বল্পমুর্বী।
যেষাং নিঃসঙ্গতাঙ্গীকরণপরিণতস্বান্তসন্তোষিণস্তে
ধন্যাঃ সংন্যস্তদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কর্ম নির্মূলয়ন্তি ॥৯৯॥

আত্মচিন্তন-পরায়ণ সর্বসঙ্গ-পরিত্যাগী যোগীশ্বরগণই সর্বকর্মবন্ধনরহিত হইয়া মুক্তিভাক্ হন, ইহাই কথিত হইতেছে: যাঁহাদের হস্তই একমাত্র শুদ্ধ ভোজনপাত্র, যদৃচ্ছা ভ্রমণবশে প্রাপ্ত ভিক্ষাই যাঁহাদের অক্ষয় অন্ন, বিস্তীর্ণ দশদিক্‌সমূহই যাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র, ভূতল যাঁহাদের নিশ্চল বিস্তৃত শয্যা, নিঃসঙ্গতাভ্যাস-পরিপক্বতাবশতঃ সন্তুষ্টমনা, দৈন্যরহিত ও সংসারিক যাবতীয় সম্পর্কপরিত্যাগী সেই পুরুষগণই ধন্য, কারণ তাঁহারাই পরমাত্মজ্ঞানসহায়ে জন্মপরম্পরাপ্রদ যাবতীয় কর্ম সমূলে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৯৯

মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতস্ফারস্ফুরন্নির্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরব্রহ্মণি ॥১০০॥

সংসার-বন্ধনমুক্ত জ্ঞানী পুরুষ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-কৃত উপকার স্মরণ করত তাহাদিগকে মাতা পিতা বন্ধু প্রভৃতি সম্বোধনে আহ্বান করিয়া শেষ প্রণাম করিতেছেন:

হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পিতঃ বায়ু! সখে অগ্নি! বন্ধু জল! হে ভ্রাতঃ আকাশ! করপুটে তোমাদিগকে আমার এই শেষ প্রণাম। তোমাদের সঙ্গবশতঃ যোগাভ্যাস-জনিত পুণ্যলব্ধ মহান্ নির্মল জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা গহন মোহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি এখন পরব্রহ্মে লীন হইতেছি। ব্রহ্মে লীন হইলে তখন ভেদাভাব-বশতঃ কোন প্রণাম সম্ভব নয়, অতএব তাহার পূর্বেই আমার এই শেষ প্রণাম। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব-রচিত দেহকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক জানিয়া তৎকৃত উপকার স্মরণ করত তাহাদিগকে এই শেষ প্রণাম করিতেছি, কারণ আর তাহাদের সহিত মিলিত হইব না।

ইতি 'বৈরাগ্যশতকম্' সম্পূর্ণম্।

ইংলণ্ডে এক বৎসর

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ ইংলণ্ডের দু-চার জায়গায় যা গেছি তার কথা কিছু লিখে এইবার আমার আখ্যায়িকা শেষ করি। সে জন্য একবার জুন মাসে ফিরে যেতে হবে, কেন না সেই সময়েই কয়েকদিনের কার্যসূচী নিয়ে লণ্ডনের কাছাকাছি কয়েকটি গবেষণা-কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

বহু জায়গায় যাওয়ার সুবিধা হবে ব'লে এবার মধ্য-লণ্ডনের পশ্চিম-ধারে হাইড্ (Hyde) পার্কের কাছে একটা হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন বৃটিশ কাউন্সিল। সেই সময়ে রাত্রি ১০টায় সন্ধ্যা হ'ত, কাজেই পার্কের মুক্ত বায়ু সেবনের সুযোগ হয়েছিল। পার্কটি আয়তনে প্রায় হাজার বিঘা, মধ্যে সারপেণ্টাইন্ (Serpentine) নামে একটি লম্বা বিল। বড়দিনের সময় যেখানে পত্রহীন ডাল-বারকরা গাছ ও কুয়াসায় ঢাকা পথ দেখে গিয়েছিলাম, সেখানে এবার দেখলাম পত্রপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষরাজি, আর জলাশয়টিতে নানা রঙের রাজহংস ভেসে বেড়াচ্ছে। এককালে এটা রাজার হরিণ শিকারের বন ছিল, পরে হয় রেস্ কোর্স। উনবিংশ শতাব্দীতে যে কোন বিষয়ে বক্তৃতার অবারিত ক্ষেত্ররূপে হাইড পার্ক বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু টেলিভিসনের আবির্ভাবে বাগ্মিতার সে যুগ আর নেই, তবুও কলকাতার মনুমেণ্টের মতো মার্‌বল আর্চ (Marble Arch)-এর কাছে বক্তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান (Orators' Corner) আছে—সেখানেই শ্রোতাদের ভিড় হয়। এত বড় বাগান, কিন্তু সুরক্ষিত। কখন জনাকীর্ণ, কখন প্রায় লোকশূন্য অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন দৃশ্য নজরে পড়েনি। ইংলণ্ডের সব পার্কের মতো হাইড্ পার্কের গেটও রাত্রে বন্ধ থাকে। পাশেই কেনসিংটন (Kensington) রাজপ্রাসাদ ও বাগান। এই বাগানের দক্ষিণে নিখুঁত কারুকার্য-খচিত এলবার্ট স্মৃতিমন্দির (Albert Memorial)—এক স্তরে বিভিন্ন সদ্‌গুণের প্রতিমূর্তি, অন্য স্তরে কৃষি বাণিজ্য শিল্প ও স্থাপত্য এবং তৃতীয় স্তরে ভিক্টোরিয়ার আমলের চার মহাদেশে বৃটিশ রাজত্বের চিহ্নসূচক প্রতিকৃতি। ৭০।৮০ বৎসরেও নিখুঁত আছে। নিকটেই আট হাজার শ্রোতার উপযুক্ত গোলাকার এলবার্ট হল (Albert Hall), কনসার্টের অতি উপযুক্ত স্থান।

আরও দক্ষিণে ইম্পিরিয়াল কলেজ (Imperial College); বিজ্ঞানের সব বিভাগের গবেষণা এখানে হয়। আমার কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলি দেখা হ'লে বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে (Science Library) গেলাম। সেখানে দু-একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা দেখার প্রয়োজন ছিল। এই লাইব্রেরী সাধারণেও ব্যবহার করতে পারে—বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র তো পারেই, আবার অন্য লাইব্রেরী মারফৎ বই ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

কাছেই মরা-চিড়িয়াখানা (Natural History Museum) ও বিজ্ঞান মিউজিয়াম (Science Museum)। একটিতে কোটী বৎসরের প্রকৃতির কীর্তি, অপরটিতে কয়েক শত বৎসরের মানুষের কীর্তি—ইতিহাস বেশ

বুঝিয়ে দেওয়া আছে। ছেলেদের বুঝাবার সুবিধার কথা এরা কোন সময়েই ভোলে না। কমনওয়েল্‌থ মিউজিয়ামে সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদের কথা পরিষ্কার ভাবে দেখানো আছে। তবে যে সময়ে দেখেছিলাম সে সময় পাকিস্তানের দিকটা যেমন নতুন ক'রে সাজানো ছিল, ভারতের দিকটা তেমন ছিল না। এগুলি অবশ্য বড়দিনের সময় একবার দেখেছিলাম।

দ্বিতীয় দিন সকালেই ৩০।৪০ মাইল পশ্চিমে প্রসিদ্ধ রেয়ন্‌ প্রস্তুত-কারক কোর্টওল্ডসের (Courtaulds) গবেষণা-কেন্দ্র টেম্‌সের ধারে মেডেনহেড (Maidenhead) গেলাম ট্রেনে। এখানেও একটি বাগানবাড়ী নিয়েই এরা কাজ আরম্ভ করেছে। কৃত্রিম সিল্কের পেছনে এরা যে কত গবেষণা চালিয়েছে, না দেখলে তা ধারণা করা যায় না। চাহিদা অনুযায়ী নতুন গুণাগুণবিশিষ্ট আঁশ তৈরী করবার চেষ্টা চলেছে। প্রায় সারাদিনই সেখানে কাটল। শেষে লণ্ডন ফেরার পথে আমার প্রদর্শকটির কাছে জানলাম, প্রসিদ্ধ উইণ্ডসর দুর্গ (Windsor Castle) এখান থেকে ১০মাইল। আমাকে তিনি তাঁর গাড়ীতে সেখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তখনও ফটক খোলা ছিল। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। বর্তমান রানী মাঝে মাঝে এখানে থাকেন। তাঁদের ঘরও দেখলাম। বিভিন্ন দেশের উপঢৌকন, স্বর্ণ, মণি-মাণিক্য, আর্ট, কারপেট, বাদ্যযন্ত্র এক একটি হল-ঘরে সব সাজানো আছে। সর্বোপরি দর্শনীয় হ'ল বিরাট দুর্গটি। সত্যই দুর্গটি সেকালে দুর্ভেদ্যই ছিল। একটু উঁচু জায়গায় অবস্থিত। বহুদূর পর্যন্ত শ্যামল বৃক্ষ, তৃণ, কৃষিক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গের নীচে দিয়েই চলেছে ক্ষীণকায়া টেম্‌স্‌ নদী, বিশ গজের বেশী চওড়া নয়, আশে-পাশে সরু রাস্তা—ভিড়ও যথেষ্ট। একটা মনোহারী দোকানে ঢুকে আর বেরুতে পারি না, দোকানী ভারতের গল্পে মশগুল, ছাড়তে চায় না।

দুর্গটিকে ঘিরে একটু এগিয়ে নদী পেরুতেই এসে পড়লাম জগদ্বিখ্যাত ইটন্‌ (Eton) বিদ্যালয়ের এলাকায়। ১২।১৪ বছরের অনেকগুলি ছেলে দ্রুত গতিতে রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভেঙে কোথা যেন চলেছে। তখন বিকেল ৭।।৮ টা হবে, বেশ রৌদ্র। সব ছেলের মুখেই—বৈশিষ্ট্য ও অভিজাত্যের পরিচায়ক একটা উজ্জ্বল ভাব। অনেকের গায়ে একই ধরনের কালো কোট। একজনের একটু মন্থর গতি দেখে তার সঙ্গেই আলাপ জমালাম। তাদের গন্তব্য স্থল টেম্‌সের ধারে,—নৌকা-চালনা এদের একটা প্রধান খেলা। সরু নদী হলেও সারা বছর এতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়।

আর একটু যেতেই একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখলাম। রাস্তার দুধারেই পুরাতন বাড়ীগুলি তাদের স্থবিরত্বের মাধ্যমেই পূর্ব গৌরব ঘোষণা করছে। এখানেও একটি ছেলেকে পেলাম, একটু ঘুরিয়ে দেখাল ও বেশ সপ্রতিভ পরিষ্কার ভাষায় ব'লল, বাড়ীগুলি ছাত্রাবাস, ক্লাস বিভিন্ন জায়গায় হয়, ত্রৈমাসিক পরীক্ষাতেও ছোটখাটো প্রমোশন হয়। বিরাট মাঠে ছেলেদের ক্রিকেট, ফুটবল, ভলি প্রভৃতি খেলা চলেছে। ট্রেনের সময় ব'লে তাড়াতাড়ি ফিরতে হ'ল। খানিকটা ডিজেল ও খানিকটা বাষ্প চালিত ট্রেনে লণ্ডনে ফিরলাম।

কাজের সূত্রেই পরের দিন গেলাম টেম্‌সের উপত্যকা ধরে আরও খানিক এগিয়ে হেনলি-অন্‌-টেম্‌সে (Henley-on-Thames)। টেম্‌সের উপর বরাবর যে বোট-রেস (Boat-race) হয়, তা এখান থেকে আরম্ভ হয়,—এটিই এখানকার বৈশিষ্ট্য।

সরু টেম্‌স্, কিন্তু নদীর ধারে ব্যবস্থা প্রচুর। ছোট শহর—কেবল বাগান। জনবিরল পথে দু-চার জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় খুঁজে বার করতে হ'ল একটি লেবরেটরী,—ক্রেতাদের সুবিধার জন্য কাপড়ের ব্যাবহারিক গুণাগুণ বিশ্লেষণ করবার একটি সমিতির দ্বারা এটি পরিচালিত।

লাঞ্চের পূর্বেই এখানকার কাজ সেরে এক বাস ধরলাম অক্সফোর্ড যাব ব'লে; লণ্ডন থেকে সোজা গেলে প্রায় ৬০ মাইল পশ্চিম-উত্তরে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। পথে চারিদিকে চাষ-আবাদ চমৎকার, গাছপালা এবং ফুলে-ভরা বাগান-শোভিত অক্সফোর্ড শায়ার (Oxfordshire)-এর মধ্য দিয়ে যখন বাস চলেছে, মন তখন আপনা হতেই আনমনা হ'য়ে আসছিল—সূর্যদেবেরও সেদিন অশেষ কৃপা ছিল। ক্রমেই টেম্‌সের শেষ প্রান্তে তার এক উপনদী আইসিস্ (Isis)-এর ধারে আসতেই শহরের সু-উচ্চ গির্জার চূড়াগুলি চোখে পড়ল। এখানকার নামকরা রাস্তা 'দি হাই' (The High)-এর মধ্যে যখন গাড়ী ঢুকল, তখন আমার পাশের যাত্রীটি আর স্থির থাকতে পারলেন না; আমাকে দেখাতে লাগলেন: কুইন্স কলেজ (Queen's College), অল্ সোল্‌স্ কলেজ (All souls' College), ইউনিভারসিটি কলেজ (University College) ইত্যাদি।

বাস থেকে নেমে মাটিতে পদার্পণ ক'রে সত্যই অনুভব করলাম, শতাব্দীর পর শতাব্দী মনীষী ও বিদ্যার্থীদের সমবেত চেষ্টার একটা জমাট ভাব। এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের কথা অস্বীকার করা যায় না। একটু হেঁটে ক্রাইস্ট চার্চ (Christ Church), জিসাস্ কলেজ Jesus College), ট্রিনিটি কলেজ (Trinity College) দেখলাম। প্রায় সব কলেজই চার-পাঁচ-শ' বছরের, দু-তিনটির গোড়া পত্তন শুনলাম ছ-সাত শ' বছর আগে।

কলেজগুলির বেশীর ভাগই হ'ল ছাত্রাবাস। ভিতরের পরিবেশ খুবই শান্ত—উঠানে 'শাইলক্ দি জু' (Shylock the Jew) থিয়েটার, ছেলেরা সাজ পরছে দেখলাম। এরা পুরাতনের পূজারী, শত শত বছরের টেবিল বেঞ্চি—আবার রীতি-নীতিও এরা বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে বদলাতে চায় না। শুধু স্থবিরত্বে নয়, সৌন্দর্যেও বাড়ীগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। বাহির-দেওয়ালের কারুকার্য এক দর্শনীয় বস্তু—ছোট ছোট চূড়া; গেটের মাথায় প্রায়ই নহবতের মতো ঘর। ক্রীস্টফার রেন (Christopher Wren)-এর স্থাপত্য-কীর্তি অনেক জায়গাতেই বিদ্যমান, বিশেষ ক'রে শেল্‌ডোনিয়ান থিয়েটারে (Sheldonian Theatre)—এটি দু-হাজার দর্শকের স্থান সংকুলানে উপযুক্ত একটি গম্বুজ। পাশেই Indian Institute—লাইব্রেরী ও চিত্রপটের মাধ্যমে ভারতীয় জীবনের আভাস দেবার চেষ্টা হয়েছে। কাছেই আর একটি মিউজিয়াম; বিজ্ঞানযুগের শুরুতে পদার্থ, গণিত, জ্যোতিবিদ্যায় যে যন্ত্র সব ব্যবহৃত হয়েছিল, তা এখানে সাজানো আছে।

সব থেকে ভাল লেগেছিল—প্রত্যেক কলেজের সঙ্গে একটি ক'রে উপাসনা-স্থল (Chapel)-এর ব্যবস্থা দেখে। এরা কোন দিনই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেয়নি। 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' (Necessity of Atheism) প্রকাশনের জন্যই কবি শেলী (Shelley) ইউনিভারসিটি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন,—সেইখানেই দেখলাম তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এমন মনোরম স্থানেও কিন্তু শিক্ষাবীজ সহজে উপ্ত হয়নি। বহুদিন পর্যন্ত 'টাউন ও গাউন' (Town and Gown)-এর বিরোধ চলেছিল, এজন্য আইন প্রণয়নও করতে হয়েছিল, যার মেয়াদ গত শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বহুদিন গাউনের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও গত ত্রিশ বৎসরে আশেপাশে মটর-গাড়ীর কারখানার মতো বড় কারখানাও গজিয়ে উঠেছে। অবশ্য বিদ্যায়তনের প্রভাব তাতে কিছু ম্লান হয়নি। অল্প সময়ে এর বেশী আর কিছু দেখা সম্ভব হয়নি। ট্রেনেই লণ্ডনে ফিরলাম—রাত তখন ১১॥ টা।

একদিন বাদে শিক্ষাজগতের আর এক তীর্থক্ষেত্র কেম্ব্রিজ (Cambridge) দেখতে রওনা হলাম; লণ্ডন থেকে ৬০ মাইল উত্তরে। বাসেই চললাম এসেক্স-এর সমতল ভূমি দিয়ে। মাঝ পথে চা খাবার জন্য গাড়ী থামল। পুরাকালের পান্থশালাটি একালের রেস্টুরেন্টে রূপান্তরিত, কিন্তু সেকেলে গেট ও লণ্ঠনটি সাজানো আছে,—কারণ লোকেরা পুরাতন ধারাই পছন্দ করে। গাড়ী আবার চলল, দ্বিপ্রহরে কেম্ব্রিজে ঢুকলাম। অক্সফোর্ডের মতো কোন উঁচু গির্জা দূর থেকে চোখে পড়ে না—বাস থেকে নেমে বিভিন্ন দোকান-পসার-বিশিষ্ট কয়েকটা রাস্তা পার হ'য়ে কিংস্ কলেজের (King's College) সামনে এসে পড়লাম। চমৎকার বাড়ীগুলি, অনেকটা অক্সফোর্ডেরই মতো। কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডে পাল্লা চলে সব বিষয়েই—এমনকি কে বেশী পুরাতন, তার প্রমাণ নিয়েও। অবশ্য অক্সফোর্ডকেই বেশী পুরানো মনে হয়। আর একটু এগিয়ে মোড় ঘুরে কর্পাস্ ক্রাইষ্ট কলেজের (Corpus Christ College) পেছনে একটা সরু গলির ভেতর ঢুকে বিশ্ববিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ (Cavendish) ল্যাবরেটরী খুঁজে পেলাম। পুরাতন বাড়ীর সঙ্গে নতুন সংযোজন মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রফেসর ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপনের পর তাঁদের গবেষণা-প্রসূত বিভিন্ন ধরনের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রক্রিয়া দেখালেন; বিজ্ঞানগুরু ম্যাক্সওয়েল (Maxwell), র‍্যালে (Rayleigh), রাদারফোর্ডের (Rutherford) স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিও দেখালেন। এইখানেই প্রথম ক্লাসে এক্সপেরিমেণ্ট (experiment) দেখিয়ে পদার্থবিদ্যা পড়াবার জন্য উপযুক্ত গ্যালারি প্রভৃতির ব্যবস্থা হয় একশ' বছর আগে। আরও দু-একটি সুপরিচিত যন্ত্র দেখে প্রফেসর ও এই বিদ্যাকেন্দ্রটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বিদায় নিলাম।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে আবার কিংস্ কলেজে ঢুকলাম। এখানেও পাশেই উপাসনা মন্দির (Chapel)—সামনে ও পিছনে দুটি বড় উঠান ও চারিদিকে ছাত্রাবাস। একটু পরেই ট্রিনিটি (Trinity) কলেজ—একই ধরনের; খাবার হল-ঘরে লম্বা পুরাতন টেবিল, পুরাতন প্রথাই চালু আছে, কাপড় পাতবার ব্যবস্থা নাই—বসবার ব্যবস্থাও সরু বেঞ্চিতে। চারিদিকে খ্যাতনামা প্রাক্তন ছাত্রদের ছবি। পেছনে উঠানে দেখি মঞ্চ তৈরী হচ্ছে—নাটক হবে। আরও পেছনে বাগান, একেবারে ক্যাম (Cam) নদীর ধারে। এই ক্যাম নদী থেকেই কেম্ব্রিজ (Cam-bridge) নামের উৎপত্তি। নদী বিশ হাতের বেশী চওড়া নয়—দুধারেই কলেজের বাড়ীগুলি বিস্তৃত—মাঝে মাঝে সেতু বা ব্রিজ দিয়ে এপার ওপার সংযুক্ত। এই নদীতেই ছেলেদের নৌকা নিয়ে খেলা ও প্রতিযোগিতা। বাগানে ফুলের বাহার। একটু বসে এগিয়ে চলি। এবার সেণ্ট জন্‌স্ কলেজ (St John's College)। আরও একটি শান্ত সুন্দর পরিবেশ ও বিস্তৃত অঙ্গন। এইখানেই আটশ' বৎসরের পুরাতন

হাসপাতালটি রয়েছে। এখানে ক্যামের ওপর সেতুটিও বিচিত্র জাফ্রি-করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা; ভিনিসের একটি সেতুর অনুকরণে এর নাম 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' (Bridge of sighs) অক্সফোর্ডের মত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেকগুলি কলেজের সমষ্টি—কলেজগুলি আসলে ছাত্রাবাস, ক্লাস অন্যত্র। শেষ বাসেই সীট্ রিজার্ভ করা ছিল—গোধূলির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে লণ্ডনে ফিরলাম রাত দশটায়।

মধ্যে একদিন বিকেলে সময় পেয়ে রাজনীতিবিদ্ উইন্‌ষ্টন চার্চিলের (Winston Churchill) অবসর সময়ে আঁকা ছবির (water-colour painting) এক বিরাট প্রদর্শনী দেখলাম বার্লিংটন হাউসে। কয়েকখানি ছবি নাকি উচ্চস্তরের। এই বাড়ীটিতেই রয়েল্ সোসাইটি (Royal Society) প্রভৃতি বড় বড় সাংস্কৃতিক সমিতির অধিবেশন হয়।

সেই দিনই টেম্‌সের বক্ষে স্টীমার-যোগে মাইল পনের গিয়ে কিউ উদ্যানে (Kew Gardens) বেড়িয়ে এলাম। ছেলেবেলাকার কল্পনার বাস্তব রূপ দেখলাম। আমাদের বোটানিকাল গার্ডেনকে এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

এর পরই দিন কুড়ির জন্য ইওরোপ (ফ্রান্স, জার্মানি, সুইটজার্লণ্ড) ঘুরে আমার প্রধান কর্মস্থল লীড্‌স্-এ ফিরে আসি।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সাঙ্গ ক'রে, ম্যাঞ্চেস্টার, ডাণ্ডি, বেলফাস্ট প্রভৃতি স্থানের শিক্ষাসূচী (Syllabus) শেষ ক'রে সেপ্টেম্বরের প্রথমে আবার যখন লীড্‌সে ফিরি, তখন বিদায়ের পালা। এক বছর ধরে যাদের সঙ্গে ক্রিয়া-কর্ম, চেনা-জানা, তাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন রাত্রের ট্রেনে লীড্‌স্ ছাড়লাম। অনেকগুলি ছাত্র স্টেশনে এসেছিল, সকলেই বাঙালী। আমার মনে যদিও বিদায়ের ব্যথার চেয়ে যাত্রার অপর প্রান্তে স্বজন-মিলনের আনন্দই তখন প্রবল,—এই সব ছাত্রদের মনে কিন্তু নূতন ক'রে বিচ্ছেদ-ব্যথা জেগে উঠল। প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া মনের আনন্দে যে কেউ সেখানে আছে, তা মনে হয় না। ট্রেন ছাড়বার পর—কেন আসা, কেন যাওয়া, কেন এত লেখাপড়া, এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। তিন ঘণ্টার পথ —রাত্রি ব'লে সাত ঘণ্টায় পার হ'য়ে গাড়ী যখন লণ্ডনে এল, তখন সকাল হ'য়ে গেছে। ভারতীয় ছাত্রাবাসেই উঠেছিলাম—সেই অব্যবস্থা।

পরদিন সন্ধ্যায় প্লেন ছাড়বে। বৃটিশ কাউন্সিল ও বি.ও.এ.সির লেন-দেনের অনুষ্ঠান সেরে যথেষ্ট সময় আছে দেখে ব্রিস্টলে (Bristol) নবভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দিরে একবার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সুযোগ ছাড়লাম না। ট্রেনে ১২০ মাইল পথ যেতে দু ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। কিছু আগেই বাথ (Bath) শহর, ট্রেন থেকেই দেখলাম—সুন্দর সুন্দর সাদা বাড়ীগুলি রোদে ঝলমল করছে। ব্রিস্টল স্টেশনে পৌছে—শহরের বিরাট ম্যাপে সুইচ টিপে আমার গন্তব্য স্থানে যাওয়ার নিশানা ঠিক ক'রে নিলাম। সমাধি-ক্ষেত্রে পৌছে কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই তিনি বললেন, 'কি রাজার সমাধি দেখতে এসেছেন ?' খুঁজে পেতে একটুও দেরি হ'ল না। বহু ক্রশ ও স্মৃতি-ফলকের মধ্যে ভারতীয় ধরনের মন্দিরাকৃতি গম্বুজ ও চূড়া-বিশিষ্ট আচ্ছাদনটি গেট থেকেই চেনা যায়। ১৮৩৩ খৃঃ ভারতের কাজেই ইংলণ্ড এসে এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। প্রস্তর ফলকে আট-দশটি ছত্রে তাঁর প্রশস্তি লেখা আছে।

যে পুষ্পস্তবকগুলি এনেছিলাম, সেগুলি অঞ্জলি দিয়ে নীরবে চলে এলাম। শহরের অপর পারে এভন্ (Avon) নদীর ওপরে একটি পুরাতন ঝুলানো সেতু দেখতে গিয়ে পর্বত-গাত্রে কয়েকটি গুহা দেখলাম, লেখা আছে: এগুলি বহু পূর্বে রোমান ক্যাথলিক সাধুদের তপস্যার স্থান ছিল। আমার একটি ছাত্র সস্ত্রীক ব্রিস্টলে ছিল, সেখানেই আহারাদি সেরে লণ্ডনে ফিরলাম।

পরদিন সকালে শেষবারের মতো স্বামী ঘনানন্দজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাইল দশেক উত্তরে ডিউক্স্ এভিনিউএ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারে গেলাম। বড়দিনে যা দেখেছিলাম, তার তুলনায় আশ্রম এখন অনেক সুন্দর—পিছনের বাগানটি নানা ফুলে ভরা। স্বামী মুখ্যানন্দও রয়েছেন। ঠাকুরঘরের সামনে কয়েকজন ইংরেজ মহিলা ও ভদ্রলোক ধ্যানে রত। তার মধ্যে একটী মহিলার সঙ্গে আলাপে লক্ষ্য করলাম তাঁর তেজ—সংসার ত্যাগের ইচ্ছা, লণ্ডন আশ্রমে মেয়েদের কোন ব্যবস্থা নেই ব'লে অনুযোগ করছেন। মহারাজ প্রসাদ না পাইয়ে আমাকে ছাড়লেন না। বেশীর ভাগই ভারতীয় খাদ্য, রান্না অবশ্য একটি ইংরেজ মহিলার।

প্রসাদ ধারণ ক'রে হোস্টেলে ফিরে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিমান-বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ভারী মাল লীড্স্ থেকেই জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছি।

প্লেন ইংলণ্ডের মাটি ছাড়বার পর মনে হ'তে লাগল: 'বিলাত দেশটা' সত্যই তো 'মাটির', আর মানুষও 'রক্তমাংসে'র; তবে কি গুণে আজ এরা এত উন্নত? এক বছরের সংসর্গে নিজের মনেই উত্তর এল: পুরাতন ধারার ওপর শ্রদ্ধা, আবার নব আবিষ্কারের উদ্যোগ, তার পেছনে আছে নিয়ম-মানা স্বভাব আর আজ্ঞাবহতা, সেটাকে এরা অপমানকর মনে করে না। সর্বোপরি এদেশে বহু মনীষী আছেন, যাঁরা 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ' এই নীতি—জেনে হ'ক বা না জেনে হ'ক, মেনে চলেন। আমাদের মতো এঁরা ভাবেন না যে জীবন শুধু দু-দিনের; সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এঁরা জানেন।

প্লেন আমায় রোমে নামিয়ে দিল। রোমের পর এথেন্স হ'য়ে কাইরো। সে আর এক কাহিনী। কাইরো থেকে যে প্লেনে উঠি, তা থেকেই নেমে দমদমে ভারতের মাটি স্পর্শ করলাম ঠিক একটি বছর পরে—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

Come out of your narrow holes and have a look abroad. See how nations are on the march.

[Letter from Yokohama, 10th July, 1893] **Swami Vivekananda.**

চার্বাক দর্শন ও জন্মান্তর নিরাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

প্রত্যক্ষের দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ না হইলেও অনুমানের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে অনুমানের দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ হইলে জন্মান্তরও সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং অনুমানের সাহায্যেই ঈশ্বর, পরলোক, কর্মফল প্রভৃতি সিদ্ধ হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে চার্বাক বলেন, 'না। অনুমানের প্রামাণ্য অসিদ্ধ।' অনুমানের প্রামাণ্য কেন অসিদ্ধ, তাহা দেখাইতে গেলে প্রথমে অনুমানের প্রামাণ্য কিরূপে পূর্বপক্ষীর মতে সম্ভব হয়, তাহা দেখাইয়া তাহার খণ্ডন করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক কিরূপে অনুমানের দ্বারা বস্তু নির্ণয় করা হয়।

আমরা সকলেই দূর হইতে অথবা গাছপালার আড়াল হইতে ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বকুল ফুল বা মল্লিকা ফুল ফুটিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করি। অনতি-দূরে কোন ঘরের উপর অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রচুর ধূম দেখিয়া ঐ ঘরে কোথাও আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া নিশ্চয় করি। এইরূপ স্থলে গন্ধের আঘ্রাণ দ্বারা যে ফুল ফোটার বা ধূম দেখার ফলে যে অগ্নির নিশ্চয়তা, তাহাকে অনু-মিতি-রূপ জ্ঞান বলে। কিন্তু এই অনুমিতি কিভাবে হয়, তাহা সাধারণ লোকে না জানিলেও 'অনুমান'বিদ্‌গণ তাহা জানেন। তাঁহারা বলেন :

একটি স্ফটিকের নিকট যদি লাল জবাফুল থাকে, তাহা হইলে ঐ স্ফটিক লাল দেখায়। স্ফটিকের নিজের কোন রং নাই, অথবা অনুজ্জ্বল রংই স্ফটিকের স্বাভাবিক রং। উহার লাল রংটি ঔপাধিক। স্ফটিকের উপাধি হইতেছে জবার রং। এই হেতু স্ফটিকের লাল রংটি যথার্থ রং নয়। উহার অনুজ্জ্বল শুক্লরূপই স্বাভাবিক রং। অতএব স্ফটিকের স্বচ্ছতাকেও অনৌপাধিক অর্থাৎ উপাধিশূন্য স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই ভাবে পূর্বকথিত গন্ধের দ্বারা ফুল ফোটার বা ধূমের দ্বারা যে অগ্নির জ্ঞান হয়, তাহাতে বোঝা যায় যে ফুলের সহিত গন্ধের বা বহ্নির সহিত ধূমের একটা সম্বন্ধ আছে। প্রত্যক্ষ দেখাও যায়—যেখানে বিশেষ গন্ধ সেখানে পুষ্পত্ব, সেখানে ধূম, সেখানে বহ্নি। এই সম্বন্ধটি স্বাভাবিক, উহা অন্য কোন উপাধি-জনিত নয়। এই জন্য এই সম্বন্ধকে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা অনৌপাধিক সম্বন্ধ বলে। অনুমানবিদ্‌গণ এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলেন। এই সম্বন্ধের জ্ঞান বা ব্যাপ্তির জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকেই; ইহা না জানিলে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমিতি হয় না। এই হেতু ব্যাপ্তির জ্ঞান অনুমিতির কারণ। কিন্তু যদি কেহ ভ্রম-বশতঃ অথবা হঠকারিতা-বশতঃ বলে, যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে—সেখানে সেখানে ধূম থাকে, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, অনেক ক্ষেত্রে বহ্নি থাকিলে ধূম থাকে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বহ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না। যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নি ধূমকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে। সেই

জন্য অগ্নিতে ধূমের স্বাভাবিক বা উপাধিরহিত সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কোন একটি উপাধিকে অবলম্বন করিয়া বহ্নিতে ধূমের সম্বন্ধ থাকে। যেমন জবাফুলকে অবলম্বন করিয়া স্ফটিকে লৌহিত্যের সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ অগ্নির ইন্ধনে জলসম্পর্ক থাকিলেই অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধ হয়। এই জন্য অগ্নিতে ধূমের সম্বন্ধটি স্বাভাবিক বা অনৌপাধিক নহে, কিন্তু অগ্নির ইন্ধনে জল সম্পর্করূপ রূপ উপাধি-জনিত। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে বহ্নিতে ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ঔপাধিক। এই জন্যই বহ্নি দেখিয়া ধূমের অনুমিত যথার্থ-ভাবে হইতে পারে না। উপাধিশূন্য সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। বহ্নিতে উপাধিবিশিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় ধূমের ব্যাপ্তি নাই। অথচ ব্যাপ্তির জ্ঞান অনুমিতির প্রতি একটি কারণ। আবার যেই খানে গন্ধবিশেষের জ্ঞান হয়, সেইখানেই ফল ফোটার নিশ্চয় হয়; বা যেইখানে ধূমের জ্ঞান হয়, সেই স্থলেই বহ্নির নিশ্চয় হয়, অন্যত্র হয় না। এই জন্য যে হেতুর দ্বারা অনুমিতি করিতে হইবে, সেই হেতুকে কোন একটি আশ্রয়ে অবস্থিত বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাকে অনুমানবিদ্‌গণ 'পক্ষধর্মতা' বলেন। ইহাও অনুমিতির প্রতি কারণ। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতার জ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়।* এই অনুমিতিকে ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অনুমান শব্দের দ্বারাও বুঝানো হয়। অনুমানবিদ্‌গণ এই ভাবে অনুমানকে প্রমাণ বলেন।

এখন চার্বাকেরা যে ভাবে 'অনুমান প্রমাণ নয়' বলিয়া অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করেন, তাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

আমাদের চক্ষু থাকিলেই আমরা রূপ দেখিতে পাই, 'চক্ষু আছে' এই জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ব্যাপ্তি থাকিলেই সেইরূপ অনুমিতি হয় না। ব্যাপ্তির জ্ঞান হইলে তবে সাধ্যের অনুমিতি হয়। কত কত স্থানে ব্যাপ্তি আছে, তাহার সর্বত্রই কি আমাদের অনুমিতি হয়? যেখানে ব্যাপ্তির জ্ঞান থাকে, সেইখানে অনুমিতি হয়। অথচ ব্যাপ্তিকে জানিবার উপায় নাই। কেন উপায় নাই? শোন। আচ্ছা, বল দেখি—ব্যাপ্তির জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা হইবে, অথবা অনুমানের দ্বারা হইবে? প্রত্যক্ষের দ্বারা হইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তি জানা সম্ভব নয়। বাহ্য প্রত্যক্ষটি বর্তমান সন্নিকৃষ্ট বিষয়েই উৎপন্ন হয়। এদিকে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি জানা মানে সকল ধূমে সকল বহ্নির ব্যাপ্তি জানা। নতুবা রান্নাঘরের ধূমে রান্নাঘরের বহ্নির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সেই ব্যাপ্তির দ্বারা পর্বতীয় ধূম দেখিয়া পর্বতীয় বহ্নির অনুমান হইতে পারে না। যেহেতু পর্বতীয় ধূমে পর্বতীয় বহ্নির যে ব্যাপ্তি আছে, তাহা তো আর জানা যায় নাই। এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী, ব্যবহিত বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্তি বাহ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা সম্ভব নয়। যদি বল, ধূম ও বহ্নি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সমস্ত ধূম ও সমস্ত বহ্নির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধও না হয় প্রত্যক্ষের বিষয় না হউক; ধূমত্ব জাতি এবং বহ্নিত্ব জাতি—প্রত্যেকে এক একটি জাতি বলিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হওয়ায় ব্যাপ্তিরও প্রত্যক্ষ হইবে; তাহার উত্তরে বলিব—ধূমত্ব ও বহ্নিত্বের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ হইলেও বহ্নি এবং ধূমের ব্যাপ্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে। বহ্নিত্ব হইতে বহ্নি বা ধূমত্ব হইতে ধূম অভিন্ন নয়।

* এতদ্ব্যতীত অনুমিতির আরও কারণ আছে, তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

মানস বা আন্তর প্রত্যক্ষের দ্বারাও ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারে না; কেন না—মন কখনও বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ করে না; এইভাবে প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হইল না। অনুমানের দ্বারাও ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে গেলে প্রথমে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োজন। আর ঐ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি জানিবার জন্য যদি অনুমানের অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় অনুমানের হেতুতে ব্যাপ্তি জানিবার জন্য তৃতীয় অনুমান আবশ্যক হইবে।

এইরূপে সেই অনুমানে আর একটি অনুমানের অপেক্ষা—ইত্যাদিক্রমে অনবস্থা দোষের আপত্তি হওয়ায় অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না।

আগম-প্রমাণের (শব্দ) দ্বারাও ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারে না। বৈশেষিক মতে আগম-প্রমাণ অনুমান-প্রমাণের অন্তর্ভূত বলিয়া পূর্বোক্ত অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হইবে। শ্রুতি বা শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহা অনুমান-সাপেক্ষ হওয়ায় সেই অনুমানে কথিত দোষের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। শব্দ অর্থাৎ বাক্য হইতে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে গেলে অনুমানের প্রয়োজন। যেমন একজন লোক আর এক জন লোককে বলিল 'ওহে গরুটা লইয়া আইস'। তার পর প্রয়োজ্য ব্যক্তি গরু লইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া নিকটবর্তী বালক প্রথমে প্রয়োজ্য ব্যক্তির চেষ্টা দেখিয়া তাহার (প্রয়োজ্য ব্যক্তির) প্রবৃত্তির মানসিক উদ্যম অনুমান করিল। আবার তাহার মানসিক উদ্যম বুঝিয়া সেই উদ্যমের কারণ যে প্রয়োজক ব্যক্তির বাক্যের অর্থ জ্ঞান, তাহা অনুমান করে। তখন সে বালক অনুমান করে যে 'গরু লইয়া আইস' এই বাক্যের এই অর্থ। এইরূপে বাক্যার্থের অনুমান করিয়াই বালক ক্রমে ক্রমে পদের অর্থও বুঝে। এই ভাবে বাক্যার্থের জ্ঞানে যে অনুমানের প্রয়োজন, তাহা আমরা সংক্ষেপে দেখিলাম। সুতরাং শব্দ হইতে বাক্যার্থজ্ঞান অনুমান-সাপেক্ষ হওয়ায় শব্দ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করিতে হইলে অনুমানোক্ত দোষের আপত্তি আসিয়া যাইবে। আর চার্বাকেরা এত আহাম্মক নয় যে মনু প্রভৃতি বলিলেন, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে—অমনি বিশ্বাস করিয়া লইবে।

উপমান-প্রমাণও ব্যাপ্তির উপায় নয়। যে হেতু উপমানের ফল উপমিতিটি নামের সহিত নামীর সম্বন্ধ-জ্ঞান। 'গরুর মতো গবয়' লোকে এই কথা পূর্বে শুনিয়া পরে কোন স্থানে গবয় দেখিয়া বুঝে, এরই নাম গবয়। গবয়টি নামী, গবয় নাম; এই নাম-নামীর সম্বন্ধ-জ্ঞানই উপমিতি। অথচ ব্যাপ্তি হইতেছে উপাধিরহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধ। আর উপমিতি হইতেছে নাম-নামীর সম্বন্ধ। সুতরাং ব্যাপ্তি ও উপমিতি এক নয়। অতএব উপমানের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না।

অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্ভূত, অনুপলব্ধিও প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। এই ভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় না থাকায়, ব্যাপ্তির উপদেষ্টা পাওয়া যাইবে না। উপদেষ্টার অভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভাবিত হওয়ায় ধূমাদি দেখিয়া আর কেহই বহ্নি প্রভৃতির অনুমান করিতে পারিবে না। সুতরাং নিজ নিজ অনুমানের কোন উপায় না থাকায় পরের অনুমান করানো একেবারে অসম্ভব হইয়া যাইবে।

আরও কথা এই যে অভাবের জ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া পূর্বে উপাধির

জ্ঞান হইলে তবেই উপাধির অভাবের জ্ঞান হইবে। উপাধির অভাববিশিষ্ট সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। সুতরাং ব্যাপ্তির ঘটক উপাধির অভাব। আবার উপাধির অভাবের ঘটক উপাধি। এই জন্য পূর্বে উপাধির জ্ঞান আবশ্যক। অথচ উপাধি যে প্রত্যক্ষ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। যে সকল উপাধির প্রত্যক্ষ হইল, তাহাদের অভাব না হয় প্রত্যক্ষ হউক; কিন্তু যে সমস্ত উপাধির প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাদের অভাবেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অনুমানের দ্বারা ঐ সকল উপাধিকে জানিতে গেলে পূর্বকথিত অনবস্থা দোষের আপত্তি হইবে। আর এক কথা এই যে, যাহা হেতুর অব্যাপক এবং সাধ্যের ব্যাপক অথচ ব্যাপ্য, তাহাই উপাধি। সাধ্যের ব্যাপ্য বলায় উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে—ইহা জানা যায়। আবার সাধ্যের ব্যাপক বলায় সাধ্যে উপাধির ব্যাপ্তি থাকে। এই ভাবে উপাধিটি ব্যাপ্তিঘটিত হওয়ায় উপাধিকে জানিতে গেলে ব্যাপ্তি জানা আবশ্যক হয়। সুতরাং উপাধির জ্ঞান হইলে উপাধির অভাব-বিশিষ্ট সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। আবার ব্যাপ্তির জ্ঞান হইলে উপাধির জ্ঞান হইবে। এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইবে। অতএব ব্যাপ্তি-জ্ঞানের আর কোন উপায় না থাকায় অনুমানের (অনুমিতির) কোন পথ থাকিল না।* যদি বল অনুমান সিদ্ধ না হইলে ধূম প্রভৃতির জ্ঞান হইতে যে লোকের অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহার সমাধান কিরূপে করিবে?

তাহার উত্তরে বলিব—প্রত্যক্ষমূলক স্মৃতি বা সম্ভাবনা অথবা ভ্রান্তিবশতঃ ঐরূপ প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইবে। লোকে মণি, মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া কখন রোগাদি হইতে মুক্ত হয়, কখনও বা হয় না। আবার কখন বা ঔষধাদি ব্যবহার না করিয়াও নীরোগ হয়। এই ভাবে সম্ভাবনা মাত্রে বা ভ্রান্তিবশতঃ ঔষধসেবনে প্রবৃত্ত হয়। যে ধূম প্রত্যক্ষ করিয়াছিল সে বহ্নিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কালান্তরে ধূম দেখিয়া সংস্কারের উদ্বোধ হওয়ায় ব্যাপ্তিস্মরণপূর্বক বহ্নিতে প্রবৃত্ত হয় অথবা ভ্রান্তিবশতঃ বহ্নিতে প্রবৃত্ত হয়। ভ্রান্তির হেতু এই যে ধূম-দ্রষ্টা কখন বহ্নি প্রাপ্ত হয়, আবার কখন প্রাপ্ত হয় না। এই ভাবে ভ্রান্তিবশতঃ ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় অনুমানের প্রামাণ্য অসিদ্ধ। ঔষধাদির ব্যবহারে কখন রোগ আরোগ্য হয় না, কখন বা ঔষধাদির ব্যবহার না করিয়া আরোগ্য হয় বলিয়া অন্বয়-ব্যভিচার ও ব্যতিরেক-ব্যভিচার নিবন্ধন কার্যকারণ-ভাবও সিদ্ধ হয় না। কার্যকারণ-ভাব অসিদ্ধ হওয়ায় কর্মজন্য ধর্ম ও অধর্ম অসিদ্ধ। ধর্মাধর্মের অসিদ্ধিবশতঃ জগতের বৈচিত্র্য দেখিয়া ধর্মাধর্মের অনুমানপূর্বক যে জন্মান্তরের অনুমান বা কল্পনা তাহা আর প্রতিপন্ন হয় না। তবে যে এই জগতে একজন সুখী, একজন দুঃখী, একজন দুর্বল, অপরে বলবান্, একজন ধনী, আর একজন নিঃস্ব ইত্যাদি বৈষম্য দেখা যাইতেছে—তাহার হেতু হইতেছে স্বভাব। জলের শীতলতা, বহ্নির উষ্ণতা কে করিয়াছে? স্বভাব। এইরূপ স্বভাবই বৈচিত্র্যের কারণ। জন্মান্তরের ধর্মাধর্মবশতঃ জগদ্‌বৈচিত্র্য হয় নাই।*

এই পূর্বকথিত যুক্তি অনুসারে দেখা যায় বেদাদিবিহিত যাগাদি করিলে কখন ফলপ্রাপ্তি হয়, কখন বা হয় না। আবার কখন বা যাগাদি না করিয়াও ফলপ্রাপ্তি হয় বলিয়া বেদাদি

* সর্বদর্শনসংগ্রহ।

শাস্ত্রোক্ত যাগাদির ফল অসিদ্ধ। ফল না হইলে বেদবাদীরা বলে, কর্মে বৈগুণ্য হইয়াছে; ফল হইলে বলে, দেখ বেদের মহিমা! বেদোক্ত উপায় ব্যতিরেকে ফল হইলে বলে, জন্মান্তরের কর্ম। এই ভাবে তাহারা কেবলই লোক বঞ্চনা করিয়া থাকে।

আর যদি বেদবাদীরা বলেন: লোকের অজ্ঞতা বশতই বেদবিহিত কর্মের ফল যথাযথভাবে প্রাপ্ত না হইয়া বেদকে অপ্রমাণ বলে; বস্তুতঃ বেদ কখনও অপ্রমাণ হইতে পারে না, উহা কোন পুরুষ কর্তৃক রচিত নয়, উহা অনাদি অনন্ত শব্দ-রাশি; পুরুষের রচনা নয় বলিয়া বেদে কোনরূপ দোষ নাই, উহা স্বতঃপ্রমাণ; অনুমানের দ্বারা জন্মান্তর প্রভৃতি সিদ্ধ না হইলেও বেদের দ্বারা জন্মান্তর সিদ্ধ হয়, যথা 'পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্মযোগাৎ' [কৈবল্য উপনিষৎ ১ম অধ্যায়]; এইরূপে বেদের দ্বারা ঈশ্বর, দেহাদি ভিন্ন আত্মা প্রভৃতি সিদ্ধ হয়—তাহা হইলে আমরা (চার্বাকেরা) জিজ্ঞাসা করি: বেদ নিত্য, (পুরুষকর্তৃক রচিত নহে) ইহার হেতু কি? যদি বল বেদের কর্তার স্মরণ হয় না (অস্মর্যমাণকর্তৃকত্ব) বলিয়া বেদ নিত্য, তাহা হইলে বলিব অনেক জীর্ণ কূপ, উপবন প্রভৃতির কর্তার স্মরণ হয় না, অথচ তাহা অনিত্য হওয়ায় বেদবাদীর হেতুটি (অস্মর্যমাণকর্তৃকত্ব) ব্যভি-চারী হইতেছে। ইহাতে যদি তাঁহারা (বেদ-বাদীরা) বলেন: কূপ, উপবন প্রভৃতির যে কর্তার স্মরণ হয় না, তাহা দেশকালের উচ্ছেদবশতই হয় না; ঐ সকলের যে কর্তা নাই, তাহা নহে; কিন্তু বেদের যে কর্তার স্মরণ হয় না, তাহা দেশ-কালের উচ্ছেদ বশতঃ নয়; কোন কালে কোন দেশেই বেদের কর্তার স্মরণ হয় না; অতএব কোন নিমিত্ত বিনাই বেদের কর্তার স্মরণ হয় না (অনিমিত্তাস্মর্যমাণকর্তৃকত্ব) বলিয়া বেদ নিত্য, সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ—তবে তাহার উত্তরে বলিব, বেদবাদীরা পূর্বে বেদের নিত্যতার প্রতি কর্তার অস্মরণ (অস্মর্যমাণকর্তৃকত্ব)-কে হেতু বলিয়া পরে বিনা নিমিত্ত কর্তার অস্মরণ (অনিমিত্তাস্মর্যমাণকর্তৃকত্ব)-কে হেতু বলায় তাঁহাদের হেত্বন্তর নামক নিগ্রহস্থান হইল।* সুতরাং বেদ নিত্য নহে, উহা কতকগুলি ভণ্ডের রচনা বলিয়া অপ্রমাণ। অতএব জন্মান্তর অসিদ্ধ। ইহলোকের প্রাপ্ত সুখকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অলীক জন্মান্তরের জন্য ধর্মাদি করিয়া থাকে, তাহারা অতীব মূর্খ। হে মানব! এস আমরা বৃহস্পতির প্রবর্তিত সকল লোকের হিতকর এই চার্বাক মত অনুসরণ করিয়া নিজের, দশের ও সমস্ত জগতের কল্যাণে নিযুক্ত হই।—ইহাই সংক্ষিপ্ত চার্বাক মত।

* তত্ত্বোপপ্লবসংগ্রহ—জয়রাশি ভট্ট॥ কোন সাধ্যের সাধনের জন্য একটি হেতু বলিয়া পরে তাহাতে কোন বিশেষণ অথবা অন্য হেতু বলিলে হেত্বন্তর নামক নিগ্রহ-স্থান হয় (ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য)।

Charvakas, a very ancient sect in India, were ra[illegible] materialists...... They claimed that the soul being the product of the body and its forces, died with it; that there was no proof of its further existence. They denied inferential knowledge, accepting only perception by the senses.

These Charvakas were allowed to preach from temple to temple, and city to city, that religion was all nonsense............Yet no one hurt these Charvakas.

—*Swami Vivekananda.*

আশঙ্কা-সংশয়ে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রাত্যহিক ঘটনার ব্যবধান মেপে মেপে কিবা হবে ফল!
চেয়ে চেয়ে দিনে দিনে ভূতাকাশ পানে?
চিদাকাশে পরমার্ক হেরিবারে চিত্ত যদি না হয় চঞ্চল,
পতনে উত্থানে
প্রপঞ্চিত ধরণীতে বারে বারে আসা-যাওয়া হবে কি গো শেষ?
জলবিম্ব সম স্থিতি, তারি মাঝে জেগে ওঠে সুখ দুঃখ ক্লেশ!
কদলী-স্তম্ভের মতো অসার পার্থিব দেহ। কামের কুঙ্কুম
মেখে রচিতেছি আকাশ-কুসুম!

বেদের প্রত্যূষ আর উপনিষদের উষা হ'তে এসেছি আমরা,
শত শত শতাব্দীর পথ বাহি।
দুঃখের বপন-ভূমি এই চিত্ত, বাসনার শস্য-বীজে ভরা;
সত্য দৃষ্টি নাহি।
স্বরূপ বিভ্রষ্ট হ'য়ে জিগীষার যজ্ঞানল জ্বালি অবিরাম
আস্তিক দর্শন সাথে লোকায়ত চিন্তাধারা করেছে সংগ্রাম।
মোরা তার পরিণাম বারংবার হেরিলাম আশঙ্কা-সংশয়ে—
ভ্রান্ত ভাব-সমীক্ষার সমুচ্চয়ে।

মোরা সবে তন্তুবদ্ধ শকুনির সম রহি বিশ্ব-চরাচরে,
তবু ভাবি আপনারে মহা শক্তিমান্।
সংসার-গহনে করি স্বেচ্ছায় পরিক্রমা মায়িক অন্তরে
আশাচ্ছন্ন প্রাণ।
চিন্তার লহরী মাঝে ডুবে গেল মর্মতরী বস্তুর সংঘাতে,
বিভ্রমে হমুগ্ধ জীব কোথা পাবে দিব্যজ্ঞান আত্মজ্ঞান সাথে?
বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করি যাহা মমতায় আঁকা,
আর কেন তারে বৃথা অহরহ রাখা?

কাজ নাই ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের কথা শুনিতে আগ্রহ
বিশ্বদেবতার সন্দর্শন লাগি।
বন্দী বিহঙ্গের মতো পার্থিব পিঞ্জরে থাকা নিয়ত দুঃসহ
মায়াজালে ঢাকি।
জড়বাদ-বিড়ম্বিত বস্তু-বিশ্বে অবস্থিতি বেদনা-সঙ্কুল,
সঙ্কীর্ণ সংসার মাঝে নীরবে প্রদীপ জেলে বসে থাকা ভুল;
পৃথুল পৃথ্বীর পথে চলেছে অসংখ্য প্রাণী অদৃষ্ট সঙ্কেতে
কোথা কোন্ অকুণ্ঠায় কি আনন্দে মেতে?

সমালোচনা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড, তারকচন্দ্র রায় প্রণীত, প্রকাশক—গুরুদাস ট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, লিকাতা ৬; পৃষ্ঠা ৬২০, মূল্য বারো টাকা।

বঙ্গভাষায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের এইরূপ কখানি ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল। লেখক ন্ত্রের যুগ হইতে বর্তমান দার্শনিক চিন্তাধারার ই ইতিহাস লিখিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিলেন। দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত রীতি ুসারে গ্রন্থে যথাক্রমে বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব-মাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শন আলোচিত ইয়াছে। এতৎসহ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্যের তুংসন সম্প্রদায়, শৈব দর্শন, মধ্বাচার্যের তবাদ, শাক্তবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতিও যথাসম্ভব র্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও বাদ যায় নাই। প্রত্যেক দর্শন আলোচনা করিবার সময়ে তাহার উদ্ভব-কাল, অন্য দার্শনিক মতের সহিত তাহার পার্থক্যাদি যেমন প্রদর্শিত হই-য়াছে, তেমনি এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এবং এ-দেশীয় আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামতও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই য ইহাতে ভাসাভাসাভাবে তত্ত্ব আলোচিত য় নাই। গভীর তত্ত্বসকল যাহাতে পাঠকের দ্ধিগম্য হয়, নানাভাবে তাহার চেষ্টা করা ইয়াছে। ফলে অনেক সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্ব সুস্পষ্ট ইয়া উঠিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরমাণুবাদের সহিত রিচয় লাভের কত পূর্বে এদেশে পরমাণুবাদ সম্বন্ধে গবেষণা হইয়াছে, ইহাও দেখানো হই-য়াছে, প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ সেই রমাণুকে অবলম্বন করিয়া যে সকল সূক্ষ্মতর পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, সে বিষয়েও আলোক পাত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে লেখকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শঙ্করের মায়াবাদ শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন, আবার উহার সমর্থনের জন্য বর্তমান বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে রূপরসাদির যে কোন স্থায়ী সত্তা নাই, ওগুলি স্পন্দনমাত্র, অনুভূত হইলেও তৎতৎ-রূপে বাস্তব নহে, তাহাও দেখাইয়াছেন। লেখকের প্রশ্ন 'এই স্পন্দনসর্বস্ব জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?'

গ্রন্থে যখন যে আচার্যের মত আলোচনা করা হইয়াছে, তখন নিরপেক্ষভাবে তাঁহার মত ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্করের মায়াবাদ, চরিত্রনীতি, উপাসনা, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কোন কোন স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। এরূপ পুস্তকে উহা না থাকিলেই শোভনীয় হইত। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। বহুশাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া তাঁহাকে ইহার তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহাতে পাঠকের জ্ঞান-ভাণ্ডার অবশ্যই সমৃদ্ধ হইবে। তজ্জন্য লেখক সকলের ধন্যবাদার্হ। —বোধাত্মানন্দ

Thus Spake The Christ: Compiled by Swami Suddhasattwananda, Published by Sri Ramakrishna Math, Madras 4, Pocket size, pp. 96. Price 40 nP.

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও বুদ্ধের বাণী চয়ন করিয়া পূর্বেই পাঁচখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই জনপ্রিয় সিরিজের ষষ্ঠ পুস্তিকা 'Thus Spake The Christ'. খৃষ্টের সংক্ষিপ্ত জীবন ও খৃষ্ট সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তির পর বাইবেল হইতে চয়ন করিয়া শৈল উপদেশ, গল্পচ্ছলে শিক্ষা প্রভৃতি আটটি ছোট ছোট অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্পের মধ্যে খৃষ্টধর্মের সারমর্ম ইহাতে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ২৫শে অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১০৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। ৭,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন ও বাণীর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, সুদীর্ঘকালের স্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভোগরাগ, ভজন, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ধন্য হন। ৭০০ নরনারী বসিয়া এবং বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরও বহু ভক্ত মাতৃসন্দর্শনে আসেন।

অদ্বৈত আশ্রমের নূতন ভবন

গত ৮ই ডিসেম্বর সকাল সাতটায় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের নূতন ভবনের (৫নং ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪) উদ্বোধন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈদিক শান্তিপাঠ ও শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন হয়। আয়োজিত সভায় বহু সাধু ও ভক্তের সমাবেশে স্বামী গম্ভীরানন্দ অদ্বৈত আশ্রমের ইতিহাস, কর্মপ্রসার ও কার্যাব[illegible] বর্ণনা করেন।

কার্যবিবরণী

লখনৌ: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে উল্লেখযোগ্য কর্মব্যাপৃ[illegible] প্রকাশিত হইয়াছে:

চিকিৎসা: অ্যালোপ্যাথিক ও হোমি[illegible]প্যাথিক উভয় বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ১,৪৮,৪৬০ ; ১,৭২,১৭৫ এবং ১,৫৮,২২৩ জ[illegible] রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ইহাদে[illegible] মধ্যে অস্ত্র-চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা[illegible] অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৭ খৃঃ রেডিওলজি, ইলে[illegible] থেরাপি ও দন্ত-চিকিৎসা বিভাগ খোলা হ[illegible] ১২ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদে[illegible] স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ গুঁড়া [illegible] ও মাখন বিতরিত হয়।

শিক্ষা: এই বিভাগে একটি গ্রন্থাগার [illegible] একটি অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়[illegible] গ্রন্থাগারে সাহিত্য অর্থনীতি রাজনীতি দর্শ[illegible] ধর্ম মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়[illegible] ৭,০৬০ সুনির্বাচিত পুস্তক আছে; পাঠাগা[illegible] ৮টি দৈনিক ও ৩০টি সাময়িক পত্রিকা আসে [illegible] হয়। গ্রন্থাগারের গ্রাহকসংখ্যা ১৪১; পাঠা[illegible]গারের দৈনিক উপস্থিতি ২৭।

ধর্ম ও সংস্কৃতি: সপ্তাহে তিন [illegible] বাংলায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী[illegible] উপদেশাবলী এবং হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বচনা[illegible] আলোচিত হয়। নিয়মিত ধর্মসভার অনুষ্ঠা[illegible] স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট।

তিরুপ্পারাইত্তুরাই (মাদ্রাজ) **:** শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন ১৯৪২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ খৃঃ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা তিরুচিরাপল্লী হইতে ১০ মাইল দূরে কাবেরীতটে অবস্থিত।

১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী: আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনে ৩৯৭ ছাত্র ছিল। এই বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা এবং প্রাথমিক শিল্পবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্যাডেট কোর রেড ক্রস, স্কাউট্‌ প্রভৃতি এখানে আছে। 'গুরুকুল' ছাত্রাবাসে ৩২৩ জন বিদ্যার্থী ছিল; ৫৯ খৃঃ ৮৯,৭২৩ টাকা ব্যয়ে ছাত্রাবাস সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮১ বালক ও ১৬২ বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। বিবেকানন্দ শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩৬, গত বর্ষে ৩৪ জন বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তপোবন গ্রন্থাগারে সংস্কৃত ইংরেজী হিন্দী ও তামিল ভাষায় ১৫০০ নির্বাচিত গ্রন্থ আছে। তপোবন আশ্রম হইতে তামিল ভাষায় 'ধর্মচক্র' নামে একটি মাসিক পত্র ১৯৫২ খৃঃ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রকাশন-বিভাগ হইতে ৫৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, বইগুলি বহুল-পঠিত। আশ্রমে একটি উন্নত ধরনের ছাপাখানা পরিচালিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং বৎসরের অন্যান্য উৎসব-দিনগুলি অনাড়ম্বরভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৭,৬৮৬ রোগী চিকিৎসা লাভ করে, মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৮,৬২৭। তামিলনাদে ও অন্যান্য স্থানে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল।

বাঁকুড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, মঠ বিভাগে দৈনন্দিন পূজা উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ৩৬০টি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা এবং ৮টি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও অন্যান্য উৎসব এবং প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা ও সরস্বতীপূজা যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল।

মঠ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৪৩১; গ্রাহক-সংখ্যা ২,৫৮৮। পাঠাগারে ৩টি দৈনিক ও ৩০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হইয়াছিল।

মিশনকর্তৃক তিনটি দাতব্য চিকিসালয় পরিচালিত হয়, বাঁকুড়ায় দুইটি এবং রামহরিপুরে একটি। আলোচ্য বর্ষে মোট ৮৫,৮৫০ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছিল।

একটি ছাত্রাবাস (ছাত্রসংখ্যা ২০), একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল (বালক ৪৮, বালিকা ২৮) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্র ১০৩, ছাত্রী ২৪) একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ছাত্র ২৪৩) এবং প্রাপ্ত বয়স্কদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

বাঁকুড়া জেলার ছোট বীরভানুপুর গ্রামের ৯টি অগ্নিপীড়িত পরিবারকে গৃহ মেরামতের জন্য সাহায্য করা হইয়াছিল।

মনসাদ্বীপ (সাগরদ্বীপ, ২৪ পরগনা) **:** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (১৯৫৫-'৫৮) খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৮ খৃঃ কাঁথি রামকৃষ্ণ আশ্রমের শাখা-কেন্দ্ররূপে মনসাদ্বীপে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৫ খৃঃ ইহা মিশনের একটি পৃথক্ কেন্দ্রে পরিণত হয়। আশ্রমের শিক্ষালয়টি ১৯৫২ খৃঃ উচ্চ বিদ্যালয়রূপে অনুমোদিত হয়। ১৯৫৮ খৃঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে ২১২ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ১০৫ জন ছাত্র এবং বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮ জন ছাত্রী অধ্যয়ন

করিয়াছিল। '৫৮ খৃঃ উচ্চ বিদ্যালয় হইতে ৮ জন ছাত্র স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১৯৫৫ খৃঃ সমাজশিক্ষা বিভাগ আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়। সমাজশিক্ষার নিজস্ব ভবনে নব-সাক্ষরদের পাঠাগারটি জনপ্রিয় হইয়াছে।

একটি ছোট ছাত্রাবাস, একটি গ্রন্থাগার এবং পাঠাগারও পরিচালিত হইতেছে। ১৯৫০ খৃঃ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নারীকল্যাণ কেন্দ্র : (Women's Welfare Centre), কলিকাতা : এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬-৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নারীজাতির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিকল্পে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ খৃঃ। এ যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশনের মাতৃ-জাতির উন্নতিমূলক কর্মধারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, স্বামীজীর পরিকল্পিত আদর্শে নারীজাতির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ভাব বিস্তারের জন্য এই কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

এখানে প্রখ্যাত বিদ্বজ্জনদ্বারা বিশেষ করিয়া বিদুষী মহিলাগণ কর্তৃক ধর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ-তত্ত্ববিষয়ক নিয়মিত সাপ্তাহিক ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

বৎসর	ক্লাস সংখ্যা	গড়ে শ্রোতৃসংখ্যা
১৯৫৬	২০	৫৪
'৫৭	৩৫	৬৯
'৫৮	৩৮	৭৬
'৫৯	৩৫	৭৮

সমাজশিক্ষা-বিভাগে সাক্ষরতা পরীক্ষায় ২৮ জন মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ৬১ জন মহিলা ও বালিকাকে বাংলা, ইতিহাস-ভূগোল ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে ৭৬০ বই আছে কলেজের ছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তকে লাইব্রেরী আছে, উহা হইতে ১৯৫৮ ও '৫৯ খৃঃ ছাত্রীগণ যথাক্রমে ৫১ ও ৬৩ বই পড়িতে লইয়াছিল।

সাপ্তাহিক পাঠচক্রে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী এবং মহাপুরুষ-জীবনী আলোচিত হয়। হিন্দী শিক্ষার জন্য হিন্দী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; '৫৯ খৃঃ ১১ জন বালিকা প্রারম্ভিক হিন্দী পরীক্ষা দিয়াছিল, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো : বেদান্ত সোসাইটি : নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১ টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮ টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় :

মে : বাস্তবতার অভ্যাস; ব্যক্তিত্ব কিরূপে পূর্ণাঙ্গ করা যায়; 'এস, আমরা দেবতা হই' বুদ্ধ ও শঙ্কর; কেমন করিয়া ভাব শুদ্ধ করিতে হয়; অদ্বৈতবাদ কিভাবে অভ্যাস করা যায়; অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত; গীতাপাঠের ভূমিকা; মন কেন যথেচ্ছ আচরণ করে?

জুন : ভগবদ্ভক্তের জীবন-যাপন; মুক্তি, ধর্ম ও সত্তা; আত্মার অমরত্ব ও তাহার অনুভূতি; ভগবান্ বুদ্ধের বাণী; মনঃসংযম;

মৃত্যুর পরে দেহ, মন ও আত্মা; রাজযোগ: বিপত্তি ও পথনির্দেশ; চিন্তা ও ভয় হইতে মুক্ত হইবার উপায়; প্রেম—জাগতিক ও ঐশ্বরিক।

জুলাই: বিবেকানন্দের হৃদয় ও মন; বিভিন্ন ধর্ম, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি; মরমীয়াবাদের ভিত্তি; হৃদয়-বিজ্ঞান; কুণ্ডলিনী ও অনুভূতি-স্তর।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং সম্মুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে: প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্য দিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব

শ্যামপুকুর: শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর কলিকাতার ৫৫ নং (বর্তমান ৫৫এ এবং ৫৫বি) শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থ ভবনে চিকিৎসার্থ অবস্থানকালে ১৮৮৫ খৃঃ ৺শ্যামাপূজার রাত্রিতে বরাভয়-মূর্তি ধারণপূর্বক সমাগত ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই পুণ্য লীলা স্মরণকল্পে গত ১৯শে অক্টোবর শ্যামাপূজার পুণ্যতিথিতে শ্যামপুকুরস্থিত উক্ত লীলাস্থানে এবং ৩১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থ বরেন্দ্র-স্মৃতিভবনে (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের বাটী) এক উচ্চ ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলুড় মঠের স্বামী সংশুদ্ধানন্দজীর পরিচালনায় একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দ ও পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'পুঁথি' অবলম্বনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বরাভয় মূর্তি ধারণ সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনালয়ের ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের নামসংকীর্তন এবং শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্তিমূলক ভজন সমাগত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার করে।

স্বামী প্রেমানন্দ জন্মোৎসব

আঁটপুর (হুগলী): শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ স্বা[illegible]— মহারাজের জন্মোৎসব তাঁহা[illegible] জন্মস্থান আঁটপুর গ্রামে গত ২৭শে নভেম্বর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ, কীর্তনভজন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ও হাওড়া হইতে বহু ভক্ত সেখানে গিয়া সারা দিন ধরিয়া আনন্দ-উৎসব করেন। সভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও স্বামী সংশুদ্ধানন্দ প্রেমানন্দ মহারাজের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর : আশ্রমটি ১৯৪৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে সাধ্যমত সেবাকার্য করিয়া আসিতেছে। আশ্রম-পরিচালিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ দাতব্য ঔষধালয়ে' ১৯৫৮-৫৯ খৃঃ ২৩,৮৬৬ এবং ১৯৫৯-৬০ খৃঃ ১৮,৭৬২ জন চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। স্থানীয় পুষ্কর-মেলায় অস্থায়ী ঔষধালয় খুলিয়া তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যেও ঔষধ বিতরিত হইয়াছে। আশ্রমস্থ বিবেকানন্দ গ্রন্থালয়ে ৩,৮৩১খানি পুস্তক, ৫টি দৈনিক, ৫টি মাসিক এবং ২১টি অন্যান্য পত্রিকা ছিল। দুই বৎসর যথাক্রমে ১,৩১৯ এবং ১,১৭৪খানি পুস্তক পাঠার্থ প্রদত্ত হয়। আশ্রম-ছাত্রাবাসে তিনজন ছাত্র ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশাদির শুভ জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হয়। জয়পুর, কিষণগঢ় আদি রাজস্থানের কতিপয় শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও অন্যান্য স্থানে ধার্মিক সভা-সমিতির ও অনুষ্ঠান হইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল

গত ১৯শে নভেম্বর ভারতের স্বাস্থ্যম শ্রীকার্মারকর হায়দ্রাবাদে 'খাদ্যে ভেজাল প্রতি রোধ' বিষয়ক তিনদিবসব্যাপী একটি আলো চনার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন : যাহারা খা ভেজাল দেয়, কোন সরকার বা কোন সম তাহাদের প্রতি সদয় হইতে পারে না। খু আসামীদের মতো তাহাদের প্রাণদণ্ড হও উচিত। সরকার যদি এ বিষয়ে কিছু না করে তবে সমাজ একদিন নিজ-হস্তে তাহাদের শাস্তি দানের ভার গ্রহণ করিবে। সে দিনের জ অপেক্ষা করিয়া আমরা যেন না বসিয়া থাকি।

[P.T.I. হইতে সঙ্কলিত

বিজ্ঞান-সংবাদ

চন্দ্র-প্রদক্ষিণ-রত রকেট হইতে সংগৃহী তথ্যে জানা গিয়াছে—চন্দ্রের চৌম্বক ক্ষেত্র নাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন ধাতু পদার্থে প্রবহমান বিদ্যুৎপ্রবাহই পৃথিবীর চৌম্ব ক্ষেত্রের কারণ। চন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্র না থাকা ইহাই প্রমাণিত হয় যে চন্দ্রে পৃথিবীর কেন্দ্রে গুরুভার ধাতুগুলি নাই। সম্ভবতঃ পৃথিবী উপরিভাগের ত্বক্ হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যেখানে এখন প্রশান্ত মহাসাগর, সেখানেই একদিন চন্দ্র ছিল।

[Tass হইতে সংগৃহীত]

বিজ্ঞপ্তি
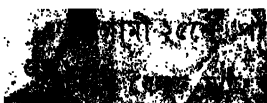
স্বামী ২৫শে পৌষ (৯.১.৬১) সোমবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ৯৯তম [illegible] সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।